পায়ের তলায় সর্ষে ২

ভ্রমণ সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের তলায় সর্ষে ২
ভ্রমণ সমগ্র
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্র ভারতী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের তলায় সর্ষে

ভ্রমণ সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২

PAYER TALAY SARSHE—VRAMAN SAMAGRA 2

by

Sunil Gangopadhyay

ISBN 978-81-8374-075-3

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত মাজি

মূল্য
৩০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 300.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

নিউ জার্সির গায়ক বন্ধু ও তার স্ত্রী

অনিন্দিতা ও পার্থ মুখোপাধ্যায়কে

খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ভ্রমণের নেশা। সব সময় মনে হতো, এই পৃথিবীতে জন্মেছি, যতটা পারি তা দেখে যাবো না? কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পয়সা তো ছিল না, তাই জমানো কুড়ি-তিরিশ টাকা হাতে পেলেই চলে যেতাম কাছাকাছি কোথাও। এক সময় জাহাজের নাবিক হবারও স্বপ্ন ছিল আমার। তা অবশ্য হতে পারিনি। তবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গেছি কয়েকবার। দেশের মধ্যে সব কটি রাজ্যে, পশ্চিমবাংলার মধ্যেও সব কটি জেলা এবং মহকুমা, এমনকী অনেক গ্রামে গ্রামেও ঘুরেছি। কখনো রাত কাটিয়েছি গাছতলায়, কখনো নদীর বুকে নৌকোয়, কখনো পাঁচতারা হোটেলে। এই সব ভ্রমণ নিয়ে লেখালেখিও করেছি অনেক। এখন দেখতে পাচ্ছি সেইসব লেখা জমে জমেও প্রায় পাহাড় হয়ে গেছে।

প্রায় সব ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে (কিছু হারিয়ে গেছে) পত্র ভারতীর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করছেন ভ্রমণ সমগ্র। এই দু'খণ্ডের আয়তন দেখে আমি নিজেই বিস্মিত। সব লেখা যদি সংগ্রহ করা যেত, তা হলে আরও কত বড় হতো! এবং আরও তো ভ্রমণ বাকি আছে এবং এর মধ্যে ঘুরে আসা অনেক দেশের কথা লেখাও হয়নি। তৃতীয় খণ্ড হবে? হতেও পারে!

১৯ জানুয়ারি ২০১০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

তারপর কী হল

পায়ের তলায় সর্ষে ১ ও ২

বারোটি উপন্যাস

ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

সুনীলের সেরা ১০১

সম্পাদিত বাবা

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ১

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ২

সূ চি প ত্র

মানস ভ্রমণ

না, এটা মানস সরোবরের কথা নয়। অতদূর আমি এখনও যাইনি, যাওয়ার ইচ্ছে আছে। আসামের একটি সংরক্ষিত অরণ্যের নাম মানস। কেউ কেউ বলেন মনাস বা মানাস। কিন্তু মানস নামটিই বেশি প্রচলিত এবং পছন্দসই। ভারতে যে ক'টি সংরক্ষিত বন আছে, তার মধ্যে আয়তনে এটি সবচেয়ে বড় এবং অনতিক্রম্য। অনেকদিন থেকেই বিশ্বস্ত লোকজনের মুখে এর সৌন্দর্যের কথা শুনেছি; পড়েওছি কিছু জায়গায়, প্রখ্যাত লেখক ই পি জি মানসের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি মানস দর্শনের বাসনা মনে-মনে পুষে রেখেছি, যদিও জানতাম, একার চেষ্টায় ওখানে যাওয়া সহজ নয়।

সুতরাং অসম সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়েই সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক করে নিলাম, এই সুযোগে মানস ঘুরে আসতে হবে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পরদিন তাঁর দূতের সঙ্গে যোগাযোগ হতেই আমার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিলুম। এ বৎসর অসম সাহিত্যসভার অধিবেশন হলো অভয়াপুর নামে একটি ক্ষুদ্র শহরে। ম্যাপ খুলে দেখে নিলাম, সেখান থেকে মানস অরণ্য বিরাট দূর নয়।

অসম সাহিত্যসভার তুল্য কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলায় নেই বলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অনেকের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে না। আসামের যে-কোনও রাজনৈতিক দলের চেয়েও এই সভা বেশি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। এঁদের বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছরই কোনও এক শহরে হয় না। বেছে নেওয়া হয় আসামের যে-কোনও একটি অঞ্চল, সাহিত্যসভাটি ধারণ করে বিশাল একটি মেলার আকার, আসে দূর-দূর থেকে গ্রামীণ মানুষ এই এক একটা উৎসবে যোগ দিতে। সভার বক্তৃতা দশ বারো হাজার মানুষ টুঁ শব্দটি না করে শোনে, সব কিছু না বুঝলেও এটুকু অন্তত বুঝে যায় যে সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার আছে, মাতৃভাষার একটা গৌরব আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারি আনুকূল্য প্রায় পুরোপুরি। মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে দু-তিন দিনের জন্য চলে আসেন এবং যে-দিন তাঁর বক্তৃতা থাকে না সেদিনও মঞ্চে দু-তিন ঘণ্টা বসে থেকে শোনেন সব কিছু। অন্যান্য অনেক মন্ত্রী বড় বড় আমলা এবং রাজনৈতিক নেতারা ঘোরাফেরা করেন সাধারণ অতিথির মতন, দুপুরে কয়েক হাজার অভ্যাগতর সঙ্গে বসেন পঙক্তিভোজনে। আসেন আসামের অধিকাংশ লেখক, কবি, শিল্পী গায়ক। যে-শহরে সাহিত্যসভা হয়, সেখানকার রাস্তাঘাটের ঝটিতি উন্নতি হয়ে যায়, তৈরি হয় নতুন বাড়ি ঘর। সাহিত্যের জন্য আসাম এতটা করে।

চারপাশে ছোট-ছোট পাহাড়ে ঘেরা অভয়াপুর শহরটি প্রায় গ্রামের মতন, অত্যন্ত ঝকঝকে সুন্দর। এককালে ছিল ছোট একটি রাজ্য বা জমিদারি, প্রাক্তন রাজাদের বাড়িটিতে এখনও বসতি আছে। এইখানকার মেয়ে বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তাই প্রবীণেরা এখনও দেশবন্ধুকে অভয়াপুরের জামাই বলে মনে করেন। এই জায়গাটি গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে, এবং গোয়ালাপাড়া আর ভুটান রাজ্যের সীমান্তেই মানস অরণ্য।

কথা ছিল, আমার জন্য থাকবে একটি গাড়ি, সঙ্গে যাবেন আরও দু-তিন জন এবং বনবিভাগের

একজন উচ্চপদস্থ অতি উৎসাহী ব্যক্তি। কিন্তু সাহিত্যসভার কাজে অনেকে নিযুক্ত, তা ছাড়া হঠাৎ ঘোষিত নির্বাচনের জন্যও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং বন্দোবস্তে অনেক ফাটল দেখা দেয়। যাঁদের সঙ্গে যাওয়ার কথা, তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না, গাড়ির জোগাড় হয় না ঠিক মতন, আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রচার সচিব শ্রী দাশ খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি প্রস্তাব দেন, আমি যদি পরে আবার কখনও আসি, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, এবার ঠিক সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যাব ঠিক করেছি, যাবই। অন্তত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে।

শেষ চেষ্টার জন্য অভয়াপুর থেকে শ্রী দাশের গাড়িতে চলে এলাম বরপেটা রোডে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্রী দাশ নিজে, তাঁর মুখে চিন্তার রেখা। একা-একা আমায় ছেড়ে দিলে আমার কোনও বিপদ ঘটতে পারে, তিনি ভাবছিলেন। মানসে একা-একা কেউ যায় না। মানসে খাবার-দাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই। ওখানে হিংস্র জন্তু, বিশেষ করে হাতির উপদ্রব খুব। এরকম জায়গায় একলা কোনও অতিথিকে কেউ পাঠায় না। তবে জেলার অরণ্য-অফিসার শ্রী লাহানকে পাওয়া গেলে আর কোনও চিন্তা নেই, তিনি অতি উৎসাহী মানুষ, তিনি সঙ্গে যাবেন এবং সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বরপেটা রোডে শ্রী লাহানের বাড়িতে গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না। তিনি হঠাৎ গৌহাটি চলে গেছেন। শ্রী দাসের মুখ আরও শুষ্ক হল। আমি কিন্তু মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলাম। যত শুনছি আর কোনও সঙ্গী পাওয়া যাবে না, তত আমার উৎসাহ বাড়ছে। আমি একাচোরা ধরনের মানুষ, একা-একা বেড়াতেই ভালোবাসি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে অনেক জায়গায় গেছি অবশ্য, কিন্তু কোথাও গিয়ে নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। আমি সুআলাপী নই। তা ছাড়া দল বেঁধে দেখা আর এই দেখার স্বাদই আলাদা। মানস অরণ্য আমি আপন মনেই দেখতে চাই। আমার চাই শুধু একটা গাড়ি, কেন না, পায়ে হেঁটে কিছুতেই একদিনে মানসে পৌঁছনো যায় না, সেখান থেকেই অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা।

উলটো দিকে পনেরো-কুড়ি মাইল উজিয়ে আসা হল বরপেটা শহরে। সেখানে শ্রী দাশের জেলা সহকারীর অফিসে যদি সেই সহকারীকে পাওয়া যায়। তিনিও নেই। সেদিন রবিবার কে কোথায় ঠিক নেই তো। সেই অফিসে আছে একটি জিপ। জিপই দরকার, জঙ্গলের পাহাড়ি রাস্তায় অ্যামবাসেডর সুবিধাজনক নয়। কিন্তু জিপটা আছে, নেই তার ড্রাইভার। ছুটির দিনে সে-ও কোথায় যেন গেছে।

শ্রী দাশ অত্যন্ত ভদ্রতাসম্মত উপায়ে আমাকে নিরস্ত করার আরও অনেক চেষ্টা করলেন। নেহাৎ আমি অতিথি, তাই রূঢ় কথা বলতে পারেন না। আমিও ততোধিক ভদ্রতার সঙ্গে আমার গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করছিলাম।

আসলে, আমাকে মানস-ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি যে সুচারু বন্দোবস্ত করে উঠতে পারছেন না, এজন্য তিনি লজ্জিত ও আমার নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তিত বোধ করছিলেন। আমি তাঁর ওই লজ্জাটুকুর সুযোগ নিচ্ছিলাম পুরোপুরি। আমি সাহিত্যসভা-টভা এড়িয়ে চলি, যদি না তার সঙ্গে আলাদা ভ্রমণের আনন্দ যুক্ত থাকে। অনেক তেতো ওষুধের অনুপান যেমন মধু।

শ্রী দাশের গাড়িতে, তাঁর পাশে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে বসেছিল। শ্রী দাশ তাকে জিগ্যেস করলেন, কী রে, তুই পারবি? ছেলেটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। তিনি বললেন, তাহলে দ্যাখ, জিপটা চালু অবস্থায় আছে কি না।

ছেলেটি নেমে যাওয়ার পর শ্রী দাস আমাকে বললেন, এই ছেলেটি আমার গাড়ি চালায়। কিন্তু ও কোনওদিন জিপ চালায়নি। ওকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে আপনার?

আমি বললাম, কেন, অসুবিধে কী আছে?

উনি বললেন, যেতে যেতেই অন্ধকার হয়ে যাবে, রাস্তা খুব খারাপ, এই ছেলেটা কোনওদিন

জিপ চালায়নি, যে-কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে—

আমি বললাম, কিচ্ছু হবে না, কোনও চিন্তা নেই। উনি বললেন, সন্ধের পর রাস্তার ওপর হাতি বসে থাকে।

আমি বললাম, চমৎকার। তা হলে তো যেতেই হবে।

শ্রী দাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বিকেল গাঢ় হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিকে লম্বা-লম্বা ছায়া। এর মধ্যে সেই ছেলেটি জিপ গাড়িটি বার করে এনেছে রাস্তায়। গাড়িটি থেকে মাঝে মধ্যে অদ্ভুত গর্জন রব বেরুচ্ছে—নতুন সওয়ারিকে পিঠে নিয়ে অবাধ্য ঘোড়া অমন বিরক্তি প্রকাশ করে। জিপটিকে তেল-জল-মোবিল দিয়ে সুস্থির করতে আরও আধঘণ্টা কাটল, ততক্ষণে পুরোপুরি সন্ধ্যা। চিন্তা-ভারাক্রান্ত শ্রী দাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে পড়লুম।

ষোলো-সতেরো বছরের অসমীয়া ছেলেটির নাম অতুল ওঝা। সে অত্যন্ত কম কথা বলে। কিংবা জীবনে প্রথম জিপ চালনার দায়িত্ব পেয়ে সে এতই ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। আমার সব প্রশ্নের সে শুধু হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়।

যাত্রার আগে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। বরপেটা রোডের বাজারে রাত্রির আহার সেরে পরের দিনের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। কেন না, তারপর মাইল পঁচিশেকের মধ্যে আর কোনও দোকান নেই। চেক পোস্ট থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে ডাক বাংলোতে খাদ্য ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় না। তবে বাংলোতে আমার নামে একটা ঘর আগে থেকেই রিজার্ভ করা আছে, সে জন্য চৌকিদার আমাকে ফেরাবে না, এবং আমি সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে গেলে সে রান্না করে দেবে। মানস অরণ্যে দর্শনার্থী অধিকাংশই সাহেব হয়, তারা সঙ্গে টিনের কৌটোয় খাদ্য ও পাঁউরুটি নিয়ে যায়। ডাকবাংলোয় আলো নেই, আমাদের মোমবাতিও নিতে হবে সঙ্গে করে। বরপেটা রোড বাজার পৌঁছবার আগেই নিকষ কালো রাস্তায় জিপ গাড়িটা দুবার হেঁচকি তুলে থেমে গেল। আমি সচকিতে ওঝাকে জিগ্যেস করলাম, কী হল?

সে কোনও উত্তর না দিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলল। আমি নিজেও কখনও জিপ চালাইনি, গাড়ির যন্ত্রপাতি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। ছেলেটির পাশে গিয়ে এমনই উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলুম। ফিনফিনে ধারাল হাওয়ায় বেশ শীত। কলকাতায় এই সময় শীত অনেক কমে গেছে বলে বেশি কিছু গরম বস্ত্র আনিনি। সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলুম। এতক্ষণ আমি বেশ মজাই পাচ্ছিলুম সব কিছুতে, কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে দু-একটা ভারী চেহারার গাড়ি যাচ্ছে এদিক ওদিক দিয়ে, আমায় ভয় হল, এই অন্ধকারে কোনও লরি হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জিপটা আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে না দেয়। ছেলেটি আমাদের গাড়ির ব্যাকলাইট জ্বেলে রাখেনি। সেটা জ্বেলে দিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী হে ওঝা, এ গাড়ি যাবে তো?

সে বলল, হ্যাঁ, যাবে।

আবার কিছুক্ষণ খুটখাট।

এক এক সময় মনে হয়, গাড়িরও বুঝি প্রাণ আছে। অন্তত ইচ্ছা অনিচ্ছা শক্তি আছেই। এই জিপটা বোধহয় তার নিজের ড্রাইভার ছাড়া অন্য কারুর হাতে যেতে চাইছে না। বিশেষত এইরকম একটা বাচ্চা ছেলের হাতে। নইলে, জিপটার বেশ নতুন-নতুন চেহারা, হঠাৎ এরকম পঙ্গু হওয়ার কথা নয়।

ছেলেটিও জেদি কম নয় কিন্তু, লেগে রইল অনেকক্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত কিছু আওয়াজও বার করে ছাড়ল। এবার সে আমাকে জিগ্যেস করল, আমি স্টিয়ারিং-এ বসে সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলেটারে

পা দিয়ে বসতে পারব কি না। এটুকু আমি পারি। সেরকম বসবার পর, কয়েকবারের চেষ্টায় ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠল। তার ফলে, বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছতে আমাদের সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

একটা ছোট হোটেলে ঢুকে আমরা দুজনে খেয়ে নিলাম গরম-গরম ভাত আর মাংস। অত্যন্ত সুখাদ্য। যাঁরা পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসেন, তাঁরা এইসব দূরের ছোটখাটো জায়গায় মাছ ডিম বা মুরগি না চেয়ে মটন কারিই চাইবেন। কারণ এইসব জায়গায় পাওয়া যায় নরম কচি পাঁঠার ঝোল, তার স্বাদই আলাদা। কলকাতার বাজারে ওঠে শুধু ধেড়ে-ধেড়ে ছাগল আর রাম ছাগল।

রাত্রির খাওয়া সেরে নিয়ে পরের দিনের জন্য বাজার। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সব এক কিলো করে। ডিম পাওয়া গেল না, মাখনও না। ঠিক আছে, একদিন নিরামিষেই চালাতে হবে। এক ডজন মোম কেনার পর একটা টর্চও কিনে ফেললাম। সিগারেট দেশলাইয়ের স্টকও রইল। একটা জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, গাড়িতে ওঠার পরও ওখাকে আবার পাঠালাম দোকানে। কয়েকটা কাঁচা লংকা। যা সঙ্গে না থাকলে আমি খাদ্যে কোনও স্বাদই পাই না।

এবারেও গাড়ি স্টার্ট নিতে চাইল না।

অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলে খানিকটা ঘ্যাসঘেসে শব্দ করেই থেমে যায়। গাড়িটি সত্যিই বেয়াদবি করছে। লোকালয়ের মধ্যে গাড়ি খারাপ হলেই কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। অনেকে অযাচিতভাবে আমাকে জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন?

আমি মানস যাব শুনে কেউ-কেউ ভুরু তুলল। মানসে তো কেউ রাত্তিরবেলা যায় না, ঢুকতেই দেয় না ভেতরে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমার জন্য ব্যবস্থা আছে। আমাকে ঢুকতে দেবে।

তখন দু-একজন বলল, এরপর রাস্তা খুব খারাপ। আর কোনও মানুষজন বা দোকানপাট নেই। গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে খুব বিপদে পড়বেন।

ওরা এমনভাবে কথা বলছে, যেন এখানেই সভ্য জগতের শেষ। এরপর শুধু অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য।

খানিকটা পরে অবশ্য আমারও অনেকটা সেরকমই মনে হল। লোকজনের সামনে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য গাড়িটা একটু বাদেই চলতে শুরু করেছিল। কাছাকাছি একটা রেল লাইন পেরিয়ে যাওয়ার অল্প কিছু পরেই পথ গৃহ-বিরল হয়ে এল, তারপর দুপাশে শুধু ধুধু মাঠ। পথের অবস্থা সাংঘাতিক। পথটা এককালে কেউ পাকা করে বানিয়েছিল, তারপর এর কথা একদম ভুলে গেছে। মাঝে-মাঝেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত, ঠিক ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের মতন লাফাতে-লাফাতে চলেছি।

দুপাশে খোলা জিপ। হুহু করা ঠান্ডা হাওয়ায় আমার হাত-পা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে একেবারে। গায়ে শুধু একটা পাতলা সোয়েটার। ব্যাগে এক বোতল ব্র্যান্ডি ছিল, সেটা খুলে কয়েকবার কাঁচা চুমুক দিতেই হাত পায়ের সাড়া একটু ফিরে এল।

জিপ গাড়িটি সত্যিই বড় বেয়াদব। বেশ বড় কোনও একটা গর্ত লাফাবার পরই হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। গিয়ার বদলাবার সময় মড়-মড় মড়াৎ করে বীভৎস শব্দ ওঠে। যেন সে আমাদের নিয়ে যেতে খুবই অনিচ্ছুক। রেলগাড়ির চলার শব্দের যেমন অনেকরকম ভাষা আছে, তেমনি এই জিপ গাড়িটির গর্জনের মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা কথা। 'এখনও ফেরো, এখনও ফেরো'। কিন্তু কিশোর ড্রাইভারটি কিছুতেই অবদমিত হয় না। যতবার স্টার্ট থামে, ততবার সে লাফিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলে কীসের যেন টুংটাং শব্দ করে। সে আগে কখনও জিপ না চালালেই বা, জিপের যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার কোনও দ্বিধা নেই। প্রতিবারই জিপটা একটু পরে চলতে বাধ্য হয়।

সেইজন্য অমার আর ভয় করে না। মনে হয়, হাতে একটা চাবুক থাকলে, ঘোড়ার মতন, এই জিপটাকে বারবার ছপটি মেরে শায়েস্তা করা যেত।

জেনে এসেছি, এর পর আমাদের যেতে হবে একটা চা বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে। দুপাশে চা গাছের সারি দেখে বুঝলাম, আর বেশি দেরি নেই, চা বাগানটা পেরুলেই আমরা জঙ্গলের চেক পোস্টে পৌঁছে যাব। সেখানে যখন এলাম, তখন রাত ঠিক ন'টা।

চেকপোস্টে তালা ঝুলছে, পাশে একটা বড় বোর্ডে এই মর্মে নোটিশ লেখা আছে যে সন্ধে ছ'টার পর আর কারুকে এই অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। সেটা দেখায় বিচলিত বোধ করলুম না আমি। ওরকম অনেক লেখা থাকে, সবাই সব কিছু মানে না।

কাছেই ফরেস্ট অফিস, সেখানে ড্রাইভার ছেলেটিকে পাঠালাম গেটম্যানকে ডেকে আনার জন্য। এখানে আরও বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত চা-বাগান সংক্রান্ত লোকেরা থাকে। একজন লোক গান গাইতে গাইতে পায়চারি করছে রাস্তায়। টপ্পা অঙ্গের গান। সম্ভবত শীতের জন্য লোকটির গলায় টপ্পার কাজ বেশি খেলছিল। আমিও গুনগুন করে একটা গান ধরলাম। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না' গানটার 'তোমায়' জায়গাটার কাজ আমার গলায় আসে না, কিন্তু এখন বেশ পেরে গেলাম। আহা, কেউ শুনল না!

ওঝা ফিরে এল বেশ খানিকক্ষণ পরে। মুখ শুকনো করে জানাল, গেটকিপার বলছে, এখন গেট খুলবে না।

আমি বিরক্তভাবে বললাম, এখন খুলবে না তো কখন খুলবে?

—সারা রাত খুলবে না, কাল সকালে খুলবে।

—সারারাত তাহলে আমরা এখানে বসে থাকব নাকি? চলো, আমি যাচ্ছি ওর কাছে।

টপ্পা গায়কটি এবার গান থামিয়ে পাশে এসে বলল, গেট খুললেও তো আপনি যেতে পারবেন না। হাতি মহারাজ আটকে দেবে!

আমি বললাম, হাতি জিপ গাড়িকে কী করবে? পাশ দিয়ে চলে যাব।

লোকটি বলল, সরু রাস্তা, হাতির পাল ওই রাস্তা দিয়ে যেতে ভালোবাসে, ঠিক এই সময় রোজ বেরোয়—আপনি গাড়ি ঘোরাতেও পারবেন না। হঠাৎ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে।

পথের উটকো লোকেদের কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না, কিছু লোক সবসময়েই আলটপকা উপদেশ দিতে আসে।

আর কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে আমি গেলাম গেটকিপারের ঘরে।

গেটকিপার নিতান্ত হেলাফেলার লোক নয়। প্যান্ট-সার্ট পরা, দু-একটা ইংরিজি বলে, তার ঘরে একটা রেডিয়ো টেলিফোনের সেট আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আমার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়েই দিল। বলল, অসম্ভব, এত রাতে আমরা কারুকে যেতে দিই না, আপনি যেতে পারবেনই না। সাতদিন আগে হাতি একটা লোককে মেরে ফেলেছে। ভুটানের ডি এফ ও সাহেব রাত্তিরের দিকে দু-দুবার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছেন।

আমি বললাম, আমরা তো আর জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরবেলা ঘুরতে যাচ্ছি না। সোজা গিয়ে বাংলোতে উঠব। বাংলোতে আজ রাত্তিরের জন্য আমার ঘর রিজার্ভ করা আছে। লোকটি বলল, এখান থেকে বাংলো একুশ কিলোমিটার দূরে। পুরোটা পথ আপনাকে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, এর মধ্যে কোনও এক জায়গায় হাতি রাস্তা আটকে দিলেই আর কোনও যাওয়ার উপায় নেই। মারা পড়বেন। আজ ফিরে যান, কাল সকালে আসবেন!

আমি একটু দমে গেলাম, এত দূরে এসে ফিরে যাব? এখন আবার বরপেটা শহরে ফিরতে হলে ঘণ্টা দু-এক লেগে যাবে। এত রাত্রে সেখানে গিয়েই বা থাকব কোথায়, কারুকে তো চিনি না। সারারাত জিপের মধ্যে কাটাতে হবে, এই শীতের মধ্যে। তার চেয়ে ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে

পড়াই ভালো। যে কোনও কারণেই হোক, হাতি সম্পর্কে খুব ভয় জাগছে না মনের মধ্যে। অতবড় একটা জানোয়ারকে দূর থেকে দেখে কোনওভাবে নিশ্চয়ই পালিয়ে বাঁচা যাবে।

এইসব জায়গায় কয়েকটা বড় বড় নাম উচ্চারণ করলে অনেক সময় কাজ দেয়। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমি আসামের হোম মিনিস্টারের গেস্ট। চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্টের কাছে আমার বন্ধু আমার নামে চিঠি লিখেছেন, আমি আজ অসম সাহিত্যসভায়...ফল হল একেবারে উলটো। লোকটি বলল, আপনি গভর্নমেন্টের গেস্ট বলেই তো এত চিন্তা করছি। আপন যে আসবেন, সে কথা আর টি-তে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই দেখুন না, আমার খাতায় আপনার নাম লেখা আছে। কিন্তু আপনার প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? আপনার কিছু হলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।. আমি বললাম, আপনাদের কাছে পট্‌কা থাকে না?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, পট্‌কা? পট্‌কা কী?

এর আগে একবার উত্তরবঙ্গেও জঙ্গলে এইরকম পথজুড়ে হাতি চলাচলের কথা শুনেছিলাম। রাজা-ভাত-খাওয়া ছাড়িয়ে জয়ন্তী নদীর ওপরে যে বন, তার ভেতরের রাস্তার ওপর দিয়ে এক এক সময় পারাপার করে পঞ্চাশ ষাটটা হাতির পাল। এদিকে, বক্সাইট না ডলোমাইট কী যেন আনবার জন্য ওই রাস্তা দিয়ে কিছু ট্রাকও যায়। হাতির পালের মুখোমুখি পড়ে গেলে ট্রাক থেকে দুম দাম করে পটকা ফাটানো হয়। সেই আওয়াজে হাতির পাল সরে যায়। বুঝলাম, এখানে সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই।

বললাম, আমার প্রাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সে কথা আমি লিখে যেতে রাজি আছি। এতদূর এসে আমি ফিরে যাব না।

লোকটি দু-এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর অসন্তুষ্টভাবে বলল, রেঞ্জার সাহেব এখনও ফেরেননি, তিনি থাকলে দায়িত্ব নিতে পারতেন। আমি একা...তা ছাড়া...

এবার সে ড্রাইভার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, তা ছাড়া এইটুকু একটা ছেলেকে নিয়ে আপনি ওই সাংঘাতিক রাস্তায় যাবেন? এ তো পারবেই না যেতে! এই ছোকরা, তুই যেতে পারবি?

আমি দম বন্ধ করে অতুল ওঝার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিপদের সম্ভাবনার কথাটা আমার মনেই পড়েনি। এ যদি রাজি না হয়, তা হলে আমার আর কোনও আশাই নেই!

অতুল ওঝা বীরের মতন উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি সাহেবকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারব। আমি ভয় পাই না।

আমি বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ছেলেটিকে আমার মনে হল বন্ধুর মতন। সেই সঙ্গে মনে হল, ভাগ্যিস, কোনও পুরোনো অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে পাওয়া যায়নি। অনেকদিন ধরে সরকারি চাকরি করছে, এমন কোনও ড্রাইভার হয়তো ওই অবস্থায় যেতে রাজি হত না। বহুদিন চাকরি করতে করতে কীরকম যেন একটা স্কয়াটে ঘুণধরা মনে হয়ে যায়। তখন 'ডিউটি' ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই উৎসাহ থাকে না। নিছক চাকরির খাতিরে কেন একজন ড্রাইভার আমাকে এরকম ঝুঁকির রাস্তায় নিয়ে যাবে এই রাত্তিরে। সে অনায়াসেই বলতে পারত, না স্যার পারব না, আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোব! জোর করার কোনও উপায় ছিল না আমার, কারণ আমি অতিথি মাত্র, সরকারি কেউ-কেটা তো নই!

অতুল ওঝার কাঁধে হাত দিয়ে আমি ফিরে এলাম। গেটম্যান অনিচ্ছার সঙ্গে তালা খুলে দিয়ে বলল, আমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। খানিকটা গিয়ে বেগতিক দেখলে ফিরে আসবেন। তার পরে এলে কিন্তু আমায় আর পাবেন না। আমার ডিউটি ওভার হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, জেনে রাখলাম, ধন্যবাদ!

অতুল ওঝা বয়েসে প্রায় কিশোর হলেও বেশ বুদ্ধিমান, তা এই সময় বুঝলাম। সে জিপটার

স্টার্ট বন্ধ করেনি। এতক্ষণ ধরে জিপটা ধকধক করেছে। এই সময়, গেটম্যানের সামনেই যদি জিপটা স্টার্ট নিতে গোলমাল করত, তাহলে অপমানের একশেষ হতে হত নিশ্চয়ই। তার বদলে, গেট পেরিয়ে সামনের অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল জিপটা।

গেট পেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরকম অনুভূতি হয় এখন আমরা জঙ্গলের মধ্যে। যদিও সেখানে তেমন কিছু জঙ্গল নেই। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত, ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, চারপাশে প্রায় ফাঁকা মাঠ, এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। তবু তো এক ঘোষিত অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েছি, এ জায়গাটা বাইরের থেকে আলাদা।

প্রায় দু-কিলোমিটার পথ পার হওয়ার পর জঙ্গল শুরু হয়। তাও এমন কিছু নয়, রাস্তার দুপাশে বড়-বড় ঘাস, এখানে সেখানে ছড়ানো গাছপালা। দেখলে কোনও ভয়ের অনুভূতি হয় না। রাস্তা বেশ খারাপ, মাঝে-মাঝে কাঠের ব্রিজ। ব্রিজগুলোর চেহারা সুবিধাজনক নয়, দুপাশে দুটো কাঠের পাটাতন, যার ওপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার কথা। অনভ্যস্ত হাতে আমার ড্রাইভার এক একবার সেই পাটাতন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে আর শব্দ উঠছে ঘট্ ঘটাং।

আমি অতুল ওঝার কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করলাম, তুমি এ রাস্তায় আগে কখনও এসেছ? সে বলল, না স্যার।

—এরকম জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছ কখনও?

—না, সাব!

—ভয় করছে?

—না, সাব!

—আমরা ঠিক পৌঁছে যাব, কী বলো?

—হ্যাঁ, সাব।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হেড লাইটের আলোয় রাস্তার ওপরেই দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অচেতনভাবেই বোধহয় আমি দেখে নিলাম চোখ দুটির উচ্চতা কতখানি। খুব বেশি নয়। এবং কাছাকাছি আরও কয়েকটি চোখ।

আর একটু কাছে আসবার পর দেখা গেল কয়েকটি চিত্রল হরিণ ও একটি বড় শম্বর। হরিণগুলি জিপ গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল দু-তিন পলক, তারপর এক পলক ফেলার চেয়েও কম সময় তাদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে, বায়ুতে সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের অন্ধকারে। শম্বরটি দাঁড়িয়েই আছে, দুটি সরল নির্বোধ চোখ, আমরা যখন খুব কাছে, যখন প্রায় একটা লাঠি বাড়িয়েই তাকে ছোঁয়া যায়, সেই সময় তার ঘোর ভাঙল, পেছন ফিরেই উন্মত্তের মতন লাফিয়ে পড়ল একটা ঝোপে, হুড়মুড় করে শব্দ হল।

এরপর দেখতে পেলাম কয়েকটি ময়ূর। তারা লীলায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হচ্ছিল, আলোয় তাদের পালকের বর্ণসজ্জার চকিতে ঠিকরে ওঠে, তারা প্রত্যেকেই গ্রীবা ঘুরিয়ে একবার তাকায় গাড়ির দিকে। কী অসম্ভব ক্রূর ভয়াল তাদের চোখ। রাত্রিবেলা যে-কোনও জন্তু জানোয়ারের চোখই অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ কোনও বিড়াল বা গোরুর চোখও অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোয় অচেনা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। রাত্রিবেলা ঘোষের চোখের চেয়ে উজ্জ্বল কোনও জিনিস আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। ময়ূরের চোখও অন্যরকম। এদের চোখের মধ্যে থেকে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে একরকমের বেগুনি ধরনের আলো।

এক ধরনের পাখির চোখেও এরকম আলো দেখলাম। শুধু এই জঙ্গলে নয়। এর আগেও রাত্রির ড্রাইভে বাইরের ফাঁকা রাস্তায় এই ধরনের পাখি চোখে পড়ে। এরা রাস্তায় শুয়ে থাকতে ভালোবাসে। এগুলো কী পাখি? বাদুড় নয়, গায়ের রং গাঢ় খয়েরি, ডানা মেলে শুয়ে থাকে পিচের রাস্তায়, চোখ দুটি আগুনের ফুলকির মতন, গাড়ি খুব কাছে এলে এরা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়।

আরও কয়েকটি হরিণ ও শম্বর পার হয়ে এলাম। হরিণ যতই সুন্দর প্রাণী হোক, রাত্রিবেলা তারা আমাদের মুগ্ধ করে না। রাত্তিরবেলা দলবেঁধে সংরক্ষিত অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার অনেক আছে। প্রত্যেকবারই দেখেছি, কেউ হরিণ পছন্দ করে না। কারণ ঘুরতে-ঘুরতে হরিণ বা বুনো শুয়োরই বেশি চোখে পড়ে, বারবার। কেউ-কেউ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে, 'আঃ, হরিণ দেখতে-দেখতে চোখ পচে গেল।' কেন-না, তখন সকলেরই আগ্রহ আরও কোনও বড় জানোয়ারের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের দেখা পাওয়া যায় না। আপাতত আমাদের অধীর অপেক্ষা যেমন হাতির জন্য।

খানিক পরে পাশের ঝোপ থেকে দুটি বেশ বড় প্রাণী বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ঠিক সামনের দিকে ছুটতে লাগল। জিপের চেয়েও তাদের ছোটার গতি বেশি দ্রুত। প্রথমে বেশ চমকে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল গণ্ডার। সেইরকমই দেহের আকার। জলদাপাড়া ও কাজিরাঙার মতন মানসেও বেশ কিছু এক-খড়্গ গণ্ডারের বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙল। গণ্ডার নয়, মোষের মতন কোনও জানোয়ার, কারণ খড়্গ নেই, বিরাট পাকানো শিং। হতে পারে বাইসন, নাও হতে পারে, বন-গোরু হওয়াও বিচিত্র নয়, শুনেছি বন-মোরগের মতন বন-গোরুও আছে এ তল্লাটে।

ওদের মাথা দুটি আমরা ভালো করে দেখতে পেলাম না, কিছুক্ষণ আমাদের সামনে রেস দিয়ে ওরা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর দশ-পনেরো মিনিট আর কিছু নেই। একটা পাখি পর্যন্ত না। সব দিক নিঃসাড়, নিঃশব্দ।

রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তার সামনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি। দুপাশের বড় বড় গাছ ওপরের দিকে গোল হয়ে এসে মিলে গেছে, রাস্তার দুপাশে উঁচু-উঁচু ঘাস। এগুলোকেই বোধহয় এলিফ্যান্ট গ্রাস বলে।

রাস্তা ফাঁকা দেখে ওঝা বেশ জোরে চালাচ্ছে।

ছেলেটির আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে একটু সংযত হতে বললাম। হঠাৎ একটা শায়িত হাতির গায়ে ধাক্কা মারা কোনও কাজের কথা নয়। তখন আর কোনও উপায়ই থাকবে না। তা ছাড়া রাস্তা এত খারাপ যে দুর্ঘটনায় মরার সম্ভাবনাই বেশি।

শীতের জন্যই কি না জানি না, হঠাৎ শরীরে একটা শিহরণ জাগল, আর কোনও জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাচ্ছি না বলেই যেন মনে হচ্ছে, আমরা এবারেই সবচেয়ে বিপদের এলাকায় এসেছি। ভয় ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য ব্র্যান্ডির বোতল থেকে আর একটা লম্বা চুমুক দিলাম। চোখ দুটি যথাসম্ভব খর করে সামনের দিকে স্থির। দূরের ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালাকে মনে হচ্ছে হাতির পাল। যেন, যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের পথ আটকে যাবে।

হঠাৎ মনে হল, আমি যাচ্ছি কেন? এতগুলি লোক নিষেধ করেছে যখন, তখন নিশ্চিত কিছুটা প্রাণের ঝুঁকি আছে। পথ জুড়ে যদি হাতির পাল শুয়ে থাকে, তাহলে এখন কী করব? অর্ধেকের বেশি রাস্তা পার হয়ে এসেছি। এখন আর ফেরার উপায় নেই। রাস্তার অবস্থা ক্রমশ আরও শোচনীয় হচ্ছে, বিরাট-বিরাট গর্তে ঢাকা পড়ে লগবগ করছে স্টিয়ারিং। একবার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেলেই শেষ। তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে এলাম কেন? আমি তো কোনও দুঃসাহসী অভিযাত্রী নই, সাধারণ ভ্রমণকারী মাত্র। রাত্তিরটা নিরাপদে কাটিয়ে কাল সকালে নিশ্চিন্তে। নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার নিয়েই তো আসা যেতে পারত। তাতে দিনের আলোয় প্রাণ বাঁচিয়ে প্রকৃতি দর্শন হত। কিংবা, কাল সকালেও যদি আসবার অসুবিধে থাকত, এ যাত্রায় হত না মানস ভ্রমণ, তাতেই বা কী ক্ষতি এমন? এ জীবনে কত কিছুই তো দেখা হয়নি। আমার মনের একটা অংশ আর একটা অংশকে খুব জেদিভাবে প্রশ্ন করতে লাগল, কেন যাচ্ছি? এমনভাবে যাওয়ার কী মানে হয়, উত্তর দাও। অনেকক্ষণ কোনও উত্তর আসে না। তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ে। তারপর মরিয়াভাবে একটা উত্তর পেয়ে যাই। অস্ফুটভাবে

যাব, যাচ্ছি, তার কারণ না যাওয়ারও কোনও মানে হয় না।

তারপর ভেতরটা বেশ হালকা হয়ে যায়। এভারেস্টের শিখর আরোহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন অভিযাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি বারবার ওখানে যাও কেন? উত্তরে তিনি, সেই বিখ্যাত অভিযাত্রীর নাম ম্যালোরি, সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার!' আমার উত্তরটাও অনেকটা সেইরকম ভেবে আমি নিজের কাছেই একটু অহংকার দেখাই। এর আগেও তো কত জঙ্গলে গেছি, কতরকম ব্যবস্থা টাবস্থা করে, মানসে নিশ্চয়ই এইরকমভাবেই আমার যাওয়ার কথা ছিল। তা ছাড়া অনিশ্চয়তা বরাবরই আমার প্রিয়।

মাঝে মাঝে কাঠের সেতু পেরুতে হচ্ছে। সেতুগুলোর অবস্থাও সাংঘাতিক, মনে হয় যে-কোনও মুহূর্তে সবশুদ্ধ ভেঙে পড়বে। এইরকম চতুর্থ সেতুটি পেরিয়ে রাস্তাটি সবেমাত্র বাঁক নিয়েছে, ঠিক সময় সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে শব্দ হল উম্ ম্ ম্ আঁ আঁ—। যেন একটা বাজ পড়ল খুব কাছ থেকে এবং এত অসম্ভব জোরে সেই শব্দ যে মনে হল তা আমার বুকে প্রবল ধাক্কা মেরে আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে। ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললাম।

চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনেছি আগে। কিন্তু নিস্তব্ধ জঙ্গলে তার ভয়াবহ জোর যেন একশো গুণ বেশি। তা ছাড়া এমনই আকস্মিক। বাঘের কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার ভয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল, মনে হল যেন আমি মরে গেছি। এবং এত জোরাল শব্দের প্রতিক্রিয়া এই যে তারপর কিছুক্ষণ মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোনও শব্দই নেই। সব শব্দ মৃত্যুতে নীরব।

আবার চোখ মেলেই পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঝার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, স্টিয়ারিং-এর ওপর তার একটুও দখল নেই, জিপটা এঁকে বেঁকে পাশের দিকে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্টিয়ারিং-এর ওপর। ডান পা বাড়িয়ে ওঝার পায়ের ওপর দিয়েই এক লাথি কষালাম ব্রেকে।

গাড়িটা থামতেই দ্বিতীয়বার আকাশ ফাটিয়ে বাঘটা ডাকল। এবার আরও জোরে। মনে হয় পাঁচশ-তিরিশ গজ দূরেই বাঘটা রয়েছে। বাঁ-পাশের জঙ্গলে।

বীর বালকটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয়বার বাঘটা ডাকতেই সে হুড়মুড়িয়ে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমিও মাথা নীচু করে ফেললাম। কেন তা জানি না। আমরা হাতির জন্য চিন্তিত ছিলাম, বাঘের কথা মনে স্থানও দিইনি, তাই ভয়টা কাটানোর কোনও উপায়ই মনে হল না। সম্পূর্ণ শরীরটা কাঁপছে।

খোলা জিপ, বাঘটা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। অস্ত্র বলতে শুধু আমার হাতের ব্র্যান্ডির বোতল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, বাঘটা আসুক, আমাদের খেয়ে নিক।

কিন্তু বাঘটা খোলা জায়গায় এল না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে তীব্র চোখে আমাদের দেখছে। যে কোনও মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে।

নির্বোধের মতন আমরা গাড়ি থামিয়ে সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম দু-তিন মিনিট, যাতে বাঘটার কোনওরকম অসুবিধেই না হয়। বাঘের গর্জনের মধ্যেই বোধহয় এরকম মৃত্যুচুম্বক থাকে। তারপর অতিকষ্টে সেই ঘোর কাটিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার চিন্তা ফিরে এল। বুঝলাম, থেমে যাওয়ার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সব সময়ই ভালো। চলন্ত গাড়িতে আমরা তবু খানিকক্ষণ বেশি বাঁচব। যেখানে পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, সেখানে সামনে এগোতেই হবে।

আমি ওঝাকে মৃদু গলায় বললাম, চলো। জিপ গাড়িটাও নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিল। কারণ, এবার সে স্টার্ট দিতে একটুও দেরি করল না। সেখানে যদি জিপটা আবার গণ্ডগোল করত, তাহলে এ-কাহিনি নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। কিন্তু এবার অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই জিপটা

ব্যস্ত হয়ে সামনের দিকে দৌড়ল। ওঝার সঙ্গে আমিও ধরে রাখলাম স্টিয়ারিং। গাড়ি চলল মাঝারি গতিতে।

বাঘটা সামনে এল না, আর ডাকলও না। এবং এক হিসেবে সে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। বোধহয় তার জন্যই আমাদের বিপদ কেটে গেল, এরপর আর কোনওরকম জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়ল না। যদিও বাঘের পরপর দুবার গর্জন শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম, তা কাটতে সময় লাগল যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ মাথাটা দুর্বল হয়ে রইল।

আরও আধঘণ্টা পর পথের ওপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। 'ওয়ে টু আপার বাংলো'। তার পাশে লেখা, অরণ্যের স্তব্ধতা নষ্ট করবেন না। ডানদিকে ঘুরে একটা টিলার ওপরে বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। হাত-পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটা বড় নিশ্বাস নিলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি দেখে বেশ খুশি ভাব হল। বেঁচে থাকার অমলিন আনন্দ।

হাঁকডাক করে তোলা হল চৌকিদারকে। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের থেকেও বেশি বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এগারোটা বেজে গেছে, এত রাত্রে কেউ কোনওদিন তাকে ডেকে তোলেনি। আমরা বেআইনি আগন্তুক।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম যে আমাদের খাবার-দাবারের কিছু দরকার নেই। বাংলোর একটি ঘর আমার নামে রিজার্ভ করা আছে, সেটি খুলে দিলেই চলবে। চৌকিদার জিগ্যেস করল, আপনারা এ সময় এলেন কী করে? হাতিতে রাস্তা আটকায়নি?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, না, হাতি কিছু করেনি। কিন্তু বাঘের কথা কেউ আমাকে বলেনি কেন?

বরপেটাতেও বলেনি, চেক-পোস্টেও বলেনি। শুধু হাতির ভয় দেখিয়েছে। যদি জানতাম রাস্তায় বাঘ পড়বে, তাহলে আমি আসতাম না। বাঘের সঙ্গে চালাকি চলে না। কেন কেউ বলেনি?

চৌকিদার বলল, বাঘ? চার নম্বর ব্রিজটার কাছাকাছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

চৌকিদার বলল, এখানে চার-পাঁচটা বাঘ মাঝে-মাঝে আসে একসঙ্গে।

একটা নয়। চার-পাঁচটা? কিন্তু সে ব্যাপারে কেউ আমাকে সাবধান কয়ে দেয়নি কেন?

চৌকিদার বলল, ওরা এ পর্যন্ত কোনও মানুষ মারেনি। মানুষ দেখলে সরে যায়। আমিও কয়েকবার দেখেছি।

কোন বাঘ মানুষ মারবে আর কোন বাঘ মারবে না, গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে সে বিচার করার সাধ্য আমার নেই। ডাক শুনেই বুকের অতি পরিচিত শব্দটা থাম বার উপক্রম হয়েছিল। এবং পিলে পর্যন্ত চমকে যাওয়া কাকে বলে, সেই তখনই বুঝেছিলাম।

বাংলোটি প্রকাণ্ড। দোতলা অন্তত আটখানা ঘর। চৌকিদার আমার ঘরটা খুলে দিল। এরপর তার শুধু আর একটা কাজ বাকি।

আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে ভোর পাঁচটায় পোষা হাতির পিঠে চেপে এখানে জঙ্গলে ঘোরার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেই সময় সেই হাতি আনবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এখনই। চৌকিদার বলল, কিন্তু সে তো আগে থেকে খবর দিয়ে রাখতে হয়। তা ছাড়া আপনি একা..আপনার একার জন্য হাতি...

আমি বললাম, হ্যাঁ আমার একার জন্যই হাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেব।

তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ভাই, আগে থেকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তোমার অতিথি হয়ে, কষ্ট করে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

লোকটি গজগজানি ধরনের নয়। শান্ত মুখেই রাজি হল। তাকে এখন কিছু দূরে মাহুতের

ঝোপড়িতে গিয়ে খবর দিতে হবে।

আমি বললাম, আর একটা কাজ, ভোর পাঁচটায় যদি আমার ঘুম না ভাঙে, একটু ডেকে দিও, আর সেই সঙ্গে যদি এককাপ চা...

সে বলল, সঙ্গে চা-চিনি-দুধ এনেছেন?

এই রে, আর সবই তো বাজার করে এনেছি, চা কেনার কথা মনেই ছিল না। ভোরবেলা এককাপ চা না পেলে কী করে চলবে?

চৌকিদার বলল, তার কাছে শুধু চা-পাতা আছে। দুধ-চিনি নেই। আমি বললাম, তাই-ই সই।

শুধু লিকার গরম গরম—

চৌকিদার চলে গেল। ড্রাইভার ওঝাও গেল তার সঙ্গে। তারপর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। এত বড় বাংলোটিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাকি সব ঘর তালাবন্ধ।

এতখানি রাস্তা লম্ফমান জিপে চড়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে। জামাকাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। চমৎকার নরম বিছানা, নতুন মশারি ও কম্বল। কাল ভোরে উঠতে হবে।

কিন্তু আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও আবার ঘুম এল না। এত বড় একটা বাড়িতে আমি একা।

ভাগ্যিস আমার সঙ্গে আর কেউ আসেনি এ যাত্রায়। কত দুর্লভ এই একাকিত্ব। শহরে সবসময় মানুষ, সব সময় কেউ না কেউ, সবসময়ে আমাকে থাকতে হয় নিজের পরিচয়ে। আমি কারুর বন্ধু, কারুর ভাই, কারুর কাছে দেনাদার, কারুর কাছে কৃপাপ্রার্থী। এখানে এই মুহূর্তে আমি কেউ না। আমি শুধু আমি।

এরকম রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না।

কাচের গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে সেটা হাতে নিয়ে উঠে এলাম দোতলায়। হঠাৎ যেন আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। অসাধারণ জ্যোৎস্না ফুটে আছে দিগন্ত জুড়ে। সামনের দিকে যতদূর তাকাই শুধু অরণ্য। যেন সত্যিই আমি পৃথিবীর সমস্ত ইঁটে গড়া সভ্যতা ছাড়িয়ে চলে এসেছি, এরপর বাকি পৃথিবীজোড়া অরণ্যরাজ্য। আমার ডান পাশে একটা বিশাল চওড়া নদী। এই নদীরও নাম মানস। কিংবা নদীর নামেই অরণ্য। মানস সরোবর থেকে নেমে এসে এই নদী এখানে পড়েছে সমতলে, তাই সবসময় সমুদ্রের মতন গর্জমান। বাংলোর ওপরতলায় একটি বেশ প্রশস্ত কাচের ঘর। সেখান থেকে দেখা যায় নদীর ওপারে স্তব্ধ অন্ধকার বনভূমি। বহুদূর থেকে দুটি পাখি একটানা ডেকে চলেছে, টিউ...টিউ...টিউ...। রাতে কোন পাখি ডাকে আমি জানি না। এমন মধুর সুরেলা স্বরও তো কখনও শুনিনি। মাঝে-মাঝে বন থেকে আর একটা শব্দ আসছে, এটা ধোপার কাপড় কাচার শব্দের মতন অবিকল। এটা নিশ্চিত কোনও জানোয়ারের ডাক। এত রাতে জঙ্গলের মধ্যে বসে কে আর কাপড় কাচবে। কোন জানোয়ার জানি না।

জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি নিজেই একটি ছায়ামূর্তি হয়ে সারা বাংলোটি ঘুরে দেখলাম। হাওয়ায় কোনও জানলা একবার খোলে আর বন্ধ হয়। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়ে হঠাৎ আপন মনে ঘুরে ঘুরে খেলা শুরু করে। আমি তন্ময় হয়ে সেই খেলা দেখি। যেন বহুদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, একদিন রাত্রি সাড়ে বারোটায় মানস ডাকবাংলোয় একটি শুকনো পাতা এইভাবে উড়ে এসে খেলা দেখাবে এবং আমি তা দেখব।

ডাক বাংলোটির সামনে ধাপ-ধাপ ফুলের বাগান নেমে গেছে নীচের দিকে। ঘোরানো পথ চলে গেছে নদীপ্রান্তে। বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে সেই পথ ধরলাম। রাতচরা পাখি দুটি এখনও ডেকে চলেছে, শোনা যাচ্ছে কাপড় কাচার শব্দ। আমার একটু একটু গা ছমছম করছে। কিন্তু ভয়েরও একটা নেশা আছে। যেমন রাত্রির আছে আলাদা জীবন। সচরাচর তো তার সন্ধান পাই না, তাই

পা টিপে-টিপে এগিয়ে চললাম। বাঘের জন্যই বেশি ভয় এবং এই ভয় বহু শতাব্দীর। তবে বাংলোর এত কাছে নিশ্চয়ই বাঘ আসবে না। যদিও বা আসে, একটু আগে চৌকিদারের মুখে শুনলাম, এখানকার বাঘ এ পর্যন্ত মানুষ মারেনি। তাহলে আমাকেই বা প্রথম মারবে কেন? কোনও ব্যাপারেই প্রথম হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার।

সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, অচেনা অন্ধকার, অচেনা পথ। একবার তাকালাম আসবার সময় একটা টর্চ কিনেছিলাম তো। কিন্তু ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসার ইচ্ছে হল না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হয় যে টর্চের আলোও শব্দ করে উঠবে।

কয়েকবার সামান্য হোঁচট খেতে খেতেও সামলে নিয়ে পৌঁছে গেলাম নদীর কিনারে। নদীর জল এমন সাদা যে, মনে হয় জমাট জ্যোৎস্নার ধারা। একটু ঝুঁকে সেই নদীর জলে হাত দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলাম। পাহাড়ি নদী সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

কোথাও কোথাও স্রোত এতই প্রবল হয় যে, ঝোঁক সামলানো যায় না, টেনে নিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। সাধারণ পাহাড়ি নদীর চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত এলাকায় মানস নদী। তাও শেষ-শীতকাল। বর্ষায় এর রূপ আরও খুলবে। ওপারে ঘন অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় মনে হয়, ওদিকের সাদা বালির চড়ায় নড়াচড়া করছে একটি প্রাণী। মানুষ? না, হতে পারে না। বাঘ কিংবা হাতিও নয়, তার চেয়ে ছোট। হতে পারে কোনও কুকুর, শেয়াল বা হরিণ। ভালো করে দেখা যায় না, তবু আমার হরিণী বলে মেনে নিতেই সাধ হল। আমি নিজের কাছে আবার জোর দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হরিণী।

হরিণীটি সম্ভবত জলপান করতে এসেছিল, বেশি দেরি করল না, চট করে আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল। তবু সে তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে যেন ধন্য করে দিয়ে গেল আমাকে। এই নির্জন প্রদেশে সে আমার সঙ্গিনী ছিল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। এমন জ্যোৎস্না বোধহয় আমি ইহজীবনে আর কখনও দেখিনি। এই শান্ত নীরবতায় তা যেন উদ্ভাসিত হয়েছে সহস্রগুণ বেশি। এই অরণ্যের মধ্যে চন্দ্রকিরণে ভেসে যাওয়া একা এক নদী, তার পাশে একজন একা মানুষ—এই দৃশ্যটি যেন বহু হাজার বছরের পুরোনো। এবং আমার চতুষ্পার্শ্বের যে রূপ, তার মধ্যে আমি যেন এক নারী-সৌন্দর্যের আভাস পাই। এই জ্যোৎস্নার যে-কোনও উপমাই নারী। এই স্তব্ধ গহন বনভূমির উপমাও নারী। আমার কাছে নারী-সৌন্দর্যই সব সৌন্দর্যের সার। তাই প্রকৃতির কাছে এসেও আমি বাস্তব কোনও নারীর সান্নিধ্য টের পাই। এই জ্যোৎস্নালোক, তার হাস্য, এই আঁধার অরণ্য, তার রহস্যময়তা।

সত্যিই আমি জন্ম রোমান্টিক, আমি না মরলে আমার এই দোষ শুধরোবে না।

এই অপরূপ রাত্রিকে একটি নারী হিসাবে কল্পনা করে আমি রীতিমতন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, এত শীতের মধ্যেও আমার শরীরে উত্তাপ জেগে ওঠে। বিছানা থেকে কম্বলটা উঠিয়ে এনেছিলাম, সেটা গা থেকে খুলে ফেলে আমি আমার সম্মুখবর্তী। শূন্যতাকে আলিঙ্গন করি এবং প্রগাঢ় চুম্বন দিই। চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমনকী শুয়েও পড়ি বালির ওপরে এবং রীতিমতন প্রণয় খেলা শুরু হয়ে যায়।

এর আগে কখনও প্রকৃতির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে প্রণয় আমার হয়নি। প্রকৃতিকেও এমন বহু ঈপ্সিতা, সম্পূর্ণ নারী, হিসেবে আমি পাইনি কখনও। আমি তার শরীরের গন্ধ নিই, বারবার গরম আদর দিই তার ওষ্ঠে, তার শরীরের সঙ্গে শরীর মেশাই।

আবেশে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর কেঁপে উঠল। ভয়ে কিংবা শীতে। আর যাই হোক, এখানে ঘুমিয়ে থাকা যায় না। ঘড়িতে দেখলাম, দুটো পাঁচ। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বেশি করে শীত নামে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

এখনও ঘন্টাআড়াই বিছানায় শুয়ে আরাম করা যেতে পারে।

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় চৌকিদার চা এনে আমাকে জাগিয়ে তোলে। আমি জড়তা কাটিয়ে তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ি। আলস্য করতে গেলেই আলো ফুটে যাবে। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে দৌড়োলাম। এবার টর্চটা সঙ্গে নিতে ভুল হল না।

ডাক বাংলো থেকে রাস্তাটা নেমে গেছে একটা বাঁধের মতন হয়ে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঁচু সিমেন্টের মঞ্চ তৈরি করা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ড্রাইভার ওঝাও চোখ ডলতে-ডলতে উঠে এসেছে। সেও জঙ্গল দেখবে।

কাছেই দুটো হাতি বাঁধা, একটি বেশ বড়, আর একটা বাচ্চা। অন্ধকারের মধ্যে সে দুটি জমাট অন্ধকার হয়ে আছে। তাদের গায়ে টর্চের আলো ফেললে কান লটপট করে। এরই কোনও একটাতে যেতে হবে। কিন্তু মাহুত কোথায়?

মিনিটদশেক পরে মাহুত এল তৃতীয় একটি হাতি নিয়ে। এই হাতিটির আকার মাঝারি। মাহুতের চেহারাটি দেখে বেশ পছন্দ হল। আজকাল অনেক কিছুই ঠিকঠাক মেলে না। রাখাল বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, সেরকম রাখাল মাঠে-ঘাটে দেখা যায় না। গয়লানিদের যে-রকম ছবি আঁকা হয় সেরকম গয়লানি বহুদিন দেখিনি। সেদিক থেকে এই হাতিটাকে তো হাতির মতন দেখতে বটেই, মাহুতটিও অবিকল মাহুতের মতন। কুচকুচে কালো এবং ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীরের একটি যুবক মাথায় পাগড়ি, কোমরে ছুরি গোঁজা ও হাতে ডাঙস। সে কোনও কথা বলল না, ইশারায় আমাকে হাতির পিঠে চেপে বসার কথা জানাল।

হাতির পিঠে হাওদা নেই। একটা দুটো তোশক ফেলে তার ওপরে মোটা দড়ি বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে বসার মতন এখানেও বলতে হবে দুদিকে পা ঝুলিয়ে। কিন্তু ঘোড়ার দু-দিকে পা ঝোলানো আর হাতির দু-দিকে পা ঝোলানো কি এক কথা হল? পা দুটি বিসদৃশ অবস্থায় থাকে এবং একটু পরেই বেশ ব্যথা করে। দড়িটাও শক্ত করে ধরে থাকতে হয়। নইলে যে-কোনও মুহূর্তে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

রাস্তা পেরিয়ে হাতি ঢুকল বনের মধ্যে। তখন সবে মাত্র অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। একটু পরেই বুঝলাম, হাতি যেখান দিয়ে চলেছে, সেখানে গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও মানুষের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, গাছে গাছে কোনও ফাঁক নেই বললেই চলে, তা ছাড়া রয়েছে লতাপাতার ঝোপ। কিন্তু হাতির গতির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, যে কিছুই মানে না, মাঝারি সাইজের গাছও সে মট-মটাং করে ভেঙে ফেলে। আমরা মাথা নীচু করে মাথা বাঁচাই। এই সময় মনে হল, কাল রাত্রে আসবার সময় পথের দুধারে এরকম অনেক আধভাঙা গাছ দেখেছি, সেগুলি তবে হাতিরই কীর্তি।

ভোরের প্রথম সিগারেটটা ধরালেই বেশ কিছুক্ষণ কাশি হওয়ার কথা। স্মোকারদের এই এক অভিশাপ। কিন্তু সিগারেট ধরিয়েও আমি জোর করে মুখ চেপে রইলাম। কিছুতেই কোনও শব্দ করা চলবে না। সমস্ত বনে হাতির পায়ে চলার শব্দ ছাড়া আর একটাই শব্দ হচ্ছে শুধু। একটা বন মোরগের ডাক। তীক্ষ্ণ স্বরটা ভেসে আসছে একটা ঘন ঝোপ থেকে। আমরা সেইদিকেই এগোচ্ছি। ভোরবেলা প্রথম সূর্যালোকের বার্তা দিকে দিকে ঘোষণা করার দায়িত্ব এই মোরগজাতিকে কে দিয়েছে কে জানে। আর কোনও পাখির ডাক এখনও শোনা যাচ্ছে না। সেই রাত-পাখি দুটিও বুঝি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঝোপটার কাছে আসতেই ঝটপটিয়ে বেরিয়ে এল বন মোরগটা, অসম্ভব গাঢ় লাল আর উজ্জ্বল তার পাখনার রং, আমাদের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে উড়ে গেল অনেক দূরে। যেন মাঝপথে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে তার সঙ্গীতের। তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

হাতিটা মাঝে-মাঝে কোনও ছোট টিলার ওপর দিকে উঠছে। কখনও নেমে যাচ্ছে কোনও

শুকনো নদীগর্ভে। সেই সময় দুহাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে দেহের ভারসাম্য রাখতে হয়। হাত আলগা হলেই ধপাস। সমতলে চলার সময় এত জোর লাগে না।

পোষা হাতির পিঠে চেপে বনের মধ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আরও হয়েছে কয়েকবার। তখন সঙ্গে অনেক লোক। দু-তিনটে হাতি, এবং কেউ না কেউ কথাবার্তা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবার মাহুতকে নিয়ে আমরা মাত্র তিনজন, এবং আধঘণ্টা হয়ে গেল তবু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিনি। এই স্তব্ধতাটাও উপভোগ্য।

ক্রমশ কয়েকটি হরিণ ও শম্বর দেখা দিতে লাগল। চিত্রল হরিণগুলিই বড় সুন্দর, দেখলে আশ্রমমৃগের কথাই মনে হয়। আজ সকালের আলোয় শুধু শম্বর নয়, হরিণগুলিও আমরা খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত পালাচ্ছে না। প্রথমে এর কারণ ভেবে অবাক হয়েছিলাম। হরিণগুলিও কি টুরিস্ট দেখে-দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে? অপেক্ষা করছে কখন আমি ক্যামেরা বার করব? তত টুরিস্ট তো এখানে আসে না। একটু পরেই কারণটা সম্যক বুঝলাম। জঙ্গলে হাতির পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, এই আওয়াজ হরিণদের চেনা এবং নিরামিশাষী হাতি সম্পর্কে তাদের কোনও ভয় থাকার কথাও নয়। তারপর হঠাৎ যখন তারা হাতির পিঠে কয়েকটি দু-পেয়ে ভয়াবহ প্রাণীকে দেখছে, তখনই তারা পালাচ্ছে। হরিণের পলায়নদৃশ্য সত্যি দেখবার মতন। বিস্মিত হয়ে তারা লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, তারপর সময়কে সময়হীনতায় এনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর শম্বরের পলায়নটা একটা জবরজং ব্যাপার, পেছন ফিরতেই অনেক সময় লেগে যায়। আহা, বেচারা শম্বরগুলো এই জন্যই এত সহজে শিকৃত হয়।

আর একটু দূর যাওয়ার পর মাঝে মাঝেই একটা শব্দ কানে আসতে লাগল। এই পরিবেশে অ-মানানসই। অনেকটা যেন রেলের পুরোনো কয়লা-ইঞ্জিনের মতন। ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস। যতবার শব্দটা শুনি, ততবার চমকে উঠি। কাছাকাছি কি কোনও রেল লাইন আছে? তা হলে আর এমনকী দুর্ভেদ্য অরণ্য। মাহুতকে সে কথাটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আবার সেই শব্দ হল ঠিক মাথার ওপরে। দেখলাম, শকুনের চেয়েও বড় আকারের দুটি পাখি, হলদে আর কালো রঙের, উড়ে যাচ্ছে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে। উড়ন্ত এত বড় কোনও পাখি আমি আগে কখনও দেখিনি। একটু পরেই, আরও কয়েকটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। ধনেশ পাখি ওগুলো, এখানে রয়েছে শয়ে-শয়ে। সে বড় বিচিত্র দৃশ্য। তাদের ডানায় অবিকল রেল ইঞ্জিনের শব্দ।

নিস্তব্ধ, অতি আগ্রহী, অধীর মন ও চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছি সামনে। মাঝে-মাঝে কোনও জীবন্ত প্রাণী দেখলেই মনে হয় কিছু যেন একটা পেলাম। এক সময় মাহুতকে ফিসফিস করে জিগ্যের করলাম, গন্ডার নেই? গন্ডার কোথায়?

মাহুত বলল, আছে সাহেব, বহুৎ। কিন্তু এই সময় পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যায়। মাঝে-মাঝে দেখা যায়—পরশুদিন আমি দুটো দেখেছি। আমি তাকে গন্ডার খোঁজার জন্য তাগিদ দিলাম। সে হাতিকে চালনা করল বন-বাদাড় ভেদ করে, অন্যদিকে। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গন্ডার পাওয়া গেল না। তখন বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, যেন সবটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, তারপর নিজেকে এক ধমক দিলাম।

অরণ্যে এসে অনেক সময়ই অরণ্য দেখাই হয় না। ছেলেমানুষের তখন শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখার ইচ্ছেই জাগে। আমারও এরকম হয়! গন্ডার না দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? গন্ডার কি কখনও দেখিনি? শুধু চিড়িয়াখানাতেই নয়, উত্তর বাংলার জলদাপাড়াতেও আমার অরণ্যচারী গন্ডার দর্শন হয়ে গেছে আগে। এখানেও শুধু গন্ডারের জন্য ছোটাছুটি করে কী লাভ? গন্ডারের চিন্তা যেই মন থেকে মুছে ফেললাম, অমনি সমগ্র অরণ্যটাই আমার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে সন্তর্পণে খুব কোমল ও বিনীত সূর্য উঠেছে। এটা সেই ধরনের দুর্লভ একটি ভোর,

যখন প্রথম সূর্যের আলো ঠিকরে লাগে চাঁদের গায়ে। আমার সামনের দিকে সূর্য, ঘাড় ফিরিয়ে একবার চাঁদকেও দেখে নিলাম। মনে হয়, এমন যে দেখলাম, এর জন্য নিশ্চয়ই আমার অনেক সুকৃতি জমা ছিল। থোকা থোকা সাদা ফুল ভোরের আলোয় হঠাৎ রক্তিম মনে হয়। ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে এক জায়গায় দেখেছিলাম শুধু অজস্র হালকা ভায়োলেট রঙের ফুল, আর কোনও রঙের ফুল নেই! এক বন্ধু বলেছিলেন, ভূতলে তামা থাকলে নাকি সেখানকার ফুল ওইরকম বেগুনি হয়ে যায়। মানস অরণ্যে বেগুনি ফুল নেই, শুধু সাদা, আর কিছু-কিছু টকটকে লাল। কোনওটারই নাম জানি না।

ফুলের চেয়েও এই জঙ্গলে পাখির সমারোহই বেশি। বন-মোরগরা তাদের কর্তব্য সাঙ্গ করেছে। এখন অসংখ্য জাতের পাখি তাদের আলাদা-আলাদা সুরে শুরু করে দিয়েছে উষার বন্দনা। যেন অরণ্যের শিখরে শিখরে একটা গানের জলসা বসে গেছে।

মাঝে মাঝেই ছোট-ছোট জলাশয়। সেরকম একটির কাছে পৌঁছতেই দেখলাম, পিঠটা কালচে আর বুকের কাছটা সাদা রঙের একজাতীয় হাঁস ঝাঁক বেঁধে দারুণ জোরে এসে জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উঠে যাচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে, চক্রাকারে বাতাস কেটে ঘুরে এসে তারা আবার ওইরকমভাবে জল ছুঁচ্ছে। এটা কি একটা খেলা? নাকি শীতের জন্য স্নান করতে এসেও ওরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারছে না? এত ভোরে স্নান না করলেই বা কী দোষ ছিল? অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম সেই হাঁসগুলির জল সইতে আসার খেলা। আবার অন্য একটি ডোবায় অন্যরকম। সেখানে খয়েরি রঙের একটু আলাদা চেহারার কয়েকশো হাঁস নিশ্চিন্তে জলে ভেসে আছে। এদের শীতবোধ নেই? আমাদের হাতিটি অবলীলাক্রমে সেই ডোবাটিতে নেমে পড়তেই ফরফর করে অসংখ্য প্রজাপতির মতন তারা উড়ে গেল। ভাগ্যিস ডোবাটিতে হাতিটির হাঁটুজল।

ডোবাটি পেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর খানিকটা প্রশস্ত প্রান্তর। তার একেবারে শেষ সীমায় গোটাছয়েক মোষের মতন প্রাণী গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ঘরোয়া সভা করছে। মাহুতটি উত্তেজিতভাবে বলল, সার বাইসন। প্রাণীগুলি বেশ দূরে এবং ওদিকটায় ঠিক মতন আলো পড়েনি বলে আমি ভালোমতন দেখতে পাচ্ছি না। বললাম, আর একটু কাছে চলো না। মাহুতটি রাজি হল না। আমিও অবশ্য খুব পীড়াপীড়ি করলাম না তাকে। জঙ্গলের নিয়ম সে-ই ভালো বোঝে। কাল রাত্রেও যেমন বুঝতে পারিনি, আজ সকালেও তেমন মোষের তুলনায় বাইসনের আলাদা কী বৈশিষ্ট্য তা ঠিক অনুধাবন করতে পারা গেল না।

হাতির মুখ ফিরিয়ে মাহুত জিগ্যেস করল, এবার ফিরব? বেলা হয়ে গেছে আর বিশেষ কিছু দেখা যাবে না।

আমি একটু জোর করলে সে হয়তো আরও ঘুরতে রাজি হত। কিন্তু আমারই উৎসাহ কমে গেছে। হাতির দু'দিকে পা ছড়িয়ে বসার জন্য একটা পায়ে রীতিমতন আড়ষ্ট ব্যথা। এ ছাড়া ঘণ্টা দুয়েক ধরে দড়ি-আঁকড়ে থাকার জন্য ঘষে গেছে হাতের তালু। হাতিটা যখন হুড়মুড় করে জলাডোবায় নামে কিংবা উঁচুতে ওঠে, তখন যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় হয়। বললাম, চলো।

ফিরছিলাম অন্যদিক দিয়ে। এক সময় জঙ্গলের মধ্যকার যে পথ দিয়ে আমরা কাল জিপে এসেছি, সেটা পার হতে হল। এবং তার একটু পরেই পেছন থেকে অতুল ওঝা আমার পিঠে একটা খোঁচা মেরে বলল, সাব। ডাইনে।—

ডানদিকে তাকাতেই আমি একটি বিশাল দৃশ্য দেখতে পেলাম। একটি অতিকায় দাঁতাল হাতি, তার সাদা দাঁত ঝকঝক করছে রোদে এবং নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক চিহ্নের মতো সে শুঁড়টা উঁচু করে আছে।

সেটিকে দেখে আমাদের বাহন এবং মাহুত দুজনেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মাহুত ডাঙস

কথাতেই আমাদের হাতিটা দ্রুতগতিতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে রইল। সেখানটা রীতিমতন অন্ধকার।

আমি অতি চুপি-চুপি জিগ্যেস করলাম, কী হল?

মাহুত বলল, ওই হাতিটা একলা ঘোরে, ওটা বড় বদমাশ, গুণ্ডা—

একলা হাতি যে বিপজ্জনক তা আমার জানা ছিল। সুতরাং বেশ খানিকটা রোমাঞ্চিত হয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম তাকে।

গুণ্ডা হাতিটা কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমাদের পলায়নকালে সে মাথা ঘুরিয়ে তার খুদে চোখে তাকিয়েছিল কয়েক পলক। কিন্তু সম্ভবত তার মেজাজ এখন প্রসন্ন। সে খুব মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগল। ঠিক যেন মনে হয়, বড়বাবু মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। চোখের সামনে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটি জলজ্যান্ত দাঁতাল গুণ্ডা হাতিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্য বলে মনে হয়।

মাহুত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা রোডের দিকে যাচ্ছে। এই শালা যখন তখন রোডের ওপর শুয়ে থাকে। তখন মানুষ যেতে পারে না। তাহলে কাল রাত্তিরে এই হাতি মহারাজের জন্যই সবাই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল? আমি পেছন ফিরে অতুল ওঝার দিকে তাকালাম। সেও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

কিন্তু হাতিটা রাস্তার ওপরেই শুয়ে থাকে যেন? অন্য কোথাও শুতে পারে না?

মাহুত যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে অতবড় একটা হাতির শুয়ে থাকার মতন ফাঁকা জায়গা এই জঙ্গলে বেশি নেই। সেই তুলনায় রাস্তাটাই ফাঁকা, সেটাই ওদের বিশ্রামের জায়গা। গুণ্ডা হাতিটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পর আমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফেরা-পথ ধরলাম। এবং বাংলোয় পৌঁছবার আগে গন্ডার না-দেখার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল আরও দুটি হাতির পাল দেখে। এক-এক দলে দশ-বারোটা হাতি, বুড়ো বাচ্চা মিলিয়ে। একটি দল একটা জলাশয়ে নেমে গোরু-মোষের মতন স্নান করছে। হাতিরা বেশ কৌতুকপ্রবণ। এ-ওর গায়ে জল ছিটিয়ে মেতে আছে খেলায়। আমরা পাশ দিয়ে চলে গেলাম, ভ্রূক্ষেপও করল না।

বাংলোয় ফিরে এক কাপ দুধ-চিনিহীন চায়ের অর্ডার করলাম চৌকিদারকে। গায়ের ব্যথা মারবার জন্য বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি, অমনি শুনলাম, নারীর কলকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে এলাম বাইরে। ঝলমলে রঙিন পোশাক পরা কয়েকটি ভুটিয়া মেয়ে পিঠে একরাশ বোঝা নিয়ে বাংলোর গা-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নদীর দিকে। আমার দিকে তারা কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল, হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর আকস্মিক হাসির ঝিলিক দিয়ে আবার চলে গেল। তারপর আরও কিছু নারী-পুরুষ, ওই একইরকম পোশাক।

কাল রাত্রে ভেবেছিলাম, চৌকিদার ও আমার ড্রাইভারকে বাদ দিলে এই জঙ্গলে আমি সম্পূর্ণ একা। কিন্তু মানুষ কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে?

শুধু চা নয়, কয়েকটা বিস্কুটও জোগাড় করে এনেছে অতুল ওঝা। তার কাছ থেকে কিছু খবর পেলাম। এবং একটু পরে, একজন তরুণ বিট অফিসার এসে আমায় সব কিছু জানাল। এই মানস নদীর ওপারেই ভুটান রাজ্য। এমনকী নদীর এপারেও কিছুটা অংশ ভুটানের এলাকায়। ওদিকে কাছাকাছি কোনও শহর বা বাজার নেই। তাই ভুটানিরা এদিকে আসে বাজার করতে, অনেক সময় দু-দিন তিনদিনের পথ হেঁটে ওরা বাজার করে আনে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে এই নদী পার হওয়া যায়? ওপারে আমরাও যেতে পারি? কোনও বাধা নেই?

বিট অফিসারটি বললেন, না, না, কোনও বাধা নেই। সবাই যেতে পারে।

তৎক্ষণাৎ আমি ওপারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয় পড়লুম।

কাল রাত্রে আমি নদীর কিনারে যেখানে এসেছিলাম, তার পাশ দিয়েই রাস্তা চলে গেছে ভুটানের দিকে। খানিক দূরে খেয়াঘাট। স্বচ্ছ, নীলবর্ণ জল। তাকিয়ে থাকলে মাছেদের খেলা দেখা যায়। এই জায়গাটি ট্রাউট ফিশিং-এর জন্য বিখ্যাত, তাই সাহেবদের কাছে আকর্ষণীয়। ছিপ থাকলে আমিও বসে যেতাম। কিছুদিন আগেই নাকি এখান থেকে একজন ত্রিশ কেজি ওজনের একটি মাছ ধরেছে।

মানস নদী বেশ খরস্রোতা বলেই পার হওয়ার কায়দাও আলাদা। সরাসরি এপার-ওপার করা যায় না। নদী গা দিয়েই লাঠি ঠেলে-ঠেলে বেশ খানিকটা উজিয়ে যেতে হয়। তারপর স্রোতের মধ্যে এসে কোণাকুনি খানিকটা পিছিয়ে এসে ওপারে ওঠা যায়।

এপারেও নিবিড় বন। কিছুক্ষণ সেই বিট অফিসার ও স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। এখানে সেই কাপড়-কাচার মতন শব্দটির রহস্যেরও মীমাংসা হল। দু-একবার সেরকম শব্দ হতেই আমি বিট অফিসারটির দিকে তাকালাম। সে বলল, ও হচ্ছে বার্কিং ডিয়ারের ডাক। এই জঙ্গলে খুব আছে। ওরা দিনে-রাত্রে সবসময় ডাকে।

বিট অফিসারটি আর একটি দুর্লভ জিনিস আমাকে দেখাবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করল। বনে বনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে তা দেখতে পেলাম।

ডজনখানেক গোলডেন লাঙ্গুর। এরা এক জাতের হনুমান। মুখ কালো, দারুণ লম্বা লেজ আর গায়ের রং ঝকঝকে সোনালি। খুব উঁচু গাছের মগডালে এরা থাকে, দেখলাম, গায়ে রোদ পড়লেই প্রায় চোখ ঝলসানো সোনালি আভা বেরোয় এদের গা থেকে। এই জাতের হনুমান এখন অবলুপ্তির পথে। সব সমেত বারো কি চোদ্দোটি হনুমানের সেই দলটির দিকে তাকিয়ে বড় বিষণ্ণ মায়া বোধ করলাম। এরা ধ্বংস সামনে নিয়ে বসে আছে।

এই বনেও ধনেশ পাখির সংখ্যা প্রচুর। এক এক সময় চেনা যায় যুগল ধনেশ-ধনেশী লম্বা ডানা আছড়ে নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার বলেছিল, কয়েকদিন আগে দিনে-দুপুরে সে একটি বাঘকেও নদী সাঁতরে এদিকে আসতে দেখেছে। জন্তু-জানোয়াররা এখনও সীমান্ত মানতে শেখেনি। মানস নদীর দু'দিকের অরণ্যের নামই মানস। তাই অরণ্য ও পশুদের সংরক্ষণের যৌথ দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত ও ভুটান সরকার।

বিট অফিসারটি শহরের ছেলে, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, অবিবাহিত, জঙ্গলে সে একলা থাকে। কী করে তার সময় কাটে? কিছু বই আছে তার সঙ্গী, তা ছাড়া এরই মধ্যে অরণ্য তার ভালো লেগে গেছে। অরণ্যে সবচেয়ে যা তার ভালো লাগে, সে আমাকে বলল, তা হল অরণ্যের স্তব্ধতা। 'শুনলেন, এই যে নদীর স্রোতের শব্দ, এটাও সেই স্তব্ধতারই অঙ্গ।' আমার সন্দেহ হল, সে কবিতা লেখে।

ভুটানের দিকে কয়েকটি বাড়িঘর আছে। কিছু-কিছু কাঠ-কাটার ব্যাপারও রয়েছে। রয়েছে ভুটানের রাজার একটি সুদৃশ্য বাড়ি। দু-পাঁচ বছরের মধ্যেও তার তালা খোলা হয় না। আর একটি বাংলো রয়েছে এদিকে। এখন কেউ নেই। নদীর এপার-ওপারে ভারত-ভুটানের দুটি বাংলোতেই এখন আমিই একমাত্র অধীশ্বর। বীট অফিসারটি বলল, আমি ইচ্ছে করলে ভুটানের বাংলোতেও গিয়ে থাকতে পারি। সেরকম ব্যবস্থা করা যায়।

কারা আসে এখানে? উত্তর পাওয়া খুব শক্ত নয়, সাহেবরা। ভারতের দিকে যে আটখানি ঘরওয়ালা বিশাল বাংলোটি প্রস্তুত, সেটিও তো সাহেবদের মুখ চেয়েই। আমাদের দেশে পর্যটনের সব কিছুই তো সাহেব-নির্ভর। ভিখারির জাত, সবসময় কোল পেতে বসে আছি, কখন দয়া করে কোনো সাহেব দেবতা আসবে। এসো সাহেব, বসো সাহেব, যো-হুকুম সাহেব, একটু ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝুমঝুমি বাজাও তো সাহেব—এই তো আমাদের পর্যটন উন্নয়নের মন্ত্র!

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। নদীর খুব কাছে

একটি খড়ের চালের কুঁড়েঘর। তার কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে একটা তক্তা সাঁটা, সেটাতে খড়ি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা 'বার'। আমি স্তম্ভিতভাবে বললাম, এখানে বার? পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম। বার রীতিমতন খোলা। কোমরে ভোজালি গুঁজে ভুটানের জাতীয় পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বার-টেন্ডার। অপরূপ সারল্যে উদ্ভাসিত তার মুখ। বিট অফিসারটি একটু অপ্রসন্নভাবে বলল, চলুন, এখানে দেখবার কিছু নেই, এদিকে পাহাড়ের কাছে অনেক পাখি আছে। বুঝলাম সে একটু নীতিবাতিকগ্রস্ত।আমি হেসে বললাম, 'একজন যখন এমন নির্জন জায়গায় বার খুলে রেখেছে, তখন কারুকে তো সেটা প্রেট্রোনাইজ করতেই হবে।' সে বুঝল না, বলল, চলুন, চলুন! তখন আমি তাকে বিদায় জানালাম! সে প্রকৃতি দর্শনে গেল, আমি রয়ে গেলাম সেখানেই।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। সেই খড়ের ঘরের বারে পরপর সাজানো রয়েছে শুধু স্কচ হুইস্কির বোতল। এখানে স্কচ হুইস্কি? বিট অফিসার ও আমি ছাড়া আর একটিও প্যান্ট-শার্ট পরা লোক নেই সেখানে। দাম জিগ্যেস করলাম। কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা হলেও এমন সস্তা নয় যে জঙ্গলের মানুষ কিনতে পারবে। তাদের আয়ত্তের যথেষ্ট বাইরে। তবে, কে খায় এসব?

উত্তর সেই একই। আমাদের মতন দুর্বল দোনামোনা নীতি নেই ভুটান সরকারের। তাঁদের টুরিস্ট বাংলো থাকলেই সঙ্গে বার থাকবে। এই সুদূর জঙ্গলে, যেখানে হয়তো বছরে একবার দুবার সাহেবরা আসে, তাদের জন্য। এবং মানুষ থাক না থাক বার-টেণ্ডার ঠিক তার দোকান খুলে রাখে। পাহাড়ি মানুষরা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে চলে যায়।

জানি বাঙালি লেখকদের শুধু লেবুর জল খাওয়াই নিয়ম। কোনও সাহেবসুবোর পার্টিতে লেখকের নিজের উপস্থিতি বর্ণনা দিতে গেলে অনিবার্যভাবে এই লাইনটি এসে পড়ে, 'না, আমার চলে না।' শরৎচন্দ্র মদ খাওয়ার কমপিটিশান দিতে গিয়ে এক সাহেবকে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু নিজের লেখার মধ্যে কোথাও সে কথা স্বীকার করেননি।

আমি ওসব বুঝি না। এইরকম পরিবেশে আমি কোনওদিন কোনও স্কচ হুইস্কির দোকান দেখিনি। এখানে স্বাদ নিশ্চয়ই আলাদা হবে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটি জ্যান্ত গাছকে মাঝখান থেকে কেটে ফেলা হয়েছে, গুঁড়িগুলোই এখন বসবার জায়গা। চমৎকার ব্যবস্থা। একপাত্র 'কালো-সাদা'-র অর্ডার দিলাম। সুশ্রী বারম্যানটি আমার দিকে পানীয় সমেত গেলাস এগিয়ে দিতে, আমি বললাম থোড়া পানি হোগা? সে তরতর করে ছুটে গিয়ে নদী থেকে এক বোতল জল নিয়ে এল। সেই পবিত্র মানস সরোবরের জল মিশিয়ে স্কচ পান করতে-করতে আমি মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলাম। আমি এইসব মজা একা-একা বেশ উপভোগ করি।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক টিয়াপাখি। নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে উঠে এল সাত-আটটি ভুটানি যুবতী। তাদের পোশাকে সবুজ ও লাল রঙের প্রাধান্য। তাদের দিকে তাকালে তারা চোখ সরায় না, হঠাৎ-হঠাৎ হেসে ওঠে। টিয়াপাখির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে তাদের ঠোঁটের মিল আছে। একটু পরেই তারা জঙ্গলের মধ্যে মিশে যায়। আবার আর একটি দল জল থেকে উঠে আসে। একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে একটি বার্কিং ডিয়ার অনাবশ্যকভাবে ডেকে ওঠে দু'বার। দুটি সারস ধরনের পাখি মানসের ঠিক মাঝখানে জলের কাছেই গোল হয়ে ঘুরছে, ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে তাদের ছায়া।

মাথার টুপিতে লম্বা একটা ধনেশ পাখির পালক গোঁজা এক বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মুখে সহস্র ভাঁজ। সে আমাকে বলল, সেলাম সাব! আমিও বললাম, সেলাম। সে আবার বলল, সেলাম। আমিও। সে-ও আবার। এই খেলাটা আমি জানি। গহন অরণ্য হোক বা ধুধূ করা মরুভূমি হোক, যেখানেই পানশালা আছে, সেখানেই এরকম একটি চরিত্র থাকবেই। বৃদ্ধটি আমার গেলাসের

দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে।

'আমি বললাম, ওরে বাবা, বড্ড দামি জিনিস। তোমায় বেশি খাওয়াতে পারব না। আচ্ছা দাও, ওকে এক পেগ।

সে তৎক্ষণাৎ আমার পাশের কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে বলল, সাহেব, শের দেখবে? আমি তোমাকে শের দেখাতে পারি। আর রাইনো, সাব, এক এক শিং রাইনো, পাইথন, ইতনা মোটা—

বুঝলাম, আমেরিকান টুরিস্টদের সে এইভাবে ভোলায়। আমি বললাম, আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে বেশি খাওয়াতে পারব না।

তিন পাত্তর খেয়েই আমি উঠে পড়লাম। লোকটি বড় বেশি কথা বলছিল। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর আমার পছন্দ হচ্ছিল না তখন।

নদীর ধার দিয়ে একা-একা হাঁটতে লাগলাম ওপরের দিকে। নানা আকারের পাথর ছড়ানো। ভাবতে ভালো লাগে যে, এইসব পাথর এসেছে শ-শ মাইল দূরের মানস সরোবর থেকে। কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে নিই, রং ও আকৃতি দেখে সংগ্রহ করতে করতে দু-হাত ভরে যায়। এসব কিছুই জমানো যায় না, তাই আবার একটি একটি করে ছুড়ে দিই জলের মধ্যে। একটা পাথরও নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছে দিতে পারি না।

এক জায়গায় পাতলা জঙ্গল দেখে বসে পড়লাম। বেশ চড়া রোদ উঠলেও এখানে গাছের ছায়া। পরিষ্কার বালি। আস্তে-আস্তে শুয়ে পড়ি। দুপাশে গম্ভীর পাহাড় আমাকে দেখছে। জঙ্গল থেকে যে-কোনও সময় যে-কোনও একটি জন্তুর বেরিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ভয় আসে না। শুয়ে-শুয়ে দেখি পাখিদের ওড়াউড়ি। কী অদ্ভুত তীব্র নীল এখানকার আকাশ। মানস সরোবর কীরকম, এই আকাশের মতন? একদিন যেতে হবে।

হাত থেকে খসে পড়ে সিগারেট, ঘুম আসে। মনে হয়, এখানেই শুয়ে পড়ব, আর কোনওদিন কোথাও যাব না। বহুদিন আগে আমি এখানেই ছিলাম, যেন দূর চলে গিয়েছিলাম ভুল করে? আর ভুল করব না। পাতার ফাঁক দিয়ে একটি রোদের রেখা এসে পড়ায় আমি দু-হাতে চোখ চাপা দিই।

আমার এই অরণ্য বৈরাগ্য মাত্র দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হয়। অতুল ওঝা ঠিক আমাকে খুঁজে বার করেছে। ডাক বাংলোতে ততক্ষণে খিচুড়ি রান্না তৈরি বলে সে আমাকে তাড়া দেয়।

আমিও উঠে পড়ি। এবার ফিরতে হবে। ফিরতে তো হয়ই।

জীবন্ত মরুভূমি

'কাল সকালে মরুভূমি দেখতে যাবে?'

ভাবছিলুম কার সঙ্গে যাব। আরিজোনায় এসে ক্যাকটাসের মরুভূমি না দেখার কোনও মানে হয় না। ভুবন বিখ্যাত এই মরুভূমি, এমন আর দেখা যায় না কোথাও। এ মরুভূমি শুধু বালুকাময় নয়। অথচ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। এমন সময়ে কানের কাছে দৈববাণীর মতো ড্রুমন্ডের প্রশ্ন।

ড্রুমন্ড হার্ডলি একজন তরুণ কবি, আমার চেয়ে বছর দু-একের ছোট হবে হয়তো (আমি এই জুলাইতে উনত্রিশ)। পাঁচ বছর আগে বিয়ের পর ড্রুমন্ড হানিমুন করতে গিয়েছিল কম্বোডিয়া ও ভারতবর্ষে। রথের মেলার সময় পুরীতে গিয়েছিল আসল সমুদ্র নয়, জনসমুদ্র দেখতে।

'তবে এমন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম যে, ভ্রমণের অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছিল'—ও বলল। বললুম, 'দ্যাখো, আমাদের সরকারি হিসেবে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, ওটা বোধহয়—'

—কম্বোডিয়া থেকে হয়েছিল, আমারও তাই মনে হয়।

—ভাগ্যিস তুমি বললে, তোমরা বললে দোষ নেই। আমি বললেই অন্য দেশের নিন্দে হয়ে যেত। একেই তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে।

বাড়িতে বাঘ পুষেছে ড্রুমন্ড। সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা, মরুভূমি থেকে ধরা। ওর স্ত্রী, ভারী লক্ষ্মী, শ্রীময়ী মেয়েটি, পরীক্ষার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছিল, আমি যেতেই শিষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল পাশ থেকে ঘর-ঘর-রর-র করে উঠল বাঘের বাচ্চা। 'ভয় পেয়ো না, আমাদের বেড়ালটা কারুকে কিছু বলে না!'

চারটে কাবুলি বেড়াল সাইজের ওই আট মাসের বাঘের বাচ্চাটা—দেখেই আমার হাড় হিম। একটা বড় ঘরে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে—ওরা দুজনে বেড়ালের মতোই ওটার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাপারটা গোপন, পুলিশে জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে। আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা বললুম, সেই যে-কোনও এক ভদ্রলোক বাঘ পুষেছিলেন, তারপর বাঘ সেই লোকটার হাঁটু চাটতে-চাটতে হঠাৎ রক্তের স্বাদ পেয়ে ধাঁক করে কামড়ে দেয়। ওরা দুজন হেসে বলল, একজন লোকে ফেইল করেছে বলে আমরা পারব না, তার কী মানে আছে। মানুষ অ্যাটমকে পোষ মানাচ্ছে—বাঘ তো দূরের কথা। তুমি কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো না, কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, 'না ভাই থাক, দূর থেকেই দেখছি। এমনিতেই আমার শরীরে আঠারো ঘা আছে।' সকাল ন'টা আন্দাজ ড্রুমন্ডের ভ্যান নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। অ্যারিজোনার টুসন শহরের একেবারে গা থেকেই মরুভূমি আরম্ভ। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড়—তার ওপাশে মেক্সিকোর সীমানা।

—মরুভূমি সম্বন্ধে যা ভাবছ তা নয়, ড্রমুণ্ড বলল, 'অন্যরকম, দেখো, তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু একটা কথা, মরুভূমি দেখে কবিত্ব করা চলবে না। বিশেষত এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড আবৃত্তি করা একেবারেই নিষেধ। আমি অনেক শুনেছি।'

'সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমার মনে মোটেই কবিত্ব জাগে না। আমার খিদে পায়।'

'কী?'

'মাইরি বলছি, আমার খিদে পায়। অর্থাৎ আমার হৃদয় কাজ করে না, তার একটু নীচে, পেটে প্রতিক্রিয়া হয় আমার।

ও হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমার বউ কয়েকটা হ্যামবার্গার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।'

বিষম জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি দুপাশের দৃশ্য দেখার বদলে ড্রুমন্ডকে দেখছিলুম। একটা ব্লু জিন আর গেঞ্জি পরেছে, মাথার চুল এলোমেলো। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সাহস, বাড়িতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও বাগান, বাঘ পুষেছে—এই একজন আমেরিকার তরুণ কবি। ভারী চমৎকার খোলামেলা ছেলে ড্রুমন্ড, কিন্তু একটা দোষ ঃ যখন খুব উৎসাহে কথা বলে, তখন খাঁটি ওয়েস্টার্ন অ্যাকসেন্ট বেরিয়ে পড়ে—আমার পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়। ও বলল, 'এখানে খুব জলের অভাব।' তারপরই গড়গড় করে কী শুরু করল—আমি কিস্যু বুঝতে পারলুম না, তবুও সেনটেন্সের মধ্যে কমা, ফুলস্টপ বসাবার মতো মাঝে-মাঝে 'হু হ্যাঁ', 'ও তাই নাকি' করে যেতে লাগলুম। হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'তোমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কী করো?' আমি একেবারে গভীর জলে পড়লুম। যদিও বুঝতে পারলুম, ব্যাপারটা জল সম্বন্ধেই। এস্টিমেশন, ড্রিলিং এই সব শব্দ শুনেছি বটে। আমতা-আমতা করে বললুম, 'আমি ঠিক—'

'ঠিক কোন জায়গা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে কী করে বুঝতে পারো?' বললুম, 'আমি ঠিক ও বিষয়ে কিছু জানি না। আমি জন্মেছি পূর্ববঙ্গে; সেখানে জল থাকাটাই একটা সমস্যা, না-থাকা নয়। রাজস্থানের দিকে ও সমস্যা আছে বটে—কিন্তু ওরা কী করে আমি জানি না।' একটু থেমে

আবার বললুম, 'একটা কথা বলব? তোমাদের দেশের অনেক কবির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি— তাঁরা কবিতা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জানে। স্পেসশিপের কোথায়-কোথায় শূন্য স্টেশন হওয়া দরকার, হায়ারোগ্লি ফিকসের পাঠ্যান্তর, নদীর তলায় সুড়ঙ্গ বানাবার কী কী সমস্যা, বাঁদরের মস্তিষ্ক টেস্ট টিউবে আলাদা বাঁচিয়ে রাখার পর সেই অশরীরী মস্তিষ্কের দুঃখ ও আনন্দ বোধ থাকে কি না, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা—এই সব। আমাদের দেশের কবিরা একটু ন্যালাখ্যাপা টাইপ, জেনারেল নলেজে শূন্য, ধুতি পাঞ্জাবিতে জেবড়ে থাকে, এক চেয়ারে বসলে ঘণ্টাপাঁচেকের মধ্যে উঠতে চায় না, কবিতা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই কিছু জানে না—হয়তো সেই জন্যই তোমাদের চেয়ে ভালো কবিতা লেখে।'

আমার শেষ কথা শুনে ও চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপরই ঝকঝক করে হেসে উঠল। বলল, 'কী জানি, হয়তো সত্যি। আমি বেশি পড়িনি—বিশেষ করে তোমাদের ওই হরিবল ট্রানস্লেশন টেগোরের লেখাও আমার মোটেই ভালো লাগেনি। কিন্তু তোমাদের একটা অসুবিধে আছে—যেটা আমাদের নেই। তোমাদের কাঁধের ওপর চেপে আছে তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের ধর্ম। তোমরা নির্জন হতে পারো না। কিন্তু আমাদের ওসব ঝামেলা নেই—আমরা সবাই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হাঁটছি, সুতরাং আমাদের প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে—আমরা নির্জন আধুনিক মানুষ সকলেই।'

'কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি তোমাদেরও লোভ কম নয়। তোমরা—'

দ্যাখো, দ্যাখো, ওই দিকে দ্যাখো। আকাশে একটা বড়ো সাইজের পাখি দেখতে পেলুম। জিগ্যেস করলুম, 'ওটা কী?'

গোল্ডেন ঈগল।

বিশাল ডানাওয়ালা সোনালি ইগল এই অঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলুম, আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু 'গোল্ডেন ইগল' এ নামটা খুব চেনা, কলকাতায় বহু গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ও নামে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে।

তাড়াতাড়ি একটা জোরালো দূরবিন বার করে ডুমন্ড ছুটল ওই পাখিটার পিছনে গাড়ি নিয়ে। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায় কী দুঃসাহসিক গাড়ি চালানো—এক হাতে স্টিয়ারিং, এক হাতে দূরবিন নিয়ে বাইরে ঝুঁকে—চোখ রাস্তায় নয়, আকাশে। কিন্তু অমন দুঃসাহসীর পাশে বসেছিলাম বলে আমারও ভয় করল না। কী ভয়ংকর গতি ওই ইগলের—ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় মহাশূন্যে বিন্দুর মতো হয়ে গেল হঠাৎ আবার ঝুপ করে নেমে এল খুব নীচে—শোঁশোঁ করে আবার পেরিয়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, মিলিয়ে গেল দিগন্তে কয়েক মিনিটে। আমরা গাড়ি নিয়েও ওর সঙ্গে পাল্লাও দিতে পারলুম না।

ড্রুমন্ড বলল, 'ওই ইগল আমেরিকার প্রতীক চিহ্ন।'

গাড়ি উঠে এসেছিল একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ডানদিকে তাকিয়ে বিশাল মরুভূমি চোখে পড়ল। সত্যিই, আমাদের কল্পনায় যে মরুভূমির ছবি আছে—অর্থাৎ মাইলের পর মাইল হলুদ বালি, গরম হাওয়া—এ মরুভূমি সেরকম নয়। এ মরুভূমি জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভূমি জুড়ে অসংখ্য সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো ক্যাকটাস, পশ্চিম অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যাকটাস, সরল, দীর্ঘ, প্রত্যেকটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। প্রথম শাখা বেরোয় পঁচাত্তর বছরে—ওই শাখা বা ডানা গুনে বয়েস বোঝা যায়। ওগুলোকে বলে সাউয়ারো (স্প্যানিশ নাম : Saguaro ঠিক উচ্চারণ হল না)—গ্রীষ্মকালে ফুল ফুটতে থাকে—বীভৎসতার বদলে এ মরুভূমিকে মনোরমই দেখায়। মরুভূমি নয়; পুরোটাই যেন এক মরুদ্যান। এ ছাড়া আছে অন্য নানা জাতের ক্যাকটাস, প্রিকলি পিয়ার—বুনো শেয়াল, কাঁকড়া বিছে, ছোট বাঘ, র‍্যাটেল স্নেক, (ল্যাজে যেগুলোর খটখট আওয়াজ হয়), হরিণ। জল নেই, ফসল হয় না—কিন্তু মরুভূমির বদলে পোড়ো জমি কথাটাই মনে

আসে। কিন্তু ড্রুমন্ড আগেই এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের উল্লেখ করতে বারণ করেছে।

এই মরুভূমির দৃশ্য আমাদের অদেখা নয়। আমেরিকার যাবতীয় ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি, ঘোড়া ছুটোচ্ছে কাউবয়রা, কথায়-কথায় গোলাগুলি খুনোখুনি—এখানকার রেড ইন্ডিয়ানের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে এখন মিউজিয়মে পুরেছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখানে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, তারপর স্প্যানিশদের সঙ্গে, তারপর সিভিল ওয়ারে। মরুভূমি মাত্রই রক্তলোভী, আরবের মরুভূমিও কম রক্ত শোষেনি। ড্রুমন্ড জিগ্যেস করল, 'কেমন লাগছে?' বললুম, 'ভাই ড্রুমন্ড, যদি সত্য কথা বলতে হয়—এসব দৃশ্যই আমি আগে ছবিতে দেখেছি। এ দেখার চেয়ে, ছবিতে বেশি সুন্দর লেগেছিল।'

—'যাঃ, তা হয় নাকি?'

'তোমাকে ঠিক যুক্তি দেখাতে পারব না। এ জায়গাটা বড় বেশি বিশাল আমার পক্ষে, আমি ছোট করে, ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।'

—দুঃখের বিষয়, আমি ক্যামেরা আনিনি।

'আরেকদিন পাহাড়ের ওদিকে গুহা দেখতে যাব, তখন।' (পরে একদিন সেখানে অসিত রায় ও সুবোধ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম)।

ছেলেমানুষের মতো ড্রুমন্ড বলল, 'জানো এখানে হরিণ আছে? হয়তো এই মুহূর্তে দশটা হরিণ দশ দিক থেকে আমাদের দেখছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

আমাদের মোটামুটি গন্তব্য ছিল ডেজার্ট মিউজিয়ম—মরুভূমির ঠিক মধ্যে আসল পরিবেশে মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যায়—তার প্রদর্শনী। ড্রুমন্ড জিগ্যেস করল, 'তুমি কিছু মনে করবে, যদি আমরা একটু ঘুরে যাই? ওই ডানদিকের টিলাটা আমার দেখা হয়নি।'

আমি বললুম, 'না-না, আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে ওটা দেখা হয়নি মানে? তুমি কি মরুভূমির সব জায়গা জানো নাকি?'

'প্রায়, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসি, এবং নানান জায়গা দেখি।'

'কেন?'

প্রথমে ও কারণটা বলতে চাইল না। লাজুক হেসে আমতা-আমতা করতে লাগল। মুগ্ধ হওয়ার জন্য মরুভূমিতে প্রতি সপ্তাহে আসার মতো এরকম খেলো কবিত্ব ও করবে বলে আমার বিশ্বাস হল না। পরে কারণটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

ড্রুমন্ড মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে আসে। এই খোঁজা নতুন নয়। সোনার লোভেই সাদা চামড়ার লোকেরা আসে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, তারপর একদিন দেখতে পায় প্রশান্ত মহাসাগর। সোনার লোভে কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে নিজেদের মধ্যে। ভুলে গেছে মানুষের জীবন সোনার চেয়েও দামি। এতকাল সোনার লোভে একপাল লোক মরেছে—সাদা হাড় ও কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করছে দু-একটা সোনার দাঁত। কিন্তু এখনও সোনার লোভে কেউ আসে জানতুম না, শেষে কি একটা পাগলের পাল্লায় পড়লুম। কিন্তু ড্রুমন্ডের অমন সরল সুন্দর মুখে কোনও স্বর্ণলোভ দেখলুম না। সোনা নয়, সোনা খুঁজছে—এইটাই যেন বড় ব্যাপার।

র‍্যাঁবোর কবিতার মতো ঃ যখন আমি ফিরব, আমি সোনা নিয়ে আসব।

'তোমার সত্যিই ধারণা এখানে সোনা পাওয়া যায়?'

'নিশ্চয়ই! কত লোক ছুটির দিনে আসে সোনা তৈরি করতে। কিন্তু তারা সারাদিনে যতটুকু সোনা পায় বালি ছেঁকে—তাতে দিনের মজুরি পোষায় না। আমি খুঁজছি এমন একটা জায়গা—যেখানে অফুরন্ত সোনা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চলল পাহাড়ি পথে। ড্রুমন্ডের গাড়িটাও ওরই মতো ডাকাবুকো। কড়কড়, মড়মড় শব্দ হতে লাগল, ডানদিকে বাঁ-দিকে বিষম হেলে পড়তে লাগল, তবু চলল ঠিকই।

শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থামল। আর রাস্তা নেই। আমরা নেমে হাঁটতে লাগলুম। 'সাবধানে হেঁটো প্রীতি, র‍্যাটেল স্নেক আছে খুব। অবশ্য ভয় নেই—কামড়ালে মানুষ চট করে মরে না।' খুব একটা ভরসা পেলাম না যদিও ও কথা শুনে। একটা ছোটো টিলা পেরোতেই দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

'এখানে এই বিশ্রী মরুভূমিতে কে বাড়ি করেছে?'

'জানি না, আমি আগে দেখিনি। তবে ভেব না, কোনও সাধু সন্ন্যাসী, তোমাদের ইন্ডিয়ার মতো—নিশ্চয়ই কেউ সোনার লোভে এসেছে।' বাড়ির সীমানায় বহুদূর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া। কোথাও কারুর কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমরা দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। হলিউডের সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো—আমি প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের গুলি আশা করছিলুম। কাছে এসে অবাক হয়ে গেলুম। বাড়িটা নতুন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত! যেন কোনও অতিকায় দানব এসে মহা ক্রোধে ওটাকে ধ্বংস করেছে। কোনও ঘরের ছাদ নেই, দেওয়ালে বড়-বড় ফুটো (বন্দুকের গুলির কিনা কে জানে!) আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করা। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কেউ ভেঙেছে নতুন রেফ্রিজারেটর—কিছু হাতুড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে বোঝা যায়, গ্যাসস্টোভের শুধু পাইপগুলো ভেঙে বিকল করা হয়েছে—নতুন কাঠের চেয়ার অথচ ভাঙা, সোফা কুশন ছুরি দিয়ে ফাঁসানো। আমি ডুমন্ডের মুখের দিকে তাকালুম। ও বলল 'কী জানি, হয়তো ঝড়ে ভেঙেছে—মাঝে-মাঝে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এখানে বাড়ি বানানোই বোকামি!'

আমি বললুম, 'না, ঝড় অসম্ভব। মানুষের কাজ।'

'হতে পারে, একদল গ্যাংস্টার এসে লুটপাট করেছে। কেউ হয়তো এখানে ছুটি কাটাবার জন্য বাড়ি বানিয়েছিল। হয়তো কেউ থাকত না এখানে!'

ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেকশন পর্যন্ত ছিল, তারগুলো দেওয়াল থেকে ছেঁড়া, মেশিনটা তোবড়ানো। দেওয়ালে কুৎসিত ছবি—তাই দেখে প্রাক্তন বাসিন্দাদের রুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সবই ন্যাংটো মেয়েমানুষ, কয়েকটা খড়ি দিয়ে আঁকা, একটি স্ত্রীলোকের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্ল্যাং ভাষায় নাম লেখা, যেন কারুকে শেখান হয়েছে।

'গুণ্ডারা এসব জিনিসপত্র ভেঙেছে কেন—নিয়ে যেতে তো পারত?'

'মরুভূমিতে এসব জিনিসের লোভে কে আসে, সবাই আসে সোনার লোভে।' ডুমন্ড বিষম উৎসাহ পেয়ে গেল ব্যাপারটাতে—শখের গোয়েন্দার মতো খুঁটিনাটি দেখতে লাগল। এক-একটা জিনিস পায়—আর আমাকে ডেকে-ডেকে দেখায়—আধপোড়া পিয়ানো, এক বাক্স ছেঁড়া জামাকাপড় এইসব। মরুভূমি দেখতে এসে কী এক রহস্যময় বাড়িতে এসে হাজির হলুম। হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে ডুমন্ড আমাকে ডাকল। কাছে গিয়ে দেখলুম, ডুমন্ড মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসেছে। ওর সামনে একটা ছোট্ট কবর। একটা কাঠের ক্রুশে ছোট্ট একটা পতাকা—তাতে লেখা, 'এই ভয়ংকর মরুভূমি আমাদের সাধের খোকনকে খুন করেছে। শ্রীমান ফ্রেডেরিক, (বয়স আট) ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দেবেন।' তারিখ খুব টাটকা, মাত্র একুশ দিন আগের। ডুমণ্ড গম্ভীরভাবে বলল, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে কোনও রহস্য আছে—শেষে আমরা পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ব।'

ওই রহস্যময় বাড়ি পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আমরা অন্যদিকে নেমে গেলুম। বিশাল ক্যাকটাসগুলো একটু আগেও যেন নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। বিষম গরমে কান ঝাঁঝাঁ করছে। একটা নদীর খাতের মতো জায়গা দেখলুম, মাঝে-মাঝে বাঁধানো ঘাটের মতো, এক বিন্দু জল নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়তো সেখানে নদী ছিল।

আমিই প্রথম সোনা আবিষ্কার করলুম। আমি আস্তে-আস্তে হাঁটছিলুম, মাঝে-মাঝে বসছিলুম ক্যাকটাসের ছায়ায়, কাঁটা বাঁচিয়ে—ডুমন্ড ষষ্টপুজোয় মানত-করা মেয়েমানুষের মতো মাঝে-মাঝেই

শুয়ে পড়ছিল মাটিতে—কোথাও গন্ধ শুঁকছে, কোথাও মাটিতে কানপেতে কী শুনছে এবং মাঝে-মাঝে ওর সেই ইমোশনাল ইংরেজিতে (দুর্বোধ্য) কী সব বলছে। এমন সময় আমি বেশ একটা গোল, নধর, পাউডার পাফ (ফরাসিরা বলে শাশুড়ির মাথা) ক্যাকটাসের তলায় দিব্যি একতাল সোনা দেখতে পেলুম। ঠিক একটা ছোটখাটো ফুটবলের সাইজ, রোদের আলো পড়ে ঝলসে দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হল—ডুমন্ড নিশ্চয়ই আমাকে অর্ধেক শেয়ার দেবে, তা হলে, ওটার দাম কত কে জানে—দেশে ফিরে অন্তত বছরপাঁচেক আমাকে কোনও চাকরি করতে হবে না। সোনা, আমি সোনা পেয়েছি! আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ডুমন্ড ওই দেখো!'

বিষম চমকে ও মুখ ফেরালো তারপর আমার আঙুল সোজা লক্ষ করে সোনার তালটা দেখতে পেয়ে ও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'ওঃ, তাই বলো। তুমি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলে—আমি ভাবলুম, সাপ না বাঘ। আমি আবার বন্দুকটা আনিনি।'

'ও কী তবে?'

'সোনা।'

কাছে গিয়ে ডুমণ্ড ওই জিনিসটাকে এক লাথি মেরে বলল, 'বাস্টার্ড।' সেই সোনার তালটা অমনি ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল ঝুরঝুরে বালির মতন। অথচ ঠিক সোনার তালের মতনই দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'এ কী!' ও বলল, 'এই জিনিসগুলো কম ঝামেলা করে? এর নাম কী জানো,—বোকার সোনা, ফুল্স গোল্ড। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। বছরদশেক আগেও এ জিনিস আবিষ্কার করে কত লোক নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সরল হাসি হেসে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি ওটা দেখতে পাওয়ার পরই পেছন থেকে আমাকে ছুরি মারোনি!'

বস্তুত, ব্যাপারটা এমন মেলোড্রামাটিক হল যে তারপর থেকে আমার বিষম বিশ্রী লাগতে লাগল। আর মরুভূমি দেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছে চলে গেল আমার। ওটা দেখতে পাওয়ার পর মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যে দুমদুম শব্দ হওয়া শুরু করেছিল—তা আর থামল না। বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। ডুমন্ডকে স্বর্ণলোভী ভেবে মনে-মনে একটু ক্ষীণ অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলুম—কিন্তু তখন, তারপর থেকে কোথা থেকে এক গভীর নিরাশা আমার বুক ভরে দিলে। যেন কেউ সেই মুহূর্তে কেড়ে নিল আমার পাঁচ বছর চাকরি না করার ছুটি, যেন পাঁচ বছর চাকরি করার পরিশ্রম একসঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে চেপে বসল।

আমরা ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ডুমন্ডের বউ-এর বানিয়ে দেওয়া হ্যামবার্গার আর স্যান্ডউইচ খেলাম। গাড়ির পিছন দিকটা খুলে ডুমন্ড কী যেন খেতে লাগল চোঁচোঁ শব্দে—মনে হল যেন পেট্রল খাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম ওখানে আলাদা একটা জলের ট্যাংক আছে। ঘন ঘন মরুভূমিতে আসার জন্য পাকা ব্যবস্থা। 'ডানদিকের ওই অঞ্চলটা একটু দেখেই আমরা যাব মিউজিয়মে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

'না, আমি এখানে বসছি। তুমি ঘুরে এসো।'

আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

একটু দূরে যাওয়ার পর আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ডুমন্ড, সাবধানে ঘুরো। হারিয়ে যেও না—কিংবা, মরে যেও না। কারণ, আমি পথও চিনি না, গাড়িও চালাতে জানি না।'

একটু পরেই ডুমন্ড মিলিয়ে গেল দূরে। আমি একা গাড়ির ছায়ায় বসলুম। চারিদিকে এমন নিঃশব্দ যে ভয় করতে লাগল। হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, একটা শুকনো পাতারও শব্দ নেই। দূরে সেই পোড়ো বাড়িটা। আমি ওটার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বসলুম। দুমানুষ-তিনমানুষ লম্বা ক্যাকটাসের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল—সান্টা ক্যাটালিনা পাহাড় পর্যন্ত। নিস্তব্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরছে সেই মরুভূমিতে। আমার হাতঘড়ি নেই, সময় জানি না। একমাত্র শব্দ শুনছি

নিজের হৃৎপিণ্ডের—তখন প্রবলভাবে দুমদুম করছে।

একটু শব্দ হলেই এদিক ওদিক তাকাই। মনে হয় বুঝি কোনও র‍্যাটেল স্নেক তাড়া করে আসছে। র‍্যাটেল স্নেক আগে দেখেছি আমি, লেজের দিকটা শুকনো হাড়, কট-কট-কট-কট আওয়াজ হয়। দেখলেই কেমন ঘেন্না লাগে। লম্বা-লম্বা ক্যাকটাসগুলো যেন এক দৃষ্টে দেখছে আমাকে। ডুমন্ড কোথায় গেল? দুবার ডুমন্ড, ডুমন্ড বলে চেঁচিয়ে ডাকলুম। কোনও সাড়া নেই। ডুমন্ড যদি আর না ফেরে? মরুভূমির মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকার মতন একাকিত্ব বুঝি আর হয় না।

ক্রমশ দুর্বলতা বোধ এনে দিচ্ছে। মরুভূমিতে এতকাল যে সব অসংখ্য মানুষ মরেছে—তাদের সবার জন্য অসম্ভব দুঃখ বোধ করতে লাগলুম। ওপরের দিকে তাকানো যায় না, আকাশ এত গরম। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল অসম্ভব লম্বা। এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভালো আমার মনে হল। গাড়ির মধ্যে ঢুকে লম্বা সিটে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে আমি একটা জলে ডোবা মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

পৃথিবীতে, এত কাছে

দাইজুড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই জিপ গাড়িটা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ড্রাইভারের পাশে আমি, তারপর স্বাতী। পেছনে কল্যাণ এবং চারটি মুরগি।

প্রথমে একটু-একটু ধোঁয়া, তারপর মোষের শিং-এর মতন, তারপর কারখানার চিমনির মতন। আমরা টপাটপ নেমে পড়লুম, ড্রাইভার এসে বনেটটি খুলে ফেললেন। 'যত্র ধূমাৎ তত্র বহ্নি' লজিকের এই সূত্রটিকে সত্যি প্রমাণিত করে হুহু করে জ্বলে উঠল আগুন, ড্রাইভার যুবকটি ব্যাটারি সংলগ্ন তারটি টানাটানি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। এর মধ্যে পথের দু-মুখে অনেকগুলো গাড়ি থেমে পড়েছে। তার মধ্যে একটা বাস এবং তাদের সবগুলির ড্রাইভার এক যোগে নানারকম বিপরীত পরামর্শ দিতে লাগল ও লাগলেন, ব্যাটারির তারটা টেনে ছেঁড়ার সাধ্য হল না কারুরই।

স্ত্রী জাতি সহজেই উদ্বিগ্ন হয়, আর এখানে তো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। স্বাতী শুকনো মুখে বলল, যাঃ! অর্থাৎ আমাদের আর যাওয়া হবে না।

আমি তাকালুম কল্যাণের দিকে। পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা কল্যাণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত মুখে। সে যেন একজন পথের দর্শক, অন্য কারুর গাড়িতে আগুন লেগেছে, সে দেখছে। বেশ সুস্থিরভাবে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে একটি ধরাল। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে কল্যাণকে বেশ নিরীহ দেখায়, প্যান্ট শার্টে তার দৃঢ়-চওড়া চেহারাটা বেশ পরিষ্কার হয়। তখন তাকে মনে হয় বহুযুদ্ধে পোড় খাওয়া একজন সৈনিক।

তার পোড়ার পটপট শব্দ হচ্ছে, আমার ধারণা এক্ষুনি এই পুরো জিপ গাড়িটি দাউ-দাউ করে জ্বলবে, মালপত্রগুলো অন্তত নামিয়ে ফেলা যায় কি না ভাবছি, এই সময় একজন ড্রাইভার একটা ছোট হাত-করাত এনে ব্যাটারির তার কেটে দিতেই আগুনের মূল প্রতাপটা কমে গেল। তারপর জ্বলন্ত তারগুলোকে নেভাবার চেষ্টা।

কল্যাণ রাস্তার পাশে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, দেখেছেন সুনীলদা, এই সময় মাঠ ধানে ভরে যাওয়ার কথা, কিন্তু এবার ভালো করে বৃষ্টিই হল না—

আমি জিগ্যেস করলুম, গাড়িটার কী হবে? কল্যাণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ও ঠিক হয়ে যাবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, গাড়ির বনেটের নীচে যে তারের জঙ্গল থাকে তা অধিকাংশই পুড়ে কালো কালো, এই অবস্থায় গাড়ি চলার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু কল্যাণের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না।

সেই কবে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', তার একটি চরিত্র কাটসিনস্কির কথা মনে পড়ে। যে কোনও পরিবেশের মধ্যে এই ধরনের মানুষ একটুও ঘাবড়ায় না। সবসময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে পারে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কল্যাণ কথা বলে খুব কম, অনেক কথায় উত্তর দেয় শুধু হেসে। ঝাড়গ্রামে ওকে বলেছিলুম, কল্যাণ, অনেকবার তো এদিকে এলুম, কাঁকড়াঝোড়টা একবারও দেখা হল না, স্বাতীরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে, একটা জিপ-টিপ জোগাড় করা যাবে? 'উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আইলিড' যাকে বলে, কল্যাণ বলেছিল, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এ বিষয়ে, কিন্তু কল্যাণ সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জানাল, কাল সকাল দশটা-এগারোটায় বেরিয়ে পড়ব।

ঝাড়গ্রামে এসেছিলুম রাধানাথ মণ্ডলদের গল্প চক্রের অধিবেশনে। সন্তোষকুমার ঘোষ মধ্যমণি। এক সন্ধের ব্যাপার। পরদিন সকালে সন্তোষদা সদলবলে ফিরে গেলেন কলকাতায়, বাংলোয় শুধু স্বাতী আর আমি। এগারোটা বেজে গেল, কল্যাণের পাত্তা নেই। স্বাতী কল্যাণকে আগে দু-একবার মাত্র দেখেছে, সুতরাং সে একটু উতলা হয়ে উঠতেই পারে। সাজপোশাক করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা তৈরি। এখন যদি কল্যাণ এসে বলে, জিপ পাওয়া গেল না—এই ধরনের চিন্তা।

সাড়ে এগারোটায় কল্যাণ এলো, শুধু জিপ নিয়ে নয়। সেই সঙ্গে চাল-ডাল-তেল-নুন-আলু-লংকা-পেঁয়াজ-পাউরুটি-ডিম-মুরগি ইত্যাদি যাবতীয় বাজার করে। কাঁকড়াঝোড়ে কিছু পাওয়া যায় না। এসব কথা কল্যাণ আমাকে একবারও বলেনি। জিপ থেকে নেমে শুধু বলেছিল, কাছেই ফরেস্ট অফিস আপনি ডি এফ ও-র সঙ্গে একটু কথা বলে বাংলোটার বুকিং করে নিন। গেলুম ডি এফ ও-র কাছে। ইনি, শ্রীসুবিমল রায় আমাদের বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরীর সহপাঠী, তা ছাড়া কাঁকড়াঝোড়ে বেশি লোক যায় না, সুতরাং বাংলো রিজার্ভেশানের ব্যাপারে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। সমস্যা যে কিছু হবে না, সবই যেন কল্যাণের আগে থেকে জানা।

ড্রাইভার যুবকটি পোড়া তারগুলো টেনে-টেনে বার করছেন, অন্যান্য ড্রাইভাররা উপদেশের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, আমার মনে হল, এই অবস্থায় এই গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা হবে, আমাদের যাওয়া তো দূরের কথা।

কল্যাণ বলল, ওই জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি!

আমি বললুম, তার মানে?

—যার কাছ থেকে জিপটা এনেছি, তার দুটো জিপ। ভালো, নতুন জিপটা নবগ্রামে চলে গেছে, সেটা পেলে ভালো হত। এটাতেও কাজ চলে যায়।

—কিন্তু এখন কী হবে?

—সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন না!

আমাদের জিপ-চালক অন্যান্য ড্রাইভারদের কারুর কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, কারুর কাছ থেকে প্লাস ইত্যাদি ধার চেয়ে চলেছেন, তারপর শুধু একটা লম্বা তার দিয়ে কীসের সঙ্গে কী জুড়ে দিতেই গাড়ির ইঞ্জিন আবার গ-র-র গ-র করে উঠল। আমি হতবাক। এতগুলো বড় তারের বদলে মাত্র একটি তার?

কল্যাণ বলল। ওই জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ড্রাইভাররা কিছু করতে পারে না। এ একজন মেকানিক। গাড়ির মিস্ত্রি। গ্যারাজে কাজ করছিল, জোর করে তুলে নিয়ে এসেছি।

অর্থাৎ সেই জন্যই কল্যাণের আসতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।

সত্যিই আবার দিব্যি জিপটি চলতে শুরু করল। দহিজুড়ি ছাড়বার কিছু পরেই তরুণ শালের জঙ্গল শুরু হয়। এ রাস্তা আমার বেশ চেনা। এ পথ দিয়ে অনেকবার বেলপাহাড়িতে এসেছি।

আমরা বেলপাহাড়িতে এসে পৌঁছলাম বিকেলের দিকে। গাড়িকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আমরা নেমে পড়লুম কল্যাণের চেনা একজন লোকের বাড়িতে। জিপ-চালক আবার বনেট উঁচু করলেন। এবার ব্যাটারির সঙ্গে তারটি লাগানো হয়েছে খুব আলগাভাবে, যাতে আবার কোনও গণ্ডগোল হলে একটানে খুলে ফেলা যায়।

যাঁর বাড়িতে নেমেছি, তিনি জাতিতে সিন্ধি, চমৎকার মেদিনীপুরের টানে বাংলা বলেন, ইনি একজন বিড়িপাতা ব্যবসায়ী। লক্ষপতি বললে খুব কম বলা হবে, অর্ধকোটিপতি বলাই বোধহয় সঙ্গত। এঁর বাড়িটির ছাদ টিনের, পেছন দিকে দু আড়াই শো মজুর-মজুরনি কাজ করছে। কল্যাণ নিজেও বিড়ি পাতার ব্যাবসায়ে নেমেছিল, বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে পিছু হটে এসেছে। বিড়িপাতা ব্যাবসায়ে যেমন ঝুঁকি, তেমনি লাভ, এরকম জানা গেল, এ অঞ্চলে সিন্ধিরাই একচেটিয়াভাবে এ ব্যাবসা করেছে এতদিন। সরকার আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির হাতে বিড়িপাতার জঙ্গলের ইজারা দিতে চান, কিন্তু যা হয়, সিন্ধি ব্যাবসায়ীদের দক্ষতার তুলনায় কেউ কিছু না। সরকারি উদ্যোগে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয় প্রতি বছর।

চকচকে কাঁসার গেলাসে জল এবং পরে সর-ভাসা বেশি দুধের চা খেয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। বেলপাহাড়ি জায়গাটি সমতল ও পাহাড়ি এলাকার ঠিক সংযোগ স্থলে। যতবার আসি, দেখি যে, বেলপাহাড়িতে মানুষ ও বাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই মানুষ বাড়ছে তো বেলপাহাড়িতেই বাড়বে না কেন?

পাহাড় জঙ্গলে ঢোকবার মুখে একজন ফরেস্ট গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিলুম। কারণ, ঝাড়গ্রামেই ডি এফ ও বলেছিলেন, কাঁকড়াঝোড়ে কয়েকদিন ধরে এক পাল হাতি দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরই ওরা আসে, তবে এবার যেন একটু আগে এসেছে। উত্তর বাংলার হাতিদের মতন এখানকার হাতি তেমন হিংস্র নয়, তবে একেবারে সামনাসামিনি পড়ে গেলে দুষ্টুমি করে জিপটা উলটে দিতেও পারে।

ফরেস্ট গার্ডটির শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা। এমনই রোগা যে ওর কোমরের বেল্টে নিশ্চয়ই নতুন ফুটো করতে হয়েছে। হাতে একটা লাঠি, হাতি সামনে এসে পড়লে এই ব্যক্তি কীভাবে আমাদের সামলাবে?

কল্যাণ বলল, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার খুব ভয়। এ অন্তত রাস্তা চিনবে।

এ কথায় আমাদের জিপ-চালক জানালেন, আমি কাঁকড়াঝোড় সাত-আটবার এসেছি, রাস্তা আমার মুখস্থ।

পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ-দিকে জঙ্গলের মধ্যে পাথুরে রাস্তায় ঢুকতেই বুঝতে পারলুম, কেন, কাঁকড়াঝোড়ে বেশি লোক আসে না। কলকাতা থেকে কতই বা দূর, দুশো-আড়াইশো মাইলের মধ্যে। আজকাল কয়েকটি বেশ স্মার্ট ট্রেন চলে, তাতে আড়াই বা তিন ঘণ্টায় পৌঁছনো যায় ঝাড়গ্রাম। সেখান থেকে মজবুত জিপ পেলে আর তিন ঘণ্টার মধ্যে কাঁকড়াঝোড়। এবং পথ চেনার জন্যও সঙ্গে কারুর থাকা দরকার, কেন-না, বনের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ কিলোমিটার যেতে-যেতে অনেক শাল পথ, তার যে-কোনও একটি ধরে হারিয়ে যাওয়া খুব সোজা।

এ রাস্তা বিপজ্জনক নয়, দুর্গম। প্রায়ই বড়-বড় চড়াই-উৎরাই, মাঝে-মাঝে গর্ত। এক-একবার কোনও গর্তে পড়ে গাড়িটি লাফিয়ে উঠলেই আমি ভাবি, ব্যাটারির তারটা ছিঁড়ে গেল না তো?

*

স্বাতী ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। যদি হাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরে যে-কোনও গাছপালার জটলার দিকে তাকালেই যেন মনে হয়, ওখানে কোনও হাতি ঘাপটি মেরে আছে। কল্যাণের ধারণা পথে হাতি পড়বেই, কারণ সে এদিকে আগে হাতি দেখেছে নিজের চোখে। এক জায়গায় হাতির 'গোবর' পড়ে থাকতে দেখে কল্যাণ বলল, ওই যে এই রাস্তা দিয়েই গেছে। আমি অভিজ্ঞ শিকারির ভাব নিয়ে জানালুম যে, ওটা অন্তত দুদিনের পুরোনো।

কল্যাণের মতে, এই জঙ্গলে বাঘ নেই বটে, কিন্তু নেকড়ে আছে। ডি এফ ও-ও আমায় বলেছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে জিপের পেছনে-পেছনে কখনও-কখনও নাকি কুকুরের মতন কোনও প্রাণীকে ঘাড় নীচু করে ছুটে আসতে দেখা গেছে। যদিও নেকড়ে আজকাল খুবই দুর্লভ। জঙ্গলের নেকড়েগুলোই এখন অ্যালসেশিয়ান হয়ে শহরের অনেক বাড়িতে শোভা পায়।

হাতি কিংবা নেকড়ে কিছুরই দর্শনলাভ ঘটল না। আমরা বাংলোর কাছে এসে পৌঁছলাম বিকেলের ব্রাহ্ম মুহূর্তে। জিপ থেকে নেমেই বললুম, বাঃ।

বাংলোটি এমনই জায়গায়, যেখানে গোল হয়ে ঘুরে তাকালে দেখা যাবে শুধু জঙ্গল-মাখা পাহাড়। এখানে দাঁড়ালে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর এক প্রান্ত সীমায়, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। যদিও দুপুরবেলাতেই আমরা একটা শহরে ছিলাম।

শেষ বিকেলের রক্তাক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বাংলোটি আমাদের মন কেড়ে নেয়। তা বলে এমন নয় যে এর থেকে ভালো বাংলো আমরা আগে কখনও দেখিনি। বস্তুত, ফরেস্ট বাংলোগুলির চেহারা একইরকম হয় প্রায়। তবু এক-একটি সময় আসে, যখন সুন্দরের মধ্যে কোনও তুলনার কথা মনে আসে না, চোখের সামনের বস্তুটিকেই মনে হয় পরম প্রাপ্তি। বড় বড় শাল গাছের মধ্যে একটি কাজুবাদাম গাছ দেখে স্বাতী মুগ্ধ। ও আগে কখনও ওই গাছ দেখেনি।

কল্যাণ জিগ্যেস করল, আপনি চন্দন গাছ দেখেছেন?

স্বাতী তা-ও দেখেনি। কল্যাণ সংক্ষেপে জানাল, কাল সকালে আপনাকে দেখাব!

দেখতে না দেখতেই ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। আমরা বাংলোর মধ্যে ঢুকে ব্যাপৃত ছিলাম পোশাক পরিবর্তনে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কল্যাণ জানাল যে চা, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি তৈরি।

বাংলোর বারান্দায় বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছি, এমন সময় একজন লোক দু বোতল মহুয়া এনে রাখল কল্যাণে পায়ের কাছে। কল্যাণ বোতল দুটি তুলে প্রথমে টোকা দিয়ে টং টং শব্দ শুনল, তারপর ছিপি খুলে দু-তিনবার ঘ্রাণ নিয়ে বলল, হ্যাঁ, খাঁটি জিনিস। আমি হাসলুম।

কল্যাণের ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই। শালের জঙ্গলে এসেছি, মহুয়া তো পান করবই। আমরা পৌঁছনো মাত্রই কল্যাণ ঠিক মনে করে মহুয়া আনতে পাঠিয়েছে। কিন্তু হাসলুম এই জন্য যে, সময়ের কত বিচিত্ররকম খেয়াল। কল্যাণকে আগে যতবার দেখেছি, ওর দুরন্তপনায় হতবাক হয়ে গেছি, ওর শরীরে ও মনে অসাধারণ শক্তি, এক বোতল মহুয়া ও এক চুমুকে শেষ করে দিতে পারে। সারারাত জেগে তাস খেলে, সকালবেলা একটুও না ঘুমিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে, যখন যে জিনিসটা চায় সেটা পেতেই হবে...। সেই কল্যাণ যেন ধীর, শান্ত এবং কিছুদিন আগে তীব্র শ্বাসকষ্টের অসুখ হওয়ায় ও আগামী ন'মাস এক বিন্দুও অ্যালকোহল পান করবে না। ঠিক ন'মাস কেন, তা অবশ্য রহস্যময়।

নিজেই একটি গেলাসে খানিকটা মহুয়া ঢেলে কল্যাণ বলল, আগে একটু টেস্ট করে দেখুন, সুনীলদা! বউদিও একটু চেখে দেখবেন নাকি? দেখুন না খাঁটি মহুয়ার মতন এমন ভালো জিনিস...

*

নিজে পান না করলেও অপরকে পান করাবার ব্যাপারে কল্যাণের উৎসাহ একইরকম আছে। একটু পরে সে মাংস রান্নার ব্যাপারে চৌকিদারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য উঠে চলে গেল।

জঙ্গলটা ডুবে আছে অরব অন্ধকারে। সৌভাগ্যের কথা, আকাশ খুব পরিষ্কার। এত বেশি তারা একসঙ্গে দেখবার জন্যই মাঝে মাঝে অরণ্যে আসা দরকার। আকাশ তার এমন রূপ আর অন্য কোথাও দেখায় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে নক্ষত্র পতন দেখা যায়। নক্ষত্র কিংবা উল্কা, পরিষ্কার চোখে পড়ে, একটা আলোর বিন্দু আকাশ থেকে খসে পড়তে-পড়তে, যেন আকাশের খুব কাছাকাছি এক দীর্ঘকায় শাল গাছের মাথার কাছে এসে নিভে গেল।

কল্যাণ মাংস রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে। একবার সে বলল, বউদি ওই যে দেখুন। ওটা কিন্তু তারা নয়।

আমরা আকাশে দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটা আলোর বিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাচ্ছে, নীচে খসে পড়ছে। সত্যিই সেটা তারা নয়, বিমানও নয়, সেটা কোনও রকেট নিশ্চিত। অসংখ্য রকেট তো এখন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি চোখে তারই একটাকে দেখতে পেয়ে আমরা বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করি।

জঙ্গল আর অরব রইল না, একটু পরে দূরে, বহু দূরে শোনা গেল দ্রিদিম-দ্রিদিম শব্দ। মাদল কিংবা খোল। কিন্তু এমনই আধোজাগা, গম্ভীর সেই শব্দ যে রীতিমতন রহস্যময় মনে হয়। যেন আদিমকালের পৃথিবীতে কেউ কারুর কাছে কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে। আমরা চুপ করে শুনি। নৈশভোজের পর আমরা অন্ধকারের মধ্যে একটু হাঁটতে বেরোলুম। স্বাতী একবার খুব মৃদুভাবে জিগ্যেস করল, এখানে সাপ আছে? কল্যাণ বলল, তা তো থাকতে পারেই।

এবং হাতির দলও কাছাকাছি কোথাও রয়েছে সুতরাং রাত্রে বেশি দূর অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না। এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, এক দিকে আঙুল দেখিয়ে কল্যাণ বলল, ওইখানে আলো দেখতে পাচ্ছেন?

চোখ সরু করে আমরা দেখলুম, জঙ্গলের ফাঁকে, বোধহয় দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, একটা আলোর রেখা, অনেক দূরের।

কল্যাণ বলল, ওই দিকে ঘাটশিলা। কপার মাইনসের আলো।

অর্থাৎ ঘাটশিলায় গিয়ে আমরা দূরে যে পাহাড়ের রেখা দেখি সেই পাহাড়েরই কোনও চূড়ায় আমরা রয়েছি। ঘাটশিলায় কতবার গেছি, কখনও ভাবিনি, দূরের ওই পাহাড়গুলোতে কখনও থাকব। চাঁদে যাওয়ার পর কেউ যদি আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই দ্যাখো, দূরে পৃথিবীতে আলো—অনেকটা সেইরকম বোধহয়। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পাহাড়ের অন্য দিকে কোথাও তখনও দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ সেই গম্ভীর, রহস্যময় মাদালের শব্দ। বোধহয় সারারাতই সেই শব্দ শুনেছিলাম।

অরণ্যে দিন ও রাত্রি সত্যিই আলাদা। সকালবেলা অনেক কিছুই আর রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর থাকে না। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন অরণ্য একটিও নেই, যা সম্পূর্ণ নির্জন। দিনেরবেলা আমি সব জঙ্গলেই মানুষের যাতায়াত দেখেছি। শুধু যাতায়াত নয়, বসতিও।

সন্ধের পর আমরা এই বাংলোটিকে যত নিরিবিলি ভেবেছিলুম, সকালে উঠে দেখা গেল, আসলে ততটা নয়। বাংলোটি টিলার ওপরে, একটু নেমে গেলেই বেশ কিছু কোয়ার্টার, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। এবং জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি গ্রামও রয়েছে। কয়েক জায়গায় চাষ আবাদও হয়। প্রকৃতির শোভা দেখলেই তো চলবে না, মানুষকে তো বাঁচতেও হবে।

সকালের প্রথম চা আমরা পান করলুম বাংলোর পেছন দিকে একটা বেশ উঁচু মিনারের

মতন জায়গায়। এখান থেকে পাহাড়ের গোল মালাটি স্পষ্ট দেখা যায়। অরণ্য সবুজ, কিন্তু সবুজ মোটেই একটা রং নয়, অন্তত সাতরকম সবুজ তো এই এখানেই রয়েছে।

কল্যাণ খুব সন্তর্পণে একটি ঘাস ফুলকে আদর করে। তারপর একটি শাল গাছের গা থেকে খানিকটা আঠা ভেঙে এনে স্বাতীকে বলে, জানেন, এর থেকেই ধূপধুনোর ধুনো তৈরি হয়? স্বাতী জানত না, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্যে ও অবাক হয়ে বলল, ওমা, তাই নাকি?

আমাদের তুলনায় স্বাতীই সবচেয়ে কম বার বন জঙ্গলে এসেছে। ও শাল ও সেগুন গাছের তফাৎ জানে না। ও জানত না যে কুসুম গাছ বলে কোনও গাছ থাকতে পারে, যার ফলের নাম কুসুম ফল, এবং লোকে তাই খায়। কচি অবস্থায় যে গাছের পাতা থেকে হয় বিড়ির পাতা। সেই গাছই বেশ বড় মোটা, আর কালো হয়, তার নাম কেন্দু, তখন আর পাতা কোনও কাজে লাগে না, কিন্তু কেন্দু ফল জঙ্গলের লোকেদের খাদ্য। আমাদের তুলনায় স্বাতীর বিস্ময়বোধ অনেক টাটকা বলে, এই জঙ্গলকে ও উপভোগ করছে বেশি।

কল্যাণ একটা অচেনা গাছের পাতা ছিঁড়ে বলল, দেখুন, কী সুন্দর শেপ, শিরাগুলো কেমন চমৎকারভাবে ছড়িয়ে গেছে—।

প্রতি বছর জঙ্গলের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কাটা কল্যাণের পেশা। কিন্তু ও গাছকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিটি গাছ ওর চেনা, ও জানে, কোন কোন গাছ কাটতে নেই, হঠাৎ-হঠাৎ এক একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ও বলে, দেখুন দেখুন, কী সুন্দর!

কল্যাণের এই পরিচয় আমি আগে জানতুম না। আগে প্রত্যেকবার দেখেছি এক দুরন্ত কল্যাণকে। সেই দুরন্তপনা এবং অনর্গল নেশা করার স্বভাব ত্যাগ করেছে বলে অন্য অনেকদিকে ওর মন খুলে গেছে। ও খালি চোখে আকাশের রকেট দেখতে পায়, দারুণ মুরগির মাংস রান্না করে, গাছের পাতার গড়নে মুগ্ধ হয় এবং আদিবাসীদের জীবন নিয়ে চিন্তা করে। এখন ওর হাতে অনেক সময়।

জঙ্গলে এলে সবচেয়ে ভালো লাগে এইটাই যে কিছুই করবার থাকে না। যতক্ষণ ইচ্ছে চুপচাপ বসে থাকা যায়, অথবা ইচ্ছে করলে যে-দিকে খুশি ঘুরে বেড়ানোও যায়। অলসভাবে সেখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লুম একটা মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে।

স্বাতীর খুব মন্দির দেখার শখ, বিশেষত যদি পুরোনো মন্দির হয়। কল্যাণ ইতিমধ্যেই এই মন্দির সম্পর্কে একটা রোমহর্ষক গল্প শুনিয়েছে। কাল ভৈরবের মন্দির, এককালে নাকি ওখানে নিয়মিত মানুষ বলি হত, এখনও মাঝে মধ্যে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গর্তের মধ্যে একটা বিরাট সাপ আছে, বলির রক্ত সেই সাপটা এসে চুক-চুক করে খেয়ে যায়।

বাংলো থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে চন্দন গাছ দর্শন করলাম। কিছুদূরে কমলালেবুর গাছও লাগানো হয়েছে। চন্দন গাছের পাতায় বা ডালে কোনও গন্ধ নেই, শুনলাম, ওই গাছে সুগন্ধ আসতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর লাগে। শিকড়ে একটু-একটু গন্ধ পাওয়া যায়, তাই কারা যেন মাটি খুঁড়ে খানিকটা শিকড় কেটে নিয়ে গেছে।

এদিকে জঙ্গল অনেক পাতলা। পর পর দুটি মকাই-খেত। তারপর একটি লাল রঙের ঝরনা। হাঁটু জল সেই ঝরনা পেরিয়ে, একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে আবার এলাম একটা সমতল মতন জায়গায়, যার পাশে একটি বেশ ছোট্ট খাট্টো খরস্রোতা নদী, আলগা-আলগাভাবে দাঁড়ানো কয়েকটি বহু পুরোনো বিশাল শাল তরু। তার মধ্যে একটি গাছের গায়ে হাত দিয়ে কল্যাণ বলল, এ গাছটার দাম কম করেও অন্তত দশ হাজার টাকা!

বিস্ময়ে আবার স্বাতীর ভুরু উঠে যায়। সান গ্লাস খুলে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোভাবে গাছটিকে দেখে।

কল্যাণ বলল, তবে এত বড় গাছ না-কাটাই উচিত।

এখানে মাঝে মাঝেই ছোট-ছোট মাটির তৈরি হাতির মূর্তি ছড়ানো। মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা মানত করে গেছে। বাঁকুড়ায় যেমন ঘোড়া, এখানে সেরকম হাতি। তবে, মন্দিরটি আমাদের হতাশ করল। কল্যাণকেও। আগে সে দেখে গিয়েছিল, খুব পুরোনো একটা মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি—তাতে পুরোনো পুরোনো গন্ধ ছিল। এখন তার বদলে ইট-শুরকি দিয়ে একটা বদখত চেহারার মন্দির বানানো হয়েছে।

জায়গাটি অবশ্য সম্পূর্ণ জনশূন্য। মন্দিরের পূজারি-টুজারিও কেউ নেই। মন্দিরের সামনে একটি কাঠগড়া, তাতে এখনও শুকনো রক্ত লেগে আছে। মানুষের রক্ত নিশ্চয়ই নয়। মোষ বলিরই চলন বেশি আদিবাসীদের মধ্যে। মোষের নাম এখানে কাড়া। কল্যাণের মুখে শুনলাম, এখানে কাড়া বলির পর মুণ্ডটা পায় পূজারি, আর বাকি মাংসে ভাগ-যোগ করার উপায় থাকে না। তার আগেই সব লোক ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে যে যতখানি পায় নিয়ে পালিয়ে যায়।

জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত ও আবিষ্ট ধরনের। আমরা তিনজনে তিনদিকে বসে রইলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে কল্যাণ বলল, ভুল হয়ে গেল, একটা মহুয়ার বোতল সঙ্গে আনলে ভালো হত। এটাও ওর নিজের জন্য নয়। আমার জন্য। ওর পূর্ব জীবনের স্মৃতি, এইরকম পরিবেশে একটু একটু মহুয়ায় চুমুক দিলে বেশ জমে। কতক্ষণ বসেছিলাম খেয়াল নেই। কথা বলারও প্রয়োজন হয় না। বড়-বড় শাল গাছগুলো মাথার ওপর ছত্রছায়া বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে-মাঝে উড়ে যাচ্ছে টিয়াপাখির ঝাঁক। এই বনে পাখিদের মধ্যে টিয়ারই প্রাধান্য। মুনিয়া পাখির চেয়েও ছোট একটা পাখির ঝাঁক দেখেছিলাম। আর দূরে কোথাও একটা কুবো ডেকে চলেছে।

সাপটাকে প্রথমে স্বাতীই দেখল। জঙ্গলে আমাদের প্রথম সাপ। খানিকটা যেন অবিশ্বাসের সুরেই স্বাতী বলল, ওটা কী, সাপ না? আমরা থমকে তাকালুম।

সাপটা আমাদের তিনজনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় কী করে কখন এলো বুঝতেই পারিনি। আমরা যেমন অবাক হয়েছি, সাপটাও তার চেয়ে কম অবাক হয়নি। কয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখেই সে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কল্যাণ বলল, চন্দ্রবোড়া!

এটাই সেই মন্দিরের সাপ বলে বিশ্বাস করা যায় না। সাপটি বয়েসে বেশ তরুণ। বহুকাল ধরে এ বলির রক্ত পান করে যাচ্ছে, এ কথা মানতে পারি না, এর পিতৃ-পিতামহ কেউ এ কাজ করলেও করতে পারে। সাপটা এখনও ঝোপের মধ্যেই রয়েছে, সুতরাং এর সংসর্গে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

ফেরার পথে কল্যাণ এক জায়গায় এসে দুঃখিত হল। একটি মাঝ বয়েসি শাল গাছ পরাজিত যোদ্ধার মতন মাটিতে শুয়ে আছে। কোনও কাঠচোর এটিকে কেটেছে, সবটা নিয়ে যেতে পারেনি। ছেঁটে নিয়ে গেছে ডালগুলো। শুয়ে থাকা গাছ দেখলে আমারও কষ্ট হয়। বিশেষত, 'দা সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস' বইটা পড়বার পর থেকে গাছ সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল বদলে গেছে।

আর একটু এগোবার পর আমরা একটি উপহার পেলাম। একটি কাচ পোকা কিংবা টিপ পোকা। সমস্ত বন মাতিয়ে বোঁবোঁ শব্দ করতে-করতে উড়ে এসে সে আমাদের সামনেই একটা নীচু গাছে এসে বসল এবং কল্যাণ অমনি খপ করে ধরে ফেলল সেটাকে। এত বড় টিপ পোকা আমি আগে কখনও দেখিনি। কী অপূর্ব সুন্দর তার রং, উজ্জ্বল নীল ও সোনালি। পাখিদের মধ্যে যেমন

ময়ূর, পোকাদের মধ্যে তেমনি এই টিপ পোকাদের কেন যে এত রঙের সৌভাগ্য, তা কে জানে! মজা এই যে, পোকাটিকে ধরে কল্যাণ ওর বাঁ-হাতের তালুতে উলটো করে শুইয়ে রাখতেই সে দিব্যি গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল। যেন তাকে কেউ দেখছে না।

লাল রঙের ঝরনাটা পার হওয়ার পর আমরা মাদলের শব্দ শুনতে পেলুম। কল্যাণ বলল, কাছেই একটা ছোট গ্রাম আছে, চলুন, সেদিক দিয়ে ঘুরে যাই।

গ্রাম মানে কী। আট-দশটা কাঁচা বাড়ি। তারই একটা বাড়ির মধ্যে একজন লোক মাদল বাজাচ্ছে, আর একজন নাচছে, আর তাদের ঘিরে হাসছে অনেকে। বাজনদার বা নাচুনে, কারুরই শরীর নিজের বশে নেই, পা টলমল, মহুয়ার নেশায় একেবারে চুরচুর। কিন্তু বাজনা বা নাচের উৎসাহ ওদের একটুও কম নয়।

আমাদের খাতির করে একটা খাটিয়ায় বসতে দেওয়া হল।

এই জঙ্গলে তিন জাতের মানুষ থাকে। লোধা বা শবর, তারা এখনও বাউণ্ডুলে, শিকার-টিকার করে খায়, বা দিন মজুরির কাজ করে, চুরির দক্ষতার ব্যাপারেও তাদের সুনাম আছে, কিন্তু তারা চাষবাস জানে না। দ্বিতীয় দল সাঁওতালরা বেশ সুসভ্য, তারা শিকার ও চাষ দুটোই জানে এবং দুপুরবেলা মহুয়া খেয়ে নাচ-গান নিয়ে আনন্দ করতে জানে শুধু তারাও। আর আছে মাহাতোরা, তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল।

এ বাড়িটা যে সাঁওতালদের, তা দেখেই বোঝা যায়। লোকজনের পায়ে-পায়ে ঘুরছে— কয়েকটি একেবারে সদ্যোজাত, একদিন বা দুদিন বয়েসি মুরগির ছানা। ওগুলোকে ঠিক চলন্ত কদম ফুলের মতন দেখায়। একটু দূরে বাঁধা একটা ছাগলও নাচ দেখছে এক দৃষ্টে। স্বাতীর কাছে এ সবই নতুন। আগেকার দিন হলে আমিও মহুয়া খেয়ে ওদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতাম। স্বাতী সঙ্গে রয়েছে বলেই শান্ত, সুশীল হয়ে বসে রইলুম। কল্যাণ আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন মাঝ বয়েসি রমণী মাঝে-মাঝে নাচ চাঙ্গা করবার জন্য একটা গান ধরেছে। বেশ গলাটি। গানের ভাষা কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য নয়, পুরোপুরি বাংলা, পথের মাঝে বৃষ্টি আসিল, বন্ধু আমার বান্ধা পড়িল—এই ধরনের। যে নাচছে এবং ঢোল বাজাচ্ছে, এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন ওই মহিলাটির স্বামী, ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারলুম না, বাজনার তালে ভুল হলে কিংবা নাচুনেটি বেশি ঢলে পড়লে সে বকছে দুজনকেই। নাচুনেটির স্বাস্থ্য চমৎকার, চকচকে কালো শরীরটি ঘামে ভেজা, এত নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে সে কিন্তু একবারও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না। সে যেন আজ সারাদিন ধরে নাচবার জন্য বদ্ধপরিকর। মহিলাটির গানের প্রতি আমি একবার তারিফ জানাতেই সে অপ্রত্যাশিতভাবেই বলল, বাবু, আমার ন'খানা ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ সে যেন জানাতে চায় যে ন'টি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও সে গান গাইতে পারে। এটা একটা জানাবার মতন কথাই বটে।

আমি একটু কৌতুক করে বললুম, পুরোপুরি দশটা হলেই তো ভালো হত।

তার উত্তরে সে উদাসীন গলায় বলল, হয়ে যাবে। দশটাও হয়ে যাবে। এই তো আমাদের একমাত্র সুখ!

স্বাতী আমার দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি করল। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচ দেখার পর আমরা উঠে পড়লুম। একটু দূরে এসেছি, তখন দেখি পেছনে-পেছনে সেই মহিলাটিও আসছে। অযাচিতভাবেই সে বলল, ওটা আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি ওই সামনে। আমার বাড়ি দেখবে না?

বিশেষত সে স্বাতীকে বলল, ও মেয়ে, তুমি আমার বাড়ি দেখবে না?

গেলুম তার বাড়িতে। এর বাড়ির উঠোনটিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে নিকানো। এক পাশের

চালাঘরে একটি ঢেঁকি, তার পাশের খাটিয়ার বসলুম আমরা। মহিলাটি কথা বলতে ভালোবাসে। আমাদের সব বৃত্তান্ত জিগ্যেস করে জানবার পর সে বলল যে তার বড় মেয়ে অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে এসেছে বলে সেই আনন্দের চোটে তার মেয়ের বাপ মহুয়া খেয়ে নাচতে গেছে। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত কৌতুকের, এইভাবে সে হাসতে লাগল খিলখিল করে।

তিন গেলাস কুয়োর জল খেয়ে আমরা উঠে পড়তে যাচ্ছি, তখন মহিলাটি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলল, এ কী, তোমরা চলে যাচ্ছ? খেয়ে যাবে না, আমি যে ভাত চাপাচ্ছি?

আমরাও হতভম্ব। এদের দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সত্যিই বুঝি অসম্ভব। অচেনা কোনও মানুষ বাড়িতে এলে আমরা কোনওদিনই তাকে খেয়ে যেতে বলতে পারব না।

রমণীটি আবার দুঃখিতভাবে বলল, আমার বাড়িতে এসে তোমরা না খেয়ে চলে যাবে?

আমরা অত্যন্ত অপরাধীর মতন, বিনীতভাবে বললুম, আজ নয়, আর একদিন আসব, নিশ্চয়ই এসে খেয়ে যাব।

সে অবিশ্বাসের সুরে বলল, হ্যাঁ, আর এসেছ।

সারাবছর ভাত খাওয়া ওদের কাছে বিলাসিতা। মন্দির থেকে ফেরার পথে একজন স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম, তার কাঁকালে একটি রোগা শিশু। মাথায় এক বোঝা শুকনো ডালপালা আর হাতে দুটি সবুজ পাতায় মোড়া কী যেন। সে স্ত্রীলোকটি বাংলা বুঝতে পারে না, কল্যাণ তার সঙ্গে আদিবাসীদের ভাষায় কথা বলে ঠোঙা দুটি দেখতে চাইল। তাতে আছে কিছু থেঁৎলানো বুনো জাম আর কিছু ব্যাঙের ছাতার মতন জিনিস। কল্যাণ আমাদের বলেছিল, ওইগুলোই ওই মা-ছেলের সারাদিনের খাদ্য। এই জঙ্গলের অনেকে মাটি খুঁজে-খুঁজে এক ধরনের বুনো আলু পায়, তাই খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। অনেকে শাল গাছের ডগার কচি পাতাও সেদ্ধ করে খেয়ে নেয়। আর ওই স্ত্রীলোকটি আমাদের তিনজনকে অকারণে ভাত খেয়ে যেতে বলেছিল। হয়তো, কিছু বিক্রি করে হাতে কিছু ধান এসেছে।

বাংলোয় ফিরে এসে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসলুম। এখান থেকে সেইসব বাড়িঘর কিছুই দেখা যায় না। শুধু দিগন্ত ছোঁয়া জঙ্গল আর পাহাড়। চোখকে আরাম দেওয়া প্রকৃতি। এরই মধ্যে মধ্যে রয়ে গেছে ক্ষুধার্ত মানুষ, আবার দুপুরবেলা নেশা করে নাচবার মতন মানুষ, অতিথি সেবার জন্য ব্যাকুল মানুষ। কয়েকটি ক্ষুধার্ত, অসহিষ্ণু হাতিও ঘুরছে কাছাকাছি।

কল্যাণ টিপ পোকাটাকে পাতায় মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে একটা প্যাকেট বানিয়ে নিয়েছিল। সেই প্যাকেটটা বারান্দার ওপর রাখতেই পাতার একটু অংশ কেটে টিপ পোকাটি মুখ বার করল। বেশ কৌতূহলী চোখ দিয়ে দেখতে লাগল আমাদের।

স্বাতী বলল, ওটাকে ছেড়ে দিন। পোকাটাকে মেরে টিপ পরবার ইচ্ছে আমার নেই। কল্যাণেরও সেইরকমই ইচ্ছে। পাতাটা খুলে সে পোকাটাকে হাতে করে উড়িয়ে দিল। টিপ পোকাটা বোঁ শব্দ করে দু-পাক ঘুরল, আমাদের মাথার ওপরে, তারপর দুর্দান্ত গতিতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

বাঘের দেশে বাঘের গল্প

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, যদি বলি, আমার বুকে বাঘের পায়ের ছাপ আছে, কেউ বিশ্বাস করবেন?

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করল না, সবাই এমনভাবে চক্ষু অবনত করল যেন এই নিস্তব্ধ, নিমীল

সন্ধ্যায় আমি কোনও অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে এসব কথা মানায় না।

আমি আবার বললুম, সত্যিই বলছি কিন্তু, ইয়ার্কি নয়। একবার একটা বাঘ দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছিল আমার বুকে।

এবার শ্রোতারা চক্ষু তুলল। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স্ক কিশোর মাঝিটি জিগ্যেস করল, সার্কেসের বাঘ, বাবু?

কথা হচ্ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশাল চওড়া নদী বক্ষে একটি খোলা নৌকোর ওপর। বেরিয়েছিলুম সারাদিনের জন্যে, এই নৌকোর ওপরেই খিচুড়ি ভোগ হল, রান্না করলুম নিজেরাই। আর এমন খিচুড়ি জীবনে খাইনি, কী অমৃতের মতন স্বাদ! আমার সঙ্গে আমার এক কলকাতার বন্ধু, তার এক স্থানীয় বন্ধু, একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ছাড়া বাকি এই তিনজনেরই সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের, এই অঞ্চলের অনেক কিছুর খবরাখবর রাখেন। মাঝিদের মধ্যে একজনের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনও জায়গায়, রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া-ভেজা লোহার মতন গড়া-পেটা শরীর, মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। আর একজন ওই পূর্বোক্ত কিশোর।

সুন্দরবনে এলেই বাঘের কথা মনে পড়ে। এর আগে কয়েকবার লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে গেছি, কিন্তু সে শুধু প্রকৃতি দেখা। এবারে এসে আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। যার পাশের গ্রামেই একটি ছটকে আসা বাঘ ধরা পড়েছে কিছুদিন আগে। সে বাঘটিকে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়, তার নাম দয়ারাম। আমি এখানে এসে পৌঁছবার পরের দিনই নদী সাঁতরে মোল্লাখালিতে এসে উঠেছিল একটা বাঘিনী, গ্রামের লোকজন সেটাকে ঘিরে রেখেছিল, ভেবেছিলুম সেটাকে দেখতে যাব, বিকেলেই খবর পেলুম ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতির তোয়াক্কা না করে সেটিকে মেরে ফেলেছে। সুন্দরবনে ভগবানের চেয়েও বাঘের কথাই বেশি স্থান পায় আলাপচারিতে।

এবারে নৌকোয় বেরিয়ে বুঝলুম, লঞ্চ-ভ্রমণের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই হয় না। নৌকোয় বসে নদীকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, দুপাশের জঙ্গলকে আমরাই শুধু দেখি না, জঙ্গলও আমাদের দেখে।

বাঘ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের শহুরে কৌতূহল আছে। সেইজন্য আমি বারবার সবাইকে জিগ্যেস করেছিলুম, আপনারা কেউ বাঘ দেখেননি? নিজের চোখে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার নৌকোর সহযাত্রীরা সবাই নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। এরা সবাই সুন্দরবনের নাড়ি নক্ষত্র জানে, এতদিন এখানে রয়েছে, অথচ কখনও বাঘ দেখেনি! আমি বাঘ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর একাধিক গল্প শুনব আশা করেছিলুম। বেশ নিরাশ-নিরাশ লাগল। তখন আমি শুরু করলুম এক লোমহর্ষক কাহিনি।

কিশোর মাঝিটির প্রশ্ন শুনে আমি পালটা প্রশ্ন করলুম, ধরো যদি সার্কাসের বাঘই হয়। একটা সার্কাসের বাঘ যদি তোমাকে বুকে পা তুলে দাঁড়ায়, তুমি ভয় পাবে না?

ছেলেটি হেহে করে হাসতে লাগল। ইস্কুল মাস্টার এবার জিগ্যেস করলেন আপনি সত্যিই সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

আমি বললুম, না। বাঘের থেকেও আমি শত হস্ত দূরেই থাকাই ভালো মনে করব। পাকে চক্রে একবার আমি সত্যিই একটা মস্ত বড় কেঁদো বাঘের খপ্পরে পড়েছিলুম। ব্যাপারটা হয়েছিল উড়িষ্যার যোশীপুরে—।

আমার কলকাতায় বন্ধুটি যার নাম শিবাজি, সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ও খৈরি?

নৌকোর অন্যান্য সুন্দরবনবাসী সঙ্গীরা কেউ খৈরির নাম শোনেনি। এদিকের লোকের সঙ্গে খবরের কাগজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বড়-মাঝি জিগ্যেস করল, খৈরি কী দাদা?

রায়মঙ্গল নদী ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের দিকে। ডান দিকে দত্ত ফরেস্ট, সেখানে

বাঘ নেই খুব সম্ভবত। বাঁ-দিকের জঙ্গলটা বাঘের এলাকা বলে নির্দিষ্ট, আমরা চলেছি সেই ধার ঘেঁষেই। একটা জায়গায় নদীর জল খানিকটা খাঁড়ির মতন ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, সেখানটার নাম কালীর চর, সেখানে হাজার-হাজার হাঁস এসে বসে। আমাদের গন্তব্য সেইদিকেই। সেখানে বাঘের উপদ্রবের ভয় আছে, আমরা কেউ শিকারি নই। সঙ্গে অস্ত্রও নেই, দূর থেকে পাখিগুলি দেখে আসাই উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে আমি জমিয়ে বাঘের গল্প শুরু করলুম।

অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে সুখকর ছিল না মোটেই, খানিকটা হাস্যকর হলেও হতে পারে।

সেবারে যাওয়ার কথা ছিল সিমলিপাল জঙ্গলে। কলকাতা থেকে ট্রেনে বারিপদা, সেখান থেকে আবার একটা গাড়ি কোনও ক্রমে জোগাড় করে যোশীপুর। অবশ্য সিমলিপাল যাওয়ার জন্য এত ঘুরপথে যাওয়ার কোনও দরকার হয় না, কিন্তু আমাদের ভ্রমণটাই উলটোপালটা। যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা জিপ নিয়ে ঢুকব জঙ্গলে, সেই অনুযায়ী যোশীপুরে বাংলো বুক করা ছিল। কিন্তু তখন খৈরির কথা মনেই পড়েনি।

যোশীপুর বাংলোর কম্পাউন্ডও মস্ত বড়, মনে হয় যেন বাংলোর পেছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ঘরগুলোর সামনে বেশ বড় একটি ঢাকা বারান্দা। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢোকার পরই দেখলুম, একটু দূরে গাছপালার মধ্যে ঘুরছে একটা হলুদ-কালো ডোরাকাটা কী যেন। সত্যিই একটা বাঘ! আমরা এসে গেলে বারান্দাটায় বসতে না বসতেই বাঘটা চলে এল সেখানে। ডি এফ-এ শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সেখানে বসে বন-কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, সংক্ষেপে আমাদের জানালেন ভয় পাবেন না। ও কিছু করে না!

বাঘটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। আমাদের মধ্যে কারুকে তার পছন্দ হবে কি হবে না, কে জানে! আমি বড় সাইজের কুকুরও সহ্য করতে পারি না। কারুর বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকলে সে বাড়িতে পারত পক্ষে যাই না। আমি লক্ষ করেছি, যাদের অ্যালসেশিয়ান থাকে, তারাও ঠিক ওই ভাবেই বলে, "ভয় পাবেন না! ও কিছু করে না।" কিছু করে না মানে কী, কাছে এসে গন্ধ শুঁকবেই বা কেন?

একটু বাদে বাঘটা আবার বাগানে চলে গেল। আমরা চলে এলুম আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে। জামাকাপড় ছাড়ব কি না ভাবছি, হঠাৎ শুনি জানালার কাছে মৃদু গর্জন। এবং বাঘের মুখ। বাঘটা জানলা দিয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল, তারপরই ঢুকে এল আমাদের ঘরে। তার আগেই আমরা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু একজন মহিলা (পরে জেনেছি, তাঁর নাম নীহার চৌধুরী) বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করবেন না। ও বন্ধ-দরজা দেখলে রেগে যায়। একটা বাঘকে খুশি করার জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করবে, এটাই বা কেমন কথা! সারা ঘরে বাঘ-বাঘ গন্ধ! আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম তাড়াতাড়ি। আবার এসে বসলুম বারান্দায়। যোশীপুরের এই বাঘটি সাধারণ বনের বাঘের চেয়েও আয়তনে অনেক বড়। একে রোজ আট কেজি মাংস ও এক টিন আমূল গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। বনের বাঘ রোজ এত খাবার পাবে কোথায়? এর পেটে চর্বি থলথল করছে। বারান্দায় বসে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর পালিতা কন্যা এই খৈরির বিষয়ে নানান কাহিনি শোনাতে লাগলেন। আমরা গল্প শুনছি বটে, কিন্তু আমাদের সকলের চোখ লক্ষ রাখছে বাঘটা কত দূরে। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর দলের মধ্যে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সে ওই খৈরির বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি ছোটদের বই লিখে ফেলেছে। সুতরাং তার ভয় পেলে চলে না। শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গেও তার আগে থেকে চেনা, সুতরাং ওই সব গল্প সে-ই উপভোগ করতে লাগল বেশি।

এরপর শুরু হল বাঘের ভোজন পর্ব। বাগানে এক জায়গায় ধপাস করে শুয়ে পড়ল

খৈরি, আর মা যেমন নিজের শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেয়, সেই ভাবে শ্রীমতী চৌধুরী ওর মুখে মাংস পুরে দিতে লাগলেন। কিন্তু বাঘ একজায়গায় বেশিক্ষণ বসে খায় না। এক-এক গেরাস মুখে দিয়েই সে উঠে পড়ছে, চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে, অনেক সাধ্য সাধনা করে ডেকে আনা হচ্ছে তাকে।

এক সময় বাঘটা হঠাৎ উঠে এল বারান্দায়, এবং নিমাই নামে আমাদের এক বন্ধুর বাঁ-হাতের কনুই শুদ্ধু অনেকখানি মুখে ভরে নিল। এবার একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের বাঁ-হাতখানা চিরতরে বাঘের পেটে চলে যাবে। বাঘটার হঠাৎ এরকম অদ্ভুত মতিগতির কারণ কী? ওর কি মোষের মাংস পছন্দ হয়নি বলে ও টাটকা মাংসের সন্ধানে এসেছে? ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথারীতি বললেন, ভয় পাবেন না, ও কামড়াবে না!

ভয়ে মানুষের চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার কথা শুধু বইতেই পড়েছিলুম, এবার স্বচক্ষে দেখলুম। নিমাইয়ের মাথার সবকটা চুল সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে, কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বলল, ওকে সরিয়ে নিন, নইলে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাব! ভয়ের চোটে নিমাই আমির বদলে আমরা বলে ফেলেছে। আমরা সশঙ্ক চিত্তে অথচ খানিকটা হাসতে-হাসতেও, দেখতে লাগলুম ওকে। এই হাসির শাস্তি আমি পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই।

বাঘটা নিমাইকে ছেড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে গজরাতে লাগল। বাঘের ডাকের সঙ্গে মানুষের জন্ম জন্মান্তরের ভয়ের সম্পর্ক। পোষা বাঘ হোক আর যাই হোক, এরকম ডাক শুনলে বুক আপনিই কেঁপে ওঠে।

বাঘটা এবার চলে এল সোজা আমার দিকে। তারপর সে আমার ডান দিকের বগলের মধ্যে টুঁ মারতে লাগল। যেন সে আমার বগলের মধ্যে অতবড় মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমি অসহায়ভাবে তাকালুম শ্রীমতী নীহার চৌধুরীর দিকে। তিনি স্নেহের হাসি দিয়ে বললেন, ও কিছু না। ও ঘামের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। তখন ঘাম মানে কী। আমার সারা শরীর দিয়ে কুলকুল করে ঘামের নদী বইছে!

বাঘটা আর একবার টুঁ মারতেই আমি অটোমেটিক্যালি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটাও দাঁড়িয়ে দুটো থাবা রাখল আমার বুকে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি জীবনে কখনও ভুলব না। আমার শরীরের ওপরে একটা বিরাট কেঁদো বাঘ, আমার চোখের সামনে ওর জ্বলন্ত চোখ, সেই অবস্থায় বাঘটা ফ-র্-র্-র করে থুতু ছেটাল, সেই থুতুতে ভিজে গেল আমার মুখ ও জামা। ওরই মধ্যে আমি ভাবলুম, বাঘটা যদি আমায় না-ও কামড়ায়, আমি যদি বাঘটাকে শুদ্ধু মাটিতে পড়ে যাই, তাহলে ওর অতবড় দেহের ভারেই আমি ছাতু হয়ে যাব। শ্রীমতী চৌধুরী বারবার বলতে লাগলেন, ভয় পাবেন না, নড়বেন না, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিন। কিন্তু হাত তোলার সাধ্য আমার নেই, আমার সারা শরীর অসাড়। আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কি না তা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে ওই অবস্থায় আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম।

ইতিমধ্যে 'খৈরি, আমার খৈরি' গ্রন্থের প্রণেতা শক্তি আমার পাশ থেকে সুট করে উঠে গিয়ে সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। নিমাই বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকব, তবু ওর মধ্যে আর যাব না। আমাদের দলনেতা পার্থসারথি চৌধুরী বলল, নাঃ, ওই বাঘের সঙ্গে রাত্রিবাস করা মোটেই কাজের কথা নয়। চলো, এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাই। তাই হল, আমরা রওনা দিলুম সেই দণ্ডেই। গল্প বলা শেষ করে আমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললুম, এই যে ঠিক এই জায়গায় বাঘটা তার থাবা রেখেছিল।

শ্রোতারা সবাই চুপ। একটু পরে বড় মাঝিটি শুধু খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে

বলল, শখ করে কেউ বাঘ পোষে? থুঃ। ওটাকে মেরে ফেলে না কেন?

আমি বললুম, মারবে কী? ওই বাঘটা খুব বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর অনেক পত্রপত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

বড়-মাঝি আবার নদীর জলে থুতু ফেলল। টাইগার প্রজেক্টের জন্য সুন্দরবনে বহু টাকা খরচ করে কতরকম বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার যতজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সকলেই বাঘকে শত্রু বলে মনে করে, এবং তাদের মতে বাঘ নামক প্রাণী জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনও প্রয়োজন নেই।

আস্তে-আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কালীর চরের বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। খাড়ির মধ্যে অনেক হাঁসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বটে, কিন্তু আলো কমে আসায় আর ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। আমি আর একটু ভেতরে যাওয়ার কথা বললুম, কিন্তু মাঝি বা অন্য কেউ রাজি হল না। একটু পরেই ভাটা শুরু হলে ফেরা মুশকিল হবে। তা ছাড়া জায়গাটা ভালো নয়। এই বনে বাঘ আছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় ডাকাতের। আমি বললুম, আমাদের কাছে তো টাকাপয়সা কিছু নেই, ডাকাত আমাদের কী করবে? মাস্টারমশাই বললেন, এখানকার ডাকাতদের ব্যাপার আপনারা জানেন না। কিছু না পেলে ওরা জামাকাপড় খুলে নেয়। আপনি যে প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, তার দামও তো কিছু না হোক সত্তর আশি টাকা। আর এই নৌকাটা, এরও তো দাম আছে। জামা-প্যান্ট খুলে নিয়ে ওরা লোককে এই জঙ্গলের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়।

আমি পাশের জঙ্গলের দিকে তাকালুম। দিনের বেলা দেখতে চমৎকার লাগছিল। এখন অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সেই জঙ্গলের দিকে তাকাতেই গা ছমছম করছে। নগ্ন অবস্থায় রাত্রিরবেলা এই জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা মোটেই উপাদেয় চিন্তা নয়।

সকলেরই মত হল, তা হলে এবার ফেরা যাক। কিন্তু খুব নির্বিঘ্নে ফেরা গেল না। একটুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল ভাটার টান, এখন উলটো দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদের নৌকো একটা চরে আটকে গেল। জোয়ার আসবে ঘণ্টাদেড়েক বাদে।

আমাদের নৌকোটা অবশ্য জঙ্গলের খুব কাছে নয়। কোনও বাঘ হঠাৎ এক লাফে নৌকোর ওপর পড়তে পারবে না, সাঁতরে আসতে হবে। এই নদীর জলেও খুব কামঠের উপদ্রব, এবং কুমীর প্রকল্পের উদ্যোগে কিছুদিন আগেই এই নদীতে চল্লিশটি কুমিরের বাচ্চা ছাড়া হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। জঙ্গলের দিকে তাকাতেই মনে হয়, একটা বাঘ বুঝি আমাদের একদৃষ্টে দেখছে। খুবই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জঙ্গলে জোনাকিও জ্বলে না। কিন্তু বাঘের চেয়ে ডাকাতের কথাই আমার মনে পড়তে লাগল বেশি।

বড়-মাঝিকে আমি আবার জিগ্যেস করলুম, আপনি এতদিন সুন্দবনের নদীতে নৌকো চালাচ্ছেন, সত্যিই কখনও বাঘ দেখেননি?

বড়-মাঝি বললেন, না।

তারপর যেন একটু ধমকের সুরেই আমায় আবার বলল, বাবু একটু চুপ করেন তো। অথবা এই সময়টা আপনি একটু ঘুমিয়ে লিন বরং।

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। এই ভর সন্ধেতে হঠাৎ আমি ঘুমোতে যাব কেন? তবে নৌকোর অন্য-অন্য আরোহীদের মধ্যে যেন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। অগত্যা আমিও চুপ করে গেলুম।

এক সময় নৌকোর তলায় জলের কলকল শব্দেই টের পাওয়া গেল জোয়ার এসেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই যেন এক সঙ্গে জেগে উঠল। নৌকো চলল আবার। রাত সাড়ে দশটায় আমরা

ফিরে এলুম আমাদের গ্রামের কাছে।

জেটিতে নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসার পর বড়-মাঝি বলল, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিগ্যেস কচ্ছিলেন না? এই দ্যাখেন। টর্চটা মেরে দ্যাখেন।

এই বলে সে জামাটা তুলে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। টর্চের আলোয় দেখলুম, তার পিঠে গভীর ক্ষত। খুব বেশি পুরোনোও মনে হল না।

মাস্টারমশাই বললেন, ওর কী কড়া জান্, বাঘ কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরও বেঁচে উঠেছে।

বড়-মাঝি দম্ভ করে বলল, আমারে খাবে, এমন বাপের ব্যাটা বাঘ আজও জন্মায়নি, বোঝলেন! মাস্টারমশাই বলল, ও বাঘের গুনিন। সবাই ভাবে, সেই জন্যই বাঘে ধরার পরও বেঁচে উঠেছে। ওদের মুখ থেকে আরও শুনলুম, এই মাঝি তার এই নৌকো নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যায় বেআইনি কাঠ কাটতে। সুন্দরবনের অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে কাঠ জড়িত। একবার নয়, মোট পাঁচবার, ওই মাঝি দলবল নিয়ে বাঘের সামনে পড়েছে, তবু আবার যায়। ডাকাতের পাল্লায়ও পড়েছে অনেক বার। অন্য বন্ধুটিও বলল, দীনেশ নামে একটি ছেলে তার বাড়িতে কাজ করত, মাত্র মাসখানেক আগে সে এইরকম একটি কাঠ কাটার দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি।

এদের সকলেরই বাঘ বা ডাকাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নৌকোর ওপর বসে আমি যখন এদের কাছ থেকে দু-একটা ঘটনা শুনতে চাইছিলুম, তখন সবাই চুপ করেছিল কেন?

মাস্টারমশাই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, জঙ্গলের কাছে বাঘের এলাকার মধ্যে গিয়ে বাঘের গল্প করা তো দূরের কথা, কেউ বাঘের নামও উচ্চারণ করে না। ওই প্রসঙ্গ তুলে আমিই ভুল করেছিলুম।

সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।

রাশিয়া ভ্রমণ

মস্কো বিমানবন্দরে পা দিলুম খুব ভোরবেলায়। সারা রাত প্রায় জেগেই কাটাতে হয়েছে। কলকাতা থেকে এরোফ্লোট বিমানে চেপেছিলুম বিকেলবেলা, তারপর বোম্বে, করাচি আর তাসকেন্টে বিমানটি মাটি ছুঁয়েছিল, আমাদেরও নামতে হয়েছিল দুবার। তার মধ্যে শেষ রাতে তাসকেন্টে নেমে আমি ঝোলা থেকে একটা সোয়েটার বার করে পরে নিয়েছিলুম। রাশিয়ার ঠান্ডা সম্পর্কে অনেকেই ভয় দেখিয়েছিল আগে থেকে, কিন্তু আমি খুব একটা শীত-কাতুরে নই, তা ছাড়া কিছুদিন আগেই ডিসেম্বর-জানুয়ারির ক্যানাডার তুষারের রাজ্য ঘুরে এসেছি, সুতরাং মে মাসের রাশিয়াকে ডরাব কেন? অবশ্য সঙ্গে একটা পাতলা ওভারকোটও এনেছি।

বিমানে রাত্তিরটা বেশ গল্প-গুজবেই কেটে গেছে। সহযাত্রী পেয়েছিলুম দুই বাঙালি তরুণকে। একজনের নাম সুবোধ রায়, সে মস্কোতে আছে প্রায় সাত-আট বছর, উচ্চশিক্ষার্থে। কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ছুটি কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার। সুবোধ খুব দিলদরিয়া ধরনের, উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অন্যজনের নাম অসিতবরণ দে, সে প্রায় চোদ্দো বছর বাসে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে কলকাতা-দর্শনে এসেছিল। সে একটু চাপা ও লাজুক স্বভাবের। আমরা তিনজনে মিলে মস্কো-প্রাহা-কলকাতার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আড্ডা দিয়ে যাচ্ছিলুম। সঙ্গে থেকে মাঝেমধ্যেই আমাদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করা হচ্ছিল, বিমানযাত্রার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই বোধহয় ওরা অত ঘন ঘন খাবার দেয়, কিন্তু অত কি খাওয়া যায়? শেষবারের খাবার আমি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলুম।

মস্কোয় নামার পর অসিতবরণ দে চলে গেল ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে, আমি আর সুবোধ পাশপোর্ট হাতে করে এগোলুম নিষ্ক্রমণের পথে।

সুবোধ জিগ্যেস করল, আপনাকে কি কেউ নিতে আসবে?

আমি বললুম, সেই রকমই তো কথা আছে। কিন্তু এত ভোরে...

সুবোধ বলল, কেউ না এলেও ক্ষতি নেই, আমি তো আছি। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

মস্কো বিমানবন্দরটি বিশাল, কিন্তু প্রায় নিঝুম। এত সকালে একটিই মাত্র ফ্লাইট এসেছে। ইমিগ্রেশান ও কাস্টমস বেরিয়ার পার হওয়া মাত্রই একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছিপছিপে যুবক আমার কাছে এসে পরিষ্কার ইংরিজি উচ্চারণে আমার নাম বলে জিগ্যেস করল, আপনিই কি তিনি?

আমি হ্যাঁ বলতেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমার নাম সারগেই স্ত্রোকান, আমি আপনার জন্যই এসেছি।

এত লোকজনের মধ্যে সে প্রথমেই আমাকে চিনল কী করে? খুব সম্ভবত ছবি দেখে সে আমার চেহারাটা মুখস্থ করেছে। আমি তার সঙ্গে সুবোধ রায়ের আলাপ করিয়ে দিলুম।

সারগেই স্ত্রোকান একটা ঠেলাগাড়ি জোগাড় করে এনে তাতে আমাদের বাক্স-প্যাটরাগুলো চাপাল। তারপর সেটা নিয়ে এগোবার চেষ্টা করতেই উলটে পড়ে গেল সবকিছু। সারগেই স্ত্রোকান লজ্জা পেয়ে সংকুচিতভাবে বলল, আমি খুব দুঃখিত, আমি কোনওরকম গাড়িই ঠিকঠাক চালাতে পারি না।

তাতে আমি খুব আশ্বস্ত বোধ করলুম। যে-খুব তুখোড় ধরনের লোক সবকিছুই নিখুঁতভাবে করতে পারে, কখনও যাদের জীবনে নিজস্ব ভুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার অবকাশ ঘটে না, সেই সব মানুষদের আমি বেশ ভয় পাই। এবারে আমরা তিনজনেই হাত লাগিয়ে গাড়িটিকে নিয়ে এলুম বিমানবন্দরের বাইরে। একটা ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র তোলা হল।

এবারে আমি ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলুম। খুব যে শীত করছে তা নয়। জানলা দিয়ে আমি উৎসুকভাবে দেখতে লাগলুম বাইরের দৃশ্য।

যে-কোনও নতুন দেশে এলেই প্রথমটায় একটা রোমাঞ্চ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কৌতূহল, আগ্রহ পুষে রেখেছি কতদিন ধরে। আমরা একটা দেশকে সবচেয়ে ভালো করে চিনি তার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এই সেই টলস্টয়, পুশকিন, ডস্টেয়ভ্স্কি, গোর্কি, মায়াকভ্স্কি-র দেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একটি দেশে প্রোলেতারিয়েতরা শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, এই দেশটি দেখবার জন্য আমি অনেকদিন থেকেই ব্যগ্র হয়েছিলুম, অকস্মাৎ আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই পুলকিত বোধ করেছি।

আমি পূর্ব ইউরোপের কোনও দেশেই আগে আসিনি। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের কতটা তফাত তাও দেখতে চাইছিলুম। এখন অবশ্য সেরকম কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বিমানবন্দর থেকে মস্কো শহর বেশ দূরে, এখন পথের দু-পাশে শুধুই উন্মুক্ত প্রান্তর, মাঝে-মাঝে গাছপালা। আজ এপ্রিল মাসের শেষ দিন, কিন্তু শীতের চিহ্ন এখনও মুছে যায়নি, এখানে সেখানে চোখে পড়ে বরফ-গলা জল।

রাস্তার পাশে একটি ভাস্কর্যের দিকে হাত দেখিয়ে সুবোধ বলল, এই পর্যন্ত হিটলারের বাহিনী এসে থেমে গিয়েছিল।

আমি চমকে উঠলুম। মস্কো নগরীর আশেপাশে কত ঐতিহাসিক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে এই অঞ্চলে কী সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল, সারা পৃথিবী আতঙ্কে ভেবেছিল মস্কো বুঝি যায়-যায়, শেষ পর্যন্ত রেড আর্মির বীরত্বের কাছে দারুণভাবে হেরে যায় নাতসিরা। আজ তার আর কোনও চিহ্নই নেই। কয়েকটি বলিষ্ঠ পুরুষের মূর্তি আকাশের দিকে মুঠি তুলে আছে। তার পেছনেই বড়-বড় গাছ, নিঃশব্দ।

মস্কো শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে মস্কোভা নদী। এমন কিছু বড় নদী নয়। সেই নদী পেরিয়ে পৌঁছে গেলুম আমার জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে। এটির নাম হোটেল ইউক্রাইনিয়া। এর ভবনটি যেমন প্রকাণ্ড তেমনি জমকালো ধরনের। নীচের দিকটা অতি প্রশস্ত, তার পর ধাপে-ধাপে ছোট হতে-হতে ওপরের দিকে উঠেছে। একেবারে চূড়োর কাছটা গির্জাশীর্ষের মতন। অবিকল এই এক ডিজাইনের বাড়ি মস্কো শহরে চার-পাঁচটি আছে, অনেক দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুবোধ রায় এখান থেকে বিদায় নেবে, তাকে যেতে হবে আরও খানিকটা দূরে। সে সেরগেই স্ট্রোকান-কে জিগ্যেস করল, আপনাদের কী প্রোগ্রাম বলুন? আমরা এখানকার বাঙালিরা সুনীলদাকে নিয়ে কয়েকদিন বসতে চাই।

সেরগেই স্ট্রোকান বলল, তা তো সম্ভব হবে না। আমরা ওঁকে ডেকে এনেছি, আমাদের প্রত্যেকদিনের ঠাসা প্রোগ্রাম আছে। তার মধ্যে তো সময় করা যাবে না। আপনারা ইন্ডিয়াতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

কিন্তু সুবোধ এত সহজে কিছু মেনে নেবার পাত্র নয়।

সে বলল, সন্ধের পর তো আপনাদের আর কিছু করবার থাকবে না। তখন আমরা এসে ওঁকে নিয়ে যাব, আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব। আজকের দিনটা থাক, কাল সন্ধেবেলা আমি এসে—

সেরগেই স্ট্রোকান বলল, কাল দুপুরেই আমরা লেনিনগ্রাড চলে যাচ্ছি।

যাই হোক, ঠিক হল যে নানা জায়গায় ঘুরে আমি আবার দিন দশেক বাদে ফিরে আসব

মস্কোতে। তখন এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হবে। সুবোধ আমাদের দু'জনকেই তার কার্ড দিল, যাতে ফিরে এসেই আমরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।

হোটেলের ভেতরে এসে পাসপোর্ট জমা দিয়ে নামটাম লেখাতে খুব বেশি সময় লাগল না। আমার জন্য ঘর নির্ধারিত হল সতেরো তলায়। হোটেলের লাউঞ্জটি পুরোনো আমলের মতন বেশ জমকালোভাবে সাজানো। খুব উঁচু সিলিং, আলোগুলো ঝাড়-লণ্ঠনের মতন। লিফটটি দেখেও আমি চমৎকৃত হলুম, একেবারে আদিকালের ঢাউস লিফট, পেতলের কারুকার্য করা দরজা, ভেতরে অন্তত জনা কুড়ি লোক অনায়াসে এঁটে যায়। এ-রকম লিফট আমি আগে দেখেছিলুম রোমের ভ্যাটিকানে।

সুটকেস সমেত আমাকে আমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেরগেই স্ট্রোকান বলল, আপনি এখন একটু বিশ্রাম নিন। আমি আবার সাড়ে নটার সময় আসব।

ওভারকোট ও জুতো-মোজা খুলে ফেললুম তাড়াতাড়ি। বেশিক্ষণ মোজা পরে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে। সেই গতকাল দুপুর থেকে এসব পরে আছি। খালি পায়ে এসে দাঁড়ালুম জানলার ধারে। একটু দূরেই নদী। এই নদীর দু-পার আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। জানলার কাচ খুলে বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে টাটকা হাওয়া বুকে টেনে নিলুম অনেকখানি। একটা গভীর বিস্ময়বোধ এখনও আমাকে আপ্লুত করে আছে। সত্যি আমি রাশিয়াতে এসেছি!

মাত্র সাতটা বাজে। কলকাতায় এ সময় ঘুম থেকেই উঠি না। দীর্ঘ বিমানযাত্রা ও রাত্রি জাগরণ সত্ত্বেও শরীরে কোনও ক্লান্তি বোধ নেই। ইচ্ছে করলে এখন ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। ধপধপে সাদা চাদর পাতা নরম বিছানায় শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু একটা নতুন দেশে এসেই কি ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব?

ঘরখানি যে-কোনও দেশের দামি হোটেল ঘরের মতন। টিভি, টেলিফোন, রাইটিং টেবল, ড্রেসিং টেবল, এক পাশে ওয়ার্ডরোব ও সংলগ্ন বাথরুম। উঠে টিভি চালিয়ে দিলুম। রুশ ভাষা এক বর্ণ বুঝি না। মনে হল খবর পড়া হচ্ছে। তার মধ্যে এক জায়গায় ইন্দিরা গান্ধির নাম শুনে চমকে উঠলুম। কী হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির? তারপর শুরু হল বাচ্চাদের জন্য অনুষ্ঠান।

আধ ঘণ্টা শুয়ে থেকেও বুঝলুম ঘুম আসবার কোনও আশা নেই। তার চেয়ে বরং দাড়ি কামানো, স্নান ইত্যাদি সেরে ফেলা যাক। এইসব পর্ব চুকিয়ে, পোশাক পালটিয়ে আমি ফিটফাট হয়ে আবার দাঁড়ালুম জানলার ধারে। এত উঁচু থেকে রাস্তার মানুষজনকে ছোট-ছোট দেখায়। নদীর ওপর দিয়ে স্টিম লঞ্চ যাচ্ছে। এখান থেকে যে দৃশ্য আমি দেখছি, তাতে অন্যান্য সাহেবি শহরের সঙ্গে মস্কোর কোনও তফাত নেই।

একটু পরেই সারগেই স্ট্রোকান এসে পড়ল। সে বেশ ব্যস্তভাবে বলল, আপনি তৈরি তো? চলুন, আগে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে আসি।

আমি বললুম, আগে একটু বসুন। আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে নিই।

সারগেই বলল, আপনি যে-ক'দিন আমাদের দেশে থাকবেন, আমিই সব জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব। সুতরাং আলাপ তো হবেই।

আমি বললুম, তবু একটু বসুন।

যুবকটির চোখের মণি দুটো নীলচে, মুখটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং সারল্য মাখানো। তার গায়ে একটা খয়েরি রঙের চামড়ার জ্যাকেট। আমি তাকে একটা সিগারেট দিতে চাইলে বলল যে কিছুদিন আগে সে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, কারণ সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়। সেই সঙ্গে সে যোগ করল, অবশ্য সোভিয়েত দেশে এখনও অনেকেই সিগারেট খায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি আমার সম্পর্কে কী কী জানেন?

সে গড়গড় করে অনেক কিছু বলে গেল। বুঝলুম যে কলকাতার কনসুলেট থেকে পাঠানো আমার বায়োডাটা সে ভালো ছাত্রের মতন মুখস্থ করে নিয়েছে।

আমি হেসে বললুম, বাঃ সবই তো জেনে ফেলেছেন দেখছি। এবারে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন!

সারগেই স্ত্রোকানের জন্ম ইউক্রাইনে, উচ্চশিক্ষার জন্য সে মস্কো চলে আসে। পড়াশুনো শেষ করার পর সে কিছুদিন সামরিক বাহিনীতে ট্রেইনিং নিয়েছে, এখন নভোস্তি প্রেস এজেন্সিতে ইন্ডিয়া ডেস্কে সে অনুবাদকের কাজ নিয়েছে। তার বয়েস বাইশ এবং সে বিবাহিত।

একটু হেসে সে যোগ করল, আমিও কবিতা লিখি। তবে আমার কবিতা বিশেষ কোনও জায়গায় ছাপা হয়নি।

তারপর সে জিগ্যেস করল, আমি আপনাকে কি মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলব? কিংবা যদি সুনীলজি বলি? ইন্ডিয়াতে তো অনেকেই এইভাবে ডাকে।

—তুমি জানলে কী করে?

--আমি ইন্ডিয়াতে গেছি। প্রায় এক বছর ছিলাম!

সারগেই স্ত্রোকান ভারত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হতে চায় বলে সে তামিল ভাষা শিখেছে। এবং সেই ভাষাজ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য সে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে। সে তামিলনাড়ু, কেরালা, বোম্বাই, দিল্লি দেখেছে, কলকাতার দিকে যায়নি।

আমি মনে-মনে একবার ভাবলুম, ওদের ইন্ডিয়া ডেস্কে নিশ্চয়ই বাংলা জানা ছেলেও আছে। সেরকম একজনকে কেন পাঠাল না আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য? পরক্ষণে সেই ভাবনাটা বাতিল করে দিলুম। এই যুবকটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। বাংলা জানা বা না জানায় কী আসে যায়!

ঠিক হল, সে আমাক সুনীলজি বলবে, আমি তাকে শুধু সারগেই বলে ডাকব। এর পর নীচে নেমে এলুম ব্রেক ফাস্ট খেতে।

এ হোটেলের ডাইনিং হলটাও বিশাল। ব্রেক ফাস্ট খাওয়ার দু-রকম পদ্ধতি। টেবিলে বসে মেনিউ কার্ড দেখে ইচ্ছে মতন অর্ডার দেওয়া যায়। আর একদিকে আছে সেল্ফ সার্ভিস। আমরা দ্বিতীয় দিকেই গেলুম। এখানে পনেরো-কুড়ি রকম খাবার সাজানো রয়েছে, তিন রুবল দিয়ে টিকিট কাটলে ইচ্ছে মতন যা খুশি নেওয়া যায়।

আমি একটা ডিম সেদ্ধ, একজোড়া সসেজ ও এক পিস টোস্ট নিয়ে টেবিলে বসতেই সারগেই বলল, এ কী সুনীলজি, এত কম নিলেন? আরও কত কী রয়েছে, স্যালামি, বেকন, হ্যাম, মিট বল, ম্যাস্ড পোটাটো, চিজ, আমাদের অনেকরকম চিজ আছে, ট্রাই করুন!

আমি খুব একটা ভোজনরসিক নই, বিশেষত সকালের দিকে মোটেই বেশি খেতে ইচ্ছে করে না। তবু সারগেই আরও কিছু খাদ্য জোর করে এনে দিল আমার প্লেটে। কাছাকাছি টেবলগুলোতে যারা বসে আছে, তারা অধিকাংশই বিদেশি; ইংরিজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষা শুনতে পাচ্ছি। এই হোটেলটি প্রধানত বিদেশিদেরই জন্য।

দশটার সময় বেরিয়ে এলুম হোটেল থেকে। এবারে আর ট্যাক্সি নয়, সারগেই-র অফিস থেকে গাড়ি এসেছে। এই গাড়ি সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে।

সারগেই বলল, চলুন, সুনীলজি, আগে রেড স্কোয়ার দেখে আসি। রেড স্কোয়ার না দেখলে মস্কো শহর অনুভবই করা যায় না।

আমি তাতে সম্মতি জানালুম।

মস্কো শহরে আধুনিক কায়দায় বিরাট বিরাট বহুতল বাড়ি যেমন উঠেছে, তেমনি পুরোনো আমলের প্রাসাদ রয়ে গেছে অনেক। রাস্তার দু-পাশে বাতিস্তম্ভগুলোতে লোকেরা এক জোড়া করে লাল পতাকা লাগাচ্ছে, দু-দিন মে-ডের উৎসব, সেজন্য। ঝকঝক করছে রোদ। চওড়া চওড়া রাস্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থা অতি সুশৃঙ্খল, কোথাও জ্যামে পড়তে হল না। তবে, পশ্চিমি কোনও বড় শহরের তুলনায় মস্কোতে গাড়ির সংখ্যা যেন কিছু কম। বাস স্টপগুলিতে রয়েছে অপেক্ষমাণ মানুষ, অনেক

লোক পায়ে হেঁটেও যাচ্ছে, এটা দেখলে স্বস্তি লাগে। আমেরিকার অনেক শহরে গাড়ি ছাড়া একজনও পথচারী দেখা যায় না, কেন যেন ভূতুড়ে-ভূতুড়ে মনে হয়।

মস্কো শহরটি তেমন ঘিঞ্জি নয়। মাঝে মাঝেই পার্ক রয়েছে, তাতে নানারকম ভাস্কর্য। ব্রোঞ্জ ও পাথরের মূর্তিগুলি দৃষ্টি টেনে নেয়। খুবই বলিষ্ঠ কাজ। লেনিনের মূর্তি ছাড়াও বিখ্যাত সব সাহিত্যিক ও কবিদের মূর্তিও আছে। একটি অতি জীবন্ত মূর্তির নাম, সর্বহারার অস্ত্র : খোয়া পাথর।

যেতে-যেতে বলশয় থিয়েটার দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। এই সেই বিখ্যাত নাট্যশালা। আমি সারগেইকে বললুম, এখানে একটা ব্যালে কিংবা অপেরা দেখার সুযোগ পাব কী?

সারগেই বলল, এখন তো টুরিস্ট সিজন, টিকিট পাওয়া খুব শক্ত, তবু আমি চেষ্টা করব।

রেড স্কোয়ারে যাওয়ার আগে আমরা পুরো ক্রেমলিন এলাকাটায় একটা চক্কর দিলুম। এই অঞ্চলে আধুনিক বাড়ি বেশি চোখে পড়ে না, প্রাচীন ভাবটি অক্ষুণ্ণ আছে। ক্রেমলিন প্রাসাদের পেছন দিকে একটি পার্ক, সেখানে নামলুম আগে। এই পার্কের মধ্যেই একটি ঘেরা জায়গায় জ্বলছে অমর-জ্যোতি। যুদ্ধের সময় দেশকে রক্ষা করার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের স্মরণে জ্বলে এই অনির্বাণ আলোর শিখা। আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম আমার শ্রদ্ধা জানাতে। অনেকেই এই আলোর শিখা দেখতে এসেছে, তার মধ্যে দেখলুম দু-জোড়া নব-বিবাহিত দম্পতিকে। যুবতী দুটির সাদা পোশাক ও দীর্ঘ ওড়না দেখলেই বোঝা যায় তারা সদ্য বিবাহের অনুষ্ঠান সেরেই এখানে এসেছে। সারগেইকে জিগ্যেস করে জানলুম, অনেক নব-দম্পতিই এখানে আসে। বিবাহের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে শহিদ বেদিতে মাল্যদান আমাদের কাছে একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু সোভিয়েত নাগরিকদের কাছে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রায় দু-কোটি মানুষ প্রাণ দিয়েছে, যখন এখানে জনসংখ্যাই ছিল কুড়ি কোটি। অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার থেকেই একজন দুজন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিংবা পঙ্গু হয়েছে।

আমি সারগেইকে মৃদু গলায় জিগ্যেস করলুম, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় তো তুমি জন্মাওনি। তোমাদের পরিবারের কেউ কি...

সে সংক্ষিপ্তভাবে বলল, হ্যাঁ।

গাড়িতে ফিরে এসে আবার খানিকটা চক্কর দিলুম। চার দিকেই অসংখ্য ফুল। এর মধ্যে বেশি করে চোখে পড়ে টিউলিপ। এত বৈচিত্র্যময় টিউলিপ আমি আগে কখনও দেখিনি। গাঢ় লাল রঙের টিউলিপের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল, এখানে দেখলুম হলুদ এবং তুষার-শুভ্র টিউলিপের ঝাড়ও রয়েছে। বাগানগুলি খুব যত্ন করে সাজানো। ফরাসি দেশের মতন বেশি বেশি যত্নের চিহ্ন প্রকট নয়, বরং বেশ স্বাভাবিক।

সারগেই বলল, আপনি ভাগ্যবান, আপনি খুব ভালো সময়ে এসেছেন। কয়েকদিন আগেও এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। দুদিন ধরে আকাশ পরিষ্কার। সেজন্য টিউলিপও এত বেশি ফুটেছে।

রেড স্কোয়ারে যাওয়ার জন্য গাড়িটা বাইরে রেখে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। ঢালু রাস্তা ধরে আমরা ওপরের দিকে উঠে এলুম।

তারপর রেড স্কোয়ারে পা দিয়েই মনে হল, এ জায়গাটা তো আমার খুব চেনা।

॥ ২ ॥

অসংখ্য ছবিতে এবং চলচ্চিত্রে রেড স্কোয়ার দেখেছি। বিভিন্ন দিক থেকে। সুতরাং রেড স্কোয়ারে প্রথম পা দিয়ে তো খুব চেনা মনে হবেই। সারা বছর ধরেই রেড স্কোয়ারে নানান উৎসব ও জমায়েত হয়। আসন্ন মে দিবসের উৎসবের জন্য আজ রেড স্কোয়ারকে বহু পতাকা ও ছবি দিয়ে সাজানো

হয়েছে। সারগেই কিছু বলবার আগেই আমি একটি চতুষ্কোণ ভবনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, ওইটা তো সেই মাস্যালিয়াম, যেখানে লেনিনের দেহ রাখা আছে?

ক্রেমলিন প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব দিকে এই প্রশস্ত চত্বরের নাম রেড স্কোয়ার। আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকলুম, সেদিক দিয়ে প্রথমেই পড়ে সেন্ট বেসিলস ক্যাথিড্রাল। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি এই বিচিত্র আকারের ও নানা রঙের গির্জাটি রাশিয়ান স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গির্জার গম্বুজের সংখ্যা ন'টি, প্রত্যেকটিই বিভিন্ন আকৃতির। চমৎকার দেখতে এই গির্জাটিতে খানিকটা যেন বার্মিজ স্থাপত্যের ছাপ আছে বলে মনে হল, কিংবা আমার ভুলও হতে পারে।

সেই গির্জার পাশ দিয়ে একটু এগোলেই ডান পাশে একটা উঁচু বেদির মতন, জারদের আমলে এটা ছিল বধ্যভূমি, সম্রাটদের ইচ্ছাক্রমে যাকে তাকে ওখানে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হত, এখন সেখানে ফুলের মালার স্তূপ।

ক্রেমলিন প্রাসাদের সিংহদ্বারের কাছেই যে সুউচ্চ গম্বুজ, যার চূড়ায় রয়েছে একটি বিশাল তারা, সেই গম্বুজটিই মস্কো শহরের প্রতীক চিহ্ন বলা যায়। সেই গম্বুজে দিনে দু-বার ঘণ্টাধ্বনি হয়। সেই ধ্বনিতে শোনা যায় 'ইন্টারন্যাশনাল' গানের সুর।

রেড স্কোয়ারে অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছে সেই ঘণ্টাধ্বনি শোনবার জন্য। অধিকাংশই টুরিস্ট, এদের মধ্যে আমেরিকান টুরিস্টদের আলাদা করে চেনা যায়। অত্যন্ত সুসজ্জিত কয়েকজন পুলিশ সেই ভিড়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। সেই পুলিশদের মুখগুলি খুবই গম্ভীর। পুলিশের পোশাক পরে থাকলে বোধহয় হাসি নিষেধ।

লেনিন সমাধিভবনের সামনে বিরাট লম্বা লাইন। সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি ভেতরে যেতে চান?

অতবড় লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর বাসনা আমার হল না, আমি বললুম, না, থাক।

সারগেই বলল, এখন শুধু জায়গাটা দেখে নিই, পরে তো এখানে বারবার আসতে হবেই।

রেড স্কোয়ারের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে গেলুম দুজনে। চত্বরটি কব্‌ল স্টোন বা খোয়া পাথরে বাঁধানো, প্রাচীন কালে যেমন ছিল, সেইরকমই রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, ছবিতে বা সিনেমায় রেড স্কোয়ারকে যত বিশাল মনে হয়, আসলে কিন্তু তত বড় লাগল না। কল্পনার থেকে বাস্তব সবসময়েই একটু ছোট।

ক্রেমলিন কথাটার মানেই হল দুর্গ। দেয়াল ঘেরা এই অঞ্চলটাই আদি মস্কো, তারপর একে কেন্দ্র করে শহরটা ছড়িয়েছে। এর চারপাশ দিয়েই বেরিয়েছে বড় বড় রাস্তা। এবারে আমরা অন্য একটা রাস্তা ধরে শহর দেখতে দেখতে পৌঁছলুম নভোস্তি প্রেস এজেন্সির কার্যালয়ে।

রাশিয়ান ভাষায় হরফ অনেকগুলিই রোমান হরফের মতন হলেও উচ্চারণে প্রায় কোনও মিলই নেই। রোমান হরফ দেখা চেনা চেনা মনে হলেও রাশিয়ান ভাষা আমরা পড়তে পারি না। সেই জন্যই নভোস্তি প্রেস এজেন্সির আদ্যক্ষর এন পি এ নয়, এ পি এন। এই এ পি এন্-এর আমন্ত্রণেই আমি এদেশে অতিথি হয়ে এসেছি।

এ পি এন-এর অফিস ভবনটি প্রকাণ্ড। ঢোকার মুখে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব এই সংস্থার। সারা পৃথিবীতে রয়েছে এঁদের শাখা, বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা এঁরা পরিচালনা করেন।

সারগেই অনেক সিঁড়ি ঘুরিয়ে আমায় একটি প্রশস্ত কক্ষে এনে বসাল। তারপর পাশের দফতরের এক মহিলা কর্মীকে আমাদের আগমনবার্তা জানিয়ে আমার কাছে এসে বলল, এক্ষুনি যিনি আসবেন, তিনি হলেন ওর বস্। তিনি এই দফতরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তিনি স্বয়ং আসছেন আমার সঙ্গে কথা বলতে। সারগেই-এর গলায় খানিকটা উত্তেজনার আভাস। নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, তাই বস্ সম্পর্কে ওর বেশ একটা ভয়-ভয় সমীহের ভাব আছে বলে মনে হল।

এক মিনিট পরেই যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। বেশ হাসিখুশি মুখের ভাব, তাঁকে দেখে মোটেই ভয় জাগে না। এঁর নাম সোয়ার্টস ইগর আলেকসেভিচ্, ইনি এশিয়া বিভাগের উপ-পরিচালক।

সোয়ার্টস সাহেবকে দেখে আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেই তিনি প্রফুল্ল গলায় বললেন, বসুন, বসুন। আপনার বিমানযাত্রা ক্লান্তিকর হয়নি তো? এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

সোয়ার্টস সাহেব একাধিকবার ভারতে এসেছেন, বেশ কিছুদিন দিল্লিতে থেকে গেছেন, সুতরাং আলাপ-পরিচয়ে প্রাথমিক জড়তাটা সহজেই কাটিয়ে ওঠা গেল।

তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, আপনি এ দেশে এসে কী কী দেখতে চান বলুন?

আমি বললুম, আমি প্রধানত ভ্রমণকারী, তথ্য সংগ্রাহক নই। আপনাদের দেশে এসেছি, যা যা দেখবার সুযোগ পাব তাই-ই দেখব, আলাদাভাবে কোনও বিশেষ ব্যাপারে কৌতূহল নিয়ে আসিনি।

তিনি বললেন, এক হিসেবে আপনি খুব ভালো সময়েই এসেছেন, আবার খুব খারাপ সময়েও বটে। ভালো, তার কারণ আবহাওয়া এখন চমৎকার। তবে মুশকিল হচ্ছে এখন পরপর ছুটির দিন। তাই অনেক কিছুই বন্ধ থাকবে। তবু যতটা সম্ভব বেশি কিছু দেখাবার জন্য আপনার একটি সফর পরিকল্পনা আমরা তৈরি করে রেখেছি। আপনি ইচ্ছে মতন ঘুরুন, এই সারগেই ছেলেটি আপনার সঙ্গে থাকবে, বিশেষ কিছু ইচ্ছে হলে ওকে জানাবেন। যা জানতে চান জিগ্যেস করবেন। আপনাকে কয়েকটা বইপত্র দিচ্ছি। পড়ে দেখতে পারেন—

মাঝপথে কথা থামিয়ে সোয়ার্টস জিগ্যেস করলেন, চা না কফি খাবেন? চা তো আপনাদের দেশের মতন ভালো নয়।

সকাল থেকে আমি দু-কাপ চা খেয়েছি, তাতে আমি চায়ের কোনও স্বাদই পাইনি। সুতরাং বললুম, কফি।

এ পি এন ভবন থেকে বেরিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মস্কো রাইটার্স ইউনিয়ান।

অনেক কিছু সম্পর্কেই আমাদের একটা পূর্ব ধারণা গড়ে ওঠে। সোভিয়েত দেশের রাইটার্স ইউনিয়ান সম্পর্কে এত বেশি প্রচার ও অপপ্রচার আগে শুনেছি বা পড়েছি যে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমার মনে একটা ধাঁধার ভাব ছিল। সরকারি আওতায় কোনও লেখক সমিতি পরিচালনার ব্যাপারটা আমাদের ঠিক যেন মনঃপূত হয় না।

মস্কো লেখক সমিতির কার্যালয়টি কেমন হবে, সে সম্পর্কে আমার মনে আগে থেকেই একটা ছবি আঁকা ছিল। সরকারি বাড়ি, চৌকো চৌকো ঘর, শ্রীহীন দেওয়াল, নেতাদের ছবি, মস্ত বড় টেবিলের চারপাশে শক্ত শক্ত চেয়ার, সব মিলিয়ে গম্ভীর গম্ভীর ব্যাপার। কিন্তু লেখক সমিতি-তে এসে আমি অবাক হলুম। বস্তুত, মস্কোতে পৌঁছে এই প্রথম আমার একটি গভীর বিস্ময় ও আনন্দের ব্যাপার ঘটল।

বিপ্লব-পূর্বকালের কোনও এক ধনাঢ্য মহিলার বিলাস-মহলটিতেই এখন লেখক সমিতির ঘাঁটি। বাড়িটি অপূর্ব। লোহার গেট পেরিয়ে একটি প্রশস্ত চত্বর, পাশে কয়েকটি ছোট-ছোট কটেজ, তারপর সামনের প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি ঘর, নানারকম গলিপথ ও সুড়ঙ্গ; যেন কোনও গুপ্তপথ দিয়ে আমরা একবার মাটির নীচে নেমে গেলুম আবার ওপরে উঠলুম। একজন মহিলার সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তাকে খুঁজে বার করতেই খানিকটা সময় লেগে গেল। আমাদের খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

দেখামাত্র তিনি হেসে জিগ্যেস করলেন, কেমন আছেন? আবার দেখা হল।

এঁর নাম মারিয়াম সোলগানিক, ইনি একজন নামকরা লেখিকা এবং লেখক সমিতির পরিচালকদের মধ্যে একজন, ঠিক কোন পদ অলংকৃত করেছেন তা আমার জানা হয়নি। ধারালো,

ঝকঝকে পাতলা চেহারা, ইংরেজি বলেন অতি মসৃণভাবে। কিছুদিন আগেই উনি কলকাতা ঘুরে গেছেন, তখন একটি চা-চক্রে দেখা হয়েছিল, ওঁকে আমার মনে আছে, কিন্তু আমাকেও যে উনি চিনতে পারবেন, সেটা খুব আশ্চর্য কথা!

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক বললেন, চলুন, চা খেতে-খেতে গল্প করা যাক।

সারগেই বলল, আমরা দুপুরে লাঞ্চ খাইনি, আপনাদের এখানে খাওয়াটা সেরে নিতে চাই।

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক আবার আমাদের সেই বাড়ির ভেতরকার গুপ্তপথ দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে চললেন। পুরোনো আমলের বাড়িতে এইরকম পথ থাকে। উনি বললেন, আমরা আসলে পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি, সামনের দিক দিয়ে অনেক সহজে যাওয়া যায়।

কাঠের ফ্লোর লাগানো একটা বড় হলঘরে এসে পৌঁছলুম, যেটা নির্ঘাৎ এক সময়ে নাচ ঘর ছিল। এক পাশ দিয়ে একটা কারুকার্য করা ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। এখানে অনেকগুলো টেবিল সাজানো, কিন্তু সবই শূন্য। দুঃখের বিষয় সেখানে আমাদের খাওয়া হল না, লাঞ্চ আওয়ার পেরিয়ে গেছে বলে সার্ভিস বন্ধ।

শ্রীমতী মারিয়াম সোলগানিক বললেন, তা হলে আর কী করা যাবে, চলুন চা-ই খাওয়া যাক।

আর একটি বড় ঘরে এসে পৌঁছলুম আমরা। এই ঘরখানিও খুব দৃষ্টিনন্দন। সমস্ত দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা, অধিকাংশই কাঁচা হাতের। লেখকরা আড্ডা দিতে-দিতে যার যা খুশি দেয়ালে আঁকেন। শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, এর মধ্যে অনেক ছবিতে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। অর্থাৎ একজন লেখক একটা কিছু ছবি এঁকেছেন, অন্য কোনও লেখক পাশে আর একটা ছবি এঁকে উত্তর দেন তার।

আমি জিগ্যেস করলুম, লেখকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয় না?

—কেন হবে না? প্রায়ই হয়। সব দেশেই লেখকরা তো একই জাতের।

—এখানে কখনও লেখকদের মধ্যে ঘুসাঘুসি হয়েছে?

উনি হেসে বললেন, না। লেখকদের মধ্যে মতবিরোধটা কাগজে-কলমে হওয়াই ভালো।

লেখক ইউনিয়ান একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। লেনিন ঠিক করে দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক প্রকাশক লেখকদের রয়ালটির একটা অংশ এই ইউনিয়ানকে দিতে বাধ্য থাকবে। এমন সমস্ত প্রকাশনালয়ই সরকার পরিচালিত, তারা প্রত্যেকেই টাকা দেয়। সেই টাকায় এই ইউনিয়ানের খরচ চলে। লেখকরা এখানে আড্ডা, শস্তায় খাওয়া-দাওয়া, সুরাপান ও আলাপ-আলোচনা করতে আসেন। নতুন সদস্য নেওয়ার আগে এখানকার কমিটি সেই লেখকের গুণাগুণ আলোচনা করে দেখে। চেষ্টা করেও কেউ-কেউ এখানকার সদস্য হতে পারেননি, এমন নজিরও আছে। এই লেখক সমিতির পরিচালনায় সারাদেশে আছে অনেকগুলি রাইটার্স হোম, সেগুলি সাধারণত স্বাস্থ্যকর, নিরিবিলি জায়গায়, সদস্য লেখকরা সেই সব রাইটার্স হোমে গিয়ে এক মাস দু-মাস থেকে লিখতে পারেন, নামমাত্র খরচে।

আমি জিগ্যেস করলুম, মনে করুন, কোনও একজন লেখক এই রকম একটা রাইটার্স হোমে গেল, আপনাদের খরচে থেকে এল একমাস, কিন্তু এক লাইনও লিখল না, অর্থাৎ কোনও লেখা তার মাথায় এল না, তা হলে কী হবে?

শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, একজন লেখক লিখবেন কি লিখবেন না, সেটা তাঁর ইচ্ছে। তাতে আমাদের কী বলবার আছে?

লেখক সমিতির থেকে লেখকদের আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটা হল অনুবাদের ব্যবস্থা করা। অনুবাদের ব্যাপারটা সোভিয়েত দেশে একটা এলাহি কারবার।

শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, আপনাদের ভারতবর্ষে যেমন ভাষা সমস্যা আছে, আমাদেরও সেইরকম ছিল। আমরা সেই সমস্যা সমাধান করে ফেলেছি অনুবাদের মাধ্যমে।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে প্রধান ভাষা ৭৭টি। এই প্রত্যেকটি ভাষায়ই আলাদা সাহিত্য আছে। এই সব ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখা অনূদিত হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়, আবার রাশিয়ান ভাষায় লেখাও অনূদিত হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষায়। তার ফলে একজন আঞ্চলিক ভাষার লেখকও অনায়াসেই সমস্ত সোভিয়েত রাশিয়ায় পরিচিত হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকেও অবিরাম অনুবাদ চলছে। অনেক আমেরিকান লেখক সোভিয়েত রাশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের এক একটি বইয়ের অনুবাদ ছাপা হয় প্রায় পাঁচ লক্ষ করে। রবীন্দ্র রচনাবলিও পাঁচ লক্ষ ছাপা হয়েছে ও অতি দ্রুত ফুরিয়ে গেছে।

বিপ্লবের আগে থেকেই জাতিগতভাবে রাশিয়ানরা দারুণ পড়ুয়া। সম্প্রতিকালের ইউনেস্কোর রিপোর্টেও প্রকাশ যে সারা পৃথিবীতে সোভিয়েত দেশের নাগরিকরাই সবচেয়ে বেশি বই পড়ে। এক হাজার জন শিক্ষিত লোকের মধ্যে ৯৯০ জনেরই বই কেনার অভ্যেস আছে।

আমি বললুম, রাশিয়ানরা খুব বেশি পড়ে তা জানতুম, কিন্তু তারা যে এত অনুবাদও পড়ে, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার।

শ্রীমতী সোলগানিক আমাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন, রাশিয়ান নয়। বলুন সোভিয়েত পিপ্‌ল।

এ কথা ঠিক। আমরা সবসময় রাশিয়া বা রাশিয়ান বললেও সোভিয়েত ইউনিয়ানে এখন নানান জাতির সমন্বয় এবং এর সীমানাও রাশিয়াকে ছাড়িয়ে অনেকখানি। মূল রুশ ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অন্য অনেকগুলি স্টেট, এখন মোট ১৫টি স্টেট নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ান। এমন অনেক স্টেট আছে, যেমন টাশকেন্ট কিংবা ল্যাটভিয়া, যেখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি রুশদের থেকে অনেক আলাদা। তারা রাশিয়ান নয়, কিন্তু সোভিয়েত নাগরিক।

কিন্তু বাংলায় এখনও আমরা চলিত ভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ানকে রাশিয়া বলি; সোভিয়েত অধিবাসীর বদলে রাশিয়ান।

শ্রীমতী সোলগানিক মৃদু হাস্যে বললেন, মনে করবেন না যে আমাদের এখানে একবারে ব্ল্যাক মার্কেট নেই। আছে। আমাদের দেশে বই আর অপেরার টিকিটের ব্ল্যাক মার্কেট হয়।

কথাটা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে বেশ গর্ব মিশে গেল! তা তো হওয়ারই কথা।

শ্রীমতী সোলগানিক আমাকে জিগ্যেস করলেন, কোন কোন সোভিয়েত লেখকের কথা আমি পড়েছি!

আমি লজ্জিতভাবে বললুম, প্রায় কিছুই পড়িনি।

রুশ মহৎ লেখকদের রচনা আমাদের অবশ্য পাঠ্য, টলস্টয়-ডস্টয়েভ্স্কি-টুর্গেনিভ-এর উপন্যাস আমরা কৈশোর বয়সে থেকে বারবার পড়েছি, গভীর মুগ্ধতা নিয়ে, পুশকিন থেকে ব্লক-মায়াকভ্স্কির কবিতাও পড়েছি। কিন্তু তারপর সোভিয়েত আমলের লেখকদের সম্পর্কে আমরা, অন্তত আমি, প্রায় অজ্ঞই বলা চলে। সলোকভ ছাড়া আর কোনও নামই চট করে মনে পড়ে না। তার কারণ, আমাদের মিডিয়াগুলি পশ্চিম-শাসিত। ইংরেজি ভাষার প্রতি দাসত্বের জন্য আমরা সবসময় ইংল্যান্ড-আমেরিকার মুখাপেক্ষী। টাইম-নিউজউইক যাকে বিশ্ব সংবাদ বলে সেগুলিকেই আমরা মনে করি সাম্প্রতিক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য খবর। ওরা পাস্তেরনাক বা সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে শোরগোল শুরু করলে তারপর আমরা ওই লেখকদের কথা জানতে পারি এবং তাদের লেখা পড়তে আগ্রহী হই। এমনকী ইয়েভতুশেংকো ও ভজনেসেনস্কির মতন আধুনিক কালের কবিদের কথাও জেনেছি ওই একই উপায়ে। ওঁদের মার্কিন দেশ সফরের সময় খুব হই চই হয়েছিল বলে। আধুনিক সোভিয়েত লেখকদের প্রতিনিধিত্বমূলক লেখার ভালো ইংরিজি অনুবাদ আমরা সরাসরি বইয়ের দোকানে পাই

না। কনসুলেট থেকে মাঝে মাঝে দু-চারটি বই বাড়িতে পাই, সেগুলিকে মনে হয় প্রচারমূলক, পড়তে ইচ্ছে করে না।

এক কাপ চা আগেই ফুরিয়ে গেছে, এরপর নিলাম এক বোতল করে মিনারাল ওয়াটার। সারগেই আমাকে বোঝাল যে এই মিনারাল ওয়াটার পেটের পক্ষে খুব ভালো। শ্রীমতী সোলগানিক বললেন, বেশি খাবেন না যেন।

আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। আরও অনেকক্ষণ চলতে পারত। কিন্তু শ্রীমতী সোলগানিকের অন্য কাজ আছে। তিনি বললেন, আবার পরে একদিন আসবেন, আবার গল্প হবে।

বিদায় নেওয়ার সময় তিনি জিগ্যেস করলেন, আপনাদের লেখক সমিতি সম্পর্কে কিছু জানা হল না। আপনাদের সমিতি কীভাবে চলে?

অমি বললুম, আমাদের কোনও লেখক সমিতি নেই।

তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, লেখকদের কোনওরকম ইউনিয়ান নেই?

আমাকে আবার বলতে হল, না। কোনওরকম ইউনিয়ান নেই।

বাঙালি লেখকদের কোনও ইউনিয়নের কথা আমি আগে চিন্তা করিনি। এখন মনে হল, মস্কোর মতন আমাদেরও লেখকদের একটা মিলনস্থান থাকলে বেশ হত। তাহলে মল্লিক প্যালেস কিংবা কুচবিহারের রাজার বাড়ি কিংবা ভাওয়ালের রানির বাড়ি কি সরকার আমাদের দিত? সে আশা দুরাশা। সোভিয়েত ইউনিয়ানের লেখকদের সম্মান অনেক বেশি।

গেটের বাইরে এসে আমাদের গাড়িটি খুঁজে পাওয়া গেল না। সারগেই বলল, আমি তো ভেবেছিলুম আমরা এখানে খেয়ে নেব, তাই ড্রাইভারকেও খেয়ে আসতে বলেছিলুম, সাড়ে চারটের মধ্যে ফেরার কথা। দেখি, গাড়িটা বোধহয় অন্য কোথাও রেখেছে। সুনীলজি, আপনি এই পার্কটায় ততক্ষণ বসুন।

এটাকে ঠিক পার্ক বলা যায় না, রেলিং ঘেরা খানিকটা জায়গা, কয়েকটি বেঞ্চ আর ঘাস-চটা মাটি। দুটি বাচ্চাকে নিয়ে এক বৃদ্ধা বসে আছেন একদিকে। আমি আর একটি বেঞ্চে বসলুম। বাচ্চাগুলি খেলতে-খেলতে একবার আমার কাছে চলে এল। ভাষা জানি না, তাই ওদের সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারলুম না, কিন্তু তারা আমায় কী যেন বলছে। বৃদ্ধা দেখছেন আমাকে। মনে হয় দিদিমা এসেছেন তাঁর নাতি-নাতনি নিয়ে। তিনিও আমায় কিছু বললেন, একটি বর্ণও বুঝলুম না। হাত নেড়ে হাসিমুখে আমার অজ্ঞতার কথা জানালুম।

সেই বৃদ্ধা বাচ্চা দুটিকে ডেকে পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতেই ঝড় উঠল। প্রথমে ধুলোর ঘূর্ণি, তারপর উড়ে এল অসংখ্য শুকনো পাতা, তারপরই বৃষ্টি।

সারগেই ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল। তার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা। সে বলল, গাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। এদিকে বৃষ্টি এসে গেল।

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো খুব বড়-বড়। একটুক্ষণ থাকলেই ভিজে যাব। পার্ক থেকে বেরিয়ে আমি পাশের একটা বাড়ির দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালুম। অত্যন্ত শীতের দেশ বলে এসব জায়গায় প্রায় সব বাড়িতেই দুটো করে দরজা থাকে। প্রথমে একটা ভারী কাঠের দরজা। তারপর একটু ফাঁক দিয়ে একটা কাচের দরজা। আমি ওই মাঝখানের জায়গাটায় দাঁড়ালুম। কার বাড়ি জানি না। কাচের দরজা দিয়ে দেখে মনে হয় কোনও ডাক্তারের চেম্বার। কাচের দরজাটা তালাবন্ধ, ভেতরে কেউ নেই।

সারগেই আবার গাড়ি খুঁজতে গেছে। খানিকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি আবার বাইরে বেরুতেই শীতের চাবুক খেলুম। বৃষ্টি এবং শনশনে হাওয়ায় তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক নেমে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে এসুম। আমাদের দেশে এইরকমভাবে কারুর বাড়িতে ঢুকলে নিশ্চয়ই কেউ এসে কড়া গলায় বলত, কী চাই মশাই? এখানে কী করছেন?

এদেশে এরকম কেউ বলে না। তবু অস্বস্তি বোধহয়।

সারগেই আবার এসে খুবই লজ্জিতভাবে কাঁচুমাচু গলায় জানাল যে গাড়িটা কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গাড়িটাকে সে এখানেই রাখতে বলেছে...।

আমি তাকে বললুম, তুমি বৃষ্টিতে ভিজছ কেন? তুমি এখানে দাঁড়াও আমার সঙ্গে। গাড়িটা এসে পড়বে নিশ্চয়ই।

সারগেই সে কথা শুনল না। বৃষ্টি মাথায় করে সে আবার ছুটে গেল। আমি শীত কাটাবার জন্য একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগলুম।

গাড়িটা এল প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে। সারগেই-এর এত বেশি ব্যস্ততার কারণ, কোনও একটা জায়গায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে আজ সন্ধেবেলা কোনও ব্যালে বা অপেরার থিয়েটারের টিকিট পাওয়া যাবে কি না, সেখানে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবার পর সারগেই বলল, ড্রাইভার দেরি করে আসার যে কারণ জানাল, তা প্রায় একটা ডিটেকটিভ বই-এর মতন।

আমি বললুম, তাই নাকি?

সারগেই বলল, ড্রাইভার খেয়ে ফিরে আসছিল...এমন সময় রাস্তায় একটা ঘটনা ঘটে। একটা চোর চুরি করে দৌড়ে পালাচ্ছিল, এমন সময় পুলিশ এই গাড়িটাকে থামিয়ে উঠে পড়ে সেই চোরটাকে ধরবার জন্য।

—তারপর চোরটা ধরা পড়েছে?

—বলছে তো ধরা পড়েছে।

ড্রাইভার ইংরেজি বোঝে না। তবু এখন সে ঘাড় ফিরিয়ে রুশ ভাষায় অনেক কিছু বলতে লাগল সারগেইকে।

সারগেই আমাকে বলল, তা হলেই বুঝতে পারছেন, সুনীলজি। আমাদের দেশেও চোর আছে!

ওর বলার ভঙ্গিতে হো-হো করে হেসে উঠলুম।

নির্দিষ্ট স্থানটিতে এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি তখনও অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। ব্যালের টিকিট পাওয়া যায়নি। অপেরার টিকিট পাওয়া গেছে। তবে বলশয় থিয়েটারে নয়, ক্রেমলিন থিয়েটারে।

প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। মাঝখানে এক ঘণ্টা সময় আছে। সারগেই প্রস্তাব জানাল, এই সময়টায় আমরা কিছু খেয়ে নিতে পারি। সকালে ব্রেক ফাস্ট বেশ হেভি হয়েছিল বলে আমার তখনও খিদে পায়নি। সারগেই বলল যে, অপেরা দেখে বেরুবার পর অনেক দেরি হয়ে যাবে, তখন খাবার পাওয়া যাবে না। তাতেও আমি তখন খেতে রাজি হলুম না। পেট ভরতি থাকলে ঘোরাঘুরি করতে মন লাগে না।

হোটেলে ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে এক পেয়ালা করে কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম দুজনে। আসলে সময় বেশি হাতে নেই। ক্রেমলিন থিয়েটার ক্রেমলিন প্রাসাদের মধ্যে, সেদিকে ঢুকতে হয় অন্য এক রাস্তা দিয়ে। এবং গেটের সামনে লম্বা লাইন। কোনওরকম হ্যান্ড-ব্যাগ বা ছাতা-টাতা নিয়ে ভেতরে ঢোকার নিয়ম নেই। সারগেই-এর হাতে একটা ব্যাগ ছিল, দ্বাররক্ষী তাকে আটকাল। সেই ব্যাগটা তাকে জমা রেখে আসতে হল বেশ খানিকটা দূরে।

ক্রেমলিন এলাকার মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ ও গির্জা আছে। থিয়েটার বাড়িটি নতুন। একেবারে অত্যাধুনিক কায়দায় তৈরি। নতুনত্বের একটা দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে। শ্বেত পাথরের মেঝে যেন কাচের মতন স্বচ্ছ। মার্কিন দেশে আমি অনেক বড় থিয়েটার হল দেখেছি, তবুও আমি এই থিয়েটার হলটি দেখে মুগ্ধ হলুম।

আমরা ভেতরে ঢুকে আসন খুঁজে বসবার সঙ্গে-সঙ্গে অপেরা শুরু হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

অপেরাটির নাম, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'রাজার নব বধূ'। যোড়শ শতকের আইভান দা টেরিব্‌ল-এর আমলের ঘটনা, একটি বিয়োগান্তক প্রণয় কাহিনি। সারগেই আমাকে সংক্ষেপে বিষয়টি বুঝিয়ে দিল, যদিও অপেরা-তে কাহিনির ভূমিকা যৎসামান্য।

আমি প্রথমেই সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম মঞ্চসজ্জা। প্রোসেনিয়ামটি প্রকাণ্ড, ধরা যাক আমাদের রবীন্দ্র সদনের প্রায় আড়াই গুণ, মাঝে মাঝেই প্রায় শ' খানেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এক সঙ্গে মঞ্চে থাকছেন, তবু মঞ্চটিকে ভিড়ে ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে না। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটি মহীরুহ। অসংখ্য ডালপালা ছড়ানো আস্ত একখানা জলজ্যান্ত গাছকে কী করে মঞ্চের ওপরে স্থাপন করা গেল তা ভেবে আমি অবাক হচ্ছিলুম, তারপর খুব নজর করে বুঝলুম, গাছটি সত্যিকারের না, সিনথেটিক, অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতন তার দিয়ে ডালগুলো ওপর থেকে বাঁধা, তবে তা বোঝা খুবই শক্ত। মঞ্চে এত বড় গাছ আমি আগে কখনও দেখিনি।

মঞ্চের পেছনে বাঁ-দিকে একটা রাস্তা, মনে হয় অনেক দূর থেকে লোকেরা হেঁটে আসছে। মঞ্চের ডেপ্‌থ্ সত্যিই অতখানি না কোনও মায়া সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না।

আমরা বসেছি সামনের দিকে দামি আসনে। প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন পুরুষের চেয়ে মহিলা-দর্শকের সংখ্যা অনেক বেশি। তিন-চারজন করে মহিলা এক সঙ্গে এসে বসেছেন, সঙ্গে কোনও পুরুষ নেই। এমনকী কোনও-কোনও মহিলা একাও এসেছেন বোঝা যায়, কেন না, বিরতির সময়েও কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। আমাদের পাশেই বসেছেন দুই অসম বয়েসের নারী, ওঁরা এক সঙ্গে এসেছেন, খুব সম্ভবত মাসি-বোনঝির মতন সম্পর্ক। এই ব্যাপারটি একটু অভিনব লাগল, কেন-না, পশ্চিমি দেশগুলিতে দেখেছি, পুরুষ-বন্ধু বা স্বামী ছাড়া মেয়েদের একা-একা সিনেমা-থিয়েটার দেখার প্রথা নেই।

অপেরাটির নট-নটী বা গায়ক-গায়িকাদের নাম আমি জানি না, সারগেই একটা স্মারক পুস্তিকা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু তা সবই রুশ ভাষায় লেখা। তবে সারগেই জানাল, রানির ভূমিকায় যিনি গাইছেন, তিনি খুবই বিখ্যাত এবং এই অপেরাটি খুব জনপ্রিয়, কয়েকশো রাত চলছে।

প্রথম অঙ্কের বিরতির সময় আমি বাইরে গেলুম সিগারেট টানতে। প্যাকেটটি খোলা মাত্র একজন লোক এসে হাত বাড়িয়ে কিছু বললেন। বুঝলুম সিগারেট চাইছেন। আমি ভারতীয় সিগারেট নিয়ে গেছি, সাগ্রহে প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, দেখুন, আপনার ভালো লাগে কি না। ভদ্রলোক ইংরিজি জানেন না, তবে সিগারেট ধরিয়ে তিনি তাঁর মাতৃভাষায় যা বললেন, তাতে অনুমান করলুম তার পছন্দ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের বিরতির সময় সারগেই আমাকে নিয়ে এল দোতলায়। এখানে রয়েছে একটি ছোট রেস্তোরাঁ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এখানে পাওয়া যায় কয়েক রকমের স্যান্ডউইচ আর গরম-গরম সসেজ ভাজা, বিয়ার আর ছোট-ছোট ওয়াইনের বোতল। ভাগ্যিস আগেই ডিনার খেয়ে নিইনি, তাই এখন এই হালকা ধরনের সুখাদ্য দিয়ে নৈশভোজ সেরে নেওয়া গেল।

তৃতীয় অঙ্কটি আমি আর তেমন উপভোগ করতে পারলুম না, আমার ঘুম এসে গেল। ক্রেমলিন প্রাসাদের অভ্যন্তরে সুরম্য থিয়েটার হলে বিখ্যাত রুশ অপেরা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়া খুবই লজ্জার কথা। এরকম সুযোগ ক'জন পায়? কিন্তু ঘুম এসে গেলে আমি কী করব? ভাষা এক বর্ণ বুঝছি না, অপেরার হাই-পিচের গান বেশিক্ষণ উপভোগ করার মতন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জ্ঞানও আমার নেই। ক'জন সাহেব ভীমসেন যোশীর গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে পারে? আমি থুতনিতে চিমটি কাটলুম, হাতের লোম টানলুম, বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল বেঁকিয়ে ফেললুম, কিছুতেই

কিছু হয় না। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, এইরকম অবস্থায় ঘুম তাড়ানো কত শক্ত। আশেপাশের লোকরা হয়তো আমাকে দেখছে ঢুলে-ঢুলে পড়তে। শেষ পর্যন্ত মাথা হেলান দিয়ে দু-হাতের তালুতে মুখ অনেকখানি ঢেকে গভীর মনোযোগের ভঙ্গি করে রইলুম। কে জানে নাক ডেকেছিল কি না!

আশ্চর্য ব্যাপার, শো শেষ হওয়ার পর বাইরে আসতেই ঘুম একেবারে হাওয়া।

গাড়িটা আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সারগেই জিগ্যেস করলো, সুনীলজি, হেঁটে যাবেন? এখান থেকে হোটেল খুব দূর নয়।

আমি তক্ষুনি রাজি। হেঁটে না ঘুরলে কোনও শহরই ভালো করে চেনা যায় না। রাত মোটে পৌনে দশটা। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু শীত খুব বেশি নয়। ওভারকোটের পকেটে দু-হাত ভরে সাহেবি কায়দায় হাঁটতে লাগলুম।

অন্যান্য পশ্চিমি বড় শহরের তুলনায় মস্কোর রাত্তিরের রাস্তার চাকচিক্য, স্বাভাবিক কারণেই, অনেক কম। রাস্তায় আলো যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্যারিস-লন্ডন-নিউ ইয়র্কের রাস্তায় যে অসংখ্য দোকানপাট আর বিজ্ঞাপনের রঙিন ঝলমলে আলো, তা এখানে নেই। সোভিয়েত দেশে কোথাও বিজ্ঞাপন নেই, কারণ সমস্ত ব্যাবসাই এদেশে সরকার-পরিচালিত, সুতরাং পণ্যদ্রব্যের ভালো-মন্দ প্রমাণ করার বিজ্ঞাপন-প্রতিযোগিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে গেলুম হোটেলে। দরজার কাছ থেকে সারগেই বিদায় নিল। তাকে যেতে হবে অনেক দূরে।

হোটেলের প্রত্যেক তলায় একজন করে মহিলা বসে থাকেন। হোটেল থেকে আমাকে একটা কার্ড দেওয়া হয়েছে, সেটা জমা দিলে ঘরের চাবি পাওয়া যায়। আমার হাতে চাবিটি তুলে দেওয়ার সময় প্রবীণ মহিলাটি মিষ্টি হেসে কত কী বললেন, হায়, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, পাসিবো, পাসিবো, অর্থাৎ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

ঘরে এসে জামা-কাপড় ছাড়ার পর বেশ চাঞ্চল্য বোধ করলুম। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব? মাত্র রাত দশটায় ঘুমোনো আমার পক্ষে অসম্ভব। অপেরা দেখতে-দেখতে যে ঘুম ভর করেছিল, তা একেবারে উপে গেছে। বাইরের আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার নয়। এখন আড্ডা মারতে ইচ্ছে করছে। ঘরে একটা টেলিফোন আছে, তারও তো ব্যবহার করা দরকার। দেশ থেকে মণীন্দ্র রায় লিখে দিয়েছেন ননী ভৌমিকের ঠিকানা। কিন্তু ফোন নাম্বার দেননি। নবনীতা দেবসেন তাঁর এক বান্ধবীর জন্য একটি উপহারের পুঁটুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে আছে সেই বান্ধবীর ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার। বান্ধবীর নাম সায়েলা।

অপারেটরকে প্রথমে জিগ্যেস করলুম, তিনি আমাকে ননী ভৌমিকের ফোন নাম্বার জোগাড় করে দিতে পারেন কি না। তিনি বোধহয় আমার ইংরেজি বুঝতে পারলেন না। তারপর আমি সায়েলার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে লাইন ধরে দিতে বললুম।

ওপাশে শোনা গেল একটি পুরুষকণ্ঠ। তিনি বললেন যে সায়েলা এখন একটু ব্যস্ত আছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কী দরকার এবং আমি কে?

সায়েলা-কে আমি কখনও চোখে দেখিনি, শুধু এইটুকু জানি, তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা শ্রীপাদ অমৃতপাদ ডাঙ্গে-র কন্যা। আমি পুরুষকণ্ঠটিকে নবনীতা দেবসেন-এর উপহার বিষয়ে জানালুম। তিনি প্রথমে একটুক্ষণ নবনীতা দেবসেন কে তা চিনতে পারলেন না। আমি নানারকম উচ্চারণে নব্‌নীটা, নবওনী-ই-টা এইরকমভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে হল না। আমি কালই লেনিনগ্রাড চলে যাব, ফিরব দশদিন বাদে, সুতরাং উপহারটা কাল সকালের মধ্যেই পৌঁছে দিলে আমার পক্ষে সুবিধে হয়। তখন তিনি বললেন যে তাঁর বাড়ি আমার হোটেলের খুবই কাছে, এই রাত্তিরেই তিনি এলে আমার কোনও আপত্তি আছে কি না।

আমি শুনে উৎফুল্ল হলুম। যাক তবু একজনের সঙ্গে গল্প করা যাবে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি পৌঁছে গেলেন, পুরোদস্তুর সাহেবি কেতায় সজ্জিত একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। তাঁর নাম রাজা আলি। তিনি বললেন যে তাঁর স্ত্রী নবনীতা দেবসেনকে খুব ভালোই চেনেন, তিনিও এখন মনে করতে পেরেছেন, নবনীতা এই তো কিছুদিন আগে মস্কো ঘুরে গেলেন।

পুঁটুলিটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি এদেশে কতদিন আছেন?

তিনি আঠারো...কুড়ি বছর, কী জানি, আই লস্ট কাউন্ট!

কিন্তু রাজা আলির সঙ্গে আমার আড্ডা জমল না। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, আমিও তেমন তুখোড় কথাবাজ নই। তিনি একবার শুধু জিগ্যেস করলেন, আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চিনি কি না। তারপর চুপ। আমি কোনও প্রশ্ন করলে উনি মনোসিলেবলে উত্তর দেন। কিন্তু আমি তো ওঁর ইন্টারভিউ নিতে আসিনি। তা ছাড়া ডাঙ্গে সাহেবের জামাই-কে ঠিক কী কী প্রশ্ন করা যায়, তাও মনে এল না। সুতরাং উনি নিঃশব্দে বসে পাইপ টানতে লাগলেন, আমি টেবিলের কাচটি দেখতে লাগলুম গভীর মনোযোগ দিয়ে।

এক সময় উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এবার আমি চলি।

আমি বললুম, শুভ রাত্রি।

হোটেলের অত কাছে ওঁদের বাড়ি অথচ আমাকে একবার চা খাওয়ারও নেমন্তন্ন করলেন না। এটা একটু অস্বাভাবিক, সাধারণত সবাই বলেন। অবশ্য রাজা আলি কুড়ি বছর ধরে মস্কোতে কী করেন তাও আমার জানা হয়নি।

তারপর বিছানায় শুয়েও আর ঘুম আসে না। আলো নিভিয়ে ছটফট করতে লাগলুম। ঘুম না-আসার একটা কারণ হল বালিশ। এমন পেল্লায় বালিশ আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের সাধারণ ব্যবহার্য বালিশ তিনখানা জোড়া দিলে যা হয়। যেমন মোটা, তেমনি চওড়া। এ শুধু মাথায় দেওয়ার বালিশ নয়, কাঁধ পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। বালিশ বাদ দিয়ে শুলেও ফাঁকাফাঁকা লাগে। চোখ মেলে রেখে অনুভব করতে লাগলুম, পৃথিবীর ঘূর্ণন, রাত্রি গড়িয়ে যাচ্ছে গভীরতর রাত্তিরের দিকে।

শেষ রাতে নিশ্চয়ই ঘুম এসেছিল, তবু জেগে উঠলুম বেশ সকাল সকাল। উঠেই চায়ের অভাব বোধ করলুম। আমরা সবাই অভ্যেসের দাস, ঘুম থেকে উঠেই এক কাপ চা না পেলে সারাদিনের জীবনযাত্রা শুরু করতে পারি না। চা পাব কোথায়? আমার কাছে এক কোপেকও নেই। যখন যা দরকার তা সারগেই কিনে দিচ্ছে। এ দেশের হোটেলে রুম সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। নিজের ইচ্ছে মতন হোটেল থেকে কিছু কিনে তারপর বিলে সই করার অধিকার আমার আছে কি না তা-ই বা কে জানে!

সেরকম স্মার্ট লোক হলে নিশ্চয়ই হোটেলের রিসেপশানে ফোন করে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলত। কিন্তু আমি এসব ব্যাপারে একেবারেই তৎপর নই। মুখটুখ ধুয়ে একখানা বই হাতে করে সারগেই-এর প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

ন'টা আন্দাজ দরজায় করাঘাত। দরজা খুলেই দেখি তিন বঙ্গীয় যুবক-যুবতী। এদের মধ্যে একজন আমার সেই বিমানযাত্রার সঙ্গী সুবোধ রায়, অন্য দুজনের নাম সুজিত বসু ও সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত। আমি একলা রয়েছি বলে ওরা সঙ্গ দিতে এসেছে।

সুবোধ জিগ্যেস করল, আপনার ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে?

আমি বললুম, ব্রেকফাস্টের জন্য ব্যস্ততা নেই, তবে এক কাপ চা জোগাড় করতে পারলে মন্দ হত না।

সুবোধ শুধু যে খুব বিদ্বান তাই-ই নয়, তার ব্যবহারও খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ। সে বলল, শুধু চা কেন, এই ঘরে বসেই আমরা ব্রেকফাস্ট খাব, আমরাও খেয়ে আসিনি। হাঁকডাক দিয়ে তক্ষুনি সেসব ব্যবস্থা করে ফেলল। এক গাদা হ্যামবার্গার ও স্যান্ডউইচ এবং চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর দ্বিতীয় চিন্তায় সে আবার বলল, আপনি রাশিয়ান শ্যাম্পেন খাননি তো? এক বোতল শ্যাম্পেনেরও

অর্ডার দেওয়া যাক।

সকাল বেলাতে শ্যাম্পেন? আমি ক্ষীণ আপত্তি জানালেও সুবোধ পাত্তাই দিল না।

সুজিত বসু কবিতা লেখে এবং ফিজিক্সে পি-এইচ ডি করছে। সঙ্ঘমিত্রাও পি-এইচ ডি করছে সাইকোলজিতে, সাহিত্য খুব ভালোবাসে। লাজুকতা ভাঙতে একটু সময় লাগল। তারপরেই আড্ডা জমে গেল।

শ্যাম্পেনের বোতল খোলার কায়দাটা রপ্ত করতে হয়। আনাড়ি হাতে ছুটন্ত ছিপি জানলার কাচ ভাঙতে পারে, কারুর চোখেটোখে লাগলে গুরুতর ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শ্যাম্পেনের বোতল খোলার সম্মান ওরা আমাকে দিতে চাইলেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম। সুবোধ নিজেই খুলল খুব সাবলীলভাবে। সকালবেলা চা-পানের আগেই সুরার গেলাসে চুমুক দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম।

আমাদের খাওয়াদাওয়ার মধ্য পথে সারগেই এসে হাজির। আমি তখনই বাইরে বেরুবার পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে নেই দেখে সারগেই বেশ ব্যস্তভাবে বলল, এ কী! আপনি এখনও তৈরি হননি? আমাদের যে সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

সুবোধ আড্ডার মেজাজে বলল, বসুন, বসুন, সাড়ে দশটার এখন অনেক দেরি।

সুবোধ, সুজিত, সঙ্ঘমিত্রা তিনজনই রুশ ভাষা বেশ ভালো জানে। আমাদের ক্রেমলিন যেতে হবে শুনে ওরা বলল, সে তো গাড়িতে মাত্র আট-দশ মিনিটের রাস্তা। মস্কোতে ট্রাফিক জ্যাম প্রায় হয় না বললেই চলে, সুতরাং ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

সারগেই তবু ছটফট করতে লাগল। অতএব আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিয়ে কোট-প্যান্টালুন পরে নিলুম। সারগেই-এর আপত্তি সত্ত্বেও খাদ্য-পানীয়র সব দাম মিটিয়ে দিল সুবোধ। লেনিনগ্রাড থেকে ফিরে ওদের সঙ্গে আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমরা দুজনে।

আজ অন্য গাড়ি, যিনি চালাচ্ছেন, তাঁর ফরসা, গোলগাল হাসি-খুশি চেহারা, অনেকটা অভিনেতা পিটার উস্তিনভের মতন। সারগেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল, ইনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, করমর্দনের পর আমাকে একটি রুশ সিগারেট দিলেন, বিনিময়ে আমিও উপহার দিলুম এক প্যাকেট ভারতীয় সিগারেট।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, কাল রাত্তিরে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

আমি মজা করার জন্য বললুম, কাল রাত্তিরে আমার ঘরে একজন অতিথি এসেছিল।

সারগেই রীতিমতন চমকে গেল। জিগ্যেস করল, অতিথি এসেছিল, আপনার হোটেলের ঘরে? কী করে এল?

আমি বললুম, সম্ভবত হেঁটেই এসেছিল।

—আপনার চেনা কেউ?

—না। জীবনে আগে কখনও দেখিনি।

—সে কি? কে এসেছিল? কেন এসেছিল?

তখন আমি হাসতে-হাসতে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গের নাম সারগেই শুনেছে।

আমরা আজ ক্রেমলিনের প্রধান প্রবেশ পথের বাইরে একটা শিকল-ঘেরা জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। এখানে খুব কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা। এর ভেতরেই সোভিয়েত সরকারি দফতর। এখানে দাঁড়িয়েই ১৯১৮ সালের ১২ মার্চ লেনিন মস্কোকে বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটায় ভেতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে আঙুলের ইশারায় আমাদের ডাকল। সারগেই বলল, দেখলেন তো, সুনীলজি, ঠিক ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে সাড়ে দশটায় আমাদের ডাকা হল। এক মিনিট দেরি হলে ওঁরা ফিরে যেতেন, আমাদের আর ঢোকা হত না। সেই জন্যই আমি আপনাকে তাড়া দিচ্ছিলুম।

সিকিউরিটির দুই ব্যক্তি আমাদের নিয়ে চলল ভেতরে। আমরা যাচ্ছি লেনিনের বাসভবন দেখতে। বিপ্লবের আগে দুশো বছর অবশ্য মস্কো রাশিয়ার রাজধানী ছিল না, তাহলেও ক্রেমলিনের প্রাসাদই ছিল চিরকাল রাজ-ক্ষমতার প্রতীক। এই প্রাসাদের একটি অংশে লেনিন তাঁর এক বোন ও স্ত্রী ক্রুপকায়াকে নিয়ে থাকতেন।

লেনিনের জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা। তাঁর ব্যবহৃত থালা-বাসন, পোশাক-পরিচ্ছদ, চেয়ার-টেবিল সবই অবিকল রাখা আছে। রয়েছে লেনিনের পুস্তক-সংগ্রহ। রান্নাঘর ও শয়নকক্ষ ছাড়া বসবার ঘর তিনখানি। লেনিনের লেখার টেবিলের ওপর রয়েছে একটি মূর্তি, এটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ডারউইন সাহেবের ইভোলিউশান তত্ত্ব বিষয়ক বইয়ের ওপর বসে আছে একটি বাঁদর, তাঁর হাতে একটি মানুষের মাথার খুলি, বাঁদরটি খুব চিন্তিতভাবে সেদিকে চেয়ে আছে।

লেনিনের বাসস্থানে ঘুরতে-ঘুরতে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েল্‌স এইখানে এসেছিলেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। লেনিন তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত দেশের দ্রুত উন্নতি ঘটাবার একমাত্র উপায় সারা দেশে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। GOELRO নামে যে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল বিদ্যুতের উৎপাদন আগামী দশ বছরের মধ্যে দশ গুণ বাড়িয়ে ফেলা, বড়-বড় নদীগুলোর ওপর নতুন তিরিশটি পাওয়ার স্টেশন স্থাপন করা।

লেনিনের এই পরিকল্পনাকে এইচ জি ওয়েল্‌সের মনে হয়েছিল অসম্ভব; তিনি লেনিনকে আখ্যা দিয়েছিলেন, "দা ড্রিমার ইন দা ক্রেমলিন"। লেনিনের স্বপ্ন কিন্তু সফল হয়েছিল। বলশয় থিয়েটারে এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "কমিউনিজম্ ইজ সোভিয়েট পাওয়ার প্লাস দা ইলেকট্রিফিকেশন অফ দা হোল কান্ট্রি।" হায়, আমাদের পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষে বিদ্যুতের কী অবস্থা। উৎপাদন বৃদ্ধির বদলে ক্রমশই আরও কমে যাচ্ছে।

ক্রেমলিন প্রাসাদের এই অংশে যখন লেনিন বাস করতে আসেন, তখনই তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। ১৯১৮ সালে তাকে মেরে ফেলার একটা চেষ্টা হয়েছিল, সেই আঘাত পুরোপুরি সারেনি। তাই নিয়েই তিনি নতুন রাষ্ট্র গড়ার প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন, তার ফলে বিপ্লবের পর ছ'বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান।

ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছুটি, তাই ভেতরে যাওয়া হল না। গাড়িতে চার দিকটা একটা চক্কর দিয়ে এলুম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনটি বিশাল ও সুদৃশ্য, আধুনিক স্থাপত্যের একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যেসব রাস্তা, তাতে রয়েছে সার-সার আপেল গাছ, এখন ছোট-ছোট আপেল ফলে আছে। আমাদের স্কুল-কলেজগুলোর পাশে অন্তত পেয়ারা গাছ লাগাবার কথাও কেউ চিন্তা করে না কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাটি সুবিশাল। সামনে মস্ত বড় চত্বর। তার পরে মস্কোভা নদী। অনেকগুলি টুরিস্ট বাস এসেছে, অর্থাৎ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ও রীতিমতন একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার।

আমরা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালুম। এই জায়গাটি বেশ উঁচু, এখান থেকে মস্কো শহর অনেকখানি দেখা যায়। নদীর পার ঢালু হয়ে অনেকখানি নেমে গেছে, মাঝে-মাঝে বেশ জঙ্গলের মতন। স্বাস্থ্য-উন্নতিকামীরা অনেকে সেখানে গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া পরে দৌড়চ্ছে। কয়েক জোড়া নব-বিবাহিত দম্পতিকে দেখলুম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আবহাওয়া ভালো বলে বোধহয় এখন বিয়ের ধুম পড়ে গেছে। বরযাত্রীরা এখানে সঙ্গে করে এনেছে শ্যাম্পেনের বোতল, গেলাস ছাড়াই সবাই

বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছে। এরই মধ্যে দু-এক জনের অবস্থা বেশ টলটলায়মান মতন মনে হল।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটলুম খানিকক্ষণ। এক সময়ে চোখে পড়ল একটি ছোট, পরিত্যক্ত গির্জা। গেটে তালা বন্ধ, বোঝা যায়, বহুদিন অব্যবহৃত।

আরও একটু বেড়াবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় নেই। লেনিনগ্রাডের প্লেন ধরতে হবে।

হোটেলে ফিরে এসে আমরা লাঞ্চ সেরে নিলুম। সারগেই নিজে ইউক্রাইনের ছেলে। ও বলল, সুনীলজি, আপনি ইউক্রাইনিয়ান বর্স খেয়েছেন? খেয়ে দেখবেন?

আমি সবরকম খাবারই চেখে দেখতে রাজি। বেশ একখানা বড় জামবাটি ভরতি সুপ এল, তার মধ্যে নানারকম মাংসের টুকরো ও সবজি। এইরকম একটু সুপ খেলেই পেট ভরে যায়।

খাওয়া সেরেই সুটকেস নিয়ে ছুট দিলুম এয়ারপোর্টের দিকে। এটা ইন্টারনাল এয়ারপোর্ট। ছুটির মরশুম বলে প্রচণ্ড ভিড়। মস্কো ছেড়ে অনেকেই এখন বেড়াতে যাচ্ছে। সারগেই এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বসাল। সেখানে মাত্র আমরা দুজন। এরকম জায়গায় বসতে কীরকম অস্বস্তি লাগে!

আরও খাতির করে আমাদের দুজনকেই প্রথমে তোলা হল বিমানে। আমার সুটকেসটা বুক না করিয়ে রেখে দেওয়া হল এয়ার হোস্টেসদের হেপাজতে, যাতে পৌঁছবার পর মাল খালাসের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। সিকিউরিটি চেকের সময় একটা বেশ মজা হল। পৃথিবীর সব বিমান বন্দরেই আজকাল এই ব্যবস্থা আছে। একটা মেটাল ডেটেকটার যন্ত্র সারা গায়ে বুলোয় অথবা একটা জায়গা পার হয়ে যেতে হয়, সন্দেহজনক কিছু থাকলে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ হতে থাকে। একজন মহিলা এখানে সিকিউরিটি চেক করছেন। আমার গায়ে যন্ত্রটা ছোঁয়াতেই প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ করে উঠল। পকেটে খুচরো পয়সা কিংবা কোমরের বেল্টের মুখটার জন্যও অনেক সময় এই শব্দ হয়। আমার পকেটে পয়সা নেই, বেল্টটা খুলে ফেললুম, তবু যন্ত্রটা ছোঁয়াতেই আবার সেই শব্দ। আমি গায়ের কোটটা খুলে ফেললুম, তবুও শব্দ থামে না। এবারে মহিলাটি হাত দিয়ে আমার গা টিপেটুপে দেখলেন, সন্দেহজনক কিছু নেই। তবে কি যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেল? তিনি নিজের গায়ে যন্ত্রটা বোলালেন, কোনও শব্দ নেই, সারগেই-এর শরীরে বোলালেন, তখনও নিঃশব্দ। কিন্তু আমার গায়ে ছোঁয়াতেই আবার বেশ জোরে প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাকতে লাগল।

একে কী বলা যায়, যন্ত্রের কৌতুক ছাড়া?

॥ ৪ ॥

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড দু-ঘণ্টার বিমান পথ। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এসে দেখলুম লবিতে প্রচণ্ড ভিড়, নানারকম ভাষায় কলস্বর। আমাদের জন্য দুটি ঘর অবশ্য আগে থেকেই বুক করা ছিল, ভিড় ঠেলে কাউন্টারে পৌঁছতেই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিখ্যাত নেভা নদীর ধারেই এই হোটেল লেনিনগ্রাড। খুবই বড় হোটেল এবং অত্যাধুনিক কায়দার। অর্থাৎ সবকিছুই চৌকো কিংবা রেক্টানগুলার। গত শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই স্থাপত্যে গম্বুজ, খিলান, গোল গোল থাম দেখা যেত, আধুনিক স্থাপত্যে এসবের কোনও স্থান নেই। মস্কোর হোটেলটিতে তবু খানিকটা পুরোনো-পুরোনো ভাব ছিল, কিন্তু এই হোটেলটি একেবারে ঝকঝকে সাম্প্রতিক ধরনের। এখানকার লিফটগুলি স্বয়ংক্রিয়।

আট তলার ওপর সারগেই আর আমি পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছি। সামনের জানলাটার পরদা সরাতেই অপূর্ব দৃশ্য। নেভা নদীর দু-পাশে সুন্দর গড়নের সব প্রাসাদের সারি। দূরে-দূরে দেখা যায় গির্জার চূড়া। নেভা নদী বেশ প্রশস্ত, অনায়াসেই জাহাজ যেতে পারে। এখান থেকে সমুদ্র

বেশি দূরে নয়।

নিজের ঘরে জিনিসপত্র রেখে এসে সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, ক্লান্ত?

মাত্র দু-ঘণ্টা প্লেন জার্নিতে ক্লান্ত হব কেন? তা ছাড়া শীতের দেশে এমনিতেই ক্লান্তি বোধ কম হয়।

আমি বললুম, না, না, চলো, বেরুবে নাকি?

সারগেই বলল, আমি লেনিনগ্রাডে আগে আসিনি। চলুন, খানিকটা হেঁটে শহরটাকে অনুভব করে আসি।

পোশাক না বদলেই বেরিয়ে পড়লুম। হোটেলের গেটের সামনে ভিড় আরও বেড়েছে। অনেকেই বোধহয় জায়গা পায়নি। আগামীকাল মে-দিবসের মিছিল দেখবার জন্যই বাইরে থেকে বহু টুরিস্ট আসছে।

নেভা নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা ছোট ব্রিজ পেরিয়ে এলুম। এই শহরের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি খাল এসে নেভা নদীতে পড়েছে। আমাদের হোটেলটি সেরকম একটি মোহানার কাছেই। বিশাল বিশাল বারোক স্টাইলের অট্টালিকা দেখলেই বোঝা যায়, এগুলি জার-এর আমলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি ছিল, এখন বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়।

লেনিনগ্রাডের ইতিহাস আমরা সবাই কিছু-কিছু জানি। এই শহরের বয়েস কলকাতার চেয়েও কিছু কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পিটার দা গ্রেট এখানে এই বন্দর-শহরটির পত্তন করে রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তখন এর নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। সুপরিকল্পিতভাবে অভিজাতদের জন্যই গড়া হয়েছিল নগরীটি। ডেকে আনা হয়েছিল ইউরোপের বিখ্যাত স্থপতিদের। চওড়া চওড়া রাস্তা, বড়-বড় পার্ক ঘিরে জমকালো সব বাড়ি। মাঝে-মাঝে খাল কেটে জলপথেরও ব্যবস্থা। এই শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়ালে চোখের আরাম হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় এই শহরটির নাম পালটে যায়। সেন্ট পিটার্সবার্গের বার্গ অংশটুকু জার্মান ভাষা, তার মানে দুর্গ। সুতরাং এ শহরের নতুন নাম হল পেট্রোগ্রাড। বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্রও ছিল এই শহর। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য পেট্রোগ্রাড নাম আবার বদল করা হয়।

হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে, শীত বেশি নেই। এইসব শীতের দেশে সন্ধ্যাগুলো খুব লম্বা হয়। এখন সাড়ে সাতটা বাজে, কলকাতায় এখন রীতিমতন অন্ধকার, লোডশেডিং হলে তো কথাই নেই, আর এখানে বেশ পরিষ্কার আলো। এইরকমই চলবে প্রায় ন'টা পর্যন্ত।

মোহানার মুখে একটা থেমে-থাকা জাহাজ দেখিয়ে সারগেই জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এই জাহাজটার কথা জানেন? এই হচ্ছে বিখ্যাত অরোরা।

আমি ব্যাট্‌লশিপ পোটেমকিনের কথা জানি, অরোরার নাম আগে শুনিনি।

সারগেই জানাল যে, এই অরোরা থেকেই বিপ্লবের সংকেত দিয়ে প্রথম তোপধ্বনি হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব স্কুলের ছেলে-মেয়েরাও এর নাম জানে। এখন জাহাজটিকে একটি মিউজিয়াম হিসেবে এখানে রাখা হয়েছে। যে-কেউ ভেতরে ঢুকে দেখতে পারে। তবে পাঁচটার মধ্যে আসতে হবে।

আমি সারগেইকে সামনে দাঁড় করিয়ে অরোরার একটি ছবি তুললুম। তারপর আর একটু বেড়িয়ে ফিরে এলুম হোটেলে। সারগেইকে এখন কিছু ফোনটোন করতে হবে। এখানকার এ পি এন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা, কাল সকালে মে-দিবস প্যারেড দেখতে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ঠিক করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবার জন্য সে চলে গেল। আমি জানলার কাছে চেয়ার টেনে বসে রইলুম চুপচাপ। নদীতীরের বাড়িগুলিতে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে আলোকসজ্জা।

হঠাৎ এক সময় আমার শরীরে রোমাঞ্চ হল। এই সেই সেন্ট পিটার্সবার্গ, এখানকার রাস্তা

দিয়ে ডস্টয়েভ্স্কি হেঁটেছেন! নিকোলাই গোগোল এখানে ইতিহাসের মাস্টারি করতে-করতে একদিন বুঝেছিলেন, সাহিত্যই তাঁর মুক্তির পথ; পুশকিন লিখেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস, একটি নিগ্রোকে নিয়ে। সাহিত্য জগতের বিশাল বিশাল বনস্পতিদের স্মৃতিজড়িত সেই শহরে আমি বসে আছি?

অনেকক্ষণ বসে রইলুম জানলার ধারে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে। খানিকবাদে ফিরে এল সারগেই। কাঁচুমাচু মুখে জানাল, ট্যাক্সি জোগাড় করা গেল না কিছুতেই। কাল মে ডে'র প্যারেডের জন্য অনেক রাস্তাতেই ট্রাফিক বন্ধ থাকবে, কোনও ট্যাক্সিই উইনটার প্যালেসে পৌঁছতে পারবে না। সুনীলজি, আপনি হেঁটে যেতে পারবেন তো?

সারগেই-এর মুখে সুনীলজি ডাক শুনে প্রত্যেকবারই আমার মজা লাগে। বাঙালিদের মধ্যে জি ব্যবহার করার রেওয়াজ নেই। উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতে ওই ডাক চলে। আমি অবশ্য সারগেইকে নিরস্ত করি না। ওর মুখে ওই ডাক বেশ মিষ্টি লাগে, আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কথা মনে পড়ে।

হোটেল লেনিনগ্রাডের বিভিন্ন তলায় টুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরনের রেস্তোরাঁ আছে। তার মধ্যে দু-একটিতে গান-বাজনা, নাচেরও ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা ঘুরে ঘুরে সব ক'টি দেখে নিয়ে মাঝারি ধরনের একটিতে নৈশভোজ সেরে নিলুম।

আমার দরজার কাছে এসে যখন শুভরাত্রি বলে বিদায় নিতে গেল সারগেই, আমি ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আমায় কিছু পয়সা দেবে?

সারগেই অবাক।

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, সকালবেলা তোমার আগেই যদি আমার ঘুম ভাঙে তাহলে আমি এক কাপ চা কিনে খেতে চাই।

সারগেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনার যখনই দরকার হবে আমাকে ডাকবেন। এমনকী মাঝরাত্তিরেও দরকার হলে ডাকবেন বিনাদ্বিধায়।

তবু আমি নাছোড়বান্দার মতন ওর কাছ থেকে এক রুবল্ আদায় করলুম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমার সহজে ঘুম এল না। কাল রাতে মস্কো ছিল নতুন জায়গা, আজ আবার নতুন জায়গায় এসেছি, বিছানার সঙ্গে দু-এক রাত্তির ভাব না জমলে ভালো ঘুম হয় না। আমার এই ঘরটি ডাব্‌ল বেড। ঘরের দুপাশে দুটি বিছানা পাতা। আমি একবার এক বিছানায় আর একবার অন্য বিছানায় শুতে লাগলুম। যেন আমি একাই দুজন মানুষ।

কাচের জানালায় পরদা টানিনি বলে ভোরের প্রথম আলো চোখে পড়ামাত্র ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে অবশ্য খুব ভোর নয়, পৌনে আটটা বাজে, কিন্তু বাইরে আবছা আবছা অন্ধকার রয়েছে এখনও। পাজামা-পাঞ্জাবি আর চটি পরেই বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। আমাদের ফ্লোরের এক প্রান্তে একটি ছোট রেস্তোরাঁ আগেই দেখে রেখেছিলুম, সেখানে এসে দেখলুম, সেটি সদ্য খুলেছে, একজন বৃদ্ধা বসে আছেন কাউন্টারে। আমিই প্রথম খদ্দের।

বৃদ্ধা মহিলা হেসে রাশিয়ান ভাষায় আমায় সুপ্রভাত জানালেন, আমি জানালুম ইংরেজিতে। প্রথমে এক কাপ চা নিলুম, তার স্বাদ আমার মনঃপূত হল না, তারপর এক কাপ কফি নিয়ে স্বাদটা বেশ ভালো লাগল।

ফিরে এসে দিনের প্রথম সিগারেটটি উপভোগ করার পর বেজে উঠল টেলিফোন। সারগেই বলল, সুনীলজি, এবার বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন, আমাদের সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। ব্রেকফাস্ট বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

আমি বললুম, আমি তো তৈরি।

আজ আকাশ সামান্য মেঘলা। গরম জলে স্নান সেরে নেওয়ার ফলে শরীরটা বেশ তরতাজা লাগছে। এখন আমি পাঁচ-দশ মাইল অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি।

নেভা নদী পার হওয়ার সময় ব্রিজের মাঝখানে একবার দাঁড়ালুম। যে-কোনও নতুন নদী প্রথমবার পার হওয়ার সময় বেশ কিছুক্ষণ নদীর সৌন্দর্য না দেখে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তাড়াহুড়ো করে, অন্যমনস্কভাবে কোনও নদী পার হওয়া উচিত নয়। সমস্ত জলেরই চরিত্র আলাদা।

আমরা ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছিলুম যে এই নেভা নদীর জল বছরে চার-পাঁচ মাস জমাট বরফ হয়ে থাকে। নদীর মোহানাতেও এত বরফ জমে যে জাহাজ ঢুকতে পারে না। এখন কিন্তু জলের প্রবাহ বেশ স্বাস্থ্যবান।

সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি জলের দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন?

আমি বললুম, কিছুই না। এমনিই, জল দেখতে আমার ভালো লাগে।

সারগেই বললেন, নদীর স্রোতের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা মিল আছে, না? দুটোই বয়ে চলেছে, আমরা শুধু ওপরের দিকটা দেখতে পাই, গভীরতা চোখে পড়ে না—

আমি হাসলুম। আমার অবশ্য এরকম কোনও কথা মনে পড়ে না। সারগেই এখনও ছেলেমানুষ, ও বোধহয় সবকিছুই উপমা দিয়ে দেখতে ভালোবাসে।

ব্রিজ পার হওয়ার পর বড় একটা স্কোয়ার। রাস্তা চলে গেছে নানা দিকে। সারগেই নিজের রাস্তা চেনে না। পুলিশদের জিগ্যেস করে করে এগুতে লাগলুম। ক্রমেই দেখা গেল, রাস্তার দু-পাশে বহু গাড়ি থেমে আছে, কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝখানে বড় বড় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দলে দলে মিলিশিয়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। আমরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে এক একটা বাধা পার হতে লাগলুম।

মস্কোয় যেমন ক্রেমলিন, লেনিনগ্রাডে প্রায় সেই রকমই হচ্ছে উইন্টার প্যালেস। এক সময় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। একটি বিশাল চত্বরের চার পাশ ঘিরেই সুরম্য সব প্রাসাদ। এইখান থেকেই মে দিবসের শোভাযাত্রা শুরু হবে। একদিকে কাঠের গ্যালারি করা আছে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য। ঠিক দশটার সময় উৎসব শুরু হবে, গ্যালারির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বহু মানুষ। দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে অনেক ছোট ছোট দোকান। কফি, চা, ঠান্ডা পানীয়, স্যান্ডউইচ, সসেজ, আলুর চপ, ডোনাট ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে। এইসব টুকিটাকি খাবার খেয়ে আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে নিলুম। হঠাৎ টিপি টিপি বৃষ্টি হতেই শীত বেড়ে গেল। শীত তাড়াবার জন্য কফি খেতে লাগলুম ঘন-ঘন।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সমবেত দর্শকদের মধ্যে প্রায় সবাই বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা, সঙ্গে বাচ্চা বা কিশোর-কিশোরীরাও আছে, কিন্তু যুবক-যুবতী একজনও নেই। একটু পরেই এর কারণ বুঝেছিলুম।

গ্যালারিতে ভিড় হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা আমাদের আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকে এলুম ভেতরে। যে অংশটায় আমাদের আসন, সেখানে সবাই মনে হল বিদেশি। অনেকেরই হাতে টিভি ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা। পৃথিবীর বহুদেশের মানুষ রয়েছে, কিন্তু ভারতীয় আর একজনও চোখে পড়ল না।

মাঝে এক পশলা বেশ জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। আমি ওভারকোট এনেছি বটে, কিন্তু মাথার টুপি কিংবা দস্তানা আনিনি। এত ঠান্ডা লাগছে যে কোটের পকেট থেকে হাত বার করতে পারছি না। অন্য সকলেরই গলায় টাই বা স্কার্ফ জড়ানো। ১৯৬৩ সালে মার্কিন দেশের একটি ছোট শহরে আমি গলা থেকে টাই খুলে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনে আর কখনও টাই পরব না। এখন মনে হল, একটা অন্তত মাফলার আনলে মন্দ হত না!

ঠিক দশটার সময় দেখা গেল ময়দানের এক প্রান্ত দিয়ে একটি শোভাযাত্রা ঢুকছে। তাদের হাতে নানারকম পতাকা ও ছবি। কয়েক মিনিটের মধ্যে চত্বরটি পূর্ণ হয়ে গেল। শোনা গেল অনেক ধরনের যন্ত্র-সঙ্গীত। চতুর্দিক থেকে মাইক্রোফোনে ধ্বনি উঠল, রুশ ভাষায়, শ্রমিক ও কৃষক ঐক্য, হু-র-রা! অমনি সমবেত কণ্ঠ বলে উঠল, হু-র-রা।

তারপর শোভাযাত্রার স্রোত বইতেই লাগল। অতি সুন্দর বর্ণময় দৃশ্য! প্রথম দিকে এল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর প্রতিনিধিরা, তারপর নানারকম কল-কারখানার কর্মী, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী। এরা প্রায় সবাই তরুণ-তরুণী। প্রান্তর পূর্ণ হয়ে গেলে একদল গান গাইতে-গাইতে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে ঢেউ-এর পর ঢেউ আসছে। মাইক্রোফোনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করে বলা হচ্ছে হু-র-রা!

মে-দিবসের মিছিল সম্পর্কে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আমি ভেবেছিলুম এখানে কামান-বন্দুক-মিসাইলেরও প্রদর্শনী হয়। সেসব কিছু না! সকলে একরকম পোশাক পরেও আসেনি, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা ছাড়া। এখানে এসেছে সবাই ছুটির উৎসবের মেজাজে, পোশাকেও নানারকম বৈচিত্র্য। অনেকেই বেশ সাজগোজ করে এসেছে।

যৌবনের এই আনন্দময় দৃশ্যের তুলনা হয় না। এই মিছিলে কোনও ধরাবাঁধা নিয়মের কড়াকড়ি নেই। হাস্যময় তরুণ-তরুণীরা গান গাইতে-গাইতে আসছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে। এই যৌবন জলতরঙ্গের যেন শেষ নেই।

শীতের মধ্যে টানা দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। আরও কতক্ষণ চলবে কে জানে!

সারগেই একসময় জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এবারে যাবেন, না আরও দেখবেন?

শেষ হওয়ার আগেই চলে যাওয়া উচিত কি না আমি মনে-মনে ভাবছিলুম। সারগেই-র প্রশ্ন শুনে বললুম, এবারে গেলে মন্দ হয় না।

গ্যালারি থেকে নেমে আমরা চলে এলুম রাস্তায়। এখান দিয়েও মিছিল চলছে। একই মিছিল ভেদ করে অন্যদিকে যাওয়ার উপায় নেই, তা সঙ্গতও নয়। একমাত্র উপায় এই মিছিলে যোগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া। তাই করলুম।

ছাত্রজীবনে আমি কলকাতায় কয়েকবার মে-দিবসের মিছিলে যোগ দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু কোনওদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে একদিন রাশিয়ায় মে-দিবসের মিছিলে আমি অংশগ্রহণ করব? এ এক বিচিত্র অনুভূতি। কেউ আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে না, দু-একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া।

সেই মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলে এলুম নেভা নদী পর্যন্ত। এবারে দেখলুম, এক একটা দল মিছিল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যার যার বাড়ির দিকে। সুতরাং আমরাও যেতে পারি।

আমাদের পাশে পাশে একটা ছোট দল যেতে লাগল নানারকম গান গাইতে-গাইতে ও হাসাহাসি করতে-করতে। গানের সুর শুনে মনে হয় কোনও পল্লিগীতি। মনে হয় খুব চেনা।

দুপুরে খেয়েদেয়ে একখানা ঘুম দেওয়ার জন্য খুব মন কেমন করছিল। কিন্তু তার উপায় নেই। তিনটের সময়েই আর একটা প্রোগ্রাম আছে। এখন বাসে করে যেতে হবে মাইল তিরিশেক দূরে, পুশকিন শহরে।

॥ ৫ ॥

আমাদের হোটেলের ব্যবস্থাপনাতেই তিন-চারটি বাস ছাড়ল পুশকিন শহরের উদ্দেশ্যে। আমি আর সারগেই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসে উঠে বসলুম। একটি ফুটফুটে তরুণী মেয়ে আমাদের গাইড। সে একটি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রাস্তার দু-ধারের বর্ণনা দিতে লাগল। আমি কিছুক্ষণ নিসর্গ দেখায় মন দিলুম। খুব একটা দেখবার কিছু নেই। মস্কোতে যেমন, লেনিনগ্রাডেও তাই, শহরের উপান্তে অসংখ্য ফ্ল্যাট বাড়ি। সোভিয়েত দেশের নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে বাসস্থান দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এখানে নাকি প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা করে নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

শহর ছাড়াবার পর বৃক্ষবিরল সমতলভূমি। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বসতি ও কল-কারখানা। এমন কোনও সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ল না, যার কথা বাড়িতে চিঠি লিখে জানানো যায়। বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি বাসের যাত্রীদের লক্ষ করতে লাগলুম।

প্রায় সকলেই বিদেশি ভ্রমণকারী। বুলগেরিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান। এর মধ্যে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই প্রৌঢ় লোকটি লম্বায় সাড়ে ছ'ফিটের বেশি তো হবেনই, বসা-অবস্থাতেই তাঁকে গাইড-মেয়েটির সমান মনে হচ্ছে। এক একজন দুর্ভাগা মানুষের ফিসফিস করে কথা বলার ক্ষমতা থাকে না, এই ব্যক্তিটি সেরকম। ইনি এঁর স্ত্রীর সঙ্গে যে নিভৃত আলাপ করছেন, তাও যেন মাইক্রোফোনে প্রচারিত হচ্ছে। এই কম্বুকণ্ঠ ব্যক্তিটির নাম, আমি মনে মনে রাখলুম, মিঃ গোলায়াথ। ওল্ড টেস্টামেন্টের ডেভিড যার সঙ্গে লড়াই করেছিল। মিঃ গোলায়াথের নাক, ঠোঁট, চোখ সবই বড়-বড়, ভুরু দুটি এত মোটা যে মুখখানাকে সবসময়েই বিস্মিত মনে হয়। এঁর স্ত্রী বেশ ছোট্টখাট্টো এবং মৃদুভাষী। আমার ঠিক সামনেই বসে আছে এক ফরাসি দম্পতি, তবে আজকালকার কেতা অনুযায়ী ওদের বোধহয় বিয়ে হয়নি, তাই প্রেম খুব গভীর, অন্য কারুর দিকে তাকাবার ফুরসত পর্যন্ত নেই। অন্যান্য যাত্রীরা সাধারণ টুরিস্টের মতন, আমি ছাড়া আর সবাই বেশ সুসজ্জিত।

মিঃ গোলায়াথ গাইড-মেয়েটিকে নানান প্রশ্ন করছেন। বাসে ওঠবার পরেই তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আটাশ বছর আগে তিনি একবার লেনিনগ্রাডে এসেছিলেন, সেই স্মৃতি তাঁর কিছু-কিছু মনে আছে। গাইড-মেয়েটির বয়েস আটাশের অনেক কম, অত আগের কথা তার জানবার কথা নয়। তা ছাড়া উত্তর দেওয়ার সময় ঠিক ইংরিজি শব্দটা খোঁজবার জন্য সে প্রায়ই মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে ফেলছে, অন্য কোনও যাত্রী তাকে সাহায্য করছে বাক্যটি শেষ করতে। মিঃ গোলায়াথের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে অনেকেই মজা পাচ্ছে বেশ।

মিনিট চল্লিশেক-এর মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম পুশকিনে। বাস থেকে নেমেই বোঝা গেল এটি একটি প্রাসাদপুরী। এককালের রাজা-রাজড়াদের বিলাস ভবন। পিটার দা গ্রেট এবং বিখ্যাত রানি ক্যাথরিনের-স্মৃতি-বিজড়িত। আগে এই জায়গাটির অন্য নাম ছিল; পুশকিন এখানে লেখাপড়া করেছেন এবং তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবন এখানে কাটিয়েছেন বলে এখন তাঁর নামেই শহরটি নামাঙ্কিত। রাশিয়ায় কবি-সাহিত্যিকদের নামে অনেক শহরেরই নাম রাখা হয়েছে।

পুশকিনের কথা ভাবলেই আমার বায়রনের কথা মনে পড়ে। রোমান্টিকতায় ও জীবনযাপনে দুজনের অনেকটা মিল আছে। দুজনেই লিখেছেন গাথাকাব্য। অবশ্য লেখক হিসেবে পুশকিনের প্রভাব অনেক ব্যাপক। অভিজাত ঘরের সন্তান হয়েও পুশকিন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে কলম ধরেছেন। এজন্য তাঁকে নির্বাসনের যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর লেখা 'ইউজেন ওনেজেন'-কে বলা হয় রুশ ভাষার প্রথম উপন্যাস। পুশকিনের 'ইস্কাবনের রানি' নামের গল্পটি অনেক বাঙালি পাঠকের কাছেই পরিচিত। পুশকিনের অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় আমি মুগ্ধ হয়েছি এক সময়।

প্রেমের ব্যাপারেও পুশকিন বায়রনকে টেক্কা দিয়েছিলেন। বত্রিশ বছর বয়েসে পুশকিন এক অসাধারণ রূপসি মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যে পুশকিনের নিজের ভাষাতেই তাঁর জীবনের ১১৩ নম্বর নারী। সেই নারীও তার চরিত্র নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসত, এবং, এবং সেই কারণেই কয়েক বছরের মধ্যেই এক ডুয়েল লড়তে গিয়ে পুশকিন প্রাণ হারান।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম রাজপ্রাসাদটির সামনে। কুড়ি-পঁচিশ জনের এক একটি ব্যাচকে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে। বাইরে থেকেই প্রাসাদটিকে বেশ জমকালো দেখায়, মিশ্রিত রাশিয়ান বারোক স্থাপত্যের একটি বৃহৎ নিদর্শন। ক্যামেরা বার করে ছবি তুলে ফেললুম কয়েকটা।

ভেতরে ঢুকে আমাদের আর এক জোড়া করে জুতো পরতে হল। প্রতিটি কক্ষের মেঝেতেই অতি মূল্যবান সব কাঠের কাজ আছে, বাইরের জুতো পরে তার ওপর দিয়ে এত লোক হাঁটলে

সেসব অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। আবার এদেশে খালি পায়ে হাঁটার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেই জন্য এখানে আলাদা কাপড়ের জুতো রাখা আছে অনেক। সেইগুলো পায়ে গলিয়ে নিতে হবে। আমার কৌতূহল হল, আমাদের মিঃ গোলায়াথের পায়ের মাপের জুতো পাওয়া যাবে কি? তাও পাওয়া গেল এক জোড়া।

প্রাসাদটির প্রতিটি কক্ষের বর্ণনা আমি দেব না। সম্রাট-বাদশাদের বিলাস ভবন যে-রকম হয় এটিও প্রায় সেইরকমই। এই প্রাসাদের মধ্যেই রয়েছে দুটি গির্জা, অসংখ্য ঘরের মধ্যে কোনওটি রাজা-রানির শয়নঘর, কোনওটি বিকেলে বসবার ঘর, কোনওটি সকালের, কোনওটি বিদেশি অতিথিদের জন্য, কোনওটি একলা একলা খাওয়ার জন্য, কোনওটি বেশি লোকের সঙ্গে ভোজসভার জন্য, কোনওটি আকাশ দেখবার জন্য, কোনওটি বই পড়বার জন্য ইত্যাদি। এ ছাড়া চোখ ধাঁধানো নাচঘর।

এখানকার দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলব। প্রজাদের শোষণ করা টাকায় এক সময় রাজা-বাদশাদের হুকুমে অনেক প্রাসাদ এবং শিল্পকীর্তি রচিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য রাজা-বাদশাদের আলাদা কোনও কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব হচ্ছে সেইসব স্থপতি ও শিল্পীদের, যাঁরা ওইসবের পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছেন। তাজমহলের জন্য শাজাহান শুধু হুকুম দিয়েছেন আর রাজকোষ খুলে দিয়েছেন। তাঁর কি স্থাপত্য সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল? সেইরকম খাজুরাহো বা কোনারক দেখতে গিয়েও আমরা শুধু শুনি সেগুলি কোন রাজার আমলে তৈরি, শিল্পীদের নাম কেউ মনেও রাখেনি। এখানে কিন্তু রুশ গবেষকরা খুঁজে-খুঁজে বার করেছেন শিল্পীদের নাম, গাইডরা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যখন আমাদের বিভিন্ন শিল্প-সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলেন, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছিলেন আসল শিল্পীদের নাম। মূল প্রাসাদটির স্থপতি বারতোলোমিও রাস্টেডেল্লি। নাম শুনে মনে হয় ইটালিয়ান।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল সোভিয়েত সরকারের ঐতিহ্যপ্রীতি। এ দেশের অভিজাততন্ত্র একেবারে মুছে ফেলা হলেও আগেকার দিনের প্রাসাদ, মূর্তি, স্তম্ভ কিছুও নষ্ট করা হয়নি, সব অবিকৃত রাখা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, এই প্রাসাদটিও অর্ধেকটা নাতসিরা ধ্বংস করে দিয়েছিল, নাতসিরা এই শহরটি অধিকার করে এখানে থেকেও গেছে অনেকদিন, তখন যা খুশি ভাঙচুর করেছে। এখানকার মানুষ আবার পরম যত্নে সেইসব ভাঙা অংশের পুনরুদ্ধার করছে। যেমন তেমন মেরামত নয়, হুবহু আগের মতন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আমরা দেখলুম, এখনও শিল্পীরা ছবি দেখে-দেখে এক-একটা ঘর ঠিক আগের মতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে আটত্রিশ বছর আগে।

ঘুরতে-ঘুরতে আরও একটি ব্যাপারে চমকিত হলুম। আমাদের সহযাত্রী মিঃ গোলায়াথের কথাবার্তা শুনে বাসের মধ্যে অনেকেই মুখ টিপে হাসছিলুম, কিন্তু এখন দেখা গেল, ওই দৈত্যাকারের লোকটি কিন্তু একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞ। বিভিন্ন ঘরে যেসব ছবি আছে, অনেক শিল্পীর নামই অপরিচিত, সেসব ছবি দেখে কিন্তু ওই ভদ্রলোক শিল্পীদের নাম, রঙের ব্যবহারের বিশেষত্ব, রীতি, শিল্প-ইতিহাস বলে যাচ্ছিলেন গড়-গড় করে, গাইডরাও অতশত জানে না।

প্রাসাদ সফর শেষ হওয়ার পর অনেকেই গেল পার্শ্ববর্তী পুশকিন-সংগ্রহশালা দেখতে। আমার আর ইচ্ছে হল না। মিউজিয়ম বা এই ধরনের বড়-বড় বাড়ি হেঁটে-হেঁটে ঘুরতে বেশ ক্লান্তি লাগে। সামনের বাগানে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, আজ আর কোথাও যাওয়ার নেই তো?

সারগেই বলল, নাঃ, আজ আর কিছু নেই। ছুটির দিন বলে এখানকার এ পি এন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি, জানি না ওর কিছু ঠিক করে রেখেছিল কি না।

আমি বললুম, আর কিছু থাকলেও আজ আর আমি যেতুম না।

বলেই আমি দুবার হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে উঠলুম। সকালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে গেছে।

বাস ছাড়ার সময়টা আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই সেখানে জড় হয়ে গেল। বাসটা চলতে শুরু করার খানিকক্ষণ পরে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে লাগল, কীসের যেন অভাব বোধ করছি। আরও একটু পরে একজন যাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে গাইড মেয়েটিকে কী যেন বললে। মেয়েটিও খুব বিচলিতভাবে কথা বলতে লাগল ড্রাইভারের সঙ্গে। কিছু যেন একটা ঘটেছে।

আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার?

সারগেই হাসতে-হাসতে বলল, সেই লম্বা আমেরিকান ভদ্রলোক মিসিং। তিনি আর তাঁর স্ত্রী বাসে ওঠেননি!

সেইজন্যই এতক্ষণ এত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল বাসটাকে।

এখন কী করা যাবে, তাই নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিল। বাসটা প্রায় দশ-বারো মাইল চলে এসেছে, এদিকে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অনেকেই ক্লান্ত, এখন আবার বাসটা অতদূরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? একজন বলল, আরও তো কয়েকটি বাস রয়েছে, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই অন্য বাসে চলে আসবেন। গাইড মেয়েটি বলল, সবক'টি বাসই তো ভরতি, অন্য কোনও বাস ওঁদের নেবে কিনা সন্দেহ। একজন বললে, কেউ বিপদে পড়লেও নেবে না? আর একজন বলল, অন্য বাসও তো ছেড়ে দেবে, উনি যদি কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে থাকেন? পরে আর ফেরবার উপায় নেই। আর একজন বলল, আমি ভদ্রলোককে একবার দেখেছিলুম, একটা সুভেনিরের দোকানে কেনাকাটা করতে।

শেষ পর্যন্ত গাইড-মেয়েটি বলল, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। বাসটির মুখ ফেরানো হল।

আবার সেই প্রাসাদের কাছাকাছি এসে দেখা গেল সস্ত্রীক মিঃ গোলায়াথ রাস্তায় একটি স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। সম্ভবত উনি গাড়িটি ভাড়া করতে চাইছেন, কিংবা গাড়িটা একেবারে কিনে ফেলার প্রস্তাব দেওয়াও বিচিত্র নয়।

আমাদের বাসের একজন যাত্রীও ভদ্রলোককে কোনও অভিযোগ জানাল না। গাইড-মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আমরাই ভুল করে আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।

বাসে উঠে সেই দৈত্যাকার, বজ্রকণ্ঠ মানুষটি শিশুর মতন সরল মুখ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনাদের অসুবিধে ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত। দোষ আমারই।

এই ছোট্ট ঘটনাটি দেখে আমার মনে হল, সোভিয়েত দেশের সাধারণ মানুষ আমেরিকার সাধারণ মানুষের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে না। সব দেশের সাধারণ মানুষই তো সমান।

সন্ধেবেলা হোটেলে ফিরে আমি আরও কয়েকবার হাঁচতে লাগলুম। সারগেই বলল, দাঁড়ান, আপনার জন্য ওষুধ আনছি।

সে এনে হাজির করল এক বোতল ভদ্‌কা।

এ দেশে এসে এখনও এ দেশের জাতীয় পানীয় আস্বাদ করা হয়নি বটে। আমি গেলাস ধুয়ে নিয়ে এলুম। ভদ্‌কার জন্য খুব ছোট-ছোট গেলাস লাগে, কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? সারগেই আমাকে বোঝাতে লাগল ভদ্‌কা জিনিসটা কী ও কতরকম হয়। আমি শুনে গেলুম বাধা না দিয়ে। রাশিয়ান ও পোলিশ ভদ্‌কা ইউরোপের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, আমেরিকাতেও পাওয়া যায়, এমনকী কলকাতাতেও জোগাড় করা অসম্ভব কিছু না। ও আমার অনেকবার চেখে দেখা আছে।

ভদ্‌কা এক ঢোঁকে গলায় ঢেলে দেওয়ার নিয়ম। প্রথম গেলাসটি নেওয়ার পর সারগেই আমাকে বলল, সুনীলজি, সাবধানে খাবেন, এ জিনিস খুব কড়া। আমি তো ইন্ডিয়াতে গেছি, আমি দেখেছি ইন্ডিয়ানরা বেশি ড্রিংক করতে পারে না।

আমি সুন্দরবনের হাঁড়িয়া, সাঁওতাল পরগনার মহুয়া, বালাসি-টোলার এক নম্বর, পার্বত্য চট্টগ্রামের চার চোঁয়ানি, মেক্সিকোর টাকিলা, গ্রিসের উজো খেয়ে দেখেছি, সেই সবের তুলনায় এই ভদ্‌কা আমার তেমন কড়া মনে হল না।

সারগেই অবশ্য বেশ সাবধানী সুরাপায়ী। একটা দুটো খেয়েই বলল, আমার যথেষ্ট হয়েছে। সারগেই-এর খানিকটা স্বাস্থ্যবাতিক আছে। ও আমাকে বলল, এক সময় আমি খুব সিগারেট খেতুম, খুব ড্রিংক করতুম, এখন ছেড়ে দিয়েছি। সে কথা শুনে আমি হেসে খুন। বাইশ বছরের ছেলে, কবেই বা ধরল, কবেই বা ছাড়ল?

গেলাসের পর গেলাস উড়িয়ে আমি বোতলটা শেষ করে ফেললুম এক সময়। খুব একটা বেশি কিছু নয়। এইসব ভদ্‌কার বোতলের ছিপি খুব পাতলা। একবার খুললে আর লাগাবার ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ এই বোতল খুলে একবারেই শেষ করে দেওয়া নিয়ম!

সারগেই বিদায় নেওয়ার পর আমি কিছুক্ষণ বইটই পড়লুম। আজও সহজে ঘুম এল না। ঘুমের আবার এ কী ব্যাপার হল? অবশ্য রাত্তিরে ঘুম না হলে আমি ব্যতিব্যস্ত হই না, বরং নিজেকে নিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটানো যায়।

মে-দিবস উপলক্ষে এখানে পর পর দুদিন ছুটি। সারগেই এ পি এন অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না, তবে আগে থেকেই আজকের অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে আছে।

হোটেল থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রেলওয়ে স্টেশনে মাত্র পাঁচ মিনিটে পৌঁছে গিয়ে বুঝলুম, ট্যাক্সি না নিলেও চলত। এটির নাম ফিনল্যান্ড স্টেশন, এখান থেকে সরাসরি ট্রেন ফিনল্যান্ড যায়। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে আত্মগোপন করতে হলে লেনিন ফিনল্যান্ডে চলে যেতেন। আমরা অবশ্য ততদূর যাব না, আমাদের গন্তব্য পঁচিশ মাইল দূরে কোমারোয়া নামে একটা ছোট্ট জায়গা।

এখন বেলা এগারোটা, লোকাল ট্রেনে বেশি ভিড় নেই। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় ট্রেন আজকাল জনপ্রিয় নয়। আমরা একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসলুম। সারগেই শোনাল তার ভারতীয় রেলযাত্রার অভিজ্ঞতার কাহিনি। একবার তাকে বোম্বে থেকে নাগপুর যেতে হয়েছিল, হঠাৎ সেই সময় তার খুব জ্বর হয়েছে। ট্রেনে রিজার্ভেশন নেই। অসহ্য ভিড়ের মধ্যে সারারাত কাটাবার সময় তার মনে হয়েছিল, সে বুঝি হঠাৎ মরেই যাবে।

অবশ্য সারগেই-এর বর্ণনার মধ্যে কোনও তিক্ততা ছিল না। সে জানে, ভারতবর্ষ অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে ভুগছে। সেই তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ায় জনসংখ্যা কমতির দিকে।

চলন্ত ট্রেনে হঠাৎ এক সময় মাইক্রোফোনে অনেকক্ষণ ধরে কী সব ঘোষণা হতে লাগল। আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, কী বলছে? সারগেই বলল, ও চাকরির খবর। রেলে কতগুলো চাকরি খালি আছে, কত মাইনে, কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যদি যাত্রীদের মধ্যে কেউ ওইসব চাকরি নিতে উৎসাহিত হয়।

আমি হতবাক! রেলে চাকরি খালি? লোক পাওয়া যাচ্ছে না, যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে? আমাদের দেশে রেলের চাকরিতে দশটা পোস্ট-এর জন্য বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত দশ হাজার দরখাস্ত পড়ে না? আমরা সবাই একই পৃথিবীর মানুষ?

কাল রাত্তিরেই আমি একবার ১৯৮৩ সালের ইয়ার-বুকে সোভিয়েত নাগরিকদের চাকরির অবস্থার কথা পড়ছিলুম। এ দেশের প্রত্যেক মানুষের কাজ পাওয়ার অধিকার আছে। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ইচ্ছে মতন চাকরি বেছে নেওয়ার অধিকারও হয়েছে। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর প্রত্যেকের চাকরি বাঁধা। ১৯৩০ সালের পর থেকে এদেশে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ উঠে গেছে। ইদানীং পনেরো থেকে পঁচিশ লাখ চাকরি খালি যায়, লোক পাওয়া যায় না।

এটা একটা দারুণ উন্নতির প্রমাণ। যে-সমাজে প্রতিটি মানুষই কাজের অধিকার পায়, সে সমাজে সবাই সসম্মানে বাঁচতে পারে। ইংল্যান্ড-আমেরিকাতে এখন বেকারিত্ব প্রকট। আমেরিকায় বর্তমানে বেকারের সংখ্যা শতকরা ১৬ জনের বেশি। অবশ্য, এই সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, ইংল্যান্ড-আমেরিকা-কানাডার মতন সোভিয়েত রাশিয়াকে বহিরাগতদের চাপ সহ্য করতে হয় না। বহিরাগতদের জন্যই ইংল্যান্ডে বর্ণ-সমস্যা এবং বেকার সমস্যা পাশাপাশি চলছে। আমেরিকা বা

কানাডার যে-কোনও ছোট শহরেও কালো মানুষ, চিনে, আরব, ভারতীয় চেহারার নতুন নাগরিক দেখা যায়। রাশিয়ায় সে সমস্যা নেই।

ছোট-ছোট স্টেশন আসছে যাচ্ছে, লোকজনের ওঠা-নামা খুবই কম। খানিকবাদেই আমাদের জায়গাটায় পৌঁছে গেলুম। বেশ একটা পরিচ্ছন্ন গ্রামের মতন। আমরা যাব এখানকার একটি রাইটার্স হোমে। স্টেশনের একজনকে জিগ্যেস করে সারগেই পথ-নির্দেশ জেনে নিল।

গাছের ছায়া-ফেলা পথ ধরে আমরা হাঁটতে লাগলুম। দুপাশে শান্ত-নির্জন বাড়ি। অধিকাংশ বাড়িই তালা দেওয়া, কোনও-কোনও বাড়িতে কুকুর রয়েছে দেখলুম, অর্থাৎ মানুষও রয়েছে। নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এদেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা নিষিদ্ধ নয়। গ্রামের দিকে অনেকেরই ডাচাউ বা কানট্রি হাউস থাকে। ছুটিছাটায় বেড়াতে আসে।

আমরা যে-লেখকের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, তাঁর পরিচয় বেশ অভিনব। সোভিয়েত দেশের উত্তরাঞ্চলে, আর্কটিক ওশানের কাছে, বরফের রাজ্যে, চুকচা নামে একটি উপজাতির বাস। জনসংখ্যা মাত্র পনেরো হাজার। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই চুকচাদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যেহেতু মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে বিশ্বাসী, তাই চুকচাদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাদের ভাষার একটা লিখিত রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং এক জেনারেশনেই তাদের মধ্যে একজন লেখক সারাদেশে যশস্বী হয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনেও আমি এঁর লেখা দেখেছি।

মধ্যবয়স্ক এই লেখকটির নাম রিথিউ ইউরি সারগেইভিচ। ইনি পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, কলকাতাতেও এসেছেন।

রাইটার্স হোম একটি বেশ বড় বাড়ি। তাতে আলাদা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট, সেখানে এসে লেখকরা থাকতে পারেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, টাইপ-রাইটার ও টেলিফোন আছে, খরচ নামমাত্র। রিথিউ সারগেইভিচ আমাদের নিয়ে তাঁর লেখার ঘরে বসিয়ে বললেন, হ্যাঁ, কলকাতার কথা আমার মনে আছে, কলকাতায় বেশ প্রাণ আছে!

ইনি ইংরিজি জানেন না। সারগেই আমাদের দো-ভাষী। নিজের মাতৃভাষা ছাড়াও ইনি অবশ্য রুশ ভাষা ভালোই জানেন, ইচ্ছে করলেই রুশ ভাষায় লিখতেও পারেন, কিন্তু নিজেদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সেই ভাষাতেই লিখে যেতে চান। তাতে অবশ্য প্রচারের অসুবিধে কিছু নেই। কারণ লেখামাত্র অনুবাদ হয়ে যায়। যে-ভাষার সমগ্র জনসংখ্যাই মাত্র পনেরো হাজার, সেই ভাষার একজন লেখক হয়েও ইনি লেখাটাকেই জীবিকা করতে পেরেছেন, লেনিনগ্রাড শহরে এঁর নিজস্ব একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সংসার-খরচের জন্য চিন্তা করতে হয় না। ইচ্ছেমতন ভ্রমণ করতে পারেন।

বিদেশি কোনও লেখকের সঙ্গে কথা বলতে আমার অনেক ক্ষেত্রেই বেশ অসুবিধে হয়। ওঁরা আমাদের লেখাটেখা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ আমরা ওদের সম্পর্কে মোটামুটি জানি। রিথিউ সারগেইভিচেরও একটি ছোট গল্প অন্তত আমার আগেই পড়া আছে। একটি ছেলেকে নিয়ে গল্প, তারা বাবা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেত, ছেলেটি অপেক্ষা করত কবে বাবা আসবে, কবে বাবা আসবে। একবার বাবা ফিরে এল না। সবাই ধরে নিল সে সমুদ্রে নৌকোডুবি হয়ে মারা গেছে। কয়েক বছর পরে ছেলেটি তার বাবাকে অন্য একটি শহরে দেখতে পায়, কিন্তু সে কথা সে তার মাকে জানাল না। সেটাই তার জীবনের প্রথম গোপন কথা।

একটি গল্প পড়েই সেই লেখকের রচনাভঙ্গি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়। কিন্তু আমার সম্পর্কে উনি কী ধারণা করবেন?

যাই হোক, খানিকক্ষণ গল্প-টল্প হল। আমি ওঁকে ওঁর লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে টুকিটাকি কয়েকটা প্রশ্ন করলুম। উনি ওঁর স্বজাতির নানান লোক-কাহিনি, গ্রাম্য জীবন বিষয়েই বেশি লিখতে চান।

অবশ্য আধুনিক শহরে জীবন নিয়েও কিছু-কিছু লিখেছেন। রুশ ক্লাসিকাল সাহিত্য ওঁর বেশ ভালোই পড়া আছে।

এক সময় উনি নিজেই চা তৈরি করে খাওয়ালেন।

আমি জিগ্যেস করলুম, এইরকম নির্জনবাসে কি আপনার লেখার বেশি সুবিধে হয়?

উনি বললেন, শহরে অনেক লোকজন, নানারকম আকর্ষণ। বাড়ির লোকজনের জন্যও সময় দিতে হয়। এরকম কোনও ফাঁকা জায়গায় বেশ কয়েকদিন থাকলে কল্পনাশক্তি বাড়ে। এই জায়গাটা বেশ সুন্দর। খুব কাছেই সমুদ্র। লেখায় মন না বসলে আমি সমুদ্রের ধারে হাঁটতে যাই।

আমি চমকে উঠে বললুম, কাছেই সমুদ্র? আমরা ঘুরে আসতে পারি?

উনি কোট ও টুপি পরে বাইরে এসে আমাদের সমুদ্রের দিকের পথটা দেখিয়ে দিলেন। দু-একটা ছবি তোলার পর আমরা উষ্ণ করমর্দন করে বিদায় নিলুম।

দুপাশে প্রায় বনের মতন। রাস্তাটা এক জায়গায় অনেকখানি ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। সারগেই জিগ্যেস করলো, সুনীলজি, আর যাবেন? ফেরার সময় কিন্তু এতখানি খাড়া উঠতে হবে।

আমি বললুম, এত কাছে সমুদ্র, তবু দেখব না? চলো, চলো!

সেই ঢালু পথ ধরে প্রায় ছুটতে-ছুটতে নেমে এসেই দেখতে পেলাম বেলাভূমি। অনেকদিন বাদে সমুদ্র দর্শন হল। আমার অভিজ্ঞতায় আর একটি নতুন সমুদ্র, এর নাম বালটিক উপসাগর।

দুপুরবেলা সমুদ্র তীর একেবারে নির্জন। আমি এগিয়ে গিয়ে জলে হাত রাখলুম। অচেনা জল সব সময়েই ছুঁতে ভালো লাগে।

॥ ৬ ॥

একে ছুটির দিন, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। এখন কোথাও যাওয়ার নেই, বসে-বসে আলস্য করতেই ইচ্ছে করে। বেশ বেলা করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে আমি আর সারগেই বসে আছি হোটেলের দোতলার লবিতে। সামনের দেওয়ালটি পুরো কাচের তৈরি। সেই জন্য এখানে বসে-বসেই নিভা নদীর ওপর বৃষ্টিপাতের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

বৃষ্টির জন্য অনেকেই বাইরে বেরুতে পারেনি। এখানকার আবহাওয়া বেশ উপভোগ্য হলেও বৃষ্টি পড়লেই কনকনে শীত পড়ে। এখন মে মাস। কলকাতায় অসহ্য গরম, আর এখানে আমি কোট, সোয়েটার পরে বসে আছি।

সারগেই জিগ্যেস করল, সুনীলজি, বৃষ্টি থামলে বিকেলে কোথায় যাওয়া যায়?

আমি বললুম, লেনিনগ্রাডে এসে আমি আর যাই দেখি বা না দেখি, হারমিটেজ মিউজিয়াম দেখবই।

সারগেই বলল, হ্যাঁ, ওই মিউজিয়াম তো নিশ্চয়ই দেখব। কালকেও সময় আছে।

লবিতে আর যে ক'জন লোক বসে আছে, তাদের মধ্যে একজন ভারতীয়। সেই দিকে আঙুল তুলে সারগেই জিগ্যেস করল, ওই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কি বেঙ্গলি?

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগে দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে, উনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। প্রবাসে সবসময় বিদেশি ভাষা বলতে-বলতে কখনও হঠাৎ মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগ পেলে বেশ আরাম হয়। কিন্তু একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আর একজন ভারতীয়ের দেখা হলেই সে সুখ পাওয়া যায় না। ওই ভদ্রলোকটি দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজ্যের, আমরা পরস্পরের ভাষা একবর্ণ বুঝব না। কথা বলতে হবে কষ্টকল্পিত ইংরিজিতেই।

আমি সারগেইকে বললুম, উনি দক্ষিণ ভারতীয়, তবে কোন রাজ্যের তা জানি না।

সারগেই উঠে গিয়ে ভদ্রলোককে তামিল ভাষায় কী যেন জিগ্যেস করল। তিনি প্রায় ভূত দেখার মতন চমকে উঠলেন।

সারগেই ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এল আমাদের টেবিলে। আনন্দের আতিশয্যে ভদ্রলোক অনেক গল্প জুড়ে দিলেন সারগেই-এর সঙ্গে। আমি বোবা হয়ে বসে রইলুম।

তারপর সারগেই আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোকের নাম শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যীয়ম, তিনি অঙ্কের পণ্ডিত, ক্যানাডার কোনও শহরে অধ্যাপনা করেন। লেনিনগ্রাডের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় মাসের জন্য একটি সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন। তিনি নিরামিষ খান বলে খাবারদাবারে কিছু অসুবিধে হচ্ছে এবং একাকিত্ব ভোগ করছেন। সারগেইকে পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

সারগেই-এর মুখে আমার পরিচয় শুনে তিনি জানালেন যে তিনিও কবিতা লেখেন। তাঁর তামিল ভাষায় লেখা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও তাঁর সঙ্গেই আছে। হাত-ব্যাগ খুলে তিনি সাইক্লোস্টাইল করা কবিতা বার করে দিলেন।

সেই কবিতা কয়েক লাইন পড়েই আমি চোখ তুলে নিলুম। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও উচ্চ দার্শনিকভাবের ব্যাপার, খটোমটো ইংরেজিতে লেখা। এই ধরনের রচনা সম্পর্কে আমি কোনও আগ্রহ বোধ করি না।

সারগেই ও শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যীয়ম গল্প করতে লাগলেন। আমি চুপ করে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলুম নিজের ঘরে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে। নিভা নদীটি বেশ চওড়া, বৃষ্টিতে তাকে বেশ উচ্ছল দেখাচ্ছে। সব নদীই নিশ্চয়ই বৃষ্টি পছন্দ করে। বৃষ্টি তো নদীর খাদ্য। মাঝে মাঝে লঞ্চ যাচ্ছে। এসব দেশে কাঠের নৌকো উঠে গেছে বহুদিন, তবু কল্পনায় আমি যেন একটা নিঃসঙ্গ পাল তোলা নৌকো দেখতে পাই। এই পাশ্চাত্য নগরীতে বসেও আমার মন চলে যায় পদ্মানদীর প্রান্তে।

প্রকৃতির কোনও সুন্দর দৃশ্য পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি দেখা ঠিক নয়। তাতে সমগ্রের বদলে অংশের দিকে চোখ চলে যায়। জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমি টিভি খুললুম। মোট তিনটি চ্যানেল। একটিতে হচ্ছে একটি ছোটদের ফিল্ম। একটিতে হচ্ছে কনসার্ট, আর একটিতে খেলাধুলো। এরা গান-বাজনা খুব ভালোবাসে। যখনই টিভি খুলি, তখনই কোনও-কোনও চ্যানেলে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনতে পাই। রুশ ভাষায় যখন খবর হয়, তখন ভাষা বুঝতে না পারলেও মাঝে-মাঝে ইন্ডিয়া, ইন্দিরা গান্ধি, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব এইসব শব্দ কানে আছে। প্রায় প্রতিদিনই ভারতের উল্লেখ, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। পশ্চিমি দেশগুলিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ টিভি খবর শুনলে মনে হয় ভারত নামে কোনও দেশেরই অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে।

হঠাৎ মনে হল তিন-চারদিন আমি কোনও খবরের কাগজ পড়িনি। ইংরিজি কাগজ এখানে বেশ দুর্লভ, খোঁজও করিনি আমি। কিন্তু কয়েকদিন খবরের কাগজ না পড়ায় আমার শরীর বা আত্মার কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

খানিকবাদে সারগেই এসে দুষ্টু হেসে বলল, ওই দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক সন্ধেবেলা আপনার ঘরে এসে কিছু কবিতা পড়ে শোনাতে চান। আপনি কি ইন্টারেস্টেড?

আমি বললুম, সন্ধেবেলা তো আমরা হোটেলে থাকব না!

—সন্ধেবেলা কোথায় যাব?

—কোনও পার্কে বসে আকাশ দেখব।

সারগেই হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, তামিল ভাষাতে এখন অনেক ভালো কবিতা লেখা হয়। কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব প্রাচীনপন্থী।

আমি বললুম, বহুদিন দেশের বাইরে আছেন, তাই আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে যোগ নেই। তখন সারগেই আমায় কিছু-কিছু আধুনিক তামিল কবিতা তর্জমা করে শোনাল। সেগুলো

বেশ লাগল আমার।

আমি বললুম, তুমিও তো কবিতা লেখো। এবারে কিছু কবিতা শোনাও!

প্রথমে বেশ লজ্জা পেয়ে গেল সারগেই। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি ছাড়ব কেন? শেষ পর্যন্ত কিছু-কিছু লাইন শোনাতে লাগল। ওর বেশ কল্পনাশক্তি আছে। ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েও কিছু কবিতা লিখেছে সারগেই। তার মধ্যে একটি কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঘুঁটে। ভারতের গ্রামে-গঞ্জে-শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে দেখতে পাওয়া যায় ঘুঁটে। সেইসব ঘুঁটের মধ্যে যে পাঁচটা আঙুলের ছাপ পড়ে, সেটাই আকৃষ্ট করেছে সারগেইকে। যেন ওপরের দিকে বাড়ানো হাজার-হাজার হাত। নীরব, অথচ কিছু বলতে চায়।

সারগেই-এর কবিতা কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এখনও কোনও বই বেরোয়নি। বই বার করা সহজ নয়। আমাদের দেশে তরুণ কবিরা অনেকেই নিজের খরচে বই ছাপে। কিংবা অনেক ছোট প্রকাশক আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ ইচ্ছে করে তো ছাপিয়ে দিতে পারে। এ দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনও প্রকাশনালয় নেই। কবিরা তাদের পাণ্ডুলিপি জমা দেয় সরকারি প্রকাশনালয়ে। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা যদি মনোনীত করেন, তবে বই ছাপা হয়। সেজন্য সময় লাগে। অবশ্য পত্র-পত্রিকাতে লেখার সময়ই যদি কারুর কবিতা খুব বিখ্যাত হয়ে যায়, তবে তার বই নিশ্চয়ই ছাপা হয় তাড়াতাড়ি। ইয়েফতুশেংকোর খ্যাতি যখন আমাদের কাছে পৌঁছেছে তখন তার বয়েস কুড়ি-একুশ।

পরদিন আমরা গেলুম একটি যুব পত্রিকার দফতরে। ঠিকানা খুঁজে পেতে খানিকটা ঝামেলা হল। তার ফলে অবশ্য লেনিনগ্রাড শহরটি অনেকখানি দেখা হয়ে গেল।

গত মহাযুদ্ধে এই লেনিনগ্রাড শহরে যে সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল এবং এখানকার নাগরিকরা অসীম সাহস আর মনোবল দেখিয়েছিল, তা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে। নাতসি বাহিনী এই শহরটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ৯০০ দিন, তবু লেনিনগ্রাডের পতন হয়নি। নিয়মিত বোমা ও কামানের গোলা বর্ষণ হয়েছে, স্থলপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত অনেকে নাকি কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত খেয়েছে, তবু এখানকার নাগরিকরা নাতসি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। শুধু অনাহারেই সেবার ছ'লক্ষ নারী-পুরুষের মৃত্যু হয়েছিল।

সেই যুদ্ধের কোনও চিহ্নই এখন নেই। কোনও ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে না। বড়-বড় পার্ক, সুন্দর সুন্দর বাড়ি, চওড়া রাস্তা ও মাঝে-মাঝেই দৃষ্টি কেড়ে নেবার মতন ভাস্কর্য। লেনিনগ্রাডের নাগরিকরাও বেশ সুসজ্জিত, অনেক মহিলার অঙ্গে ফ্যাসনেব্‌ল পোশাক, জিন্‌স পরিহিত যুবকদেরও দেখা যায়।

লেনিনগ্রাডে কিছু কিছু পুরোনো পাড়াও রয়েছে। এখানকার বাড়িগুলো ব্যারাকবাড়ির মতন; রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে, ট্রাম লাইন থাকলেই সেইসব রাস্তা কিছুটা ভাঙা ভাঙা হয়। এখানে সেখানে জল জমে থাকে। এই এলাকায় বেশ একটা কলকাতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলুম। নিউ ইয়র্ক শহরেও বেশ কয়েকটা রাস্তা আছে এরকম, ভাঙা-ভাঙা, পাশে জঞ্জাল জমে থাকা, ও মানুষের ভিড় দেখে কলকাতার কথা মনে পড়েছিল আমার। পৃথিবীর যেখানেই যাই, কলকাতার সঙ্গে মিল খুঁজি।

যুব পত্রিকাটির অফিস কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক রাস্তায় এসেছি, ঠিক নম্বরের বাড়ির সামনে এসেছি, কিন্তু সেখানে কোনও পত্রিকা অফিস নেই। সারগেই একটুতেই নার্ভাস হয়ে যায়, সে ছোটাছুটি করতে লাগল। এদেশে সবাই খুব ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। সারগেই একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে টেলিফোন গাইড দেখে ঠিকানাটা চেক করে এল। ঠিকই আছে, তা হলে পত্রিকার অফিসটা গেল কোথায়? রাস্তায় দু-একজন পথচারীকে জিগ্যেস করা হল, তাঁরা কোনও সাহায্য করতে পারলেন না। দু-একজন মনে হল পত্রিকাটির নামই শোনেননি। রাস্তায় এ সময় অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তারা যুব-

পত্রিকা পড়েন না।

শেষ পর্যন্ত হদিশ পাওয়া গেল। আমাদের কাছে যে ঠিকানা লেখা আছে, ঠিক তার পাশের বাড়িতেই পত্রিকা অফিসটি কিছুদিন আগে উঠে গেছে। আমরা সে বাড়ির সামনে দিয়েই কয়েকবার ঘুরে গেছি। শীতের মধ্যেই সারগেই-এর কপালে প্রায় ঘাম জমে গিয়েছিল, এবারে সে নিশ্চিন্ত হল।

পত্রিকাটির নাম "অরোরা"। সারা দেশের স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা এখানে লেখা পাঠাতে পারে। এইরকম পত্রিকা থেকেই নতুন-নতুন সাহিত্য-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের নিজস্ব প্রেস আছে, প্রচার সংখ্যা আড়াই লক্ষ'র বেশি।

কলেজ জীবনে আমিও কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা-পত্রিকা সম্পাদনা করেছি, প্রথম দিকে বেশ কয়েক বছর তাতে শুধু তরুণ লেখকদের রচনা ছাপা হত, এবং আমাদের মুদ্রণ সংখ্যা কোনওক্রমে টেনেটুনে এক সময় আড়াই হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। সে পত্রিকা চালাবার জন্য আমাদের কখনও কখনও ভিক্ষে পর্যন্ত করতে হত। বন্ধু-বান্ধবরাই ঘাড়ে করে সে পত্রিকা পৌঁছে দিত স্টলে স্টলে, লেখকদের সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না। শিল্পীরাও বিনা পয়সায় এঁকে দিতেন মলাট। সেই জন্যই এখানকার যুব পত্রিকার পরিচালনা ব্যবস্থা জানবার জন্য আমার আগ্রহ ছিল।

এ দেশে পত্রিকার খরচ তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞাপনের জন্য ঘোরাঘুরি ও হ্যাংলামির প্রয়োজন হয় না, ছাপার খরচ জোগাড় করার দুশ্চিন্তা নেই। কারণ সরকারই এর পৃষ্ঠপোষক। সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-কোনও পত্র-পত্রিকায় কোনও লেখা ছাপা হলেই লেখককে টাকা দেওয়া হয়। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা অনুযায়ী টাকার অঙ্ক বাড়ে কমে। এদেশের একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় একটি মাত্র ছোট গল্প লিখে সাত-আট হাজার টাকা (আমাদের হিসেবে) পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেক, সেই জন্য যার কিছুমাত্র সাহিত্য-প্রতিভা আছে, তার পক্ষেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাওয়া সহজ।

অরোরা পত্রিকার সম্পাদক কিন্তু অল্পবয়েসি যুবক নয়। টাক-মাথা একজন ভদ্রলোক। তিনি ইংরিজি জানেন না, কথাবার্তা চলছিল সারগেই-এর মাধ্যমে। নানান আলাপ-আলোচনার পর আমি জিগ্যেস করলুম, আপনারা যে রচনা নির্বাচন করেন, তার কি কোনও গাইড লাইন আছে? আপনারা কি বিষয়বস্তু ঠিক করে দেন?

তিনি হেসে বললেন, না, যার যা খুশি লিখতে পারে। তবে, আমাদের তরুণ লেখকরা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, সম-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি এসব বিষয়েই লেখে।

আমি বললুম, সে তো বটেই। সব কবিই এসব চায়। কিন্তু তরুণ বয়েসে একটা বিদ্রোহের মনোভাব থাকে, বিশেষত আগেকার লেখকরা যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থাকে, কোনও-কোনও মূল্যবোধকে ভাঙতেও চায়।

তিনি বললেন, সেরকম কেউ এখানে লেখে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কী। এখানে তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্য কোনও বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা, কিংবা ফর্ম ভাঙার ঝোঁক নেই?

তিনি বললেন, কেউ সেরকম লিখলে আমরা তাদের চিঠি লিখে জানাই কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, তাদের পরামর্শ দিই।

আমি বললুম, কাল রাত্রেই আমি বেল্লা আখমাদুলিনা-র একটি কবিতা পড়েছি, তার নাম 'সামথিং এল্‌স', চমৎকার কবিতা। এই কবিতাটির সেরকম কোনও বিষয়বস্তুই নেই, কবিতা লিখতে না পারার দুঃখ নিয়ে লেখা। এটাই তো একটা নতুন ফর্ম, পুরোনো ফর্মের প্রতিবাদ!

সম্পাদক মশাই আবার জোর দিয়ে বললেন, আমাদের নতুন লেখকরা যাতে আদর্শবাদ, সম-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বশান্তি নিয়ে লেখে, সেটাই আমরা চাই...

সম্পাদক মশাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমার ঠিক মনঃপূত হল না। যেন তিনি একটি উঁচু আসনে

বসে তরুণ লেখকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। অবশ্য এমনও হতে পারে, ভাষার ব্যবধানের জন্য আমরা পরস্পরের বক্তব্য ঠিক বোঝাতে পারিনি।

চা খেয়ে আমরা বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালুম। আমাদের পাশেই আর একজন অত্যন্ত রূপবান যুবক আগাগোড়া চুপ করে বসেছিল। আমি ভেবেছিলুম সে ইংরেজি জানে না। তার সঙ্গে করমর্দন করতে যেতেই সে নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে বলল, চলুন, আমি আপনাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।

এই যুবকটি এখানকার এ পি এন অফিসের একজন কর্মী। এত সুন্দর চেহারা, ওকে চলচ্চিত্রের নায়ক হলেই যেন মানাত। ওর ব্যবহারও খুবই ভদ্র। সে আমাকে জিগ্যেস করল, লেনিনগ্রাড আপনার কেমন লাগল?

আমি বললুম, খুবই তো ভালো লাগছে। মে-দিবসের প্যারেড দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এত বড় শহর, এখানে কত কী দেখার আছে, কিন্তু অনেক কিছুই দেখা হল না। তাই একটা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে।

যুবকটি বলল, নিশ্চয়ই এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। তবে এখন ছুটির সময় চলছে, তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে।

সারগেই বলল, আজ সন্ধেবেলাতেই আমাদের চলে যেতে হবে।

আমি বললুম, হারমিটেজ মিউজিয়াম কিন্তু দেখতেই হবে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করা সম্ভব নয়। আমরা একটা ট্যাক্সি ধরে নিলুম।

হারমিটেজ মিউজিয়ামটিকে কেউ-কেউ ফরাসি কায়দায় 'অ্যারমিতাঝ' বলে। আমি 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী' স্মরণ করে চট করে বিদেশি উচ্চারণের অনুকরণে সাহস পাই না, ইংরিজিতে সন্তুষ্ট থাকি।

এই হারমিটেজ মিউজিয়াম উইন্টার প্যালেসের সংলগ্ন, সেটাও এখন মিউজিয়াম। এই দুটি প্রাসাদ মিলে যে মিউজিয়াম তা বিশ্বে বৃহত্তম। এর পুরোটা সাতদিনেও দেখে শেষ করা বোধহয় সম্ভব নয়, আমাদের হাতে আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

সারগেই বলল, এই মিউজিয়ামে অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক জিনিসপত্তর আছে শুনেছি, চলুন আগে সেগুলো দেখে নিই।

আমি বললুম, সারগেই, আমি ইন্ডোলজিস্ট নই। আমাদের দেশেই যা ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি আছে, তার অনেক কিছুই এখনও দেখা হয়নি। বিদেশে এসে ভারতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার আগ্রহ আমার নেই। এত বড় মিউজিয়ামে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে গেলে ক্লান্ত হয়ে যাব। আমি কি দেখব তা আগেই ঠিক করে রেখেছি। আমি জানি, ফরাসি ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের কিছু ভালো কালেকশান আছে এখানে, আমি শুধু সেগুলিই দেখতে চাই, যা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও দেখা যাবে না।

সারগেই একটু কৌতূহলী চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর জিগ্যেস করল, ফরাসি ছবি সম্পর্কে আপনাদের আগ্রহ হল কী করে? আপনারা কি আপনাদের দেশে ওরিজিনাল ছবি দেখতে পান?

আমি হেসে বললুম, না, আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। আমাদের দেশে যারা ফিল্মে উৎসাহী, বার্গমান, ফেলিনি, গদার, বনুয়েল, ওয়াইদা, কুরোশোওয়া-র নাম তাদের মুখে-মুখে, তাদের সব ছবির কাহিনি ও ট্রিটমেন্টের অভিনবত্ব তাদের মুখস্থ, যদিও ওঁদের ফিল্ম দেখার সুযোগ নেই। কালেভদ্রে যে দু-চারটি ছবি দেখানো হয় তাও দশ-পনেরো বছরের পুরোনো। যারা শিল্প ভালোবাসে, তারা মাতিস্, পিকাসো, ব্রাক্, রুয়ো, মার্ক শাগাল-এর নামে প্রায় উন্মাদ, যদিও ওঁদের ওরিজিনাল

ছবি প্রায় কেউ-ই দেখেনি। কিন্তু সেটা কি দোষের? আমাদের গরিব দেশ বলে পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি আমাদের কাছে পৌঁছয় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ জিনিস সম্পর্কে আমাদের যে আগ্রহ ও কৌতূহল আছে, সেটা কি কম কথা?

সারগেই বলল, সত্যি খুব আশ্চর্য ব্যাপার!

মিউজিয়ামে ঢুকে অন্যান্য ভালো ভালো জিনিস বাদ দিয়ে আমরা চলে এলুম ছবির ঘরের দিকে।

জারদের আমলেই মূল্যবান ছবির সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাতসিরা তস্করবৃত্তি করে নানান দেশ থেকে যেসব বিখ্যাত ছবি নিজেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল, বার্লিন জয়ের পর রেড আর্মি তার অনেকগুলি দখল করে নেয়। সব মিলিয়ে এখানে বহু ছবির দুর্লভ সমাবেশ।

ঘুরতে-ঘুরতে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলুম সারগেই-এর ছবি সম্পর্কে জ্ঞান দেখে। মাত্র বাইশ বছর তার বয়েস, কিন্তু সে গত শতাব্দীর ছবির জগতের নানান আন্দোলন, প্রত্যেক শিল্পীর আলাদা বৈশিষ্ট্যের কথা জানে। আমার থেকে অনেক বেশিই জানে। আমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে ডেকে দুই দেয়াল ভরতি দেগা-র অনেকগুলি ছবি দেখাল। মোনে ও মানে-র ছবি বোঝাল আলাদা করে। আমি দেখতে চাইছিলুম ক্যান্ডিনস্কির ছবি, তার খোঁজে সে ঘুরতে লাগল এঘর ওঘর।

এইসব ছবি বিশেষ মূল্যবান এই কারণে যে এইসব ছবির প্রিন্টও খুব দুর্লভ।

সারগেই একবার আমাকে ডেকে জিগ্যেস করল, আপনার টিনটেরেট্টোর ছবি ভালো লাগে না? এই দেখুন—

আমার মজা লাগল। একটি কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখে আমাদের দেশে টিনটেরোট্টোকে নতুন করে জনপ্রিয় করেছেন সত্যজিৎ রায়। এখানে টিনটেরেট্টোর একাধিক ছবি আছে। তার মধ্যে একটি আবার যিশুর।

কখন দু-ঘণ্টা পার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। সারগেই আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে, আমাদের সন্ধের সময় ট্রেন ধরতে হবে। আরও অনেক ছবি দেখা বাকি, সেইজন্য একটু দ্রুত পা চালাতে হল। এক সময় একটি নারীর ভাস্কর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। শিল্পীর নাম আমার চেনা নয়। কিন্তু মূর্তিটি অপূর্ব।

তারপর এক সময় আমি সারগেইকে হারিয়ে ফেললুম।

॥ ৭ ॥

এত বড় মিউজিয়ামের মধ্যে কাউকে হারিয়ে ফেললে খুঁজে বার করা শক্ত। সারগেইকে দেখতে না পেয়ে আমি ভাবলুম এই সুযোগে আরও বেশি করে হারিয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে আরও বেশিক্ষণ ছবি দেখা যাবে। সন্ধেবেলা ট্রেন ধরতে হবে বলে সারগেই তাড়া দিচ্ছিল, ঠিক ক'টার সময় ট্রেন তা আমি জানি না।

আর দু-একটা ঘর ঘোরার পর আমার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। সারগেই একটুতেই নার্ভাস হয়ে যায়। এতক্ষণ ও আমায় কোথায় খোঁজাখুঁজি করছে কে জানে! আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথা ছিল, ও নিশ্চয়ই আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

মিউজিয়াম থেকে বাইরে এসে দেখি সেখানেও সারগেই নেই। ফাঁকা রাস্তা, শন-শন করে হাওয়া দিচ্ছে। ওভারকোটের কলার তুলে পকেটে দু-হাত গুঁজে আমি পায়চারি করতে লাগলুম। অচিরেই আমি অন্তর্হিত হয়ে গেলুম লেনিনগ্রাড থেকে। এখন আমি কায়রোর রাস্তায়। কেন হঠাৎ

কায়রোর কথা মনে পড়ল তা কে জানে, কায়রোতে আমি গেছি অনেককাল আগে, এবং লেনিনগ্রাডের সঙ্গে কায়রোর কোনওরকম মিল নেই।

কায়রোতে একদিন আমি হোটেলের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলুম, ঠিকানাটাও মনে ছিল না। একজন ট্রাফিক কনস্টেবলের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলুম সে আমায় কোনও সাহায্য করতে পারবে কি না! পুলিশটি কোনও উত্তর না দিয়ে আমার হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল। আমি তো হতভম্ব। ডিউটির সময় তার সঙ্গে কথা বলে আমি অপরাধ করে ফেলেছি? সেইজন্য সে আমায় গ্রেপ্তার করল? পুলিশটি আমায় নিয়ে এল একটি দর্জির দোকানের সামনে এবং দর্জিকে ডেকে কী সব বলল। তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, ওই দর্জি ইংরিজি জানে, সে আমায় সাহায্য করবে। ততক্ষণে সে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম শুরু হয়ে গেছে।

আমি আবার লেনিনগ্রাডে ফিরে এলুম। এখানে রাস্তা হারাবার কোনও আশঙ্কা নেই। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে গেলে আমার হোটেল খুঁজে পাবই। কিন্তু সারগেই গেল কোথায়?

মিনিট দশেক বাদে সারগেই বেরিয়ে এল। উদ্‌ভ্রান্তের মতন চেহারা, রীতিমতন হাঁপাচ্ছে সে। আমার কাছে এসে ফুঃ করে মুখ দিয়ে বিরাট নিশ্বাস ছেড়ে সে বলল, সুনীলজি, কী হয়েছিল! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি মুচকি হেসে বললুম, আমি ইচ্ছে করেই তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে পড়েছিলুম। তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ পর দেখা হলে আমরা ট্রেন মিস করতুম, তা হলে ভালোই হত, আরও দু-একদিন থেকে যাওয়া যেত লেনিনগ্রাডে। আমার আজই লেনিনগ্রাড ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

সারগেই বলল, আমাদের যেসব প্রোগ্রাম করা আছে। ট্রেনের টিকিট, হোটেল বুকিং, অ্যাপয়েন্টমেন্টস।

আমি বললুম, চলো।

সারগেই একবার মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে আবার ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর প্রায় দৌড়ে গোটা মিউজিয়ামটাতেই আমাকে খুঁজে দেখে এসেছে।

হোটেলে ফিরে আমরা তৈরি হয়ে নিলুম তাড়াতাড়ি।

শীতের দেশে এলে মোটাসোটা জামাকাপড় আনতে হয়, তাই আমার সুটকেসটি বেশ ভারী। যাতে বইতে না হয় সেজন্য তলায় চাকা লাগানো। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে আমি সুটকেসটার টিকি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আর ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে, লোকজনরা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। যদি অন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা হলে আর চাকা লাগাবার মানে কী? সুটকেসটা আমি তুলে নিলাম।

আমাদের দেশের রেল স্টেশনগুলিতে মৌমাছির ভন্‌ভনের মতন সবসময় একটানা একটা আওয়াজ শোনা যায়। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা প্রকাশ্য স্থানে নীরবতা পছন্দ করে। এত বড় স্টেশন, এত মানুষ, অথচ প্রায় কোনও শব্দই নেই। হকারদের চ্যাঁচামেচির তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কিছু-কিছু মানুষ স্বভাবেই ব্যস্তবাগীশ। ট্রেন বা প্লেন ধরতে হলে সারাদিন ধরে তাদের উৎকণ্ঠা থাকে। যদি ঠিক সময় পৌঁছনো না যায়, রাস্তা জ্যাম হয়, এইজন্য তারা রওনা হয় অনেক আগে। সারগেইও অনেকটা সেইরকমের। আমাদের ট্রেন ছাড়তে এখনও পুরো এক ঘণ্টা বাকি।

রাত্রির ট্রেনে সকলেরই শুয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের কুপেতে চারটে বার্থ। অন্য দুজন এখনও এসে পৌঁছয়নি। প্রতিটি বার্থেই রয়েছে বেশ পুরু তোষকের বিছানা ও কম্বল। এই কুপের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ, তার জন্য বাইরে আলাদা জায়গা আছে।

ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে অন্য দুজন যাত্রী এসে পৌঁছল। যাত্রী নয়, যাত্রিনী, দুজনেরই বয়েস তিরিশের মধ্যে, বেশ সুসজ্জিত। এরা কি দুই বোন, না দুই বান্ধবী? বোঝবার কোনও উপায় নেই। সারগেই-এর সঙ্গে তারা রুশ ভাষায় মামুলি দু-একটা কথা বলল মাত্র, গল্প করার কোনও উৎসাহ দেখাল না, দুজনে দুটি বই খুলে বসল।

চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলুম বাইরে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে, কিন্তু বাইরে কোনও অন্ধকার নেই। লেনিনগ্রাড শহর হোয়াইট নাইটসের জন্য বিখ্যাত, যে সময় সারা রাতে অন্ধকার নামে না। এখন অবশ্য সে সময় আসেনি।

একটু বাদে একজন যুবতী সারগেইকে কিছু বলতেই সারগেই আমাকে জানাল, চলুন সুনীলজি, আমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।

আমরা বাইরে যেতেই মেয়ে দুটি দরজা বন্ধ করে দিল। বুঝলুম ওরা রাত্রির জন্য পোশাক বদলে নিচ্ছে। আমাদের অবশ্য পোশাক বদলাবার প্রশ্ন নেই, যা পরে আছি, সেই সুদ্ধুই শুয়ে পড়ব। সারগেইকে প্রথম দিন যে চামড়ার কোটটা পরতে দেখেছি সেটা আর সে ছাড়েনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাতেই অন্য একজন লোক এসে আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চাইল। আগেও কয়েকবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা বেশ মজার লাগে। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেল আমিও নিশ্চয় যেকোনও একজনের কাছ থেকে সিগারেট চাইতে পারি বিনা দ্বিধায়।

লোকটি কিছু জিগ্যেস করল আমাকে। সারগেই অনুবাদ করে বোঝাল যে, লোকটি জানতে চাইছে, আমি কি এদেশে নতুন এসেছি, আমার এ দেশ কেমন লাগছে?

অনুবাদে আড্ডা জমে না, কুপের দরজা খুলতেই আমরা চলে এলুম ভেতরে। যুবতী দুটি পোশাক বদল করে আবার বই খুলে বসেছে। আমার হ্যান্ডব্যাগে কোনও বই নেই। এখন সুটকেস খোলা এক বিড়ম্বনা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর এক সময় একটি মেয়ে সারগেইকে কিছু বলতেই সে আমায় জানাল, সুনীলজি, এখন আলো নিবিয়ে দিলে আপনার কোনও আপত্তি আছে?

আমি বললুম, না, না, আপত্তি কেন থাকবে?

যদিও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কোনও বাসনা আমার ছিল না। ইচ্ছে করছিল কিছুটা গল্পগুজব করতে। মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই। ভাষা জানি না। সারগেই নব বিবাহিত যুবক, অন্য মেয়েদের প্রতি তার বোধহয় কোনও ঔৎসুক্য নেই এখন।

ট্রেনে আমার ভালো ঘুম আসে না। সারারাত ধরে আমি প্রায় তিনশো স্বপ্ন দেখলুম। একটি প্রকাণ্ড স্বপ্নমালা বলা যায়।

সকাল বেলা কোনও স্টেশন থেকে চা বা কফি কেনার দরকার হয় না। যে মহিলা কন্ডাকটর গার্ড কাল রাত্রে আমাদের টিকিট পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, তিনিই সকালবেলা নিজে হাতে করে আমাদের জন্য কফি নিয়ে এলেন। এই কফির দাম বোধহয় টিকিটের মধ্যেই ধরা থাকে।

সকাবেলা যুবতী দুটি মুখ খুলল, টুকিটাকি প্রশ্ন করতে লাগল আমাদের। দেখা গেল, এদের মধ্যে একজন ইংরিজি জানে। যাঃ, তা হলে তো এর সঙ্গে অনায়াসেই ভাব জমানো যেত। কিন্তু এখন আর সময় নেই, রিগা স্টেশন প্রায় এসে গেছে।

এক একজন লোককে দেখলেই মনে হয় বেশ সুরসিক। এ পি এন-এর যে প্রতিনিধি আমাদের রিসিভ করতে এসেছেন স্টেশনে, তাঁর মুখখানাও সেরকম। ছাতা হাতে ছিপছিপে চেহারার ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি যে ক'দিন এখানে থাকবেন, আপনার খুব টাইট প্রোগ্রাম, সব জায়গাতেই যেতে হবে, বিশ্রামের সুযোগ পাবেন না। এখন হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন, দশটার সময় আমরা আবার আসব।

আমি কিন্তু ক্লান্ত বোধ করছি না একটুও। শরীরটা বেশ হালকা হালকা লাগছে। গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা মিহি বাতাসের স্পর্শ, তার আমেজই আলাদা।

হোটেল ল্যাটভিয়া বেশ আধুনিক কায়দার হোটেল, কিন্তু এর সামনে নদী নেই। সাততলার ওপরের ঘর থেকে দেখতে পাওয়া যায় সামনের ব্যস্ত রাস্তা ও একটি বিশাল গির্জার অঙ্গন।

ল্যাটভিয়া রাশিয়ার মধ্যে নয়, একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র। অবশ্য রাশিয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়, এখানকার প্রধান কবি জ্যানিস রেইনিস-এর ভাষায় "মুক্ত রাশিয়ার মধ্যে মুক্ত ল্যাটভিয়া।"

ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ লক্ষ, আমাদের পশ্চিমবাংলার অনেক জেলার জনসংখ্যাই এর চেয়ে বেশি। তবু এই ছোট রাজ্যটি নিয়েই ইতিহাসে অনেক রকম রাজনৈতিক খেলা চলেছে। মধ্য শতাব্দীতে এই ল্যাটভিয়া ছিল জার্মান ফিউডালদের শাসনে। তখন দমন ও অত্যাচার ছিল চরম। ল্যাটভিয়ানরা মূলত ছিল লুথেরান, তাদের ওপর জোর করে ক্যাথলিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হত। দোম ক্যাথিড্রালের সামনের ময়দানে ক্যাথলিক সাধুরা শত-শত লোককে ধর্মদ্বেষের নামে পুড়িয়ে মেরেছে। সেই সময় জার্মানদের চোখে ল্যাটভিয়ানরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রাশিয়ান সম্রাট পিটার দা গ্রেট-এর বিজয়ীবাহিনী ল্যাটভিয়াকে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নেয়। সেই সময় রিগা হয়ে ওঠে রাশিয়ার একটি প্রধান বন্দর। জারদের আমলে ল্যাটভিয়ার ব্যবসায়ী শ্রেণির সমৃদ্ধি হয়েছিল বটে, কিন্তু শ্রমিক-কৃষকদের অবস্থা বিশেষ কিছু বদলায়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট কাইজার ল্যাটভিয়াকে আবার দখল করে নেবার লোভ করেছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং কাঁচা মাল সরবরাহের জন্য ল্যাটভিয়ার গুরুত্ব ছিল। এখানকার বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলের টান ছিল রুশ বিপ্লবীদের দিকে। অক্টোবর রিভোলিউশানে অনেক ল্যাটভিয়ান যুবকও অংশগ্রহণ করেছিল। সামরিক জার্মান অবরোধের বিরুদ্ধে ল্যাটভিয়ান রাইফেলম্যানরা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে ল্যাটভিয়া নিজেকে স্বাধীন সোভিয়েত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

কিন্তু পাঁচ মাস পরেই ল্যাটভিয়াতে আবার পালা বদল শুরু হয়। জার্মানির সহযোগিতায় ল্যাটভিয়ার সোভিয়েত-বিরোধী হোয়াইট গার্ডরা আবার ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারপর সুদীর্ঘকাল ধরে ল্যাটভিয়াতে বিপর্যয় চলতে থাকে, এই রাজ্যটি আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ফিরে আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, সে ইতিহাস অনেকেরই জানা।

একটা জিনিস এখানে এসে বারবার মনে হচ্ছে, পুরোনো ঐতিহ্য রক্ষায় সোভিয়েত নাগরিকরা খুবই তৎপর। লেনিনগ্রাডের মতন রিগা শহরেও প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছিল, এখন তার কোনও চিহ্নই নেই। শুধু তাই নয়, বোমার আঘাতে যেসব ঐতিহাসিক অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিন্তু নতুন বাড়ি ওঠেনি, অবিকল আগের বাড়িটাই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

রিগা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সুদৃশ্য শহর। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে শহরটা ঘুরে দেখতে বেরুলুম, শহরটা দেখতে তো সুন্দর বটেই, তা ছাড়া আমার আর একটা অনুভূতিও হল, আমি এখানে খুব সহজ ও সাবলীল বোধ করছি। কোনও নতুন জায়গায় গেলে কাঁধ দুটো একটু উঁচু হয়ে থাকে। কে কী ভাবছে, কেউ আমাকে লক্ষ করছে কি না, কোনও আদবকায়দায় ভুল করে ফেললুম কি না, এইসব ভেবে সবসময় একটা সতর্ক ভাব বজায় রাখতে হয়। এখানে সেই ব্যাপারটা নেই। যে-কোনও অচেনা লোকের সামনে দাঁড়ালেই একটা পারস্পরিক তরঙ্গ বিনিময় হয়। অর্থাৎ সে আমাকে প্রথম দর্শনেই অপছন্দ করছে কি না তা আমরা বুঝে যাই। এখানে শুধু রিগায় নয়, লেনিনগ্রাড ও মস্কোতেও সেই তরঙ্গ বিনিময় বেশ সন্তোষজনক। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই কথা বললে বোঝা যায়, ভারতীয়দের সম্পর্কে এখানে কোনও বিরূপ মনোভাব বা অবজ্ঞার ভাব নেই।

রিগা শহরের কেন্দ্রে রয়েছে তিন ল্যাটভিয়ান রাইফেলম্যান-এর ভাস্কর্য। বিপ্লবের সময়ে এরাই প্রথমে এগিয়ে যায়, সেই সম্মানে এদের মূর্তি বসানো রয়েছে। শহরের যে-কোনও জায়গা থেকে দেখা যায় প্রাচীন দোম ক্যাথিড্রালের চূড়া। এখন এই ক্যাথিড্রালটিকে অর্গান রিসাইটালের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শহরের মাঝখানে একটি খুব পুরোনো পাড়াকে অবিকৃত রাখা হয়েছে। সরু সরু গলি, ছোট ছোট দোতলা বাড়ি, খোয়া পাথরের চত্বর। আমার সঙ্গীদের কাছে শুনলুম, পুরোনো ইউরোপের পট-ভূমিকায় যেসব সিনেমা তোলা হয় তার অনেকগুলিরই শুটিং-এর জন্য পরিচালকরা রিগা শহরে আসেন।

এই পাড়ারই একটি ছোট রেস্তোরাঁয় আমরা গেলুম কফি খেতে। এই রেস্তোরাঁর নাম 'ড্রপ', গেটের কাছে কোট জমা রাখতে হয়, ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার। টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। এই দোকানটির কফি নাকি খুব বিখ্যাত, ছেলে-ছোকররা খুব আসে এখানে।

কালো গাউন পরা দীর্ঘকায়া এক যুবতী এল আমাদের কাছে অর্ডার নিতে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। আমি যদি এই শহরের নাগরিক হতুম, তা হলে ওই রেস্তোরাঁয় নিশ্চয়ই রোজ কফি খেতে আসতুম।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম নদীর ধারে। যে-কোনও শহরে এলেই আমার একবার নদী দেখে নিতে ইচ্ছে করে। এখানকার নদীর নাম ডাংগোভা। নদীটি তেমন প্রশস্ত নয়, তবু এর ওপরে একাধিক সেতু, দূরের একটি সেতু বেশ আধুনিক কায়দার।

এই নদীর ধার থেকে শহরটাকে অনেকখানি দেখা যায়। শুধু প্রাচীন বাড়ি নয়, নতুন বাড়িও উঠেছে অনেক। মস্কোতে হোটেল ইউক্রাইনের বাড়িটি যেরকম, সেরকম একটি বাড়ি এই শহরেও দূর থেকে চোখে পড়ে। স্তালিন আমলে এই ধরনের কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছিল।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর আমরা এলুম একটি হোটেলে, দুপুরের আহার সেরে নেবার জন্য। হোটেলটির নাম 'ব্লু উইন্ড'। এখানে আমরা এ পি এন-এর নিমন্ত্রিত অতিথি। এ পি এন-এর স্থানীয় শাখার কর্তা এবং আরও কয়েকজন এসেছেন।

এই হোটেলটিও পুরোনো কায়দায় সজ্জিত। চাপা আলো। বড়-বড় পিঠ-উঁচু চেয়ার। চেয়ারগুলি ঠিকমতন সাজাতে গিয়ে একটি চেয়ার উলটে পড়ে গেল সশব্দে। এই ব্যাপারটা বেশ পছন্দ হল আমার। সবকিছু ঠিকঠাক চলার মধ্যে একটা কিছু হঠাৎ গণ্ডগোল হয়ে গেলে বেশ হয়। সবাই আমরা ভদ্র-মার্জিত ব্যবহার করছিলুম, এর মধ্যে একটা চেয়ার পড়ে যাওয়ায় সবাই একসঙ্গে চুপ।

সব সাজিয়ে ঠিকঠাক করে বসা হল। তবু তক্ষুনি খাবারের অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণ কর্তাদের একজন বললেন, আমরা আর একজনের জন্য অপেক্ষা করছি, তিনি এক্ষুনি এসে যাবেন।

তখনও আমি জানি না, একটা বেশ চমক অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

॥ ৮ ॥

একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি এলেন একটু পরে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় অধ্যাপক। গাড়ি-ঘটিত কারণে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, নমস্কার, কেমন আছেন?

সুদূর রিগা শহরে বসে একজন ল্যাট্‌ভিয়ান অধ্যাপকের মুখে বাংলা ভাবা শুনলে রোমাঞ্চিত হতেই হয়।

এঁর নাম ভিক্‌টর ইভবুলিস, ইনি ল্যাটভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কোনও সরকারি প্রয়োজনে বাংলা শেখেননি। শিখেছেন নিজের আগ্রহে, মূল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পড়বার জন্য।

আলেকজান্ডারের গুরু তাঁকে বলেছিলেন, তুমি যেখানেই যাও, যত কিছুই দেখো, শেষ পর্যন্ত দেখবে মানুষের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছুই নেই। ছোট্ট দেশ ল্যাটভিয়া, যার জনসংখ্যাই মাত্র পঁচিশ

দাখ, সেখানকার একজন মানুষ প্রাচ্যের কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা পাঠ করবার জন্য বাংলার মতন একটি দুরূহ ভাষা শিখেছেন নিজের চেষ্টায়, এটা বিস্ময়কর নয়?

খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে নানারকম গল্প হতে লাগল। আজ একেবারে ফুল কোর্স লাঞ্চ। সুপ্ দিয়ে আরম্ভ, সুইট ডিস দিয়ে শেষ, সঙ্গে ওয়াইন। এখানকার খাবারে প্রথম দিকে থাকে দু-একটি কোল্ড ডিস, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের চিজ, হ্যাম, স্মোক্‌ড ফিস, কয়েক রকমের স্যালাড। তারপর আসে মেইন ডিস বা হট্ ডিস, রোস্ট চিকেন বা বিফের নানারকম রূপান্তর, বড়-বড় মাছও পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ইভবুলিস মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছেন, অন্যদের সঙ্গে কখনও ইংরিজিতে, কখনও রাশিয়ানে; এ ছাড়া তিনি ফরাসি ও জার্মান জানেন, তাঁর মাতৃভাষা ল্যাটভিয়ান। ইনি মাতৃভাষায় রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখেছেন, পরে তা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনেও থেকে গেছেন কয়েক বছর আগে, কলকাতা সম্পর্কে ওঁর অভিজ্ঞতা বেশ মজার। উনি যখন কলকাতায় আসেন, সেই বছরেই কলকাতায় বন্যা হয়েছিল, তিন-চারদিন পথ-ঘাট ও অনেক বাড়িই বেশ খানিকটা জলের তলায় ছিল।

অন্যরা আমাদের কথাবার্তা কৌতূহলের সঙ্গে শুনছিলেন, একজন জানতে চাইলেন, আচ্ছা, তোমাদের কলকাতাতেই তো মেট্রো-রেল হচ্ছে?

এই নিয়ে এই প্রশ্ন আমি তিনবার শুনলুম বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতার উল্লেখ শুনেই কেউ কেউ এই কথাটা জিগ্যেস করেন। যেন এটাই কলকাতার একমাত্র পরিচয়। পৃথিবীর বহু শহরেই মেট্রো রেল আছে, সুতরাং কলকাতায় মেট্রো-রেল হওয়া এমনকী বিশেষ সংবাদ?

পালটা প্রশ্ন করে আমি ব্যাপারটা জেনে নিলুম। আসলে, কলকাতা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই কেউ জানে না। তবে আমাদের মেট্রো রেলের প্রাথমিক স্তরে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা এসে নানারকম সুপারিশ করেছেন, মস্কো শহরের মাটির সঙ্গে কলকাতার মাটির খানিকটা মিল আছে বলে কোন ধরনের পাতাল রেল এখানে উপযোগী হবে, সে ব্যাপারে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা পরিকল্পনায় সাহায্যে করেছেন, সেই খবর এখানকার পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুতরাং কলকাতা সম্পর্কে অনেকে শুধু ওই সংবাদটাই জানে।

আমি বললুম, কলকাতায় বন্যা হয়েছিল শুনে আপনারা ভাবছেন পাতাল রেল চালু হওয়ার পর আবার যদি বন্যা হয়, তখন কী হবে? তখন কী যে হবে, তা আমিও জানি না!

অধ্যাপক ইভবুলিস বললেন, কলকাতার যানবাহনে অনেক গোলমাল, আলোর ব্যবস্থা বড়ই খারাপ...।

বাংলাভাষা-প্রেমিক এই ল্যাটভিয়ান অধ্যাপক কলকাতায় এসে যে অনেক অসুবিধে ভোগ করেছেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর ছিল, অভিযোগের নয়।

আমাকে আরও চমকে দিয়ে তিনি এরপরেই বললেন, আপনাদের 'দেশ' পত্রিকা আমি মাঝে মাঝে পড়ি। দেশ পত্রিকায় আমার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সে সংখ্যাটিও আমার কাছে আছে।

বেশ কয়েক বছর আগে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী এসেছিলেন এই রিগা শহরে, অধ্যাপক ইভবুলিসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রিগা-র অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায়, সে লেখাটি আমিও পড়েছিলাম, তবে অনেকদিন আগের কথা, ভালো মনে নেই।

অধ্যাপক ইভবুলিস তাঁর বাড়িতে সন্ধেবেলা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। দুপুরে হোটেলে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে এবং বিকেলবেলা শহরটায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে তারপর যখন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন সারগেই বলল, একটু দাঁড়ান, সুনীলজি!

দৌড়ে সে কোথায় চলে গেল, একটু বাদেই সে ফিরে এল কয়েকটি ফুল নিয়ে। তুষারশুভ্র

কয়েকটি টিউলিপ ফুল, সেলোফিন কাগজে সুন্দর করে মোড়া। সারগেই বলল, অধ্যাপকের স্ত্রীর হাতে আপনি এটা দেবেন।

এর আগে রাস্তায় অনেককেই আমি এরকম ফুল হাতে নিয়ে যেতে দেখেছি। বড় বড় মোড়ে ফুলের দোকান। এদেশে কারুর বাড়িতে দেখা করতে গেলেই ফুল নিয়ে যাওয়া প্রথা। বিমান-যাত্রীদেরও আমি ফুল নিয়ে নামতে দেখেছি, প্রিয়জনের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই আগে তার হাতে ফুল তুলে দেয়। গাদাগুচ্ছের ফুল নয়, একটি বা দুটি বা তিনটি।

সোভিয়েত দেশে প্রত্যেক শহরেরই বাইরের দিকে প্রচুর ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। প্রায় একই রকম চেহারা। সারা দেশের প্রতিটি পরিবারকে ফ্ল্যাট দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার, সে তো এক বিস্ময়কর, বিরাট কর্মযজ্ঞের ব্যাপার।

সারগেই আগে কখনও রিগা শহরে আসেনি, তার পক্ষে ঠিকানা খুঁজে বার করা কঠিন হত, তাই এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি নিয়ে এলেন আমাদের। তবু যাতে আমাদের চিনতে অসুবিধে না হয় সেইজন্য অধ্যাপক ইভবুলিস নিজেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায়।

স্বাভাবিক কারণেই এইসব ফ্ল্যাটবাড়িগুলি বহুতল। ছোট-ছোট লিফট, এক সঙ্গে তিনজনের বেশি ধরে না। একজনকে অপেক্ষা করতে হবে, অধ্যাপক ইভবুলিস নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের আগে তুলে দিলেন।

আগেই জেনেছিলুম, অধ্যাপকের স্ত্রী মাদাম আর্তা দুমপেই একজন নামকরা ভাস্কর। দরজা যিনি খুললেন, তিনি একজন সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী রমণী, যৌবন এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। আমি তাঁর হাতে ফুল তুলে দিতেই তিনি সহাস্যে আমাদের ভেতরে আহ্বান জানালেন।

প্রথমেই আমরা দেখতে গেলুম তাঁর স্টুডিও। সেখানে পা দেওয়া মাত্র ডানদিকের একটি মূর্তি দেখিয়ে অধ্যাপক ইভবুলিস জিগ্যেস করলেন, এটা কার, চিনতে পারেন?

আর একটি চমক। মূর্তিটি রবীন্দ্রনাথের।

ঘরে ছোট-বড় অনেক ভাস্কর্যের প্লাস্টার কাস্টিং রয়েছে, কিছু-কিছু মূর্তি অসমাপ্ত। বাস্তবানুগ কাজও যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক বিমূর্ত কাজ, নানান আকারের নারী মূর্তিও রয়েছে অনেক। কাজগুলির মধ্যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে মিশে আছে কাব্য সুষমা। বেশ বড় একটা হল ভরতি মূর্তিগুলি ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলুম আমরা।

ঘরটির ছাদ সাধারণ ঘরের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ উঁচুতে, ওপরের স্কাই লাইট দিয়ে আসছে প্রচুর আলো। একজন শিল্পীর স্টুডিও-র পক্ষে একেবারে আদর্শ। সাধারণ ফ্ল্যাট বাড়ির কোনও অ্যাপার্টমেন্ট কি এই রকম হয়।

এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতেই অধ্যাপক ইভবুলিস বললেন, তাঁদের সরকার তাঁদের জন্য বিশেষ সুবিধে দিয়েছে, স্বামী ও স্ত্রীর জন্য দুটি আলাদ অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ করে তারপর দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এত বড় একটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া পঁচিশ রুব্‌ল। টাকার হিসেবে সাড়ে তিনশো টাকার কাছাকাছি। কলকাতায় এরকম একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া হবে অন্তত তিন হাজার টাকা, আমেরিকার কোনও ছোটখাটো শহরে আট-ন'শো ডলার তো হবেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৮ সাল থেকে নাকি বাড়ি ভাড়া বাড়েনি। সরকারি ফ্ল্যাটের ভাড়া লাগে মাইনের শতকরা তিন টাকা। গ্যাসের জন্য খরচ ষোলো কোপেক। টেলিফোনের জন্য প্রতি মাসে বাঁধা দু-রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক, তাতে যত ইচ্ছে লোকাল কল করা যায়। এক রুবলের ক্রয়-ক্ষমতার আন্দাজ খানিকটা এই ভাবে বোঝা যেতে পারে, এক রুবলে দশ কিলো আলু কিংবা এগারোটা ডিম কিনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক কিলো আলু আর একটা ডিমের দাম প্রায় সমান। সরকার নিয়ন্ত্রিত বলে সারা বছরের জিনিসপত্রের দাম কখনও বাড়ে-কমে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যে-কোনও ব্যক্তির নিম্নতম আয় দুশো রুবলের কিছু কম, মার্কিন

দেশে সাড়ে আটশো ডলার, আর আমাদের দেশে নিম্নতম আয় বলে তো কিছুই নেই, শতকরা পঞ্চাশ জনেরই তো সারা বছরে রোজগারের কোনও ঠিক-ঠিকানাই থাকে না—তবু তারা বেঁচে থাকে।

মাদাম আর্তা দুমপেই খুবই খ্যাতনাম্নী ভাস্কর। তিনি বড় বড় মূর্তি গড়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে ডাক পেয়েছেন অনেকবার। রিগা শহরের কোথায় কোন মূর্তি বসানো হবে, সে ব্যাপারে যে উপদেষ্টা কমিটি আছে, তিনি তার সদস্যা। এসব ছাড়াও তিনি নিজের শখেই ভাস্কর্যের কাজ করেছেন অনেক, তার নিয়মিত প্রদর্শনী হয় স্বদেশে ও বিদেশে। উনি ব্রোঞ্জ এবং পাথরের কাজ করেন। ওঁর কবজিতে নিশ্চয়ই খুব জোর আছে, কিন্তু মুখের হাসিটি বড় সরল।

ওঁদের একটি সন্তান। ষোলো-সতেরো বছরের সেই ছেলেটিকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। মাদাম আর্তা দুমপেই নিজে ইংরেজি জানেন না। তবে ওঁদের ছেলে ইংরিজি শিখছে। তিনি ছেলেকে বললেন, খোকা, তুই এঁর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বল-না!

কিন্তু ছেলেটি বেশ লাজুক, এই বয়েসের ছেলেরা যেমন হয়, সে দু-একটা কথা বলে ঘাড় নীচু করে রইল। এঁদের সংসারটি দেখে বেশ ভালো লাগে, স্বামী পণ্ডিত ও অধ্যাপক, সবসময় বইপত্তরের মধ্যে ডুবে আছেন, স্ত্রী কঠিন পাথর কেটে সৃষ্টি করছেন শিল্প, একটিমাত্র ছেলে এখন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত।

ভিক্টর ইভবুলিস রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখেন না। অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চেনেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এবং এ বিষয়ে ওঁর একটি থিয়োরিও আছে। ওঁর ধারণা ভারতী সাহিত্য ইওরোপীয় সাহিত্যকে নানাভাবে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অন ওয়েস্টার্ন লিটারেচার, এই শিরোনামে ওঁর বিস্তৃত প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে। অথচ, আমরা এর উলটোটাই ভাবি।

'দেশ' পত্রিকার সেই পুরোনো সাহিত্য সংখ্যাটি তিনি জমিয়ে রেখেছেন সযত্নে। ভূদেব চৌধুরীর প্রবন্ধটি দেখিয়ে আপশোশ করে উনি বললেন, এই দেখুন, আমার স্ত্রীর করা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটির একটি ছবি এতে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু পুরোটা নয়। অর্ধেক। এতে মূর্তিটি ঠিক বোঝা যায় না।

আমারও আপশোশ হল, আমি ক্যামেরাটা ভুল করে ফেলে এসেছি হোটেলে। এই মূর্তিগুলির এবং এই সুন্দর পরিবারটির অনেক ছবি তোলা যেত।

স্বামী-স্ত্রী মিলে আমাকে অনেকগুলি ছবি, বই ও নানান লেখার জেরক্স কপি উপহার দিলেন।

মাদাম আর্তা দুমপেই আমাদের খাওয়ালেনও খুব। ইনি একজন রন্ধন শিল্পীও বটে। নানান রকম খাবার করেছেন, তার মধ্যে মাংসের টুকরো, সবজি ও চিজ ফুটিয়ে একটা রান্নার স্বাদ অতি অপূর্ব।

বিদায় নেবার সময় ভিক্টর ইভবুলিস আমাকে বললেন, আমার এই ফ্ল্যাটে আপনিই দ্বিতীয় বাঙালি এলেন। এর আগে যিনি এসেছিলেন, তাঁকে আপনি নিশ্চয়ই চিনবেন না। তিনি লেখক নন, কিন্তু আমার খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন।

যে-কোনও বাঙালিকে আমার পক্ষে চেনা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, তবু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই প্রথম বাঙালিটিকে আমি চিনতে পারলুম। এঁর নাম উদয় চট্টোপাধ্যায়, খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যপ্রেমিক, নিজেও কবিতা লেখেন। প্রবাসে এসে চেনা কারুর কথা শুনলে ভালো লাগে।

রাত্তিরে হোটেলে ফিরে সারগেই-এর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, হঠাৎ এক সময় সে লাফিয়ে উঠল। এই যাঃ, দারুণ ভুল হয়ে গেছে তো।

আমি জিগ্যেস করলুম, কী হল?

দারুণ চিন্তিতভাবে সারগেই বলল, আমাকে এক্ষুনি একবার রেল স্টেশনে যেতে হবে। ট্রেনে কন্ডাকটর গার্ড আমাদের টিকিট পরীক্ষা করতে নিয়েছিল, সেই টিকিট তো আর ফেরত দেয়নি! আমাকে টাকা-পয়সার হিসেব রাখতে হবে, টিকিটের কাউন্টার পার্ট না দেখালে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আমাকে ধরবে!

আমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো। বললুম, এই রাত্তিরে তোমাকে আবার দৌড়োতে হবে স্টেশনে? সে তো বেশ দূরে!

সারগেই ক্ষুণ্ণভাবে বলল, যেতেই হবে, সুনীলজি। মহিলাটির উচিত ছিল না নিজে থেকেই আমাদের টিকিট ফেরত দেওয়া? সেটাই তো নিয়ম।

আমি জিগ্যেস করলুম, আমি যাব তোমার সঙ্গে?

সারগেই বলল, না, না, আপনি গিয়ে কী করবেন? আমার কতক্ষণ লাগবে তার ঠিক নেই। আজ রাত্তিরের ট্রেন যদি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে হয়তো ওই মহিলাকে আর পাবই না।

সারগেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তারপর আমি ঘণ্টাখানেক বই পড়লুম। ভিক্টর ইভবুলিসের বাড়িতে খানিকটা ভদ্কা ও ব্র্যান্ডি পান করেছিলুম, তার প্রভাবেই কিনা জানি না, বেশ গরম লাগছে। উঠে খুলে দিলুম সব জানলা।

রিগা শহরে লেনিনগ্রাদের চেয়ে শীত অনেক কম। তবু বাইরে বেরুবার সময় গরম কোট সঙ্গে রাখতে হয়, এখানে যখন-তখন বৃষ্টি নামে, বৃষ্টির পর শীত-শীত লাগে বেশ। মাঝে-মাঝে বেশ অসুবিধে হয়। রাস্তায় শীত, সেজন্য ফুলহাতা জামা, সোয়েটার, কোট ইত্যাদি পরে বেরুতে হয়, তারপর কোনও হোটেল বা অফিস বা বাড়িতে ঢুকলেই গরম লাগে, কারণ সেসব জায়গাতে সেন্ট্রাল হিটিং। ওভারকোট খুলে রাখা যায়, কিন্তু সোয়েটার ইত্যাদি তো খোলা যায় না। এক এক সময় আমার কপালে ঘাম বেরিয়ে যায়। সারগেই-এর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সেই যে চামড়ার জ্যাকেটটা তাকে প্রথম দিন পরতে দেখেছি, তারপর সেটা আর ও একদিনও খোলেনি।

সারগেই এখনও ফেরেনি? বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে টোকা মারলুম। কোনও সাড়া নেই।

আবার খানিকটা বই পড়ার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মন বসছে না। এখনও গরম লাগছে। সেন্ট্রাল হিটিং কমানো-বাড়ানোর ব্যবস্থা এক এক জায়গায় এক এক রকম। এ ঘরে সেই ব্যবস্থাটা যে ঠিক কোথায় খুঁজে পেলুম না। জানলা দিয়ে কোনও হাওয়া আসছে না।

এক এক সময় হোটেলের বন্ধ ঘরের মধ্যে বড় অস্থির লাগে। শুধু বই পড়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঘুমও আসছে না। আমি ভাবলুম, এখন টাটকা বাতাসের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘুরে এলে কেমন হয়?

শার্ট-প্যান্ট পরাই ছিল, ওভারকোট নিয়ে, পায়ে জুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়লুম হোটেল থেকে। রাস্তায় কিছু লোকজন এখনও হাঁটাহাঁটি করছে। আমি গির্জার বাগানটা কোনাকুনি পার হয়ে চলে এলুম অন্য রাস্তায়। আমার ইচ্ছে নদীর ধারে যাওয়া। হোটেলের রাস্তা হারিয়ে ফেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। রিগা শহরে উঁচু বাড়ির সংখ্যা খুব কম, পেছন ফিরে তাকালেই আমাদের হোটেলের আলো দেখতে পাওয়া যায়।

অচেনা শহর, এখানকার ভাষাও আমার সম্পূর্ণ অজানা। এখানে ইংরিজি জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমার আড়ষ্ট বোধ হচ্ছে না, গা ছমছম করছে না। সহজাত অনুভূতি দিয়েই ভয়কে টের পাওয়া যায়। আজকাল পশ্চিমের অধিকাংশ শহরই খুব হিংস্র, রাত্তিরবেলা একা একা চলাফেরা করা রীতিমতন বিপজ্জনক। কিন্তু সকাল থেকে রিগা শহরে কয়েকবার ঘুরেই আমার মনে হয়েছে, এখানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন নেই।

যে পথ দিয়ে আমি এখন হাঁটছি, সে পথটি রীতিমতন জনবিরল। মাঝে-মাঝে দু-একটি

লোক আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। একটু বাদে আমি পরিবেশের কথা ভুলে গেলুম। ওভারকোটের পকেটে এক হাত, অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মাথা নীচু, গুনগুন করে সুর ভাঁজছি, "আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন, বাতাসে..."।

এখন আমি পৃথিবীর যে-কোনও শহরের, যে-কোনও রাস্তার, যে-কোনও একজন মানুষ।

॥ ৯ ॥

ভালেন্টিন রাসপুটিনের জন্ম ১৯৩৭ সালে, রাশিয়ান ফেডারেশানে। খ্যাতিমান লেখক। এঁর একটি অতি বিখ্যাত গল্পের নাম "ফরাসি শিক্ষা"। গল্পটি এই রকম :

একটি এগারো বছরের ছেলে গ্রাম থেকে শহরে যাচ্ছে পড়াশুনো করতে। ছেলেটির মা বিধবা, ওরা তিন ভাই বোন, ছেলেটিই সবচেয়ে বড়। ওদের অভাবের সংসার। সময়টা হল ১৯৪৮ সাল, যুদ্ধ-পরবর্তী সংকটকাল তখনও চলছে, খাদ্যদ্রব্যের খুব অভাব। গ্রামের স্কুলে ছেলেটি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে, অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে সে-ই ছিল সবচেয়ে মেধাবী। স্কুল লাইব্রেরির সব বই সে পড়ে ফেলেছে। স্টেট লটারি-লোন সার্টিফিকেট-এর খবর ছাপা হলে গ্রামের লোকেরা সেই ছাপা কাগজ ওই ছেলেটির কাছে নিয়ে আসত, কারণ সে ঠিকঠাক পড়ে দিতে পারে। সেই জন্যই গ্রামের প্রবীণরা তার মাকে বলত, তোমার এ ছেলেটির বেশ মাথা আছে। একে আরও পড়াও!

সেই জন্যই মা কষ্ট করেও ছেলেকে আরও লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঠালেন শহরে। গ্রাম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটি ছোট শহর। একটি বাড়ির একখানা ছোট ঘরে স্থান পেল সে, সপ্তাহে একবার তার মা একজন লোকের হাত দিয়ে কিছু খাবার পাঠান। খাবার মানে রুটি আর আলু। তাও ও বাড়ির অন্য ছেলেরা চুরি করে নেয় তার খাবার, সপ্তাহের মাঝখানেই ফুরিয়ে যায় তার রুটি আর আলু, তারপর শুধু খিদে, শুধু খিদে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে একবার মা দেখতে এলেন ছেলেকে। ছেলেটি কিছুতেই বুঝতে দিল না যে সে কোনওরকম কষ্টে আছে। সে হাসিমুখে মাকে কত রকম মজার গল্প শোনাল। তারপর মা যখন বিদায় নিচ্ছেন, সে আর থাকতে পারল না, গাড়ির পেছন-পেছন ছুটতে-ছুটতে কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে। মা গাড়ি থামিয়ে বললেন, তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আয়। ছেলেটি তখন উলটো দিকে দৌড় দিল।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধেবেলা সে শুধু বাড়ির কথা ভাবে। ইচ্ছে করে বাড়ি ফিরে যেতে। আবার সে ভাবে, তাকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। খালি পেট নিয়ে সে বই খুলে বসে।

গ্রামের স্কুলের ভালো ছেলে কিন্তু শহরে এসে তেমন সুবিধে করতে পারল না। অন্য সাবজেক্টগুলো কোনওক্রমে ম্যানেজ করলেও ফরাসি ভাষার ক্লাসে সে একেবারে নাজেহাল হয়ে যায়। তার গ্রাম্য উচ্চারণে তা অদ্ভুত শোনায়। ফরাসি যিনি পড়ান, তিনি একটি পঁচিশ বছরের তরুণী, তাঁর নাম লিদিয়া মিখাইলোভনা। এই ছেলেটির ফরাসি উচ্চারণ শুনে তিনি শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলেন।

খিদের চোটে ছেলেটির মাথা ঘোরে, মাঝে-মাঝে একটু দুধ খেতে ইচ্ছে করে। তাদের গ্রামে তবু নানারকম ফলমূল পাওয়া যেত, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। নদীতে মাছ ধরার জন্য সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থেকে তিনটি পুঁটি মাছ পায় মাত্র। পাড়ার ছেলেরা তাকে খেলতে ডাকে, কিন্তু তার যেতে ইচ্ছে করে না।

একদিন তাকে এ বাড়িরই একটি ছেলে জিগ্যেস করল, তুই 'ফায়ার্স' খেলতে যাবি।

ছেলেটি জিগ্যেস করল, সেটা কী খেলা?

—পয়সা দিয়ে খেলতে হয়।

—আমার তো পয়সা নেই।

তবু ছেলেটি তাকে নিয়ে যায়। বাড়ির পেছনের ঝোপঝাড় ও ছোট একটি টিলা পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে জড়ো হয়েছে কয়েকটা ছেলে। তারা মাটিতে পয়সা সাজিয়ে দূর থেকে পাথরের টুকরো ছুড়ে একরকম খেলা খেলে, যে ঠিকমতন লাগাতে পারবে, সে পয়সাগুলো জিতবে। কয়েকটা উঁচু ক্লাসের ছেলেও রয়েছে এখানে। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ভাডিক, সে বেশ লম্বা-চওড়া। সে-ই ওদের নেতা।

এই ছেলেটি কয়েকদিন ধরে খেলাটা লক্ষ করল। তার মনে হল, এটা খুব শক্ত নয়। তারও খেলতে ইচ্ছে হয়। আর কিছুর জন্য নয়; এখান থেকে কিছু পয়সা জিতলে সে দুধ কিনে খেতে পারবে। মায়ের কাছে সে টাকা চাইতে পারে না, কারণ সে জানে, তাদের পরিবার খুব কষ্টে আছে, তা ছাড়া এ বছর ফসল ভালো হয়নি। মায়ের কাছে টাকা নেই বলেই তো মা বাড়ির তৈরি রুটি পাঠিয়ে দেন। তবু মা একবার রুটি আর আলুর নীচে পাঠিয়ে দিলেন একটা পাঁচ রুবলের নোট। ছেলেটি সেই টাকা নিয়ে জুয়া খেলতে গেল।

ছেলেটি খুব সাবধানে কম কম খুচরা পয়সা দিয়ে খেলে। প্রথম দু-তিন দিন সে হারল। তারপর জেতার জন্য মরিয়া হয়ে সে বার করল পাথর ছোঁড়ার একটা নতুন কায়দা। এবার জিততে লাগল সে। তবে সে বেশি লোভ করে না। এক রুবল জিতলেই খেলা ছেড়ে চলে যায়। বাজারে গিয়ে সেই টাকায় দুধ কিনে খায়।

পর পর কয়েকদিন এরকম জেতার পর সেই ভাডিক ওকে চেপে ধরে বলল, কী ব্যাপার! তুই চালাকি পেয়েছিস, রোজ জিতে চলে যাবি? আজ তোকে শেষ পর্যন্ত খেলতেই হবে।

ছেলেটি বলল, আমাকে যে পড়তে যেতে হবে। সেই জন্য আমি বেশিক্ষণ খেলি না।

অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করতে লাগল। তাকে বাধ্য করল শেষ পর্যন্ত খেলতে। একবার সে একটা বড় খেলা জিততেই ভাডিক পা দিয়ে চেপে ধরল পয়সাগুলো। ছেলেটি পয়সা তুলতে যেতেই ভাডিক বলল, নিচ্ছিস যে, তোর তো লাগেনি!

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ লেগেছে, নিশ্চয়ই লেগেছে। একটা পয়সা উলটে গেছে।

ভাডিক তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, আমি বলছি লাগেনি!

ছেলেটি আবার তার দাবি জানাতেই তিন-চারজন মিলে মারতে লাগল তাকে। কেড়ে নিল তার পয়সা। ছেলেটি ওদের সঙ্গে মারামারিতে পারবে না। দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে ছোট টিলাটির ওপর উঠে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, হ্যাঁ, আমার লেগেছিল! লেগেছিল! তোরা চুরি করেছিস!

ভাডিক চেঁচিয়ে বলল, তুই খুন হতে চাস?

পরদিন সকালে ছেলেটি দেখল, তার নাকটা ফুলে আলু হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালশিটে, কপালে ক্ষত, মুখখানা একেবারে বীভৎস। কী করে স্কুলে যাবে এই অবস্থায়? তবু যেতেই হবে। কারুর কারুর নাক কি এমনিতেই আলুর মতন বড় হয় না? স্কুলে গিয়ে সে মুখ ঢেকে বসে রইল।

কিন্তু প্রথম ক্লাসটাই ফরাসির। লিদিয়া মিখাইলোভনা প্রত্যেক ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে গুড মর্নিং বলেন। এই ছেলেটির কাছে এসে তিনি জিগ্যেস করলেন, তোমার কী হয়েছে?

ছেলেটি বলল, আমি আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

ফরাসি শিক্ষিকা বললেন, ইস, খুব লেগেছে দেখছি।

পেছন থেকে একটি ছাত্র বলে দিল, মোটেই পড়ে যায়নি, মিস, ও জুয়া খেলতে গিয়ে মারামারি করেছে।

মিস কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি ছুটির পরে থেকে যাবে।

ছেলেটি ভাবল, মিস নিশ্চয়ই হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করবেন। তা হলে স্কুল ছেড়ে

চলে যেতে হবে! না, না, সে কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।

ছুটির পর একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে লিদিয়া মিখাইলোভনা জিগ্যেস করলেন, তুমি জুয়া খেলো, সত্যি? জেতো না হারো? জেতো? বাঃ, এটা একটা ভালো কথা অন্তত। অনেক টাকা জিতেছ? কী করবে সে টাকা দিয়ে? বই কিনবে? কেক কিনবে?

ছেলেটি বলল, আমি মাত্র এক রুবল জিতেছিলাম।

—এক রুবল? মোটে এক রুবল। তা দিয়ে কী করবে?

—দুধ কিনব।

এই কথা শুনে মিস কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মিসের তন্বী শরীর, সূক্ষ্ম, শহুরে ধরনের পোশাক, তাঁর নিশ্বাস দিয়ে সুগন্ধ বেরোয়। তিনি অঙ্ক বা ভূগোল পড়ান না। তিনি পড়ান রহস্যময় ফরাসি ভাষা, সেইজন্য তাঁকেও রহস্যময়ী মনে হয়।

মিসের কাছে ছেলেটি প্রতিজ্ঞা করল, সে আর জুয়া খেলবে না। কিন্তু সময়টা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এ বছর আবার খরা, মা কম-কম আলু পাঠাচ্ছেন। সারাক্ষণ ছেলেটির পেটে ধিকিধিকি করে জ্বলে খিদে। পকেটে আলু নিয়ে সে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও একটু আগুন জ্বেলে সে আলু পুড়িয়ে খায়।

শেষ পর্যন্ত আবার সে জুয়ার আড্ডায় গেল, দুদিন বাদে সেখানে সে আবার মার খেল। পরের দিন ঠোঁট, নাক ফোলা অবস্থায় গেল স্কুলে। এমনিতেই তার ফরাসি উচ্চারণ খারাপ, ফোলা ঠোঁটের ফরাসি শুনে লিদিয়া মিখাইলোভনা কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, থামো-থামো!

এবার তিনি ঠিক করলেন, ছেলেটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াবেন। সারাদিন ছেলেটির বুক দুরুদুরু করে। মিসের বাড়ি ঝকঝকে তকতকে, সেখানে সে কোথায় কী ভেঙে ফেলবে। সে এক কোণে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। লিদিয়া মিখাইলোভনা একটা সাদামাটা হাউস ফ্রক আর গরম ফেল্টের চটি পরে হাঁটেন আস্তে আস্তে, সবকিছুই ছেলেটির কাছে অন্য রকম মনে হয়।

একদিন ছেলেটিকে খেয়ে যেতে বললেন লিদিয়া। ছেলেটি যদিও দারুণ ক্ষুধার্ত, তবু লজ্জায় মরে গেল সে। লিদিয়া মিখাইলোভনা কি সাধারণ মানুষের মতন খাবার খান? তিনি তো সব দিক থেকে অসাধারণ। ছেলেটি কিছুতেই খাওয়ার টেবিলে বসতে রাজি হল না, ছুটে পালিয়ে গেল।

তারপর একদিন ওই ছেলেটির নামে এল একটা পার্সেল। ছেলেটি অবাক। তার মা ছাড়া তাকে আর কে কী পাঠাবে? অথচ মা তো গ্রামের লোকদের হাত দিয়ে জিনিস পাঠান, ডাকে পাঠিয়ে পয়সা নষ্ট করবেন কেন? দারুণ কৌতূহলে ছেলেটি স্কুলের সিঁড়ির নীচে বসে পার্সেলটি খুলল। সুন্দর কাগজের মোড়ক খুলতে বেরিয়ে পড়ল ম্যাকারোনি। মা কোথা থেকে এত দামি জিনিস পেল? কাঁচাই খেতে শুরু করল সেই ম্যাকারোনি, সেগুলোর তলায় সে দেখতে পেল, দুটো বড়-বড় সাদা মিছরি আর দুটি কেক! এবারে সে বুঝতে পারল। এ জিনিস তার মা পাঠাতেই পারেন না। মা হঠাৎ এত বড়লোক হয়ে গেলে নিশ্চয়ই চিঠি লিখে জানাতেন।

তক্ষুনি সবসুদ্ধ প্যাকেট বন্ধ করে সে ছুটে গেল ফরাসি শিক্ষিকার বাড়িতে। তিনি প্রথমে খুব অবাক হওয়ার ভান করলেন। তারপর লজ্জা পেয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করে বুঝলে, আমিই পাঠিয়েছি? ছেলেটি বলল, তার কারণ, আমরা বাড়িতে কোনওদিন ম্যাকারোনি বা কেক খাইনি। মা এসব জিনিসের কথা জানেই না।

ছেলেটি জোর করে প্যাকেটটা ফেরত দিয়ে গেল। মিসের হাজার অনুরোধও সে নিজে রাজি হল না। সে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল, যদি খিদের বশে হঠাৎ রাজি হয়ে যায়! সে দৌড়ে পালাল।

পড়ানো কিন্তু বন্ধ হল না। আর কোনওদিন সেই পার্সেলের কথা ওঠেনি। ছেলেটি ফরাসি শিখে গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

একদিন মিস জিগ্যেস করলেন, তুমি আর আগের মতন পয়সা নিয়ে খেলো না? ছেলেটি

বলল, সে তো এখন বিকেলবেলা এখানেই আটকে থাকে। খেলবে কী করে?

মিস জিগ্যেস করলেন, তোমাদের ওই খেলাটার নিয়মটা কী? ছেলেবেলায় আমিও খেলতুম। ভাবছি সেই একইরকম খেলা কি না। তুমি আমাকে বলো না, ভয় কী?

ছেলেটি খেলার নিয়মকানুন জানাল। মিস বললেন, না, আমরা খেলতুম অন্য খেলা। তুমি সেই খেলা খেলবে আমার সঙ্গে?

ছেলেটি অবাক। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

লিদিয়া মিখাইলোভনা বললেন, কেন, মাস্টারমশাইরা কি মানুষ নয়? আমার কি খেলতে ইচ্ছে করে না? আমি একা একা থাকি, আমার বাড়ি অনেক দূরের এক শহরে, আমি ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলুম, এখনও আমার ইচ্ছে করে খেলতে, মাঝে-মাঝে লাফাতে...কিন্তু পাশেই থাকেন হেডমাস্টার...

তারপর দুজনে খেলতে শুরু করল। পয়সা দিয়ে খেলা। একটু পরে ছেলেটি বুঝতে পারল, মিস তাকে ইচ্ছে করে জিতিয়ে দিতে চাইছে। তখন সে রেগে গিয়ে বলল, আমি খেলব না। মিস এবারে সত্যিকারের খেলা খেলতে লাগলেন।

এর পরদিন থেকে ফরাসি পড়া হয় কুড়ি পঁচিশ মিনিট, তারপরেই শুরু হয় খেলা। কোনওদিন ছেলেটি জেতে, কখনও মিস। মাঝে-মাঝে দুজনে ঠিক সমবয়স্কের মতন ঝগড়া করে। দুজনেই দুজনকে খেলার কৃতিত্বে হারাবার চেষ্টা করে। এমনকী মিস মাঝে-মাঝে চোট্টামি করেও জিতবার চেষ্টা করে...

এর মাঝখানে হঠাৎ একদিন এক হুঙ্কার শোনা গেল। হেড মাস্টার! ছাত্র ও শিক্ষিকা তখন হাঁটু গেড়ে মুখোমুখি বসে পয়সা গোনা নিয়ে ঝগড়া করছিল। হেডমাস্টার আগে কয়েকবার দরজায় টোকা দিয়েছেন, ওরা শুনতেই পায়নি। তিনি তাই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছেন। তিনি বিস্ফারিত চোখে বললেন, ছাত্রের সঙ্গে পয়সা নিয়ে খেলা...জুয়া? এমন অন্যায়, এমন পাপ, এমন বিকৃতি...

তিনদিন পরে লিদিয়া মিখাইলোভনা স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি ছেলেটিকে বলে গেলেন, তুমি পড়াশুনো চালিয়ে যেও, তোমাকে ওরা কিছু শাস্তি দেবে না, সব দোষ আমি নিজে নিয়েছি...।

কিছুদিন পরে, মধ্য শীতে, ছেলেটির নামে আর একটি পার্সেল এল। তার মধ্যে অনেক ম্যাকারোনি আর তিনটি লাল রঙের আপেল। এর আগে ওইরকম আপেল ছেলেটি শুধু ছবিতেই দেখেছে।

গল্পটিতে ছেলেটির কোনও নাম নেই। ১৯৪৮ সালে লেখকেরও বয়েস ছিল এগারো। খুবই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় গল্প।

আর একটি গল্পের নাম "চিন্তা"। লেখকের নাম ভাসিলি শুকশিন, এঁর জন্ম ১৯২৯ সালে, মৃত্যু ১৯৭৪। গল্পটি এইরকম :

রাত্তিরে ঠিক ঘুমোবার সময় শুরু হয় এই উপদ্রব। সারাদিন খেটেখুটে সবাই যখন বিশ্রাম নেবে, সেই সময় রাস্তা দিয়ে দৈত্যের মতন চেহারার নিক মালাশকিন বিকট সুরে তার আকরডিয়ন বাজাতে-বাজাতে যাবে। সেই বাজনায় একটুও সুর নেই, যেন অসুরের চিৎকার। যে যতই আপত্তি করুক নিক মালাশকিন বুক ফুলিয়ে চলে। এর বিরুদ্ধে কোনও আইন আছে? আমার অধিকার আছে বাজনা বাজাবার।

যৌথ খামারের চেয়ারম্যান মাতভেই রিয়াজানতসেভ-এর বাড়ি একটা তেরাস্তার মোড়ে। গলি থেকে যখন নিক বাজাতে-বাজাতে আসে, তখনও শোনা যায়, যখন সে মোড় পেরিয়ে যায় তখন বেশি করে শোনা যায়। সে বাজনা শুনেই মাতভেই বিছানায় উঠে বসে বলে, ব্যাটাকে কাল

দেখে নেব।! যে-কোনও উপায়ে ওকে আমি যৌথ খামার থেকে তাড়াব!

পরের দিন সে কিছুই করে না অবশ্য। নিককে দেখলে রাগে গজরায় শুধু। আবার রাত্তিরবেলা মাতভেই বলে, ব্যাটাকে যদি কালই না তাড়াই তো কী বলেছি!

মাতভেই-এর আর ঘুম আসে না। সে সিগার্টের ধরায়। আকাশ-পাতাল চিন্তা করে।

সেই রকমই এক রাত্তিরে, নিকের বাজনায় তার মেজাজে বিচড়ে গেছে, আর ঘুম আসছে না, মাঝ আকাশে উঠেছে চাঁদ, বাতাসে বুনো বুনো গন্ধ, এমন সময় মাতভেই-এর মনে পড়ে গেল আর একটি রাত্তিরের কথা। সেটা ছিল গাঢ় অন্ধকার রাত, তার ছোট ভাই কুঝমার সে-রাতে হঠাৎ নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়েছিল। কুঝমা সারাদিন খাড়া রোদে মাঠে ঘোড়া-গরু চরাতে গিয়েছিল, কয়েকবার ঝরনার ঠান্ডা জল খেয়েছে, তাই রাত্তিরে ওই কাণ্ড! মাতভেই-এর বয়েস তখন তেরো, তার বাবা তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বললেন, সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াটা নিয়ে সামনের গ্রাম থেকে খানিকটা দুধ আনতে গরম দুধ খাওয়াতে পারলে কুঝমা সেরে যাবে। মাতভেই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার রাত, সামনে কিছু দেখা যায় না, তবু তার ঘোড়া যেন মাটি ছুঁচ্ছে না, বাতাসে ভাসছে। সে তার ভাইয়ের কথা ভাবছে না, সে আকাশ দেখছে না, পৃথিবীর কথা মনে নেই, শুধু তার কানে যে বাতাসের আওয়াজ সেটাই সে অনুভব করেছে। তার শরীরে প্রচণ্ড গতির উল্লাস।

দুধ নিয়ে সে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার ভাই বাঁচেনি।

আকরডিয়নের বিকট সুর শুনে সেই রাতটার কথা মনে পড়ল কেন? তারপর সাতচল্লিশ বছর কেটে গেছে। আরও কত রাতই তো গেছে। তার বিয়ে হল, যৌথ খামার তৈরি হল, তারপর যুদ্ধ এল। অতীতের মধ্যে সবকিছু মিশে গেছে। সে তার কর্তব্য পালন করে গেছে। তাকে বলা হল যৌথ খামারে যোগ দিতে, সে যোগ দিল। বিয়ের সময় হলে বিয়ে করল। সন্তানের জন্ম দিল। যুদ্ধ এল, সে যুদ্ধ করতে গেল, ফিরে এল আহত হয়ে। তারপর সবাই বলল, মাতভেই, তোমাকে চেয়ারম্যান হতে হবে। সে হয়েও গেল। কাজ, কাজ আর কাজ, সারা জীবন শুধু কাজ। যুদ্ধও একটা কাজ। তার আনন্দ, উত্তেজনা, দুঃখ সবই কাজকে ঘিরে। লোকে যখন ভালোবাসার কথা বলে সে অবাক হয়ে যায়। সে জানে পৃথিবীতে ভালোবাসা বলে একটা জিনিস আছে, ভালোবাসা নিয়ে গান হয়, লোকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাঁদে, এমনকী একজন আরেকজনকে গুলিও করে! এই যে নিক, সেও কিনা বলে একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে, তাকে খুশি করবার জন্যই রোজ রাতে বাজনা বাজায়। মাতভেই কি কখনও কারুকে ভালোবেসেছে?

সে তার বউ আলিওনাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল। এই ওঠো, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

বউ ঘুম চোখে ব্যস্ত হয়ে বলল, কী হয়েছে?

—তুমি কি কখনও ভালোবেসেছ? আমাকে কিংবা অন্য কারুকে?

—আজ বেশি মদ গিলেছ তুমি?

—মোটেই না। যা জিগ্যেস করছি উত্তর দাও। আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে? না এ সবই অভ্যেস? এই বিয়েটিয়ে, একসঙ্গে থাকা।

একটু সময় নেওয়ার পর বউ বলল, নিশ্চয়ই ভালোবেসেছিলুম। মনে নেই, মিক করোলিয়ভ আমায় বিয়ে করার জন্য কত ঝুলোঝুলি করেছে, কিন্তু তার বদলে আমি তোমাকে—

—ঠিক আছে, ঘুমোও।

—কাল গরুগুলোকে মাঠে নিয়ে যেও। কাল আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে জাম পাড়তে যাব।

—কোন জমিতে? খামারের জমিতে যদি যাও, তোমাদের সবাইকে দশ রুবল করে ফাইন করে দেব।

আবার মাতভেই ভাবে, সেই রাতটার কথা মনে পড়ল কেন? সেই ঘোড়া ছুটিয়ে দুধ আনতে যাওয়া, তার ভাইয়ের মৃত্যু। এত বছর পরে।

আবার শোনা যাচ্ছে নিক-এর বাজনা। সে ফিরে আসছে। সে তার প্রেমিকাকে খুশি করতে চায়। অথচ এই বাজনা শুনলে মাতভেই-এর গায়ে জ্বালা ধরায়।

এবার সে ভাবল একটি সকালের কথা। সে খালি পায়ে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছে। সবুজের কোমলতা আর ঠান্ডা শিশির লাগছে তার পায়ে। বিছানায় বসে মাতভেই যেন সত্যিই সেই ঠান্ডাটা অনুভব করল।

তারপর সে ভাবল মৃত্যুর কথা। ঠিক ভয় হল না। বরং বিস্ময়। একদিন সব শেষ হয়ে যাবে, তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কবরে, তারপরেও পৃথিবী ঠিকঠাক চলবে। বড়জোর দশ-পনেরো বছর তার কথা মনে রাখবে কেউ-কেউ। সে বউকে জাগাল।

—এই শোনো, তুমি কি মৃত্যুকে ভয় পাও?

—এই লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—যা জিগ্যেস করছি, বলো না।

—কে না পরকালের ঘণ্টার কথা ভাবলে ভয় পায়?

—আমি ভয় পাই না।

—তা হলে ঘুমোও। এত চিন্তার কী আছে?

—তুমি ঘুমোও।

আবার মনে পড়ল সেই রাতটার কথা, সেই ঘোড়ার তীব্র গতি, সেই উল্লাস...। মনে পড়লেই মনটা একটা মিষ্টি অনুভূতিতে ছেয়ে যায়। জীবনের একটা কিছু আছে, যা ছাড়তে ইচ্ছে করে না, ছাড়বার চিন্তা করলে চোখে জল আসে।

তারপর এক রাত্তিরে সে নিকের বাজনার প্রতীক্ষায় বসে রইল। সিগারেট টানতে-টানতে অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। রাত্রি একেবারে শুনশান। অপেক্ষা করতে-করতে সারারাত কেটে গেল, নিক এল না।

ভোর হতেই বউকে জাগিয়ে সে জিগ্যেস করল, ছেলেটা অসুস্থ নাকি?

বউ বলল, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই রোববার বিয়ে।

সেদিন মাতভেই নিজেই নিকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইল, কী ব্যাপার, তুমি আর বাজনা বাজাচ্ছ না?

নিক একগাল হেসে বলল, আর আপনাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাব না। নিনা আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছে।

মাতভেই বিরক্ত হয়ে ভাবল, অত হাসির কী আছে? দু'দিন বাদেই তো নিনা তোর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। ওদের বংশটাই ওরকম!

সাতদিন কেটে গেল। রাত্রিগুলো এখন নিস্তব্ধ। কিন্তু মাতভেই-এর আর ঘুম আসেনি। সে উঠে সিগারেট খায়। এক চুমুক হালকা মদ খায়। উঠে বাইরে আসে। সিঁড়ির ওপর বসে থাকে। সমস্ত গ্রাম জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। বড় বেশি নিস্তব্ধতা।

বেল্লা আখমাদুলিনা। জন্ম ১৯৩৭ সাল। তাঁর একটি কবিতার নাম "অন্য কিছু" :

আমার এ কী হল, প্রায় গোটা বছর
আমি লিখতে পারিনি একটিও কবিতা
আমার ওষ্ঠে এই যে বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছি
এই বধিরতা—বিষম ভারী হয়ে চেপে বসছে আমার ওপর।

কিন্তু...তুমি বলবে...এই তো বেশ একটা স্তবক
চারটে লাইন, ছন্দ এবং মিলও ঠিকঠাক।
কিন্তু সেটা কথা নয়। এসব তো আমি অনেকদিন ধরে শিখেছি।
শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবিতার মতন লাইন তৈরি করা।

এ তো অভ্যাস...আমার এক ধরনের দক্ষতা।
এরকম লেখায় কিছু আসে যায় না। তবে কী, হে ভগবান।
কী যেন বেরিয়ে এসেছিল তখন? মাত্র একটি লাইন তো নয়
অন্য কিছু। কী সেই অন্য কিছু, একেবারে ভুলে গেছি।
সেই যে অন্য কিছু, কেন তার এত কুণ্ঠা।
কখনও সাহসী হলে, বেরিয়ে এসেছিল উজ্জ্বল স্বরের মতন
আমার ওষ্ঠের ওপর নেমে এসেছিল হাসির রেখা হয়ে
অথবা আকস্মিক কান্না—কোনটা চেয়েছিল বেছে নিতে?

ইউন্না মরিটস-এর জন্ম ১৯৩৭-এ। তাঁর একটি নামহীন কবিতা এই রকম :
ঠিক টুং টাং বা ঢং ঢং নয়
নয় একটা দোয়েলের ডাক
একটু কান্না, একটু ঝলকানি, নয় দীর্ঘশ্বাসও
আঙুর খেতের মেঘলা সুখের মধ্যে যেন ছুঁয়ে আছে
অথবা লেবু গাছে বাতাসের শিরশিরানির মধ্যে ফুটে ওঠে।

আমি শুনতে পাই মধ্য রাতে, শুনি খুব ভোরে
গুমোট ও গরমের উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং আমার দরজার বাইরে শীতে
এটা কীসের শব্দ? আমি জানতে চাই, কে এত পবিত্র ও নিষ্পাপ
যে তার আত্মার ভেতর থেকে এমন স্বর তুলে আনতে পারে?

সেই শব্দ আমার কাছে আসে যখন নৌকোয়, অথবা চলন্ত ট্রেনে
এমনকী যখন রুটির দোকানে যাই তখনও আসে আমার পিছু পিছু
তার খোঁজে আমি কাটিয়ে দিলুম আমার কিশোরী জীবন
তারপর আর ফেরার পথ নেই, এদিকে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল।
গতকাল আমার এক বন্ধু বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছে
তাকে জানিয়েছে এক ধূর্ত খবর-শিকারি
আমার আত্মা নাকি একেবারে ঝড়-বিধ্বস্ত হয়ে গেছে
কী একটা শব্দ আমাকে বেঁধে রেখেছে চিরকালের মতন।

রাত জেগে আমি যে কয়েকটি গল্প ও কবিতা পড়লুম, সেগুলোর ভাবার্থ তুলে দিলুম এখানে। এগুলি ষাট ও সত্তরের দশকে লেখা। এগুলি থেকে সাম্প্রতিক সোভিয়েত সাহিত্যের খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়।

এই লেখাগুলি আমি পড়লুম "ল্যান্ড অফ দা সোভিয়েটস ইন ভার্স অ্যান্ড প্রোজ" দু-খণ্ড থেকে। প্রকাশক প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। বই দুটি এতই সুমুদ্রিত যে হাতে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা, ভেতরে চমৎকার চমৎকার ছবি।

॥ ১০ ॥

সকালবেলা সারগেইকে আমি জিগ্যেস করলুম, আজ কী কী প্রোগ্রাম আছে বলো!

সারগেই পকেট থেকে কাগজ বার করে দেখে বলল, অপেরা পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলোচনা, রাইটার্স ইউনিয়ানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এ পি এন অফিসে সাক্ষাৎকার, আর্ট এক্সিবিশান দেখা...

আমি অস্ফুটকণ্ঠে বললুম, বাবাঃ, এ যে রীতিমতন ভি আই পি'র মতন ব্যাপার, সারাদিন একটুও বিশ্রাম নেই। এক একদিন ইচ্ছে করে কিছু না করে চুপ করে বসে থাকতে।

আজ বৃষ্টি নেই, শীতও কম, ঝকঝকে রোদ, একটা পার্কে বসে পায়রাদের ওড়াউড়ি দেখলে বেশ হত। এখানকার পায়রাগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী। মস্কোতে কাক দেখে চিনতে পারিনি এত মোটা, রংও কুচকুচে কালো নয়।

আমি সারগেইকে বললুম, সবক'টা জায়গাতেই যেতে হবে? দু-একটা বাদ দিলে হয় না?

সারগেই চোখ বড় বড় করে বলল, না! সব জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, লোকজন অপেক্ষা করবে।

সারগেই নিজেই রিগা শহরে এই প্রথম এসেছে। এখানকার সবকিছু জানা সম্পর্কে ওরও আগ্রহ আছে। হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা দিনের কর্ম শুরু করার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

একটা বেশ পুরোনো থিয়েটার হলের একটি ঘরে একজন নাট্য-পরিচালক ও কয়েকজন মঞ্চকর্মী ও অভিনেতা-অভিনেত্রী অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা গেল কিছুক্ষণ। নাটক ও অপেরা সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের অত্যুৎসাহের কথা আমরা জানি। এ দেশের ফিল্ম খুব একটা উচ্চাঙ্গের নয়। আইজেনস্টাইন-পুডকিন-চেরকাশভের কথা মনে রেখেও বলা যায়, সাম্প্রতিক দু-চারটি সোভিয়েত ফিল্ম বেশ উচ্চমানের হলেও অধিকাংশ ফিল্ম মোটা দাগের, শিল্পকলা বা উপভোগ্যতা দুটোই কম। এদেশের টিভি অনুষ্ঠানও তেমন আকর্ষণীয় নয়, এঁরাই কয়েকজন বললেন। নাটক আর অপেরা কিন্তু উচ্চমান বজায় রেখে গেছে। রিগার নাটক মাঝে-মাঝে বিদেশ সফরেও যায়। এক একটি নাটক অনেকদিন চলে। সফল নাট্যকারদের রোজগারও খুব ভালো।

আমি বললুম, নাটক সম্পর্কে আলোচনা না করে নাটক দেখা অনেক বেশি ফলপ্রসূ নয়?

ওরা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পরে আমাকে একটি নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন ওঁরা।

রাইটার্স ইউনিয়ানে গিয়ে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারলুম। এঁদের বাড়িটি অবশ্য মস্কোর রাইটার্স ইউনিয়ানের মতন অমন বনেদি বাড়ি নয়। এখানকার সেক্রেটারি বললেন, ল্যাটভিয়াতে ২০০ জন লেখক আছেন, লেখাটাই যাঁদের জীবিকা! ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ লক্ষ, সেখানে দুশো লেখক? আরও জানলুম যে এখানে সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত সমালোচক আছে ৭০ জন, এবং শিল্পীর সংখ্যা ৭০০। এঁরা সবাই ইউনিয়ানের সদস্য। এর বাইরেও শখের লেখক-শিল্পী আছেন, যাঁদের মূল্য জীবিকা অন্য কিছু।

এই তথ্যের বিস্ময় আমাকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। একটা জাতি কতখানি শিল্প-সাহিত্য প্রেমিক হলে সেখানে এতগুলি লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতজ্ঞ থাকতে পারে। পঁচিশ লক্ষ জনসংখ্যার প্রত্যেকেই শিক্ষিত বলে ধরে নিচ্ছি, তা হলেও তাদের মধ্যে এত লেখক শিল্পীর সমাবেশ প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। অথচ সত্যি। ল্যাটভিয়ান ভাষায় সাহিত্যচর্চার বয়েসও বেশি নয়। একশো বছর আগেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ছিল।

সেক্রেটারি মশাই বললেন, কিছু বছর আগে একটা সংস্কৃত অভিধান হাতে পেয়ে আমরা চমকে উঠেছিলুম। কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আমাদের মিল আছে।

ল্যাটভিয়ানরা লাটিন জাতি, তাঁদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আপনাদের এক সহোদরা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বসন্তকালে রিগা শহরে একটি আর্ট ফেস্টিভাল হয়। দোম ক্যাথিড্রালের সামনের প্রকাণ্ড চত্বরে তরুণ শিল্পীরা তাদের যার যার ছবি, ওয়াটার কালার, ট্যাপেস্ট্রি, পোস্টার, সেরামিক দ্রব্য ইত্যাদি যার যেরকম খুশি সাজিয়ে নিয়ে বসে। অনেকটা প্যারিসের Salon des inde'pedants-এর মতন। হাঁটতে-হাঁটতে সেখান দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম সেই শিল্পমেলার প্রস্তুতি চলছে। কয়েকজন তরুণ-তরুণী বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে। মেলাটা শুরু হতে কয়েকদিন দেরি আছে, ততদিন আমার এখানে থাকা হবে না।

শুনলুম যে, এখানে ছবি প্রদর্শন করবার জন্য কোনও সিলেকশন কমিটি নেই। কোনওরকম বিধিনিষেধ নেই। প্যারিসের মেলার মতনই এখানেও ছবি রাখবার শর্ত একটাই, কোনও শর্তই থাকবে না। ছবির গুণাগুণ নির্ধারণের জন্যও থাকে না কোনও বিচারক; বিচারক হল দর্শকরা। তারা ইচ্ছে হলে কিনবে, অথবা কিনবে না।

শিল্পমেলাটি দেখা হবে না বলেই দেখতে গেলুম একটি শিল্প প্রদর্শনী। আমাদের হোটেলের কাছেই একটি বড় হলে রিগার তরুণ শিল্পীদের বার্ষিক প্রদর্শনী চলছে, টিকিট কেটে ঢুকতে হয়।

প্রায় শ'দেড়েক ছবি ও কিছু ভাস্কর্য। সবচেয়ে যেটা অবাক লাগল, তা হল এতগুলি ছবির মধ্যে একটি ছবিও তথাকথিত রিয়েলিস্টিক নয়। ক্রুশ্চভের আমলে কলকাতায় সোভিয়েত শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী দেখেছিলুম, তার অধিকাংশ ছবিই আমাদের পছন্দ হয়নি। সেসব বেশিরভাগ ছবিই ছিল ফটোগ্রাফিক, চড়া রং ও হাইলাইটের ব্যবহার, শিল্পের বিস্ময় ছিল খুবই কম। এখানে, এখনকার তরুণ ছেলেমেয়েদের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি রহস্যময়তার দিকে ঝোঁক। মানুষের মূর্তি যেতে চাইছে বিমূর্ততার দিকে। কিছু-কিছু ছবি অবশ্য ইম্প্রেশানিস্টদের কপির মতন।

ঘণ্টাদুয়েক সেই শিল্প প্রদর্শনীতে বেশ কাটল।

এরপর গেলুম এ পি এন অফিসে। আজ ৫ মে, কোনও কারণে এখানে ছুটি। তবু ছুটির দিনেই আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দফতরে এসেছেন কয়েকজন। যে সুরসিক ব্যক্তিটি রেল স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনিই এখানকার অফিস প্রধান।

তিনি জিগ্যেস করলেন, খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে তো?

আমি হাসলুম।

তিনি বললেন, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাকে যত বেশি জায়গা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখানো। মনে হচ্ছে আপনার কিছু-কিছু সময় ফাঁকা যাচ্ছে, সেখানে আরও দু-একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, দা মোর দা মেরিয়ার।

ছুটির দিনে অফিস-অফিস ভাব নেই, পরিবেশটা অনেকটা আড্ডার মতন। ওঁদের কাছে শুনতে লাগলুম ল্যাটভিয়ার অতীত ইতিহাস।

আমি জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তো ল্যাটভিয়ায় অনেকরকম বিপর্যয় গেছে, এখনকার মানুষজনকে বহুরকম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এখন রাস্তাঘাটে যাদের দেখি, সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান, খুশি-খুশি চেহারা, শিল্প-সাহিত্যে এখানকার মানুষদের এত আগ্রহ, এত তাড়াতাড়ি এরকম উন্নতি কী করে সম্ভব হল?

ওঁদের একজন বললেন, মানুষের প্রাণশক্তি। মানুষ সব পারে!

আমি আবার বললুম, আমার আর একটি কৌতূহলের নিবৃত্তি করুন তো! সোভিয়েত দেশে

॥ ১০ ॥

সকালবেলা সারগেইকে আমি জিগ্যেস করলুম, আজ কী কী প্রোগ্রাম আছে বলো।

সারগেই পকেট থেকে কাগজ বার করে দেখে বলল, অপেরা পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলোচনা, রাইটার্স ইউনিয়ানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এ পি এন অফিসে সাক্ষাৎকার, আর্ট এক্সিবিশান দেখা...

আমি অস্ফুটকণ্ঠে বললুম, বাবাঃ, এ যে রীতিমতন ভি আই পি'র মতন ব্যাপার, সারাদিন একটুও বিশ্রাম নেই। এক একদিন ইচ্ছে করে কিছু না করে চুপ করে বসে থাকতে।

আজ বৃষ্টি নেই, শীতও কম, ঝকঝকে রোদ, একটা পার্কে বসে পায়রাদের ওড়াউড়ি দেখলে বেশ হত। এখানকার পায়রাগুলো বেশ স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী। মস্কোতে কাক দেখে চিনতে পারিনি এত মোটা, রংও কুচকুচে কালো নয়।

আমি সারগেইকে বললুম, সবক'টা জায়গাতেই যেতে হবে? দু-একটা বাদ দিলে হয় না?

সারগেই চোখ বড় বড় করে বলল, না। সব জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, লোকজন অপেক্ষা করবে।

সারগেই নিজেই রিগা শহরে এই প্রথম এসেছে। এখানকার সবকিছু জানা সম্পর্কে ওরও আগ্রহ আছে। হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা দিনের কর্ম শুরু করার জন্য বেরিয়ে পড়লুম।

একটা বেশ পুরোনো থিয়েটার হলের একটি ঘরে একজন নাট্য-পরিচালক ও কয়েকজন মঞ্চকর্মী ও অভিনেতা-অভিনেত্রী অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা গেল কিছুক্ষণ। নাটক ও অপেরা সম্পর্কে সোভিয়েত জনগণের অত্যুৎসাহের কথা আমরা জানি। এ দেশের ফিল্ম খুব একটা উচ্চাঙ্গের নয়। আইজেনস্টাইন-পুডভকিন-চেরকাশভের কথা মনে রেখেও বলা যায়, সাম্প্রতিক দু-চারটি সোভিয়েত ফিল্ম বেশ উচ্চমানের হলেও অধিকাংশ ফিল্ম মোটা দাগের, শিল্পকলা বা উপভোগ্যতা দুটোই কম। এদেশের টিভি অনুষ্ঠানও তেমন আকর্ষণীয় নয়, এঁরাই কয়েকজন বললেন। নাটক আর অপেরা কিন্তু উচ্চমান বজায় রেখে গেছে। রিগার নাটক মাঝে-মাঝে বিদেশ সফরেও যায়। এক একটি নাটক অনেকদিন চলে। সফল নাট্যকারদের রোজগারও খুব ভালো।

আমি বললুম, নাটক সম্পর্কে আলোচনা না করে নাটক দেখা অনেক বেশি ফলপ্রসূ নয়?

ওরা বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

পরে আমাকে একটি নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন ওঁরা।

রাইটার্স ইউনিয়ানে গিয়ে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারলুম। এঁদের বাড়িটি অবশ্য মস্কোর রাইটার্স ইউনিয়ানের মতন অমন বনেদি বাড়ি নয়। এখানকার সেক্রেটারি বললেন, ল্যাটভিয়াতে ২০০ জন লেখক আছেন, লেখাটাই যাঁদের জীবিকা! ল্যাটভিয়ার জনসংখ্যা মাত্র পঁচিশ লক্ষ, সেখানে দুশো লেখক? আরও জানলুম যে এখানে সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত সমালোচক আছে ৭০ জন, এবং শিল্পীর সংখ্যা ৭০০। এঁরা সবাই ইউনিয়ানের সদস্য। এর বাইরেও শখের লেখক-শিল্পী আছেন, যাঁদের মূল্য জীবিকা অন্য কিছু।

এই তথ্যের বিস্ময় আমাকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। একটা জাতি কতখানি শিল্প-সাহিত্য প্রেমিক হলে সেখানে এতগুলি লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতজ্ঞ থাকতে পারে। পঁচিশ লক্ষ জনসংখ্যার প্রত্যেকেই শিক্ষিত বলে ধরে নিচ্ছি, তা হলেও তাদের মধ্যে এত লেখক শিল্পীর সমাবেশ প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। অথচ সত্যি। ল্যাটভিয়ান ভাষায় সাহিত্যচর্চার বয়েসও বেশি নয়। একশো বছর আগেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ছিল।

সেক্রেটারি মশাই বললেন, কিছু বছর আগে একটা সংস্কৃত অভিধান হাতে পেয়ে আমরা চমকে উঠেছিলুম। কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আমাদের মিল আছে।

ল্যাটভিয়ানরা লাটিন জাতি, তাঁদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আপনাদের এক সহোদরা ভাষার প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

বসন্তকালে রিগা শহরে একটি আর্ট ফেস্টিভাল হয়। দোম ক্যাথিড্রালের সামনের প্রকাণ্ড চত্বরে তরুণ শিল্পীরা তাদের যার যার ছবি, ওয়াটার কালার, ট্যাপেস্ট্রি, পোস্টার, সেরামিক দ্রব্য ইত্যাদি যার যেরকম খুশি সাজিয়ে নিয়ে বসে। অনেকটা প্যারিসের Salon des inde'pedants-এর মতন। হাঁটতে-হাঁটতে সেখান দিয়ে যেতে-যেতে দেখলুম সেই শিল্পমেলার প্রস্তুতি চলছে। কয়েকজন তরুণ-তরুণী বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি টাঙাচ্ছে। মেলাটা শুরু হতে কয়েকদিন দেরি আছে, ততদিন আমার এখানে থাকা হবে না।

শুনলুম যে, এখানে ছবি প্রদর্শন করবার জন্য কোনও সিলেকশন কমিটি নেই। কোনওরকম বিধিনিষেধ নেই। প্যারিসের মেলার মতনই এখানেও ছবি রাখবার শর্ত একটাই, কোনও শর্তই থাকবে না। ছবির গুণাগুণ নির্ধারণের জন্যও থাকে না কোনও বিচারক; বিচারক হল দর্শকরা। তারা ইচ্ছে হলে কিনবে, অথবা কিনবে না।

শিল্পমেলাটি দেখা হবে না বলেই দেখতে গেলুম একটি শিল্প প্রদর্শনী। আমাদের হোটেলের কাছেই একটি বড় হলে রিগার তরুণ শিল্পীদের বার্ষিক প্রদর্শনী চলছে, টিকিট কেটে ঢুকতে হয়।

প্রায় শ'দেড়েক ছবি ও কিছু ভাস্কর্য। সবচেয়ে যেটা অবাক লাগল, তা হল এতগুলি ছবির মধ্যে একটি ছবিও তথাকথিত রিয়েলিস্টিক নয়। ক্রুশ্চভের আমলে কলকাতায় সোভিয়েত শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী দেখেছিলুম, তার অধিকাংশ ছবিই আমাদের পছন্দ হয়নি। সেসব বেশিরভাগ ছবিই ছিল ফটোগ্রাফিক, চড়া রং ও হাইলাইটের ব্যবহার, শিল্পের বিস্ময় ছিল খুবই কম। এখানে, এখানকার তরুণ ছেলেমেয়েদের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি রহস্যময়তার দিকে ঝোঁক। মানুষের মূর্তি যেতে চাইছে বিমূর্ততার দিকে। কিছু-কিছু ছবি অবশ্য ইম্প্রেশানিস্টদের কপির মতন।

ঘণ্টাদুয়েক সেই শিল্প প্রদর্শনীতে বেশ কাটল।

এরপর গেলুম এ পি এন অফিসে। আজ ৫ মে, কোনও কারণে এখানে ছুটি। তবু ছুটির দিনেই আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য দফতরে এসেছেন কয়েকজন। যে সুরসিক ব্যক্তিটি রেল স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন, তিনিই এখানকার অফিস প্রধান।

তিনি জিগ্যেস করলেন, খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে তো?

আমি হাসলুম।

তিনি বললেন, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনাকে যত বেশি জায়গা সম্ভব ঘুরিয়ে দেখানো। মনে হচ্ছে আপনার কিছু-কিছু সময় ফাঁকা যাচ্ছে, সেখানে আরও দু-একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঢুকিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, দা মোর দা মেরিয়ার।

ছুটির দিনে অফিস-অফিস ভাব নেই, পরিবেশটা অনেকটা আড্ডার মতন। ওঁদের কাছে শুনতে পাগলুম ল্যাটভিয়ার অতীত ইতিহাস।

আমি জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তো ল্যাটভিয়ায় অনেকরকম বিপর্যয় গেছে, এখনাকার মানুষজনকে বহুরকম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু এখন রাস্তাঘাটে যাদের দেখি, সকলেই বেশ স্বাস্থ্যবান, খুশি-খুশি চেহারা, শিল্প-সাহিত্যে এখানকার মানুষদের এত আগ্রহ, এত তাড়াতাড়ি এরকম উন্নতি কী করে সম্ভব হল?

ওঁদের একজন বললেন, মানুষের প্রাণশক্তি। মানুষ সব পারে!

আমি আবার বললুম, আমার আর একটি কৌতূহলের নিবৃত্তি করুন তো। সোভিয়েত দেশে

এসে দেখছি, থিয়েটারে-অপেরায়, ট্রেনে, রাস্তায়, রেস্তোঁরায়, মেয়েরা আলাদা বসে, একসঙ্গে এক জোড়া নারী পুরুষের বদলে আলাদা নারী, আলাদা পুরুষ দেখতে পাই, এর কারণ কী? নারী-পুরুষের মেলামেশার নিশ্চয়ই কোনও বিধিনিষেধ নেই, তবু পুরুষ সঙ্গীহীন যুবতীদের এত বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আরও অনেক প্রশ্ন এসে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জীবিকার ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে। পশ্চিমি দেশগুলিতে মেয়েরা এতখানি স্বাধীনতা ও সমান অধিকার এখনও পায়নি। কিন্তু এই সমান মর্যাদাও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

বাড়ির বাইরে মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার অর্জন করলেও, নিজের সংসারে কি সেই অধিকার পাওয়া সম্ভব? স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সমান মাইনের এবং সমান পরিশ্রমের চাকরি করে। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পরও কি দুজনে সব কাজ সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে? মেয়েদের রান্নাঘরে ঢুকতেই হয়। বাচ্চাদেরও দেখাশুনো করতেই হয়, সে সময়টায় তার স্বামী টিভি দেখে কিংবা গল্পের বই খুলে বসে বা পাড়ার ক্লাবে খেলতে যায়। আজকাল অনেক স্বামী রান্না বা বাসন মাজার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করে। কিন্তু তা সাহায্য মাত্র, সব কাজ সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া অসম্ভব। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে স্বামীর মুখ দিয়ে অমনি বেরিয়ে পড়বে, ওগো, দু-কাপ চা করে দাও তো! যেন এটা শুধু মেয়েদেরই কাজ। তা ছাড়া, যাকে বলে সংসার চালানো, ভাঁড়ার ঘর ভরতি রাখা ও জামাকাপড়ের হিসেব রাখা ও দায়িত্ব মেয়েদেরই নিতে হয়।

ধরা যাক, এসব দায়িত্বও পুরুষরা সমানভাবে ভাগ করে নিল। কিন্তু শিশুপালন পুরুষের পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব নয়। কোনও মা-ই এ দায়িত্ব পুরুষদের ওপর ছেড়ে দিতে চাইবেও না। সুতরাং বাইরের জগতে সমান অধিকারপ্রাপ্তা মেয়েদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় নিজের সংসারে। এই কারণে খিটিমিটি বাধে, তারপর মন কষাকষি, তার পরেই ডিভোর্স।

সোভিয়েত ইউনিয়ানে ডিভোর্সের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রিগা শহরে শতকরা ৫০টি পরিবারেই ডিভোর্স হয়।

আলোকপ্রাপ্তা মেয়েরা বিয়ের পরেও চাকরি ছাড়তে চায় না। শুধু টাকা পয়সার জন্য নয়, মেয়েরা চায় না শুধু পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে। তারা চায় সমাজের কাজেও নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে, গোষ্ঠীজীবনে তারা নিজেরাও প্রত্যেকে কিছু দিতে চায়, তারা চায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ।

সম্পূর্ণ সমান অধিকার পাওয়ার পর তারা আর যে-কোনও ভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রম বা বেশি দায়িত্ব নেওয়াটা বরদাস্ত করতে পারে না। এর ফলে জন্মহার সাংঘাতিকভাবে কমে যাচ্ছে। বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া মানেই মেয়েদের বেশিদিনের জন্য বাড়িতে আটকে থাকা, বেশি দায়িত্ব, বেশি কাজ। সেইজন্য অধিকাংশ পরিবারেই আজকাল একটি মাত্র সন্তান। এদেশে দুটি সন্তান আছে এমন পরিবারের সংখ্যা যত, একটিও সন্তান নেই এমন পরিবারের সংখ্যাও তত। তিনটি সন্তান আছে, এমন পরিবার শতকরা মাত্র একটি। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ানের এখন জনসংখ্যা কমতির দিকে। বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য দম্পতিদের প্রতি সরকারি তরফ থেকে নানারকম উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একগাদা কাচ্চাবাচ্চার মা হলে এদেশে সে সোনার মেডেল পাবে।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই এদেশে ডিভোর্স চায় বেশি। তার কারণ মেয়েদের নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই। প্রত্যেক মেয়েই চাকরি পাবে এবং আলাদা থাকলে নিজস্ব ফ্ল্যাটও পাবে।

মেয়েদের সমান অধিকার আর পরিবার প্রথা, এই দুটিকে যেন আর খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। এর একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের নতুন করে ভাবতে হবে। পশ্চিমি দেশগুলিতে

তো ছেলেমেয়েরা আজকাল বিয়েই করতে চাইছে না। সেইজন্য পারিবারিক বন্ধনও থাকছে না। ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে, এবং সন্তান সংখ্যা কমছে। শুধু বড় শহরে নয়, গ্রামেও। উন্নত দেশগুলিতে এখন সত্যিকারের গ্রাম বলতে কিছু নেই, গ্রামের জীবনযাত্রাও শহরে ধাঁচের।

সেইজন্যই পথে বা ট্রেনে বা থিয়েটারে আলাদা-আলাদা নারীদের দেখা যায়, যারা হয় কুমারী অথবা বিবাহ-ভগ্না। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ফল যদি হয় নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া, তবে সেটাও তো খুব ভয়াবহ হবে।

আড্ডার মাঝখানে একটু চায়ের আয়োজন করা হল। স্পিরিট ল্যাম্পে গরম জল ফুটিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল চায়ের পাতা। এদেশে এসে একদিনও ভালো চা খাইনি, এই চা-ও যথারীতি বিস্বাদ। ভারত নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনেক চা বিক্রি করে, আমরা ওদের এত খারাপ চা দিই কেন?

ওঁদের একজন বললেন যে, তিনি সদ্য কানাডা ঘুরে এসেছেন, সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন এই চা।

অর্থাৎ আমি বিশিষ্ট অতিথি বলেই তিনি কানাডা থেকে সযত্নে নিয়ে আসা স্পেশাল চা পান করাচ্ছেন আমাকে। এর আগে এক জায়গায় শুনেছিলুম, জর্জিয়াতেও নাকি চা হয়। আমার সব ভূগোলের জ্ঞান গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা তো জানতুম, ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা বার্মা চিন ছাড়া আর কোথাও চা হয় না। এখন শুনছি জর্জিয়ান চা, ক্যানাডিয়ান চা, এসব কী? যাই হোক, আমি বঙ্গবাসী, আমার বাড়ি থেকে দার্জিলিং বেশি দূরে নয়, আমার কাছে এঁদের এই কালচে তরলপদার্থ মোটেই চা পদবাচ্য নয়।

রাত্তিরবেলা থিয়েটারটি বেশ উপভোগ্য হল। আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল একটি সংরক্ষিত বক্সে। দারুণ খাতিরের ব্যাপার। ওখানে বসতে পান শুধু নগরপাল এবং সোভিয়েত ডেপুটিরা। বক্সটির সংলগ্ন একটি ছোটঘর, সেখানে আছে ওভারকোট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার জায়গা আর ধূমপানের ব্যবস্থা। আমি আর সারগেই দোতলার বক্সে বসেছি, নীচ থেকে দর্শকরা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমায় দেখছে। আমাকে আফ্রিকার কোনও দেশের রাষ্ট্রপতি ভাবছে কি না কে জানে!

প্রেক্ষাগৃহটি দর্শকে পরিপূর্ণ। নাটকের কাহিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার, প্রচণ্ড শীতে এক বরফ-ঝরা মধ্য রাত্রে একজন আগন্তুক এসে আশ্রয় চেয়েছে একটি গ্রামের বাড়িতে। জমিদারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, পালিয়ে এসেছে লোকটি, গ্রামের লোকদের জমিদারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়, কিন্তু দেখা গেল যে-বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে, সে বাড়ির কর্ত্রী তার পূর্ব প্রণয়িনী। এই ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়ে বাড়ির কর্তা বারবার মদের দোকানে চলে গিয়ে ধুম মাতাল হয়ে পড়ে ইত্যাদি। কাহিনিটি অনেকটা আন্দাজে বুঝলুম, কারণ নাটকটি ল্যাটভিয়ান ভাষায় বলে সারগেইও বুঝতে পারছিল না। তবে অভিনয়ে ও মঞ্চসজ্জায় বেশ জমজমাট।

নাটক দেখে ফেরার পথে আমরা আর গাড়ি নিলুম না, হাঁটতে লাগলুম। পথে অনেক মানুষজন। আমাদের কোনও তাড়া নেই। আমরা গল্প করতে-করতে আস্তে-আস্তে হাঁটছি।

হঠাৎ একজন লোক আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটির চোখমুখ দেখে মনে হয় কিঞ্চিৎ-অধিক ভদ্কা সেবন হয়েছে।

লোকটি জিগ্যেস করল, হিন্দি?

বুঝলুম সে জানতে চাইছে আমি ভারতীয় কি না। আমি মাথা নাড়লুম।

লোকটি হাসিমুখে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, হিন্দি-রুশী বায় বায় (ভাই ভাই)।

॥ ১১ ॥

এইখানে একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশুতে পরিণত করা হয়েছিল। এইখানে একদিন নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল খোঁয়াড়ে। শক্ত সমর্থ পুরুষদের মুখের রক্ত তুলে খাটানো হত সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। সন্তানের সামনে থেকে ভাইকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হত, তারা আর ফিরত না। সভ্য, শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছে, নিজের মলমূত্রের মধ্যে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এইখানে বয়ে গেছে নররক্তের স্রোত। এই মাটিতে মিশে আছে এক লক্ষেরও বেশি নারী-পুরুষের শব।

এইখানে ছিল হিটলারের নাতসি বাহিনীর অধীনে ইহুদি কনসেনট্রেশান ক্যাম্প।

রিগা শহর থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে এই এলাকাটির নাম সালাসপিলস। তিনদিকে নিবিড় বন। তার মাঝখানে বিশাল উন্মুক্ত চত্বর। সেই কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের কোনও চিহ্নই এখন আর এখানে নেই; বরং জায়গাটি দেখতে বড়ই সুন্দর। খুব যত্নে এই এলাকাটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

গাড়ি থেকে নামার পর দু-ধারে বৃক্ষ সারি সমন্বিত একটি প্রশস্ত পথ ধরে অনেকখানি হেঁটে আসতে হয়। তারপর চোখে পড়ে একটি অতিকায় স্মৃতিসৌধ। এখানে রাখা আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু ছবি ও নানান ইতিহাস-চিহ্ন। এই ভবনটি পার হয়ে এলে প্রকাণ্ড চত্বরটিতে এসে দাঁড়াতে হয়। আগাগোড়া কংক্রিটে বাঁধানো। এই চত্বরটি অন্তত দশখানা গ্রাউন্ডের সমান। হিটলারি আমলের কাঁটাতারের বেড়া ও বন্দি নিবাসগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে, তার জায়গায় রয়েছে কয়েকটি মহান, গম্ভীর ভাস্কর্য। মূর্তিগুলি এইরকম : প্রথমে দেখা যাচ্ছে অত্যাচারিত মানুষ মাটিতে পড়ে আছে। আর একটু এগোলে দেখা যায় তারা আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। তারপর তাদের প্রতিরোধের ভঙ্গি। একেবারে শেষ দিকে দেখা যায় সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে মা। তার পাশে বিজয়ী পুরুষ, যে বজ্রমুষ্টি, তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। এরপর অরণ্যের সবুজ দেওয়াল। মূর্তিগুলি লাইফ সাইজের দু-তিন গুণ বড়।

হিটলারি বাহিনীর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের নানান কাহিনি আমরা পড়েছি। পোলান্ডের কুখ্যাত গ্যাস চেম্বার নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। ফিলম তোলা হয়েছে। রিগার এই সালাসপিল্‌স বা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের কথাও অনেকের কাছে ইদানীং সুপরিচিত, ফ্রেডরিক ফরসাইথের অতি জনপ্রিয় উপন্যাস "ওডেসা ফাইল"-এর মূল পটভূমিকা হল এই জায়গা। সেই উপন্যাসে এখানকার ক্যাম্পের নৃশংস অত্যাচারের অতি জীবন্ত বর্ণনা আছে।

এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি এসেছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি আমাদের চত্বরটির এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, এইখানে একটা পুকুর ছিল। পুকুরটি কী করে কাটা হয়েছিল শুনবেন? এখানকার নাতসি কর্তার শখ হল, তিনি পুকুরে মাছ ধরবেন। তার জন্য পুকুর কাটানো দরকার। সে কাজের জন্য তো বন্দিরা আছেই। কিন্তু নাতসি কর্তার আরও উৎকট খেয়াল হল এই যে, পুকুর খোঁড়ার জন্য বন্দিদের খন্তা-কোদাল কিছু দেওয়া হবে না। খালি হাতে, নোখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে হবে। হাজার হাজার বন্দিদের লাগিয়ে দেওয়া হল সেই কাজে, তাদের পেছনে স্টেনগান হাতে প্রহরীরা। এইভাবেই একটা পুরো পুকুর কাটা হল।

একটু থেমে তিনি বললেন, অবশ্য নাতসি কর্তার মাছ ধরার শখ শেষ পর্যন্ত মেটেনি। সেই পুকুরের মাছ বড় হওয়ার আগেই নাতসিবাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আর এক পাশে রয়েছে একটি ডোবা। ভদ্রলোক বললেন, এই ডোবাটা কী কাজে ব্যবহার করা হত শুনুন। ছোট ছোট শিশুদের গা থেকে সব রক্ত টেনে বার করে নেওয়া হত সিরিঞ্জের সাহায্যে, তারপর সেইসব মৃত শিশুদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া হত এই ডোবায়!

আমি চোখ বুজলুম, ফিসফিস করে বললুম, যাক, আর বলবেন না। আর শুনতে চাই না।

চত্বরটির প্রান্তে এসে আমি নিবিড় বনের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই গাঢ় সবুজের দিকে দৃষ্টি গেলে আস্তে আস্তে মন ভালো হয়ে যায়। নাতসিবাহিনী যখন চোখের পলক পর্যন্ত না ফেলে শত শত মানুষ খুন করেছে, তখনও তো এখানে এই অরণ্য ছিল! কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা কিন্তু প্রতিপক্ষের সৈনিক নয়, তারা সবাই নিরীহ সাধারণ মানুষ। তাদের অপরাধ, তারা ইহুদি। অবশ্য লাটভিয়ানদেরও নাতসিরা ক্রীতদাসের মতনই গণ্য করত। গত যুদ্ধে এই ছোট্ট দেশটিতে নিহত হয়েছে তিন লক্ষ সাধারণ মানুষ, আর দু-লক্ষ আশি হাজার নারী-পুরুষকে দাস শ্রমিক হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জার্মানিতে। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রয় এক-চতুর্থাংশই যুদ্ধের শিকার। হিটলারের ইচ্ছে ছিল, গোটা দেশটাতে শুধু খাঁটি জার্মান রক্তের মানুষরাই বসবাস করবে।

সারগেইও আগে কোনও কনসেনট্রেশান ক্যাম্প দেখেনি। তার মুখখানা থমথমে। আমরা তিনজনে নিঃশব্দে এদিক-ওদিক ঘুরছি।

আমরা ছাড়াও এখানে অনেক দর্শনার্থী এসেছে। এসেছে গাড়ি ভরতি করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। এসেছে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সকলেরই হাতে ফুল। মে মাসের এই সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মে মাসের ন'তারিখে সোভিয়েত বাহিনী চূড়ান্ত জয়লাভ করেছিল।

ফিরতে গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দৃশ্যটি দেখে আমার মতন কঠোর হৃদয় মানুষেরও চোখ জ্বালা করে উঠল। যে-জায়গাটিতে শিশুদের হত্যা করা হত, সেখানে রয়েছে একটি চিত্র-বিচিত্র স্মৃতিবেদি। সেখানে ভিড় করে আছে এখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা। নানান রকমের রঙিন তাদের পোশাক, সরল সৌন্দর্যময় স্বাস্থ্যবান মুখ। তারা শুধু ফুল আনেনি, তারা এনেছে লজেন্স, চকোলেট, অনেক খেলনা। সেগুলো তারা বেদির ওপরে সাজিয়ে রাখছে। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যেসব শিশুরা প্রাণ দিয়েছে, তাদের জন্য চকোলেট খেলনা উপহার এনেছে আজকের দিনের শিশুরা।

নাতসি অত্যাচারের ফোটোগ্রাফিক দলিল দেখার আর ইচ্ছে হল না আমার। ফিরে এসে উঠে বসলুম গাড়িতে। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর এ পি এন-এর প্রতিনিধি ভদ্রলোকটি বললেন, চলুন, এর পরেই যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে পরে যাব, তার আগে একটু সমুদ্র দেখে আসা যাক।

আধ ঘণ্টা গাড়ি যাত্রার পর আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সে জায়গাটিকে আমাদের দীঘার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জায়গাটির নাম জুরমালা বিচ। রিগা শহর থেকে লোকে এখানে ছুটি কাটাতে সমুদ্রে স্নান করতে আসে। জায়গাটি মাছ ধরারও একটি বড় কেন্দ্র। মাছ ধরা ল্যাটভিয়ানদের একটি প্রধান জীবিকা।

এখানে যে জলরাশি দেখছি, সেটি আমার পূর্বে দেখা বাল্টিক সাগর। এই সমুদ্রে নাকি প্রচুর মাছ। কয়েক বছর হল এখানে নতুন করে ঝাঁকে-ঝাঁকে কড মাছের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মাছ ধরা পড়ে জনসংখ্যার মাথাপিছু ২৩২ কিলোগ্রাম বছরে। এখানকার লোকের খাদ্য তালিকায় দু-তিনরকম মাছ থাকে প্রায়ই।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা ওড়িশাও ঠিক এই রকমই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল, এবং বঙ্গোপাসাগরেও মাছের অভাব নেই, তবু আমাদের এই অঞ্চলে মাছের কত আকাল।

সমুদ্র তীরে কিছুক্ষণ বসে রইলুম আমরা। জলে একজনও স্নানার্থী নেই। যদিও মে মাস। তবু এখানে এখনও শীতকাল। আর কয়েকটা দিন পরেই স্নানের পরব শুরু হবে। সেই জন্যই এখানে অধিকাংশ বাড়ি এখন ফাঁকা। বড়-বড় হোটেলের বদলে এখানে কো-অপারেটিভের বাড়ি কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হলিডে হোম রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এখানে ছুটি কাটাবার জন্য নামমাত্র

ভাড়ায় থাকতে পারে। লেখক সমিতিরও একটি তিনতলা বাড়ি রয়েছে। তবে, একজন লেখকও এই সময়ে এখানে আসেননি।

সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর আমি জিগ্যেস করলুম, এই সমুদ্রের ওপারে কোন দেশ?

আমাদের সঙ্গী বললেন, ঠিক ওপারেই সুইডেন। দূরত্ব হবে দুশো মাইলের মতন। সুইডেন থেকে পাওয়ার বোটে চেপে কেউ কেউ এদিকে চলেও আসে।

আমি চোখ সংকুচিত করে চেষ্টা করলুম, ওপারের সুইডেন দেখতে পাওয়া যায় কিনা!

আমাদের সঙ্গী মৃদু হেসে বললেন, তা কখনও সম্ভব? মানুষের দৃষ্টিশক্তির তো একটা সীমা আছে!

আমি বললুম, না তো। মানুষ ইচ্ছে করলে লক্ষ-লক্ষ মাইল দূরের জিনিসও দেখতে পারে। সেরকম কয়েকটা জিনিস আমরা রোজই দেখি। কী কী বলুন তো?

তিনি একটু অবাক হতেই আমি হেসে বললুম, এটা অনেকটা ছোটদের ধাঁধার মতন হয়ে গেল, তাই না? আমরা চাঁদ, সূর্য দেখতে পাই। আকাশের এমন অনেক তারা আমরা দেখি যেগুলি কোটি কোটি মাইল দূরের।

সমুদ্রকূল ছেড়ে আমরা জুরমালা শহরটিতে দু-এক চক্কর দিলুম। ছোট শহর। আপাতত জনসমাগম কম বলে খানিকটা ঘুমন্ত মনে হল।

ফেরার পথের রাস্তাটি সুন্দর। দুপাশে বড়-বড় গাছ। সারগেই আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, এটা আমাদের সোভিয়েত গাড়ি। আমাদের গাড়ি কেমন লাগছে আপনার?

আমি বললুম, আমি মোটর গাড়ির কলকবজা কিছুই বুঝি না। এই গাড়িটা চলছে ঠিকঠাক, দেখতে-শুনতেও ভালো, সুতরাং ভালোই বলতে হবে।

সারগেই জিগ্যেস করল, আপনি তো অনেক আমেরিকান গাড়ি দেখেছেন, সেগুলো কি এর চেয়ে ভালো?

আমি বললুম, মোটর গাড়ির তুলনামূলক বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, আমেরিকানরা বানায় ঢাউস ঢাউস গাড়ি, কিন্তু অনেক আমেরিকানই আজকাল কিনতে চায় জাপানি বা ফরাসি বা জার্মান ছোট-ছোট গাড়ি। তোমাদের সোভিয়েত গাড়িগুলো খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়, মাঝারি আকারের।

—আপনাদের দেশেও তো গাড়ি তৈরি হয়।

—হ্যাঁ। আমরা ভারতীয় গাড়ি চড়ি। তবে আমাদের গাড়ির একটা মজা আছে। অন্য দেশের গাড়ি প্রতি বছরই ক্রমশ ভালো হয়, বেশি মজবুত হয়, গাড়িতে নতুন-নতুন জিনিস জুড়ে দেওয়া হয় আর দাম কমাবার চেষ্টা হয়। আর আমাদের দেশের গাড়ি প্রতি বছরই খারাপ হয়, সেইসঙ্গে দামও বাড়ে।

—আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলেও তো একটা গাড়ি বানাবার কোম্পানি খুলেছিল...

সারগেই ইন্ডিয়া ডেস্কে কাজ করে, সে ভারত সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। গাড়ি সম্পর্কে আলোচনা চালাতে আর আমার ইচ্ছে হল না। মাটিতে নীচের সমস্ত পেট্রোল ফুরিয়ে গেলে পৃথিবীর থেকে যদি মোটরগাড়ি নামে ব্যাপারটা উঠেই যায়, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তখন আমরা আবার ঘোড়ায় চাপব। মনে-মনে আমি যেন অশ্বারোহীদের শতাব্দীগুলিতে প্রায়ই ফিরে গিয়ে বেশ আরাম পাই।

মাঝপথে আমরা থামলুম একটি কৃষি খামারে। সেখানকার পরিচালক অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য।

এটি একটি সরকারি খামার। এখানে খামার আছে দু-রকম। অনেক জায়গায় চাষিরা নিজেদের

সব জমি মিলিয়ে সমবায় প্রথায় যৌথ খামার করেছেন। আর কোথাও-কোথাও সরকারই জমি অধিগ্রহণ করে কৃষকদের দিয়ে চাষ করাচ্ছেন। উৎপাদন অনুযায়ী চাষিদের আয়।

এ সম্পর্কে আগে থেকেই কিছুটা ধারণা ছিল বলে চমকে গেলুম না এখানকার চাষিদের সচ্ছলতা দেখে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এসে আমি গরিব চাষি দেখব, এমন তো আশঙ্কাও করিনি। আমাদের দেশে চাষি, মজুর, জেলে, মুচি, কুমোরদের এমনই অবস্থা যে ওইসব শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই ছেঁড়া কাপড়, খালি গা, হৃত-দরিদ্র চেহারার মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেই জীবনযাপনের একটা নিম্নতম মানই আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেসব দেশে চাষি-মজুর-মুচিরাও ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে, ঘরে টেলিভিশান আছে, কারুর-কারুর নিজস্ব মোটর গাড়ি থাকাও কিছুই আশ্চর্যের নয়।

এখানকার এই সরকারি খামারটি সুপরিচালিত। শুধু চাষবাস ছাড়াও এখানে হাঁস-মুরগি পালন, গরুর দুধের কারবারও হয়। কৃষকদের এই কলোনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজস্ব দোকানপাট ছাড়াও আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।

আমি মাঠের চাষ দেখতে গেলুম না, কালোনিটিই ঘুরে-ঘুরে দেখলুম। বেশ নিরিবিলি, শান্ত জায়গাটি। প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল দোতলা বাড়ি, তার একতলা-দোতলায় দুটি করে পরিবার থাকে। এখন তৈরি হচ্ছে লম্বা-লম্বা ফ্ল্যাট বাড়ি। কিছু-কিছু একতলা বাড়িও আছে, সেখানকার সংলগ্ন জমিতে নিজস্ব শাক-সবজি ফলানো যায়।

ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সের সামনে কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে। কৃষকেরা বাজার করতে এসেছেন। মহিলারা সুসজ্জিত। এক জায়গায় একজন বলিষ্ঠকায় কৃষক একটি গাড়িতে বোঝাই করছেন ভুট্টা। তাঁর পায়ের গামবুট জলকাদা মাখা, নীল রঙের ঢোলা পোশাকেও নোংরা লেগেছে। বিকেলবেলা ইনি স্নান-টান করে, পোশাক বদলে হয়তো বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবেন।

এই খামারের পরিচালক আমাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবকিছু বোঝাচ্ছিলেন। এক সময়ে তিনি বললেন, আমি ভারতে গিয়েছিলুম। পশ্চিমবাংলাতেও গেছি। আমাদের তুলনায় আপনাদের চাষিরা ভাগ্যবান। তারা বছরে দুবার চাষ করতে পারে। আমরা তো আবহাওয়ার জন্য বছরে একবারের বেশি চাষ করতে পারিই না।

আমি মনে মনে হাসলুম। সোভিয়েত চাষিরা পাকা বাড়িতে থাকে, গাড়ি চাপে, বউকে নিয়ে নাচতে কিংবা সিনেমা দেখতে কিংবা দেশ ভ্রমণে যায়। আর ভারতীয় ভাগ্যবান চাষি, যারা বছরে দুবার চাষ করে, তারা সারা বছর পেট ভরে খেতে পায় না, পাকা বাড়িতে থাকার দুঃস্বপ্ন তারাও দেখে না।

॥ ১২ ॥

দেশ-এর মতন একটা বিশাল ভারী জিনিস সবসময় পিঠে বহন করা খুব শক্ত। আমি ভারতবর্ষে জন্মেছি, জন্মসূত্রে আমি ভারতীয় এবং ভারতবাসী হিসেবে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট। কিন্তু সর্বক্ষণই কি আমি ভারতবাসী? আমি যখন কোনও রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যাই, তখন আমি শুধুই একজন মানুষ, এমনকী সেই রকম অনেক সময় আমি লেখকও নই, কারুর পিতা বা সন্তান নই, নেহাতই নামহীন একজন। মানুষ যখন অন্য মানুষের কাছাকাছি আসে তখনই তার একটা পরিচয়ের দরকার হয়।

বিদেশে গেলে কিন্তু সব সময়ই ভারতীয় সেজে থাকতে হয়। সেই জন্য মাঝে-মাঝে পিঠ ব্যথা করে। এখানে যার সঙ্গেই দেখা হবে, সে-ই আমাকে ভারতের একজন প্রতিনিধি বলে ধরে নেবে। আমি যদি ঘন-ঘন চোখ পিট পিট করি, তাহলে অনেকে ভাবতে পারে যেসব ভারতীয়েরই

এরকম স্বভাব! অনেকেই তো এখানে সামনাসামনি কোনও ভারতীয়কে আগে দেখেনি। ভারতীয়রা যে কত বিচিত্র ও অদ্ভুত হয় তা অন্যরা কী করে বুঝবে? আমরা দু-দিকে মাথা নেড়ে 'না' বোঝাই, আবার এই ভারতেরই দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝায় 'হ্যাঁ'। ভারতবর্ষেই বহু মানুষ ঘোর নিরামিষাশী, গো-হত্যাকে মহা পাপ মনে করে। আবার ভারতেরই বহু লোক মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে, উৎসবে পাঁঠা বলি দেয়, পরবের সময় পবিত্র জ্ঞানে গো-মাংস ভক্ষণ করে। এই ভারতবর্ষেই কোটি কোটি লোককে এখনও গ্রামের বাইরের দিকে থাকতে হয়, তারা অস্পৃশ্য, তারা তথাকথিত ভদ্রলোকদের কুয়ো থেকে জল তুলতে গেলে মার খায়। আমি তবে কোন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি?

বিদেশে এসে ভারতের গৌরব বৃদ্ধিই আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমি তো আমার দেশের সবকিছু পছন্দ করি না। আমাদের শাসক শ্রেণির বোকামি, ভারতীয় চরিত্রের ভণ্ডামি, সামাজিক বৈষম্য, এসব কথা বিদেশে এসে গোপন করে যেতে হবে?

প্রায় দিন দশেক সারগেই-এর সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করছি, আমি ওকে লক্ষ করছি ভালো করে। সে একজন সোভিয়েত যুবক, বছর দেড়েক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, এখন বিদেশ দফতরে কাজ করে। এই সব শুনলে যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা কিন্তু তার চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। সে আসলে বেশ নরম স্বভাবের মানুষ, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী, খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল বা কেজো ধাঁচের নয়। আমাদের দেশের বা পৃথিবীর যে-কোনও দেশের একজন তরুণ কবির সঙ্গে তার চরিত্রের বিশেষ কিছুই অমিল নেই।

সারগেই অবশ্য তার দেশ সম্পর্কে খুব গর্বিত। প্রায়ই সে তার দেশের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশ বা আমেরিকার তুলনা করে এবং আমার মতামত জানতে চায়।

বিকেল বেলা ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটিতে এসে আমার এইসব কথা মনে পড়ছিল। এখানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে আমাকে নিয়েই। বন্ধু রাষ্ট্র ভারত থেকে আমি অতিথি হয়ে এখানে এসেছি, তাই রিগা শহরের বন্ধু পরিষদ সংবর্ধনা জানাচ্ছে আমাকে। আমার পক্ষে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। এখন আমার পিঠের ওপর গোটা ভারতবর্ষ।

কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন। তিনটি মেয়ে লোক-উৎসবের পোশাক পরে, অর্গান বাজিয়ে একটি গান গাইল আমাকে উদ্দেশ্য করে। গান শেষ হওয়ার পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ঝুঁকিয়ে মেয়ে তিনটিকে ধন্যবাদ জানালুম। ভেতরে-ভেতরে কিন্তু আমি ঘামছি। কারণ, শেষকালে আমায় একটি বক্তৃতা দিতে হবে। এসব জায়গায় কীরকম বক্তৃতা দিতে হয় সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই।

সারগেই উঠে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করা ভঙ্গিতে আমার পরিচয় জানাল। তারপর একে একে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। অধ্যাপক ইভবুলিসও এসেছেন, তাঁর হাতে 'দেশ' পত্রিকার সেই সাহিত্য সংখ্যাটি, যাতে রিগা শহর সম্পর্কে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর রচনাটি ছাপা হয়েছে। রচনাটির নাম "দূরের বন্ধু"।

ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির সভাপতি এবং আরও দু-একজন ভাষণ দিলেন ভারতীয় অতিথিটিকে স্বাগত জানিয়ে। তাঁদের কণ্ঠস্বরে আমি যেন সামান্য ক্লান্তির সুর লক্ষ করলাম। বিদেশি অতিথি এলে প্রত্যেকবারই তাঁদের খুব সম্ভবত এই একই কথা বলতে হয়। এক ঘণ্টার আলাপ-পরিচয়ে—পরস্পরের ভাষা আলাদা—মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য ধরাবাঁধা কথা দিয়ে আলাপ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী।

সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে কিছু উপহার দেওয়া হল। লোকসঙ্গীতের একটি রেকর্ড, একটি ছোট মূর্তি এবং ল্যাটভিয়ার একটি পতাকা। এবারে আমার ভাষণ দেওয়ার পালা। উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে আমি বললুম, আপনাদের এই মহান দেশে আসতে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি

ধন্যবাদ বোধ করছি। আপনাদের জন্য আমি সঙ্গে কোনও উপহার আনতে পারিনি, কিন্তু এনেছি উষ্ণ আন্তরিকতা এবং আমার দেশের শুভেচ্ছা!

এবারে একটু থামলুম, সারগেই আমার কথা অনুবাদ করে দিতে লাগল। সেই সুযোগে আমি আর একখানা বেশ সারগর্ভ বাক্য ভেবে নিলুম। ক্রমশ দেখলুম, দোভাষীর মাধ্যমে বক্তৃতা করা খুব একটা শক্ত কিছু নয়। ভেবে নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমি যা বলছি তার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে কি না তা-ও বোঝবার উপায় নেই। অনুবাদের সুবিধের জন্য সরল এবং প্রথাসম্মত বাক্য বলাই ভালো।

অনুষ্ঠান শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে সারগেই-কে জিগ্যেস করলুম, আমি পাস করেছি তো?

সারগেই বলল, কীসের?

আমি বললুম, মহান ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের এই মহান সোভিয়েত দেশে আমি যে বক্তৃতাটি দিলুম, সেটা ঠিকঠাক হয়েছে তো।

সারগেই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, এইসব অনুষ্ঠান তো খানিকটা ফর্মাল হবেই। আপনার ভালো লাগেনি?

আমি বললুম, নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ওখানকার কফি। যে-মহিলা কফি বানাচ্ছিলেন, আমি লক্ষ করছিলুম, তাঁর হাতের আঙুলগুলো কী সুন্দর। অস্ফুট চাঁপা ফুলের মতন। ওই হাতের গুণেই কফি অত সুন্দর হয়েছে।

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম। রিগা শহরে আজই আমাদের শেষ দিন। সন্ধেবেলা একটি কনসার্ট শুনতে যাওয়ার কথা আছে। মাঝখানের সময়টা ঘুরে বেড়ানো যায়। এখানে এসে আমরা গাড়ি নিয়েছি খুব কম। একটু হাঁটলেই পৌঁছে যাওয়া যায় নদীর ধারে। এই ক'দিনেই আমি শহরটির মূল কেন্দ্রটি, ইংরেজিতে যাকে বলে ডাউন-টাউন, বেশ চিনে গেছি।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সারগেই বলল, আমাকে একবার এ পি এন দফতরে যেতে হবে প্লেনের টিকিট কাটবার জন্য। আপনি কি আমার সঙ্গে সেখানে যাবেন না এখানে অপেক্ষা করবেন?

আমি একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। নিজের দেশে বিকেলবেলা কোনও পার্কের বেঞ্চে বসে অলস সময় কাটাবার সুযোগ আজকাল আমি পাই না। তিন দিকের রাস্তা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের মাঝখানে চুপচাপ বসে থাকা এক চমৎকার বিলাসিতা।

সব গাছেরই নতুন পাতা গজাচ্ছে, চারদিক তাই উজ্জ্বল সবুজ। পার্কে নানানরকম ফুলের মেলা, অধিকাংশ ফুলেরই নাম জানি না। তবে টিউলিপ-ই বেশি, বিভিন্ন রঙের, লাল, হলুদ, সাদা। আর একটি ফুল চিনতে পারলুম। রডোডেনড্রন। প্যারিসে, অসীম রায় তাঁর বাড়ির বাগানে এই ফুল চিনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদিও লিখেছেন, "উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ", কিন্তু আমি আমাদের দেশে এ ফুল কোথাও দেখিনি। উত্তরবঙ্গে, কার্শিয়াং-কালিম্পং-এর দিকে এই ফুল অনেক ফোটে বলে শুনেছি। কিন্তু আমার দেখা হয়নি।

কাছেই রাস্তায় একটা দোকানের সামনে বেশ ভিড়। পথ চলতি লোকেরা সেখানে থেমে গিয়ে কিছু কিনছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ল। প্রায় দিন দশেক হল আমি নিজস্ব একটি পয়সাও খরচ করিনি। সাবালক হওয়ার পর, অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া, আর কখনও আমার এই অবস্থা হয়নি। আমার যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই সারগেই কিনে দিচ্ছে। তার ফলে, আমার হঠাৎ কিছু কেনার ইচ্ছে হলেও মুখ ফুটে সে কথা সারগেই-কে বলতে পারি না। এরা আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছে বলে কি আমার নিজস্ব পয়সাও খরচ করতে দেবে না? এরপর আমার প্যারিস ও লন্ডনে যাওয়ার কথা আছে বলে সঙ্গে কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এসেছি। এখানকার বড়-বড় হোটেলে ডলার বা পাউন্ড দিয়ে জিনিসপত্র কেনা যায়। আমি দু-একবার সেইসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পকেটে হাত দিয়ে কিছু কেনার প্রস্তাব করতেই সারগেই

অতি ব্যস্ত হয়ে বলেছে, না, না, আপনি পয়সা খরচ করবেন না। আপনার কী চাই বলুন না! ফলে, সেসব জিনিস আর আমার কেনাই হয়নি। আসলে, হোটেলে স্কচ হুইস্কি দেখে আমার মাঝে-মাঝে বাসনা জেগেছে। কিন্তু সারগেই-এর মতন একটা বাচ্চা ছেলে আমাকে মদ কিনে দেবে, এ আমি মেনে নিতে পারি না। তাই সংযম দেখিয়ে আমি হুইস্কি পানের বাসনা দমন করে যাচ্ছি। সারগেই অবশ্য মাঝে-মাঝে ঠান্ডা কাটাবার ওষুধ হিসেবে ভডকা বা ব্র্যান্ডি এনে দেয় আমাকে।

একটা বেশ ফুরফুরে খুশিয়ালি বাতাস দিচ্ছে। এ দেশে এখন বসন্তকাল। এ দেশে কি পাখি কম? সেরকম পাখি তো চোখে পড়েনি। আমাদের মতন গরম দেশেই বোধহয় পাখি বেশি থাকে। শালিখ, চড়াই, ছাতারে, কাক, চিল আর শকুন, এই কটা পাখি তো কলকাতা শহরে সর্বক্ষণ থাকে। এ ছাড়া, বুলবুলি, টিয়া, দোয়েল এবং বকও প্রায়ই দেখা যায়। এখানে সেরকম পাখি নেই।

সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য। বস্তুত এ পর্যন্ত যে ক'টি থিয়েটার বা অপেরা দেখেছি, সেগুলির চেয়ে এই অনুষ্ঠানটি আমার ভালো লাগল বেশি। এখানে ভাষারও অসুবিধে নেই।

অনুষ্ঠানটি ঠিক বাজনার কনসার্ট নয়, বরং নাচই বেশি। বিভিন্ন এলাকায় যে খুব প্রতিষ্ঠান আছে তাদের নাচের দলগুলির একটা প্রতিযোগিতার মতন হচ্ছে এখানে। অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশটি দল এসেছে এরকম। সবাই তরুণ-তরুণী বা কিশোর-কিশোরী। মঞ্চের নেপথ্যে বাজনা বাজছে, আর এক একটি দল এসে নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। বাজনাও অনেকরকম, নাচও অনেক রকম।

ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না সেই নাচ কত সুন্দর। ট্রাডিশনাল বা পুরোনো নানান উৎসবের পোশাক পরে এসেছে ছেলেমেয়েরা, কত তার রং, কত তার বৈচিত্র্য। কোনও-কোনও নাচ ওয়ালজের মতন মৃদু লয়ের, কোনও-কোনও নাচ ফক্স ট্রটের মতন দ্রুত। কোনওটি নিভৃত প্রণয়ের, কোনওটি যুদ্ধযাত্রার। যে দলের নাচ বেশি ভালো হচ্ছে, দর্শকরা বেশ হাতাতালি দিয়ে মঞ্চে আবার ফিরিয়ে আনছে তাদের, তারা দ্বিতীয়বার নাচ দেখাচ্ছে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে আমি দেখে গেলুম সেই দৃশ্যের ঐশ্বর্য। আজকালকার প্যান্ট-শার্ট আর স্কার্টের চেয়ে আগেকার পোশাক কত সুন্দর ছিল! দেখতে-দেখতে মাঝে-মাঝে আমার মন খারাপও লাগছিল। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। এরকম স্বাস্থ্যবান, হাস্যোজ্জ্বল ছেলেমেয়ে কোথায় আমাদের দেশে? আমাদের যুবক-যুবতীদের মধ্যে গোষ্ঠীনাচের কোনও চলনই নেই। অথচ এরকম নাচে শরীর আর মন দুটোই ভালো হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো জন যুবক-যুবতীর নাচের ব্যবস্থা হয়েছে এই সন্ধেবেলা। সমান সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে। মেয়েরা যে শুধু স্বাস্থ্যবতী তাই-ই নয়, ল্যাটভিয়ান মেয়েরা বেশ সুন্দরী। অন্যান্য দর্শকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমিও আমার পছন্দমতন নাচের পর প্রবল হাততালি দিতে লাগলুম।

যে-কোনও অনুষ্ঠানের শেষেই সারগেই আমার মতামত জানতে চায়। হল থেকে বেরিয়ে সে জিগ্যেস করল, সুনীলজি, আপনার কেমন লাগল?

এর মধ্যে আমি আরও দু-চারটি রুশ শব্দ শিখে নিয়েছি। আমি জোর দিয়ে বললুম, খারাসো, খারাসো! (ভালো, খুব ভালো!) তারপর ফরাসিতে বলুম, ত্রে বিয়াঁ। তারপর ইংরিজি, হিন্দি ও বাংলায় ওই কথাগুলিই আবার বললুম।

সারগেই বলল, মনে করুন, কোনও এক এঞ্জেল এসে আপনাকে বলল, তুমি একটা মাত্র কিছু চাও। যা চাইবে তাই-ই পাবে। তাহলে, সুনীলজি, আপনি কী চাইবেন!

আমি প্রশ্নটা ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, এরকম হলে তুমি কী চাইবে শুনি?

সারগেই বলল, আমি চাইব, সময়। জীবনে এত সব ভালো ভালো জিনিস আছে। সব কিছু ভালোভাবে উপভোগ করবার জন্য আরও অনেক সময় চাই।

আমি নিজে কী চাইব সে বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারলুম না। হয়তো আমার কিচ্ছুই চাইবার

নেই। জীবনটা যেভাবে চলছে তাই তো বেশ। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার একদম মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। ভবিষ্যৎ যত অনিশ্চিত, তত রহস্যময়। আমি দীর্ঘজীবন কামনা করি না এইজন্য, যদি তাতে এ জীবনটা পুরোনো হয়ে যায়।

॥ ১৩ ॥

কিয়েভ শহরে পৌঁছে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। হোটেলের ঘরটি আমার পছন্দ হয়নি, বেশ ছোট ঘর, অন্ধকার-অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, হিটিং ব্যবস্থা ঠিক মতন কাজ করছে না বোধহয়। একটি মাত্র জানলা, সে জানলা দিয়ে দেখবার কিছু নেই। চোখে পড়ে একটা কারখানা মতন জায়গায় উঠোন, সেখানে পড়ে আছে কিছু ভাঙাচোরা জিনিস।

সুটকেসটা ঘরের মাঝখানে নামিয়ে রেখে আমি অপ্রসন্ন মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ করে। তারপর আপন মনেই হেসে উঠলুম হো হো করে। অবস্থা বিশেষে মানুষের মানসিকতার কত পরিবর্তনই হয়।

আমি জীবনে কত সস্তার হোটেলেই না থেকেছি, ক্যানিং-এ টিনের ঘরে দেড় টাকা সিট ভাড়া দিয়ে হাটুরে লোকদের সঙ্গে পাশাপাশি ঘুমিয়েছি, বেলপাহাড়িতে একই খাটিয়া দুজনে ভাগাভাগি করে রাত কাটিয়ে দিয়েছি আকাশের নীচে, হায়দ্রাবাদ রেলে স্টেশনে একটা কম্বলের অভাবে সারারাত শীতে ঠকঠক করে কেঁপেছি, সেই আমারই হোটেলের ঘর নিয়ে খুঁতখুঁতুনি? এই ঘরটি তেমন কিছু খারাপ নয়, আসলে লেনিনগ্রাড ও রিগায় দারুণ আরামদায়ক হোটেলে থেকে এসে আমার প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। বেশি আদর পেয়ে-পেয়ে আমার পায়াভারী হয়েছে। আমি নিজের খরচে বেড়াতে এলে এর চেয়ে অনেক খারাপ হোটেলে আমায় উঠতে হত।

এ ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সময় সারগেই অবশ্য বারবার দুঃখ প্রকাশ করে গেছে। কিয়েভ শহরে এখন টুরিস্টদের সাংঘাতিক ভিড়, অনেক চেষ্টা করেও এর চেয়ে ভালো ঘর জোগাড় করা যায়নি। এই হোটেলটি বেশ বড়, এর নাম হোটেল নিপ্রো, এর পেছন দিকের দুটি ঘর কোনওক্রমে পাওয়া গেছে আমাদের জন্য।

মনে-মনে এসব সান্ত্বনা বাক্য নাড়াচাড়া করবার পরও কিন্তু আমার মন ভালো হল না। ঘর যেমনই হোক, জানলা দিয়ে রাস্তাঘাট দেখা গেলেই আমি খুশি হতাম। কিয়েভ শহরটি যে বড়ই সুন্দর!

এয়ার পোর্ট থেকে আসতে আসতেই এই শহরের অনেকখানি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। এমন সবুজ শহর আমি আগে কখনও দেখিনি। মনে হয় পুরো শহরটাই একটা উদ্যান, বাড়িঘরগুলি গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে। রাস্তার দুপাশের গাছগুলিতে ফুটে আছে থোকা-থোকা চেস্টনাট ফুল। লন্ডন শহরে এইরকম চেস্টনাট ফুল ফোটে, প্যারিসেও দেখেছি কিন্তু এ দেশে এসে এই ফুল আগে চোখে পড়েনি। এর আগে যে তিনটি শহর দেখেছি, সেই তিনটিই সমতল, কিয়েভ কিন্তু ঢেউ খেলানো, ছোট-ছোট টিলা এদিক-ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে, শহরের মাঝখান দিয়েই বয়ে চলেছে বিশাল নিপার নদী।

এরকম সুন্দর শহরে এসে হোটেলের ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। সারগেইকে এখানকার অফিসের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তা ছাড়া সে তার স্ত্রীকে ফোন করবে। আমার সঙ্গে টানা দিন দশেক ঘুরছে, এর মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই। আমি একলাই বেরিয়ে পড়লুম বাইরে। পথঘাট না চিনলেও ঠিক যে-পথ দিয়ে যাব, সেই পথ দিয়ে ফিরে আসব।

আমাদের হোটেলের খুব কাছেই অক্টোবর রেভোলিউশান স্কোয়ার। এই স্থানটি বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। এখানে অনেক রক্ত গড়িয়েছে। অথচ এখন এই জায়গাটি এতই মনোরম যে এখানে এসে দাঁড়ালেই একটা চমৎকার অনুভূতি হয়। চতুর্দিকেই ফুলের বাগান, একদিকে বিশাল চত্বরের একপাশে উঠে গেছে থাক থাক সিঁড়ি, তার ওপরে লেনিনের সুদৃশ্য মূর্তি।

ইউক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ শহরটি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো। বেশ কিছুদিন প্রাচীন রাশিয়ার রাজধানী ছিল এই কিয়েভ। পরে সেই রাশিয়া ভেঙে তিনটি জাতি হয়, রাশিয়ান, ইউক্রাইনিয়ান ও বিয়েলো রাশিয়ান। এখানকার মাটি এত উর্বর যে ইউক্রাইনকে বলা যায় এক বিশাল শস্য ভাণ্ডার। যন্ত্রশিল্পেও এ রাজ্যটি এখন খুবই উন্নত।

এত সৌন্দর্য ও সবুজের সমারোহ দেখে কল্পনা করাই শক্ত যে এখানে একদিন কী সাংঘাতিক যুদ্ধকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। দু-বছর এই শহরটি নাতসিরা অধিকার করেছিল, এখানকার ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে, মিউজিয়ামগুলি লুট করেছে এবং দু-লক্ষ নাগরিককে হত্যা করেছে। অবরোধমুক্ত করে ইউক্রানিয়ান বিজয়ী বাহিনী যখন এখানে প্রবেশ করে তখন নাকি তাদের মনে হয়েছিল, এটা একটা মৃতের নগরী।

এখানে আসবার আগেই আমি ইউক্রাইন ও কিয়েভ সম্পর্কে কিছু-কিছু পড়ে নিয়েছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনিগুলির মধ্যে একট কাহিনি যেমনই মর্মন্তুদ তেমনই সেটি মানুষের অপরাজেয় মনোভাবের একটি মহান দৃষ্টান্ত।

ঘটনাটি এইরকম :

কিয়েভে ডায়নামো টিম নামে একট বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় দল ছিল। যুদ্ধের সময় এই দলের অনেক খেলোয়াড় প্রতিরোধ বাহিনীতে যোগ দেয়। এই দলের একজন প্রধান খেলোয়াড় মাকার গনচারেংকো একদিন আহত হয়ে নাতসিদের হাতে ধরা পড়েন। নাতসিদের মধ্যে অনেকে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। নাতসিরা তখন আহ্বান জানাল ডায়নামো টিমের সঙ্গে তাদের একটি ফুটবল ম্যাচ হোক। নাতসিদের মধ্যেও অনেক প্রফেশনাল খেলোয়াড় ছিল।

ডায়নামো টিমের খেলোয়াড় কয়েকজন আগেই ধরা পড়েছিল, কয়েকজন ছিল অবরুদ্ধ নগরীতেই। তারা বুঝতে পারল, এই ম্যাচ মানে মৃত্যু-খেলা। এই খেলায় জিতলে প্রাণে বাঁচার কোনও আশাই নেই। খেলা শুরুর আগে ড্রেসিং রুমে ঢুকে রেফারি বলে গেল, মনে রেখো, দু-দলের একটাই জনধ্বনি, তা হল, "হাইল হিটলার"।

দু-দল দাঁড়াল মাঠের মাঝখানে। ইউক্রানিয়ান খেলোয়াড়রা তাদের জাতীয় জনধ্বনিই দিল। তাদের পরনে লাল পোশাক। তবু নাতসিরা কিছু বলল না। তারা ধরেই নিয়েছিল ডায়নামো টিম তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। ডায়নামো টিমের ছেলেরা অনেকদিন ভালো করে খেতে পায়নি, রুগ্‌ন চেহারা, প্র্যাকটিসও নেই বহুদিন।

প্রথম অর্ধে খেলার ফলাফল হল ৩—২, জার্মানরা এক গোলে এগিয়ে। বিরতির পর ডায়নামো টিমের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল। খেলা হচ্ছে খেলা। খেলতে নামলে জেতার চেষ্টা করতেই হবে, টিমের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে, তার ফলে মৃত্যুদণ্ড হোক আর যাই হোক। রেফারি তাদের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ঢুকতেই দিচ্ছে না, সেখানে গেলেই অফ সাইড বলে দিচ্ছে। গোল করতে গেলে অনেক দূর থেকে শট মারতে হবে। তবু তারা জয়ের শপথ নিল।

খেলার শেষে ৫—৩ গোলে জয়ী হল ডায়নামো টিম। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়া হল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে এবং তাদের এক এক করে হত্যা করা হল। গানচারেংকো প্রায় অলৌকিকভাবে সেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই জানা গেছে এই কাহিনি। সেই অসাধারণ সাহসী ফুটবল খেলোয়াড়দের নামে এখন রয়েছে একটি বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ।

কিয়েভ শহরটিতে এরকম অনেক স্মৃতিস্তম্ভ, মিউজিয়াম, গির্জা ও পার্ক আছে। পুরো শহরটাই

বেড়াবার জন্য, কাজকর্মের জন্য নয় মনে হয়। যদিও ইউক্রাইনের রাজধানী হিসেবে এটি একটি ব্যস্ত শহর নিশ্চই, এখন জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ।

সারগেই এই ইউক্রাইনেরই ছেলে। কিয়েভ শহরে নয়, ওর বাড়ি প্রায় দুশো মাইল দূরে। স্কুল শেষ করার পর সারগেই প্রথমে পড়তে এসেছিল কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর মত বদলে চলে যায় মস্কোতে। এখন সারগেই খুব মস্কোর ভক্ত। মস্কো আর লেনিনগ্রাড শহরের মধ্যে খানিকটা প্রতিযোগিতার ভাব আছে, যেমন মার্কিন দেশে আছে নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলিসে। সারগেই-এর মতে মস্কো অনেক বেশি জীবন্ত।

সন্ধেবেলা সারগেই আমাকে খাওয়াল ইউক্রাইনের নিজস্ব কিছু খাবার। বর্স সুপ তো আগেই খেয়েছি, তা ছাড়া এখানকার সসেজেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আরও নানান রকম রান্না। সবচেয়ে অবাক হলুম এখানকার ভদ্‌কা দেখে। সিলকরা বোতলের মধ্যে ভাসছে দুটি আস্ত শুকনো লঙ্কা। গেলাসে ঢেলে খানিকটা পান করে দেখলুম জিনিসটা রীতিমতন ঝাল। এর আগে আমি কখনও ঝাল মদ আস্বাদ করিনি। আমার অবশ্য খেতে বেশ ভালোই লাগল।

কিয়েভে আমাদের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট গত মহাযুদ্ধের দুই বীর সেনানীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পরদিন সকালে গেলুম এ পি এন অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে। সে অফিসে পা দিয়ে প্রথমেই যে কারণে অবাক হতে হয় তা হল পরিচ্ছন্নতা। সমস্ত অফিসটা একেবারে ঝকঝক করছে, যেন গতকালই তৈরি হয়েছে। দেওয়ালে কাঠের প্যানেল, তার পালিশ একেবারে আয়নার মতন। এ দেশে অনেক জায়গাতেই খুব উচ্চাঙ্গের কাঠের কাজ দেখেছি।

একটু পরেই দুজন প্রাক্তন সেনানী এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরা জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত। তাঁরা পরিধান করে আছেন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক, বুকের দু-দিকে অনেকগুলি পদক ও স্ট্রাইপ। দুজনেরই এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

ওঁদের সামনে বসে আমি ভাবলুম, এবার নিশ্চয়ই মজা হবে। বৃদ্ধেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, এবং নিজের কথাও বেশি বলতে চান। দুই বৃদ্ধ একসঙ্গে বলতে শুরু করলে, নিশ্চয়ই একজন অন্যজনকে মাঝে-মাঝেই থামিয়ে দিয়ে বলবেন, আরে তুই চুপ কর। শোন না, তখন আমি কী করেছিলুম! অন্যজন বলবেন, আরে তুই তো ওখানে ছিলিই না, আমার স্পষ্ট মনে আছে...।

বাস্তবে কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। এই দুই বীর সেনানীই অত্যন্ত বিনয়ী। এঁরা প্রথমেই বললেন, দেশরক্ষার জন্য প্রত্যেকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করে, আমরা বেশি কিছু করিনি।

তবু বললুম, তবু আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

এঁদের একজনের নাম আইভানোভস্কি অ্যাড্রিউ ইনি ছিলেন বিমান বাহিনীর মেজর জেনারেল। অন্যজন হলেন সুখভ কনস্টানটিন, ইনি ছিলেন স্থল বাহিনীতে।

১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর নাতসি বাহিনী ভেদ করে সোভিয়েতে সৈনিকরা কিয়েভ নগরীতে ঢোকে। তারপর এখানকার পথে পথে লড়াই হয়। সেই বাহিনীতে ছিলেন জেনারেল সুখভ কনস্টানটিন, তাঁরা অসম সাহসের সঙ্গে নাতসি বাহিনীকে নিপার নদীর ওপারে ঠেলে নিয়ে যান। ম্যাপ দেখিয়ে এই শহরের তখনকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা বোঝাতে এক জায়গায় থেমে গিয়ে তিনি বললেন, এবারে অ্যাড্রিউ তুমি বলো, তুমি তো এর পরের অংশ ভালো জানো।

মেজর জেনারেল অ্যাড্রিউ শোনাতে লাগলেন, সেই সময় বিমান বাহিনী কীভাবে স্থলযুদ্ধকে সাপোর্ট দিয়েছিল। তিনি নিজের কীর্তির কথা না বলে তার এক মৃত সহযোদ্ধার কথা বেশি বলতে লাগলেন, যিনি প্রাণ তুচ্ছ করে এতবার শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন যে তাঁর সম্পর্কে নানান কাহিনি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

কথায় কথায় জানা গেল যে, এই দুই বীর যোদ্ধাই লেখক। একজন কবিতা লেখেন, অন্যজন

গল্প। ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় কয়েকটি পত্রপত্রিকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাতে ওদের সম্পর্কে লেখা ছাপা হয়েছে। সেই লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনালেন ওঁরা। আমাকে কয়েকটি বইপত্র দিলেন, পরে পড়ে দেখার জন্য। আমি যে ইউক্রাইনিয়ান ভাষা একবর্ণও বুঝি না, সে কথা ওঁরা শুনলেন না। ভালোবেসে ওইসব বইপত্র আমাকে দিলেন নিজেদের নাম সই করে।

ওঁদের দুজনের কোথাও লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে, এবারে ওঁদের উঠতে হবে। আমি বললুম, এত বড় যোদ্ধাদের আমি কখনও কাছাকাছি দেখিনি। আপনাদের গল্প শুনে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করছিলুম।

ওঁরা বললেন, যুদ্ধ জিনিসটা মোটেই ভালো নয়। এসো, আমরা সবাই মিলে আশা করি, পৃথিবীতে আর কোনওদিন কোনও যুদ্ধ যেন না হয়।

ওঁরা দুজনে ইংরিজি একেবারেই জানেন না। কথাবার্তা বলছিল সারগেই-এর অনুবাদের মাধ্যমে। আমার পরিচয় শুনে ওঁরা শেষকালে বললেন, এবারে তোমার একটা কবিতা শোনাও। তোমার নিজের মাতৃভাষায় শোনাও। তুমি কী ভাষায় লেখো?

আমি বললুম, বাংলায়। কিন্তু সে ভাষা তো আপনারা বুঝতে পারবেন না কিছুই!

ওঁরা বললেন, তবু শোনাও। আমরা বাংলা ভাষা কখনও শুনিনি। কীরকম শুনতে লাগে দেখি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নিজের কোনও কবিতাই মনে পড়ল না। তা ছাড়া আমি ভাবলুম, এঁরা শুনতে চাইছেন বাংলা ভাষার শব্দঝংকার, সুতরাং সেরকম কোনও ঝংকারময় কবিতা বলাই ঠিক হবে। এরকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দুঃসময় কবিতাটি একেবারে আদর্শ।

সুতরাং আমি আবৃত্তি করলুম—যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া...তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ না করো না পাখা...।

ওরা দুজনেই বেশ তারিফ করে বললেন, বাঃ, বেশ সুন্দর, এর মানে কী?

এবারে আমি প্রমাদ গুনলুম। অনুবাদ করার পক্ষে রবীন্দনাথের এই কবিতাটি আবার খুবই শক্ত। যাই হোক, আক্ষরিক অনুবাদ না হলেই বা কী আসে যায়।

আমি বললুম, এটা একটা পাখি সম্পর্কে...ফিনিক্স পাখি...জানেন নিশ্চয়ই যে পাখি বারবার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার পুনর্জীবন পায়...।

আমাদের সামনে রয়েছে একটা টেপ রেকর্ডার। ভবিষ্যতে যদি কেউ আমাদের এই আলোচনা নিয়ে গবেষণা করতে চায়, তা হলে বাংলা কবিতার এই অংশটি নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে।

॥ ১৪ ॥

কিয়েভে এসে প্রথম ওভারকোট খুলে ফেলতে পারলুম। ফুরফুরে বাতাসে বেশ উপভোগ্য ঠান্ডা, একটা পাতলা গরম জামা গায়ে দিলেই চলে যায়। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে প্রকৃতই বসন্ত। মে মাসের ৯ তারিখ এখানে জাতীয় বিজয় দিবসের ছুটি, সমস্ত অফিস-কাছারি বন্ধ, পথে পথে উৎসব-মনা নারী-পুরুষের ভিড়। রাস্তায় পা দিলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। এমন "ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী" শহর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যে দিকে তাকাই সেদিকেই পার্ক চোখ পড়ে। রাস্তাগুলি চড়াই-উতরাই। দু'পাশের বাড়িগুলিও সুদৃশ্য এবং মিউজিয়ামের সংখ্যাও প্রায় অগুন্তি। কোনটা ছেড়ে যে কোনটাকে দেখি তা-ই ঠিক করতে পারি না।

আজ ছুটির দিন বলে আমাদের কোথাও কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর বেড়াতে-বেড়াতে গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলুম একটা পার্কে। মস্ত বড়-বড় গাছ, নানারকমের

ফুল, মাঝে মাঝে চমৎকার ভাস্কর্য। ছুটির দিন বলে অনেক লোক এসেছে, কিন্তু কোনও গোলমাল নেই, বেশ শান্ত নির্জন পরিবেশ।

আমি খুব একটা প্রকৃতিপ্রেমিক নই। উদ্যানের চেয়ে অরণ্য আমাকে বেশি টানে। শোভার চেয়ে রহস্যময়তা। তবে "দা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস" নামে একটি বই পড়ার পর সব গাছপালাকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি। যে-কোনও বড় বৃক্ষের সামনে দাঁড়ালেই মনে হয় সেই মহাদ্রুম আমার আপাদমস্তক লক্ষ করছেন।

পার্কটি একটি উঁচু টিলার ওপর। যেখানটা সবচেয়ে উঁচু, সেখান থেকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ উপত্যকা, তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নিপার নদী। বিশ্ববিখ্যাত নদীগুলির মধ্যে এই নদী একটি।

অন্যান্য শহরের নদী দেখিয়ে সারগেই আমাকে জিগ্যেস করেছে, এই নদী কি আপনাদের গঙ্গার চেয়ে বড়?

প্রত্যেকবারই আমি বলেছি, না হে, সারগেই ভায়া, নদী দেখিয়ে আমাকে চমকানো খুব শক্ত। আমি নদী নালার দেশেরই মানুষ। তুমি তো পদ্মা কিংবা ব্রহ্মপুত্র দ্যাখোনি।

নিপার নদী দেখে আমার মুগ্ধতা স্বীকার করতেই হল। শুধু বিশাল নয়, এই নদীর একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে।

সারগেই বলল, চলুন, আমরা নিপার নদীতে বেড়াতে যাই।

অতি উত্তম প্রস্তাব। একটা বাস ধরে আমরা চলে এলুম স্টিমার ঘাটায়। এখানে অনেকগুলি সুদৃশ্য স্টিমার বা বড় মোটরবোট রয়েছে, প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে। বহু লোক এসেছে আজ এখানে ছুটি কাটাতে। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে আমরা একটি বোটে চড়ে বসলুম।

বোটটি বেশ চওড়া, ভেতরে বসবার বন্দোবস্তও বেশ ভালো। কিন্তু ভেতরের পরিবেশটি তেমন জমজমাট নয়, চালকের কেমন যেন একটা দায়সারা ভাব। আমস্টারডাম, প্যারিসে আমি এরকম জলযানে নদী ভ্রমণ করেছি, সেখানে গাইডরা নানারকম ঠাট্টা-রসিকতা করতে করতে দু-পারের দৃশ্য দেখায়, সেইসঙ্গে ইতিহাস শুনিয়ে দেয়। যাত্রীরাও অনেক কৌতুক করে, সময়টা যে কোথা থেকে কেটে যায় তা বোঝাই যায় না। এখানেও সেই রকম কিছু আশা করেছিলুম। নদী পরিভ্রমণের ব্যবস্থা যখন আছেই, তখন আয়োজনটি সর্বাঙ্গসুন্দর করাই উচিত।

বোটটি ছাড়ামাত্র তীব্র বেগে চলতে লাগল। এত দ্রুত গতি ঠিক যেন ছুটির দিনের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না, বাইরের দৃশ্যও ভালো করে দেখা যায় না।

কিয়েভ শহরটি সারগেই-এর আগে থেকেই চেনা, সে আমাকে ধারাভাষ্য দিয়ে যেতে লাগল। নদীর ডানপাশটি বেশি সবুজ ও বেশ উঁচু, সেখানে দেখতে পেলুম একটি টিলার ওপর সুবিশাল একটি মূর্তি। কিন্তু বোটের প্রচণ্ড গতির জন্য সেটিকে প্রাণভরে দেখা গেল না, ছবি তোলারও সুবিধে হল না।

নদীর অন্যদিকে চোখে পড়ে একটি সদ্য গড়ে ওঠা উপনগরী। অসংখ্য ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে।

নিপার নদীর সঙ্গে পদ্মার খানিকটা মিল আছে। কোথাও কোথাও এই নদী খুব চওড়া হয়ে গেছে এবং মাঝখানে চড়া পড়েছে। ঝোপঝাড় ও গাছপালাও গজিয়ে গেছে সেইসব চড়ায়। ছোট ছোট নৌকো নিয়ে অনেকে সেই চড়ায় এসেছে পিকনিক করতে। সেই দৃশ্য দেখে লোভ হয়, ওরকম কোনও জায়গায় নেমে পড়ি, কোনও একটা পিকনিক পার্টির সঙ্গে যোগ দিই।

আমি সারগেইকে জিগ্যেস করলুম, এখানকার লোক কি নিজস্ব নৌকো রাখতে পারে? এরকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার নিয়ম আছে?

সারগেই বলল, কেন নৌকো রাখতে পারবে না? ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানে কী? আমার জামাটা একটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার উপার্জন দিয়ে আমি একটা গাড়ি বা নৌকো কিনতে পারি, সেটা

আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার বাড়ির সামনে যদি খানিকটা জমি থাকে, সেখানে আমি আলু পেঁয়াজের চাষ করে তা বাজারে বিক্রি করতে পারি। আমি যদি নিজে কোনও মেশিন বানাই, তাহলে বাড়িতে সেই মেশিন বসিয়ে কিছু উৎপন্ন করার অধিকারও আমার আছে। কিন্তু আমি আর তিন-চারজন লোককে খাটাতে পারি না। কারণ, অপরের শ্রম থেকে লাভ করার অধিকার কারুর নেই। যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ভালো চাকরি করে, তারা টাকা জমিয়ে অনায়াসেই একটা গাড়ি বা নৌকো কিনতে পারে।

নদীর চড়ায় এরকম শত শত পিকনিকের দল দেখতে পেলুম। কেউ কারুর কাছাকাছি নয়, সবাই আলাদা আলাদা জায়গা খুঁজে নিয়েছে।

ভালো করে দেখবার জন্য আমি দু-একবার ওপরের ডেকে এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এমন হুহু হাওয়া যে সেখানে এক মিনিট তিষ্ঠোবার উপায় নেই, মনে হয় যেন হাতের আঙুলগুলো জমে যাচ্ছে, ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে নাকের ডগাটা।

এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মোটরবোট অনেকখানি এলাকা চক্কর দিয়ে ফিরে এল ঘাটে। এইরকম ভ্রমণও অনেকের কাছে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু এমনভাবে নদী দেখা আমার মনঃপূত নয়। ইচ্ছে রইল, আবার কোনও একদিন নিপার নদীর কাছে ফিরে এসে একটা পালতোলা নৌকোয় বেড়াব।

আজ এখানে জাতীয় ছুটির দিন বলে অনেক দোকানপাটই বন্ধ। আমাদের হোটেলের বেশ কিছু কর্মচারীও ছুটি নিয়েছে। ঠিক সময়ে না গেলে খাবারদাবার পাওয়া যাবে না। দুপুরবেলা একটু দেরি করে এসে আমরা আহার্য পছন্দ করার কোনও সুযোগ পাইনি। তাই সন্ধে হতে না হতেই আমরা গিয়ে বসলুম ডাইনিং হলে।

হোটেলে এখন প্রচুর বিদেশি ভ্রমণকারীর ভিড়। সোভিয়েত সরকারের 'ইন টুরিস্ট' নামে দপ্তর এখন বাইরে থেকে বহু টুরিস্টদের আসবাব জন্য নানারকম সুযোগসুবিধে দিচ্ছে এবং টুরিস্টদের সবদিক ঘুরিয়ে দেখাবারও ব্যবস্থা করেছে। টুরিস্টদের মধ্যে আমেরিকানই বেশি।

আমাদের পাশের টেবিলে একজন প্রৌঢ় বিদেশি একা একা বসে খাচ্ছিলেন, এক সময় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ইংরেজি বলতে পারো?

আমি হেসে ঘাড় নেড়ে বললুম, একটু একটু।

প্রৌঢ় বিদেশিটি বললেন, তোমাদের টেবিলে যোগ দিতে পারি?

অজানা কোনও শহরে গিয়ে হোটেলে বসে-বসে একা একা খাবার খাওয়া যে কী বিড়ম্বনার ব্যাপার সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি সাগ্রহে তাঁকে আমাদের টেবিলে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালুম।

ইনি কানাডিয়ান, এসেছেন তীর্থ দর্শনে। শ'খানেক বছর আগে এঁর পূর্বপুরুষ এই ইউক্রাইন থেকেই পাড়ি দিয়েছিলেন কানাডায়। ইনি এসেছেন তাঁর প্রাক্তন মাতৃভূমি (অথবা পিতৃভূমি) পুনর্দর্শনে।

আমি কানাডায় গিয়ে শুনেছিলুম যে এডমান্টন ও ক্যালগেরি শহরের মাঝামাঝি কোথাও ইউক্রাইনিয়াদের বিরাট বসতি আছে। সেইজন্য আন্দাজে ঢিল মেরে জিগ্যেস করলুম, আপনি কি এডমান্টনের কাছাকাছি কোথাও থাকেন?

ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, তুমি এডমান্টন চেনো? গিয়েছ সেখানে? কবে গিয়েছিলে?

বেশ গল্প জমে গেল। এই ভদ্রলোক কানাডার কিছু ভারতীয়কে চেনেন, তাঁদের নাম বললেন, আমি অবশ্য তাঁদের একজনকেও চিনি না।

সারগেই যে-কোনও কারণেই হোক, এই লোকটিকে বেশি পাত্তা দিল না। আমি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরেও সে চুপ করে রইল। এই লোকটি দু-তিনটি ইউক্রাইনিয়ান গান শোনাবার

চেষ্টা করে সারগেইকে জিগ্যেস করলেন, তুমি এই গানগুলি জানো?

প্রায় একশো বছরের পুরোনো অপ্রচলিত গান, সারগেই জানবে কী করে? ইনি ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলে সারগেই উত্তর দিল ইংরিজিতে, সম্ভবত ওই ভাষাও তার বোধগম্য নয়।

রাত্তিরের দিকে আবার শহরটা খানিকটা ঘুরে এসে সারগেই আর আমি গেলুম যে-যার ঘরের দিকে। রাত্তির মোটে দশটা, এরই মধ্যে হোটেলটি প্রায় নিঃশব্দ! অনেক আলো নিবে গেছে।

হোটেলের প্রত্যেক ফ্লোরে একজন মহিলা থাকেন, যাঁর কাছে চাবি জমা থাকে। বেশির ভাগ হোটেলেই দেখেছি বৃদ্ধারাই এই কাজ করেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সকলেই সরকারের কাছ থেকে বার্ধক্যভাতা পায়। অতিরিক্ত রোজগারের জন্য বুড়োবুড়িরা আবার পার্টটাইম চাকরিও নিতে পারেন। ঘর ঝাঁট দেওয়া, রাস্তা পরিষ্কার করা, হোটেলে রাত্তিরের ডিউটি, এইসব কাজেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখতে পাওয়া যায় বেশি। এক-এক সময় একটু নিষ্ঠুর লাগে, শরীরিক পরিশ্রমের কাজেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের লাগানো হয় দেখে। শুধু সোভিয়েত দেশেই নয়, অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য দেশেই এই অবস্থা। উপায়ই বা কী? সকলেই যদি শিক্ষার সুযোগ পায়, মোটামুটি শিক্ষা লাভের পর সকলেই যদি চাকরি পেতে পারে, তাহলে বাথরুম পরিষ্কার, হোটেলে বাসন মাজার কাজের লোক পাওয়া যাবে কী করে? একজন অফিস কর্মচারী আর একজন নর্দমা পরিষ্কারকের মাইনে সমান হলেও সবাই চাইবে অফিসের কাজটাই নিতে। জোর করে কারুর ওপর কোনও কাজ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সোভিয়েত দেশের নতুন সংবিধানেও প্রত্যেক নাগরিকেরই চাকরি নির্বাচনের অধিকার আছে। একমাত্র বুড়োবুড়িদের জন্যই ভালো চাকরির সুযোগ বেশি নেই।

আজ হোটেলের অনেকেই ছুটি নিয়েছে, কিন্তু আমার ফ্লোরের এই বৃদ্ধা রাত জেগে বসে একটা বই পড়ছেন।

ইংরেজি বলে কোনও লাভ নেই, তাই আমি হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললুম, কেমন আছ, দিদিমা? তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো? বাড়িতে তোমার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে নেই তো?

দিদিমাও হেসে ফেলে তাঁর ভাষায় কী যেন সব বলে গেলেন, তার মধ্যে একটা শব্দ যেন 'শুভমস্তু'র মতন শোনাল। যেন উনি আমাকে আশীর্বাদ করছেন।

॥ ১৫ ॥

আজ সকাল থেকেই সারগেই-এর চোখমুখে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছি। আজ যাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে যাওয়ার কথা, তাঁর কাছে যাওয়ার আগ্রহ সারগেই-এরই যেন খুব বেশি। ওলেস হনচার ইউক্রাইন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার একজন প্রথম সারির লেখক, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও পেয়েছেন।

সারগেই বলল, এই ওলেস হনচারের লেখা পড়ে কলেজ জীবনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, কত রাত জেগে পড়েছি তাঁর বই, মনে-মনে তাঁকে পুজো করেছি, দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখলেও কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য কোনওদিন হবে এমন কল্পনাও করিনি। আজ সেই বিখ্যাত লেখকের সামনাসামনি গিয়ে বসব, একথা ভাবতেই আমার এমন হচ্ছে...। সুনীলজি, আপনি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন!

আমি হাসিমুখে বললুম, হ্যাঁ।

স্কুল-কলেজে পড়ার সময় আমি ছিলুম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারুণ ভক্ত। পাড়ার লাইব্রেরি

থেকে তাঁর সমস্ত বই পড়ে শেষ করেছিলুম। খুব ইচ্ছে করত, তাঁকে একবার চোখে দেখব। কলেজ জীবনে এসে কফি হাউসে আড্ডা মারতে গিয়ে জানতে পারলুম, কাছেই "পরিচয়" পত্রিকার অফিস, সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে-মাঝে আসেন। পর পর কয়েকদিন "পরিচয়" পত্রিকার অফিস বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু দেখা মিলল না। ভরসা করে একদিন ঢুকেই পড়লুম "পরিচয়" অফিসে। সেদিন সেখানে সত্যিই মানিববাবু উপস্থিত ছিলেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছিলুম, এই কালোমতন গম্ভীর চেহারার মানুষটির হাতে দিয়েই এইরকম সব জটিল লেখা বেরিয়েছে? আমার বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, কিন্তু আমি একটি কথাও বলতে পারিনি তাঁকে। মানিকবাবু বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি বোবা!

ওলেস হনচার কিয়েভের শান্তি কমিটির সভাপতি, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে সেই অফিসেই।

ওলেস হনচার-এর জন্ম ইউক্রাইন-এর একটি গ্রামে, ১৯১৮ সালে। শৈশবে মাতৃহীন, তিনি দিদিমার কাছে মানুষ। ছাত্রজীবনে লেখালেখি শুরু। কিছুদিন সাংবাদিকতা করার পর অধ্যাপনা শুরু করলেন। কয়েকটি গল্প, একটি উপন্যাস প্রকাশিত হল। কিন্তু সেগুলি এমন কিছু না। তারপর একটি বিরাট ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনার নাম যুদ্ধ। হনচার-এর নিজের ভাষায়, "দা ওয়ার ওভারটুক মি ইন দা লাইব্রেরি।" অতিশয় পড়ুয়া মানুষটিকে যেতে হল যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তিনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন, তাঁর প্রত্যেকটি লেখাই মর্মস্পর্শী। তাঁর "দা স্টান্ডার্ড বেয়ারার্স" নামে ট্রিলজি অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে তিনি সমান জনপ্রিয় হয়ে আছেন। সোভিয়েত দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার—লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

এ পি এন-এর একজন প্রতিনিধি এসে আমাদের নিয়ে গেলেন নির্দিষ্ট সময়ে। শান্তি কমিটির সভাকক্ষটি বেশ প্রশস্ত, ধপধপে সাদা দেওয়াল, একটি গোল টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার। ওলেস হনচার আগেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হাসিমুখে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমার ভালো লেগে গেল। এক একজন মানুষের মুখের মধ্যে ভারী সুন্দর প্রসন্নতা থাকে, তাঁদের সামনে দাঁড়ালে কোনও আড়ষ্টতা বোধহয় না।

আমি একজন ভারতীয় এই কথাই তাঁকে জানানো হয়েছিল, আমি যে একজন বাঙালি তা তিনি জানতেন না। সারগেই-এর মুখে আমার পরিচয় জেনে তিনি বললেন, কী আশ্চর্য। তোমাকে উপহার দেওয়ার জন্য আমি যে বইটি নিয়ে এসেছি, তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই বেঙ্গল-এর কথা আছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, ইউক্রাইনের মানুষ কি বাংলার কথা কিছু জানে?

ওলেস হনচার বললেন, তেমন কিছু জানে না, তবে একটা রোমান্টিক ধারণা আছে। বাংলা হল সেই সুদূর দেশ যেখানে আমাদের হাঁসেরা শীত কাটাতে যায়। সেই বাংলা হল কবিদের দেশ, চিরবসন্তের দেশ।

বলতে-বলতে তিনি ভুরু নাচিয়ে হাসলেন, আমিও হাসলুম। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য তিনি জানেন, আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

এরপর নানা বিষয়ে আড্ডা হতে লাগল। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কোনও গোঁড়ামি নেই, তাঁর মন সংস্কারমুক্ত। কথায়-কথায় তিনি বললেন, কোনও লেখকেরই উচিত নয় নিজেকে বা অন্য লেখকদের ধারণার পুনরাবৃত্তি করা, তাতে শিল্পের তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সময়ের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সবসময় মানুষকে দেখা উচিত। শিল্পী তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে চান, অথচ শিল্পের স্বভাবই হল অনবরত পরিবর্তন। সাহিত্যে এই দুই বিপরীত শক্তি মিলেমিশে থাকে।

অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক সাহিত্য সম্পর্কে যেসব রস-কষহীন ফতোয়া জারি করেন তার চেয়ে এই ধরনের একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বললে প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে অনেক বেশি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি যে উপন্যাসগুলি লেখেন, তার বিষয়বস্তু কি আগেই ভেবেচিন্তে ঠিক করেন, না হঠাৎ মাথায় আসে?

তিনি বললেন, মনের প্রক্রিয়া বড় জটিল। কী করে যে কোন বিষয়টা মনে ধাক্কা দেবে, তা বলা যায় না। যুদ্ধের সময় আমি নোট রাখতুম, মৃত বা জীবিত কমরেডদের কথা অন্যদের জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করতুম। তারপর আরও অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছি।

কথায়-কথায় ওলেস হনচার জানালেন যে তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করে এসেছেন, সেখানকার চওড়া-চওড়া বহুদূর পর্যন্ত একটানা সোজা রাস্তাগুলি দেখে এক-এক সময় তাঁর কল্পনাশক্তি বিস্তৃত হয়েছে।

আমি আবার জিগ্যেস করলুম, আপনি একজন সৃষ্টিশীল লেখক, এবং আপনি এখানকার শান্তি কমিটির সভাপতি। লেখা ছাড়া অন্যান্য কাজে মন দিতে বা সময় দিতে আপনার অসুবিধে হয় না?

তিনি একটু হেসে বললেন, এখানকার কাজ খুব বেশি নয়। সব শিল্পীদের কিছুটা সামাজিক ভূমিকা নিতে হয়। না, আমার সময়ের অভাব হয় না। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে তোমার কী অভিমত?

আমি বললুম, আমরা তৃতীয় বিশ্বের নাগরিক, আমাদের মতামতের কী মূল্য আছে? আমরা তো কামানের খাদ্য।

তিনি বললেন, সব মানুষেরই মতামতের মূল্য আছে। প্রতিবাদ জানানো একটা নৈতিক অধিকার। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ, কী সাংঘাতিক অপচয়, তা আমরা মর্মে-মর্মে বুঝেছি। তাই আমরা সত্যিই চাই না, পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোক।

আমি বললুম, সে কথা আমি বিশ্বাস করি। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য আপনাদের দেশ বেশি উদ্যোগী, আপনাদের প্রয়াস আন্তরিক।

এরপর কফি ও কেক-পেস্ট্রি এসে গেল।

ওলেস হনচার ইংরেজি জানেন না। কিংবা জানলেও বলেন না। কথাবার্তা হচ্ছিল সারগেই-এর অনুবাদের মাধ্যমে। আমাদের আলোচনা যখন শেষ তখন সারগেই জানাল যে সে ওয়েলস হনচারের কত ভক্ত, তাঁর কত বই পড়েছে। ছাত্র বয়েস থেকে তাঁকে কাছাকাছি দেখবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব।

বিখ্যাত লেখকটি তখন তাঁর ওই তরুণ ভক্তটির সঙ্গে ওঁদের নিজস্ব ভাষায় নানারকম কৌতুক করতে লাগলেন, যা আমি কিছুই বুঝলুম না।

ওলেস হনচার আমাকে তাঁর যে বইটি উপহার দিলেন, সেটির নাম "দা সোর অফ লাভ।" ইংরেজি অনুবাদটি বেরিয়েছে মস্কো থেকে। উপন্যাসটি পড়ে আমি বুঝতে পারলুম, ওলেস হনচারের বর্ণনাভঙ্গি বেশ কাব্যময় এবং একটা রোমান্টিক সুর আছে।

সেই বইতে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রসঙ্গটি আমি এখানে তুলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণসাগরের তীরে একটি ছোট শহর। সেখানে একটি নার্সদের ট্রেনিং কলেজ। সেখানকার একজন শিক্ষিকা রেড ক্রসের কাজ নিয়ে দূর বিদেশে গিয়েছিলেন। তরুণী নার্সরা তাদের ওই প্রিয় শিক্ষিকার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইছে। তারা বলছে, 'আমাদের বলুন সেই সোনার বাংলার কথা, যেখানে আমাদের হাঁসেরা শীত কাটাতে যায়।

"সে তো কবিদের দেশ, চিরকালীন প্রেমের দেশ, চিরবসন্তের দেশ, সেখানকার মানুষরা কৃষ্ণ-চক্ষু, তাদের হাসিতে আছে জাদু, সেখানকার মেয়েদের বাহু রাজহংসীর গলার মতন, সেইসব হাতের ভঙ্গিমা দেখে সাপেরাও মোহিত হয়ে যায়...সেখানে নৃত্যরতা নারীরা, অপূর্ব ছন্দ, যেন জিপসি..."

কিন্তু শিক্ষিকাটি কোনও কথাই বললেন না। তাঁর চোখ বেদনার্ত। ছাত্রীরা যা বলছে, তাঁর

অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মনে পড়ছে শত শত ক্ষুধার্ত শিশুর হাত, রক্তশূন্য চেহারার মায়েরা, করুণ চোখে তারা ভিক্ষে চাইছে, চাইছে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য...রেড ক্রসের কর্মীরা সারা দিনরাত পরিশ্রম করলেনও ভিড়ের শেষ নেই...তিনি সবসময় এত পরিশ্রান্ত থাকতেন যে বাংলার অন্য সৌন্দর্য দেখার অবকাশই পাননি...

এর পরে আমরা গেলুম একটা পত্রিকা দফতরে।

ইউক্রাইনের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। আমাদের পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যার সমান। ইউক্রাইনিয়ানদের সাহিত্য-প্রীতি খুব বেশি। বাঙালিরাও সাহিত্য-প্রীতির জন্য বিখ্যাত। তবে তফাত হচ্ছে এই যে, ইউক্রাইনে শতকরা সবাই প্রায় শিক্ষিত এবং এখানকার অধিবাসীরা খুবই সচ্ছল। আর পশ্চিমবাংলায় শিক্ষিতের হার শতকরা পঁয়ত্রিশজন আর শতকরা পঞ্চাশজন সারা বছর দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না।

ইউক্রাইনের সাহিত্য বাঙালিদের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়। তবে ইউক্রাইনের বিখ্যাত লেখক শেভচেংকোর জীবন নিয়ে একটি নাটক বাংলায় রচনা করেছেন মন্মথ রায়, কলকাতায় সেটি অভিনীতও হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যখন কিয়েভ শহরে গিয়েছিলেন, সেখানে এক জনসভায় তিনি মন্মথ রায়ের ওই নাটকটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনের উদাহরণ হিসেবে।

নাট্যকার মন্মথ রায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ওই সুকীর্তিটির জন্য বাঙালি হিসেবে আমি বেশ খাতির পেতে লাগলুম।

পত্রিকাটির নাম "সেস্‌ভিট"। অনুবাদের ওপরে এঁরা খুব জোর দেন। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ডঃ ওলেগ মিকিটেংকো জানালেন যে তাঁরা বাংলা সাহিত্য থেকে বেশ কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এরকম অনেকের, আরও অনুবাদ প্রকাশ করতে আগ্রহী, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাংলা বই সংগ্রহ করা।

"সেস্‌ভিট" পত্রিকাটি ইউক্রাইনিয়ান ভাষায় প্রচারসংখ্যা আড়াই লক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়ানে এসে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করলেই বোঝা যায় যে সমৃদ্ধ রুশ ভাষা প্রত্যেকটি সোভিয়েত রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হলেও প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষার উন্নতির জন্যও প্রচুর জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ রুশ ভাষা দিয়ে অন্য ভাষাগুলিকে গ্রাস করবার কোনও চেষ্টা নেই। আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিগুলি যদি সমানভাবে গুরুত্ব পায় তা হলে একটা বড় দেশের মধ্যে অসন্তোষ বা বিভেদকামী শক্তি দানা বাঁধে না।

কিয়েভে আমাদের সফরসূচী প্রায় শেষ। মাত্র বারো দিন আগে আমি সোভিয়েত ভূমিতে পা দিয়েছি কিন্তু এর মধ্যে এত বেশি স্থান বদল ও বিভিন্নরকম মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে যে মনে হয় যেন কতদিন কেটে গেছে। সেই তুলনায় কিয়েভ শহরে অবশ্য তত বেশি ঠাসা প্রোগ্রাম ছিল না, ছুটির মেজাজে ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াবার অনেক সুযোগ পাওয়া গেছে, এই রমণীয় শহরটি ভালোভাবে উপভোগ করা গেছে।

আগামীকাল ফিরে যেতে হবে মস্কোতে।

॥ ১৬ ॥

কিয়েভ শহরে আধুনিক বাড়িগুলির ফাঁকে-ফাঁকেই চোখে পড়ে এক-একটি গির্জা। এ শহরে যে কত গির্জা, আর মনাস্টারি, তার যেন ইয়ত্তা নেই। অনেকগুলিই বেশ প্রাচীন।

এখানকার সব গির্জাই সযত্নে সংরক্ষিত। বড়-বড় গির্জাগুলিতে কনসার্ট হল বা সংগ্রহশালা

তৈরি করা হয়েছে। ধর্মীয় কারণে গির্জার ব্যবহার অবশ্য এখন সব দেশেই কমে গেছে, সাম্যবাদী আদর্শে তো ধর্মের কোনও স্থানই নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ানে যদিও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা আছে। ইউ এস এস আর-এর সংবিধান অনুযায়ী যে-কোনও নাগরিকই নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে অথবা নাস্তিকতা প্রচারও করতে পারে।

অন্য কোনও শহরে আমি গির্জায় জনসমাগম লক্ষ করিনি। কিন্তু রবিবার সকালে কিয়েভের রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে ট্রিনিটি গেটওয়ে চার্চের সামনে বেশ ভিড় দেখতে পেলুম। ভ্রমণকারীদের কাছেও পুরোনো গির্জাগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্যস্থান। কিন্তু এত লোকজন সবাইকেই ভ্রমণকারী মনে হল না। ভেতরে ঢুকে দেখলুম প্রচুর মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে এবং রীতিমতন সারমন দিচ্ছেন একজন বয়স্ক পাদরি। ভক্তিভরে বসে শুনছেন বেশ কিছু নারী-পুরুষ। সামনের দরজার বাইরে কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বসে আছেন, তাঁদের সামনে বিছানো কাপড়ের টুকরোর ওপরে খুচরো পয়সা। হয়তো আমাদের দেশের মতনই, তীর্থস্থানে ভিক্ষা যাঞ্চা করা এখানেও কোনও ধর্মীয় আচারের অঙ্গ। এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় আমি এক বিখ্যাত অধ্যাপককে ভিক্ষে করতে দেখেছিলুম।

সারগেই-কে আমি জিগ্যেস করলুম, তোমাদের ইউক্রাইনে তো এখনও অনেকে ধর্মকর্ম মানে দেখছি।

সারগেই বলল, পুরোনোরা এখনও কেউ-কেউ মানে। অল্প-বয়েসিরা এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দরজার কাছে যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখেছি তাঁদের বয়েস অক্টোবর বিপ্লবের চেয়ে নিশ্চিত অনেক বেশি।

ভারতবর্ষ তো ধর্মের ডিপো। সেইজন্য বিদেশিরা যে-কোনও ভারতীয়কেই মনে করে খুব ধর্মপরায়ণ। এখানে আমাকে দু-তিনজন জিগ্যেস করেছে, আমি হিন্দু না মুসলমান।

এর উত্তরে আমাকে বলতে হয় যে আমার জন্ম একটি হিন্দু পরিবারে, কিন্তু কোনও ধর্মমতেই আমার বিশ্বাস নেই।

এ কথা শুনে কেউ-কেউ যেন সামান্য একটু অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। তখন আমাকে আবার বলতে হয়েছে যে ভারতবর্ষে নাস্তিকতার ট্র্যাডিশানও অনেক দিনের। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধই তো একটা নাস্তিকতার ধর্ম প্রচার করে গেছেন। সে যাই হোক, আমি হিন্দু বা মুসলমান তা জানতে চাইছেন কেন। তাতে কী আসে যায়? আপনাদের তো ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ থাকার কথা নয়!

একজন অধ্যাপক বলেছিলেন, হিন্দু ধর্মের দর্শনটি তাঁর ভালো লাগে।

পাছে ওই দর্শন বিষয়ে আলোচনা চালাতে হয় তাই আমি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছি।

আমি ধর্ম মানি বা না-ই মানি, পুরোনো গির্জাগুলির দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি বড় সুমধুর লাগে। অধিকাংশ গির্জাই যুগ যুগ ধরে প্রচুর হিংস্রতার কেন্দ্রস্থল, অথচ ভেতরের শিল্পকর্ম অপূর্ব।

কিয়েভ ছেড়ে আমরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে ফিরে এলুম মস্কোতে। উঠলুম আবার সেই হোটেল ইউক্রাইনিয়াতে। এবারে আমার ঘরটি তেইশ তলায়। সারগেই আমাকে ঠিক দেড় ঘণ্টা সময় দিল, এর মধ্যে সে একবার বাড়ি ঘুরে আসবে। তারপর আজ অনেক কাজ, অনেক ঘোরাঘুরি।

এক কাপ চা খেয়ে বাথরুমে গিয়ে দেখলুম কলে জল নেই। খবর নিয়ে জানা গেল যে, কিছু একটা যান্ত্রিক গোলোযোগে সারা হোটেলেই জল বন্ধ, মেরামতি কাজ চলছে। যাক, তাহলে আজ আর স্নানটানের ঝামেলায় যেতে হবে না। পুরোদস্তুর পোশাক পরেই শুয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল টেলিফোন।

বিদেশ বিভুঁইয়ে টেলিফোনে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলেই ভালো লাগে। আমি ফিরেছি কিনা সেই খোঁজ নেওয়ার জন্য টেলিফোন করছে সুবোধ রায়। এখানকার বাঙালিদের সে খবর দিয়ে

রেখেছে, আজ সন্ধেবেলা একটা আড্ডার আসর বসানো হবে।

সুবোধ বলল, অনেক তো ঘোরাঘুরি করে এলেন, আজকের দিনটা ছুটি নিন আজ সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটান।

আমি বললুম, আজ তো অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে শুনেছি। এঁদের অতিথি হয়ে এসেছি, এঁদের প্রোগ্রাম তো ঠিক রাখতেই হবে। আবার তোমাদের সঙ্গেও আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে খুব। তুমি সারগেই-এর সঙ্গে কথা বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করো।

সারগেই ফিরে আসবার পর আমি ওকে সুবোধ রায়ের বার্তা জানালুম। সারগেই বিশেষ পাত্তা দিল না। বলল, বাঙালিদের সঙ্গে আপনি কলকাতায় ফিরে আড্ডা দেবেন, এখানে অনেক কাজ আছে।

এক প্রস্থ ভারী ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমেই যেতে হবে এ পি এন দফতরে। এশিয়া বিভাগের ডেপুটি হেড কোয়ার্টার্স সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আবার। সহাস্য মুখে তিনি জিগ্যেস করলেন, কী কী দেখলেন, কেমন লাগল বলুন!

আমি বলুলম, আপনাদের এত বিরাট দেশ, সেই তুলনায় তো কিছুই দেখা হয়নি। খুবই অতৃপ্তি রয়ে গেল!

তিনি বললেন, আমাদের এত বড় দেশ, আমরা নিজেরাই বা তার কতখানি দেখতে পাই। আপনাদের ভারতবর্ষ তো অনেক বড়, আপনি কি গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন?

আমি বললুম, না। তবে যে-কোনও দেশই নেটিভদের চেয়ে বাইরের ভ্রমণকারীরা অনেক বেশি ঘুরে দেখে যায়।

তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমাদের যে ছেলেটি গিয়েছিল, সে আপনার ঠিক যত্ন নিয়েছিল তো?

সারগেই কাছে বসে থাকলে আমি নিশ্চিত কিছুটা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করতুম। কিন্তু সারগেই অন্য কোথাও গেছে। সেইজন্য আমি বললুম, সারগেই ছেলেটি সত্যিই ভালো, ওর ব্যবহার খুবই আন্তরিক। আমায় কোনওরকম অসুবিধে বোধ করতে দেয়নি। যতগুলো জায়গা আমি দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি।

সোয়ার্টস সাহেব বললেন, আপনি আশা করি আবার আসবেন।

ওখানে আর দুজনের সঙ্গে দেখা হল, তাঁদের দুজনের সঙ্গেই কলকাতার সম্পর্ক আছে। ওঁদের একজন কলকাতার সোভিয়েত দূতাবাসে কাজ করেন, আর একজন শিগগিরই ভাইস কনসাল হিসেবে কলকাতায় যাবেন।

সোয়ার্টস সাহেব আমাকে পৌঁছে দিলেন নীচের সিঁড়ি পর্যন্ত। আমাকে উপহার দিলেন এক প্যাকেট রুশ সিগারেট ও কয়েকটি বই।

এই বাড়িটির কাছেই রাদুগা পাবলিশার্সের অফিস। এই প্রকাশনীর কাছ থেকে আমি আগে চিঠিপত্র পেয়েছি, এঁদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, সুতরাং ওখানে একবার যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলই, সারগেই অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে রেখেছে।

মস্কোর প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স তথা প্রগতি প্রকাশনী বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং সোভিয়েত সাহিত্য পৃথিবীর বহু ভাষায়। রাদুগা পাবলিশার্সও তাঁদের সহযোগী হিসেবে স্থাপিত হয়েছে। বাংলা ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি বই দেখলুম। এঁরা আধুনিক বাংলা গল্পের একটি সংকলনও প্রকাশ করছেন, সেই সংকলনটির নাম "রাতপাখি"।

রুশ ও অন্যান্য সোভিয়েত ভাষার বিখ্যাত কয়েকটি রচনার বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ দেখে মুগ্ধ হলুম। যেমন সুন্দর ছাপা, তেমন সুন্দর কাগজ, অনুবাদও বেশ ঝরঝরে। সুমুদ্রিত, সুবাঁধাই বই হাতে নিলেই ভালো লাগে। অনুবাদে সাহিত্যের আদান-প্রদানের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে, তেমনটি আর পৃথিবীর কোথাও নেই। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কেও এঁদের

যথেষ্ট আগ্রহ ও যত্ন আছে।

ফরেন লিটরেচার বিভাগের চিফ এডিটর জর্জ এ আনদ্‌জাপারিদ্‌জ-এর সঙ্গে আলাপ হল। প্রথমেই অবাক হলুম এর মুখের ইংরিজি শুনে। খাঁটি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। এখানে যাঁরা ইংরিজি শেখে তাঁদের এক-একজনের ইংরিজি এক এক রকম। আমেরিকান অ্যাকসেন্টও বেশ শোনা যায়। ভারতীয় অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বলতেও শুনেছি দু-একজনকে।

জর্জ অবশ্য ইংরিজি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। ইনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিখ্যাত সব ইংরেজ লেখকদের বিচার করে নিবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। রাদুগা পাবলিশার্স ইংরিজিতেও অনেক বই প্রকাশ করেন। সেইসব বই অনেকগুলি উপহার দিতে চাইলেন আমাকে। বই পেলে আমি সবসময়েই খুশি হই, কিন্তু বিমানযাত্রায় বই বহন করা বেশ অসুবিধেজনক। আমি অনুরোধ করলুম, বইগুলি ডাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

এখান থেকে আমি প্যারিস যাব শুনে জর্জ সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে বললেন, প্যারিসে...বি গুড!

কথায় কথায় আমি জিগ্যেস করলুম, এই যে এতসব চমৎকার-চমৎকার বাংলা অনুবাদ আপনারা প্রকাশ করেছেন, এগুলো কলকাতায় পাওয়া যায় না কেন? আমার তো চোখে পড়ে না!

জর্জ বললেন, এইসব বই বিক্রি করার ব্যবস্থা ঠিকমতন গড়ে ওঠেনি, চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমি বললুম যে, আমরা ছেলেবেলায় প্রচুর সস্তা দামে সোভিয়েত বই দেখেছি, কলকাতার পথে পথে বিক্রি হয়েছে। এখন আর তেমন দেখা যায় না। রুশ ক্লাসিকাল সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালি পাঠকদের খুবই আগ্রহ আছে। টলস্টয়, পুশকিন, টুর্গেনেভ, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি প্রমুখ লেখকদের লেখা যদি সস্তায় সঠিক অনুবাদে পাওয়া যায় তাহলে বাঙালি পাঠকরা নিশ্চয়ই কিনবে। একালের লেখকদেরও রচনা অনেকেই পড়তে চায়।

এর পরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল "ফরেন লিটরেচার" পত্রিকা দফতরে। সেই পত্রিকায় আমার কয়েকটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও পাওনা আছে। কিন্তু টেলিফোনে ওদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি।

সারগেই বলল, চলুন, তার আগে আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিই, আজ আপনাকে খুব ভালো করে খাওয়াতে হবে।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, আমি কোনওদিনই তো খারাপ খাইনি, আজ হঠাৎ খুব ভালো করে খাওয়াবার মানে কী? রোজ যা খাই, তার বেশি তো খেতে পারব না!

সারগেই বলল, আপনি কাল চলে যাবেন, সেই জন্য আজ আপনাকে স্পেশাল কোনও জায়গায় খাওয়াতে চাই। সঙ্গে আমার এক বন্ধু থাকবে, তার সঙ্গে আলাপ করে আপনার ভালো লাগবে!

গাড়ি নিয়ে প্রায় গোটা মস্কো শহরটা পেরিয়ে এলাম আমরা। শহরের প্রান্ত এলাকায় সব দিকেই প্রচুর নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে, পাড়াগুলি একইরকম দেখতে। মাঝখানে চওড়া চওড়া রাস্তা। একটা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে ছিলেন সারগেই-এর বন্ধু, আমাদের দেরির জন্য তিনি ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছিলেন।

আলাপ হল, এর নাম পারপারা আনাতোলি আনতোলিয়েভিচ। বিখ্যাত "মস্কোভা" পত্রিকায় ইনি কবিতা বিভাগের সম্পাদক। প্রথমে একটু নিরাশ হলুম, পারপারা একেবারেই ইংরিজি জানেন না, সুতরাং এঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যাবে না। যদিও ব্যাপারটি অতিশয় গর্ব করার মতন। রুশ ভাষার একজন কবি ও সম্পাদক, তিনি বিদেশি ভাষা শেখার জন্য সময় ব্যয় করেননি। যেহেতু রুশ ভাষা খুবই উন্নত, তাই এই ভাষা জানলেই বিশ্বের সমস্ত সাহিত্য সম্ভারের স্বাদ পাওয়া যায়। আমি যদি শুধু বাংলো ভাষায় সব কাজ চালাতে পারতুম, তাহলে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করতুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল রেস্তোরাঁ খোঁজাখুঁজি। কোনওটাই ওঁদের দুজনের ঠিক পছন্দ হয় না। তারপর এক সময় পারপারা বললেন, চলো, তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যদি সে জায়গাটা খোলা থাকে, তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

সৌভাগ্যবশত জায়গাটা খোলাই পাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে আমি পারপারার কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। শুধু খাওয়ার জন্যই নয়, আর একটি চমৎকার জায়গা দেখা হল।

জায়গাটা হল আর্টিস্ট ইউনিয়ান। রাইটার্স ইউনিয়ান আগেই দেখেছি, শিল্পীদের মিলন স্থানটিও খুবই সুন্দর। পুরোনো আমলের বাড়ি, কাঠের সিঁড়ি, দেওয়ালে কাঠের কারুকাজ। খাবারের জন্য আমরা যে বড় ঘরটিতে এলুম, সে ঘরটি যেন একশো বছর আগেকার কায়দায় সাজানো। পরিবেশের গুণেই মনটা ভালো হয়ে যায়।

আমরা একটু দেরি করে এসেছি, লোকজন এখন কম। পারপারা বোধহয় একেবারে রান্না ঘরে চলে গিয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে এলেন। তারপর এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে বসে বললেন, আসুন, আগে খিদে বাড়িয়ে নেওয়া যাক।

॥ ১৭ ॥

দোভাষীর মারফত বক্তৃতা দেওয়া চলতে পারে, সাক্ষাৎকার নেওয়াও সম্ভব, কিন্তু এইভাবে আড্ডা দেওয়া যায় না। বিশেষত খাওয়ার টেবিলে। আমরা রয়েছি তিনজন, এর মধ্যে পারপারা যা বলছে, সারগেই আমাকে তা অনুবাদ করে শোনাচ্ছে। আমি যা যা উত্তর দিচ্ছি, সারগেই-কে তা আবার অনুবাদ করতে হচ্ছে। পারপারা আমার দিকে তাকিয়ে কোনও মজার কথা বললে সারগেই তা শুনে হাসছে, আমি তখন বোকাবোকা মুখ করে তাকিয়ে থাকি, তারপর অনুবাদ শুনে হাসতে হয়। গণ্ডারকে কাতুকুতু দিলে সে নাকি সাতদিন পরে হাসে, এ যেন অনেকটা সেই ব্যাপার। সারগেই নিজে কোনও কথা বলতে চাইলে একবার বলে রুশ ভাষায়, আর একবার আমার দিকে ফিরে ইংরিজিতে।

খানিকটা ভদ্‌কা পানের পর অবশ্য অনুবাদের ঝামেলা অনেকটা চুকে যায়। তখন আমি পারপারার কথা সরাসরি অনেকটা বুঝতে পারি। ইশারা-ইঙ্গিতেও অনেকটা কাজ চলে। সারগেই খাদ্য-পানীয় দুটোই কম খায়, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক; ওর চেহারা বেশ ছিপছিপে, তবু ওর ধারণা মোটা হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেই সারগেই আমাকে বলেছিল, খুব শীতের সময় বাড়ি থেকে কম বেরুনো হয়, বসে-বসেই সময় কাটাতে হয় বেশি, তাই শীতের পর তার ট্রাউজার্সের কোমর আঁট হয়ে যায়।

পারপারা বেশ দিলদরিয়া ধরনের মানুষ, এবং খুবই কবিতাপ্রেমিক। কবিতা প্রসঙ্গে নানা কথা বলতে বলতে ভদ্‌কা পান চলতে লাগল। সেইসঙ্গে নানারকম খাদ্য। লেনিনগ্রাদে আমি একদিন ক্যাভিয়ের সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলুম, সেদিন হোটেলে ক্যাভিয়ের বিশেষ ছিল না। তারপর আমি অন্যত্র ক্যাভিয়ের খেয়েছি, কিন্তু আজ সারগেই আমাকে আশ মিটিয়ে ক্যাভিয়ের খাওয়াবে ঠিক করেছে। দু-প্লেট ক্যাভিয়ের আনানো হয়েছে, এবং তা শুধু আমাকেই খেতে হবে। আমি কালো রঙের ক্যাভিয়েরই আগে দেখেছি, কমলা রঙেরও যে হয় আগে জানতুম না।

যতদূর জানি, কাস্পিয়ান হ্রদের স্টার্জন মাছের পেটেই শুধু এরকম ডিম হয়। মাছগুলি বিরাট বিরাট, সেই তুলনায় ডিমের পরিমাণ কম। সেই জন্যই এই ডিমের দাম খুব বেশি। সারা পৃথিবীতেই ক্যাভিয়ের একটি অতি শৌখিন খাবার হিসেবে পরিচিত। তবে এই মাছের ডিমই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কি না, তা আমি বলতে পারি না, এটা ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন, তা ছাড়া আস্বাদ রপ্ত করারও একটা ব্যাপার আছে। অনেক বাঙালিই হয়তো বলবেন, পদ্মার ইলিশের ডিমের কোনও তুলনা নেই। অবশ্য

স্টার্জন মাছের এই ডিমের বৈশিষ্ট্য হল এর দানাগুলো বড়-বড়, এবং ভেতরটা রসাল। ক্যাভিয়ের আমার বেশ প্রিয়, কিন্তু তা বলে দু-প্লেট খেতে হবে? পারপারা আর সারগেই বলতে লাগল, আপনারা দেশে তো এ জিনিস পাবেন না, আপনিই খান, আমরা তো প্রায়ই খেতে পারি।

আমি বললুম, আপনারা আমার দেশে আসুন, ইলিশ মাছের ডিম খাওয়াব!

ইলিশ মাছ কীরকম দেখতে হয়, তা ওরা দুজনেই জানে না। ইলিশ নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আছে, তা দু-লাইন শুনিয়ে মাছটির বর্ণনা দিলুম, তারপর বললুম, ইলিশ মাছ খুব বড় হয় না বটে, কিন্তু ডিম হয় অনেকখানি করে।

পারপারা কখনও ভারতে আসেননি, আসবার খুব ইচ্ছে আছে। ওঁর শুধু শখ হিমালয় পাহাড় দেখা। আমি বললুম, কলকাতায় চলে আসুন, আমি দার্জিলিং নিয়ে যাব। দার্জিলিং-এর নাম শুনেছেন?

ওরা দুজনেই বলল, দার্জিলিং তো বিশ্ববিখ্যাত জায়গা।

মাঝে মাঝে টুকটাক কবিতা সম্পর্কে আলোচনা, পরিবেশটি হল শিল্পীদের মিলনকেন্দ্র এবং নানারকম সুখাদ্য, সব মিলিয়ে দুপুরটি কাটল চমৎকার। পারপারা কারুকার্য করা খাপ সমেত একটা ছোট ছুরি দিলেন আমাকে। বললেন, আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে এই সামান্য জিনিসটি আপনাকে নিতে হবে।

আমি অভিভূত হয়ে গেলুম একেবারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়! আমার কাছে দেওয়ার মতন কিছুই ছিল না। আমি লজ্জিতভাবে সেকথা জানাতেই পারপারা বললেন, আমি যখন আপনার দেশে যাব, তখন নিশ্চয়ই কিছু নিয়ে আসব আপনার কাছ থেকে।

বিদায় নেওয়ার সময় পারপারা আনাতোলি আনতোলিয়েভিচ্ খুব আন্তরিকভাবে আমার হাতে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। ভাষার ব্যবধান থাকলেও দুজন মানুষের কাছাকাছি আসতে যে বাধা হয় না, আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে হোটেলে ফিরে দেখি সুবোধ রায় বসে আছে। সে সারগেইকে বলল, অনেক লোক অপেক্ষা করছে, সুনীলদাকে না নিয়ে গেলে চলবেই না।

আমাদের সারাদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মোটামুটি শেষ, তাই সারগেই আপত্তি জানাল না। সুবোধ সারগেইকেও নেমন্তন্ন জানাল, কিন্তু সারগেই নিজের বাড়ি ফিরে যেতে চায়। ও বেশ কয়েকদিন বাড়িছাড়া, সেইজন্য আমিও ওকে ফিরে যেতে বললুম। সরকারি গাড়িও ছেড়ে দিতে হল।

সুবোধরা থাকে বহু দূরে। দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলুম। সন্ধে প্রায় সাতটা বাজে। সন্ধে না বলে বিকেল বলাই ভালো, কারণ আকাশে যথেষ্ট আলো রয়েছে। সুবোধ জানাল যে এই সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। রাস্তায় অফিস ফেরত ভিড়।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু হেঁটে অতদূর যাওয়া যাবে না। সুবোধ বলল, মেট্রোতে যেতে আপনার আপত্তি আছে? কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যায়।

আপত্তির তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, আমি সাগ্রহে রাজি হলুম। সরকারি অতিথি হলে সবসময় গাড়ি চড়ে ঘুরতে হয়। এর আগে একদিন ক্রেমলিন থেকে ফেরার পথে শর্টকাট করার জন্য একটি মেট্রো স্টেশনে নেমে উলটো দিকের রাস্তায় উঠেছিলুম, আজ প্রথম মস্কোর মেট্রোতে চাপার সুযোগ হল।

পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের ভূ-নিম্ন ট্রেন দেখেছি আমি, মস্কোর মেট্রো আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। স্টেশনগুলির বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্য এই দুটোই একসঙ্গে বিস্মিত করে। স্টেশনগুলি নিছক ফাংকশনাল নয়, নানারকম ভাস্কর্য ও আলোর বাহার দিয়ে সাজানো। গ্রানাইট ও মার্বেল পাথরে রয়েছে শিল্পীদের হাতের স্পর্শ।

মস্কোর মেট্রো রেল তৈরি শুরু হয়েছিল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে। এখন এই শহরেই

১১৫টি স্টেশন এবং লাইন পাতা আছে ১৯৩ কিলোমিটার জুড়ে।

মেট্রো রেলে বেশ খানিকটা পথ আসবার পর আবার ওপরে উঠে সুবোধ গাড়ি জোগাড় করে ফেলল। ননী ভৌমিককে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে, তিনি বাড়িতে অপেক্ষা করছেন।

এখনকার পাঠকরা অনেকেই হয়তো ননী ভৌমিকের লেখা পড়েননি, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল দুর্ধর্ষ ছোটগল্প লেখক হিসেবে। তাঁর "ধান কানা" নামে একটি গল্পের বই পড়ে আমার ছাত্র বয়েসে মুগ্ধ হয়েছি। তারও আগে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর একটি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল। খুব বেশি লেখেননি তিনি। বহুকাল ধরেই মস্কোতে আছেন অনুবাদের কাজ নিয়ে।

ননী ভৌমিক তৈরি হয়েই ছিলেন, কিন্তু আমাদের দেখে বললেন, আপনারা এসেছেন, কিছু দিয়ে তো আতিথ্য করতেই হবে!

সুবোধ বলল, না ননীদা চলুন, অন্য অনেকে অপেক্ষা করছে। আমরা খুব দেরি করে ফেলেছি!

তবু খুব চটপট একটা করে ভদ্কা পান করা গেল। ননী ভৌমিকের ছেলে সদ্য মিলিটারি সার্ভিস শেষ করে এসেছে, আলাপ হল তার সঙ্গে। সে এখন বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান, এই ছেলেটিই একবার অল্প বয়েসে কলকাতায় এসে হারিয়ে গিয়েছিল, গল্প শুনেছি।

ননী ভৌমিককে আমি কলকাতায় দেখেছি দু-একবার, কিন্তু ভালো পরিচয় ছিল না। গাড়িতে যেতে-যেতে বললুম, আপনি দুর্দান্ত সব গল্প লিখেছেন, এখন আর লেখেন না কেন? আমাদের অনুরোধ, আবার লিখুন। উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ, আমার দ্বারা আর লেখা হবে না। আমার লেখা শেষ হয়ে গেছে!

গাড়ি যেখানে থামল, সেই পাড়ায় অনেক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পেলুম, কালো রঙের যুবক-যুবতী অনেক। কাছেই প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়। বহু দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে। কাছাকাছি অনেকগুলি হস্টেল।

সুবোধের অ্যাপার্টমেন্টে জড়ো হয়েছে অনেক বাঙালি নারী-পুরুষ। অনেকেই ছাত্রছাত্রী। সুজিত আর সংঘমিত্রার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। ওদের কেউ-কেউ এক-একটা জিনিস রান্না করে এনেছে, সব মিলিয়ে অনেক খাবার। সুবোধ সাজিয়ে রেখেছে শ্যাম্পেন ও ভদ্কার বোতল। সুবোধকে কারা যেন একটা বড় অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু আমি তা নাকচ করে দিয়েছি, আমার এইরকম ঘরোয়া আসারই পছন্দ। অবিলম্বে আড্ডা জমে গেল।

শ্যাম্পেনের গেলাস শেষ হতে না হতেই কেউ ঢেলে দিচ্ছে আবার, আমি মনে-মনে একটু ভয় পাচ্ছি। দুপুর থেকেই যথেষ্ট ভদ্কা সেবন হয়েছে, এবার হঠাৎ না জ্ঞানটা চলে যায়। কিন্তু ননী ভৌমিক আমাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন আমাকে অনুরোধ জানাল কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য। ফাঁকি দেওয়ার জন্য আমি বললুম, কোনও কবিতার বই তো সঙ্গে আনিনি! কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ল গোটা দু-এক কবিতার বই। এই সুদূর মস্কোতেও কেউ বাংলা কবিতার বই সঙ্গে করে এনেছে, এটা দেখে আমার মনটা বেশ ভিজে ভিজে হয়ে গেল।

উপস্থিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে দু-একজন বেশ ভালো গান করে। শুরু হয়ে গেল গান। প্রায় সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ এতগুলো গান লিখে গিয়েছিলেন, নইলে বাঙালি জাতটার কী অবস্থা হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আমাদের আর কোনও গানই নেই!

রাত্রি বাড়ছে আর বারবার মনে পড়ছে আমাকে কাল ভোরেই এয়ারপোর্ট ছুটতে হবে। হুস করে, যেন চোখের নিমেষে কেটে গেল দুটি সপ্তাহ। বাঙালিরা অনেকেই বলতে লাগলেন, মস্কোতে আপনি বড্ড কম দিন থাকলেন, এখানে আপনার আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাওয়া উচিত ছিল!

আমি বললুম, সে যাই হোক, শেষ সন্ধেটি আমার চমৎকার কাটল।

অনেক রাতে ট্যাক্সিতে আমায় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল সুবোধ আর কয়েকজন। জামা-

প্যান্ট না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়লুম আমি। ঠিক যেন পরের মুহূর্তেই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

না, এক মুহূর্ত নয়, এর মধ্যে রাত কেটে গেছে। হোটেলের অপারেটর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে আমার প্লেন ধরতে হবে। এই ব্যবস্থাটা কে করে গেল? নিশ্চয়ই সুবোধ। এভাবে জাগিয়ে না দিলে হয়তো আমার ঘুম ভাঙত না। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, আর মোটেই সময় নেই।

বাক্স গুছোবার কোনও ব্যাপার নেই, জামা-কাপড় যেখানে যা ছড়িয়েছিল সব দলামোচা করে ভরে দিলুম। পাশপোর্ট আর টিকিট ঠিক থাকলেই হল। এয়ারপোর্টে কি আমাকে একাই যেতে হবে?

মোজা পায়ে দিয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে শুরু করেছি, এমন সময় সারগেই এসে হাজির। ওর বাড়ি অনেক দূরে, ওকে আরও অনেক ভোরে উঠতে হয়েছে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে বেশি সময় পাওয়া গেল না। সিকিউরিটি চেকের ডাক পড়ে গেল। সারগেই-এর ধারণা ছিল ওর পরিচয়পত্র দেখালে ওকে সিকিউরিটি এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেবে, তা হলে আরও কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। কিন্তু গম্ভীর চেহারার রক্ষীরা অনুরোধ করলেও ফল হল না কিছু। সুতরাং আমাদের বিদায়পর্ব হল অতি সংক্ষিপ্ত। সারগেই আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, সুনীলজি, মনে রাখবেন আমাদের কথা, চিঠি লিখবেন, আবার কখনও এদেশে এলে ফোন করবেন...

আমি বললুম, নিশ্চয় মনে থাকবে তোমার কথা! আমাদের দেশে কখনও এলে নিশ্চয়ই খবর দিও!

তারপরেই আমি চলে গেলুম চোখের আড়ালে।

॥ উপসংহার ॥

সোভিয়েত ইউনিয়ান একটি বিরাট দেশ। কত বিরাট তার খানিকটা ভৌগোলিক আভাস দিচ্ছি। এই যুক্তরাষ্ট্রটি অস্ট্রেলিয়ার তিন গুণ, দক্ষিণ আমেরিকার চেয়ে বেশ বড়, আফ্রিকার চেয়ে কিছুটা ছোট। অর্থাৎ দেশ নয়, প্রায় মহাদেশ বলা যায়। একটি ট্রেন যদি সারাদিন দু-হাজার কিলোমিটার যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছতে ওই ট্রেনটির এক মাস সময় লাগবে। এই দেশের পশ্চিম অঞ্চলে যখন সন্ধ্যা, পূর্ব প্রান্তে তখন ভোরের আলো ফুটে ওঠে। এ দেশে নদী আছে দশ হাজার, হ্রদের সংখ্যা পাঁচশো, এর মধ্যে কাস্পিয়ান হ্রদ এমনি প্রকাণ্ড যে সেটি সমুদ্র নামেই পরিচিত। ইউরোপের সবচেয়ে বড় নদী ভোল্গা এসে পড়েছে এই কাস্পিয়ান হ্রদে। জনসংখ্যা সাড়ে ছাব্বিশ কোটি। উনআশিটি ভাষায় এখানে সাহিত্য রচিত হয়।

এই বিশাল দেশের অতি সামান্যই আমি দেখেছি। মোট চোদ্দো দিনের সফর, চারটি শহরে। তবু যতটুকু আমি দেখেছি, তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। ভ্রমণকারী হিসেবে এদেশে এসে যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তেমনই আছে প্রচুর ঐতিহ্যময় শিল্পসম্ভার। যে-কটি শহর আমি দেখেছি, তার মধ্যে একমাত্র মস্কোই খুব জনবহুল (লোকসংখ্যা বিরাশি লক্ষের বেশি) এবং সেইজন্যই বোধহয় মস্কোর অধিকাংশ অঞ্চল সেরকম কিছু সুদৃশ্য নয়। কিন্তু অন্যান্য শহরগুলি খুবই সুসজ্জিত, পথঘাট অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং নগর পরিকল্পনায় শিল্পরুচি আছে।

মস্কো থেকে প্যারিস যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে একজন ভারতীয় যুবকের আলাপ হয়। যুবকটি চার বছর পশ্চিম জার্মানি ও চোদ্দো বছর ধরে মার্কিন দেশে আছে, ভাবভঙ্গি সবই সাহেবি ধরনের। আমি সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়ান দেখে আসছি শুনে সে জিগ্যেস করল, আপনার কেমন লাগল? দেখার মতন কিছু আছে? আমি তো কয়েকবার যাব-যাব ভেবেও শেষ পর্যন্ত যাইনি!

আমি বললুম, দেখার মতন কিছু আছে কি না সেটা নির্ভর করে আপনি ঠিক কী কী দেখতে চান তার ওপরে। আমার তো বেশ ভালোই লাগল। অনেক ভুল ধারণা ভেঙে গেছে, অনেক কিছু নতুনভাবে জানলুম।

যুবকটি ফস করে বলে বসল, ওদের দেশে তো ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই।

আমি বললুম, আমি ভারতীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাকে বলে তা আমি জানি না। কারণ, ক্ষুধার্ত মানুষের কোনও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকে না। শুধু দু-বেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার চিন্তা থেকেই যারা মুক্ত হতে পারেনি, তারা কোনওরকমেই স্বাধীন নয়। সোভিয়েত দেশে আমি কোনও ক্ষুধার্ত মানুষ দেখিনি। রাস্তায়-ঘাটে আমি কোনও রুগ্‌ণ চেহারার, ছেঁড়া-খোঁড়া জামা-কাপড় পরা, ভিখিরি ধরনের মানুষ দেখিনি। লন্ডন-নিউইয়র্কে কিন্তু সেরকম লোক দেখা যায়।

যুবকটি বক্রভাবে জানাল, আপনি কি সব দেখেছেন? আপনাকে যেটুকু দেখানো হয়েছে সেটাই দেখেছেন। ওদেশের লোক কি ইচ্ছেমতন তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

আমি বললুম না, আমি সব দেখিনি। ঘুরেছি মাত্র কয়েকটি শহর। কিন্তু সেই শহরগুলিতে যখন যেখানে ইচ্ছে গেছি, কয়েক জায়গাতে একা একাও ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও একটিও সেরকম অভাবগ্রস্ত মানুষের চেহারা আমার চোখে পড়েনি। ওদেশের সবাই ইচ্ছেমতন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে কি না জানি না, কারণ আমি তাদের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখিনি। অধিকাংশ লোকই ইংরিজি জানে না, সেই জন্য রাস্তার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। তবে কোথাও কোনও বিক্ষোভের চিহ্ন আমার নজরে পড়েনি। বেশ ভালোভাবেই জীবনপ্রবাহ চলছে, এই তো মনে হল।

যুবকটি বলল, আরে মশাই, আমি নিজে না গেলেও আমার অনেক কলিগ্ সোভিয়েত রাশিয়ায় গেছে, তাদের মুখে শুনেছি, বইপত্রেও পড়েছি, ওদের দেশে কিছুই পাওয়া যায় না। ইচ্ছেমতন খাবারদাবার পাওয়া যায় না, সন্ধে কাটাবার কোনও ব্যবস্থা নেই...ওদেশে আপনার কি কিছুই খারাপ লাগেনি?

আমি মুচকি হেসে বললুম, হ্যাঁ, একটা জিনিস খুব খারাপ লেগেছে। তা হল ওদের চা। একেবারে বিস্বাদ।

আমি মুখের সামনে একটি পত্রিকা তুলে আলোচনা বন্ধ করে দিলুম। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। নানারকম প্রচার ও ভুল ধারণা মিশে রয়েছে এর মাথায়। আমার নিজেরও কিছু ভুল ধারণা ছিল।

পশ্চিমি দেশের যে-কোনও বড় শহরের সব রাস্তাই নানারকম দোকানপাটে একেবারে মোড়া থাকে। থরে-থরে সাজানো থাকে হাজার রকমের ভোগ্যপণ্য। সোভিয়েত দেশের শহরগুলিতে সেরকম দোকানের সংখ্যা কম। প্রয়োজনীয় দ্রব্য অবশ্য সবই পাওয়া যায়। কিয়েভ শহরের বাজারেও আমি ঢুকেছিলুম। প্যারিসের একটি বাজারে ঢুকে একবার আমার চোখ প্রায় কপালে ওঠার উপক্রম হয়েছিল, অন্তত তিরিশ রকমের মাংস, পঁচিশ রকমের মাছ, আর আনাজপত্তর যে কত তার ইয়ত্তা নেই। ফরাসিরা ভোজনবিলাসী, তবে সে দেশেও গরিব আছে, সেই গরিবরা নিশ্চয়ই তিরিশ রকমের মাংস আর পঁচিশ রকমের মাছ কখনও খেয়ে দেখেনি। কিয়েভের বাজারে খাবারদাবারের বৈচিত্র্য বিশেষ ছিল না। তবে ভাত, রুটি, আলু, মাছ, মাংস নিশ্চয়ই ওখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, সেজন্য সকলেরই স্বাস্থ্য ভালো। ভারতীয় হিসেবে এটাই আমার যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। কিয়েভের রাস্তায় এক ভদ্রলোকে বাজার করে ফিরছিলেন, একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা হঠাৎ সেই লোকটিকে থামিয়ে কী যেন জিগ্যেস করলেন। ভদ্রলোকটি কী যেন বলে হাত তুলে একটা দিক দেখালেন, ভদ্রমহিলা দ্রুত হেঁটে গেলেন সেদিকে। আমি সারগেই-কে জিগ্যেস করলুম, ভদ্রমহিলা কী জিগ্যেস করছিলেন? সারগেই বলল, ওই ভদ্রলোক

শশা কিনেছেন, নতুন শশা উঠেছে তো! তাই বৃদ্ধা মহিলা জিগ্যেস করলেন, কোন বাজারে শশা পাওয়া যাচ্ছে!

আমাদের দেশে শশা অবশ্য এমন কিছু লোভনীয় জিনিস নয় যে লোককে ডেকে জিগ্যেস করতে হবে, কোথায় শশা পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েত দেশে শশা নিশ্চয়ই প্রিয় খাদ্য।

সোভিয়েত দেশ সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমি। অনেক প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এবং নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেই দেশটি এখন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। আমার ধারণা, সমাজতন্ত্রই ইতিহাসের নিয়তি, পৃথিবীর যদি আয়ু থাকে, তাহলে পৃথিবীটা সেইদিকেই এগোবে। সেই সমাজতন্ত্র একটি অতবড় দেশে কীভাবে কার্যকর হয়েছে তা দেখার কৌতূহল ছিল অনেকদিন ধরেই। যেটুকু আমি দেখেছি, তাতে আমি সমালোচনার কিছু পাইনি। এ দেশে সকলেই কাজ পায়, সকলেই বাসস্থান পায়, বৃদ্ধ বয়সে অনাহারের দুশ্চিন্তা নেই, শিক্ষার সুযোগ আছে সকলের, চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না। আমাদের চোখে অত বড় একটা দেশের সরকারের পক্ষে এগুলিই তে দারুণ কৃতিত্বের ব্যাপার। রাস্তা-ঘাটে মানুষজনকে দেখে অসন্তুষ্ট, গোমড়ামুখোও মনে হয়নি। তবে সরকারের নানান কীর্তি সম্পর্কে দেশের কিছু কিছু মানুষের আপত্তি বা প্রতিবাদ তো থাকতেই পারে। তারা কীভাবে কিংবা কতদূর পর্যন্ত সেই প্রতিবাদ জানাতে পারে তা আমি জানি না।

বাইরে থেকে গিয়ে, ওদেশের সিকিউরিটি ব্যবস্থার কড়াকড়ি প্রথম প্রথম আমাদের চোখে লাগে। ওদের পুলিশের নাম মিলিশিয়া, তারা সবাই অতি গম্ভীর। প্রত্যেক হোটেলে গিয়েই পাশপোর্ট ও ভিসা ফর্ম জমা দিতে হয়, অন্যান্য দেশে এ ব্যবস্থা দেখিনি। অবশ্য, সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য নানান রকম চেষ্টা হয়েছে, একাধিকবার এই রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়েছে, সেইজন্য বাইরের শত্রুর হাত থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এঁদের তো ব্যবস্থা নিতেই হবে। শুনেছি, আগে কড়াকড়ি অনেক বেশি ছিল, এখন তা ক্রমশ শিথিল হচ্ছে, এখন পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রচুর ভ্রমণকারী আসছে।

আমাদের দেশ সম্পর্কে সোভিয়েত দেশের বুদ্ধিজীবীদের, এমনকী সাধারণ মানুষদেরও যথেষ্ট কৌতূহল ও আকর্ষণ আছে বোঝা যায়। অন্যান্য পশ্চিমি দেশগুলিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও রহস্যবাদ সম্পর্কে মাঝে মাঝে আগ্রহ জাগে বটে, কিন্তু আধুনিক ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কোনও উৎসাহ দেখা যায় না। সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথ যতখানি জনপ্রিয়, তেমন আর বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই নয়। আধুনিক সাহিত্যেরও অনুবাদ হচ্ছে। রাস্তার সাধারণ মানুষদের দেখে আমার মনে হয়েছে, যদিও ভাষার ব্যবধানের জন্য ভাব বিনিময় করা যাচ্ছে না, তবু ভারতীয় হিসেবে আমার পরিচয় পেয়ে তারা বন্ধুত্ব জানাতে চেয়েছে।

একটা দেশের শাসন ব্যবস্থাকে বদলানো মানেই সে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথাবাহিত আচার-আচরণ একেবারে মুছে ফেলা নয়। অনেকের ধারণা এই যে, বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশ সেখানকার পুরোনো সবকিছু একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গিয়ে দেখলুম, ব্যাপারটা ঠিক উলটো। ওদেশে শুধু শোষকদের চিহ্ন ও ব্যবস্থাগুলি ছাড়া পুরোনো সব কিছুকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। পুরোনো শিল্পসামগ্রী, পুরোনো রাজপ্রাসাদ, গির্জা, পুরোনো সংস্কৃতি, গান-বাজনা এসব সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের জন্য বিপুল উদ্যম নিয়োজিত। এদেশে অনেকেই এখনও বিয়ের সময় নববধূকে আগেকার দিনের মতন সাজে দেখতে ভালোবাসে। পল্লিগীতি এবং লোকনৃত্য সম্পর্কে অনেকেরই বেশ মায়া আছে। পারিবারিক বন্ধন এখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে। এদেশের গল্প-উপন্যাস পড়লে বা ফিল্ম দেখলে বোঝা যায়, মা-বাবার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি।

দু-সপ্তাহের মধ্যে একদিনও আমার খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ হয়নি। ইংরিজি ভাষার পত্রিকা পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া গেলেও চোখে পড়েনি। খবরের কাগজ থেকে দেশের একটা

দৈনন্দিন চিত্র ফুটে ওঠে। সুতরাং, ওদেশে প্রতিদিন কীরকম খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি হয় তা আমার জানা হয়নি। এত বড় দেশটায় যে ওরকম কিছুই ঘটে না, তা তো হতেই পারে না। সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠিত হয় ঠিকই, তবু জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণে কিছু-কিছু মানুষের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা দেখা দেবেই। বিলাসের পরিবেশে থেকেও যেমন কিছু-কিছু লোক সন্ন্যাসী হয়ে যায়, সেইরকম সামাজিক বৈষম্য না থাকলেও কিছু-কিছু লোক ডাকাত বা খুনি হতে পারে। চাক্ষুষ কোনও প্রমাণ না পেলেও আমার নিশ্চিত ধারণা, সোভিয়েত দেশে এরকম অপরাধের সংখ্যা কম। এটা অনুভবের ব্যাপার। পশ্চিমি দেশগুলিতে নিরাপত্তার কথা সবসময় চিন্তা করতে হয়। এখানে আমি যে ক'দিন ঘুরেছি সেরকম কোনও কথা মনে পড়েনি। এখানকার ভারতীয়দের মুখেও শুনেছি যে এখানে রাত-বিরেতে পথ চলতেও ভয়ের কিছু নেই।

এটাও অনুভব করেছি যে বিশ্বশান্তির জন্য এদেশের মানুষ সত্যিকারের আগ্রহী। যুদ্ধের আগুনে সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ হয়ে এরা যুদ্ধকে ঘৃণা করতে শিখেছে। ইউরোপ আমেরিকায় সাধারণ মানুষও নিশ্চিত যুদ্ধ চায় না। তবু মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কোটি-কোটি টাকা অনর্থক খরচ হচ্ছে। একটি সাধারণ অ্যাটম বোমা বানাতে যা খরচ তাতে তেরো লক্ষ শিশুর এক বছরের ভরণপোষণ হয়ে যায়। আমাদের মতন তৃতীয় বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় চারশো সত্তর জন মানুষ অনাহারে কিংবা অনাহারজনিত রোগে মরছে। অথচ আণবিক অস্ত্রের জন্য ওই বিপুল অর্থের অপচয়..এই কথা ভাবলেই মাথা ঘুরতে থাকে, মনে হয় কয়েকটা পাগল পৃথিবীটা ধ্বংস করতে চলেছে! তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্য যে ক'বার শীর্ষ সম্মেলন হয়েছে, তাতে সোভিয়েত দেশ বেশি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য-ছবি-ভাস্কর্য আর শিল্প সুষমামণ্ডিত নয়, এরকম ধারণা অনেকেরই আছে, আমারও ছিল। সোসালিস্ট রিয়েলিজম মানে ধরাবাঁধা একঘেয়েমি, ট্র্যাক্টর চালানো আর মেয়েরা কত দক্ষতার সঙ্গে ক্রেন তৈরি করছে কিংবা খামারে কত উৎপাদন হচ্ছে এইসব। গোড়ার দিকে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস অনেক লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সব ধারণা কবেই পালটে গেছে। জীবনেরও বহুমুখীনতা এবং মনের জটিল রহস্যকে বাদ দিলে শিল্প-সাহিত্য কিছুই হয় না! এ দেশের লেখক, শিল্পী বা নীতি-নির্ধারকরা এখন তা যথেষ্টই বোঝেন! ইউ এস এস আর-এর ১৯৮৩ সালের ইয়ার-বুকে স্পষ্ট লিখে দেওয়া হয়েছে—"Socialist realism is not a cut-and-dried recipe for artists and writers; it does not prescribe subjects or themes. It rejects neither conventions nor the grotesque, nor the use of symobolism. ...Socialist realism means a truthful depiction of reality in a concrete historical situation, in its revolutionary development. It accepts everything that is valuable in past and present world culture, and rejects everything that isolates art from life and the individual from society"

এই সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। সেই জন্যই আধুনিক অনেক সোভিয়েত লেখকের গল্প-উপন্যাস কবিতা পড়ে শিল্পের আস্বাদ পাওয়া যায়। আধুনিক ছবিতেও চোখে পড়ে অনেক পরীক্ষা। জীবনের মতন শিল্পও পরিবর্তনশীল।

সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

অজানা নিখিলে

॥ এক ॥

একদা প্যারিস ছিল বিশ্বের সমস্ত শিল্পীদের তীর্থ। একদা এবং অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলুম খানিকটা ভেবেচিন্তেই। পৃথিবীর প্রায় সবদেশেরই শিল্পীদের একমাত্র স্বপ্ন ছিল একবার প্যারিসে ঘুরে আসা। আমাদের বাংলাদেশের কোনও অখ্যাত শিল্পীও প্যারিসের রাস্তায় বসে পদ্মাপাড়ের ছবি আঁকছেন এমন কাহিনী আমরা শুনেছি। প্যারিসে নাম করেছেন এমন বন্ধু শিল্পীই অফরাসি। প্যারিসের ম'মাঁর্ত্র-এর কাফে রেস্তোরাঁয় বিখ্যাত সব শিল্পীরা এসে গুলজার করেছেন, একটি কাফের মধ্যে বদ্যার সঙ্গে দেগার ঝগড়া হয়ে গেল, পল গগ্যাঁ মত্ত অবস্থায় ঢুকে বললেন, আমি তিনদিন কিছু খাইনি, কে আমাকে খেতে দেবে দাও।—এসব আমরা কাহিনীতে পড়েছি।

রঙিন ছাতাওয়ালা খোলা হাওয়ার রেস্তোরাঁ। ম'মার্ত্রে আমি বসে আছি। এখানে ওয়াইন বা কফি বা যে-কোনও খাবারের দাম একটু বেশি। কারণ এখানে ভ্রমণকারীদের ভিড় লেগেই আছে। ভ্রমণকারীরা এখানে শিল্পীদের দেখতে আসেন। তা ছাড়া মাত্র পাঁচ ফাঁ খরচ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছবি এঁকে দেবে—এমন শিল্পীরা ঘোরাঘুরি করছে প্রচুর। সে-সব ছবি দেখলে নিজেকে চেনা যাবে নিশ্চিত। আমাকে এসে একজন শিল্পী অনুরোধ করলেন। আমি হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করতে যেতেই আমার ফরাসিভাষী সঙ্গিনী পাঁচ কথায় ধমকে শিল্পীকে বিদায় করলেন। আমার ক্ষীণ সন্দেহ বা আশা হল যে, সবকটি রূঢ় বাক্য শিল্পীটির বোধগম্য হয়নি। কারণ খুব সম্ভব সে ফরাসি নয়, আমেরিকান। সে পাশের এক আমেরিকান দম্পতির কাছে গিয়ে আবার অনুনয় করতে লাগল এবং দু'খানা ছবি আঁকার কাজও পেয়ে গেল। পৃথিবীর সব দেশেই, সবচেয়ে জাঁকজমকের পোশাকে দেখা যাবে আমেরিকান পর্যটকদের। এবং সবচেয়ে ছেঁড়াখোঁড়া মলিন পোশাকে দেখা যাবে যাদের তারাও আমেরিকান। একজন ভারত কিংবা বাংলাদেশি বিদেশে গিয়ে ভিখারি সাজে না কিন্তু বহু আমেরিকান বিদেশে গিয়ে ভিক্ষে করতে পারে।

ফরাসি উচ্চারণের নানা ধরন দেখেই আমার সঙ্গিনী বলে দিচ্ছিলেন কে কোন জাতের এবং দেখা গেল ওইসব ছুটকো শিল্পীদের মধ্যে আমেরিকানই বেশি।

এরকম অনেক শিল্পী আছেন প্যারিসে। কিন্তু না, প্যারিস আর শিল্পীদের তীর্থস্থান নেই। শিল্পীদের কেন্দ্র এখন বেশিরভাগ উচ্চাভিলাষী শিল্পীদেরই এখন স্বপ্ন, একবার নিউ ইয়র্কে যাওয়া।

কারণ ফরাসিরা ছবি তারিফ করার ব্যাপারে ঝিমিয়ে এসেছে। অনেক প্রাচীনপন্থী হয়েছে এখন। বাজে শৌখিন শিল্পীতে ভরে যাওয়ার জন্যই হয়তো, নতুন শিল্পীদের ছবির ক্রেতা নেই ফরাসি দেশে। শিল্পের দৃষ্টিতে ছবি দেখার বদলে, ছবি এখন অর্থ বিনিয়োগের উপায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ কোনও রকমে মডিসের একটা স্কেচও যদি এখন কিনে রাখা যায়, তবে পরে তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা যাবে। কিন্তু নতুন অচেনা কোনো ছোকরার ছবি কিনে, পরে সে খ্যাতিমান হলে, সেই ছবিকে কাজে লাগানোর ঝুঁকি এখন ফরাসি দেশে চট করে কেউ নিতে চায় না। আর, নবীন শিল্পীদের একমাত্র ভরসা ছবি বিক্রি। ছবি আঁকা এক হিসেবে ২৪ ঘণ্টার কাজ। যিনি সত্যিকারের ছবি আঁকতে

চান, তাঁর পক্ষে কোনও চাকরি করে ছবি আঁকা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং আঁকা ছবি যদি বিক্রি করা না যায়, তবে পাঁচ মিনিটে মুখের ছবি আঁকার অধঃপতনে জীবিকা উপার্জন করা স্বীকার করে নিতে পারে?

নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট একদল আমেরিকান শিল্পীকে ইউরোপ পাঠান। তাদের মধ্যে ছিলেন পোলোক, ডি কুনিং, ক্লাইন প্রভৃতি শিল্পী এবং কিছু কিছু অমূর্তভাবের শিল্পের উদাহরণও ছিল, এই সব শিল্পীরা ইউরোপে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এবং জানা গিয়েছিল, আমেরিকায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। নিউইয়র্কের উঁচু সমাজে হঠাৎ ছবি কেনার খুব রেওয়াজ শুরু হয়েছে। তা ছাড়া, আমেরিকানরা যেহেতু ঠিক কেউই বনেদি-বংশ নয়, সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে বড় বড় মাস্টারদের আঁকা ছবি পারিবারিক সংগ্রহে পায়নি। সুতরাং একদিকে যেমন যতই উচ্চমূল্য হোক, পিকাসো, ম্যাতিস, রেনোয়া, রুসো কেনার জন্য আমেরিকানরা উদগ্রীব, তেমনি ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির জন্য আধুনিক তরুণ শিল্পীদের ছবি কিনতে পরাঙ্মুখ নয়। এই সন্ধান নগরে-নগরে রটে যাওয়ার পর, তরুণ শিল্পীরা এখন ছুটছেন নিউইয়র্কে।

অত্যধিক আর্থিক প্রাচুর্য এবং সেই জনিত অস্বস্তি দুটোই ছবি আঁকার পক্ষে অনুকূল। প্রথমটি ছবি বিক্রির পক্ষে দ্বিতীয়টি ছবি আঁকার পক্ষে। প্যারিসের নিয়মিত প্রদর্শনীগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় সম্মিলিত প্রদর্শনী। একক প্রদর্শনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি বিখ্যাত বা মৃত শিল্পীদের। অন্যদিকে নিউইয়র্কে নিয়মিত আর্ট গ্যালারির সংখ্যা একশোর কাছাকাছি এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদেরও প্রদর্শনীর সুযোগ পাওয়া অনেক সহজ। তা ছাড়া পপ্ আরট বা বিজ্ঞানের কাগজপত্র ছিঁড়ে কোলাজ ব্যবহার করে আমেরিকানরা যে চিত্রধারা তৈরি করেছে তার জনপ্রিয়তা প্রায় পপ সঙের কাছাকাছি।

ছবির নিলামের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে, উল্লেখযোগ্য স্থান লন্ডনে। লন্ডনের নিলামে গিয়ে ছবি কেনা একটি শখে দাঁড়িয়ে গেছে। লন্ডনের বাজারে এ পর্যন্ত ছবির সর্বোচ্চ দাম ৫৬ লক্ষ ডলার পর্যন্ত উঠে একটা রেকর্ড হয়ে আছে।

প্যারিসে একজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ফরাসিদের অতি আদরের লম্বা রুটি যা গরম গরম না খেলে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট কেটে যায়, সে সম্পর্কে সে অভিযোগ করছিল। ঘর ভাড়া পাওয়া যায় না সহজে, সব খাবারেরই দাম বেশি। নিউইয়র্কে অনেক সস্তায় সুন্দরী মডেল পাওয়া যায়। রঙের দামও আমেরিকায় সস্তা। তবে, তুমি এখানে পড়ে আছো কেন?

ছেলেটা হাসল। এক মুহূর্ত থেমে বলল মায়া বলতে পারো। জানি আমেরিকায় অনেক সুযোগ বেশি। কিন্তু যখনই ভাবি এই প্যারিসের রাস্তা দিয়ে এক সময় কত মহা মহা শিল্পী হেঁটেছে এখানেই কাটিয়েছে তাদের যৌবনের দুঃখের দিনগুলি তখনই আমেরিকাকে আমার নোংরা মনে হয়। প্যারিসকে মনে হয় পবিত্র।

॥ দুই ॥

প্রথম থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল পিরামিডের ভেতরে ঢুকব। কিন্তু প্রথমদিন পিরামিড দেখতে গিয়ে হতাশ হলুম। কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। বিশালাকার জগদ্বিখ্যাত ফিংকস হোটেল থেকে বেরিয়ে বাসে চেপেই সেখানে পৌঁছনো যায় আধ ঘণ্টার মধ্যে। সেখানে পৌঁছেই আমি হতাশ হলুম, যদিও পিরামিডগুলি আসল পিরামিডই, সুউচ্চ ত্রিকোণ পাথরের ঢিবি, বহু পর্যটক ভ্রমণার্থীর ভিড় সেখানে, অনেক খাবার দাবার সঙ্গে এনেছে—পিকনিক করার জন্য; কেউ কেউ পিরামিডের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। প্রচুর ক্যামেরা ও ট্রানজিস্টার—অনেকটা মেলার মতন আবহাওয়া। সন্ধেবেলা এখন দিল্লির লালকেল্লায় যেমন দেখানো হয়—সেই সঁএ লুকিয়ে

হল সবই ঠিক, তবু আমি মনমরা হয়েছিলুম, ওখানকার কোনও পিরামিডের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, ছাদ ধসে পড়ে দুর্ঘটনার ভয়ে সবক'টির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক ঘোড়া ও উটের সমাবেশ ওখানে—সহিসরা এসে টানাটানি করছে সেগুলো ভাড়া নেবার জন্য, ওদের মুখে ভাঙা ইংরেজি—ওয়ান আওয়ার ট্রিপ, কাম কান মিস্টার ফিফ্‌টি পিয়াসতা। গিভ থারটি পিয়াসতা! থারটি ফাইভ? নো? সামনে বালুকাময় প্রান্তরে উটের পিঠে চেপে একটুখানি মরুভূমি ভ্রমণের স্বাদ পাবার জন্য অনেকে ভাড়াও নিচ্ছে। শুনতে পেলাম ওখান থেকে দশ-বারো মাইল দূরে মেমফিসে কয়েকটা পিরামিড আছে—সেগুলোর মধ্যে ঢোকা যায়—উটের পিঠে সেখানে যেতে হবে।

মনে-মনে ঠিক করে ফেললুম। সেদিন নয়, তার দু'দিন পর ওখানে ফিরে এসে একটা উট ভাড়া নিয়ে একা বেরিয়ে পড়লুম মেমফিসের উদ্দেশ্যে।

আঃ কী ভালো লেগেছিল সেই সকালবেলা। খালি একটু আফশোস হচ্ছিল—চেনাশুনো কেউ আমাকে এ অবস্থায় দেখল না। নিজেকে মনে হচ্ছে খাঁটি অভিযাত্রী একজন, আমার পরনে জিনের প্যান্ট, গায়ে লাল ছাপ-ছাপ জামা, রোদ ঢাকার জন্য একটা টুপিও পরেছি। গলায় ঝোলানো ওয়াটার বটল, চোখে রোদ চশমা। আমি আমেরিকান উট মার্কা সিগারেট খাচ্ছি। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'—তখন তো আমি সত্যিই আরব বেদুইন! বাংলা দেশে—শুধুমাত্র আমার বাবা-মায়ের ধারণা—আমার গায়ের রং 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ' কিন্তু বন্ধুবান্ধব বা মেয়েদের চোখে আমি ছাতার মতন কালো, অথচ এক জার্মান মহিলা আমাকে দেখে বলেছিলেন—আমাকে নাকি আরবদের মতন দেখতে—আমার শরীর কত না সূর্যের আলো শুষেছে। বারবার সেই কথা মনে হতে লাগল, এ জন্মে না হোক—গত জন্মে আমি নিশ্চিত আরব ছিলুম।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে রোদ চিড়চিড় করতে লাগল, আগস্ট মাসের গরমে ইজিপটে ইওরোপ-আমেরিকার টুরিস্টরা সাধারণত আসে না সুতরাং পুরো মাত্রায় আমি একা। উটের পিঠে ভ্রমণ করতে বেশ আরাম লাগে বটে—কিন্তু পরদিন শরীরের সবচেয়ে নরম স্থান দুটিতে এমন ব্যথা হয় যে মনে হয় যে সারারাত্রি বিছানায় শোবার বদলে দাঁড়িয়ে থাকি। ক্রমে মেমফিসের চত্বরে এসে পৌঁছলুম। পাথর ও বালুকাময় প্রান্তরে ছড়ানো কয়েকটি পিড়ামিড—অসংখ্য ভাঙা মূর্তি ও স্তম্ভ—একটি পিরামিড দেখা মাত্র চিনতে পারলুম—বহু ছবিতে দেখেছি সেটার নাম স্টেপ পিরামিড—ওর গা'টা মসৃণ নয়, সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে উঠে গেছে—এটাই মিশরের প্রাচীনতম পিরামিড—বয়েস পাঁচ হাজার বছর। একদা এখানেই ছিল মিশরের রাজধানী, আর্য সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন এক সভ্যতার একদা লীলাভূমিতে আমি এসে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু দাঁড়িয়েছি দর্শক হিসেবে আমি একা। এখানে আর কেউ আসেনি, যত দূর দেখা যায় শুধু বালি আর সভ্যতার পাথুরে কঙ্কাল—মাঝে-মাঝে একটু জোর বাতাসের সাঁসাঁ শব্দ! উট থেকে নামিয়ে সহিস আমাকে বলল, কাম কাম। খানিকটা পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে উঠেই দেখা গেল সরকারি নোটিশ ও একটা কুঁড়েঘর। নোটিশের মর্মার্থ—এখানে ঘুরতে গেলে সঙ্গে গাইড নিয়ে ঘুরতে হবে। আমার সহিসের নাম রফিক—বেশ হাসিখুশি এক তরুণ, সে আঙুল দেখিয়ে আমায় বলল, সি! দেখলাম এক বিশালকায় পুরুষ মাটিতে উবু হয়ে নামাজ পড়ছে। তার পাশে একটা শাবল পড়ে আছে, আর একটি তিন-চার বছরের ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে বালি নিয়ে খেলা করছে।

হঠাৎ কোথা থেকে বিষম ভয় আমাকে পেয়ে বসল। জানি না সবারই এরকম হয় কি না, কিন্তু আমার অন্তত বিদেশের কোথাও হঠাৎ খুব ফাঁকা কোনও জায়গায় পৌঁছলেই কী রকম যেন ভয় ধরে। তা ছাড়া আমি ভাবলুম এ জায়গাটা ঘুরে দেখতে আমার অন্তত তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা সময় লাগবে—অতক্ষণ আমাকে নিয়ে একা-একা ঘোরাবার পর—গাইড যদি শেষে অসম্ভব বেশি

টাকা চায়? অন্যদিক দিয়ে—মোটরেও এখানে আসার রাস্তা আছে, ভেবেছিলাম আরও অনেক টুরিস্ট নিশ্চিত আসবে—সকলে একসঙ্গে দেখব। আজ শুধু আমিই একমাত্র দর্শক। আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবার দরকারই বা কি, ওই তো শাবল পড়ে আছে, নামাজ সেরে উঠে ওই জোয়ান লোকটা যদি শাবলের এক ঘা আমার মাথায় মারে—তাহলেই আমার শেষ, তারপর গাইড ও সহিস দুজনে মিলে আমার পকেটের সব কিছু ভাগাভাগি করে নিয়ে—ওই শাবল দিয়েই বালির যেকোনও জায়গায় গর্ত খুঁড়ে আমাকে যদি কবর দেয়—তা হলে ভূ-ভারতে কারুর জানার উপায় নেই। কিংবা যে কোনও একটা পিরামিডের ভেতরেও আমার মৃতদেহটা দুমড়ে কুঁকড়ে রেখে দিতে পারে। হয়তো কুড়ি কি পঞ্চাশ বছর বাদে কেউ আমার দেহটা আবিষ্কার করে ভাববে—আর একটা পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো মমি, আমাকে নিয়ে আবার নতুন করে গবেষণা শুরু হবে।

এই কথাটা ভাবামাত্র আমি হেসে ফেললাম। এখন মুখটা হাসি-হাসি রাখা দরকার, ওদের কাছে আমার ভয় পাওয়া মুখ মোটেও দেখানো চলবে না। গাইডের তখনও নামাজ পড়া শেষ হয়নি। শাবলের ফলাটা কী চকচকে। এশিয়া মাইনর সম্পর্কে একটা ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলুম এক জোড়া জুতো পাবার লোভেও কুবদ্রা মানুষ খুন করে। আমার তো জুতো জামা-কাপড় রোদ-চশমা, ফ্লাস্ক, পকেটে বেশ কিছু ইজিপসিয়ান পাউন্ডও রয়েছে। ওসব কথা মন থেকে তাড়িয়ে আমি নাচের ভঙ্গিতে পা দোলাতে-দোলাতে দুঃসাহসী যুবার মতন শিস দিয়ে ইংরেজি গানের সুর ভাঁজতে লাগলুম। আমায় দেখলেই বুঝতে পারত, আসলে তখন আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছি। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি।

বাচ্চা ছেলেটা আমার শিস শুনে খলখল করে হেসে উঠল। তাকে দেখে হঠাৎ আমার বুদ্ধি এল। এই বাচ্চা ছেলেটাই আমায় বাঁচাতে পারে। আমি ওকে দেখিয়ে সহিসকে বললুম লাভলি চাইল্ড। ভেরি সুইট লুকিং। সহিস একগাল হেসে বলল, ইয়েস হিজ নেম বাকু।

আমি সোল্লাসে বললুম বাকু? হোয়াট এ সুইট নেম? নীচু হয়ে আমি ঝপ করে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলুম। ওর চুলে হাত বুলিয়ে নাচতে-নাচতে বললুম, বাকু ডার্লিং, উম উম, কী সুন্দর ছেলেটা, কাঁদিস না বাবা, আল্লার দোহাই এখন কাঁদিস না, বাঃ বাঃ প্রিটি চাইল্ড, আই লাভ ইউ।

ছেলেটা কাঁদল না, মজা পাচ্ছিল বেশ, আমি ওকে নিয়ে খেলা করতে লাগলুম, সুড়সুড় দিয়ে হাসালুম। এমনকি ওর ধুলোমাখা গালে ফটাফট করে কয়েকটা চুমুও খেলাম! আমার একমাত্র আশা, ছেলেটাকে আদর করছি দেখে ওর বাবা যদি আমায় শাবল না মারে। খুনিরও তো পিতৃস্নেহ থাকে।

নামাজ পড়া শেষ করে গাইড আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ছিল। তারপর কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এলো, শাবলটা এক হাতে তুলে নিয়ে বলল কাম স্যার। পিরামিড ইনসাইড অর আউট সাইড।

মাথার ওপরে গনগনে ইজিপসিয়ান সূর্য বালিতে চোখ ধাঁধানো আলো, লোকটির হাতে লণ্ঠন তখন আমার একমাত্র ইচ্ছে বেঁচে ফিরে আসা, কোনও রকমে পালানো, পিরামিডের ভেতরটা কীরকম জানি না যদি সেখানটাই খুনের প্রশস্ত স্থান হয়? একবার ইচ্ছে হল, ভেতরে ঢুকব না বলি। কিন্তু তাহলে সহিসটা অবাক হয়ে যাবে, বুঝবে ভয় পেয়েছি। সুতরাং বেপরোয়াভাবে বললুম, ইনসাইড।

লোকটি বলল, ইনসাইড ভেরি ডার্ক। কাম।

শুনেছিলাম মিশরের প্রাচীন লিপি হিয়েরোগ্রাফিকসে কোনও স্বরবর্ণ নেই, তেমনই লক্ষ করলুম, মিশরি লোকদের ইংরেজিতে প্রায় কোনও ক্রিয়াপদ থাকে না এক ওই কাম ছাড়া। শুকনো মুখে প্রাণ হাতে করে তার সঙ্গে চললুম, সহিস ওখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

স্টেপ পিরামিডের ভেতরে ঢোকা যাবে না—ওটা এত প্রাচীন যে ঢোকা নিরাপদ নয়। একটা ছোট নতুন পিরামিড—এই হাজার তিনেক বছর বয়স—সেটার মধ্যে ঢুকতে বলল গাইড।

ভেবেছিলাম পিরামিডের গায়েই কোনও দরজা থাকবে—সেখান থেকে টুপ করে ঢুকে এক পলক দেখেই বেরিয়ে আসব। কিন্তু পিরামিডটা থেকে বেশ কিছুটা দূরে—প্রায় পঞ্চাশ ফুট—থেমে গিয়ে গাইড বলল, হিয়ার। কেয়ারফুল। হ্যানডস লাইক দিস—ওয়াল। কেয়ারফুল!

একটা গর্ত মাটির নীচে সুড়ঙ্গের মতন নেমে গেছে। অন্ধকার এবং ঢালু। মাথা নীচু করে, দু-হাত দু-পাশের দেয়ালে ভর দিয়ে পা টিপে-টিপে নামতে হবে, একটু হাত আলগা হলেই গড়িয়ে নীচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, না এলেই ভালো হত। সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—সেই শাবল হাতে গাইড। জানি না, নীচে নেমে আমার ভাগ্যে কী আছে।

নীচে নেমে কী দেখলুম, তা বর্ণনা করার জায়গা এখানে নেই। আর একটি পৃথক রচনা দরকার। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট, মাটির ওপরে যে বিশাল ত্রিভুজ—সেটা পিরামিডের অকিঞ্চিৎকর অংশ, নিছক মাথার টুপিও বলা যায়। পিরামিডের আসল অংশ মাটির নীচে সেখানে নানান ছোট ছোট ঘর, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আঁকা অসংখ্য ছবি—সেইসব ছবিতে অনেক গল্প, আর পড়ে আছে কারুকার্য করা কিছু শূন্য কফিন—ভেতরের সব মমি পাচার হয়ে গেছে। এক সময় এই সব পিরামিডের অন্দর ভরা ছিল খাঁটি সোনার আসবাব ও মূর্তিতে—তার অনেক চুরি হয়ে গেছে, কিছু দেখেছি কায়রো মিউজিয়ামে। আর একটা পাশের কবরের ভেতরে নেমেছিলাম—সেটায় নামার পথ একটা সোজাসুজি গভীর কুয়োর মধ্যে দিয়ে, আগে সেই কুয়োতে পাথরের সিঁড়ি ছিল, এখন মিশর সরকার লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বসিয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে নামছি তো নামছিই—নিজের হাত দেখা যায় না এমন অন্ধকার। একটু বাদেই মাথা ঘুরে যায়।

সেই গাইডটির মতন সরল ও নিষ্পাপ মানুষ আমি জগৎ সংসারে খুবই কম দেখেছি। আমি ভয় পাচ্ছিলুম, সে হয়তো আমাকে খুন করবে। বস্তুত অতবড় বিশাল চেহারায় আমি একটা নেহাৎ শিশু। অন্য যে কোনও জায়গার গাইডরা খুনি না হোক রক্তশোষক—টাকা নিয়ে এমন ঝোলোঝুলি করে। এই গাইডটি নিতান্তই লাজুক—টাকাকড়ির কথা মুখ ফুটে বলতেই চায় না। তার ধারণা, কত দূর দেশ থেকে লোকেরা এই যে এইসব পাথরের স্তূপ দেখতে আসে—এতে যে তাদের অত কষ্ট হয়—সেসব যেন তারই লজ্জা। ঘোরানো সিঁড়ির কবরখানায় নামার পর আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, আমি অবসন্নভাবে সেই অন্ধকার ভূগর্ভে বসে পড়েছিলাম—ভাবছিলাম—অতগুলো সিঁড়ি বেয়ে আর আমার দ্বারা ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। সে তখন তার বিশাল কাঁধ আমার হাতের তলায় দিয়ে একপ্রকার বহন করেই সেই কয়েকশো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। তারপর আমাকে ওর কুঁড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে লেবু—চা তৈরি করে খাওয়াল। জীবনে সেই একবারই চা-কে মনে হয়েছিল মৃতসঞ্জীবনী।

সরকারি বাঁধা রেট অনুযায়ী ওর ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেবার পর, আমি ওকে চায়ের দাম দিতে চাইলুম। ও লজ্জিত নারীর মতন হাত নেড়ে বলতে লাগল, কিছুতেই চায়ের দাম নেবে না। লোকটি দরিদ্র, তা ছাড়া সেই মরুভূমির মাঝখানে চায়ের যথেষ্ট দাম—সুতরাং আমি ওকে দাম দেবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগলুম। ও তখন ছাপানো চায়ের কাগজটা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, সি, টি ফ্রম ইয়োর কান্ট্রি! ইউ মানি? নো, নো, নো।

॥ তিন ॥

অনেকের ধারণা সাহেব-মেমরা খুব সৎ ও সত্যবাদী। বড়-বড় ডাকাত হয় বটে, কিন্তু—জোচ্চুরি করে না। লোককে ঠকায় না। জিনিসপত্র কেনার সময় দরদাম করে না। অন্তত আমার এই রকমই ধারণা ছিল। এবং এখনও আছে। কিন্তু এই ধারণাটা আমার দৃঢ় হয়েছে সাহেব-মেমদের মধ্যে কিছু

কিছু সত্যিকারের বদমাস-জোচ্চোর দেখার পর। ওই সব বদমাস-জোচ্চোরদের দেখার পর যে ক'জন সত্যিকারের মহৎ নারীপুরুষকে দেখেছি তাদের চরিত্রবলের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

যাই হোক, আপাতত নিউইয়র্কের একটি রাস্তার কথা বলা যাক। কুখ্যাত ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিট, আমেরিকার প্রায় সকলেই এই রাস্তার কথা জানে, কিন্তু বিদেশিদের পক্ষে একটি মৃত্যু-ফাঁদ।

সব বড় শহরেই কিছু-কিছু জোচ্চোর দোকানদার দেখেছি। কিন্তু নিউইয়র্কের ৪২ নং রাস্তার দোকানগুলির মতো এমন ভয়াবহ দোকানের সারি আর কোথাও বোধ হয় নেই।

আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দরাদরি হয় শুনে—অনেক সাহেব-মেমকে হাসাহাসি করতে শুনেছি। সুতরাং আমার ধারণা ছিল, আমেরিকায় কোনও জিনিসের দরাদরি হয় না। সত্যিই হয় না। কিন্তু ওই এক ৪২ নং রাস্তায় ছাড়া। কিন্তু নতুন লোকের পক্ষে তো জানা সম্ভব নয়, ও রাস্তার প্রত্যেকটি দোকানের কাছেই যে চুম্বক আটকানো আছে, একবার না ঢুকে উপায় নেই।

প্রত্যেকটি দোকানের বাইরে বিরাট বিরাট অক্ষরে লেখা আছে সেল। সেল। কোথাও লেখা ৫০ পারসেনট শস্তা, কোথাও লেখা দোকানের সব জিনিস আজই বিক্রি হবে ইত্যাদি। শো-কেসে এক একটা চমৎকার দ্রব্যের গায়ে অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা দাম লেখা আছে। পরে শুনলাম—সারা বছরই ওরকম 'সেল' লাগানো থাকে সব দোকানে।

আমি ঢুকেছিলাম নিতান্ত হঠকারীর মতোই। কোনও কিছু কেনার দরকার ছিল না। তবু হঠাৎ মনে হল, একটা সিগারেট ধরাবার লাইটার কিনতে হবে। কী অন্যায় ইচ্ছে! সারা আমেরিকায় দেশলাই পাওয়া যায় বিনামূল্যে—কত সুন্দর-সুন্দর রকমারি দেশলাই, যে কোনও দোকানে বা ব্যাংকে ঢুকে যে ক'টা ইচ্ছে তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু এই বিনা পয়সায় বলেই হয়তো প্রায়ই পকেটে থাকে না। মাঝরাত্রে উঠে জানালা দিয়ে বরফ পড়া দেখবো—কিন্তু সব আনন্দটাই মাটি, সিগারেট ধরাবার দেশলাই নেই।

ঢোকামাত্র দোকানদার আমাকে লুফে নিল।

আসুন আসুন। লাইটার চাই? এই যে—। দশ-পনেরোটা লাইটার ফেলে দিল টেবিলে। আমি বাছাবাছি করছি—আর চোখ বোলাচ্ছি সারা দোকানে। ছোট দোকানঘর হাজার রকম জিনিসে ঠাসা। যে ছেলেটি আমায় অ্যাটেন্ড করছিল, তার বয়েস ২০-২১, অত্যন্ত সুন্দর, সরল দেখতে ছেলেটিকে। জিগ্যেস করল, আপনি বুঝি সাউথ আমেরিকা থেকে আসছেন?

—না।

—তবে?

—ভারতবর্ষ।

—ও, ইন্ডিয়া? নমস্তে, নমস্তে।

আমি অবাক। ছেলেটি হেসে বলল, আমাদের দোকানে অনেক ভারতীয় আসে। ভারতীয়রা খুব দরাদরি করতে ভালোবাসে, নিন আপনাকে দরাদরি করতে হবে না। এইটা দশ ডলার দাম, আপনাকে আট ডলারে দিলাম।

আট ডলার? না, না। অসম্ভব। আমাকে একটা শস্তা দামের দাও, ওই কালো রঙেরটা কত?

কালোটা? ওটা আপনাকে মানাবে না। ওসব লাইটার গ্যাংসটাররা ব্যবহার করে। এই যে দেখুন, এইভাবে ঝুঁকে—টুপিতে মুখ ঢেকে গ্যাংসটাররা টস্ করে আওয়াজ করে এ সব লাইটার জ্বালে। এসব কি আপনাকে মানায়? আপনি নিন ওই রূপোলিটা, কী চমৎকার। আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি খুব শিক্ষিত লোক, প্রফেসার নিশ্চয়ই? হ্যাঁ, প্রফেসার, আমি বলছি, আপনি এইটাই নিন।

তোষামোদের গুণ এই যে বুঝতে পারলেও ভালো লাগে। লোকটা আমাকে প্রফেসার বলায়

আমি আর প্রতিবাদ করতে পারলুম না। মনে পড়ল, একবার রাণাঘাট স্টেশনে একটি কুলি শ্রেণির লোক—আমাকে একটা ইংরেজিতে লেখা ঠিকানা পড়তে দিয়েছিল। আমি হাতের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করছি। হঠাৎ লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, থাক-থাক। আমি অন্য লোককে দিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছি।

সুতরাং অকস্মাৎ এখানে প্রফেসারের সম্মান পাওয়াতে আমি আর ভাবলুম না। লাইটারটা নিয়েই নিলাম। তখন ছেলেটি বলল, প্রফেসার আপনার কলম চাই না? আপনার কত লেখার কাজ—ওটা কি একটা বিশ্রী কলম আপনার পকেটে?

—নাঃ যে কোনও কলমেই কাজ চলে যায়।

—তা কি হয়? একবার দেখুন, লিখে দেখুন না। আচ্ছা এ কলমটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম।

শুধু-শুধু উপহার নেব কেন? আমাকে কলমটার দাম দিতে হল। এবার আর আমার পয়সা নেই। সুতরাং এবার আমি নির্ভয়ে কয়েকটা জিনিসের দরদাম করতে লাগলাম। এই ক্যামেরাটা কত? তিনশো ডলার? নাঃ—আমি একটা একশো ডলারের মধ্যে খুঁজছি। ওই বাইনোকুলারটা তিরিশ ডলার? থাক।

ঘুরে-ঘুরে দেখছি, ছেলেটি আমাকে সব কিছু দেখাচ্ছে। দোকানে আর লোক নেই। অন্য কর্মচারীরাও আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকেরই কী বিনয়। কী ভদ্রতা। প্রতি কথায় স্যার আর প্রফেসার যোগ করা। সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাদের ধন-দৌলত সম্পর্কে মন্তব্য। আমার এমন একটা ভাব হল যেন এরা আমার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, আমি যা-যা হুকুম করবো, তাই পালন করবে। হঠাৎ আয়নায় দেখি, আমার মুখ। না মুখ নয়-মুখের ভঙ্গি থিয়েটারের রাজা-মহারাজার মতোই হয়ে উঠেছে। বুঝলাম এবার বিদায় নিতে হবে। বেরুতে যাচ্ছি। ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, টেপ রেকর্ডারটা আপনার পছন্দ হয়েছিল, শুধু দামের জন্যই নিলেন না? অন্য জায়গায় ঠকবেন। একশো ডলারে কেউ ভালো টেপ রেকর্ডার দিতেই পারে না। আপনার যখন পছন্দ হয়েছে। আপনি ওটাই নিয়ে যান। একশো ডলারেই নিয়ে যান।

পাশ থেকে আর একজন কর্মচারী বলে উঠলো। তুমি পাগল হয়েছো জিমা। একশো ডলারে কী করে দেবে।

ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, দিয়ে দাও, প্রফেসার যখন পছন্দ করেছেন।

—অসম্ভব। একশো ডলারে—

না হয় লোকসানই করবো, তবু একজন মান্যগণ্য লোক ফিরে যাবেন—

তখন ওরা দু'জনে ঝগড়া শুরু করে দিল।

আমি হা-হা করে উঠে বললাম না, না, আমি এখন কিনবো না। পরে কিনবো, থাক না।

সেই ছেলেটি রাগত মুখে বলল, না আপনি নিয়ে যান। এ দোকানে আমার চতুর্থাংশ শেয়ার। আমারও একটা কথার দাম আছে। আপনি নিয়ে যান।

—না ভাই, কী করে নেবো, আমার যে সঙ্গে টাকাই নেই।

—না থাক। আপনি চেক লিখে দিন।

—কিন্তু আমার এখন কেনার ইচ্ছে নেই।

ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলল, আপনার জন্য আমি ঝগড়া করলাম, আর এখন আমি—

আমি বিষম অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম। শেষ পর্যন্ত সবই নিতে হল—টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা বাইনোকুলার সবই—এবং এসব ভরে নেবার জন্য একটা সুটকেশ পর্যন্ত। হাতে টাকা গুণে দিতে মায়া লাগে—কিন্তু চেক লেখার মধ্যে কোনও মায়া নেই, বিশেষত যে নতুন চেক বই পেয়েছে।

আমার কাছে চেকে কুড়ি লেখা আর দুশো লেখা একই।

যে বন্ধুর বাড়িতে থাকি, তাকে সব জিনিসগুলো দেখালাম ফিরে এসে। অ্যালেন গিনসবার্গ বলল, কী সর্বনাশ, ৪২ নম্বর রাস্তা থেকে কেনোনি তো?

—হ্যাঁ, কেন?

—ডুবিয়েছো। তোমার সেল ট্যাক্স বাঁচাবার নাম করে ওরা ক্যাশমেমো দেয়নি নিশ্চই?

—না।

তোমাকে শস্তায় দেবার জন্য একজন কর্মচারী আর একজন কর্মচারীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল?

—হ্যাঁ, কিন্তু—

—বুঝেছি। গরীবের ছেলে বিদেশে এসে ডুবলে! সুটকেশ-ভর্তি কতকগুলো মাংস এনেছো। ওগুলো সব ঝুটো, সেকেন্ড হ্যান্ড, রং করা। বাজে। ছি ছি তুমি যে এরকম বোকামি করবে...আমার উচিত ছিল আগেই তোমাকে সাবধান করা—

আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলুম। তারপর আবার গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, যাক ভালোই হল এক হিসেবে। মায়া কেটে গেল। এসব জিনিস কেনার আমার কোনই ইচ্ছে ছিল না। শুধু একটু লোভ হয়েছিল হঠাৎ। এখন লোভ কেটে গেছে। কয়েকটা কাগজের টাকা মাত্র দন্ড গেল, কিন্তু এগুলো আমি দেশে নিয়ে যাব না। কিছুই নিয়ে যাব না।

॥ চার ॥

স্টকহল্‌ম থেকে ট্রেনে ওঠার সময় আমাদের কামরা ছিল ভরতি। আমি দূরপাল্লার যাত্রী, অন্য যাত্রী-যাত্রীনীরা কেউ-কেউ মাঝ পথে উঠছে নামছে। এক সময় কামরাটা ফাঁকা হয়ে গেল, আমি হাত-পা ছড়িয়ে বসলুম। নরওয়ে পৌঁছতে আমার বেশ রাত হয়ে যাবে।

নির্জন কামরা আমার খুব পছন্দ। বিদেশ বিভূঁই-এ অচেনা যাত্রীদের সঙ্গে খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতেই হয়। একলা যাত্রার সময় শরীরটা হালকা হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী স্টেশানেই একজন যুবতী ও একজন যুবক উঠল। এরা কেউ কারুর চেনা নয়। যুবতীটির সঙ্গে একটা ছোট্ট ঝোলা, আর যুবকটির হাতে বই।

যুবতীটি খুব সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের সমান লম্বা, কিংবা, এতটা না হলেও, আমার চেয়ে যে মাথায় উঁচু, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তার গায়ের জামাটা টকটকে লাল রঙের, মুখখানা খুব সারল্য মাখা।

সুইডেনে রোদ খুব কম ওঠে বলে এখানকার মেয়েরা অন্যান্য মেম-সাহেবদের চেয়েও ফর্সা। অনেকেরই মাথার চুল একেবারে সোনালি, কারুর-কারুর লালচে। চোখের মণি নীল। সব মিলিয়ে ঠিক যেন মানুষ বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে বেড়াতে এসেছে।

যুবকটির গায়ের রং কিন্তু হলদে ধরনের, মাথার চুল কালো। সে ইটালিয়ান বা গ্রিক হতে পারে। চেহারা দেখেই কোন দেশের মানুষ, তা চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বসার পরেই যুবকটি চোখের সামনে একটা বই মেলে ধরল। যেন সে এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চায় না। মেয়েটি ধরাল একটা লম্বা, কালো রঙের সিগারেট, তার ধোঁয়ায় সুমিষ্ট গন্ধ। এটা ধূমপায়ীদের কামরা, সেই জন্যই সে এখানে উঠেছে।

মেয়েটি আমার দিকে দু-একবার চকিতে চেয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমার স্পষ্ট বিদেশি চেহারা দেখে তার একটু কৌতূহল হবেই। সে নিজে থেকে আমার সঙ্গে কোনও কথা না বললে অযাচিতভাবে কোনও বিদেশিনীর সঙ্গে আলাপ করার সাহস আমার নেই। আমি আবার মনে-মনে

অনুমানের খেলা শুরু করলুম। এই মেয়েটির পরিচয় কী হতে পারে? সে কি নর্তকী? তার হাতের আঙুলগুলি লীলায়িত। দু-হাতে চার পাঁচটা আংটি। সে নর্তকী হলে যুগ্ম নাচের সময় তার পক্ষে সঙ্গী পাওয়া মুশকিল। মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা ছোট হলে চোখে লাগে। নর্তকী যদি না হয়, তবে এ মেয়েটি হয়তো টেনিস খেলোয়াড়। টেনিস খেলায় সুইডিশ ছেলে-মেয়েরা জগৎ বিখ্যাত।

কিন্তু খেলোয়াড় মেয়ে হলে কি এত সিগারেট খাবে? একটি সিগারেট শেষ করেই সে আর একটা ধরাচ্ছে।

যুবকটির বয়স বাইশ তেইশ। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে সে একবারও চোখ তোলেনি। সে কি কোনও লেখক? তার এলোমেলো চুল ও মুখের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে সে খানিকটা বাউন্ডুলেপনার ভাব আছে। লেখক কিংবা পর্যটক।

জানালার বাইরের দৃশ্য প্রায় একই রকম।

ঘন ঝাউ গাছের সারি, জঙ্গল অথবা জলাভূমি। সুইডেন দ্বীপময় দেশ। চাষের জমি কিংবা লোক বসতি খুবই কম দেখা যায়।

মাঝে-মাঝে দু-একটি ছোটখাটো স্টেশান।

সেই স্টেশানগুলোর চেহারা অনেকটা আমাদের দেশেরই মতন। তবে মানুষজন খুব কম। দশ-বারো জনের বেশি মানুষ ওঠানামা করে না।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। বাইরে আর দেখবার কিছু নেই। কামরার মধ্যে তাকাতেই চোখাচোখি হল মেয়েটির সঙ্গে।

এর সঙ্গে ভাব হলে বেশ হত। কিন্তু আলাপ শুরু করি কী করে?

একটু পরে অন্য একটি কামরা থেকে একজন লোক এদিক দিয়ে যেতে-যেতে মেয়েটিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সুইডিশ ভাষায় বিস্ময়ের সঙ্গে কী যেন বলল।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েই লোকটিকে জড়িয়ে ধরে তার দু'গালে তিনবার চুমু দিল। তারপর কলকল করে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে-বলতে তারা দু'জনেই চলে গেল এ কামরা ছেড়ে।

এই সব কথাবার্তায় আমার পাশের ছেলেটি প্রথম চোখ তুলল। মেয়েটি আর ফিরে এল না। পাশের ছেলেটি চেয়ে রইল আমার দিকে এক দৃষ্টিতে। ভুরু যে কুঁচকে গেছে তার। সে আমাকে কিছু একটা সন্দেহ করেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে ভাব করার ভঙ্গিতে হাসলুম।

সে জিগ্যেস করল, ইরানিয়ান?

আমার সঙ্গে ইরানিদের চেহারার কিছুমাত্র মিল আছে এমন তো মনে হয় না। আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলে ঘোরার সময় কেউ-কেউ আমাকে মেক্সিক্যান বলে ভুল করত।

ওখানকার মিশ্র আদিবাসীদের গায়ের রং অনেকটা আমাদের মতন।

আমি তাকে মাথা নেড়ে বললুম, না, আমি ইরানিয়ান নই। সে আবার জিগ্যেস করল, ইজিপশিয়ান?

—না। আমি ভারতীয়।

সে গভীর বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সুইডেন থেকে নরওয়ে যাওয়ার ট্রেনে কোনও ভারতীয় উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব।

তারপরই সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে, ইনডিয়ান। গুড! গুড। গুড পিপ্‌ল। সে একটা সিগারেট প্যাকেট বার করে জোর করে আমার হাতে গুঁজে দিল। তার ইংরিজি বেশ দুর্বল। চিন্তা করে তাকে শব্দ খুঁজতে হয়। বিদেশে আমার চেয়েও যে ইংরিজি কম জানে, তার সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ আরাম হয়।

সে বলল, আমি ইরাক থেকে আসছি...ইরাক আমার দেশ! তুমি বাগদাদের নাম শুনেছ?

আমি বললুম নিশ্চয়ই। বাগদাদের নাম কে না শুনেছে? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর।

সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ভালো দেশ।

সুইডেন ভালো না! খুব পচা জায়গা। আমার সুইডেন ভালো লাগে না। সুইডিশ মেয়েরা খুব পাজি।

এবার আমার অবাক হবার পালা। অতিশয় দুর্মুখের পক্ষেও সুইডেনকে খারাপ দেশ বলা সম্ভব নয়। প্রকৃতি এখানে চোখ জুড়িয়ে দেয়। মানুষজন বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে। সুইডেনের কোথাও আমার একটিও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়নি।

আর সুইডেনের মেয়েরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের মধ্যে হলিউডের গ্রেটা গার্বো থেকে ইন গ্রিড বার্গমান পর্যন্ত কত নায়িকা সুইডেনের। স্টকহল্মের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যদি একশোটি মেয়েকে দেখা যায়, তাদের মধ্যে অন্তত সত্তরজনই চোখ জুড়িয়ে দেয়।

সেই সুইডেন এবং তার মেয়েদের নিন্দে করছে এই ইরাকি যুবকটি।

সে আবার বলল, ওই যে মেয়েটি এতক্ষণ বসে ছিল, কী বিচ্ছিরি দেখতে না? খেজুর গাছের মতন।

তার সঙ্গে আমার কোনপ্রকার মতের মিল না হলেও আমি প্রতিবাদ করলুম না। বরং জিগ্যেস করলুম, তুমি কি এদেশে বেড়াতে এসেছ?

সে বলল, না, আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। দু-বছর আগে।

তারপর কথা খুঁজতে-খুঁজতে ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বলল, এখানে একটা কারখানায় কাজ করি। শুধু কাজ শিখলে হবে না। এরা বলে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এত বই পড়তে কাদের ভালো লাগে? দূর ছাই।

হাতের বইটা সে ছুড়ে মারল কামরার মেঝেতে। তারপর তাতে একটা লাথি কষাল।

ছেলেটি ইংরেজি খুবই কম জানে। সুইডিস ভাষাও নিশ্চয়ই এখানে এসেই শেখার চেষ্টা করেছে, দু-বছরে আর কতটা শিখবে! এইসব বিমাতৃ ভাষায় খটোমটো বই পড়া নিশ্চয়ই তার পক্ষে কষ্টকর।

ভালো না লাগলেও তাকে এদেশে থাকতে হবে টাকা রোজগারের জন্য। এসব দেশে অনেক টাকা মাইনে দেয় বটে কিন্তু খুব খাটিয়ে মারে।

বইটা আবার তুলে নিয়ে সে ধুলো ঝাড়ল। তার মুখে আপমানে ও বেদনার একটা অদ্ভুত রং।

হঠাৎ চোখ তুলে সে জিগ্যেস করল, এর পরে স্টেশানে আমি নামব। তুমি নামবে আমার সঙ্গে?

এরকম একটা আমন্ত্রণ অস্বাভাবিক।

আমি বললুম, না। আমাকে অসলোতে যেতে হবে। স্টেশানে আমার জন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করবে।

সে আবার মুখ বিকৃত করে বলল, অসলো গিয়ে কী করবে? নরওয়ে আর একটা বাজে দেশ। সেখানে কখনও রোদ ওঠে না।

এখন যাচ্ছ দেখবে বৃষ্টি। তুমি আমার সঙ্গে এখানে নামো। এখানে আমার গার্ল ফ্রেন্ড থাকে, সে খুব ভালো সুইডিশ রান্না খাওয়াবে। চলো, আমরা অনেক গল্প করব।

এবারে আমি জিগ্যেস করলুম, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড, সে কি সুইডিশ? তুমি যে বললে সুইডিশ মেয়েদের একেবারে পছন্দ করো না?

সে বেশ জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, পছন্দ, করিই নাতো। এইসব মেয়েরা কি ইরাকি মেয়েদের পায়ের নখের যোগ্য? তোমাদের ইন্ডিয়ার মেয়েরাও কত ভালো, কত নরম। কিন্তু কী করব, এদেশে

পাকতে গেলে গার্ল ফ্রেন্ড ছাড়া চলে না। তোমার যদি গার্ল ফ্রেন্ড না থাকে, তাহলে শুক্র-শনিবার সন্ধেবেলা, তুমি একলা, তোমার অন্য কোনও বন্ধু থাকবে না। তোমার গার্ল ফ্রেন্ড না থাকলে আরও অন্য খারাপ খারাপ মেয়ে এসে তোমাকে বিরক্ত করবে। এই মেয়েটার তবু একটা গুণ আছে। রান্না করে খাওয়াতে ভালোবাসে। যদি আমাকে সিটিজেনশিপ না দেয়, তাহলে এই মেয়েটাকেই বিয়ে করে ফেলব।

—এদেশে তোমার এত খারাপ লাগে, তবু তুমি এখানে থাকতে চাও কেন? ফিরে যেতে পারো না?

—বললুম না, আমার দেশ থেকে পালিয়ে এসেছি।

কিছু যদি মনে না করো, তাহলে জানতে পারি কি, তুমি কেন পালিয়ে এসেছ?

—না পালিয়ে এলে আমাকে যুদ্ধ করতে যেতে হত। এতদিনে হয়তো একটা কামানের গোলা খেয়ে মরে যেতাম! তুমি জানো না, আমাদের দেশের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ চলছে?

—হ্যাঁ, জানি, মানে খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি।

—তুমি বলতে পারো কেন ইরাক আর ইরানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে? কী নিয়ে ঝগড়া?

—তা আমি ঠিক জানি না অবশ্য।

—আমিও জানি না! আমার দেশের সঙ্গে ইরানের কেন যে যুদ্ধ চলছে, তা আমি কিছুতেই বুঝি না। ইরানিদের সঙ্গে আমার তো কোনও ঝগড়া নেই। এদেশে কয়েকজন ইরানিকে দেখেছি, তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। তবে কেন ওদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ কর মরতে যাব?

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাগদাদ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আমাদের বাড়ি। খুব চমৎকার জায়গা, তোমাকে ঠিকানা দেব, তুমি যাবে?

আমার মা তোমাকে খুব যত্ন করবে।

আমি আর কবে ফিরতে পারব জানি না। আমি শুধু-শুধু যুদ্ধে মরতে চাই না। মারতেও চাই না। কিন্তু আমার খুব দেশে যেতে ইচ্ছে করে। আমি প্রায়ই আমার বাড়িটাকে স্বপ্নে দেখি। আমার বন্ধুরা কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে জানি না...

তারপর অনেকক্ষণ সে চুপ করে রইল। কী অসহায় তার মুখ। সে একটা সরল, নিরীহ ছেলে, দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকার একটুও ইচ্ছে নেই তার, কিন্তু কী এক অকারণ যুদ্ধ তাকে প্রবাসে মন-মরা করে রেখেছে।

যারা এসব যুদ্ধ বাধায়, এসব যুদ্ধ চালায়, তারা এই সব ছেলেদের কথা বোধ হয় একবারও ভাবে না।

॥ পাঁচ ॥

প্রথমেই বলে রাখি, এটা কোনও সমাজতান্ত্রিক আলোচনা নয়। আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটি লঘু সন্দর্ভমাত্র।

নিছক যোগাযোগ বা দুর্ঘটনাবশতই হোক, আমি আমেরিকার নানা জায়গায় দেখেছি, শিল্প সংস্কৃতির চূড়ামণি হিসেবে বা পৃষ্ঠপোষক হয়ে বসে আছেন এক একজন প্রৌঢ়া বিধবা। এইসব প্রৌঢ়া রমণী যেমন নানান বাতিকগ্রস্ত তেমনি অর্থব্যয়ে মুক্তহস্তা এবং একটু অভিভূত হলে দয়ার আঁধার।

আমেরিকার ধনীদের অনেকেরই ঘন-ঘন বউ বদলানো স্বভাব। আর ওদের ধনীরা তো আর জাত—কুল—মান দেখে বিবাহ করেন না, পাত্রী নির্বাচন করেন রূপ ও নামডাক দেখে। অর্থাৎ সমাজে ও দেশে যে—রমণীর বেশি সুনাম বা দুর্নাম তাকে বিবাহ করার জন্য ধনীরা তখন উদগ্রীব,

তা হোক না সে রমণী কোনও নর্তকী বা অভিনেত্রী বা প্রাক্তন সেনাপতির নির্যাতিত স্ত্রী। এইসব বেশি বয়সে বিয়ে করা স্বামীরা যখন হঠাৎ একদিন দুম করে মারা যান, তখন তাদের বিধবা পত্নীরা প্রথমটায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে যান। বিবাহিত জীবনের হয়তো সুখভোগ, আমোদ-বিলাসিতার চূড়ান্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা দেখলেন যে, তাঁর হাতে এখন অঢেল টাকা, কোটি-কোটি টাকা, ব্যাংকের সিন্দুকে টাকায় শ্যাওলা পড়ছে—তা ছাড়াও, টেক্সাসের কোনও তেল কোম্পানি কিংবা চেইন স্টোরের মালিকানা থেকেও প্রতি বছর আসছে লক্ষ-লক্ষ টাকা। এখন এত টাকা নিয়ে তিনি করবেন কী?

বেশি বয়সে বিয়ের ফলে অনেকেরই সন্তান থাকে না। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখারও কোনও পার্ট নেই সে দেশে। থাকলেও অত টাকার মালিক কোনও বিধবা আত্মীয়স্বজনদের বিশ্বাস করতে পারেন না। আবার বিয়ে করতেও ভরসা হয় না, কেন না, যে বিয়ে করবে সে নিশ্চিত টাকার লোভ ছাড়া প্রৌঢ়া বিধবাকে বিয়ে করতে কেন রাজি হবে। যে দেশে যুবতী মেয়েদেরই বর জোটে না।

সুতরাং অত টাকা নিয়ে বিধবারা শিগগিরই ক্লান্ত হয়ে ওঠেন। তা ছাড়া বিলাসিতায় টাকা খরচ করারও তো একটা সীমা আছে। কত টাকা আর পার্টি ডেকে কিংবা নৌকা বিলাসে খরচ করা যায়। আরও যে অঢেল টাকা, সবসময় ঝনঝন করে বিরক্ত করে।

সুতরাং তখন তাদেরও ইচ্ছে হয় টাকা খরচ করে বিখ্যাত হতে। টাকা খরচ করে কাগজে ছবি ছাপাতে। সারা দেশের লোকের মুখে তাঁর নাম ছড়াতে।

এখন প্রৌঢ়া রমণীদের বিখ্যাত হবার উপায় হঠাৎ নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা করা অথবা শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হওয়া। রুচির তাগিদেই হোক বা বিখ্যাত হবার ঝোঁকেই হোক, ইদানীং প্রৌঢ়া বিধবাদের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক আমেরিকার সংস্কৃতির পক্ষে উপকারীই হয়েছে।

কোথাকার যেন এক ডাচেস এক আমেরিকান ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে নিউইয়র্কে বসবাস করেছিলেন, কস্মিনকালেও কেউ তাঁর নাম শোনেনি। বিধবা হওয়ার পর তিনি হঠাৎ কিছু টাকা দান করে ফেললেন। নিউইয়র্কের একটি কবিদের সংঘে তিনি দান করলেন এককালীন সাড়ে সতেরো লক্ষ ডলার, পরদিন প্রত্যেক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর নাম। তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে এক সভায় এসেছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিরা। ভদ্রমহিলার ওই দানকে নেহাৎ সাহিত্যপ্রীতি বলা যায় না, কারণ তিনি পশুক্লেশ নিবারণী সমিতিকেও ওই পরিমাণ অর্থ দান করেছিলেন। তা যাই হোক ওই টাকা পেয়ে কবিদের মধ্যে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গিয়েছিল।

আর একটি বিধবা রমণীর বাড়িতে দৈবাৎ দাওয়াত খেতে গিয়েছিলুম, হার্ডসন নদীর পাড়ে তার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। সেই অট্টালিকার বৈভবের বর্ণনা করতে পারি—এমন সাধ্য আমার নেই, তবে দুটি ঘরের কথা বলি। সেই দুটি ঘরকে বলা যায় সোনার খনি। অথবা, একটা সোনার খনি অন্যটা রূপোর। ভদ্রমহিলার শখ ছবি কেনা। একটি ঘরে আছে পিকাসো ব্রাক, রেমব্রান্ট, রুশো, ক্যানডিন্‌সকি, মদিগ্লিয়ানি, দেগা—এঁদের আঁকা আসল ছবি। অর্থাৎ সেই ঘরখানির মূল্য কয়েক কোটি টাকা। অন্য ঘরে আছে তরুণ জীবিত শিল্পীদের ছবি অধিকাংশই অখ্যাত, নানান একজিবিশনে ঘুরে তিনি প্রতি সপ্তাহে একখানি করে ওই রকম পছন্দ মতন ছবি কেনেন, তাঁর ধারণা এদের মধ্যে কেউ না কেউ পরে বিখ্যাত হবেই। নতুন শিল্পীর ছবির জন্য তাঁর দাম ঠিক করাও আছে, প্রতিটি ছবি পঞ্চাশ হাজার ডলার। সুতরাং ওই মহিলার কৃপা পাবার জন্য সারা আমেরিকার শিল্পীরা লালায়িত।

আর একটি বিধবাকে চিনতাম, যিনি একটি বিখ্যাত জামা কাপড়ের চেইন স্টোরসের মালিকানী। তাঁর বাতিক রেকর্ড সংগ্রহ। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আমেরিকা তো বটেই, গায়ক-সঙ্গীত শিল্পীদের তিনি বাড়িতে ডেকে এনে, তাঁর টেপ রেকর্ডারে তাঁদের সঙ্গীত তুলে রাখেন। শুনেছি,

পণ্ডিত রবিশঙ্করও একবার সে বাড়িতে গিয়েছিলেন। এ বাবদে তিনি এ পর্যন্ত ব্যয় করেছেন সাড়ে তিন কোটি টাকা। মহিলার গর্ব, আইনস্টাইনেরও বেহালা বাজাবার রেকর্ড আছে তাঁর বাড়িতে।

এরকম মহিলা আমি আরও অনেক দেখেছি। অনেক ছোটখাটো শহরেও, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয় করার আলাদা হল নেই, কোনও সহৃদয় বিধবা সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত নির্মাণ ব্যয়টা চাঁদা দিয়ে দিলেন। এ ছাড়া হাজার রকম সমিতি গড়াও এদের ব্যসন। অনেক সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজেও ওঁরা অংশগ্রহণ করেন, যেমন বিকলাঙ্গ শিশুদের সেবা, অনাথআশ্রম কিংবা বিদেশিদের আতিথ্য দেওয়া। হায়! আমাদের দেশের এরকম কোনও ধনী বিধবার সঙ্গে আজও আমার পরিচয় হল না।

॥ ছয় ॥

দিল্লি থেকে হঠাৎ অনুরোধ এল দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যেতে হবে ঢাকায়। সাগরদা আমার ওপর আজ্ঞা দিলেন।

আমি বড়লোকদের সংসর্গে থাকতে ভয় পাই। রাজনৈতিক নেতাদের খবরের কাগজের ছবিতেই দেখা পছন্দ করি। অথবা বাধ্য হয়ে টেলিভিশনে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলবলের সঙ্গে এক বিমানে যেতে হবে শুনে প্রথমে মন ঠিক সায় দেয় না, কিন্তু নেমন্তন্নটা যেহেতু বাংলাদেশে এবং উপলক্ষটা সাত দেশের শীর্ষ সম্মেলন, তাই যাওয়ার ইচ্ছাটাও প্রবল হয়ে ওঠে।

ঢাকা যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির অনেক প্রোগ্রাম। দিল্লি থেকে উড়ে আসবেন পানাগড়ে, সেখান থেকে শান্তিনিকেতন। সন্ধেবেলা দু-তিনটি অনুষ্ঠান, পরদিন সকালে কনভোকেশানে পৌরোহিত্য, তারপর হেলিকপ্টারে পানাগড়ে ফিরে এসে বিমানযোগে গুয়াহাটি, সেখানে পৌঁছে আবার হেলিকপটারে শিলং-এ গিয়ে মিটিং, তারপর গুয়াহাটি থেকে সরাসরি ঢাকায়।

বাচ্চা বয়সে আমাদের স্কুলের রচনায় দেওয়া হত, 'তোমাকে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তবে তুমি কীভাবে দেশটাকে চালাইবে?' তখন কী লিখেছিলুম মনে নেই। কিন্তু এখন মনস্থির করে ফেলেছি, আমাকে হঠাৎ কখনও এ-দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ঝুলোঝুলি করা হলেও আমি রাজি হব না একটি মাত্র কারণে। সারা দেশে চরকিবাজির মতন ঘুরে, একই দিনে দু-তিনটি সভায় দু-তিন রকম বিষয়ে এবং গলার আওয়াজ বদলে বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

দিল্লি থেকে জানানো হল যে আমি ইচ্ছে করলে প্রধানমন্ত্রীর পার্টির সঙ্গে দিল্লি গিয়েও যোগ দিতে পারি, অথবা শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনই বাড়ির কাছে, রওনা দিলুম সেদিকে। ট্রেনে দেখা হল পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তিনিও যাচ্ছেন একই উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে শুধু আমরা দু'জনেই নিমন্ত্রিত, শুনলাম আরও দশ-বারোজন আসবেন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পত্র-পত্রিকা থেকে।

শান্তিনিকেতন পৌঁছে পোঁটলা-পুঁটলি জমা রাখলুম বন্ধুবর অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের বাসা বাড়িতে। বিনা নোটিসে আমার এরকম অকস্মাৎ আগমনের উপলক্ষ শুনে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, তা হলে তো তোমার সিকিউরিটি পাস-এর ব্যবস্থা করে ফেলতে হয় এক্ষুনি। নইলে তো তোমাকে আসল ব্যাপারের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেবে না।

তখুনি বেরুতে হল ওইসব জোগাড় করতে। শান্তিনিকেতন পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। মেলাপ্রাঙ্গণে সারি-সারি সশস্ত্র সেপাইদের তাঁবু। এ দৃশ্য চোখকে পীড়া দেয়। যুদ্ধের দৃশ্যে যোদ্ধাদের মানায়, কিন্তু যে-জায়গাটির নাম শান্তিনিকেতন, যেখানে সারা বিশ্বের মনন-শিল্প একসঙ্গে মেলাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন এক কবি, সেখানেও সমর বাহিনী।

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের তৎপরতায় জোগাড় করা গেল এক টুকরো চোথা কাগজ, যা দেখালে প্রবেশ করা যাবে নিষিদ্ধ এলাকায়। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর আইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায়? তিনি তো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছায়ার মতন ঘুরবেন।

সুতরাং বিকেলবেলা প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যেখানে মিটিং করবেন গেলুম সেই এলাকায়। এখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধির নামে জাতীয় সংহতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। গিয়ে দেখি দড়ি দিয়ে ঘেরা সেই জায়গাটিতে শ্রোতার চেয়ে পুলিশের সংখ্যা বেশি। অনেক দূরে, কর্ডনের ওপাশে ভিড় করে আছে গ্রামের লোকজন। সুসজ্জিত মঞ্চের একপাশে একটি ছোট মঞ্চে, নির্বাক-নিষ্পলক হয়ে বসে আছেন শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। তাঁরা নির্দেশ মতন গান গাইবেন।

যথাসময়ে এলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। চর্মচক্ষে এই দ্বিতীয়বার আমি তাঁকে দেখলুম। আগেরবার দেখেছি কিঞ্চিৎ অধিক এক বছর আগে তাঁর মায়ের চিতার পাশে। তখন তাঁর মুখে ছিল শোক দমনের গাম্ভীর্য। এখন তাঁর মুখে একটা সার্বজনীন মিষ্টি হাসি। পৃথিবীতে যতগুলি কৃত্রিম ব্যাপার আছে তার মধ্যে কৃত্রিম হাসিই সবচেয়ে বেশি কৃত্রিম।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ আমার ছিল না, আর জাতীয় সংহতি বিষয়ে বক্তৃতা মানেই তো সেই একঘেয়ে কথা। আমি খুঁজছিলাম মণিশঙ্কর আইয়ারকে। প্রধানমন্ত্রীর ডান পাশে বাঁ পাশে যাঁরা ভিড় করে আছেন, তাঁদের মধ্যে কোনজন তিনি?

এর মধ্যে একটা কাণ্ড হল। পুলিশের কর্ডন ভেদ করে হুড়-হুড় করে ঢুকে এল গ্রামের লোকেরা। পুলিশও বাধা দিল না বিশেষ। বোধহয় হঠাৎ কোনও কর্তাব্যক্তির মাথায় এসেছে যে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন অথচ শ্রোতাদের সংখ্যা নগণ্য এটা বোধহয় ভালো দেখায় না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো প্যান্ডেল ভরে গিয়ে বাইরেও উপচে পড়ল মানুষ। এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যাই বেশি। কোনও কোনও মহিলা কাঁখে বাচ্চা নিয়ে এসেছেন। এঁদের চোখে রাজদর্শনের কৌতূহল। তা ছাড়া আর কী? প্রধানমন্ত্রী, উপাচার্য এবং অন্য সকলেরই বক্তৃতা চলছে ইংরিজিতে, এরা তা এককর্ণ বুঝবে না। আর চেয়ারে-বসা, ভদ্রলোকের পোশাক পরা যাঁরা ইংরিজি বোঝেন তাঁরা এখানে যা বলা হচ্ছে সবই আগে থেকে জানেন।

এই ভিড় ভেদ করে আমি মনিশঙ্কর আইয়ারকে কোথায় খুঁজে পাব? এর মধ্যে কলকাতার পি আই বি-র শ্রীদেবব্রত রায় এসে বললেন যে এর পরবর্তী মিটিং আছে গৌর প্রাঙ্গণে, সেইখানে আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ধরতে হবে। একখানা সরকারি বাসে করে গেলুম সেখানে। এবারে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন পূর্ব ভারত সংস্কৃতি কেন্দ্রের। আগের অনুষ্ঠানের আয়োজক বিশ্বভারতী। এবারেরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন অনেক জাঁকজমকপূর্ণ। বিরাট প্যান্ডেল, প্রচুর নিমন্ত্রিত, কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা। এখানে গ্রামের লোকের হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আগের অনুষ্ঠানটিতে সিকিউরিটি ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেলেও কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগম সংযত করার জন্য পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়েছে এমন শোনা গেল। আমি নিজের চোখে তা দেখিনি, শোনা কথা।

আমি অবশ্য ভেতরে পৌঁছে গেলুম ঠিকঠাক। কিন্তু এবারে শ্রীযুক্ত আইয়ারকে পাওয়া গেল না। আমাদের জন্য যে দিকে বসার ব্যবস্থা হয়েছে, তিনি আছেন তার উল্টো দিকে। সেদিকে আমাদের যাবার উপায় নেই। তখনই ঠিক করে ফেললাম, শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর আইয়ারের সঙ্গে আমার দেখা না করলেও চলবে। তাঁর যদি গরজ থাকে তিনি দেখা করবেন আমার সঙ্গে। ঢাকা যাওয়ার বদলে কলকাতায় ফিরে গেলেও আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।

একটু বাদে জানা গেল যে, আমরা ট্যুরিস্ট লজে গেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে দলটি এসেছে, সেই দলটি সেখানেই অপেক্ষা করবে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও আমি সেই মতো এসে হাজির হলাম টুরিস্ট লজে। পার্থবাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ভি ভি আই পি-দের সঙ্গে তিনি অনেক দেশ ঘুরেছেন। কিছুক্ষণ অকারণ অপেক্ষার পর তিনি চুপি-চুপি বললেন, আসুন, রাত্তিরের খাওয়াটা সেরে ফেলা যাক। আমি আগে অনেকবার দেখেছি, শেষের দিকে খাবার পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী পানাগড় থেকে শান্তিনিকেতন এসেছেন হেলিকপটারে। তাঁর সঙ্গী সাংবাদিকরা আসবেন একটি বাসে। পানাগড় থেকে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবার কথা নয়, আড়াই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, বাস তবুও বেপাত্তা। কয়েকজন সরকারি অফিসার এখানে কয়েকটি টেলিফোন ঘিরে বসে আছেন, এটা নাকি কন্ট্রোল রুম। আমাদের দেশে ভালো হাসির ছবি হয় না, কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন এরকম একটা কন্ট্রোল রুম খুব কাজে লাগাতে পারতেন। এখানে কেউই সঠিক কিছু জানেন না, টেলিফোনগুলির কোনটা খারাপ কোনটা ভালো তা বোঝাবার উপায় নেই। যেটা সরব সেটা মুহূর্ত পরে বোবা হয়ে যাচ্ছে। যেটা বোবা বলে এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেটা হঠাৎ বেজে উঠছে ঝনঝন করে। প্রত্যেকবার টেলিফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কথা বলছে ভুল লোক, কেউ কারুর কথা বুঝতে পারছে না। এই কন্ট্রোল রুম থেকে গৌর প্রাঙ্গণের দূরত্ব বড়জোর দু'ফার্লং, কিন্তু সেখানকার খবর জোগাড় করবার জন্য এক ভদ্রলোক টেলিফোনে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন ঘণ্টাখানেক ধরে।

সাংবাদিক বোঝাই বাসটির তখনও পাত্তা নেই। কেউ বলল পথে ব্রেক ডাউন হয়েছে, কেউ বলল, ভুল করে দুর্গাপুরে চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে স্থাপিত এই কন্ট্রোল রুমের কৃতিত্ব দেখে ঘন ঘন চমৎকৃত হতে লাগলুম।

রাত আটটার সময় জানা গেল যে, সেই বাস বহুক্ষণ আগেই শান্তিনিকেতন পৌঁছে গেছে। পথ ভুল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ট্যুরিস্ট লজে যে সেই বাসের যাত্রীদের খাবার রাখা আছে সে কথা কেউ তাঁদের বলেনি। অপূর্ব ব্যবস্থা!

সেই বাসে আমাদের এখন নিয়ে যাওয়া হবে দুর্গাপুরে। সেখানে রাত্রি যাপন। পরদিন সকালে পানাগড় কাছাকাছি যেতে হবে।

বাসে উঠে দেখলুম অন্য সাংবাদিকরা রীতিমতন ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। তাঁদের ঘোরানো হয়েছে অনর্থক। ট্যুরিস্ট লজে এসে তারা অনায়াসে ঘণ্টা দু-এক বিশ্রাম নিতে পারতেন। তার বদলে অন্ধকার রাস্তায় তাঁদের অকারণ ঘোরানো হয়েছে। শান্তিনিকেতনের কিছুই তাঁরা দেখতে পাননি। তাঁদের তাড়াহুড়ো করে খাওয়ানো হয়েছে ইন্টারন্যাশান্যাল হস্টেলে, যেখানে ছাত্ররা সস্তায় খায়। সকলের মতে সেই খাবার একেবারে অখাদ্য। ডাল মানে হলুদ রঙ করা জল, ভাত হচ্ছে ঠান্ডা শক্ত সাবুদানা। এই নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগলেন অনেকে।

বাস চলেছে দুর্গাপুরের দিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অফিসারের দায়িত্বে। অফিসারটির নাম রায়বাবু। নিরীহ ভালোমানুষ ধরনের, হয়তো অন্য কাজে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা আছে কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংবাদিকদের বাসে করে নিয়ে রাত্রির বাসস্থান ঠিক করে দেওয়া তাঁর যোগ্য কাজ নয়! সে অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল পদে পদে।

আমাদের বাসের পেছনে পেছন একটি পুলিসের এসকর্ট গাড়ি আসবারও কথা। এসেছিলও কিছুটা পথ, তারপর আর তার পাত্তা নেই। আমাদের বাসটি এমনিতেই চলছে আস্তে-আস্তে তারপর মাঝে-মাঝে থেমে যাচ্ছে এসকর্ট গাড়ির প্রতীক্ষায়। সবাই হাসাহাসি করছে। সেই হাসি এক সময় পরিবর্তিত হয়ে গেল রাগে। যখন বাসটা একটা জঙ্গলে ঢোকার মুখে একদম থেমে গেল। বাসচালক একজন সর্দারজি, তিনি বললেন, এই জঙ্গলে পুলিশের পাহারা ছাড়া তিনি যেতে সাহসী নন।

সারা সন্ধের হয়রানি ও খারাপ খাবার খেয়ে সাংবাদিকরা এমনিতেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এবারে তাঁরা চ্যাঁচামেচি করে পশ্চিমবাংলার মুণ্ডপাত করতে লাগলেন। তাঁরা সবাই ঝানু সাংবাদিক, সারা

ভারতবর্ষ চষে বেড়ান। তাঁরা বলতে লাগলেন পশ্চিমবাংলার অধঃপতন হবে না কেন? দেখছ তো দুপুর থেকে কারবার? কেউ কথা শোনে না, কেউ মন দিয়ে কাজ করে না। কোনও কো-অর্ডিনেশন নেই, কারুর কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই। কী অবস্থা এই রাজ্যটার। মাঝপথে পুলিশের গাড়ি হাওয়া হয়ে যায়, এ কখনও কেউ শুনেছে? এর থেকে রাজস্থানের ব্যবস্থাপনাও অনেক ভালো।

পার্থবাবু ও আমি দুজনেই চুপ। কী প্রতিবাদ করব? আমরা নিজেরাই তো দেখছি অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা!

রায়বাবু বাস থেকে নেমে পুলিশের গাড়ির খোঁজে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সবাই চেঁচিয়ে উঠল, রায়বাবু ভাগতা হ্যায়। রায়বাবু ভাগতা হ্যায়।

খানিকবাদে পুলিশের গাড়ির আশা ত্যাগ করতে হল, কোনও গরুর গাড়িরও এত দেরি লাগার কথা নয়। সাংবাদিকরা জিগ্যেস করল, এই জঙ্গলে কীসের ভয়? ডাকাত না নক্সালাইট? বাসে শুধু একদল সাংবাদিক রয়েছে, বর যাত্রী নয়। রাত নটার সময়ে পুলিসের সাহায্য ছাড়া যাওয়া যাবে না? কে কে যেতে রাজি আছ, হাত তোলো।

ড্রাইভারকে এক প্রকার জোর করেই বাধ্য করানো হল বাস চালাতে। এঁরা দিল্লি থেকে প্লেন জার্নি করে এসেছেন, তারপর অনবরত বাসে ঘুরছেন, এখন তাড়াতাড়ি বিশ্রাম স্থানে পৌঁছতে চাওয়া কোনও অন্যায় আবদার নয়। এঁরা কেউ অল্প বয়সী সংবাদিক নন, প্রত্যেকেই ভারতের বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।

শান্তিনিকেতন থেকে দুর্গাপুর, এই সামান্য যাত্রাপথটুকুই এক রোমহর্ষক ভ্রমণ কাহিনীর পটভূমিকা হয়ে গেল। জঙ্গলটি নির্বিঘ্নে পার হয়ে এলেও দুর্গাপুর শহরটিই পরিণত হল জঙ্গলে, সেখানেই আমরা পথ হারালুম।

আমাদের ভারপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক ও ব্যবস্থাপক রায়বাবু দুর্গাপুর শহরটি চেনেন না। আমাদের বাসস্থান কোথায় নির্দিষ্ট হয়েছে সে সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা নেই। ড্রাইভারও কিছু জানেন না। তার ফলে দুর্গাপুর শহরের চওড়া নির্জন রাস্তায় আমাদের বাস অনবরত পাক খেতে লাগল। ক্রমে এক সময় মনে হল, সারা রাতই আমাদের বাসে কাটাতে হবে। কেন-না, রাত এগারোটার পর, দুর্গাপুরের সব রাস্তা শুনসান, একটা পথচারীও নেই যে কিছু জিগ্যেস করা যাবে। এই অবস্থায় সকলেই যদি বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু লক্ষ করলুম, সকলেই উষ্মা প্রকাশ করলেও কোনও সাংবাদিকই একটা খারাপ ভাষা ব্যবহার করেননি। বাসে কয়েকজন বিদেশি ও একজন বিদেশিনী ছিলেন, পূর্ব ইউরোপের কোনও দেশের, এঁরা প্রধানমন্ত্রীর সচিব সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। এই সব কান্ডকারখানা দেখে এঁরা নিজস্ব ভাষায় হাসাহাসি করতে লাগলেন। কী বলছিলেন, ভাগ্যিস তা বুঝিনি।

নৌ-বিদ্রোহের মতন বাস-বিদ্রোহের উপক্রম হল। কেউ-কেউ বলল, শান্তিনিকেতনেই ফিরে যাওয়া হোক। কোনও একটি মোড়ে এসে কয়েকজন উদ্যোগী সাংবাদিক জোর করে বাস থামালেন। তারপর একটি রিকশাওয়ালাকে ডেকে সার্কিট হাউস, গেস্ট হাউসের খবর নিলেন। এবং তাঁদেরই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গেস্ট হাউস খুঁজে পাওয়া গেল।

রাত তখন বারোটা। একজন সাংবাদিক রায়বাবুকে বললেন, এ রকম অবস্থা আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

রায়বাবু অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, সত্যি, এরকম অভিজ্ঞতা আমারও প্রথম।

পানাগড় বিমানবন্দরটিও যথারীতি সেনা-পুলিশে ঘেরা। আমাদের পঁটুলি ও শারীরিক তল্লাসির পর তুলে দেওয়া হল হাওয়াই জাহাজে। এই বিমানবাহিনীর বিশেষ একটা হাওয়াই জাহাজ,

অন্দরমহলটি তিনটি ভাগে ভাগ করা। পেছনের কামরায় আমরা, মাঝখানে অফিসারবৃন্দ ও সামনের দিকে প্রধানমন্ত্রীর আসন। প্রধানমন্ত্রী আসার একঘণ্টা আগে আমরা উঠে বসে রইলাম। এটাই নাকি নিয়ম। আমি সঙ্গে বই নিয়ে যাইনি। বিমানে আগের দিনের বাসি খবরের কাগজ রয়েছে। আমি এর আগে কখনও এত মনোযোগ দিয়ে কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িনি। এমনকি পাত্র-পাত্রী সংবাদও বাদ রাখলুম না।

বিমানটি আকাশে ওড়ার পর প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর আইয়ারের। আগের সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। কয়েকজন সাংবাদিক আগের রাত্রির নাজেহাল অবস্থার বর্ণনা করে অভিযোগ জানালে তিনি হালকা গলায় বললেন, আরে ছি ছি, যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে।

আমার একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল, রাজীব গান্ধিও বোধহয় কোনও এক সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতে আসবেন। কিন্তু তিনি সর্বক্ষণ অদৃশ্য হয়েই রইলেন। যাঁদের সর্বক্ষণ বুকে বুলেট প্রুফ জামা পরে থাকতে হয়, তাঁরা গল্প গুজব বা আড্ডার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য। আহা রে!

শান্তিনিকেতনে মনোরম শীত ছিল কিন্তু গুয়াহাটিতে বেশ গরম। অবশ্য এখানে ব্যবস্থাপনা ভালো। প্রধানমন্ত্রী আবার একটি হেলিকপ্টারে চলে গেলেন শিলং-এর এক সভায় বক্তৃতা দিতে, আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বিমানবন্দরের কাছেই একটি নির্মীয়মাণ হোটেলে। প্রত্যেকের বিশ্রামের জন্য আলাদা ঘর। দুপুরবেলা ভদ্রগোছের খাদ্য পরিবেশন। বলাই বাহুল্য, অন্য প্রদেশের সাংবাদিকরা পশ্চিমবাংলার তুলনায় আসামের প্রশংসা করবেনই। গতকাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি এবং আজ ঢাকায় কখন পৌঁছব এবং কত রাত্রে কী হবে তার স্থিরতা নেই বলে আমি চট করে খানিকটা দিবানিদ্রা দিয়ে নিলুম।

এর আগেও আমি বেশ কয়েকবার গুয়াহাটিতে এসেছি। কিন্তু এবারের আসা যেন আসা নয়। বিমানযাত্রী বটে কিন্তু বিনা টিকিটের। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল, আবার সেখান থেকে এয়ারপোর্ট। রাজীব গান্ধি এর মধ্যে ক'টা বক্তৃতা দিয়ে এলেন কে জানে!

ঢাকার দিকে রওনা হবার পরেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একবারও চাক্ষুষ দেখা হল না। তার বদলে আমাদের কাছে বিলি করা হল প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার ছাপানো কপি, যেটা তিনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পড়বেন।

সাতটি দেশের এই শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে আমি অনেকদিন থেকেই কৌতূহলী। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করলে দু'পক্ষেরই ক্ষতি হয়। এটা সব নীতিশিক্ষাতেই আছে। সব ধর্মেই আছে। তবু মানুষ বোঝে না, রাষ্ট্রনায়করা ইচ্ছে করে বুঝতে চায় না। আমেরিকার রাশিয়ার অস্ত্র কিনে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলির লড়ালড়ি দেখে সাহেব জাতগুলো হাসে। যাই হোক, প্রথম এই ভারতীয় উপমহাদেশের সাতটি দেশের শীর্ষ সম্মেলন হলেই যে সব সমস্যা মিটে যাবে তা কেউ আশা করে না, তবু একটা চক্ষুলজ্জার ভাব তো হবে। একটি গিঁট অন্তত খুলতে পারে।

রাজীব গান্ধির বক্তৃতায় অবশ্য পরিষ্কার কোনও প্রস্তাব নেই, আছে পারস্পরিক মেলামেশা ও সম্প্রীতির সম্পর্কে মিষ্টি-মিষ্টি কথা। উদ্বোধনী ভাষণে বোধহয় এরকমই কথা বলার নিয়ম। বক্তৃতার শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথের কবিতার খানিকটা ভুল অনুবাদ আছে। প্রধানমন্ত্রীর কবিতা পড়ার সময় কোথায়, বক্তৃতা লেখারই বা সময় কোথায়। বোঝাই যাচ্ছে, রাজীবের কোনও পরামর্শদাতা ঠিক মতন হোমওয়ার্ক করেননি। সেই পরামর্শদাতা ভেবেছেন বাংলাদেশের মানুষ আবেগপ্রবণ, সেখানে একটা কিছু কবিতা-টবিতা ভাষণের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়াই ভালো। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি ভালো করে খুঁজলে সকলকে খুশি করার মতন অনেক কবিতা পাওয়া যেত। কিন্তু 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কবিতাংশকে অনুবাদে পালটে দেওয়ার অধিকার প্রধানমন্ত্রীরও নেই।

হঠাৎ কেউ একজন বলল, দ্যাখো, দ্যাখো, বাইরে দ্যাখো।

জানালা দিয়ে দেখা গেল, আমাদের বিমানের দু-পাশে দুটি দুটি চারটি বাংলাদেশি সামরিক বিমান সমান গতিতে উড়ে আসছে। কোনও রাষ্ট্রপ্রধান এলে তাঁকে এই রকম সম্মান দেখিয়ে, পথ দেখিয়ে আনাই নাকি প্রটোকল। পাশাপাশি কয়েকটি বিমান উড়ে যেতে আমি এর আগে শুধু সিনেমাতেই দেখেছি।

হঠাৎ মনে একটা প্রশ্ন জাগল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তো একবারও দেখা হল না এ পর্যন্ত, তবু তাঁর সঙ্গে একই বিমানে যাওয়ার জন্য আমাদের নেমন্তন্ন করা হল কেন? সহযাত্রীদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরে গেলে এইরকম একটা দল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া নাকি প্রথা। আগেকার দিনে রাজা মহারাজাদের সঙ্গে যেমন পারিষদ দল থাকত, সেইরকম? কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদের ভূমিকা তো পারিষদদের মতন নয়। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী কার্যক্রম সমালোচনা করা বা টেনে গালাগাল দেবার কোনও বাধা নেই।

ঢাকা বিমানবন্দরের আকাশে যখন আমাদের বিমানটি চক্কর দিচ্ছে, সেই সময় আমাদের জানানো হল যে প্রধানমন্ত্রী নামবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা যেন হুড়োহুড়ি করে নেমে না পড়ি। প্রধানমন্ত্রী একা নামবেন, আমাদের এদিক থেকে শুধু ভিসুয়াল মিডিয়ার লোকজন, অর্থাৎ টি ভি ও ফিল্মস ডিভিসনের কর্মীরা মুক্তি পাবেন আগে।

রাজতন্ত্রের প্রভাব অতি দুর্মর। এখানে তার রেশ অতি প্রকট। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সাত রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দু'জন তো সত্যিকারের রাজা, সামরিক শাসকদেরও রাজা-বাদশার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় অনায়াসে, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতাদেরও চালচলন অনেকটা রাজকীয়। ট্র্যাজেডি এই যে সাধারণ মানুষ যাঁকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় তুলে দেয় সেই মানুষটিকে বর্ম পরে, দেহরক্ষী পরিবৃত অবস্থায় থাকতে হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরার সুযোগ তাঁর থাকে না।

কিছুদিন আগে আমি সুইডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানকার বন্ধুরা আমাকে স্টকহলম শহরে ঘোরাতে-ঘোরাতে এক জায়গায় একটা সরু মতন রাস্তায় একটি বাড়ি দেখিয়ে বললেন, এই বাড়িটায় সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী থাকেন। সেখানে একজনও সেপাই-সান্ত্রী নেই। শোনা গেল, প্রায়ই দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের মিটিং সেরে ফেরার পথে সুপার মার্কেট থেকে বাজার করে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরেন।

যত বেশি গরিব দেশ, তত বেশি আড়ম্বর, তত বেশি পুলিশ মিলিটারির দাপট! এসিয়াড খেলার সময় দিল্লিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে অন্য দেশের প্রতিনিধিদের দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, ভারত গরিব নয়। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীরা এক একটা মিটিং করতে যান, তার জন্য কত লক্ষ টাকা যে বাজে খরচ হয় তার ইয়ত্তা নেই। বস্তির মানুষদের দু-বেলা উনুন ধরে না, তার কাছেই তৈরি হয় পাঁচ তারা হোটেল।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ এলাহি ব্যবস্থা করেছেন। আমরা বিমানের এক দরজায় দেখতে লাগলুম। অন্য দরজায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ির কাছে পাতা হল লাল কার্পেট। নানা দিকে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ সেনাবাহিনী। একদিকে দেখা গেল একটি জীবন্ত রামধনু। নানা বয়েসি বালিকারা বিভিন্ন রঙের পোশাক পরে রামধনুর আকার তৈরি করেছে। দেখে প্রথমেই মনে হল, কতক্ষণ ধরে এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওই বালিকারা?

সেনাবাহিনীর মধ্যে এই অংশের পোশাক চক্রাবক্রা, তাদেরই বোধহয় কমান্ডো বলে। তাদের একজন খোলা তলোয়ার হাতে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি এরশাদের পাশে। এই তলোয়ারধারী কমাণ্ডোর হাঁটার ভঙ্গিটা অদ্ভুত, হাত-পা দুটোরই নড়াচড়া বেশি-বেশি। অনেকটা ক্যারিকেচারের মতন। বিমানবন্দরে সব রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা হয়তো এই রকমই হয়। কিন্তু আমি তো এর আগে দেখিনি, তাই আমার কাছে কেমন-কেমন লাগছে। রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কে হৃদ্যতার প্রশ্ন নেই। বাহ্যাড়ম্বরই প্রধান।

বিমানবন্দরটি চমৎকার সাজানো হয়েছে। অতিথি রাষ্ট্রপ্রধানদের বিমান থেকে নেমেই মোটরগাড়িতে ওঠার উপায় নেই। তার আগে বেশ কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতে হয়। প্রথমে মঞ্চে উঠে স্যালুট গ্রহণ, তারপর মাপা-মাপা পায়ে হেঁটে সেনাবাহিনীর সামনে দিয়ে ঘুরতে হয় অনেকখানি।

রাজীব গান্ধিকে তো করতে হল একবার। প্রেসিডেন্ট এরশাদকে অবিকল এই একই ব্যাপার করতে হবে দু'বার। রাষ্ট্রপতি হবার ধকল কম নয়।

বাংলাদেশের ব্যান্ডে প্রথমে বাজানো হল ওঁদের জাতীয় সঙ্গীত, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। পরে বাজানো হল ডি এল রায়ের 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি...'। আমি ভারতীয়, আমি বিদেশি হিসেবে পাশপোর্ট নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে শুনতে পাচ্ছি আমার মাতৃভাষার প্রিয় গান। যা আমি নিজের দেশের সেনাবাহিনীর ব্যান্ডে কোনও দিন শোনার আশা রাখি না।

দুই নায়ক রঙ্গভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর আমরা বিমানবাহিনী থেকে অবতরণের অনুমতি পেলাম। টারম্যাকে তখনও লাল কার্পেট ছড়ানো রয়েছে চতুর্দিকে। আমিও পা ফেলতে লাগলুম খুব সাবধানে। যাতে কোনওক্রমে ওই লাল কার্পেটে আমার পা না পড়ে। আমি গরিবের ছেলে আমার তো ঘোড়ারোগ দরকার নেই। অপরের জন্য পাতা কার্পেটে আমি পা দিতে যাব কেন?

আমাদের জন্য হোটেল নির্দিষ্ট ছিল। এদিককার ব্যবস্থাপনা প্রায় নিখুঁত। সব কিছু চলছে ঘড়ির কাঁটায়। হোটেলের ঘরের আয়নায় একবার মুখটি দেখে নিয়েই ছুটতে হল ভারতীয় হাই কমিশনের চত্বরে। সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রিসেপশান দিচ্ছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে এবং আরও বহু হোমরা—চোমরারা আসবেন। আমরা গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই পার্টি প্রায় শেষ। কেউ-কেউ বেরিয়ে আসছেন, আরও হাজার খানেক নারী-পুরুষ রয়ে গেছেন তখনও। দারুণ-দারুণ পোশাকের বাহার, প্রচুর সুন্দরী মহিলা, কাকে ছেড়ে কাকে দেখি।

আমি দলভ্রষ্ট হয়ে একা-একা ঘুরছিলাম। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শামসুর রহমানের সঙ্গে। কবি সাহেব আজ এসেছেন সাহেবি পোশাক পরে। দেখাচ্ছেও সাহেবদের মতন। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। একটু পরে এলেন সৈয়দ সামসুল হক, অবশ্য দু-তিন মাস আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অন্য প্রবাসে। কবি ও সফল নাট্যকার সৈয়দ সামসুল হক এখন চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেছেন। সন্ধানী পত্রিকার সম্পাদক গাজি সাহাবুদ্দিন দূর থেকে এসে হাসতে-হাসতে বললেন, আমার স্ত্রী বীথি বলছে, ওই ভদ্রলোককে দেখতে ঠিক সুনীলদার মতন। সত্যিই আপনি সুনীলদা তো? এবারে বীথি কাছে এসে অভিযোগ-অভিমানের সঙ্গে বলল আপনি আসছেন। আমাদের একটা খবরও দেননি? আমি বললুম আমি যে ঢাকায় আসব, সেটা তো আমিই জানতুম না গত সপ্তাহেও।

ওঁদের সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতে আমার গা থেকে সাংবাদিক-সাংবাদিক গন্ধটা মিলিয়ে যেতে লাগল। দাড়ি কামাবার পর মুখে আফটার শেভ লোশানের বদলে তারপিন তেল মেখে ফেললে যা হয়, আমার গা থেকে বোধহয় সেইরকমই গন্ধ বেরচ্ছিল।

একজন বিশেষ সুন্দরী মহিলা হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। গাজি সাহাবুদ্দিন আমাকে বললেন, সুনীলদা, আপনি ওঁকে চেনেন? আমি না বলতেই গাজি বললেন তাহলে উনি বোধহয় আপনাকে চেনেন।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমাকে টেনে সেই ভদ্রমহিলার সামনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে কী পরিচয় আছে? এনার নাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

মহিলা বললেন, ও।

তারপর দু-এক মুহূর্তে দ্বিধা করে জিগ্যেস করলেন, আপনি কোথায় আছেন?

আমি বিনীতভাবে বললুম, আমি দেশে আছি।

কথা বলার সময় কোনও শব্দে কোটেশান চিহ্ন দেওয়া যায় না। সুতরাং আমি দেশে আছি

শুনে উনি চার পাঁচ রকম অর্থ ভেবে নিতে পারেন। যে একটি মাত্র শব্দে পৃথিবীর সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, তিনি সেই শব্দটিই উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, ও।

তারপর চলে গেলেন বাইরের দিকে।

তখন অন্যদের কাছে তাঁর পরিচয় জানলুম।

ইনিই বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমানের পত্নী। এখন একটি বিরোধী দল সমষ্টির নেত্রী। এঁর মতন বিখ্যাত রমণীর পক্ষে আমাকে চেনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি যদি সাংবাদিক হিসেবে চালু হতাম, তাহলে এর পরে দৌড়ে ওঁর পেছন-পেছন গিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা কিংবা সার্ক সম্মেলন সম্পর্কে ওঁর মতামত চাইতাম। কিন্তু ওসব কথা আমার মাথাতেই আসে না।

এক সময় বীথি ও গাজি আমাকে বললেন, হোটেলে ফিরে কী করবেন? চলুন আমাদের বাড়িতে আড্ডা দেবেন। খেয়ে নেবেন ওখানেই।

সৈয়দ সামসুল হকের শরীর তেমন সুস্থ নেই বলে আমি শামসুর রাহমানকে অনুরোধ করলুম তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী করবে?

শামসুর রহমান বললেন এই কোট-প্যান্ট পরে কি আড্ডা হয়? আজ বাড়িই যাই। কাল-পরশু দেখা তো হবেই।

গাজির বাড়িতে পানাহার ও আলাপচারি চলল অনেক রাত পর্যন্ত। সেখানে এক সময় এলেন 'যায় দিন'-এর সম্পাদক শফিক রহমান এবং সর্বজন পরিচিত দুলাভাই। তিনি বীথির দুলাভাই বলে আমাদেরও সকলের দুলাভাই।

রাত সাড়ে এগারোটায় আমি হোটেলে ফিরব, শফিক রহমান আমায় পৌঁছে দেবেন, তাঁর গাড়িতে উঠেও বসেছি। এমন সময় বিরাট শব্দ তুলে একখানা স্টেশন ওয়াগন পেছনে এসে দাঁড়াল। সে গাড়ি থেকে কমান্ডোদের কায়দায় লাফিয়ে নামল কবি রফিক আজাদ আর ফারুক ফরিদ নামে দুটি যুবক। আমার হাত ধরে নামিয়ে তারা বলল, চলুন, চলুন। বেলাল ও আরও অনেকে আপনার জন্যে এক জায়গায় অপেক্ষা করে আছে, আপনাকে যেতেই হবে।

আমি ঢাকায় পৌঁছে এখনও কারুকে টেলিফোন করার সুযোগ পাইনি; কী করে ওরা জানল। আমি যে এখন এই বাড়িতে আছি সে খবর কী করে পেল, এ সব প্রশ্ন জিগ্যেস করারও সুযোগ পেলাম না। ঢাকা শহর এই রকমই। কোনও উদ্যোগ নিতে হয় না, তার আগেই এখানকার মানুষ এমন আপন করে নেয়।

আমার বরাবরই ধারণা, ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হবার সময় ভারত নামটা বদলে দেওয়া উচিত ছিল। হিন্দুস্থান অবশ্যই নয়, কারণ কংগ্রেসি নেতারা দ্বিজাতিতত্ত্ব মানেননি, অন্য কোনও নতুন নাম, নতুন দেশ। এই নামটাই বা মন্দ ছিল কী? তখনকার কোনও নেতার মাথায় এই নাম আসেনি কেন? ভারত নামটা যদি আমরা ছেড়ে দিতাম তা হলে পাকিস্তানি, বাংলাদেশি, নেপালি, ভুটানি এবং আমরা সকলেই নিজেদের ভারতীয় হিসেবে পরিচয় দিতে পারতাম। এমনকি মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কারও এই পরিচয়ে আপত্তি থাকত না বোধহয়, কারণ ভৌগলিকভাবে এই গোটা অঞ্চলটিরই নাম ভারতীয় উপমহাদেশ।

সেই ভারতীয় উপমহাদেশেরই সাতটি দেশের শীর্ষ সম্মেলন বসেছে ঢাকায়। আফগানিস্থান ও বার্মা থাকলে প্রতিনিধিত্ব একেবারে ষোলো আনা হতো, কিন্তু ওই দুটি দেশ কেন যোগ দেয়নি তা আমি জানি না।

এই সম্মেলনের আড়ম্বর চোখকে একটু পীড়া দেয়। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার আশঙ্কা মনে জাগায়। আমরা তো খুব বেশি কিছু আশা করছি না, সাত রাজ্যের পরিচালক হঠাৎ এখনই ভাই

ভাই বলে গলা জড়াজড়ি করবেন, এমন কল্পনাও করা যায় না। আমরা চাই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির.অবসান আর একটু একটু সহযোগিতার জন্য হয়তো মেলামেলি। সহজ-সরল পরিবেশে ওই রকম সুর হলেই আশ্বস্ত হওয়া যেত।

ঢাকা শহরটি সাজানো হয়েছে খুবই সুন্দরভাবে। এই উপলক্ষে শহরটির প্রসাধন হয়ে গেল। বড় বড় রাস্তাগুলির প্রত্যেকটি বাড়িতে নতুন রঙের প্রলেপ, অফিস বাড়িগুলিতে প্রতিদিন আলোকসজ্জা। খানাখন্দ ভরাট হয়েছে, পথের পাশের পড়ো জমি বা ডোবা ঢেকে দেওয়া হয়েছে রঙিন চট দিয়ে। একটি নতুন ফোয়ারা দেখে এমনই চোখ ধাঁধিয়ে যায় মনে হয় বিলেত-আমেরিকার এক টুকরো দৃশ্য। প্রতিটি দেশের নামে আলাদা আলাদা তোরণ। সাইকেল রিক্শা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণও করা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে, প্রধান প্রধান পথ একমুখী।

আমাকে প্রয়োজনীয় কার্ড ও ব্যাজ ইত্যাদি দেওয়া হলেও আমি সার্ক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার উৎসাহ বোধ করিনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ির কথা মনে পড়লেই মনটা কুঁকড়ে যায়। দু-চারটে খুনে কিংবা ধর্মীয় উন্মত্তর জন্য সবাইকেই সন্দেহ করা হয়, পদে-পদে পরীক্ষা দিতে হয়। এ যেন রামের অপরাধের জন্য শ্যামকে শাস্তি দেওয়া। ওই রকম পুলিশ-মিলিটারির কড়া চোখের সামনে দিয়ে যেতে হবে সম্মেলন স্থানে। না গেলে কি আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? টাটকা খবর পাঠাবার দায়ও আমার নেই।

হোটেলের ঘরে বসে টেলিভিশনেই সব কিছু দেখা যেতে পারে। জ্যান্ত সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু টিভি খোলার পর বেশ একটা চমক খেলাম। এক ঘোষিকা কাঁচুমাচু মুখ করে জানাল যে কী যেন একটা যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে, তাই উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করা যাচ্ছে না। শুনেই আমার ভয় হল। অন্যদিকে সব ব্যবস্থা এমন সুশৃঙ্খল, এই অনুষ্ঠানের জন্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, সেটাই টি ভি-তে দেখানো গেল না! যে কোনও মুহূর্তে যান্ত্রিক গোলমাল হতেই পারে। কিন্তু যাঁদের ওপর আজকের দায়িত্ব দেওয়া আছে তাঁদের কী হবে?

অবশ্য অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করে রাখতে ত্রুটি হয়নি। দেখানো শুরু হল ঘণ্টা দেড়েক বাদে থেকেই। এই সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন এরশাদ সাহেব, সেটাই স্বাভাবিক ও সংগত, এর জন্য এরশাদ সাহেবের খাটা খাটনি বেড়ে গেল অনেক। কতবার যে তাঁকে টেবিল ছেড়ে উঠতে হল ও বসতে হল তার ঠিক নেই, অন্যদের বক্তৃতার পর প্রত্যেককে অবিকল একই ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান, যাতে কারুর ক্ষেত্রে উনিশ-বিশ না হয়। আমাদের মতন সাধারণ মানুষের কাছে এই সব কাজ বেশ বিরক্তিকর মনে হলেও রাষ্ট্রনেতাদের সহ্য করতেই হয়, অসীম তাঁদের সহ্যশক্তি।

নেতারা প্রত্যেকেই বেশ ভালো-ভালো কথা বললেন। কেউ পুরোনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলেননি। পূর্ব শর্ত অনুযায়ী কেউই দ্বিপাক্ষিক কোনও সমস্যার কথা উত্থাপন করেননি, সুতরাং প্রথম দিনটিকে সার্থকই বলা যায়। আমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি চমকে গেছি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বক্তৃতা শুনে। আমাদের দেশে আমরা তাঁকে একজন কট্টর, জঙ্গী মানুষ বলেই ভাবি। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মনে হল অমায়িক ভদ্রলোক। শুরুতে স্তোত্র পাঠের সময় খানিকটা ধর্মগুরু ভাব, তারপর একনাগাড়ে প্রশংসা করতে লাগলেন সকলের, এমনকি ইন্দিরা গান্ধিকে পর্যন্ত। তিনি বোধহয় প্রথম ইন্দিরা গান্ধির নাম উল্লেখ করলেন। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিও অবাক করলেন বেশ। শ্রীলঙ্কায় তামিলরা নির্বিচারে নিহত হচ্ছে বলে ওঁকেও ভেবেছিলাম একজন কঠোর নির্দয় মানুষ। কিন্তু এই প্রবীণ মানুষটির কথা শুনলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অন্যরা পড়েছেন লিখিত ভাষণ, ইনি শেষের দিকে এক্সটেমপোর বলতে লাগলেন, নানা রকম রঙ্গ-রসিকতা মিশিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে যেতে লাগলেন অবলীলায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও মুখস্থ বললেন। রাজনীতিকদের চেনা সত্যিই দুষ্কর, রাজনীতি এক বিচিত্র বস্তু!

এই সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা শহরটি যে শুধু উৎসবের সাজে সেজেছে তাই-ই নয়, বাইরে

থেকেও অনেকে এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে মনে হয়। এই সময় টি ভি ও সিনেমা হলগুলিতে দেখানো হচ্ছে বিভিন্ন ছায়াছবি, সবই পুরোনো, ষাটের দশকের। তবু সেইসব ছবি দেখবার জন্যই হাউস ফুল। নস্টালজিয়াই প্রধান আকর্ষণ তা বোঝা যায়। আমি কোনও কাজে একটি সরকারি অফিসে গিয়েছিলুম, অধিকাংশ টেবলই প্রায় ফাঁকা! একজন অফিসার বললেন বিকেলে টি ভি-তে ইন্ডিয়ান ফিল্ম দেখাচ্ছে তো, তাই সবাই বাড়ি পালিয়েছে। ছবিটি বাংলা, উত্তম-সুচিত্রার।

একেবারে সাধারণ মানুষ এই সম্মেলনকে কী চোখে দেখছে তা বলা শক্ত। সাধারণ মানুষের মন কি সহজে বোঝা যায়! তবু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে মনে হল, তারা যেন একটু নিরুত্তাপ, তারা রুজি-রোজগারের ধান্দাতেই ব্যস্ত, এরোপ্লেনে উড়ে এসে বড়-বড় মানুষেরা কী সব কথা চালাচালি করছে, তাতে তাদের মাথা ব্যথা নেই।

হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার অবস্থান হলেও প্রথম দিন থেকেই আমি আলাদা হয়ে গিয়েছিলুম। সার্থক সাংবাদিকরা ব্যস্ত হয়ে আছেন, কীভাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বা রাজীব গান্ধি বা জেনারেল জিয়াউল হকের কাছ থেকে কয়েকটা নিরালা মুহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেওয়া যায়। আর আমি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলুম, পাছে ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা যায়। আমি ওই সব শীর্ষ ব্যক্তির থেকে সহস্র হাত ব্যবধানে থাকতে চাই, কেন-না কাছাকাছি চলে এলেই তো আবার নিরাপত্তা রক্ষীদের ভ্রূকুটি!

শুধু তাই নয়, ঢাকায় নেমেই ঠিক করে ফেলেছি। রাজীব গান্ধির সঙ্গে আর এক বিমানে ফেরা নয়। একবারেই যথেষ্ট, যাবার সময় নিজের পয়সায় টিকিট কাটতে হবে, তা হোক। যে-কোনও অভিজ্ঞতাই একবারের বেশি দু-বার হলে তার তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যায়।

তিন দিনের শীর্ষ সম্মেলনে আমার প্রধান কৌতূহল ছিল নেতারা একমত হয়ে কোন-কোন বাধা নিষেধ তুলে দেন তা জানার। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্তও জানা গেল না। নেতারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছেন, একসঙ্গে লঞ্চে নদী দেখতে যাচ্ছেন, রসিকতা করছেন, সেগুলো ভালো লাগছে ঠিকই, কিন্তু তারপর? শেষদিন প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন বাংলায়, তাই শুনে শ্রীলঙ্কার জয়বর্ধনে রাজীব গান্ধিকে বললেন, আগামী বছর তো দিল্লিতে সম্মেলন হবে, আপনি এর মধ্যে কবিতা লেখা প্র্যাকটিস করুন।

রাজীব গান্ধির কবিতার সঙ্গে বিশেষ কোনও সংস্পর্শের কথা শুনিনি, এই এক বছরে তিনি কবি হয়ে উঠবেন কি না জানি না। যদি দৈবাৎ রাজীব গান্ধি কবিতা রচনা করে ফেলেন, তা হলে, আমার ধারণা, পাকিস্তানের জিয়াউল হকও ছাড়বেন না। তিনিও কবিতা লিখবেন। বেশ তো। চমৎকার ব্যাপার হবে তা হলে।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ হল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া। যদিও স্পষ্ট কোনও প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি হয়নি। তবু একটা বড় কাজ হয়েছে। যুদ্ধ বা অস্ত্র বা সীমান্ত সমস্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তো আলোচনা হল, ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হল। এরপর পরস্পরের দিকে ছোরা তুলতে গেলে একটু চক্ষু লজ্জা হবে না?

॥ সাত ॥

রাস্তায় তো কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা ছিল না, তবু বহু কণ্ঠের একসঙ্গে চিৎকার শুনতে পেলাম হঠাৎ। সময় সেপ্টেম্বরের মেদুর সন্ধ্যা, প্যারিসের শেন নদীর পাড়ে। শুধু রং ও রূপ, বাতাসে সুগন্ধ ইভনিং ইন প্যারিস যাকে বলে। এমন সময় কীসের গোলমাল? আগুন দেখলে পোকা ছুটে যায়, গোলমাল শুনলে মানুষ। অনেক লোক সত্যিই সেদিকে ছুটে গেল, সট সট করে কয়েকটা পুলিশের

গাড়ি। আমার সঙ্গে একজোড়া ফরাসি যুবকযুবতী, এলেন আর হোব্রেয়ার, ওরা বলল, ম দিও, আর একটা মরল বোধ হয়? এ মাসে এ নিয়ে ক'টা হল? তিনটে না চারটে?

অল্পক্ষণের মধ্যে শুনতে পেলাম, একজন নয়, দুজন, এফেল টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়েছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় মানুষ মরতে চায় কেন? এখন তো মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনও দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই, বুকের বিষ নেই। সাময়িক বা নকল, যাই হোক না, প্যারিসে সন্ধেবেলা সবাই সুখী। তবু একজোড়া রুমানিয়ান দম্পতি হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেল কেন? হোবেয়ার বলল, দূর, ছাই, এই কুচ্ছিৎ স্তম্ভটাকে ভেঙে ফেলে না কেন? এটা আমাদের দু-চক্ষের বিষ।

এলেন বলল, ভাঙলেই বা কী লাভ। টাওয়ার সোসাইটির সভাপতি কে বলেছে শোনোনি? টাওয়ারটা ভেঙ্গে ফেললে মানুষ তখন শেন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করবে। মানুষ আত্মহত্যা করা কখনও থামবে না।

হোবেয়ার গলার স্বর গাঢ় করে বলল, কেন মানুষ আত্মহত্যা করে? এলেন তুমি মরতে চাও কখনও?

এলেন নিবিড় হয়ে, এসে উত্তর দিল, কী জানি। চরম সুখের মুহূর্তেও মানুষ বোধ হয় মরতে চায়।

অতঃপর তরুণ-তরুণীদ্বয় বলিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ওষ্ঠ সংলগ্ন করলেন। আমি যে পাশে দাঁড়িয়ে আছি, তাতে গ্রাহ্যই নেই। ফরাসিজাত একে বলে। আমার ইচ্ছে ছিল মৃত রুমানিয়ান দম্পতিকে একবার দেখে আসি; তাদের মুখে প্রকৃত সুখ চিহ্নিত কি না! কিন্তু ভিড় ঠেলে এগুতে পারলুম না। সুতরাং ওদের সঙ্গে কারতি ল্যাত্রায় বইপাড়ায় চলে গেলুম। আমিও দেশ ছাড়ার পর কাগজে পড়েছিলুম যে, আত্মহত্যা নিবারণের জন্য প্যারিসের খবরের কাগজগুলো খুব হইচই তোলায় এফেল টাওয়ারের যে তিনটে বারান্দা আছে, সেগুলোতে সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আত্মহত্যা অবশ্য তাতে থামেনি। গত সপ্তাহেও ভিয়েতনামের একটি ছাত্র তারের বেড়া ডিঙিয়ে আত্মহত্যা করায়, এ পর্যন্ত ওই স্তম্ভ প্রান্তের অপমৃত্যুর সংখ্যা হল ৩৪৯টি। প্রতি মাসে একটা না একটা মৃত্যু লেগেই আছে।

আলেকসুন্দর এফেল নামের সাহেবটি এই ইস্পাত স্তম্ভটি তৈরি করেন ১৮৮৯ সালে। সেবার প্যারিসে বিশাল বিশ্বমেলা হয়েছিল, এফেলের এই টাওয়ার তার স্মারক। তারপর থেকে এ যাবৎ প্যারিস শহরকে একমুহূর্তে বোঝবার জন্য এফেল টাওয়ারের নাম করলেই হয়। অসংখ্য ছবিতে-কার্টুনে প্যারিস বলতেই এফেলের স্তম্ভ। অথচ, ফরাসিরা গোটা প্যারিসের মধ্যে ওই জিনিসটার চেয়ে আর কিছুকে বুঝি বেশি ঘৃণা করে না। সেই ঘৃণার কারণ বোঝা যায়, প্যারিসের মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে অসংখ্য শিল্পকীর্তি, শেন নদীর ওপর সুরম্য সেতুগুলি, এখানে ওখানে ছড়ানো অসংখ্য ভাস্কর্য, নতবদন গির্জার সুষমা সাঁজে লিজের মতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজপথ যে শহরের গর্ব, সেই শহরের বুকে নিতান্ত শিল্পহীন একটা ইস্পাতের চূড়া খারাপ লাগতেই পারে। এ সম্পর্কে সেই গল্পটি নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে, একজন তরুণ ফরাসি কবি সর্বক্ষণই প্রায় এফেল টাওয়ারের ওপরের রেস্তোরাঁতে বসে থাকত। তাকে সেখানে দেখে একজন আমেরিকান কবি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিল, কী হে, তুমি যে এখানে? তোমরা ফরাসিরা শুনেছি এটার দিকে তাকানো পর্যন্ত সহ্য করতে পারো না? ফরাসি কবিটি মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল, সেই জন্যই এখানে আসি। গোটা শহরে এই একটি মাত্র জায়গা, যেখানে এলে এই কুচ্ছিৎ জিনিসটাকে পুরো দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু তা বলে এফেল টাওয়ার ভেঙে ফেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ টুরিস্টরা আর শিল্প দেখতে আসে না, তারা আসে বিখ্যাত জিনিস দেখতে। যে-কোনও জায়গাতে গিয়েই কাগজের লিস্ট মিলিয়ে বিখ্যাত জায়গাগুলি দেখে নিতে হয়। এবং প্যারিসে এক নম্বর বিখ্যাত জায়গা হচ্ছে, এফেল টাওয়ার। এ পর্যন্ত এফেল টাওয়ারে যত ভ্রমণার্থী এসেছে, তত আর কিছুতে নয়।

এফেল টাওয়ার আরও নানান ধরনের লোককেও আকর্ষণ করেছে। শৌখিন পর্বতারোহীরা বাইরে থেকে বেয়ে উঠেছে ওপরে। পাইলটরা তলায় গর্ত দিয়ে প্লেন উড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন (কখনোই পারেননি), একজন লোক দু-হাতের ওপর ভর দিয়ে ৩৬৩টা সিঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। একজন আবার সাইকেল চালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল। চূড়া থেকে প্যারাসুটে ঝাঁপিয়েছে অনেক লোক। ১৯১১ সালে একজন দর্জি দু-খানা কাপড়ের তৈরি ডানা তৈরি করে, শরীরের সঙ্গে মুড়ে ওড়ার চেষ্টা করেছিল এফেল টাওয়ারের চূড়া থেকে। বলাই বাহুল্য, উড়তে পারেনি, মাটিতে আছড়ে মারা গেছে। এ ছাড়া আত্মহত্যা তো লেগেই আছে।

এফেল টাওয়ার ভেঙে দেবার বদলে রক্ষণ সমিতি আরও দশ ফুট উঁচু করার সিদ্ধান্ত করেছেন। এখন আছে ৯৮৪ ফিট, এরপর হাজার ও আকাশছোঁয়া।

॥ আট ॥

এক সময় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা একটা ফ্যাশান ছিল। কল্লোল যুগ থেকে শুরু, চলেছিল পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত। তিন জোড়া লাথির ঘায়ে, রবীন্দ্র রচনাবলি লুটোয় পাপোষে—এরকম লাইন লিখেছিল পঞ্চাশের দশকের কোনও ছোকরা কবি। এই রকম মনোভাবের শেষ হয় রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছরে। প্রচুর ধুমধাড়াক্কা, সভা-সমিতি, অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, গান-বাজনা ইত্যাদি হল। উৎসবের শেষে বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথ এতদিন পরে পুরোপুরি ছবি হলেন। তাঁর রচনাবলি লোকে সযত্নে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে, আর কেউ পড়বে না। তাঁর নৃত্যনাট্য গীতিনাট্যগুলোও ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে লাগল। কবিতা তো আগে থেকেই ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। বাকি রইল গান। তাঁর গান কিন্তু আশ্চর্যভাবে জনপ্রিয় হতে লাগল। চল্লিশ—পঞ্চাশ দশক পর্যন্তও তার গান ছিল এলিটদের ড্রইংরুমে সীমাবদ্ধ। পঙ্কজ মল্লিকের ক্লান্ত চেষ্টা বা কিছু কিছু বাংলা সিনেমাতে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগেও এই গান খুব বেশি জনসমাদর পায়নি। কিন্তু শতবার্ষিকীর বছরের পর থেকেই যেন রবীন্দ্রসংগীতই হয়ে উঠল বাঙালির একমাত্র গান এবং এই রবীন্দ্রসংগীত রুচির প্রভাবেই অতুলপ্রসাদের গান ও দ্বিজেন্দ্রগীতিকে টেনে তোলা হল অনেকখানি বিস্মৃতির গহবর থেকে। এর প্রধান কারণ অবশ্য আধুনিক বাংলা গানের নিম্নগতি, নামতে-নামতে তা তলিয়ে গেল কদর্যতার পাকে, শচীন দেব বর্মন বা সলিল চৌধুরীর মতন প্রতিভাবানেরা ওই সময়ে পুরোপুরি চলে গেলেন হিন্দি গানের জগতে। আচ্ছা, গানের কথা পরে হবে।

আপামর পাঠকেরা একজনের রচনাকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচল কিংবা ছুঁয়ে রেখে দিয়ে আর ছুঁল না, তা দিয়ে তো আর সাহিত্য বিচার হয় না। এ কথা ঠিক, হঠাৎ কোনও লেখক জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে গেলে তার প্রতি অন্য লেখকদের ঈর্ষা, বিরাগ বা অবহেলার ভাব আসে। সমালোচকেরা সে রকম লেখককে লঘু দৃষ্টিতে দেখেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। সমালোচকেরা এখনও পর্যন্ত তাঁর মহিমায় আচ্ছন্ন। লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এতই বড় যে তাঁকে অন্য লেখক ঈর্ষা করলে সেই লেখক নিজেই ছোট হয়ে যাবেন, যেমন সাময়িকভাবে হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কল্লোল যুগের রবীন্দ্র বিরোধিতা মোটেই ঈর্ষাপ্রসূত নয়। তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন এবং সেটা ঠিক কাজই করেছিলেন।

যদিও নানা সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিরিশের দশকের সেই সব বিদ্রোহী যুবকেরা প্রকাশ্য রবীন্দ্র বিরোধিতা করলেও নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আউড়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্র বিরোধিতা ছিল তাদের স্ট্র্যাটেজি, কিন্তু মনের দিক থেকে তাঁরা অনেকখানিই ছিলেন রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে, পরবর্তীকালে সেই সব যুবকেরা যখন প্রবীণ হলেন তখন তাঁদের

মধ্যে থেকে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেকেই আবার প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূজা নিবেদন করেছেন। কবিতায় ও গদ্যে আধুনিকতার যথার্থ প্রতিনিধি যে দু'জন, সেই জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সঠিক মনোভাব ঠিক জানা যায় না। এঁরা দু'জনেই রবীন্দ্র মানসিকতা থেকে অনেকখানি দূরের মানুষ এবং খুব সম্ভবত এঁরা আর পেছন দিকে ফিরে তাকাননি।

পঞ্চাশের দশকে আমরা যখন লেখালেখি শুরু করি, তখনও কিন্তু সাহিত্যের আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের কিরণচ্ছটাতেই অনেকখানি আচ্ছন্ন। পত্র-পত্রিকায় অধিকাংশ প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে। অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত। রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের ভাষণে যখন-তখন, অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দেন। 'দেশ', 'মাসিক বসুমতী', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি প্রভাবশালী পত্রিকায় রবীন্দ্র অনুসারী কাঁচা কবিতারই প্রাবল্য, নিছক ছন্দমিল দেওয়া সে সব অদ্ভুত জিনিস। 'আধুনিক কবিতা', তখনও, শিক্ষিত মহলেও হাসিঠাট্টার বিষয়। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন একজন অল্পজ্ঞাত কবি, অনেকদিন তাঁর কোনও কবিতার বই ছাপাই হয়নি। মৃত্যুর পর সবচেয়ে বড় ইংরেজি দৈনিকের ছোট খবরে তাঁর নাম ভুল ছাপা হয়েছিল। একটি বাংলা সংবাদপত্রে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছিল শুধু অধ্যাপক হিসেবে, কোনও কোনও সংবাদপত্রে কোনও খবরই ছাপা হয়নি।

আমার কৈশোর কাটে রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে। তখনকার কবিতা পিপাসু কিশোর ও তরুণেরা পাগলের মতন রবীন্দ্রনাথের কবিতাই পড়ত। নিজে কবিতা রচনা শুরু করার আগে আমি ছিলুম একজন খুদে আবৃত্তিকার। একজন মাস্টার মশাই-এর উৎসাহের আতিশয্যে আমি বিভিন্ন জলসায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর স্টাইলে গলা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে আবেগে প্রায় চোখে জল এনে ফেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে হাততালি পেতুম। (এখনকার অনেকেই বোধহয় জানেন না যে এক সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে নির্মলেন্দু লাহিড়ী ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চেয়েও জনপ্রিয়। তখনও শম্ভু মিত্র ঠিক মতন আসেননি। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তির রেকর্ড গ্রামে-গঞ্জেও বাজাতে শোনা যেত)। তখনকার কোনও জলসায় নজরুল-পরবর্তী কোনও কবির কবিতাপাঠ ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। সদ্যমৃত সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ছোট-ছোট গোষ্ঠীতে পরিচিতি পাচ্ছে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যথার্থই ছিল আমার প্রিয়। রাত্রিরবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আমি উঠে অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে নিতুম। সেইসব কবিতা ছিল আমার নির্জনতার সঙ্গী, বিশেষ ভালো লাগা কোনও কোনও লাইন অপরকে জানাবার জন্য, আমি বিনা কারণেই একে ওকে তাকে চিঠি লিখতুম তখন, এমনকি রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের গদ্য কবিতাগুলিও অধিকাংশই ছিল আমার মুখস্থ।

অন্য কারুর প্ররোচনায় নয়, কোনও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রভাবেও নয়, নিজে থেকেই আস্তে-আস্তে আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে সরে আসি। ক্রমশ, তার কবিতাগুলি পান্‌সে লাগতে থাকে। মনে হয় যেন অতি সরলীকরণ। রহস্যময়তা বড় কম। একটি স্তবকে যা বলা হয়ে গেছে, সেটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও পাঁচটি স্তবকে লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য তখনও আমাকে আকর্ষণ করে। তার অনায়াসে লেখা সব পুস্তক-সমালোচনা, প্রাচীন-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ, ছোটগল্প সবগুলি, কয়েকটি উপন্যাস, কয়েকটি নাটকে যে গদ্যশিল্পীকে পাই, যে পরিশীলিত রুচি, যে বিশাল মানুষটির অন্তঃকরণ ফুটে ওঠে, তাঁর প্রতি বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

গত দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের কোনও লেখা শখ করে আবার পড়বার ইচ্ছে হয়েছে, এমন তো মনে পড়ে না। দৈবাৎ তাঁর রচনাবলি হাতে এলে চতুরঙ্গ যোগাযোগ বা চার অধ্যায় আবার পড়ে যেতে ভালো লাগে, আবার অনেক লেখা পড়তে-পড়তে বই বন্ধ করে দিতেও ইচ্ছা হয়। একটা বিশেষ কারণে সম্প্রতি তাঁর মুক্তধারা নাটকটি আমায় অনেকবার পড়তে হয়েছে। ফাঁপা গাল-ভরা মহত্ত্বের প্রতি ঝোঁকের দোষে তাঁর এই ধরনের অনেক রচনা দুষ্ট বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর

গান এখনও পুরোন হয়নি। শুধু সুরের আনন্দের জন্যই নয়, শুধু বাণীর বৈচিত্র্যের জন্যও নয়, আরও কিছু আছে, একটা কোন জাদু, যার নাম শিল্প, তার জন্যই এই সব গান এখনও আমাদের মন ভরিয়ে রাখে। এই সব গানগুলির কাব্যরসের আবেদন এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, হয়ত তার কারণ এগুলি সংক্ষিপ্ত। বহুবার শোনা গানের একটা দুটো লাইন হঠাৎ মনটা আলোকিত করে দেয়। মাঝে মাঝেই তাঁর এইসব গানে আশ্চর্য ভাষা ব্যবহারের সৌন্দর্য নতুন করে খুঁজে পাই। একা-একা তাঁর গান শুনতে-শুনতে অকস্মাৎ চোখে জল এসে যায়। এই অশ্রু মন ভালো করে দেয়। আজও রবীন্দ্রনাথ এতখানি আনন্দের ভান্ডার, এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকি।

॥ নয় ॥

গ্রিস থেকে যখন কেউ কায়রো আসবেন বিমানে, সকালে আসবেন না। দুপুরেও না। রাত্রে আসার তো কোনওই মানে হয় না। বিকেলে আসবেন, যখনও ঠিক সন্ধে হয়নি, অথচ রোদ্দুরের তেজ মরে গেছে। আলো তখনও আছে, কিন্তু তাপ নেই।

আথেনসের বিমান বন্দরটা ছোট। এপাশে সমুদ্র, ওপাশে পাহাড়ের সারি, মাঝখানের সমতল উপত্যকায় ছোট বাড়ি। আকাশে মেঘ নেই। গ্রিসের আকাশে কদাচিৎ মেঘ থাকে।

প্রতীক্ষা গৃহ থেকে হয়তো কিছুটা হেঁটে গিয়ে আপনাকে প্লেনে উঠতে হবে। অথবা প্লেন আসতে যদি দেরি হয়, কিছুটা হয়তো অপেক্ষা করতে হবে এয়ারপোর্টে। আপনার ভালোই লাগবে। নাকে আসবে সমুদ্রের লবণ-হাওয়া, আপনার বুকের মধ্যে একটু-একটু দ্রিম দ্রিম শব্দ হবে।

না, আমি এয়ারপোর্টের বর্ণনা লিখতে বসিনি। একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করতে চলেছি।

গ্রিস ভ্রমণের চেয়ে, গ্রিস ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটি কম আকর্ষণীয় নয়। প্লেন আসার পর আপনি গিয়ে প্লেনে উঠলেন। সিট বেলট বাঁধলেন কোমরে, কানে তালা লাগানো শব্দ। হাওয়ার জাহাজ হাওয়ায় উঠল।

তখনও আপনার বিশেষ কিছু মনে হবে না। প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আপনার তো নতুন নয়, বরং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, এখন যে কোনও দিন প্লেনে উঠেই কত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছনো যায় সেইজন্যই আপনার ব্যস্ততা থাকে। এবার প্লেন যখন শূন্যে উঠে সমান হয়েছে, উড়ে চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। আপনি কোমর থেকে সিট্ বেলট খুলে সিগারেট ধরিয়েছেন। ছেড়ে আসা গ্রিসের জন্য সামান্য বুক টনটন করছে। সেই স্বপ্নের গ্রিস। দেখা হয়ে গেল, এখন বিদায়। হয়তো আপনার ইচ্ছে হবে—যদি ভাগ্যবশত জানলার ধারের সিট পান—জানালা দিয়ে একবার শেষবার গ্রিসের দিকে তাকাতে। শেষবার অ্যাক্রোপলিসের দিকে দেখে নিতে। আপনি পিছনে ফিরে তাকাবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠবেন বিষমভাবে।

ও কি! পিছনের আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলছে শেষ গোধূলিতে। যেন ভয়ংকর আগুন লেগে গেছে গ্রিসে—আপনি আসার ঠিক পরেই কি অগ্নিকান্ড হল? বিষম বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটু-একটু করে আপনার মনে পড়বে—ওই আগুন ইউরোপের আগুন। পিছন দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আপনি সামনের দিকে তাকাবেন। সামনের আকাশ নিকষ কালো। বিষম অন্ধকার ওই মিশরের দিকে। মিশর নয়, সমস্ত প্রাচ্যে অন্ধকার। সূর্য প্রাচ্যদেশে আগে ওঠে, আগেই অস্ত যায়। তাই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবেন সন্ধ্যা নেমে গেছে, পিছনের দিকে তবুও শেষ সূর্যের আগুন।

তৎক্ষণাৎ আপনার মনে পড়বে আপনি পাশ্চাত্য দেশ ছেড়ে এসেছেন। এই মাত্র আপনি প্রাচ্য দেশের লোক, ভারতবর্ষের কিংবা বাংলাদেশের কোনও যুবা। আপনি নিজের দেশে ফিরছেন। আপনি এখন ভূমধ্যসাগরের ওপরে আছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থলে। আপনার গা ছমছম

পারবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি চরিত্র নদীয়া আর যশোর জেলার সীমান্তে একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল এখানে দুটো জেলা এসে মিশেছে, দুই চরিত্র। আর আপনি এখন আছেন দুই পৃথিবীর মাঝখানে—প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে আপনি ত্রিশঙ্কু। সামনে অন্ধকার পিছনে আগুন। একদিন সভ্যতা জেগে উঠেছিল প্রাচ্যে এখন অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। আর পিছনে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন জ্বলছে দাউ-দাউ করে, হয়তো শিগগিরই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই উপলব্ধি মাত্রই এক ধরনের অলৌকিক অনুভব হবে আপনার। হঠাৎ আপনার গলা থেকে টাই খুলে ফেলতে ইচ্ছে হবে। মুখ ও নাক দিয়ে যুগপৎ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলা মাত্র আপনার মুখের চেহারা বদলে যাবে। ইওরোপ আমেরিকা—পশ্চিমের যেকোনও দেশে থাকার সময় আপনার মুখটা অন্যরকম হয়ে যায়—হাসি অন্যরকম, গলার স্বর অন্যরকম, হাঁটা অন্যরকম, চাহনি অন্যরকম। চেষ্টা করে ভুরু টান করে রাখতে হয়—নচেৎ অনিচ্ছায় বারবার ভুরু কুঁচকে আসে। জুতোর তলায় ধুলো লাগলে অস্বস্তি হয়, প্যান্টের ক্রিজ ঠিক না থাকলে বিরক্তি আসে, বার বার নিজের গলার কাছে হাত চলে যায়—টাইয়ের গিঁট ঠিক আছে কি না দেখার জন্য। হাঁচি পেলে হাঁচা যায় না, সর্দি লুকোতে হয় রুমালে, খাবার পর ঢেঁকুর তোলা তো রীতিমত পাপ। চা খাবার সময় ভয় হয়—পাশে শপ শপ শব্দ না হয়ে যায়। আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই—আসলে আপনি পূবের লোক—পশ্চিমে গিয়ে অন্যরকম। পশ্চিমে সাহেব-সুবোর পাশে দাঁড়ানো আপনার ছবি দেখে আপনার বাড়িতে সকলে বলেছে, ওমা, কত বদলে গেছে। আসলে আপনি বদলাননি, যা বদলেছে তা আপনার অভিব্যক্তি। সাময়িকভাবে বদলেছে মুখের রেখা।

যেই মাত্র আপনি অনুভব করলেন, আপনি পশ্চিম ছেড়ে এসেছেন। অমনি—(না, আপনার কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেলে—একথা বলব না। অনেকের শেষ পর্যন্ত ভূত নামে না—) আপনার সেই কৃত্রিম মুখের রেখা মিলিয়ে যাবে। আপনার উদ্ভাসিত মুখ সেই আপনার পুরানো নিজস্ব মুখ। আপনার বোধ হবে আপনি নিজভূমিতে ফিরে এলেন—মিশর আপনার দেশ নয়, কিন্তু সেই একই মাটি—যে মাটির সঙ্গে আপনার দেশ যুক্ত। একা-একা বসেও আপনার মুখের নিঃশব্দ হাসিটি মনে হবে বাংলা ভাষার হাসি। আপনার মনে হবে হঠাৎ আপনার শরীর খুব হালকা হয়ে গেছে।

—আমার মনে হয়েছিল।

॥ দশ ॥

ক্লিয়োপেট্রার যদি নাকটা একটু ছোট হত, তা হলে সিজার কিংবা অ্যান্টনি এমনভাবে তার প্রেমে পড়তেন না। অত সহজে তা হলে কি আর ভেঙে যেত রোমান সাম্রাজ্য—খ্রিস্টধর্ম হত আরও বিলম্বিত, পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো হত অন্যরকম। অথবা তারও আগে মদ খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করে কিংবা পেটের অসুখে অত অল্প বয়সে যদি মারা না যেতেন মহাবীর আলেকজান্ডার, তাহলে ম্যাসিডোনিয়ার ওই তেজি ছোকরা পৃথিবীর চেহারা কীরকম করে দিতেন কে জানে। তাঁর মৃত্যুর পরই অমন করুণ দৃশ্য হত না, বিশাল গ্রিক সাম্রাজ্যের আর একবার কি ভারতবর্ষের শেষ দিকে এই বাংলাদেশ পর্যন্ত আসার চেষ্টা করতেন না? কিংবা ওয়ার্টলুর মাঠে যদি হঠাৎ বৃষ্টি না হত, যদি রোখা না যেত নেপোলিয়ানকে, তা হলে আমরা আজ নিশ্চিত ইংরেজির বদলে ফরাসি শিখতুম। টিপু সুলতানকে অত সহজে ঘায়েল করে ভারতের মাঠে-মাঠে আর ইংরেজের বিউগ্‌ল বাজত না তবে। কিংবা নর্মান্ডি অবতরণের সময় হিটলার যদি স্লিপিং পিল খেয়ে না ঘুমাতেন—যদি তিনি প্যানজার বোমারু বাহিনী ছেড়ে দেবার অনুমতি দিতেন তা হলে কোনদিকে ঘুরে যেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে জানে, কে জানে ওই রণদুর্মদ রক্তপাগল পৃথিবীতে আরও কত কেলেঙ্কারির স্রোত বইয়ে দিতেন।

ইতিহাসের অনেক বিশাল সন্ধিক্ষণে এমন অনেক মজার ছোটখাটো ঘটনা আছে। জয়পালের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অমন বদ মতলব যদি পৃথ্বীরাজের না হত—তা হলে ভারতে মহম্মদ ঘোরীর আগমন আরও কত বিলম্বিত হত। এমন জল্পনা করার লোকের অভাব নেই। একজন লেখক লিখতেন—নর্ম্যান্ডিতে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের আসল কারণ নাকি রোমেলের স্ত্রীর জন্য এক জোড়া সাদা জুতো। রোমেল কারুকে না জানিয়ে বিবাহ বার্ষিকীতে স্ত্রীকে উপহার দেবার জন্য ফ্রন্ট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। নইলে রোমেল উপস্থিত থাকলে এত সহজে—হয়তো এসব জল্পনাই। ইতিহাস এত তুচ্ছ কারণে বদলায় না, সে তার নিজস্ব গতি নেবেই।

পৃথিবীর কয়েকটি ভৌগোলিক বদল সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। কয়েকটি ভৌগোলিক পরিবর্তন মানব সভ্যতার কী আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে, যেগুলি না ঘটলে এ পৃথিবীকে নিশ্চিত অন্য পৃথিবী মনে হত। যেমন হিমালয় পর্বত যদি না থাকত ভারতের উত্তরে, সাহারা মরুভূমি যদি মরুভূমি না হত সত্যিই। অর্থাৎ যেমন ছিল আগে।

ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, যেখানে এখন হিমালয়, আগে সেখানে ছিল এক অতি গভীর সমুদ্র, নাম তার টেথিস, হিমালয় তার কত নীচে ডুবে ছিল কে জানে। অসম্ভব ছিল না ডুবে থাকা। হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শিখর এভারেস্টের উচ্চতা সাড়ে পাঁচ মাইলের কাছাকাছি, পৃথিবীর গভীর মহাসমুদ্রগুলির এখনও কোথাও-কোথাও গভীরতা ছ'মাইলের বেশি। যাই হোক, তারপর একদিন পৃথিবীর খামখেয়ালে হল বিষম ভূমিকম্প, টেথিস সাগর গড়িয়ে এল ভারতের নীচের দিকে, বিছিন্ন হয়ে গেল অনেকখানি ভূভাগ, দূরে সরে গিয়ে এখন তার নাম অস্ট্রেলিয়া, জন্ম হল দুটি ছেলে-মেয়ে উপসাগর সমেত ভারত মহাসাগর।

হিমালয় না থাকলে কী হত? কাব্য সাহিত্যের যে সমূহ ক্ষতি হত—তা ঠিকই। ম্রিয়মাণ কালিদাসের মুখ এখনই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে কোনও পাহাড় নেই, তাদের কাব্যসাহিত্য কিন্তু সেজন্য কম সম্পদশালী নয়, তারা সমুদ্রের বন্দনা করেছে।

এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত হতেন জগমাতা দুর্গাসমেত মহাদেব, পদব্রজে স্বর্গে যাওয়ার কোনও উপায় থাকত না যুধিষ্ঠিরের। কোথায় থাকত পুণ্যসলিলা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুই বা হয়তো কোথায়। হিমালয়ের গায়ে অনেক জলজ জন্তু—মাছের অস্থিজীবি পাওয়া গেছে। কিন্তু তবুও মুনি-ঋষিরা অপবিত্র জ্ঞানে তাকে কখনও বর্জন করেননি, ওই নাগাধিরাজের গুহা কন্দরেই একদিন ভারতবর্ষের মহাওঙ্কার ধ্বনি প্রথম জেগেছিল।

হিমালয় ব্যতীত ভারতবর্ষ হত শীতপ্রধান দেশ। সাইবেরিয়া থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইত সারা বছর। আমরা সবাই হতুম ফরসা লোক। মৌসুমী হাওয়া হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে সারা উত্তর ভারতে, বাংলাদেশে যে বৃষ্টি ছড়াচ্ছে সেটা পাওয়া যেত না। বঞ্চিত হতুম বিশাল অরণ্যসম্ভার থেকে। ওই বিশাল প্রহরী না থাকলে রাশিয়া থেকে ভারত আক্রমণ হত বহুবার নিশ্চিত।

হিমালয় না থাকলে নেপাল-ভুটান-সিকিম-তিব্বতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না আমাদের। পাহাড় ঘেরা ছিলুম বলে বহুকাল আমরা শুধু ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলে জানতুম। হিমালয় বাইরের শত্রুর কাছে ভারতকে দুর্ভেদ্য করেছিল, আবার তার বিপরীত অর্থে, ভারতের বাইরে ভারতের ক্ষমতা বিস্তারের কথা কখনও মনে পড়েনি। ফলে আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে গেছে রক্ষণশীল।

সেই জন্যেই বাইরের শত্রু এসে বহুবার অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের পর্যুদস্ত করেছে। চোখের সামনে অমন গগনভেদী পাহাড়—তারই বন্দনা করছি আমরা। ওই বিশাল রহস্যের ভেদ করতে চাইনি বলে আমাদের জাতীয় চরিত্রও হয়ে গেছে মিস্টিক। আমরা সমুদ্রকে উপেক্ষা করেছি। অথচ সমুদ্রজয়ী জাতিগুলিই একদিন পৃথিবী জয় করেছে। হোমার লিখলেন, ইউলিসিসের অজানা সমুদ্র অভিযান, আর আমাদের দৌড় লঙ্কাদ্বীপ পর্যন্ত, তাও সেতুবন্ধন করে, জাহাজ-টাহাজ নয়! জলস্পর্শ বারণ। প্রাচীন হিন্দু রাজারা নৌবিদ্যায় রয়ে গেলেন অজ্ঞ—তারপর মুসলমান শাসকরা এল আরবের

মরুভূমি, পাহাড় থেকে, তারা ভালো করে সমুদ্র চোখেই দেখেনি! উত্তর হিমালয় ভারত পাহারা দিচ্ছে, এই জেনে নিশ্চিত হয়ে প্রায় তিন দিকের উপকূল রয়ে গেল চিরকাল অরক্ষিত।

হিমালয় না থাকলে ভারতের দক্ষিণে আরও জমি থাকত। জনসমস্যার সমাধান হয়ে যেতো অত সহজে। আলাদা হত না সিংহল। সুতরাং সিংহল প্রবাসী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার কোনও কথাই উঠত না। যে স্থলভূমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওখান থেকে—তা যদি হয় আজকের অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ, বাংলাদেশের নীচের ভাঙা জায়গাটায়—সারা বঙ্গোপসাগর জুড়ে কী চমৎকার ফিট করে যায়—তাহলে আরও অতখানি জমি থাকতো আমাদের অধিকারে, কি বিশাল হত বাংলাদেশ, বিভক্ত হলেও উদ্বাস্তু সমস্যা থাকতো না নিশ্চিত। তার বদলে, আজ সেই অস্ট্রেলিয়া জুড়ে রয়েছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে আসা ইউরোপীয়রা। আজ এমন স্পর্ধা তাদের যে, কালো লোকেদের—ইমিগ্রেশান বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

তা হলে হিমালয়কে নিয়ে অত উচ্চতার গর্ব থাকত না আমাদের—কিন্তু পাক-ভারত-বাংলার ব্যাপ্তি হত আরও বিশাল। চিনের সমকক্ষ। এখন এই শীতকালে সারা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জুঁইফুলের মতো বরফ পড়ত। এদিকের আবহাওয়া হত অনেকটা আমেরিকার মতো। কে জানে, রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় আমেরিকা এই ভারতেই হত কি না।

ভূগোলের এ রকম আর একটা খামখেয়ালি ঘটেছিল সাহারা মরুভূমিতে। ভূতত্ত্ববিদরা যাকে বলেন চতুর্থ বরফ যুগ, সেই সময় আফ্রিকা ছিল অনেক সুযোগভুক্ত। তখন কী দুর্দশা ইউরোপে, সমস্ত উত্তর ইউরোপ বরফে ঢাকা, আল্পস্ ও পিরেনিজ থেকে বিশাল-বিশাল বরফের চাঁই নেমে আসত। প্রায় গোটা ইউরোপই ছিল মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। ছিল প্রকাণ্ড সোমশ হাতি, পশমওলা গণ্ডার। আর সাহারায় তখন অগভীর জল, নলখাগড়ার বন, নানারকম ছোট সাইজের জানোয়ার। অনেক সুস্বাদু মাছ—আর এক জাতের মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে সেগুলো মেরে মেরে বেশ সুখে আছে। টাটকা মাছ-মাংস আর বনের ফলমূল, তখনও আগুনের ব্যবহার আসেনি, সুতরাং রাগ হিংসা আসেনি, সেই সময় সভ্যতার ভোর শুরু হত।

কিন্তু তা হয়নি। আরম্ভ হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বরফ সরে যেতে লাগল আর্কটিক মহাসমুদ্রের দিকে—সারা ইউরোপে জন্মালো অসংখ্য চারাগাছ। কত রকমের ঘাস ফুল। ফুল থেকে এল ফল। তারপর বনস্পতি, সুবাতাস, যাযাবর মানুষ। ইউরোপ হয়ে উঠল মনুষ্যবাসের রম্যভূমি। আটলান্টিক থেকে বার্মার জোলো হাওয়া মুখ ফিরিয়ে বইতে লাগল উত্তর ইউরোপে, দিতে লাগল সুফলা বৃষ্টি। সে হাওয়া তার মুখ ফিরিয়ে এল না আফ্রিকা—এশিয়ার বিশাল ভূমিখণ্ডে, সাহারা শুকিয়ে গেল। হা-হা করতে লাগল তৃষ্ণায়, পরিণত হল পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমিতে। সেই মরুভূমির ছোঁয়াচ লাগল আশেপাশেও। আফ্রিকার আর জাগরণ হল না।

যদি অচলাবস্থা বজায় থাকত—তবে কে জানে, আফ্রিকানদের দর্পিত পদভারেই সারা পৃথিবী টলমল করত—ইউরোপের বরফ গলতেই একদিন কিন্তু ততদিনের বৃষ্টিহীন আফ্রিকা যদি কালো না হয়ে যেত—তবে, প্রস্তুত হয়ে থাকত একদল সংঘবদ্ধ মানুষ। তারাই বেরিয়ে পড়ত ইউরোপ দখলে। প্রকৃতির পরিহাসে তা তারা পারেনি। সাহারা থেকে ভ্রষ্ট প্রধান আদিম মানুষের দল যাযাবর হয়ে যায়। নিজেরা সভ্যতা গড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে—তাই সভ্যতার ওপর জাতক্রোধ জন্মে যায় হয় তো তাদের। পৃথিবীর নানান সভ্যতা এদের প্রতি আক্রমণে বারবার কেঁপে উঠেছে। দুর্ধর্ষ তাতার, হুনেরা ওই যাযাবরদেরই বংশধর।

সাহারা যদি শস্যশ্যামলাই থাকত, আর ইউরোপ বরফ ঢাকা—তাহলে কি হত পৃথিবীর ইতিহাস কে কল্পনা করতে পারবে। এত দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকার বদলে আজ আফ্রিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই হয়তো হত জয়জয়কার। হয়তো নিগ্রোদের মতো কালো হওয়াই হত খুব সুন্দর হওয়ার চিহ্ন। আমাদের দেশের মায়েরা মেয়ের বিয়ের জন্য কাঠকয়লার মতন কালো চেহারার পাত্র খুঁজতেন। সবাই বলত, কালো জগতের আলো।

॥ এগারো ॥

গাড়িটা পিচ রাস্তা ছেড়ে নামতেই এক রাশ ধুলো উড়ছে। ধুলোর মেঘে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঢেকে গেল লোকগুলো। চার-পাঁচজন মানুষ, মুখোমুখি দুটি কাঠের বেঞ্চিতে বসা। সামনেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান।

আমার লজ্জায় ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে করলে। আমি গাড়ি চড়ার আরাম উপভোগ করি বটে। কিন্তু গাড়ি-শ্রেণির মানুষ নই। এ রকম রাস্তার ধারের চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আমি বহুবার বসে থেকেছি, হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে কোনও গাড়ি এসে থামলে আমি নিশ্চয়ই চটে লাল হয়ে যেতাম। গালাগালি দিতাম গাড়ির মালিককে।

এ গাড়ির মালিক অবশ্য আমি নই, আমার বন্ধু অলোক এটা ভাড়া করেছে, তাকেই উপ-মালিক বলা যায়। অলোক গর্জন করে বলল, ইডিয়েট। এনক্রোঞ্চমেন্টের একটা সীমা আছে। একেবারে রাস্তার ওপরে বেঞ্চ পেতেছে। এরপর এরা মাঝ রাস্তায় দোকান খুলে বসবে।

লোকগুলো কিন্তু রাগারাগি করল না, বরং দু-তিনজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল।

এই খাতিরটা অবশ্য আমাকে কিংবা অলোককে নয়, ধুলোর আড়াল সরে গেলে ওরা রোজমেরিকে দেখতে পেয়েছে। সাদা চামড়ার প্রতি সমীহ এখনও আমাদের মজ্জায়-মজ্জায়। মেমসাহেব বলে কথা। সকলেই রোজমেরিকে দেখছে।

অনেকদিন বাদে আমেরিকা থেকে স্ত্রীকে নিয়ে দেশে বেড়াতে এসেছে অলোক। একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে কাছাকাছি মফস্বলে। চা-তেষ্টার জন্য এখানে থামা।

রোজমেরি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রয়েছে। একটা পচা কাঁঠালের গন্ধ আমিও পাচ্ছি। এমনই গরম যে একটা কাক কা-কা ডাকের বদলে খ্যারর-খ্যারর করে ডেকে উঠল।

রোজমেরি অবশ্য কোনও অভিযোগ করে না। গরম কিংবা দুর্গন্ধ সে হাসিমুখে মেনে নেয়, ধুলোতে তার সত্যিই কষ্ট হয়; দম আটকে আসে। কিন্তু আমাদের মতন গরম দেশে ধুলো এড়াবার তো উপায় নেই।

দোকানটির জীর্ণ অবস্থা দেখে অলোক খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, এখানে কী চা খাওয়া যাবে? খুব নোংরা জায়গাটা।

রোজমেরি একটা বেঞ্চে বসে পড়ে বলল, ইট্স ওকে। তুমি ওদের চিনি কম দিতে বলো না। যত ইচ্ছে দিক। আমি টিপিক্যাল রোড সাইড স্টলের চা পান করতে চাই।

একটা বড় কড়াইতে কালো কুচকুচে রঙের তেলে আলুর চপ ভাজা হচ্ছে। ওই একই তেলে দিনের পর দিন অনেক কিছু ভাজা হয়। যাদের স্বাস্থ্য বাতিক আছে তারা ওই সব খেতে ভয় পায়, কিন্তু গরম আলুর চপ দেখলে আমার জিভে জল আসে। বাড়ির তেলে ভাজায় কখনো এমন চমৎকার স্বাদ হয় না।

অলোক চায়ের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে; আমি দোকানের একটা বাচ্চা ছেলেকে বললাম, এই আলুর চপ দে তো।

ছেলেটা ধপধপে সাদা দাঁতে হেসে জিগ্যেস করল, কয়টা দেবো স্যার?

অলোক আমার দিকে কটমট করে তাকাল। আমেরিকার বাসিন্দা হবার ফলে তার চোখে এইসব দোকানের ভাজাভুজি একেবারে বিষ।

আমি ছেলেটাকে বললাম, মেম সাহেব খাবে না, এই সাহেবও না। আমার জন্য আন, আর গাড়ির ড্রাইভার খাবে কি না জিগ্যেস করে দ্যাখ।

অন্য লোকগুলো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোজমেরির দিকে।

রোজমেরি আগেই বলে দিল, তোমাদের দেশে এই একটাই প্রধান অসুবিধে। অচেনা লোকেরা সোজাসুজি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অথচ কোনও কথা বলে না।

ওদের দেশে কারোর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাই বলা নিয়ম। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ একজন মেম সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সাহসই পায় না। আমি রোজমেরিকে বলেছিলুম তুমি বিশেষ দ্রষ্টব্য, তাই তোমাকে দেখে সবাই।

বাচ্চা ছেলেটা একটা শাল পাতায় দুটো আলুর চপ এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, মেম সাহেব আলুর চপ খায় না?

আমি বললুম, তুই জিগ্যেস করে দ্যাখ না।

ছেলেটা লজ্জায় গা মোচড়াতে লাগল। হিজল গায়ের রং, একটা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা, মুখখানা বেশ মিষ্টি, টলটলে দুটি চোখ। খুব ভাবতে ইচ্ছে করে যে ছোট বেলায় আমার মুখখানাও ওই রকমই ছিল।

আমি আবার বললুম, লজ্জা কী, জিগ্যেস কর না। এই মেম একটু একটু বাংলা বোঝে।

রোজমেরি আমার দিকে ফিরে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তুমি একলা-একলা কী খাচ্ছ? আমাদের দিচ্ছ না কেন?

আমি বললাম, তোমাকে দিলে তোমার বর বকবে। এটা অত্যন্ত সুস্বাদু বিষ।

এইবার ছেলেটা লজ্জা ভেঙে হঠাৎ বলে উঠল, মেম সাব, নট ইট আলুর চপ?

আমি চমকে উঠে, ছেলেটার গালে একটা টোকা মেরে জিগ্যেস করলাম, বাঃ! তুই দেখছি ইংরিজিও জানিস। ইস্কুলে পড়েছিস বুঝি?

ছেলেটা বলল, কেলাস থিরি, সাহেব।

রোজমেরি ওর কথা বুঝতে পারেনি। জিগ্যেস করল, কী বলছে, এই সুইট ছেলেটি কী বলছে?

আমি বললুম, ও তোমাকে ইংরিজিতে জিগ্যেস করল, নট ইট? তুমি আলুর চপ খাও না?

রোজমেরি বলল, অফ কোর্স আই শ্যাল টেইস্ট ইট!

আমার হাত থেকে একটা আধ খাওয়া আলুর চপ নিয়ে রোজমেরি এক কামড় দিয়ে বলল, উমম ডিলিশাস। চমৎকার। এতক্ষণ দাওনি কেন?

তৃতীয় কামড় দিয়ে অবশ্য রোজমেরি ঝালের চোটে মাথা চাপড়াতে লাগল আর উস্‌স উস্‌স করে লাফাতে লাগল প্রায়।

অলোক সব দোষ চাপাল আমার ঘাড়ে। বাচ্চা ছেলেটা রোজমেরির কাণ্ড দেখে হেসে উঠল খিলখিল করে। অন্য লোকরাও হাসি চাপতে পারছে না।

আমি অম্লানবদনে খেয়ে যেতে লাগলুম। ঝাল তো হবেই। সস্তার দোকানের যেকোনও জিনিসই বেশি ঝাল হয়। পচা জিনিস-টিনিস দিলে তার মধ্যে অনেক লঙ্কা ঠেসে দেয়, যাতে অন্য কোনও স্বাদ আর পাওয়া না যায়।

বউয়ের অবস্থা দেখে অলোক খুব রাগারাগি শুরু করলেও রোজমেরি অবশ্য লজ্জা পেয়ে গেছে। একটু ঠান্ডা হওয়ার পর সে বলল, মেক্সিকানরাও খুব ঝাল খায়। এবার ফিরে গিয়ে আমিও কাঁচা লংকা খাওয়া প্র্যাকটিস করব। অলোক যে একেবারেই ঝাল পছন্দ করে না।

আমি বললুম, অলোক যে সাহেবদের থেকেও বেশি সাহেব।

ছোট ছেলেটা মুখের ওপর হেসে উঠলেও রোজমেরি তার ওপর রাগ করেনি। সে মুখ ঝুঁকিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

ছেলেটা বলল, আমার নাম সেফু।

আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলুম, কী বললি।

সে এবার স্পষ্ট করে বলল, আমার নাম সৈফুদ্দিন, সাব।

সবাই সেফু বলে।

—তোর বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি...আমার বাড়ি নাই, সাব!

—বাড়ি নেই মানে? তুই থাকিস কোথায়? দোকানের মালিক এবার গলা বাড়িয়ে জানাল, ও ছেলেটা এই দোকান ঘরেই শুয়ে থাকে।

আমি সেফুকে আবার জিগ্যেস করলাম, তোর বাবা-মা কোথায় থাকে?

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে দু-দিকে মাথা নাড়ল। অন্য বেঞ্চির লোকগুলো কিছু একটা বলার সুযোগ পেয়ে প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, ওর বাপ-মা নেই। মা মরে গেছে। বাপটা ওকে ফেলে কলকাতায় চলে গেছে।

রোজমেরি এত বাংলা বুঝতে পারে না। তাকে সব বুঝিয়ে দিতে হল। রোজমেরির কৌতূহল প্রবৃত্তি বেশি, সে ছেলেটি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চায়।

অলোকের এ সব বিষয়ে আগ্রহ নেই। সে অস্থির হয়ে বলল চা খাওয়া তো হয়ে গেছে, এবার চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আমি ছেলেটাকে জিগ্যেস করলাম তুই ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিলি, ইস্কুল ছেড়ে দিলি কেন?

বলেই বুঝতে পারলাম, এটা একটা বোকার মতো প্রশ্ন। যে ছেলের মা নেই, বাবা পরিত্যাগ করে চলে গেছে, নিজস্ব কোনও মাথা গোঁজার কোনও জায়গা নেই, রাত্তিরে শুয়ে থাকে একটা নড়বড়ে চায়ের দোকানে। সে আবার ইস্কুলে যাবে কী? ইস্কুল-টিস্কুল ওদের জন্য নয়।

রোজমেরির নরম মন, হঠাৎ যুক্তিহীন দয়ামায়ায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে ইংরিজিতে জিগ্যেস করল, এ চমৎকার ছেলেটিকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না।

অলোক ধমক দিয়ে বলল, পাগল নাকি! আমরা দু-সপ্তাহ বাদে ফিরে যাচ্ছি, একে কোথায় রাখবে? এরকম হাজার হাজার ছেলে আছে আমাদের দেশে।

সেফু বলল। সাব, কাটারার মসজিদ দ্যাখতে যাবেন? আমি গাইড হতে পারি।

আমি বললাম, না রে, আমরা আর ওদিক যাব না।

সেফু বলল, চলেন না সাব। বেশি দূর না। ট্যাক্সিতে গ্যালে মাত্র দশ মিনিট। আমি সব দেখিয়ে দেব।

আমরা মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ি, ইমাম বাড়া, খোসবাগ দেখে এসেছি। এরপর কাটারার মসজিদ না দেখলেও চলে। আমার আপত্তি নেই, তবে সন্ধের মধ্যে কলকাতায় ফিরতে গেলে আর দেরি করা চলে না।

আমি সেফুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম নারে আমি কাটারার মসজিদ অনেকবার দেখেছি। আর এই সাহেব-মেমদের এখন সময় নেই। পরে আর একদিন আসব। কিন্তু তুই গাইডের কাজ কী জানিস রে?

সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, ভালো জানি, সাব শোনবেন। নবাব মুচ্ছিদ কুলি খাঁ যখন ছুবে বাংলার...তখন ইণ্ডিয়ান ভাগ্যাকাশে...একদিন এক পীর ছায়েব এসে বললেন...

উল্টো দিকের বেঞ্চির লোকেরা বলল, মসজিদে অন্য গাইড আছে তো, এই ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনে তাদের কথা মুখস্থ করেছে।

রোজমেরি ইংরিজিতে আমাদের বলল, শ্যাল উই গিভ হিম সাম মানি?

আমার কাছে দু'টি একশো টাকার নোট আছে।

অলোক বলল, এটা তোমার একটা বিলাসিতা। বেশি টাকা দিয়ে তুমি ওকে স্পয়েল করবে। পরে যে সব খদ্দের কম টিপ্‌স দেবে, ও তাদের যত্ন করবে না। তা ছাড়া, তুমি ওকে একবার দুশো দিলে তাতে ওর কী উপকার হবে? খুব সম্ভবত দোকানের মালিক টাকাটা কেড়ে নেবে। দ্যাখো

না, লোকটি কী রকমভাবে তাকিয়ে আছে।

এ ব্যাপারে অবশ্য অলোকের সঙ্গে আমার দ্বিমত নেই। এই বাচ্চা ছেলেটিকে দুশো টাকা দিলে সেটা ওর কোনও কাজেই লাগবে না। এ দেশে একটা বাচ্চার হাত থেকেও টাকা কেড়ে নেবার মতন মানুষের অভাব নেই।

সুতরাং ওকে দু' টাকা বকশিশ দেওয়া ঠিক হল।

আমরা কাটারার মসজিদ দেখতে গেলাম না বলে সেফুর কোনও ক্ষোভ নেই। সে হাসি মুখে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে এল গাড়ি পর্যন্ত। রোজমেরির দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিটিয়ে সে বলল, সেলাম মেম সাব। আবার আসবেন।

গাড়িটা ছাড়ার পর রোজমেরি আমার দিকে ফিরে বিহ্বলভাবে বললে, একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। ওই ছেলেটা যখন বলল, ওর কোনও বাড়ি নেই, তখন ও হাসছিল কেন?

আমি ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালাম।

রোজমেরি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, চুপ করে আছ কেন? এটা কী করে হয়। ওইটুকু একটা ছেলে, মা-বাবা নেই, থাকার জায়গাও নেই। তবু ও হাসে কী করে? আনন্দে থাকে কী করে?

আমি তবু চুপ করে রইলাম। এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব? হাসি একটা অতি রহস্যময় ব্যাপার। ছেলেটা যখন বলেছিল, আমার কোনও বাড়ি নেই, তখন সত্যি ফিক করে হেসে ফেলেছিল। সে হাসির মর্ম আমি বুঝব কী করে?

॥ বারো ॥

মুখার্জি সাহেব গাড়িটা আস্তে করে আমায় জানলা দিয়ে দেখিয়ে বললেন, দেখছেন, ম্যাপল পাতাগুলো কী সুন্দর লাল হয়েছে।

পিছনের সিটে বসেছিল মুখার্জি সাহেবের সাত বছরের মেয়ে ঝুমি। সে আইসক্রিম মাখা মুখে বলল, ড্যারি (অর্থাৎ ড্যাডি) হাউ মেনি টাইমস আই টোলড য়ু, ইট ওয়াজ নট ম্যাপেল। ইট ওয়াজ মে-প্‌ল কান্‌চ য়ু রিমেমবার?

মুখার্জি সাহেব কাঁচুমাচুমুখে বললেন, আচ্ছা বাবা হয়েছে, হয়েছে। এবার থেকে ঠিক বলবো— মেপ্‌ল, মেপ্‌ল। হল তো!

আমি হাসতে লাগলুম। মুখার্জি সাহেব এরকম ভুল প্রায়ই করেন এবং ধমক খান মেয়ের কাছ থেকে। উনি হয়তো আমাকে সিঙাড়া খাওয়াতে-খাওয়াতে গত গ্রীষ্মের ভ্রমণ কাহিনী শোনাচ্ছেন; তারপর বুঝলে। আমরা তো গাড়ি নিয়ে পৌঁছলুম গোলড ওয়াটারের দেশ আরিজোনায় উঠছি টাক্‌সন শহরের এক—টেলিভিসানের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝুমি ইংরেজিতে ধমকালো, আবার ট্যাক্‌সন! বলেছি না টুস্‌ন।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে থাকে না। এমন বিচ্ছিরি বানানটা।

তারপর মুখার্জি সাহেব আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, দেখছো তো কাণ্ডটা। আমিও আমেরিকায় আছি পাঁচ বছর, আমার মেয়েও আছে পাঁচ বছর। অথচ ও কীরকম কথায়-কথায় আমার ভুল ধরে। আমি যেন একটা মুখ্যু।

না, মুখার্জি সাহেব যে মুখ্যু নন তাতে সন্দেহ নেই। উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত, আমেরিকায় আমন্ত্রিত অধ্যাপক। বছর পাঁচেক এদেশেই আছেন। সদালাপী মজলিশি লোক, কথাবার্তায় পাণ্ডিত্যের কোনও অভিমান নেই।

আমি আসি মাঝে-মাঝে আড্ডা দিতে, বাংলায় হাসাহাসি করতে। ওঁর স্ত্রীও সুন্দর রান্না করেন। কিন্তু ওঁদের মেয়ে ঝুমিকে দেখলে একটু অস্বস্তিবোধ করি, ওর মুখে ইংরেজির ফুলঝুরি শুনে আমিও খানিকটা হকচকিয়ে যাই। অথচ হালকা চেহারায় ঝুমিকে দেখতে ঝুমকো ফুলের মতই সুন্দর। সে যখন এদেশে আসে তখন তার বয়স দুই। এই পাঁচ বছরে সে বাংলা ভাষা আর শেখেনি। কিন্তু খাঁটি নাকি সুরে আমেরিকান ভাষা শিখেছে।

এই রকম আরও দেখেছি। প্রবীন বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা অনেক দ্রুত শিখে নিচ্ছে সেই দেশের ভাষা এবং সেইরকম দ্রুতভাবেই অনেক কথা, ভুলে যায় মাতৃভাষা। বয়স্করা ছেলেবেলা থেকে যে সব ভুল উচ্চারণ শিখে এসেছেন তা আর বদলাতে পারেন না সহজে—গানের সুর একবার ভুল শিখলে যেমন সহজে আর আসল সুরটা তোলা যায় না। শিকাগোতে অর্থনীতির একজন বাঙালি ছাত্র—চার বছর থাকার পরও এখনও উচ্চারণ করে চিকাগো। আমার মৃদু হাসি দেখে তিনি বললেন, কী করবো ভাই সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন—তারপর থেকে মুখ দিয়ে শুধু চিকাগো বেরিয়ে যায়।

জেনিভাতে আছেন এরকম এক দম্পতি, ছ'বছর ধরে, ভদ্রলোক কর্মাশিয়াল আর্টিস্টের কাজ করেন। জেনিভার ভাষা হচ্ছে ফরাসি কিন্তু আমাদের পরিচিত এই ভদ্রলোক ছ বছরেও ভালো ফরাসি শিখতে পারেননি। অথচ ওর পাঁচ বছরের ছেলে বল্টু কি ঝরঝর করে ফরাসি বলে। ওর বাবা অনেক সময় ডেকে জিজ্ঞাসা করেন। হ্যাঁরে, বল্টু, হাতুড়ির ফরাসি কী রে? বল্টু অম্লানমুখে বলে দেয়। দুজনেরই পাঁচ বছরে শেখা।

প্রবাসে আমাদের শিশুদের দেখতে ভালোই লাগে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা হয়, চমৎকার পোশাক। পরিচ্ছন্ন থাকতে শেখে—সেই সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার এবং খেলাধুলো। বিদেশি ভাষাকে ওরকম আয়ত্ত করাও কম নয়। তবে ক্লাশের ছেলের কাছ থেকে শিখে আসা দু-একটা শ্ল্যাং বা শপথ ওদের মুখে শুনলে একটু অস্বস্তি লাগে। বয়স্করা কিন্তু বিদেশে গেলে সে ভাষার শ্ল্যাং সাধারণত ব্যবহার করেন না,—কারণ, অপপ্রয়োগ হবার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রবাসে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আর, একটা সমস্যার কিন্তু খুব সহজ সমাধান করে নেয়। আজকাল নতুন করে বর্ণবৈষম্যের হাওয়া উঠছে প্রায় পৃথিবীর সব দেশেই—পক্ষে বা বিপক্ষে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে সর্বত্র, সুতরাং সামান্য আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন যে-কোনও ব্যক্তি বিদেশে গিয়ে এজন্য মাঝে-মাঝে অস্বস্তি বোধ করবেন। কোনও রেস্টুরেন্টে ঢুকে যদি মনে হয় তাঁর গায়ের রং কালো বলে—কেউ বারবার তাকাচ্ছে। তখন কোনওরকম প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি তাঁর হবে না। বরং সেখান থেকে বেরিয়ে আসবেন! কিন্তু বাচ্চাদের কথা আলাদা।

ইংল্যান্ডের সারে অঞ্চলের একটি পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাঙালি। একটি ন'বছরের স্বাস্থ্যবান ছেলে। একদিন ছেলেটি স্কুলের ছুটির পর ফিরে এল—হাতে মুখে রক্ত।

ওকী! ওকী। ওকী হয়েছে তোর?

ছেলেটা কিন্তু একটুও ভয় পায়নি বা দমেনি। তেজের সঙ্গে বলল, জ্যান্নো মা, পার্কের পাশে কয়েকটা ছেলে আমাকে ব্ল্যাকি, ব্ল্যাকি, নিগার, নিগার বলে রাগাচ্ছিল। এমন ঘুঁষি মেরেছি না, দুজনের নাক ফাটিয়ে দিয়েছি।

॥ তেরো ॥

বড়দিন এবং নববর্ষের সপ্তাহান্ত মিলিয়ে আমেরিকায় পথদুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ১৪০০। পথদুর্ঘটনা বলতে মোটর গাড়ির দুর্ঘটনাই বোঝায়—রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মরে না কেউ ওদেশে, কারণ

শহরের বাইরের রাস্তা দিয়ে পায়ে হাঁটেই না কেউ। যে ১৪০০ জন লোক মরেছে, হিসেব করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ১৬ থেকে ৪৫ বছরের নারী পুরুষের সংখ্যাই বেশি। বুড়ো বুড়িরা মরে না। তারা ঠিকঠাক সিট-বেল্ট বেঁধে সাবধানে গাড়ি চালায়। সুতরাং প্রায় দেড় হাজার যুবক-যুবতী উৎসবের আনন্দ করতে-করতে মারা গেল। আমেরিকা হয়তো সকলের আগেই একদিন ক্যানসার রোগের ওষুধ আবিষ্কার করবে, কিন্তু মোটর-দুর্ঘটনা রোগের কোনও ওষুধ কোনদিন আবিষ্কার করতে পারবে না বোধ হয়। কারণ এই রোগের মূল ওই জাতির মর্মে। আমেরিকার এই বিশাল উন্নতিরও যা কারণ, মোটর-দুর্ঘটনার সেই একই কারণ।

সাধারণত আমেরিকানরা ভালো মোটর চালক হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা বেশ কঠিন। মোটর গাড়ির কলকব্জা সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতে হয় ও লিখিত পরীক্ষা আছে। এ ছাড়া আস্তে গাড়ি চালানোর পরীক্ষা। ও দেশের বহু রাস্তাতেই ৭০ মাইল গতি বাঁধা—কিন্তু শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় ১৫ মাইলের বেশি গতি নিলে ফাইন হয়। সুতরাং আস্তে চালানো একটি পরীক্ষা। বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও দেখছি ড্রাইভিং লাইসেনসের পরীক্ষায় বার দুয়েক ফেল করতে।

এবং ট্রাফিক আলোর প্রতি আমেরিকানদের আনুগত্য অতি দর্শনীয়। রাত্তির দুটো, চকচকে রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা—দূরে, কাছে কোথাও কোনও পুলিশ নেই, ট্রাফিকের আলো জ্বলছে। ক্লান্ত মোটর চালক হয়তো সারাদিন ড্রাইভ করে আসছে, কিন্তু সেই নির্জন মধ্যরাত্রেও লাল আলোর সামনে দাঁড়াবে। এরকম আমি বহুবার দেখেছি।

যেখানে যাওয়া-আসার অনেকগুলো আলাদা লেন—সেখানে তো দুর্ঘটনার সম্ভাবনা না-থাকার কথা। এ ছাড়া অন্য সব রাস্তায় আগাগোড়া মাঝখানে হলদে দাগ কাটা—দুদিক আলাদা করে বোঝানোর জন্য। কোথাও রাস্তায় খানা-খন্দ নেই, বৃষ্টির জল জমে নেই। যখন শহরের রাস্তা তিন চার ফুট বরফে ঢেকে গেছে—তখনও প্রত্যেকটি হাইওয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর বরফ পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক বাঁকে সাবধান বাণী। দেখলে মনে হয় দুর্ঘটনার কোনও কারণ নেই।

তবু দুর্ঘটনা এত হয় কেন? অনেকের ধারণা, মদ খেয়ে গাড়ি চালাবার জন্য। কিন্তু মাতাল দুর্ঘটনাকারীর সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে নগণ্য। মাতালরা যেমন কদাচিৎ গাড়ি চাপা পড়ে, তেমনি কদাচিৎ দুর্ঘটনা করে। একটা সাময়িক সতর্কতা প্রত্যেক মাতালকে ভর করে শুনেছি। সঙ্গিনীকে নিয়ে বিহ্বল অবস্থায় দুর্ঘটনা খুব কম। দূর পাল্লার চালকের বরং প্রায়ই ঘুম আসার সম্ভাবনা, সঙ্গিনী থাকলে তা জাগিয়ে রাখতে পারে। ১৬ বছর বয়স না হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় না। ছেলে-মেয়েরা ততদিন ছটফট করে। তার আগে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধদিন যে না-চালায় তা না, কিন্তু ১৬ বছর বয়স হলেই লাইসেন্স ও গাড়ির চাবি, তখন বান্ধবীকে নিয়ে সন্ধেবেলা হুস করে বেরিয়ে যাওয়া।

সব দেশেরই বড় বড় রাস্তায় আধিপত্য করে ট্রাকগুলো। .বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো ট্রাক ঝাঁঝাঁ আওয়াজে ছোটে। কিন্তু অমন ভারী ভারী ট্রাকের গতি কখনও ঘণ্টায় ৭০।৮০ মাইল হতে পারেন। একটু আস্তে যায়, তার পিছনে কোনও মোটরগাড়ি পড়লে এক বিরক্তিকর অবস্থা। তাকেও পিছনে-পিছনে আসতে হয়। চলতি কথাই আছে স্ট্রাক বাহাইন্ড আ ট্রাক। অর্থাৎ যে-লোক জীবনে দমে গেছে, এগিয়ে যেতে পারছে না, সে-ই ট্রাক বাহাইন্ড আ ট্রাক। জীবন মানে এগিয়ে যাওয়া, অপরকে অতিক্রম করা, ক্রমশ গতি বাড়ানো। জোরে যাও, আরো জোরে, নীতি-আইন সব ঠিক থাক। কিন্তু যেতে হবে আরও জোরে, পাল্লা দিয়ে আর সবাইকে ছাড়িয়ে, জোরে জোরে, আরও জোরে। সামনের লোককে হারিয়ে দিয়ে, অতিক্রম না করে গেলে আর জীবনের কী মানে? আর ওইরকম অতিক্রম করতে গিয়েই কোনও কোনও সময়ে মৃত্যু দেওয়ালের মতো এসে দাঁড়ায়। মৃত্যুকেও পাশ কাটাবার চেষ্টা সফল হয় না।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একটা দুর্ঘটনায় তিনটে গাড়ি জড়িয়ে পড়ে। ট্রাকগুলোকে পাশ কাটাবার প্রথম প্রয়াস থেকেই আসে সামনের অন্য গাড়িকেও অতিক্রম করার নেশা। একটা খুন করা এবং দশটা খুন করা যেমন পাপের হিসেবে সমান, তেমনি একটা গাড়িকে অতিক্রম না করার কোনও মানে হয় না। প্রত্যেকটি আমেরিকানের চরিত্রে আছে প্রতিযোগিতার স্পৃহা, অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দুর্দমনীয় চেষ্টা—এর ফলেই ওই জাতটার যাবতীয় উন্নতি এবং আকস্মিক মৃত্যুও।

মসৃণ নিখুঁত পথ, নিপুণ চালক—দুর্ঘটনার কোনও কারণই দিগন্তে নেই। কিন্তু সামনের ওই যে গাড়িটা সমান গতিতে ছুটছে—ওইটাই তো সব গণ্ডগোলের মূল। হয়তো কয়েকশো মাইল ধরেই ওই গাড়িটা সামনে ছুটছে। সুতরাং প্রথমে দেখতে ইচ্ছে ওই চালক বা চালিকার মুখ। সুতরাং অ্যাকসিল্যারেটারে চাপ। কাছাকাছি। ও গাড়িতে একটা কঠিন মুখ। পিছনের গাড়ি একটু আগে একটা ট্রাককে পাশ কাটিয়ে এসেছে, সুতরাং পাশ কাটাবার নেশা এখনও তার রক্তে। জীবনে সে কত লোককে পাশ কাটিয়েছে। সুতরাং হুস্ করে আওয়াজ, হলদে দাগ পেরিয়ে ৮০।৯০ মাইল গতিতে পাশ কাটাবার পাল্লা। সে গাড়িও গতি কমাবে না, এবার পাশাপাশি—কে আগে যাবে, হলদে দাগ পেরুনো গাড়ি আরও জোরে। দিগন্তে ক্ষীণতম বিপদের আভাস ছিল না। কিন্তু সামনের রাস্তাটা ঢালু—, পুরো দেখা যায়নি, বিপরীত দিক থেকে আর একটা কালো বিন্দু ৭০ মাইল গতিতে নিরীহভাবে ছুটে আসছিল। ব্রেক করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না সে-সময়ে। একসঙ্গে তিনটে গাড়িতে ধাক্কা লাগল—আগুন জ্বলে উঠলো, হতাহতের সংখ্যা কম পক্ষে পাঁচজন।

গত উৎসবে ১৪০০ মৃত্যুর অধিকাংশই এই রকম। একজনকে পাশ কাটাতে গিয়ে সামনে থেকে মৃত্যু।

আমি এরকম একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। বলা বাহুল্য, সেবার আমি মরিনি। এ রচনা ভূতের লেখা নয়।

॥ চোদ্দো ॥

পুরুষের বেশে অশ্বারোহিনী, কোমরবন্ধে তলোয়ার ও পিস্তল, দীপ্ত যৌবনবতী রানি ক্রিসটিনা মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করে গেলেও, তাঁর জীবনচরিত রূপকথার রানির মতো। সুইডেনের রাজা গুসটাভাস এডোলফাস চেয়েছিলেন, তাঁর পুত্র সন্তান হয়নি বলে, একমাত্র মেয়ে ক্রিসটিনাকেই পুরুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। শৈশব থেকেই ক্রিসটিনাকে যুদ্ধ বিজয়, অশ্বারোহণ এবং রাজনীতি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। যে দশ বছর ক্রিসটিনা সুইডেনে রাজত্ব করেছেন, কখনও দুর্বলতা দেখাননি।

বাবা তাঁকে পুরুষ করতে চেয়েছিলেন, ক্রিসটিনা পুরুষের বহু গুণই আয়ত্ত করেছিলেন। শুধু যুদ্ধ নয়, পাঁচটি ভাষা তিনি শিখেছিলেন, জ্ঞান ও শিল্পকলায় ছিল আন্তরিক অভিরুচি। দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের ও গুণীদের আমন্ত্রণ করেছিলেন নিজ সভায়, প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক দেকার্তকে নিযুক্ত করেছিলেন নিজের শিক্ষক। প্রত্যেকদিন ভোর পাঁচটায় উঠে তাঁর কাছে পাঠ নিতেন। (সুইডেনের চরম শীতের মধ্যে অত ভোরে, ঘুম ভাঙার জন্যই বোধ হয় সর্দি জ্বরে, দেকার্ত মারা যান)।

বিক্ষুব্ধ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে একটি তরুণী মেয়ের পক্ষে রাজ্য চালনা করা শক্ত, তা অনুমান করা যায়। এজন্য ক্রিসটিনা অন্যান্য পুরুষসুলভ মানসিক জোরের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িকরা বলেছেন ক্রিসটিনা একাই একশোটি নারীর সমান! আর একজন বলেছেন অন্য মেয়েদের কাছে সূচ-সুতো যেমন স্বাভাবিক, ক্রিসটিনার কাছে নানান বিদ্যাশিক্ষা তেমনি স্বাভাকি। সারাজীবনে বিয়ে করেননি ক্রিসটিনা কিন্তু সুকুমারবৃত্তির দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। পাঁচ বছর

বয়সে, তাঁর বাবা যখন একবার যুদ্ধে যান, ক্রিসটিনা বাবাকে বলেছিলেন, বাবা, যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় আমার জন্য একটা সুন্দর জিনিস এনো। সাজিয়ে রাখার মতো সুন্দর। ক্রিসটিনা নিজে যখন রানি হলেন ১৮ বছর বয়সে, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কর্মচারী, সৈন্যাধ্যক্ষদের হুকুম দিয়েছিলেন, যেখানে যত ছবি, ভাস্কর্য, শিল্প সামগ্রী পাওয়া যাবে—সবই যেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে এনে দেখানো হয়। ১৬৪৮ সালে যখন একবার প্রাগ শহর প্রবল ঝড়ের মুখে তছনছ হয়ে যায়, তখন ক্রিসটিনা তাঁর সেখানকার সমর দূতকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে আর যা কিছু বাঁচাতে পারো আর নাই পারো, ওখানকার লাইব্রেরি আর শিল্প সামগ্রী যেন একটাও নষ্ট না হয়। জানো তো, এইগুলিই চিরকাল বেঁচে থাকার যোগ্য, এবং আমি এদেরই বেশি মূল্য দিই।

এইভাবে ক্রিসটিনা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-সংগ্রাহক হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের দশ বছরের মধ্যেই অবশ্য দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। প্রোটেস্টান্টদের দেশ সুইডেন, কিন্তু ক্রিসটিনা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে তাকে সিংহাসন ও দেশ ছাড়তে হয়। ক্রিসটিনার জীবন এর পরবর্তী ঘটনা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর। শিল্পপ্রীতির জন্যই ক্রিসটিনা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন এবং তাঁর সমস্ত দুর্লভ শিল্প সংগ্রহ তিনি গোপনে আগেই রোমে পাঠিয়ে দেন। সুইডেন থেকে গোপনে বেরিয়ে এসে তিনি জারমানিতে প্রবেশ করলেন পুরুষ নাইটের ছদ্মবেশে। তার দেড় বছর পর, তিনি রোমে প্রবেশ করলেন। রানির সম্মানে স্বয়ং পোপ সপ্তম আলেকজান্ডার সুসজ্জিত কোচ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য, রাস্তার দুপাশে প্রহরীদের অভিবাদন, ভ্যাটিকান থেকে কামান গর্জে উঠেছিল তার সম্মানে। রাজ্যহীনা রানির বয়স তখন তিরিশের কাছাকাছি, পূর্ণযুবতী, কুমারী।

রোমে আসার পর, কিছু সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি নেপলসের সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইটালিয়ান প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন সেই প্রেমিকের শিরচ্ছেদ করিয়ে, এরপর আর প্রেম বা সিংহাসনের জন্য লোভ করেননি। বাকি তিরিশ বছর তিনি রোমের শিল্পী-সমাজের শিরোমনি হয়ে বিরাজ করেন। ভ্যাটিকানের কাছেই তাঁর শিল্প সংগ্রহশালায় একবার আসেননি, সে যুগে এমন শিল্পপ্রেমিক প্রায় ছিলই না। নিজ রাজ্য থেকে বহু দূরে অসংখ্য চিত্র, ভাস্কর্য গ্রন্থ প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে বিরাজমান একা বিদুষী রানির মূর্তি সমগ্র ইওরোপের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ধর্মান্তর ও পলায়নের জন্য তাঁর নিজের দেশ সুইডেন অবশ্য কখনও আর তাঁকে হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু সুইডিশরা এখনও দুঃখ করে বলে ক্রিসটিনা রোমে চলে না গেলে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা থাকতো সুইডেনেই, প্যারিসের লুভর মিজিয়ামের সুনামও খর্ব হয়ে যেত। ৬১ বছর বয়সে মৃত্যু হবার পর পোপ সমস্ত নিয়মভঙ্গ করে ক্রিসটিনাকে ভ্যাটিকানের মধ্যে কবরস্থ করার অনুমতি দেন। বহুবছর পরে ডলট খুলে দেখা গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ক্রিসটিনার মুখে রানির মহিমা ও অভিমান লেপ্টে ছিল।

মৃত্যুকালে ক্রিসটিনার সংগ্রহের মধ্যে ছিল ১৫০০ ছবি ও বহু ভাস্কর্য পাণ্ডুলিপি দুর্লভ বই প্রভৃতি। তাঁর মৃত্যুর পর এগুলি ইটালির সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নেয়। পরবর্তী যুগে সেগুলি আরও নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

একবার কাউনসিল অফ ইউরোপের উদ্যোগে স্টকহলমে রানি ক্রিসটিনার শিল্প সংগ্রহ বিভিন্ন দেশ থেকে আহরিত করে একটি অভিনব প্রদর্শনী হয়। উদ্যোক্তরা এজন্য নানা দেশের সংগ্রাহকদের কাছে আবেদন জানান, ভারতবর্ষের বরোদার মহারাজাও ক্রিসটিনার কিছু সংগ্রহ প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছেন। ক্রিসটিনার নিজস্ব তালিকা অনেক সংগ্রহই পাওয়া যায়নি, অনেক মিউজিয়াম হারাবার বা নষ্ট করার ভয়ে পাঠাতে চাননি, অনেকগুলির কোনও পাত্তাই নেই, কিছু আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা সংগৃহীত হয়েছিল সেই সমস্ত শিল্পসম্ভারে প্রদর্শনী ভবনের ৩৬টি ঘর ভরে গিয়েছে। এটাই ইওরোপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্প প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীতে ইটালিয়ান মার্থারদের মধ্যে র‍্যাফায়েল টিমিয়ান, ভেরোনিজের বহু ছবি আছে, প্রখ্যাত ভাস্কর বারনিজির বহু সংখ্যক দান এবং উত্তর ইওরোপের রেনেসাঁসের শিল্প উপহার দেখতে পাওয়া যায় আরও অনেকের। এ ছাড়া আছে বহু শিল্পীর আঁকা ও তৈরি করা ক্রিসটিনার খুব আগ্রহ ছিল, গ্রিক ও রোমান ভাস্কর্যের বিপুল নগ্ন মূর্তির সমারোহ স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। এই সব মূর্তির সামনে নিঃসঙ্গ ও রাজ্যহীনা রানি ক্রিসটিনা বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

॥ পনেরো ॥

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একরকম তরকারি হত, তার নাম কচ্চালু। হয়তো এ নামের তরকারি অন্য কোথাও পরিচিত নয়। আমাদের পারিবারিক নাম। অর্থাৎ যুদ্ধের পরপর যখন আলুর খুব টানাটানি, তখন আমরা খুব আলুর দম খেতাম, অবশ্য দু-একটা আলুর সঙ্গে প্রচুর কচুর ভেজাল দিয়ে। ভেজাল আবিষ্কারের পর কচ্চালু নাম রেখেছিলাম।

ছেলেবেলায় আর একটা কথা ছিল, দৈবাৎ যদি কখনও পেট ব্যথা করত, মা অমনি ধমকে বলতেন, কেন হোটেল মোটেলে খাস। ওদের কি রান্নার কোনও মাথামুণ্ডু আছে? হোটেলের সঙ্গে নিতান্ত ধন্যাত্মক মোটেল শব্দটা মা নিতান্ত না জেনেই ব্যবহার করতেন। পরে জানতে পারি, মোটেলও একটা বস্তু। নিতান্ত ধ্বন্যাত্মক না। অনেকটা কচ্চালুর মতো। মোটর গাড়ি ও হোটেলের সন্ধি!

মোটর গাড়ির সঙ্গে মোটেলের যোগ শুধু এইটুকু যে, মোটর গাড়ি যাত্রীরা এসব হোটেলে রাত্রির বেলা মোটর গাড়ি রেখে দিতে পারেন। বিরাট-বিরাট হাইওয়েতে পদযাত্রী একজনও থাকে না। আমেরিকায় সকলেরই গাড়ি এবং গাড়ি পার্ক করা বিষম সমস্যা। সুতরাং রাত্রে বিশ্রাম নেবার জন্য গাড়ির মালিকের মতো গাড়িরই একটা শোবার জায়গা দরকার। হোটেলের বদলে মোটেল কথাটা লেখা থাকলেই বুঝতে পারা যাবে—মটর গাড়ি রাখবার জায়গা আছে। ক্লান্ত আরোহী হয়তো গাড়ি চালিয়ে চলেছেন পরপর পান্থনিবাস দেখে-দেখে, অনেক মোটেলের গায়ে জায়গা নেই লেখা জ্বলজ্বল করছে। মোটেলগুলো থাকে সাধারণত বাইরে। শহরের মধ্যে গাড়ি থামাবার জায়গা নেই। থাকলেও ঘণ্টা অনুযায়ী পয়সা দিতে হয়।

শিকাগো এয়ারপোর্টে আমি একদিন রাত্তির বেলা বসে আছি, আমার পরের প্লেন পরের দিন সকালে। রাতটা এয়ারপোর্টে গদিমোড়া চেয়ারে শুয়ে কাটিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু বহুক্ষণ প্লেনে কাটিয়ে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল আরাম করে শুয়ে ঘুমোতে। কাছাকাছি হোটেলগুলোর নাম খুঁজলাম। একটাও নেই, সব মোটেল। অথচ আমার তো গাড়ি নেই। তা ছাড়া ওগুলো কত দূরে কী জানি। তবু শয়নের ইচ্ছে প্রবল হওয়ায় আমি তালিকার নীচের দিকের নামের মোটেলে ফোন করলাম। আমি একটা রাত থাকতে চাই, তোমাদের ওটা কত দূরে? উত্তর এল, মাইল চারেক হবে। কেন তোমার গাড়ি কি খারাপ হয়ে গেছে?

—আমার গাড়ি নেই।

ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, তুমি বাইরে এসে দাঁড়াও। আমাদের গাড়ি পাঠাচ্ছি।

দাঁড়ালুম। হুস করে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা বিশাল গাড়ি এসে দাঁড়াল। লম্বা নিগ্রো ড্রাইভার বলল, তুমি ফোন করেছিলে? এসো।

উঠে খানিকটা গেছি, হঠাৎ কী খেয়াল হল ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম, তোমাদের মোটেলের চার্জ কত? দশ ডলার। শুনেই হঠাৎ আমার শীত করতে লাগল। পকেটে মাত্র আটটি ডলার। আর কিছুই নেই প্লেনের টিকিট কাটা আছে। কাল সকালেই পৌঁছে যাব—টাকা বেশি দরকারও ছিল

না। কিন্তু এখন কী করি? এতখানি আসার পর এখন ফিরে যাই বা কী করে? ড্রাইভারটিকে বললাম, তুমি ভারতবর্ষের সিগারেট খাবে?

দেখি, দাও তো একটা। বাঃ চমৎকার তো।

—তুমি একটা প্যাকেট নেবে? তোমাকে উপহার দিলাম।

—ধন্যবাদ।

—শোনো ভাই, আমার কাছে টাকা কম আছে। আট ডলার। তোমাদের মোটেলে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। মাত্র আট ডলার আছে। এখন কী করি বলো তো?

—ও, এই ব্যাপার? হুঁ। আচ্ছা এখানে যেটা সবচেয়ে সস্তা সেটাই আট ডলার। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

—কিন্তু সেটা তো তোমাদের কোম্পানি নয়।

—তা হোক, চলো, তোমাকে একটা লিফট দিই।

পরের হোটেলে ঢুকেই আমি ম্যানেজারকে বললাম, আমাকে আট ডলারের একটা ঘর দাও। আমি কিছু চাই না, খাবার না, সারভিস না। কিন্তু কাল ভোরবেলা দয়া করে তোমাদের গাড়িতে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিও। আমার কাছে আর একটাও পয়সা নেই। মোটেলগুলোর নামে নানান বদনাম শুনেছিলাম। তা ছাড়া বিত্তবান যাত্রীরাই এখানে আসে—সকাল বেলা আরও কী চার্জ দিতে হয়, কে জানে। আগে থেকে বলে রাখা ভালো।

—তুমি খাবে না রাত্তিরে? ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল।

—না। দয়া করে সকালবেলা আমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার কাছে আর পয়সা নেই।

—হ্যাঁ দেবো। আচ্ছা, তুমি তিন ডলার ফেরত নাও। আমার খানিকটা কনশেসন করার ক্ষমতা আছে।

—না, ধন্যবাদ। তুমি যে কাল আমায় পৌঁছে দেবে, এজন্যই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এর বেশি কিছু চাই না। তাহলে আমার খারাপ লাগবে, মনে হবে তুমি আমায় দয়া করছো।

—ও, আচ্ছা। তুমি একটা ডলার অন্তত ফেরত নাও। কাল সকালে যে পোর্টার তোমার মাল তুলে দেবে, তাকে কিংবা ড্রাইভারকে বকশিশ দিও।

নির্দিষ্ট ঘরে এসে সুস্থ হলাম। রাত্রে ঘুমের সম্ভাবনায় খুব খুশি-খুশি লাগছিল, যদিও খিদেতে পেট চিন চিন করছে। তা থাকগে। আশে পাশের কয়েকটা ঘরে হই-হল্লা হচ্ছে। লাল নীল আলোর মধ্যে কালো আর সাদা আর হলদে পোশাক পরা নারীপুরুষ। সামনের উঠোনে রকমারি মোটর গাড়িতে ঠাসা। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দিগন্ত ধুয়ে যাচ্ছে।

দরজায় ঠকঠক। আঃ কী মুশকিল, বলে এলাম তো আর কিছুই চাই না। বেয়ারা ঢুকলেই তো বকশিশ দেবার কথা ওঠে। ম্যানেজার ঢুকলেন, হাতে প্যাকেট। অত্যন্ত বিনীত লাজুক ভঙ্গি। বললেন, যদি কিছু মনে না করেন আসুন আপনার ঘরে আমার খাবারটা আপনি আর আমি দুজনে ভাগ করে খাই। আমার একা-একা খেতে ভালো লাগে না। দয়া করে আমার সঙ্গে আমার এই খাবার একটু খাবেন? কিন্তু প্লিজ এতে আর কিছু মনে করবেন না।

॥ ষোলো ॥

শিশু খুন এবং যে খুনী, সেও শিশু। গল্পটা এই রকম : যদিও গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। এই ঘটনাটি ঘটেছিল আমার প্রথম নিউইয়র্ক ভ্রমণের সময়। নিউইয়র্কের শহরতলি ব্রংকসে একটি ছোট

দোকানদারের চার বছরের ছেলেটির নাম এলবান। সে তাদের দোকানের সামনের ফুটপাথে খেলা করছিল, এমন সময়, আর একটি আট বছর বয়সের ছেলে এসে তাকে বলল, এই আমার পুতুল দেখবি? আয়, তা হলে আমাদের ছাদে আয়।

চার বছরের ছেলে এলবান সেই আট বছরের ছেলেটির সঙ্গে উঠে গেল পাশের বাড়ির ছাদে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। কিন্তু ছাদে ওঠার পরই, আট বছরের ছেলেটি দাঁত কিড়মিড় করে টেলিভিশনের, সিনেমার, কমিক স্ট্রিপের ডাকাতদের মতন, বলল, তোর পকেটে কী টাকাকড়ি আছে বার কর। এলবান খিলখিল করে হেসে বলল, কিছু নেই, একটা পয়সাও নেই।

—পকেট দেখি।

এলবান পকেট উলটে দেখালো। তখন বড় ছেলেটি চোখ পাকিয়ে বলল, পয়সা যখন নেই, তখন তোকে ছাদ থেকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দেব। এলবান তাতেও ভয় পেল না। তার হাতে এক প্যাকেট আলুভাজা ছিল, সে বলল, পয়সা নেই, আলুভাজা নেবে? সব না কিন্তু, অর্ধেক। বড় ছেলেটি সাগ্রহে আলুভাজার দিকে হাত বাড়াল। ক্রমশ আলুভাজা সব শেষ হয়ে গেলে, সে বলল, এবার? এলবান হাত উল্টে বলল, আর কিছু নেই, নেই। কী মজা!

বড় ছেলেটি তখন এলবানকে ঠেলতে-ঠেলতে কার্নিসের ধারে নিয়ে এল, তারপর হঠাৎ তাকে দু-হাতে উঁচু করে তুলে নীচে ফেলে দিল।

এলবান পড়ে গেল ছ'তলা বাড়ির ছাদ থেকে। তারপর একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। সেই বাড়ির ঠিক নীচে ছিল এক গাদা ডাঁই করা কার্ড বোর্ডের বাক্স। বৃষ্টিতে ভিজে সেগুলো নরম তুলতুলে হয়েছিল, এলবান মরল না। তার বাবা-মা ছেলেকে অত উঁচু থেকে পড়তে দেখে মূক হয়ে যায়। হাসপাতালে এলবানের পেটের মধ্যে অবিরাম রক্তক্ষরণ হতে থাকে, কিন্তু অপারেশনের ফলে সে বেঁচে যায় ও সুস্থ হয়ে উঠে। এলবানের অবিশ্বাস্য গল্প শুনে, তার বর্ণনা মতন যে পাড়ার ৬ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক বহু ছেলেকে তার সামনে হাজির করানো হয়, কিন্তু এলবান তাদের কারুকেই সেই আততায়ী বলে চিনতে পারে না।

এর সপ্তাহ দু-এক বাদে, সেই পাড়াতেই জাভিয়ের নামে আর একটি ৪ বছরের ছেলেকে দেখতে পাওয়া যায়—একটা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে ছিটকে পড়েছে। এবার নীচে কোনও কার্ড বোর্ডের বাক্স ছিল না, ছেলেটা থেঁতলে মরে যায়, তার হাতে তখনও এক প্যাকেট আলুভাজা। এই ছেলেটা ছিল এলবানের খুব বন্ধু। এবারও আততায়ী ধরা পড়ল না।

এর কিছুদিন পর এলবানদেরই দোকানে একটি আট বছরের ছেলে এসে বলতে লাগল, তার এক ভাগ্নে নাকি সুযোগ পেলেই বাচ্চা ছেলেদের ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়! কিন্তু সেই ছেলেটিকে দেখেই এলবান প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে ভয়ে। এলবনেদের দাদারা তখন ছেলেটিকে ধরে রেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসবার আগে অপেক্ষা করার সময় ছেলেটি বলে, আমার খিদে পেয়েছে। তাকে কেক এবং লেমনেড খেতে দেওয়া হলে সে বেশ শান্তভাবেই খায় এবং এলবানের দাদাদের জিগ্যেস করে, আপনাদের ছোট ভাইকে ভালোবাসতেন? সে বেঁচে যাওয়ায় খুশি হয়েছেন?

পুলিশের কাছে জেরাতেও ছেলেটি প্রথমে স্বীকার করতে চায়নি কিছু, কিন্তু দূর থেকে তার মা-কে আসতে দেখেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বারবার বলতে থাকে, মা-কে বলবেন না, মা-কে বলবেন না। মা মারবে। মা খুব মারবে।

এলবানের মা নিজের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রেখে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আমি যে আমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছি তাই যথেষ্ট। আমি ওই ছেলেটার শাস্তি চাই না। ওকে ফাঁসি দিও না।

ফাঁসি অবশ্য সেই আট বছরের ছেলেটির হবে না—একটি খুনি এবং একটি খুনের চেষ্টা

সত্ত্বেও। কারণ তার বয়স কম। ছেলেটির পারিবারিক ইতিহাস এই রকম, তার বাবা নেই, মা সব সময় ব্যস্ত এবং রাগি, থাকে একটা নোংরা ঘরে। তার চেহারা রোগা বলে পাড়ার অন্য ছেলেরা তাকে মারে। একদিন সে মার খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরেছিল—তখন তার মা তাকে আরও মার দিয়েছিল। বলেছিল, চুপ করে বাড়িতে বসে থাকবি। তখন সে জানলা দিয়ে রাস্তার লোকের গায়ে থুতু ছেটাত। তাতে তার মা তাকে ধরে আরও বেদম মার দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে যায়। এরপর থেকে, সে তার চেয়ে অনেক কম বয়সি ছেলেদের সঙ্গে খেলা শুরু করে। টেলিভিশন দেখা, সিনেমা দেখা, বড়দের খেলা।

॥ সতেরো ॥

প্রায় চব্বিশ বছর আগে ইতালিতে আন্তর্জাতিক কবিতা সপ্তাহ উপলক্ষে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবি সম্মেলনের কথা এবার বলা যেতে পারে। সম্মেলনটি উল্লেখযোগ্য নানা কারণে বহু প্রখ্যাত কবির উপস্থিতিতে এবং ঝগড়াঝাটিতে। অবশ্য আন্তর্জাতিক বলতে শুধু ইওরোপ এবং আমেরিকার কবিরা, এডেন বন্দরের এ পাশের দেশের কেউ ছিল না।

আমি ছিলাম নিতান্ত দর্শক বা শ্রোতা।

কবি সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জিয়ান কার্লো মিনোত্তি তিনি তো সভা আরম্ভ হবার সময়ে নির্দিষ্ট থিয়েটার হলে এসে দেখলেন, উদগ্রীব, শ্রোতায় হল ভরতি, কিন্তু একটিও কবির দেখা নেই। মিনোত্তি ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করলেন সালভাদোর কাশিমোদোকে—ইতালির নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত প্রবীণ কবি। কাশিমোদো তখন দাড়ি কামাচ্ছিলেন, কাতর মিনোত্তি তখন অনুরোধ জানালেন, একটু তাড়াতাড়ি আসুন। আপনার শ্রোতারা বিষম ব্যস্ত হয়ে আছে।

তারপর তিনি ফোন করলেন পাবলো নেরুদাকে। নেরুদা তখন বাথটবে গা ডুবিয়ে স্নান করছেন। চলে আসুন, যে অবস্থায় আছেন চলে আসুন। এমন সময় ঢুকলেন আমেরিকার মহিলা কবি বারবারা গেস্ট। যাক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সভাপতি। শ্রীমতি গেস্টকে দিয়েই কবিতা পাঠ শুরু হল।

একটু পর একে-একে অন্য কবিরা আসতে লাগলেন। এক-একজন ঢুকছেন আর হলের মধ্যে গুঞ্জন। চকচকে কামানো গাল নিয়ে কাশিমোদো আর ভিজে মাথায় এলেন নেরুদা। পাবলো নেরুদা নিজের কবিতা পড়লেন উদাত্ত সুরেলা গলায় কিছু আবেগের সঙ্গে। তারপর কাশিমোদো। আস্তে শান্তভাবে পড়ার পর কাশিমোদো, প্রকাশ্যে বললেন, তিনি নেরুদার কবিতা পড়ার ধরন একটুও পছন্দ করেননি। আমি আমার কবিতা পাঠ করি, আবৃত্তি করি না। আমরা কবি. আমরা অভিনেতা নই।...আজকাল রামাশ্যামাও কবিতা লিখছে। কিন্তু কবিতা লেখা অত সহজ নয়। এদের বন্ধ করিয়ে দেওয়া উচিত। কবিতা লেখা আমার মতো পেশাদারদেরই কাজ।

এ কথায় মৃদু হেসে নেরুদা বললেন, কাশিমোদো নিশ্চয়ই খুব ভালো কথাই বলেছেন—অবশ্য উনি কী বলেছেন তা যদি বুঝতে পারা যায়।

সভা আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা পর ঝড়ের মতো ঢুকলেন রাশিয়ার প্রখ্যাত কবি ইভগেনি এভটুশেংকো। এসেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। এজরা পাউণ্ড এসেছেন কি না। না, আসেননি। যাক বাঁচা গেল। এভটুশেংকো আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন। এজরা পাউন্ড সভায় থাকলে তিনি আসবেন না। কারণ, পাউন্ডের সঙ্গে কবিতা পড়লে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে আবার প্রচুর বকুনি খেতে হবে হয়তো। কারণ, পাউন্ড একসময় ছিলেন ইহুদি বিদ্বেষী, ফাসিস্তদের সমর্থক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মুসোলিনিকে সমর্থন করে বেতারে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কবেকার

কথা। তারপর পাউন্ডের ওপর কত নির্যাতন গেছে। কতদিন রইলেন উন্মাদ আশ্রমে—তখন ইতালিতে প্রায় নির্বাসিত হয়ে আছেন। কিন্তু সেই পুরোনো কথা তুলেই প্রতিবাদ করেছিলেন এডটুশেংকো, নিজে পড়লেনও ওঁর কবিতা, কবি ইয়ার—যেটা রাশিয়ার ইহুদি বিদ্বেষীদের আক্রমণ করে লেখা। কবিতা পড়া শেষ করেই এডটুশেংকো আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন হল ঘর থেকে। একেবারে শহর ছেড়েই চলে গেলেন মনে হল। খুব ভদ্রতাসম্মত মনে হল না ওঁর ওরকম বেরিয়ে যাওয়া।

সিফেন স্পেন্ডার এডটুশেংকোর ওই রকম ব্যবহার দেখে বিড়বিড় করে বললেন, 'ওকে যত দেখেছি—ততই ওর প্রতিভা এবং কবিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছে'।

আমেরিকার বিটনিকদের অন্যতম প্রধান কবি। দীর্ঘস্থায়ী লরেন্স ফের্লিংগেটি কবিতা পড়ার আগে একটা ছোট ভূমিকাও করেছিলেন। আমি একজন পুরুষ কবি। আমার কবিতা সবচেয়ে সমসাময়িক বিষয়কে ভিত্তি করে, অর্থাৎ রাজনীতি। আমেরিকান কবিতায় সত্যিকারের নতুন জিনিস এনেছে। বাকি ইওরোপীয় কবিরা এখনও গাছপালা নিয়ে লেখে।

সভার একেবারে শেষের দিকে একজন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে ঢুকলেন। শরীরের চামড়া শুকিয়ে গেছে, ধূসর মুখের রং, চোখ দুটি কোটরাগত কিন্তু তীব্র উজ্জ্বল। চুল দাড়ি সমস্ত পাকা। এজরা পাউন্ড। পাউন্ড মঞ্চে উঠে শূন্য চোখে চারিদিকে তাকালেন। কতদিন পর কবিতা পড়া। দুর্বল ভাঙা-ভাঙা গলায় পাউন্ড পরপর দশটি কবিতা পড়লেন। সেই এককালের দুর্দান্ত বেপরোয়া এজরা পাউন্ডের ছায়ামূর্তি যেন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। যেন কবিতা পড়া শুরু করার পর নিজের সৃষ্টি শব্দের ধ্বনি কানে ভালো লেগে গেল সেইজন্য দশটা কবিতা পড়লেন। পড়া শেষ হবার পর প্রবল সমর্থনে ও সম্মান প্রদর্শনে ফেটে পড়ল হল ঘর। দশ মিনিট ধরে সব লোক দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগল। অভিভূত হয়ে গেলেন পাউন্ড। বারবার কী যেন বলতে গেলেন। কিন্তু শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস আর থামে না। তারপর থেমে গেলে, পাউন্ড বললেন, 'এ কী, না না, এটা ভুল। এটা তোমাদের যুগ। আমাকে আর তোমাদের দরকার নেই।'

সভা শেষ হলে, অবসাদে ভেঙে পড়েছিলেন মিনোত্তি। এতগুলো বিপরীত চরিত্রের কবিকে সামলানো কি সোজা কথা। মিনোত্তি বললেন, আমি ১০০ জন গুন্ডাকেও সামলাতে পারি। কিন্তু দশজন সাধারণ কবিকেও আর পারব না।

॥ আঠারো ॥

১৫ অগাস্ট খ্রিস্টানদেরও একটি পবিত্র উৎসবের দিন। এইদিন ক্যাথলিক প্রধান দেশগুলিতে ছুটি থাকে ও খুব উৎসব হয়। এক ১৫ অগাস্ট আমি সুইজারল্যান্ডের জেনিভায়। ওই দিন দেশে নানান উৎসব ও হইচই হচ্ছে ভেবে একটু মনমরা লাগছিল। আমার বন্ধু বিমান বললেন, চলো হে, সন্ধ্যেবেলা আজ লেকের ধারে মেলা আছে। দেখবে রঙের বাহার। সেজেগুজে বেরুলাম সন্ধ্যেবেলা। বিখ্যাত জলহাওয়ার দেশ, আমি অবশ্য কাশ্মীরের সঙ্গে কোনও তফাৎ পাইনি। তবু যা পেয়েছি সেই মুহূর্তে তো তার তুলনা নেই। ফুরফুর করে অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছে, আমরা দুই বন্ধু ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি হ্রদের দিকে। ছোট্ট শহর জেনিভার সন্ধেবেলার একমাত্র আকর্ষণ হ্রদের তীর। যেখানে ভিড় ভেঙে পড়ে। হ্রদের পাড়ে মানুষ। হ্রদের উপর নৌকোয় মানুষ।

সেদিন গিয়ে দেখি হ্রদের পাড়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘেরা জায়গায় ঢুকতে হলে দশ ফ্রাংকের (পঁচিশ টাকা) টিকিট কিনতে হবে। সেখানে সন্ধেবেলা কনসার্ট হবে, একটু রাতে পোড়ানো হবে বাজি। টিকিটের কথা শুনেই বিমান আর আমি চোখাচোখি করলুম। চোখে চোখেই কথা হয়ে গেল, টিকিট কাটতে হবে? পাগল হয়েছো? কনসার্ট আর বাজি দুটোই দূর থেকে

শোনার ও দেখার জিনিস। ওর জন্য টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার কী দরকার।

কিন্তু দলে-দলে মেয়ে পুরুষ ঢুকছে সেখানে। মানুষের মাথা: বহুদূর দেখা যায় না। এত লোক ঢুকছে কেন, বিশেষ কোনও আকর্ষণ আছে ওখানে? বিমানের সঙ্গে আবার চোখে-চোখে কথা হল, কি বিনা টিকিটে ঢোকা যায় না? দেশে থাকতে কত জলসায়, পাড়ার থিয়েটারে গেট ভেঙে ঢুকেছি। আর এই সামান্য পুঁচকে দেশ? তক্ষুনি ঠিক করে নিয়েছি, বিনা টিকিটে ঢুকতে হবে।

অবিবাহিত বাঙালি যুবক। এর মতো মারাত্মক চিজ নাকি দুনিয়ায় দুটি নেই। অনেকের মুখেই শুনেছি। বিমান আর আমি তখুনি মতলব এঁটে ফেললুম। এদিকটাই প্রধান ঢোকার পথ, নিশ্চয়ই উল্টো দিক থেকে ঢোকা সহজ হবে। শহরের নানান গলি খোঁজাখুঁজি করে, কয়েকবার পথ হারিয়ে, উৎসব প্রাঙ্গণের অপর পাড়ে লেকের ধারে যখন এসে পৌঁছিয়েছি তখন কনসার্ট প্রায় শেষ। টুক করে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়েছি।

তখন শুরু হল বাজি পোড়ানো। এরকম বাজি পোড়ানো উৎসব আমি আর আগে কখনও দেখিনি। এত রঙ বেরঙের অদ্ভুত রকমের বাজির সমাবেশ দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। তখন বুঝতে পারলুম, কেন পঁচিশ টাকার টিকিট! এই বাজি তৈরির খরচের তুলনায় পঁচিশ টাকার টিকিট তো কিছুই না। এরকম বাজি তৈরি করতে পারে যখন, তখন সুইজারল্যান্ড চাঁদে রকেট পাঠায় না কেন? একজন বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন, সুইজারল্যান্ড তিনশো বছর ধরে শ্রেষ্ঠ ঘড়ি তৈরি করছে অথচ পৃথিবীতে সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে সুইসরাই। কিন্তু না, এরকম বাজির বাহার দেখে, শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া অসংখ্য ফুলঝুরি দেখে মনে হয়, এ জাতের পক্ষে চাঁদে রকেট পাঠানোও ছেলেখেলা।

এরপরই কিন্তু আরম্ভ হল আসল উৎসব। সেই উৎসবের বর্ণনা দেবার জন্যই এই লেখা। ১৫ অগাস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সেদিন আমি সুইজারল্যান্ডে বসে দোল খেললুম। এর চেয়ে সুন্দর দোল খেলা আর হয় না।

বাজি উৎসবের পরই সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আরম্ভ হল দোল খেলা। এ দোলে জল রং নেই। আবীর ফাগও নেই, জামা-কাপড় নষ্ট হবার ভয় নেই। টুকরো-টুকরো কুচি-কুচি নানা রঙের কাগজ। সেই কাগজের কুচো বড়-বড় প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। সমস্ত ছেলেমেয়ের হাতে ওই প্যাকেট। এ ওর মুখে, মাথায়, পিঠে বুকে মুঠো মুঠো কাগজের কুচি ছুড়ে মারছে। অবিকল আমাদের ফাগ খেলা, শুধু ফাগের বদলে কুচি কাগজ। চেনা-অচেনা, মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো কোনও ভেদ নেই, হো-হো হাসির মধ্যে ছুড়ে মারছে এ ওকে। কেউ হয়তো কানের ফুটো থেকে কাগজ কুচি বার করছে, আর একটা মেয়ে হাসতে-হাসতে এসে অন্য কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কেউ হয়তো প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলছে—অমনি খোলা মুখের মধ্যে ঢুকে গেল এক মুঠো কাগজ। অসম্ভব ভিড়, ঠেলে এগুনো যায় না। পথে এক ফুট প্রায় কাগজের কুচি জমে গেছে। মাঝে-মাঝে ঠিক রথের মেলার মতন, আলুর চপ, ফুলুরির দোকান (অর্থাৎ স্টেক আর হট্ ডগ)। হঠাৎ দেখলুম আমি বিমানকে হারিয়ে ফেলেছি ভিড়ের মধ্যে।

একা-একা রং কানার মতো ঘুরছি। মাথায় মাঝে-মাঝে ঠকাস, ঠকাস্ করে মার খাচ্ছি। রঙিন কাগজ ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জিনিস আছে। জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডারা যেমন বেতের ছপটি মারে, সেই রকম ওখানে অনেকের হাতে একটা করে ফাঁপা হালকা কাঠের হাতুড়ি। ঠকাস্ ঠকাস্ করে মাথায় মারছে, লাগে না। মেয়েরা মারছে ছেলেদের, ছেলেরা মেয়েদের। একজনের বান্ধবীকে মারছে অন্য পুরুষ এবং পুরুষ মারছে অপরের বান্ধবীকে। সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছল অজস্র হাসি। একজন পিছন থেকে মাথায় মারল, সেই দিকে তাকাতেই সামনে থেকে আরেকজন, আবার সামনে ঘুরে দাঁড়াতেই পাশ থেকে। হো-হো হাসিতে হ্রদের জলে যেন অনেক বেশি তরঙ্গ উঠছে।

আমি একা-একা ঘুরছি আর মাথায় ঠকাস-ঠকাস মার খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি। খুব

বেশি মুখ খুলে হাসার উপায় নেই, তাহলেই মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এক মুঠো কাগজ। দাঁড়িয়ে থেকে মুখ থেকে কাগজ বার করতে আবার কোটের পাশ দিয়ে পিঠের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কাগজ। খলখল করে হাসতে-হাসতে সুইস সুন্দরীরা আমাকে দেখেই বলাবলি করছে ইস এ লোকটার চুলগুলো কী কালো রে। দে দে আরও রঙ দে। (অবশ্য অন্য কথাও বলতে পারে। আমি ক্ষীণ ফরাসি বিদ্যেয় ওই রকমই বুঝেছিলাম।)

আমার চুল অবশ্য তখন আর কালো কোথায়! লাল নীল রঙে ভরতি। একবার করে চিরুনির মতো আঙুল বোলাচ্ছি আর ফর ফর করে রাশি রাশি রঙিন কাগজ উড়ছে। আমিও তখন কাগজ ছুঁড়ে মারছি। ওই রূপালি মেয়েদের সোনালি চুলে।

কত রাত পর্যন্ত ওইভাবে ঘুরেছিলাম মনে নেই। এক সময় বেশ শীত করতে লাগল। ঘড়ির দেশ, আশে পাশে কোনও ঘড়ি পাই না, কে জানে কটা বাজে। একটা লোককে থামিয়ে জিগ্যেস করলুম, আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?

এই যে, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

তাকিয়ে দেখি বিমান। রঙিন কাগজ মেখে এমন চেহারা করেছে যে, চিনতে পারিনি আগে।

॥ উনিশ ॥

প্রশান্ত মহাসাগর আমি প্রথম দেখি লস্ এনজেলেস-এ। বেয়াড়া বেখাপ্পা বিরাট শহর। একা ও শহর ভ্রমণ ভালো লাগে না। আরিজোনা থেকে সানফ্রানসিসকো যাবার পথে নেহাত ও শহরে নেমেছি—একবার হলিউড ঘুরে যাব বলে। একবার ঘুরে যাওয়াই ভালো, নইলে সারাজীবন মনে হবে—হলিউড বুঝি কী এক আশ্চর্য অপরূপ রূপকথার রাজ্য, আমার সেখানে গিয়ে নিশ্বাস নেওয়া হয়নি। বরং ঘুরে গেলে জানতে পারব, সেও সাধারণ, হলিউড আর পাঁচটা জায়গারই মতন, দৃশ্য হিসেবে একঘেয়ে, নিজের কাজ বা বন্ধু না থাকলে বিরক্তিকর—অর্থাৎ বড় সাইজের বোমবাই!

লস্ এনজেলেসে নেমেই কিন্তু হলিউডের বদলে আমার মনে হল প্রথমেই প্রশান্ত মহাসাগর দেখে আসি। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে এই প্রথম এলাম। এর আগে আটলান্টিক পেরিয়ে এলে কী হয়—প্রশান্ত মহাসাগরে কথা আলাদা। সে জলধিরাজ, তার বুকে হিমালয় ডুবে যায়। প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখা, পৃথিবীর বৃহত্তমকে দেখা।

সমুদ্র কোনদিকে তা কখনও খুঁজতে হয় না। সমুদ্র পাড়ের শহরে নেমেই যেন হাওয়ায় পাওয়া যায় সমুদ্রের গন্ধ। আমি বাসে চেপে বসলুম।

আমেরিকার পূর্ব আর পশ্চিম উপকূলের মধ্যে কিছুটা রেষারেষি আছে। পূর্ব উপকূলের নিউ ইয়র্ক শহর সারা পৃথিবীর চোখ এমন টেনে রেখেছে যে, পশ্চিম উপকূলের এ নিয়ে কিছুটা ঈর্ষা আছে। এজন্য লস্ এনজেলেস মাঝে-মাঝে দাবি করে—সে নিউ ইয়র্কের চেয়ে বড়। কিন্তু নিউ ইয়র্কের প্রাধান্য তো শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, নিউ ইয়র্ক ইউরোপের সবচেয়ে কাছে। আর লস্ এনজেলেস প্রাচ্যের দ্বার—সেখান থেকে সোজা আসা যায় জাপানে। লস্ এনজেলেসের আয়তন বিপুল, মাইলের পর মাইল বাস চলেছে—কিন্তু কেমন যেন ছন্নছাড়া, মনে হয় যেন কয়েকটা ছোট ছোট শহর জুড়ে একটা বিরাট শহর।

বাস থামার পরও কাউকে কিছু জিগ্যেস করিনি, হাওয়ার গন্ধ শুঁকে এগিয়ে গেছি। চওড়া রাস্তার পাশে-পাশে বহু বিচিত্র দোকান। গাছের লাইন করা পার্কের মতো বহু বসার আসন। তার পাশে দেয়াল, ওপারে ঝড়ের গর্জন। আমি হাঁটতে-হাঁটতে এসে দেয়াল ধরে উঁকি দিলাম। প্রশান্ত মহাসাগর।

দেয়ালের পাশে সিঁড়ে বেয়ে নীচে নেমে এলাম বালির পাড়ে। নরম কাঁকড়া ভরা বালির ওপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে এলাম জলের প্রান্তে, আমার পায়ে জল লাগল সমুদ্রের। কাঠের বিরাট পোল দিয়ে একটা জেটির মতো করা আছে, সেখানে অসংখ্য সমুদ্রমাছের দোকান। জেটির ওপর পর্যন্ত চলে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালাম জলের দিকে। আমার পায়ের নীচে বিশাল বাধাহীন সমুদ্র।

আমার উচিত হয়নি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। কারণ সমুদ্র দর্শনের পর আমি কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তো পারলুম না। জলধিরাজ প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখার জন্য যে উৎকণ্ঠা, সে আমার ব্যক্তিগত এবং দেখার পর যে নৈরাশ্য সেও আমার ব্যক্তিগত। কারণ জেটির ওপর দাঁড়িয়ে অকূল প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম, আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। আগেই বোঝা উচিত ছিল, প্রশান্ত মহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর দৃশ্যত একই। একই সমুদ্র, অন্তহীন নীল জল—কোনও তফাত নেই, দীঘা আর লস্ এনজেলেসের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও তফাত নেই। বিরাটত্ব যা কিছু শুধু মানচিত্রে।

হলিউডের কথাও থাক। লস্ এনজেলেসে নিগ্রো-সাদায় দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে তখন, সুতরাং আমার অন্য কথা মনে পড়ছে।

গ্রে হাউন্ড বাসে চেপে লস্ এনজেলেস শহর পৌঁছে প্রথমে আমার একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। একবেলা ঘোরাঘুরি করার পরই বুঝতে পারলুম, শহরটা কুৎসিত। আমার পছন্দ হবে না। নিউ ইয়র্কের বিশাল প্রাণ এখানে নেই। এ শহর শুধু ধনী আর দরিদ্রের—সাধারণ মানুষের নয়। এখানেই ফিল্‌ম তৈরির সবচেয়ে বড় কারখানা বলেই বোধহয় চলচ্চিত্রভবনগুলি এমন কুৎসিত। চোখের সামনে দিবারাত্র চিত্র-তারকাদের দেখেই বোধহয়—এখানে মানুষের সিনেমা দেখার ইচ্ছে খুব কম। অধিকাংশে সিনেমা হলে এক সঙ্গে দুটো করে বই দেখানো হয়, সেই সঙ্গে ওই একই টিকিটে স্ট্রিপটিজ।

ওই স্ট্রিপটিজ সমেত সিনেমা হলেই আমি শুনেছিলাম কালো লোকদের আলোচনা। মঞ্চে ওই সব দৃশ্য, ওরা তখন ঘাড় নীচু করে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এক সময় কান পেতে শুনলাম, সাদা লোকদের গালাগাল। দুনিয়ার সমস্ত সাদা জাতের উপর ওদের ক্রোধ যেন বিষম এক বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আঁটছে। পথে পথেও দেখেছি নিগ্রোদের তিক্ত বিদ্রোহী মুখ। নিউ ইয়র্ক বা অন্যত্রও দেখেছি অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতকায় বন্ধুর মতো পাশাপাশি গল্প করতে-করতে যাচ্ছে। লস্ এনজেলেসে একজনও দেখিনি।

আমি শহরের একটা ম্যাপ কিনতে ঢুকেছি দোকানে। দোকানের মালিক শ্বেতকায়, আমাকে নবাগত দেখে জিগ্যেস করল, তুমি স্প্যানিস বুঝি? মেকসিকো না সাউথ আমেরিকার?

আমাকে অতি কষ্টে বোঝাতে হল। আমি তাদের কেউ নেই। লোকটি তখন আমাকে বলল, নতুন এসেছো, সাবধান হয়ে ঘুরো রাত্রে। জায়গাটা ভালো নয়। তারপর চিবিয়ে-চিবিয়ে আবার বলল, বিশেষ করে নিগ্রোদের খুব সাবধান।

একদিন একটা দোকানে চুল কাটতে ঢুকেছি। তিনজন বিশালকায় কালো নাপিত। কী যেন এক উত্তেজিত আলোচনা করছিল—আমাকে দেখে খুশি হল না। খরিদ্দার না এলেই যেন ওদের ভালো। অবহেলা আমার চুল কাটতে-কাটতে আবার ওরা আলোচনা চালিয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, মালিকের নামে ওরা গালাগাল দিচ্ছে। যেন মালিককে এখনই হাতের সামনে পেলে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে। মাঝে-মাঝে তখন, সকাল বেলাতেই, বোতল থেকে ঢকঢক করে গিলে খাচ্ছে কাঁচা জিন।

একটু পরেই একজন শ্বেতকায় লোক ঢুকলো। লোক তিনটি কথা বন্ধ করে অমনি শান্ত হয়ে গেল। বুঝলুম, ওই লোকটাই মালিক। মালিক বাক্স থেকে টাকা পয়সা হিসেব করে সব নিয়ে আবার চলে গেল। চলে যেতেই আবার রাগে ফেটে পড়ল তিনজন। মালিকের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠল, একজন হাতের খালি বোতলটা দড়াম করে ভাঙল মাটিতে। কাঁচ ছিটকে এসে লাগল আমার পায়ে পর্যন্ত।

সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওই লোকগুলো অবিলম্বেই একদিন বোতলটা মালিকের মাথাতেই ভাঙবে। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অশান্তি কম নয়।

॥ কুড়ি ॥

মিসেস টেলারের বয়স শুনলুম উনআশি কিন্তু দেখলে মনে হয়, অনেক-অনেক কম। শান্ত শীতলশ্রী মুখের মধ্যে যেন জননীর ছায়া আছে। কথা বলেন খুব আস্তে। বিশাল ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী। কিন্তু এক সময় তিনি কবিতা লিখতেন। বললেন, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথকে আমার মনে আছে। এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর সেই অসাধারণ রূপবান মূর্তি।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার তখন বয়স নিশ্চয়ই খুব কম ছিল।

—হ্যাঁ, আমি তখন কচি খুকি প্রায়। নিউইয়র্কের একটা হোটেলে দাসীর কাজ করি—

আমার ভুরু দুটি তখন জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় ব্রাকেট হয়েছে দেখে তিনি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন একটা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করতুম, সপ্তাহে দশ ডলার মাইনে। তখনও ডনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

মিসেস টেলারের শিল্পপতি স্বামী পাশে বসেছিলেন, মৃদু হাসলেন, বললেন, জুডি, তখন তোমার চুলের রং কালো কুচকুচে ছিল।

মিসেস টেলার হাসতে-হাসতে বললেন। এখন রূপোলি। কিন্তু তুমি তো রুপোর রং পছন্দ করো। হ্যাঁ, তারপর একদিন বিকেল বেলা আমার বন্ধু গটফ্রিড (সে ছিল সত্যিকারের ভালো কবি, আহা বেচারা অল্প বয়সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়) হঠাৎ টেলিফোন করে জিগ্যেস করল, আমি একজন ইনডিয়ান কবির বক্তৃতা শুনতে যাব কি না। আমি প্রথমটা খুব অবাক হয়েছিলাম, কারণ জানো তো, ইন্ডিয়ান শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে এখানকার আদি অধিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের কথা। রেড ইন্ডিয়ানরা আবার কবিতা লেখে তাও আমি শুনতে পাব নিউইয়র্কে বসে। গটফ্রিডের যত পাগলামি। একটু পরেই সব বুঝতে পারলুম। গটফ্রিড যোগব্যায়াম করতো, হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে কৌতূহল ছিল, ও অনেক খবর রাখতো। ওর মুখে আমি প্রথম টেগোরের নাম শুনলুম। তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং শুধু কবি নন, মানুষ হিসেবেও মহাপুরুষ।

আমার তখন একটিই ভদ্রগোছের গাউন ছিল, সেটাও সেদিন একটু আগে কেচে দিয়েছি। এখানকার খুকিদের মতো তখন আমরা ট্রাউজারস পরে পথে-পথে বেরুতে পারতুম না তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি ঘষে সেই ভিজে পোষাকটাই কোনওরকমে শুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম গটফ্রিডের সঙ্গে। ব্রডওয়ে অঞ্চলের একটা থিয়েটার, আমার নাম ঠিক মনে নেই। অসংখ্য লোক এসেছিল। তার আগে আমি কোনও ভারতীয়কে দেখিনি। পথেঘাটে দেখেছি হয়তো—কিন্তু আলাদাভাবে চিনতুম না, সমস্ত এশিয়াবাসীদের আমার মনে হতো একরকম। দেখলুম মঞ্চের ওপর কবি একটি চেয়ারে বসে আছেন। অমন রূপবান মানুষ আমি আগে আর দেখিনি, ওরকম জ্যোতির্ময় পুরুষ। পুরুষ মানুষ যে এত সুন্দর হয় (স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি) আমি কল্পনাই করিনি। সাদা চুল, বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, একটা লম্বা স্লিপিং গাউনের মতো পোশাক পরেছিলেন, সে রকম একজন মানুষকে দেখা এক জীবনের অভিজ্ঞতা। উনি প্রথমেই একটি বক্তৃতা দিলেন। তারপর অনেকগুলি কবিতা পড়লেন। দীর্ঘ সুরেলা গলা, যেন গির্জায় একক সঙ্গীতের মতো। কথাগুলি আমার মনে নেই। কিন্তু সেই উদাসীন মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর আমার কানে আজও ভাসছে। সত্যি বড় দুঃখের কথা উনি কী কবিতা পড়েছিলেন আমার একেবারেই মনে নেই—কিন্তু একটা বিশাল ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শেষ পর্যন্ত বসেছিলুম। শেষ হবার পর বেরিয়ে এলুম, কী যেন এক অনির্বচনীয় দুঃখ

বুকে নিয়ে। দুঃখ এবং আনন্দের মিশ্র অনুভূতি, আমি যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। কবিতা শুনলে যে এরকম হয়, তা তো জানতাম না আগে। সেদিন থেকে আমি কবিতাকে সত্যিকারের ভালোবাসতে শিখি। তোমাদের কবির ছোঁয়ায় আমার রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল।

উনি যখন থিয়েটার থেকে বেরুচ্ছেন—হঠাৎ একদল মানুষকে দেখলুম ওঁর দিকে ছুটে যেতে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম—হঠাৎ কী কোনও কারণে লোকে ওঁকে আক্রমণ করতে চাইছে? তক্ষুনি জানতে পারলুম, আসলে তা নয়। উপস্থিত ভারতীয়রা ছুটে যাচ্ছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। কী বিচিত্র প্রথা—সবাই তাঁর সামনে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আমি গটফ্রিডকে জিগ্যেস করলুম। গডফ্রিড বলল, এশিয়ার লোকেরা কারুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁর পা ছুঁয়ে ধুলো নেয়। এরকম কথা আমি জীবনে কখনো শুনিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল ওরকম মানুষকে শ্রদ্ধা জানাবার এটাই তো শ্রেষ্ঠ উপায়।

মিসেস টেলার আমার দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে হেসে বললে, তখন আমিও ওঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালুম।

॥ একুশ ॥

তাহিতি দ্বীপের নাম শুনলেই পল গগ্যাঁর কথা মনে পড়ে। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর গগ্যাঁ কাটিয়েছিলেন তাহিতি দ্বীপে। তাঁর অধিকাংশ বিখ্যাত ছবি এখানেই আঁকা। এবং এখানেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মারাত্মক ব্যাধিজীর্ণ অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত, অসহায় মৃত্যু। এখনও তাহিতির সমুদ্র পাড়ে একজন বৃদ্ধকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সে কতকগুলি ছেলেমানুষি ছবি এঁকে তলায় নাম সই করে গগ্যাঁ। সেই সব ছবি বহুমূল্যে বিক্রি হয় আমেরিকান বিবিদের কাছে। গগ্যাঁ নাম সই করার অধিকারও আছে সেই বৃদ্ধের—কারণ এক তাহিতি রমণীর গর্ভে সে পল গগ্যাঁরই সন্তান।

সেই তাহিতি এই সেদিন পর্যন্ত ছিল ভ্রমণকারীদের স্বর্গ। এবং ভ্রমণকারীদের ভাষায় "পৃথিবীর শেষ স্বর্গ"। এখনও এখানে ঝকঝকে সূর্যের আলো, টলটলে নীল জল, অজস্র ফুল ফলের সম্ভার, এখানকার বাতাসে সুস্বাস্থ্যের সৌরভ। এখানকার জীবনযাপন শুরু আনন্দ ও রঙের সমারোহ, আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানকার ওয়াহিন মেয়েরা। সেই সুন্দরীরা স্বর্গের অপ্সরীদের মতন, তারা বিবাহ বন্ধন মানে না, জানে না কোনও হিসেব নিকেশ। যে পুরুষকেই তার পছন্দ হয়, তারই বাহু বন্ধনে ধরা দেয়। পৃথিবীতে সম্ভবত এই শেষ জায়গা—যেখানে নারী-পুরুষের প্রেমের মাঝখানে কোনও আইন বা অর্থমূল্য নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির মধ্যে তাহিতির অধিবাসীরাও পলিনেশিয়ান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং স্বভাবতই রূপবান। ১৯৬০ সালে তাহিতির পাপিতে শহরে জেট প্লেনের উপযোগী এরোড্রম খোলা হলে শুরু হয়, দলে দলে ধনী ভ্রমণ বিলাসীদের অভিযান। এদের মধ্যে আমেরিকানই বেশি। মিউটিনি অন দ্যা বাউনটি ছবির সুটিং এর সময় মারলন ব্র্যানডো এবং তাঁর দলবল গিয়েছিলেন ওখানে, তারপর আরও বহু সিনেমা কোম্পানি, উপভোগ-লোভী ব্যবসায়ীতে ভরে গিয়েছিল তাহিতি। ফলে এসেছে প্রচুর ডলার, খাদ্য ও আধুনিক উপকরণের ছড়াছড়ি, তাহিতির প্রত্যেকটি অধিবাসীই সুখ ও স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেছে। ছুটি আর খুশির হই-হল্লাই ছিল তাহিতির প্রাণ। পল গগ্যাঁ যেমন পেয়েছিলেন পাহুরা নাম্নি সুন্দরী অধিবাসীনীকে, তেমনি অন্য পাহুরাদের খুঁজতে দলে দলে এসেছে গায়ে ফুলকাটা জামা পরা বিদেশিরা, পেয়েছেও অনেক।

তাহিতিতে আর বোধহয় পর্যটকরা তেমন আসবে না। বোধহয় তাহিতির স্বর্গেও ছড়িয়ে পড়বে বিষের ধোঁয়া। আণবিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তিতে সই করেনি যে দুই দেশ, সেই ফ্রান্স ও চিন

এখন আণবিক বোমার বিস্ফোরণ চালিয়ে যাচ্ছে। এবং ফ্রান্সের বিস্ফোরণের জায়গা এই প্রশান্ত মহাসাগর। ফ্রান্স প্রথম বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালিয়েছে সাহারা মরুভূমিতে, এখন তার পক্ষে সুবিধেজনক কেন্দ্র প্রতিবাদহীন প্রশান্ত মহাসাগর। ফ্রান্স অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে, অল্পদিনের মধ্যেই হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবে। সেই ধোঁয়া এসে ছড়িয়ে যাবে তাহিতির আকাশে। অন্য দেশের ভ্রমণকারীরা এখন তাহিতি দ্বীপ বর্জন করতে শুরু করেছে। আবার স্বর্গ থেকে পতন।

তাহিতির সরল অধিবাসীরা এখনও তেমনভাবে এর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেনি। আমেরিকান ভ্রমণকারীরা আসা বন্ধ করায় ডলারের মিষ্টি ঝনঝন শব্দ বন্ধ হলেও ফ্রান্সের, ফ্রাংকের নোট এখনও সেখানে বাতাসে উড়ছে। আণবিক পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ফরাসি সরকার তাহিতিতে গড়ে তুলেছেন বিরাট সামরিক শিবির। ১৯৬২ সালের পর থেকে এখানে সামরিক বিভাগের হাজার লোক আস্তানা গেড়েছে এবং সৈনিকদের ব্যবহার, যদিও অনেক সময় বর্বরোচিত, নিরেট এবং কটু, কিন্তু পর্যটকদের তুলনায় টাকা খরচে তারা আরও উদার। সৈন্যবাহিনীর খরচ করা টাকার স্রোতে তাহিতির অধিকাংশ অধিবাসীরই আয় এখন দ্বিগুণ।

অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের জন্য সরল তাহিতিবাসীরা এখনও প্রতিবাদ জানাতে শেখেনি। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অন্য দেশগুলি যথেষ্ট প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সরকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। চিলি থেকে উঠছে অসহিষ্ণু গুঞ্জরণ এবং জাপান সরকারিভাবে বিধিবদ্ধ প্রতিবাদ জানাবে ঠিক করেছে। ফ্রান্স সারা বিশ্বেই জনপ্রিয়। ফরাসি দেশকে কে না ভালোবাসে এমনকি তার পরম শত্রুরাও, কিন্তু সে ফরাসি দেশ মারণাস্ত্র প্রস্তুতকারক ফরাসি দেশ নয়, চিরকালের ফ্রান্স, যে ফ্রান্স সারা বিশ্বের সংস্কৃতির কেন্দ্র। কিন্তু ফরাসি সংস্কৃতিকে ভালোবাসলেও ফরাসী দেশের জঙ্গি জাতীয়তাবাদকে কেউ সুনজরে দেখছে না।

তাহিতির অনেক সরল মানুষ এখনও ভাবে, বিস্ফোরণ হচ্ছে আটশো মাইল দূরে, সে তো অনেক দূর, একদিন প্রবল ঝড়ো বাতাস উঠবে। উড়িয়ে নিয়ে যাবে বিষের ধোঁয়ার মেঘ। তা আর এ পর্যন্ত পৌঁছবে না, তাহিতি স্বর্গই থেকে যাবে। ভয় কী? তবু বহিরাগতদের মুখে আশঙ্কা আর উদ্বেগের চিহ্ন দেখে এখন সর্বক্ষণ অ্যাটম বোমার আলোচনা, তাহিতির লোকেরা কী যেন এক অশুভ ছায়া দেখতে পেয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরার ছোট্ট ডিঙা একা বাইতে-বাইতে তাহিতির কোনও জেলে বিষণ্ণভাবে গান ধরে। সেই দিনগুলো ছিল ভালো, যেদিন এখানে বিদেশের সাদা মানুষেরা আসেনি, যন্ত্র আসেনি, সোনার টাকা আসেনি। তখন ছিল শুধু সমুদ্রের গান, ফুলের রং আর নারীর প্রেম। সেদিনই তাহিতি ছিল সত্যিকারের স্বর্গ।

॥ বাইশ ॥

মোটর গাড়ির তো প্রায়ই নানারকম অসুখ দেখা যায়, কিন্তু মোটর গাড়ি যাদের থাকে, তাদেরও অনেকের মোটর গাড়ি সংক্রান্ত অসুখ কম থাকে না। গাড়ি ধ্যান, গাড়ি জ্ঞান, গাড়ির দুঃখে দুঃখী। জার্মানিতে পাউলভাকের নামের একটি লোক দুর্দান্ত গতিতে তার প্রেয়সীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারপর থামল এসে একটা দোকানের সামনে একটু ফলের রস খেয়ে নেবে। প্রেয়সীকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে একা এল দোকানের সামনে, খুশির আড়চোখে তাকাতে লাগল প্রেয়সীর দিকে।

রহস্য না করে বলে দেওয়াই ভালো, পাউলভাকের-এর প্রেয়সী এক্ষেত্রে কোনও মেয়ে নয়। একটি নতুন চকচকে মোটর গাড়ি। পাশেই একটা গ্যাস স্টেশন বা পেট্রোল পাম্প—সেখানকার কর্মী জোসেফ বেইনেরট কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করল,—

গাড়িটা আপনার?

পাউলের উত্তর : হ্যাঁ। নতুন কিনলাম। কেমন গাড়িটা?

বেইনেরট : বাজে। ওগুলো বাজে গাড়ি।

—কী?

কথায়-কথায় তর্ক শুরু হয়ে গেল। প্রেয়সীর অপমান। পাউল ঝট করে পকেট থেকে পিস্তল বার করে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করল বেইনেরটকে এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

জার্মানিতে গাড়িপ্রেম এতই বেশি যে এ-রকম ঘটনা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার প্রমাণ, পাউলের লঘু শাস্তি। বিচারে পাউলের মাত্র দুবছর সাত মাস জেল হয়েছে। অভিযোগ প্ররোচনার ফলে মানুষ খুন। আদালতে পাউল বলেছিল, আমি আমার মারসিডিজ গাড়িটাকে ভালোবাসি। ওর শরীরে সামান্য আঘাত পেলে, আমি নিজের শরীরে আঘাত পাই। ওকে কেউ অপমান করলে আমি সহ্য করতে পারি না।

আমেরিকাতে সেরা উইনকিনস নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তাকে আমি মোটর গাড়ির সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিরাট ধানডার বার্ড গাড়িখানার কাছে ছুটে যায়, নিজে সারা গাড়িটাকে ধুয়ে মুছে চকচকে করে। আবার রাত্তিরে শুতে যাওয়ার আগে গাড়ির স্টিয়ারিং-এ চুমু খেয়ে আসে।

সেরা উইলকিনসের ছেলে বন্ধুর নাম রয় রজার্স। ওদের বিয়ে ঠিকঠাক, পি এইচ ডি-র ডেসারটেশানটা হয়ে যাওয়ার পরই বিয়ে হয়ে যাবে। হঠাৎ শুনলাম ওদের বিয়ে ভেঙে গেছে। কারণ খুবই সামান্য, রয় রজার্স সেরা উইকিনসের থানবাডার বার্ড নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, ড্রাইভ-ইন সিনেমায় গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে সামান্য দুর্ঘটনা হয়। গাড়ির কিছুই ক্ষতি হয়নি প্রায়, মাডগার্ডের দু-একটা চলটা উঠে গেছে, রজার্সের হাতে সামান্য চোট লেগেছে। রজার্সের যা হচ্ছে হোক, গাড়ির রূপ নষ্ট হওয়ার জন্য রাগ করে সেরা বিয়ে ভেঙে দেয়। পরের মাসেই সেরার বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সঙ্গে।

শিকাগোতে আমার প্রতিবেশী একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রগাঢ় পান্ডিত্য, উন্নত চরিত্রবান, সহৃদয়—ওঁর গাড়িতে প্রায়ই আমায় লিফ্ট দিতে চাইতেন। অমন চমৎকার লোক, কিন্তু ওঁর গাড়িতে চড়ার নাম শুনলেই আমি পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতুম। অন্য সময় তিনি কত বিষয়ে কত জ্ঞানের কথা বলতেন। কিন্তু গাড়িতে উঠলেই শুধু গাড়ির কথা। এই গাড়ি কত হাজার মাইল ছুটেছে, কত বিপদসংকুল পথ তিনি এ গাড়িতে পার হয়েছেন—সেসব গল্প নয় মোটেই। গাড়িতে উঠলেই ওঁর মুখ চোখ বদলে যায়, সজাগ উৎকর্ণভাবে বলতে থাকেন, আচ্ছা, গিয়ার বদলাবার সময় একটা শব্দ হোল না? জানালার কাঁচটা নড়ছে নাকি? ওয়াইপারটা মনে হচ্ছে একটু ধীরে হয়ে গেছে। পেছন দিক থেকে একটা কিচকিচ কিচকিচ শব্দ হচ্ছে। শোনো তো কান পেতে শোনো তো। এসব শুনতে-শুনতে আমার কান ঝালাপালা।

ফ্রাংক অরড একজন ইংরেজ। কী প্রাণবন্ত, উদার ছেলে, আমাদের সঙ্গে বিষম বন্ধুত্ব। ফ্রাংকের টুকটুকে লাল রং-এর মোটর গাড়ি। এক শনিবার আমরা ঠিক করলুম, উইনডগর, প্যালেস দেখতে যাব, আমরা চারজন বাঙালি বন্ধু আর ফ্রাংক। ফ্রাংক ওর গাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু অবাক কান্ড করল ফ্রাংক। যাওয়ার মুহূর্তে ও বলল তোমরা চারজন? কিন্তু আমার গাড়িতে তো আমি সবশুদ্ধ চারজনের বেশি নিয়ে যাই না। চারজনের বেশি হলে ওর কষ্ট হবে, বুঝলে। তিনজন আমার গাড়িতে এসো, আর একজন ট্রেনে চলে যাও।

আমি ওর কাঁধে চাপড় মেরে বললুম, কী বলছো। আমরা একটা গাড়িতে এর আগে আট-দশজন পর্যন্ত চেপেছি। কী হবে। একজন কখনও আলাদা যেতে পারে? তোমার এমন চমৎকার গাড়ি।

ফ্রাংক নিরেট মুখ করে বলল, না ভাই, চারজনের বেশি নিলে আমার গাড়ির কষ্ট হয়।

আমি ফিল করি। তোমরা একজন আলাদা যাও।

বলা-বাহুল্য, সেবার আমরা ফ্রাংকের গাড়িতে যাইনি। এসব অসুখ ছাড়া কি? অন্যান্য বহু রোগের পর এখন মোটর গাড়ির অসুখ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গাড়ি আছে আমেরিকায়, কত লোকের গাড়ি আছে সে কথা না বলে শুধু বলাই যথেষ্ট যে, এক পরিবারেই দুটি বা তার বেশি মোটর গাড়ি আছে, এরকম পরিবার সংখ্যাই ওদেশে এগারো মিলিয়ন। মোটর গাড়ি ছাড়া এক পা বেরুতে পারে না—এমন নারী পুরুষ ওদেশে অসংখ্য। হেঁটে গেলে বড় জোর দু-মিনিটের রাস্তা, তবু একখানা চিঠি পোস্ট করতে হলেও মোটর গাড়ি বার করেন।

মোটর গাড়ির সংখ্যায় আমেরিকার পরই দ্বিতীয় স্থান পশ্চিম জার্মানির (৮,৭০০,০০০) এবং অনেকেই নিজের-নিজের গাড়ির একটা আলাদা নাম রাখে। টেলিফোনে একটি জার্মান ছেলে তার বান্ধবীকে হয়তো বলছে, আজ যেতে পারবো না ডিয়ার, আমার সুসির আজ অসুখ। এ কথা শুনলে অন্য লোকের চমকে যাওয়ার কথা। কিন্তু সুসি ওর মোটর গাড়ির নাম, সেই রকমই মাউসি কোটে, হানসেন ইত্যাদি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জার্মান পুরুষদের গাড়ির প্রতি প্রেম এত বেশি যে, ৬০% পুরুষ নিজেই নিজের গাড়ি ধোয়ামোছা করে, এদের মধ্যে ৫৭% প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিনে একবার।

স্নানের চূড়ান্ত হচ্ছে সাবান-স্নান। রোমের সাম্রাজ্ঞীরা যেমন সাবানের ফেনায় ডুবে থেকে স্নান করতেন জার্মান পুরুষেরা তাদের গাড়িকেও সেইরকম স্নান করাতে চায়। প্রতি শনিবার পথে-পথে অসংখ্য সভ্য শিক্ষিত জার্মান পুরুষকে দেখা যাবে, হাতে গুড়ো সাবানের প্যাকেট কিনে ফিরছেন। কারণ রবিবার সকালে বালতিতে সাবানের ফেনা গুলে নিজের মোটরগাড়িকে স্নান করাবেন।

॥ তেইশ ॥

আমি প্রথম দার্জিলিং যাই স্কুল-বয়সে।

তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু দার্জিলিং তখনও প্রায় সাহেবি শহর। চা বাগানের মালিক ও ম্যানেজারেরা সব সাহেব। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সংখ্যাও ছিল অনেক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সাহেবদের তফাত বুঝতাম না আমরা। উচ্চবিত্ত বাঙালিরা কখনও সপরিবারে হাওয়া বদলাবার জন্য দার্জিলিং-এর হোটেলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। কিছু-কিছু বাড়িও ভাড়া পাওয়া যেত। গরিব বাঙালিদের কাছে দার্জিলিং ছিল স্বর্গের মতন স্বপ্নের দূরত্ব।

আমি গিয়েছিলাম বয়েজ স্কাউট হিসেবে। খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট, পায়ে নটি বয় সু, গলায় বাঁধা নীল স্কার্ফ। তখনও গোঁফের রেখা গাঢ় হয়নি। দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে সারাব্রিজ আর ব্যবহার করার উপায় ছিল না আমাদের তাই তখন দার্জিলিং যাওয়াটাই ছিল বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার। তিন রকমের ট্রেন। প্রথম বড় ট্রেনে শিয়ালদা থেকে সাহেবগঞ্জ কিংবা শকরিকালি ঘাট। তারপর ঢাউস স্টিমার। ফারাক্কা বাঁধ তো দূরের কথা, উত্তর ভারতে অনেক বাঁধই তখনও হয়নি, গঙ্গায় জল ছিল অনেক, নদীগুলি ছিল ঠিক নদীরই মতন। বড় মনোহর ছিল এই জলযাত্রা। ওপারের মনিহারি ঘাটে স্টিমার ভেড়বার আগেই যাত্রীদের মধ্যে দেখা যেত বিশেষ চাঞ্চল্য। থামা মাত্রই টপাটপ বালির ওপর লাফিয়ে পড়ে সবাই মিলে দৌড় প্রতিযোগিতা। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকত ফাঁকা ট্রেন, কিন্তু তাতে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং যে আগে উঠে জায়গা দখল করতে পারে।

এবারে মিটার গেজ। আমরা জানলা দিয়ে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকতাম, কখন পাহাড় দেখব। কিছুই দেখা যেত না। আবার এক সময় মালপত্র বয়ে নিয়ে ন্যারো গেজের ট্রেনে ওঠা

সে ট্রেন যেন খেলনা গাড়ি। আমরা তখন কলকাতার আশপাশেই মার্টিন কোম্পানির এই রকম ট্রেন দেখেছি অনেকবার, অবিকল কু ঝিকঝিক কু ঝিকঝিক আওয়াজ, ঠিক গল্পের বইয়ের মতন। অনেক ছেলে এই চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা দৌড়ে আবার উঠে পড়ে। দুজন লোক ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেন চলার সময় তারা অনবরত সামনের লাইনে বালি ছড়ায়। ওই লোক দুটির চাকরি খুব লোভনীয় মনে হয়েছিল।

দেওঘর-মধুপুরে এর আগে ছোট ছোট পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা ছিল। খুদে ট্রেনে চুনভাটি পর্যন্ত ওঠার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, আসল পাহাড় কাকে বলে। এ যেন পাহাড়ের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় ঢেউয়ের পর ঢেউ। এত সবুজ আগে কখনো একসঙ্গে দেখিনি। একদিকে খাদ বা উপত্যকা, অন্যদিকে জঙ্গলের দেয়াল। কী নিবিড় বন, দিনের বেলাতেও অন্ধকার! আমরা শুনেছিলাম প্রায়ই জঙ্গল থেকে হাতিরা বেরিয়ে এসে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রেন তখন থেমে পড়ে করুণভাবে সিটি দেয়। সেই হাতির পাল মর্জি মতন কতক্ষণ বাদে সরে যাবে, তার কোনও ঠিক নেই। হায়, সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য আমাদের হল না।

কার্শিয়াং টুং

সোনাদা, ঘুম।

কার্শিয়াং পেরুবার পরেই আমরা ছড়ার মতন এই নামগুলো আবৃত্তি করি! এক একটা রূপকথার মতন স্টেশান। মানুষজন প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। রাস্তার ধারে দু-একটা ফরসা ফরসা ছেলেমেয়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকে। আমার সব সময়েই মনে হচ্ছিল, সব কিছুই যেন গল্পের বইতে পড়া জগতের মতন।

মাঝে-মাঝে ইল্‌শেগুড়ি বৃষ্টি ও রোদের খেলা চলছিল, সোনাদা পেরুবার পরই হঠাৎ রাশি-রাশি মেঘ এসে ঢুকে পড়ল ট্রেনের কামরায়। দার্জিলিং-এ ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে পড়ে, এ রকম আমরা শুনেছিলাম আগেই, কিন্তু চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমরা ছুটোছুটি করে সেই মেঘ ধরায় চেষ্টা করতে লাগলাম। ক্রমে মেঘ এমনই জমাট হল যে আর কিন্তু দেখা যায় না। একদা রাজকুমাররা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উড়ে চলে যেত মেঘের রাজ্যে, আর আমরা কিশোর বয়েজ স্কাউটরা টয় ট্রেনে মেঘ ভেদ করে যাচ্ছি।

ঘুম নামটার মধ্যেই এক অদ্ভুত আমেজ আসে। হয়তো শব্দটা বাংলা নয়, এর অন্য মানে আছে, তবু একটা জায়গার নাম ঘুম শুনলেই সেই জায়গাটিকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি সেদিন হাঁ করে মেঘ খাচ্ছিলাম।

এই রাস্তায় ঘুমই সবচেয়ে উঁচুতে, তারপর আবার উৎরাই। একটু পরেই যেন এক ফুঁয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সব মেঘ। ঝকঝকে রোদে ফুটে উঠল পাহাড়, জঙ্গল। কোথাও বৃষ্টির লেশমাত্র নেই লাইনের ওপর কয়েকটা পাথর পড়েছে বলে থেমে গেল ট্রেন। আসলে, ওই পাথরগুলি যেন ট্রেনটাকে থামতে বাধ্য করেছিল আমাদেরই জন্য। আমরা হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম কামরা থেকে। সামনেই একটা গভীর উপত্যকা, তার উল্টো দিকের আর একটি পাহাড়ের গায়ে দার্জিলিং এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো একটি ছবি। যেন অমরাবতী! বুক দুরদুর করছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, মহান সুন্দরের সেই বিভা যেন সমস্ত উপভোগের শক্তিকে ছাড়িয়ে যাবার মতন।

অল্প বয়সে চোখ দুটি ছোট থাকে সমস্ত কিছুকেই বেশি বড় বড় দেখায়। সেই সময়ে কুশ্রীতা-কদর্যতার দিকে চোখ পড়লেও মনে দাগ কাটে না, সুন্দর, মধুরের অভিজ্ঞতাই মনে ছাপ ফেলে যায়।

যতদূর মনে পড়ে সেই প্রথম দেখা দার্জিলিং ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম শহর। ভিড় খুব কম, সব দিকই ফাঁকা। পাহাড়ের পটভূমিকায় এই নির্জনতাই ছিল আসল সৌন্দর্য। পর্যটকদের

জটলা ছিল শুধু ম্যালে। একদিন ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে এক ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়ে দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়েছিলাম। খানিকটা পরে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। এক সময় দেখি, কোথাও কোনও জন-মনুষ্য নেই, আমার ঘোড়ার পায়ের কপাৎ কপাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দও নেই, রীতিমত গা ছমছম করছিল। সেও তো মোহময় ভালো লাগা।

আমরা যেখানে উঠেছিলাম, সেটি একটি পুরোনো আমলের হোটেল হলেও, নাম স্যানাটোরিয়াম। এই নামটা শুনলেই টি বি রোগের কথা মনে পড়ে। সে আমলে টি বি-ই ছিল রাজরোগ, ক্যান্সার হার্ট অ্যাটাক তেমন পাত্তা পেত না। তবে কি আমরা যক্ষ্মারোগীদের খাট বিছানায় শুচ্ছি? এই চিন্তায় আমাদের স্কাউট মাস্টাররা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। পরে অবশ্য জেনেছি, যক্ষ্মারোগের সম্পর্ক ছাড়াও যে-কোনও স্বাস্থ্যনিবাস বা আরোগ্য নিকেতনকেই স্যানাটোরিয়াম বলে। যাই হোক, আমাদের দাদা শ্রেণি অভিভাবকরা বলে দিয়েছিলেন যে আমরা যেন খবর্দার বাইরে কোনও খাবার না খাই। দার্জিলিং-এ খুব টি বি রোগের উৎপাত।

দার্জিলিং খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। অসুস্থ ব্যক্তিরা এখানে আসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। অথচ এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা নাকি খুব রোগে ভোগে, অধিকাংশেরই টি বি আছে। এখানকার নেপালিদের বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা, নানান রকম রঙিন জামা কাপড় পরে থাকে, তবু তাদের টি বি কেন? এরা পরিশ্রম করে বেশি সেই তুলনায় ঠিক মতন খেতে পায় না, তাই তাদের ক্ষয় রোগ ধরে যায়। এখানকার কুলি রমণীদের দেখেছি মাথায় দড়ি বেঁধে দু-চারটে বাক্স-প্যাঁটরা বয়ে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা ধরে হাঁপাতে-হাঁপাতে ওঠে।

বাস, দার্জিলিং-এর নেপালিদের সম্পর্কে শুধু ওইটুকুই জানা গিয়েছিল সেবারে।

দার্জিলিং কার?

কোনও এক সময় লেপচারাই ছিল এখানকার অধিবাসী। তারপর প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখন তাদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। লেপচাদের মধ্যে বেশ কিছু অংশ এখন ক্রিশ্চিয়ান হয়ে গেছে, পূর্ব গৌরব স্মরণ করে তারা মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দার্জিলিং শহরটি নির্মাণের কৃতিত্ব তো ইংরেজদের বটেই, এই জেলাটারও পত্তন করে সেই সাহেবরাই। ইংরেজরা পা দেবার আগে এই জঙ্গল-ঢাকা পাহাড়গুলিতে জনবসতি ছিল নগণ্য, এই এলাকা ছিল পশু পাখিদের নিশ্চিন্ত লীলাভূমি। প্রগাঢ় নির্জনতার মধ্যে খুব সম্ভবত অপ্সরা ও কিন্নরেরা এখানে গোধূলিবেলায় খেলা করতে আসত।

কাগজে কলমে এই অঞ্চল ছিল সিকিম রাজাদের অধীনে। গত শতাব্দীতে সিকিমের সঙ্গে নেপালের ঝগড়া-মারামারি লেগে যেত যখন তখন। কোম্পানির রাজত্ব তখনও খুব বেশি দূর বিস্তৃত হয়নি, তবে ইংরেজদের সঙ্গে সিকিমের রাজার একটা মৈত্রী চুক্তি ছিল—নেপাল বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইংরেজরা এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতো সিকিমের রাজাকে। অর্থাৎ নেপালি তিব্বতিদের খুব ঠ্যাঙাত।

সেই রকমই একবার সিকিম-নেপাল সীমান্তে সংঘর্ষের সময় কলকাতা থেকে লর্ড বেন্টিংক তাঁর দুজন প্রতিনিধি পাঠালেন হিমালয়ের এই দিকে। এই দুজন অফিসার হলেন ক্যাপটেন লয়েড এবং মিঃ গ্র্যান্ট।

প্রকৃতিপ্রেম ইংরেজদের মজ্জাগত,—না হলে ওদের মধ্যে অত রোমান্টিক কবির জন্ম হল কী করে? শুধু নিরীহ কবিরা কেন, ইংরেজদের মধ্যে অনেক ডাকাত, খুনে, সুদখোর মহাজনও খুব

রোমান্টিক হয় এবং তারাও কবিতা লেখে। (যেমন, স্যার ওয়াল্টার র‍্যাল, মারলো, শেকসপিয়ার প্রমুখ)। অরণ্য ও নিসর্গের প্রতিও ইংরেজরা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়।

ক্যাপটেন লয়েড এবং মিঃ গ্র্যান্টের মধ্যে কে বেশি প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন তা বলা শক্ত, সম্ভবত প্রথমজনই। তলোয়ার বন্দুকধারী এই দুই ইংরেজ যুবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করলেও নগাধিরাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন এবং গোর্খাদের একটি গ্রামে তাঁবু ফেলে একটানা ছটা দিন কাটিয়ে দিলেন নিষ্কর্মাভাবে। চোখের সামনে গগনচুম্বী ধবল পর্বত, চতুর্দিকে সবুজ অরণ্যের সমারোহ, আর নির্মল শীতল বাতাস যেন একেবারে বিলেতের মতন। কলকাতায় গরম, ঘামাচি, ওলাওঠা, ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলা গাড়ির ঘর্ঘর আর মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনির তুলনায় এই গ্রামটি যেন স্বর্গ।

এই গ্রামটির নামই দার্জিলিং। বর্তমান অবজারভেটরি হিলের ওপর এককালে একটি তিব্বত গুম্ফা ছিল, সেটির নাম ছিল দোরজে-লিং, সেই থেকেই স্থানটির নাম এসেছে। লিং মানে জায়গা আর দোরজে শব্দটি বজ্র শব্দের তিব্বতি অপভ্রংশ।

আমাদের এক সংস্কৃত পণ্ডিতমশাই অবশ্য বলেছিলেন যে, দার্জিলিং নামটি এসেছে 'দুর্জয়লিঙ্গ' থেকে। ওই এক শ্রেণির লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন সমস্ত নামই সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর এমনকি পারস্য দেশটিও পারা অস্য! অবশ্য 'দুর্জয়লিঙ্গ' শব্দটির সঠিক কী অর্থ হয়, তা বোধ হয় ওই পণ্ডিতমশাই ভেবে দেখেননি।

যাই হোক লয়েড, ও গ্র্যান্টের আমলে মাত্র গোটা কুড়ি স্থানীয় লোকেদের কুঁড়ে ঘর ছিল ওই দার্জিলিং গ্রামটিতে। সেই সময়কার একটি দৃশ্য অনায়াসেই এরকম কল্পনা করা যায়।

তাঁবুর সামনে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছেন লয়েড এবং গ্রান্ট। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর ঝকঝক করছে আকাশ। সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঠান্ডা বাতাস খুব মোলায়েম স্পর্শ দিচ্ছে এই দুই ইংরেজ তনয়ের শরীরে। ছোটো ব্র্যান্ডির পেগে চুমুক দিতে-দিতে লয়েড বললেন, ওহে গ্র্যান্ট, এই জায়গাটা আমাদের হোমের চেয়েও অনেক রমণীয় তাই না? এখানে দু-একটা হোটেল-বাড়ি বানালে হয় না? যাতে কলকাতার ঝাঁঝাঁ রোদ প্যাচপেচে বৃষ্টি থেকে পালিয়ে মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতে পারি!

গ্রান্ট বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। স্থানটি অতি অনবদ্য তাতে সন্দেহ নেই। শরীর ও মন জুড়িয়ে যাচ্ছে একেবারে। কিন্তু একটাই মুশকিল, এই জায়গাটি তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নয়। এটা সিকিমের রাজার সম্পত্তি।

লয়েড বললেন, নেটিভরা এত মনোরম স্থান নিয়ে কী করবে? ওরা কি এর ব্যবহার জানে? সিকিমের রাজা কোনওদিন এখানে এসেছে? নেটিভরা এই সৌন্দর্যের মর্মই বুঝবে না। সিকিমের রাজার কাছ থেকে এই জায়গাটা কেড়ে নিতে কতক্ষণ লাগবে?

গ্রান্ট বললেন, তার আগে গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংককে জানানো দরকার।

লয়েড বললেন, কোম্পানির সার্ভেন্টরা কলকাতায় কত রকম রোগে ভোগে। তাদের কিছুদিন এ রকম একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখলে আপনিই শরীর সারবে। বেঙ্গল-এর মধ্যেই যে এমন সুন্দর জায়গা আছে, তা আমরা জানতামই না।...

যেমন কথা তেমন কাজ। কলকাতায় ফিরেও লয়েড ও গ্রান্ট তাদের সংকল্প বিস্মৃত হলেন না। তাঁরা লর্ড বেন্টিংককে বোঝালেন যে দার্জিলিং গ্রামটি একটি চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাস তো হওয়া উচিতই, তা ছাড়া সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটিও বসানো যেতে পারে। নেপালকেও তো আটকানো দরকার।

কলকাতায় বসে তুষার মাখা পাহাড় আর হিমেল হাওয়ার বার্তাই যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। দার্জিলিং গ্রামটির বর্ণনা পড়ে লর্ড বেন্টিংক আকৃষ্ট হলেন এবং ক্যাপটেন রবার্ট নামে একজন ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেলকে পাঠালেন জরিপের জন্য। সঙ্গে গেলেন মিঃ গ্রান্ট। বলাই বাহুল্য, ক্যাপটেন

রবার্টও জায়গাটি দেখে মুগ্ধ। তাঁর রিপোর্ট গেল কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাছে। সকলেরই পরিকল্পনাটি খুব পছন্দ হল।

ক্যাপটেন লয়েড ইতিমধ্যে জেনারেল লয়েড হয়েছেন। তিনি এবার লর্ড বেন্টিংকের প্রতিনিধি হয়ে সিকিমের রাজার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে এলেন। আলোচনা আর কী, জায়গাটা ইংরেজদের চাই।

শক্তিমান কিংবা বড়লোকদের ইচ্ছেটাই আদেশ। সিকিমের রাজা কোনও দরাদরির মধ্যেই গেলেন না। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক চেয়েছেন সুতরাং সিকিমের রাজা বিনা শর্তে পুরো জায়গাটাই দান করে দিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। বিনা রক্তপাতে তো বটেই, একটি কপর্দকও ব্যয় না করে সিকিমের খানিকটা অংশ চলে এল ইংরেজদের হাতে। রঙ্গিত নদীর দক্ষিণ থেকে মহানদী নদীর পশ্চিম পর্যন্ত। সেই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল ১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ওই তারিখটিকে দার্জিলিং এর জন্মদিন বলে গণ্য করে অনেকে।

অত্যুৎসাহী জেনারেল গ্রান্ট এরপর পুরো একটা শীতকাল এবং পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত রয়ে গেলেন দার্জিলিং অঞ্চলে। কোথায় স্বাস্থ্যনিবাস আর অন্যান্য বাড়িঘর তৈরি হবে ঠিকঠাক করলেন সেই সব।

এই নবলব্ধ অঞ্চলে জেনারেল লয়েডই হলেন কোম্পানির এজেন্ট এবং তিনি আহ্বান করলেন দার্জিলিং-এর বাড়ি ঘর বানাতে ইচ্ছুকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র। কলকাতা থেকে অনেকেই জমি চাইলেন, তারা প্রায় সকলেই সাহেব। কলকাতার বাঙালি বাবুদের টনক নড়ল না।

বাঙালিরা পাহাড়-বিলাসী, কিন্তু পর্বতপ্রেমিক নয়। বাঙালি মানসে পাহাড়ের রুক্ষতা কিংবা উচ্চতা নেই। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালিরাও কোনওক্রমে পয়সা জমিয়ে সপরিবারে, জীবনে একবার অন্তত মাঝারি ধরনের পাহাড়ি অঞ্চলে বেড়াতে যাবেই, দূর থেকে পাহাড়চূড়ায় বরফ দেখে জীবনে ধন্য করবে, তবু কোনও বাঙালি পরিবারই সমতল ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে সংসার পাততে যাবে না।

পশ্চিমবাংলার মধ্যেই এমন মহান, সুন্দর, সবুজ ও রুপালি পর্বতশ্রেণি রয়েছে, কিন্তু বাঙালিরা সেখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয়নি।

সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনোর প্রবাদটা ইংরেজদের ক্ষেত্রে প্রায় সব জায়গাতেই খাটে। সিকিমের রাজার কাছ থেকে প্রথমে মিষ্টি কথার কৌশলে আদায় করা হল, তারপর ছলে ও বলে দখল করা হল তরাই অঞ্চল ও কালিম্পং।

ক্যাম্পবেল নামে একজন ডাক্তারকেই বলা যায় দার্জিলিং শহর নির্মাণের প্রথম স্থপতি। তিনি এখানে এসে প্রথমেই একটি চমৎকার স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করলেন, তারপর বাজার বসালেন, রাস্তাঘাট তৈরির দিকে মন দিলেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তৈরি হল পাঙ্খাবাড়ির দিকের রাস্তা, কার্শিয়াং ও দার্জিলিং-এ দুটি হোটেল হল। কিন্তু স্থায়ী নাগরিক ছাড়া শহর জমে না। ৭০ ঘর ইওরোপীয়ের বসবাস শুরু হলেও দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য নেটিভদেরও দরকার। এখানে এসে যারা বসতি স্থাপন করতে চায় তাদের বাসস্থানের জন্য জমি এবং চাকরি দেবারও প্রলোভন দেখালেন ক্যাম্পবেল সাহেব। সমতলের বাঙালিরা তাতেও প্রলুব্ধ হল না বিশেষ। সমতলের সকল বাঙালিই সে সময় ভালোভাবে খেয়ে পরে, নিজ বাসস্থানে বহাল তবিয়তে ছিল, এমন মনে করার অবশ্য কোনও কারণ নেই।

প্রথম চোদ্দো বছরে গোটা দার্জিলিং জেলার জনসংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র দশ হাজার।

ডাক্তার ক্যাম্পবেলই প্রথম দার্জিলিং-এর চায়ের গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং তাঁর স্বজাতীয়দের চা-চাষের প্ররোচনা দেন। ১৮৫৬ সালে আলুবাড়ি এবং লেবং-এ প্রথম চালু হল চা-বাগান। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চা গাছের কচি পাতা ও কুঁড়ি উঁকি মারল কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে।

চা ব্যাবসার অভাবনীয় সাফল্যে দার্জিলিং-এ একটা জন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মাত্র দশ

বছরে চা-বাগানের সংখ্যা হল ৩৯, পরবর্তী দশ বছরে সেই সংখ্যা বাড়ল আরও তিনগুণ। প্রচুর চাকরির সুযোগ খুলে গেল, হুড়হুড় করে আসতে লাগল মানুষ। শুধু বাগানের চাকরিই নয়, আনুষঙ্গিক উপার্জনের ক্ষেত্রও হল বিস্তীর্ণ।

১৮৬৯ সালে দার্জিলিং জেলার জনসংখ্যা দাঁড়ায় বাইশ হাজার। তার ঠিক একশো দু বছর পরের (১৯৭১) আদমসুমারিতে দার্জিলিং-এর লোক সংখ্যা ৭,৮১,৭৭৭ জন।

স্বাধীনতার আগে, এই জেলার জনবসতির মধ্যে কোন্ জাতের মানুষ কতজন, তার একটা হিসেব নেওয়া হয়েছিল। সিকিম ও দার্জিলিং-এর যারা আদিবাসী, সেই লেপচাদের সংখ্যা তখন মাত্র শতকরা ৩.৩ জন। সেই তুলনায় নেপালিরা শতকরা ৬১.৮ জন। এই বিপুল সংখ্যক নেপালিরা এসেছে বাইরে থেকে। তখন পাহাড় বাঙালিদের টানেনি। সেই সময় তথাকথিত ভদ্র শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি শতকরা মাত্র ৫.৩ জন আর সিডিউলড কাস্ট, রাজবংশী, শতকরা ৬.২ জন। অর্থাৎ শতকরা সাড়ে এগারোজন বাংলাভাষী। 'ভদ্দরলোক' বাঙালিদের তুলনায় বিহার-উত্তর প্রদেশ থেকে আসা হিন্দি উর্দুভাষীদের সংখ্যা কিন্তু তখনই কিছুটা বেশি, শতকরা ৭.৪ জন।

স্বাধীনতা তথা দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রচুর শরণার্থী এসেছে পশ্চিমবাংলায়। অন্যান্য জেলাগুলিতে তার বিরাট প্রভাব দেখা গেলেও দার্জিলিং-এ সেই উদ্বাস্তুরা এসেছে যৎসামান্য। এই জেলার চারটি মহকুমার মধ্যে একমাত্র শিলিগুড়িতেই সেই উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু সেই ছিন্নমূল মানুষের দল পাহাড় ও অরণ্যের বিরাট খালি এলাকায় ওঠেনি কিংবা তাদের উঠতে দেওয়া হয়নি।

নেপাল থেকে মানুষের স্রোত কিন্তু অব্যাহতই থেকেছে। পাহাড়ে অভ্যস্ত সেই সব নেপালি গোর্খারা ভরিয়ে দিয়েছে দার্জিলিং-কালিম্পং এর পার্বত্য অঞ্চল। সরকারি খাস জমিতে গজিয়ে উঠেছে তাদের কলোনি। পূর্ব পাকিস্তানের পর, বাংলাদেশ থেকেও শরণার্থীরা এসেছে এবং এখনও আসছে পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতে, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই হইচই হয়, প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু হাজার হাজার নেপালি বংশোদ্ভূতরা প্রবেশ করছে, তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই, রাজ্য বা কেন্দ্রের সরকার সে বিষয়ে এতদিন মাথাও ঘামাননি।

যখন সুযোগ ছিল, তখন বাঙালিরা এমন চমৎকার পাহাড়-অরণ্যে বাড়ি বানায়নি, জঙ্গল হাসিল করে জমি চাষ করেনি, ব্যাবসা বাণিজ্যও ছেড়ে দিয়েছে অবাঙালিদের হাতে। নেপালিরা এখানে এসেছে, ঘাম ঝরিয়ে বসতি স্থাপন করেছে, এখন তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, এই অঞ্চলের ওপর তাদেরই ন্যায্য অধিকার।

হঠাৎ যেন একদিন ঘুম ভেঙে বাঙালিরা গেল-গেল রব তুলে দিল। দার্জিলিং তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে! যা কোনওদিনই হাতে ছিল না তা আবার হাত ছাড়া হবে কী? কলকাতার দেয়ালে-দেয়ালে বড় বড় পোস্টার পড়ল, রক্ত দিয়ে গোর্খাল্যান্ড রুখব।

যারা ক্রমিক রক্তাল্পতায় ভোগে তারাই বোধ হয় কথায়-কথায় রক্ত দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়! বাঙালিরা নিজেদের ও ভাই বন্ধুদের রক্ত অনেকবার ঝরিয়েছে বটে, কিন্তু সে যেন আরও দুর্বল হয়ে যাবার জন্য তান্ত্রিক সাধনা!

শীতে উপেক্ষিতা

পঞ্চাশের দশকে যাযাবর ছদ্মনামধারী একজন লেখক 'দৃষ্টিপাত' নামে একটি বই লিখে দারুণ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। একজন অজ্ঞাত কুলশীল লেখকের কোনও একখানি বইয়ের এমন বিপুল জনপ্রিয়তা অভূতপূর্ব।

বইটি বেশ সুখপাঠ্য, কিন্তু প্রচারের ব্যাপারে খানিকটা অন্যান্য কৌশল নেওয়া হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ওই লেখক অকালমৃত, তাঁর ওই একটিই প্রথম ও শেষ বই। যাযাবর আসলে বিনয় মুখোপাধ্যায়, তিনি পরে আরও কয়েকটি বই লিখেছেন এবং সুদীর্ঘজীবী হয়েছেন।

দৃষ্টিপাত-এর সাফল্যের কিছুদিন পর রঞ্জন নামে আর একজন লেখক আত্মপ্রকাশ করলেন এবং প্রচারের ব্যাপারে কিছুটা চালাকির আশ্রয় নিয়ে জনপ্রিয় হলেন। 'শীতে উপেক্ষিত' নামে সেই বইয়ের ভূমিকায় এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা হল যেন রঞ্জন আর যাযাবর আসলে একই ব্যক্তি।

এর কোনও প্রয়োজন ছিল না, রঞ্জন ওরফে নিরঞ্জন মজুমদার ইংরেজি সাংবাদিকতায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন পরবর্তীকালে। সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে যুগ্মভাবে তাঁর গল্পের বই-ও প্রকাশিত হয়েছিল।

'শীতে উপেক্ষিতা' বইটির নায়িকা দার্জিলিং নগরী।

উপেক্ষিতা অর্থে টুরিস্ট-উপেক্ষিতা, তাও সব টুরিস্ট নয়, বাঙালি টুরিস্ট। দার্জিলিং নিয়ে গল্প-উপন্যাস কবিতা কম লেখা হয়নি বাংলায়, সবই টুরিস্টের চোখ দিয়ে। এত যে ভালোবাসা দার্জিলিং-এর প্রতি, তাও মাত্র সাড়ে তিন মাসের জন্য। গ্রীষ্মের ছুটির দু-মাস, পুজোর ছুটির দেড় মাস। রবীন্দ্রনাথও দার্জিলিং গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু 'শেষের কবিতা' লিখলেন শিলং-এর পটভূমিকায়। দার্জিলিং তার কাছে লক্ষ্মণ-পত্নী।

রঞ্জনের লেখাটি পড়লে মনে হয় কোনও বিদেশি শৈল শহরের ভ্রমণ কাহিনী। সুদূর অচেনা। সেই বইটি পড়ার পর থেকেই কখনও ঘোর শীতে দার্জিলিং ভ্রমণের ইচ্ছে পুষে রেখেছিলাম। একবার দার্জিলিং-এ তুষারপাতের খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেলাম কয়েকজন দল বেঁধে।

শীতের জায়গায় শীতকালে ভ্রমণই প্রকৃষ্ট। সেবারেই দার্জিলিংকে পরিপূর্ণভাবে দেখা গিয়েছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনের জন্য সাধ্য সাধনা করতে হয় না, ঘুরতে ফিরতে যখন তখন চোখে পড়ে। রাস্তার ধারে ধারে থোকা থোকা ফুলের মতন জমে ছিল বরফ। তার ওপর ঝকঝক করছে রোদ। যেখানে সেখানে মানুষের ভিড়ে ধাক্কা খেতে হয় না, ম্যালটাকে সত্যিই বেড়াবার জায়গা মনে হয়।

শহরটা অবশ্য মোটেই জনশূন্য নয়। চকবাজারে স্থানীয় মানুষদের কেনাকাটা চলে সমানে। টুরিস্টদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা আশ্চর্য রকমের কম হলেও বিদেশি টুরিস্ট অনেক, প্রচুর জাপানি ছেলেমেয়ে। সেই জাপানিরা এতই শীত ভালোবাসে যে দার্জিলিং এর বদলে টাইগার হিলের টুরিস্ট লজেই ভিড় বেশি। বাঙালিরা এত শীতকাতুরে হয় কেন কে জানে। কলকাতার ডিসেম্বরেই সকালে ময়দানে অনেকের মাথায় বাঁদুরে টুপি দেখা যায়।

জানুয়ারির শীতে আমি দার্জিলিং- কালিম্পং অঞ্চলে আরও দু-বার গেছি, ক্রমশই একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে। হয় শীত কমেছে, অথবা বেড়েছে বাঙালিদের সাহস। এখন বাঙালি হানিমুন-যুগলকেও দেখতে পাওয়া যায় ওই সময়।

শীতকালের পাহাড়ের একটা বিশেষ ঘ্রাণ আছে। নিশ্বাসের সঙ্গে বাতাস যেন বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ধুয়ে দেয়।

উৎসবে নৈরাশ্য

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী এবং পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি জেলা সদরে একটি করে রবীন্দ্র ভবন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সরকারিভাবে। এতে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়, কারণ সরকারি খরচে একটা রঙ্গমঞ্চ পাওয়া যাচ্ছে, যা যে কোনও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। আসামে সে সময় বাঙালি বিদ্বেষ চরমে উঠেছিল, এমনকি জাতীয়

সংগীতে আসামের নাম উল্লেখ নেই বলে সেটাও বর্জন করা হচ্ছিল, কিন্তু গৌহাটিতে রবীন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার কোনও বাধা হয়নি। আপত্তি উঠেছিল খোদ পশ্চিমবাংলায় দার্জিলিং শহরে। রবীন্দ্র নামটি স্থানীয় নেপালিদের পছন্দ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ তাদের কেউ না। তাদের নিজস্ব মহাকবি ভানুভক্তের নামে কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই।

শেষ পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়ে রবীন্দ্র-ভানুভক্ত হল এই নামে সেই ভবনটির উদ্বোধন হয়েছিল। প্রারম্ভিক গন্ডগোলের কথা বিশেষ প্রচারিত হয়নি। এখন সেই ভবনটি শুধু ভানুভক্ত হল নামেই পরিচিত।

এ কথাও ঠিক, ভানুভক্তের নাম কিংবা তাঁর কোনও রচনার সঙ্গে বাঙালি পাঠকরা অনেকেই পরিচিত নয়। বাংলায় কত রকম অনুবাদের বই বেরোয় অথচ আমাদের এত কাছাকাছি একজন লেখকের কথা আমরা জানিই না।

দার্জিলিং শহরের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁতে বাঙালি ও নেপালিদের মেলাবার একটা প্রয়াস ছিল। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিছু লেখক ও সঙ্গীতশিল্পী, দার্জিলিং-এর নেপালি লেখক ও গায়ক-গায়িকাও অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই কেমন যেন থমথমে ভাব ছিল। কলকাতা থেকে বহু দূরে, আমেদাবাদ কিংবা ভোপালে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে অন্য ভাষার লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, আড্ডা হয়, অল্পক্ষণেই আত্মীয়তা জমে যায়। আর পশ্চিমবাংলারই নেপালি লেখকদের কাছে আমরা একেবারে অনাত্মীয়। কেউ আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন না। নেপালি ভাষা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়, আর যাঁরা দু-তিন পুরুষ ধরে পশ্চিম বাংলায় বাস করছেন, তাঁদের পক্ষে কিছু-কিছু বাংলা জানা অস্বাভাবিক নয়, তবু পারস্পরিক কোনও যোগাযোগ হল না। উৎসবের সন্ধ্যায় ভানুভক্ত হলের মঞ্চে নেপালি লেখকরা বসলেন একদিকে, বাঙালিরা অন্যদিকে, কোনও রকম হাস্য পরিহাস নেই, সবাই উৎকট গম্ভীর।

এমনও শোনা গেল যে দার্জিলিং-এর এই উৎসবে কলকাতার লেখক-শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে আনা নেপালি বুদ্ধিজীবীরা পছন্দ করেননি। এই সংবাদে আমরা এমনই অবাক হয়েছিলাম, যে রাগ করতেও ভুলে গেছি। পশ্চিম বাংলার মধ্যেই কোনও জায়গায় বাংলা ভাষা অনভিপ্রেত!

এতদিন আমরা জেগে ঘুমিয়েছি। দার্জিলিংটাকে আমরা একটা বেড়াবার জায়গা বলে ধরে নিয়েছি, কিন্তু সেখানে যে বহু মানুষজন থাকে, তাদের ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে বাকি পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ কতখানি, তা খেয়ালই করিনি।

দার্জিলিং জেলায় নেপালিভাষীর সংখ্যা ৫৯.১ শতাংশ, হিন্দিভাষীর সংখ্যা ৭.৭ শতাংশ আর বাংলাভাষীর সংখ্যা ১৮.৪ শতাংশ (৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। এর মধ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা শিলিগুড়িতেই বেশি, বাকি তিনটি মহকুমায় নগণ্য। সেই সব জায়গায় বাংলা ভাষার প্রসারের কোনও চেষ্টাই হয়নি। পাহাড়ের স্কুলগুলিতে বাংলার নাম গন্ধ নেই। নেপালিরা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায্য। কিন্তু তা হলে যে পশ্চিমবাংলায় তাদের দু-তিন পুরুষের বাস, সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, সংগীত তারা কিছুই জানবে না? আসামের বাঙালিরা অসমীয়া শিখতে বাধ্য হয় না? বিহারের বাঙালিরা সবাই হিন্দি জানে, অথচ পশ্চিমবাংলায় নেপালিরা বাংলাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যেতে পারে!

অবশ্য তাদের প্রতি অবিচারও হয়েছে প্রচুর।

একবার দার্জিলিং অঞ্চলে বেড়াতে গেছি, তখন কলকাতায় ক্রিকেটের একটা টেস্ট ম্যাচ চলছিল। প্রতিদিনের রেজাল্ট জানবার আগ্রহে একটি ছোট রেডিও নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে। যথা সময়ে সেটা খুলে দেখি কড়র কড়র চ্যাঁ-চোঁ এইসব বিকট আওয়াজ হচ্ছে। খানিকক্ষণ পণ্ডশ্রমের পর একজনের কাছ থেকে জানা গেল যে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের কোনও অনুষ্ঠানই দার্জিলিং জেলার

অনেক জায়গা থেকে কিছুই শোনা যায় না। আমি হতবাক। কলকাতায় এতদিনের একটা পুরানো বেতারকেন্দ্র, এত রকমের নাটক-গান-বাজনা, তার কোনও কিছুই দার্জিলিং-এর মানুষের জন্য নয়? কলকাতায় যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে দূরদর্শন কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে, তারও কোনওই উপযোগিতা নেই এই রাজ্যের একটু দূরের জেলাগুলির মানুষদের। দিল্লির অনুষ্ঠান তবু দেখা যায়, কিন্তু বাংলা অনুষ্ঠান গোটা পশ্চিমবাংলার জন্য নয়। অপূর্ব ব্যবস্থা।

বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চোখে দার্জিলিং-কালিম্পং নিছক প্রমোদকেন্দ্র। কিংবা টুরিস্ট স্পট। গ্রীষ্মকালে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের জরুরি কাজ পড়ে যেত দার্জিলিং-এ, তখন কয়েকটা দিন তাঁদের ভিড়ে পাহাড় সরগরম, তারপর বছরের অন্য সময় দার্জিলিং-এর কথা আর মনেই পড়ে না। সেখানে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বছর বাস করে, তাদের জীবনযাত্রার যে নানান অসুবিধে থাকতে পারে, তাদের যে একটা সাংস্কৃতিক ক্ষুধা আছে, সে ব্যাপারে কোনও হঁসই ছিল না সরকারের। সুভাষ ঘিসিং এবং তাঁর দলবল রক্তমাখা ভোজালি তুলে ধরতেই সারা ভারতবর্ষ থেকে সাংবাদিকরা ছুটে এল, দিল্লির বড় তরফ এই প্রথম যেন দার্জিলিং সম্পর্কে সচেতন হল।

আজকাল অস্ত্রের ভাষা ছাড়া সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া গণতান্ত্রিক সরকারের কর্ণে পশে নয়। আসামে বোরো উপজাতির যে এতখানি ক্ষোভ রয়েছে, তা টের পাওয়া গেল কয়েকটি শক্তিশালী বোমা ফাটার পর। ঝাড়খণ্ডীরাও এখন হাতে তির-ধনুক তুলে নিয়েছে।

সুভাষ ঘিসিং-এর কৃতিত্ব সত্যিই বিস্ময়কর। মাত্র কয়েক বছরের আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত তো তিনি অনেকখানি দাবি আদায় করে ছাড়লেন! দার্জিলিং শহরের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে যখন আমরা যাই, তখন সুভাষ ঘিসিং-এর নামও শোনা যায়নি। কিন্তু সেই উৎসবের মধ্যে বেশ বেসুরো আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। আমরা অনুভব করেছিলাম এই সুন্দর শৈলাবাসের তলায়-তলায় প্রচুর বিক্ষোভের ধোঁয়া জমে গেছে।

এক বছর আগে পরে

গত বছর, তখনও সুভাষ ঘিসিং-এর সঙ্গে বুটা সিং-জ্যোতি বসুর সই-সাবুদ হয়নি, কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম দার্জিলিং বেড়াতে। সমতলের বাঙালিদের কাছে তখন দার্জিলিং এক ভয়াবহ জায়গা, খুনোখুনি লেগেই আছে, যখন তখন বাট ঘণ্টা একশো কুড়ি ঘণ্টা বন্‌ধ লেগেই আছে, ভ্রমণ-পাগল বাঙালিরা কেউ শিলিগুড়ির ওপরের দিকে পা বাড়ায় না।

আমি আর স্বাতী কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তেই পৌঁছেছিলাম দার্জিলিং-এ। জি এন এল এফ-এর আন্দোলন যতই উগ্র হোক, তারা টুরিস্টদের ওপর কখনও হামলা করেনি, নেহাত দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া স্থানীয় বাঙালিদের ওপরেও আক্রমণের কথা শোনা যায়নি। জিন এন এল এফ-এর লড়াই ছিল পুলিশ, অ-নেপালি সরকারি কর্মচারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। এ ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল।

গ্রীষ্মকালে এত ফাঁকা দার্জিলিং যেন চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। জানুয়ারিতেও এমন জনশূন্য ম্যাল দেখিনি। বড় বড় হোটেলগুলি খদ্দেরের অভাবে বন্ধ।

সেসময় একটা কিছু মিটমাটের সম্ভাবনায় কিছুদিনের জন্য আন্দোলন স্থগিত ছিল, কিন্তু চতুর্দিকে ধ্বংসচিহ্ন। ম্যালের সবক'টা কাঠের বেঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাইফেলধারী সিপাহীরা সেখানে টহল দিচ্ছে সর্বক্ষণ।

একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম আমাদের প্রিয় জায়গাগুলি। আমাদের

সঙ্গী ছিলেন, তাপস মুখার্জি। তাপসরা দার্জিলিং-এর তিন পুরুষের বাসিন্দা, ওখানকার স্থায়ী রিপোর্টার। একটা ভুল সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে জিন এন এল এফ-এর একটি দল একবার তাপসকে ধরে নিয়ে যায়। মাথা গরম সেই সব ছোকরারা তখন প্রতিপক্ষকে যখন তখন মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, কুকরির এক কোপে উড়ে যাচ্ছে মুণ্ডু। পুলিশকে খবর দিয়ে তখন কোনও লাভ ছিল না। তাপসের স্ত্রী ছুটে গিয়ে জিন এন এল এফ-এর আর একটি শাখার লোকদের কাছে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিল। খবরটি যে তাপসের লেখা নয়, তা প্রমাণিত হবার পর প্রায় শেষ মুহূর্তে তাপস ছাড়া পেয়েছিল। সেই সাংঘাতিক বিপদের ফাঁড়া গেছে সেই রাত্রিটায় তাপসের মুখে কিন্তু কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। তারপরেও সে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে সর্বত্র।

তাপস আমাদের নিয়ে গেল টাইগার হিলে। একেবারে জনশূন্য পথ। টাইগার হিলের চমৎকার বাংলোটিতে আমি একাধিকবার রাত কাটিয়ে গেছি, কত মধুর স্মৃতি আছে, গতবার দেখলাম সেখানে বাংলোটির বদলে পড়ে আছে একটা ধ্বংসস্তূপ। আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাপ-প্লেট।

অথচ কী সুন্দর সেই সকালটি। ঝলমল করছে স্বর্ণাভ রোদ, দূরে পাইন গাছের সারিতে খেলা করছে একদল শিশু-মেঘ, লাফালাফি করছে দুটি ছাগলছানা। স্বাতী মুগ্ধ হয়ে দেখছে সবুজ ঘাসের ডগায় একটা টিপ পোকা। তার পাশেই একটা কালো, পোড়া বিকট পাথরের বাড়ি, মনে হয় যেন তার গা থেকে এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এমনও মনে হয়, ওর আড়াল থেকে যেন অতর্কিতে বেরিয়ে আসছে একদল সশস্ত্র আততায়ী।

আরও মন খারাপ লেগেছিল লেপচা জগৎ-এর ডাকবাংলোটি দেখে। টাইগার হিলের মতন এই বাংলোটি তেমন জনপ্রিয় ছিল না। সূর্যোদয় দেখার হুজুগে টাইগার হিলে বহু মানুষ ছোটে, সেই তুলনায় লেপচা জগৎ অনেক নিরিবিলি। সুখিয়াপোখরির দিকে মূল রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে তারপর এই বাংলোটির অবস্থান। সাহেবদের পক্ষেই খুঁজে খুঁজে এমন জায়গা বার করা সম্ভব ছিল। সামনে এক বিশাল উপত্যকা, তার পাশে পাহাড়ের গায়ে চুমকি বসানো দার্জিলিং নগরী পটভূমিকায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। এখানে প্রায় সর্বক্ষণই ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ে। এক ইংরেজ একবার লন্ডন থেকে এখানে বেড়াতে এসেছিল। বাংলোর পুরানো ভিজিটার্স বুকের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে সে দেখতে পায়, প্রায় তিরিশ বছর আগে তার পিতাও এখানে দু-একদিন থেকে গেছেন। তিনি লিখে গেছেন। এখানে সারাদিন কিছুই করার নেই, শুধু বৃষ্টি, বারান্দায় চুপচাপ বসে শুধু বৃষ্টি দেখা! যুবকটি তার তলায় লিখছেন, ড্যাডি, ইট্স স্টিল রেইনিং!

সেই রাতেও কি বৃষ্টি পড়েছিল, যখন এই বাংলোটিতে আগুন ধরানো হয়েছিল? পুরোনো আমলের কারুকার্য, সব নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন করে আর তা গড়া যাবে না। নিশ্চয়ই ভালো করে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হয়েছিল, যাতে বাড়িটিকে কিছুতেই রক্ষা করা না যায়।

সেই ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এমন সুন্দর বাংলো, এমন শান্ত নির্জন জায়গা। এখানে আগুন লাগিয়ে, নষ্ট করে আন্দোলনকারীদের কী লাভ হল?

আসলে আমরা দূর থেকে এসে এই সব জায়গাকে সুন্দর দেখি, প্রকৃতির শোভায় মোহিত হই। কিন্তু যারা এখানে নিত্য তিরিশ দিন থাকে, প্রকৃতি-ফ্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন? তাদের খাদ্য-বস্ত্র, জীবিকা, স্বাধীনতার প্রশ্নই অনেক বড়। তাদের ক্রোধের আগুন এই সব সরকারি সম্পত্তিকে ছুঁয়ে গেছে।

গত বছর পুলিশের ডি আই জি রমেশ হান্ডার বীরত্বের কাহিনী সকলের মুখে-মুখে ঘুরছিল। সুভাষ ঘিসিং-এর উগ্রপন্থী চেলারা হান্ডাকে খুন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। কয়েকবার তিনি চমকপ্রদভাবে বেঁচে গেছেন। উগ্রপন্থীদের বহু গুপ্তঘাঁটি তিনি ভেঙে দিয়েছেন এবং কিছুতেই জিন

এন এল এফ-কে তিনি দার্জিলিং-এর প্রশাসন দখল করতে দেননি।

এক সন্ধ্যেবেলা ঘাস্তা সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। গত বছর দার্জিলিং-এ পাহাড় ও আকাশ দেখার চেয়েও ঘাস্তাকে দেখার আকর্ষণ কম ছিল না। সত্যিই অন্য রকমের অভিজ্ঞতা। এই বীর পুরুষটির চেহারা বা কথাবার্তা শুনে কিছুই বোঝা যায় না। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ধরনের মানুষ, কখনও চেঁচিয়ে কথা বলেন না, ব্যবহারে অহমিকার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। তাঁকে যে বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ থাকতে হয়, একটা টেনশান সর্বক্ষণই থাকে, তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাঁর হাবে-ভাবে। দিব্যি হেসে-হেসে গল্প করতে লাগলেন।

অনেকে বলে, ঘাস্তার বদলে কিছু কম দক্ষ কোনও পুলিশ অফিসার এই সময় দার্জিলিং-এ থাকলে সুভাষ ঘিসিং ঠিকই শেষ পর্যন্ত পৃথক গোর্খা রাজ্য আদায় করে ছাড়তেন।

গত বছর কপালে সবুজ ফেট্টি বাঁধা জি এন এল এফ-এর ভলান্টিয়ারদের দেখেছি সর্বত্র। প্রত্যেক বাড়িতে জিন এন এল এফ-এর পতাকা তোলা ছিল বাধ্যতামূলক। আমরা যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িয়েছি, কেউ কোথাও বাধা দেয়নি তা ঠিক, কেউ আমাদের দিকে কোনও বিদ্রূপের মন্তব্যও ছুড়ে দেয়নি, তবু মনে হচ্ছিল এ আমাদের সেই চেনা দার্জিলিং নয়, যেন এসে পড়েছি কোনও বিদেশে, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের দিকে মুখে তাকালেও তারা হাসে না। ইচ্ছে করেই ঢুকেছিলাম রাস্তার ধারের একটা ছোট রেস্তোরাঁয়, আর কোনও খরিদ্দার নেই তবু কেউ আমাদের বসতে বলল না, সামান্য খাতিরও করল না, চেঁচিয়ে অর্ডার দিতে একজন এসে দু-কাপ চা দিয়ে গেল অবশ্য। আর একটি কথাও নেই। বিল মেটাবার সময় প্লেটে কিছু অতিরিক্ত পয়সা রাখলুম বখশিস হিসেবে, বেয়ারাটি তা ছুঁল না পর্যন্ত।

তখন মনে হয়েছিল, নেপালিদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে! আর কোনওদিন পারস্পরিক মেলামেশা হবে না।

কয়েক মাসের মধ্যেই আবার বদলে গেল সব কিছু।

পৃথক গোর্খা রাজ্যের দাবি ছেড়ে সুভাষ ঘিসিং হিল কাউন্সিল-এর দাবি মেনে নিলেন, সেই অনুযায়ী চুক্তি হল। জ্যোতি বসুর নামে আগে কত কু-কথা বলেছেন ঘিসিং, এখন আবার তাঁর সঙ্গে গলাগলি করলেন, কলকাতায় খানাপিনা করে গেলেন। আবার বাঙালি-গোর্খা ভাই-ভাই। রাজনীতি এরই নাম।

এবারের গ্রীষ্মে পরিবর্তিত দার্জিলিং-এর রূপ দেখার ইচ্ছে হয়েছিল আমার। চুক্তি স্বাক্ষরের এক বছর পূর্তি উৎসবে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, তাঁদের চ্যালা চামুণ্ডা, আমলা ও দেহরক্ষীদের ভিড়ে দার্জিলিং সরগরম রইল বেশ কয়েকদিন, সেই সময়টা আমি এড়িয়ে গেলাম। তার পরেও শুনি, এ বছর টুরিস্টদের ভিড়ে দার্জিলিং শহর উপচে পড়ছে, হোটেলগুলিতে জায়গা নেই, প্লেন বা ট্রেনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। বিমানের টিকিট কাটতে গিয়ে শুনি ছিয়ানব্বই নম্বর ওয়েটিং!

কোনও রকমেই আর যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন প্রকৃতি একটি থাপ্পড় কষালেন। একদিনের বিরাট ঝড় ও বৃষ্টিপাত দার্জিলিং-এ ধস নামলো, হিলকোর্ট রোড বন্ধ, বাড়ি ধসে মারা গেছে কয়েকজন। সঙ্গে-সঙ্গে টুরিস্টদের স্রোত বন্ধ। সেই মওকা আর আমি ছাড়ি কেন? একমাত্র মানুষের হিংসোকেই আমার ভয়। প্রকৃতির বিপর্যয়ে অনেক সময় মজা অনেক বেশি পাওয়া যায়।

প্রায় অর্ধেক ফাঁকা প্লেনে আমি পৌঁছোলাম বাগডোগরা। এবারে পেরুবো, সেই ছেলেবেলার মতন। সময় যতই বেশি লাগুক তাতে কিছু যায় আসে না।

আগেরবার টয় ট্রেনের অবস্থা দেখে খুব নৈরাশ্য বোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল এই বিশ্ববিখ্যাত ট্রেন লাইনটি বুঝি চিরতরেই নষ্ট হয়ে গেল। স্টেশনগুলিতে মিলিটারির আখড়া, লাইন অনেক জায়গায় ওপড়ানো, কোথাও কোথাও শূন্যে ঝুলছে। নতুন কিছু গড়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, ভেঙে ফেলা খুবই সহজ।

পাহাড়ের এই রেল লাইনটি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিস্ময়। পৃথিবীর বহু দেশের রেল বিশেষজ্ঞরা এই লাইনটি দেখে গেছে।

দার্জিলিং-এ শহর স্থাপনের গোড়ার দিকে কলকাতা থেকে এখানে পৌঁছোতে সময় লাগত আটানব্বই ঘণ্টা! সাহেবরা এত সময় নষ্ট করতে রাজি ছিল না, তাই নানা কৌশলে রাস্তা ও যানবাহন তৈরি করে দূরত্ব কমিয়ে আনে। শিলিগুড়ি থেকে এই লাইনকে প্রথম প্রথম বলা হত ট্রামওয়ে। প্রথম ইঞ্জিনটার নাম ছিল 'টাইনি', সেটি বানিয়েছিল কলকাতার টম মিচেল অ্যান্ড রাসজে কোম্পানি। প্রথম এই ইঞ্জিনটি চালু করা হয় ১৮৮০ সালে, ভারতের তৎকালীন বড় লাট এই ট্রামে চেপে কিছুটা পথ গিয়েছিলেন। সেই বড় লাটের নাম লর্ড লিটন (ইনি গল্প-উপন্যাস লিখতেন, 'লাস্ট ডেইজ অফ পমপেই' নামে তাঁর একটি বই এককালে বেশ বিখ্যাত হয়েছিল) তিনি নিজে এই খুদে রেলে চেপে পাহাড় ভ্রমণ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে প্রচুর লটবহর ছিল, সেগুলির বোঝা এই ইঞ্জিন বইতে পারল না, কুলিরা সেসব মাথায় চাপিয়ে পাশে-পাশে দৌড়েছিল। সুতরাং পরের বারে ওই ইঞ্জিন বাতিল করে শক্তিশালী ইঞ্জিন বানাবার অর্ডার দেওয়া হয় গ্লাসগো'র একটি কোম্পানিকে, ট্রামওয়ের বদলে এই রেলপথের নাম রাখা হয় 'দা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে'।

আন্দোলনের দু-তিন বছরে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও এই ট্রেন আবার চালু করা হয়েছে এটা একটা সুসংবাদ। কিন্তু আমার সেই ট্রেনে চাপার আর সুযোগ হল না, সাম্প্রতিক ধসে দু-তিন জায়গার লাইন উপড়ে যাওয়ায় কয়েকদিন আবার বন্ধ আছে।

অগত্যা একটি ট্যাক্সি নিতে হল। বেশ আশা করেছিলাম, রাস্তার কোনও জায়গায় গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তার ধারেই রাতটা কাটাবো। কিন্তু ট্যাক্সি চালক নানান কায়দা করে ঠিক এক সময় পৌঁছে দিল শহরে।

ঠিক এক বছরে কত তফাত। দার্জিলিং শহরে গিসগিস করছে মানুষ, ম্যাল এমনই ভরতি যে হাঁটতে গেলে লোকের গায়ে ধাক্কা লাগে। নতুন করে আবার বেঞ্চ বসিয়ে রং টং করা হয়েছে। কাঠমান্ডু এবার বন্ধ, কাশ্মীরেও মৌলবাদীরা বোমা ফাটাচ্ছে, তাই পাহাড়-বিলাসী বাঙালিরা সব ধেয়ে এসেছে দার্জিলিং-এ। শুনলাম, অনেকে হোটেলে জায়গা না পেয়ে বারান্দায় শুচ্ছে। এত জনসমাগমের চাপ সহ্য করতে পারছে না এই শহর। যখন তখন বিদ্যুৎ চলে যায়, পানীয় জলের অভাব প্রচন্ড। খাবার দাবারের দাম আকাশছোঁয়া।

নিউ এলগিন হোটেল গতবারে কত খাতির করেছিল, এবার আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না। একটা স্যাঁতসেতে, দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন ঘরে প্রথমে আমাকে জায়গা দিল। তাপস মুখার্জির সাহায্যে ভালো ঘর কিছু পরে পাওয়া গেল অবশ্য। গতবার স্বাতী ও আমিই ছিলাম এ হোটেলের একমাত্র বাসিন্দা। বাড়ি ঘর ফাঁকা, এবার আমার মতন অনেক খদ্দেরদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গতবারের তুলনায় সমস্ত চার্জও দ্বিগুণ।

সকালে-বিকেলে দার্জিলিং শহরে কয়েক চক্কর দিতে এসেই বোঝা গেল, সেরকম টেনশান আর কোথাও নেই, দোকানগুলো ভিড়ে ভরতি, ঘোড়ায় চেপে ঘুরছে সুসজ্জিত ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। ঠিক আগেকার পুরোনো দৃশ্য। সন্ধ্যে হতে না হতেই অবশ্য রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য, দিনের আলো শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, টুরিস্টরা কেউ তখন বাইরে ঘোরাফেরা করে না। আন্দোলন থেমে গেছে বটে, কিন্তু ছিনতাই, রাহাজানি অব্যাহত। একদল লোক চাঁদা তোলা, জোর-জুলুম করায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, এখন তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায় না। আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে প্রচুর জমি জবর-দখল হয়েছে, দার্জিলিং-এর আশেপাশে কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই, সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে নতুন-নতুন বাড়ি। শুকনা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের এককালে সৌন্দর্যই ছিল নির্জনতা, দু-দিকে নিবিড় বনানী, এখন সেই রাস্তার কোনও

এক জায়গাতেও নিরিবিলিতে হিসি করারও উপায় নেই, সর্বত্র মানুষ, রাস্তার ধারে-ধারে অগুনতি নড়বড়ে বাড়ি। মানুষ বাড়ছে, নেপাল থেকে এখনও মানুষ আসছে এখানে আশ্রয় নিতে; গরিব মানুষেরা অসহায় মানুষেরা দেশ-কালের সীমানা মানে না। আরও মানুষ আসবে, জঙ্গল কেটে সাফ হয়ে যাবে, রাজকীয় মহিমায় মাথা তুলে আছে যেসব বিশাল মহিরূহ, তারাও ধুলোয় লুটোবে। মানুষের জন্যেই অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন, অথচ মানুষেরই আশু বাঁচার তাগিদে ধ্বংস করা হচ্ছে অরণ্য।

বড় বড় হোটেলগুলি ট্যাংকারে করে দূর দূর থেকে জল আনে। সন্ধেবেলা শুনলাম, একদল গ্রামবাসী ওপরে উঠে এসেছে জল ভিক্ষে করতে। হোটেলের মালিকরা তাদের পয়সা দিয়ে কেনা জল বিলি করতে রাজি নয়, তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীরাও ছাড়বে না। জলের হাহাকারের এই রূপ আমি আগে কখনও দেখিনি। পানীয় জলের সরবরাহের তুলনায় লোক সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। শহরের নাগরিকদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে দিনে একবার বা দু-বার জল বিলি করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গৃহস্থবাড়ির বউ-ছেলে-মেয়েরা এক একটা পাত্র নিয়ে ছোটে। আমার পরিচিত একটি পরিবার সারাদিনের জন্য মাত্র এক জেরিক্যান জল পেয়েছে। গ্রামের লোকদের এ ব্যবস্থাও নেই। এই সব শুনে, হোটেলের বাথরুমে কল খুলতে আমার লজ্জা হয়।

বাইরের থেকে দার্জিলিং বেড়াতে এসে কী পায়? শুধু ম্যাল, জলাপাহাড়, অবজারভেটারি হিল পর্যন্ত ঘোরাফেরা, তার চেয়ে দূরে কেউ যায় না। কোনওরকম খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই। সন্ধের পর হোটেলের ঘরে বন্দি। শুধু গ্রীষ্মকালের ঠান্ডা বাতাস আর পাহাড়ে মেঘের বক্রক্রীড়া! টুরিজ্‌ম এখন হিল কাউনসিলের হাতে, তারা আর কী নতুন জিনিস দেবে কে জানে।

ফিরে আসার সময় হিলকার্ট রোড ছেড়ে পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা ধরলাম। এদিকটায় জনবসতি এখনও কম। জোর এক পশলা বৃষ্টি হবার পর আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, গাড়ি থামিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালাম একটুক্ষণ। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ, সদ্যোস্নাত গাছপালাগুলি, নানারকমের সবুজ, চতুর্দিকে একটা বিরাটত্বের মহিমা। তখন মনে হল, শহরের ফ্ল্যাট বাড়ি, নোংরা কাদা প্যাচপেচে রাস্তা ঘিঞ্জি মফস্বল, পরনিন্দা-পরচর্চা মুখর গ্রাম, সমতলের জীবনে অনেক ক্লেদ, সেসব ছেড়ে অন্তত দু-একদিনের জন্যও এই আকাশছোঁয়া পাহাড়, এই সবুজ উচ্চতাকে দেখে গেলে চক্ষু ও হৃদয় জুড়িয়ে যায়। এর মূল্য অনেক।

॥ চব্বিশ ॥

আগের বার প্রায় দিন দশেক ছিলাম, তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল। ট্রামে চেপে বইমেলায় যাতায়াত করতাম। এইবারেও ১৬ নম্বর ট্রামে চেপে নামলাম 'বুক মেসে' বা বইমেলার গেটের সামনে। কিন্তু নেমে আর গেট খুঁজে পাই না। মাত্র তিন বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে, প্রবেশ দ্বারটি এখন অন্যত্র এবং সুবিশাল। পাশেই গম্বুজের মতন একটি বহুতল বাড়ি উঠেছে, সেটাও বইমেলার অন্তর্গত হবে।

আগেরবার ছিলাম আমন্ত্রিত, এবার রবাহূত দর্শক মাত্র। তবে বিদেশ থেকে কেউ এলেই তাকে একটি সিজন কার্ড দেওয়া হয়। বিনামূল্যে এই সৌজন্যটুকু বইমেলা কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করেন। পাশপোর্ট দেখিয়ে কার্ড সংগ্রহ করে ভেতরে ঢুকতে যেতেই সশস্ত্র প্রহরীর সম্মুখীন। মনটা বিবশ হয়ে গেল। বইমেলার মধ্যেও পিস্তল-বন্দুক! আজকাল বিমান-ভ্রমণে এতরকম সিকিউরিটির ঝঞ্ঝাট যে সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়। হুমদো হুমদো চেহারার লোকেরা গায়ে হাত দিয়ে টিপে-টিপে দেখে, আমি আবার পুরুষ মানুষের স্পর্শ একেবারে সহ্য করতে পারি না। বইমেলাতেও সেই উৎপাত!

শুধু যে হাত-ব্যাগই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তাই-ই নয়। প্রহরীদের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গের চ্যালাদের মতন হাত তুলেও দাঁড়াতে হচ্ছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের মেলা এলাকাটা এবার যেন আরও বড় মনে হল। অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল, তিন-চারতলা করে। সেগুলির এক একটি ঘুরে দেখতেই পা ব্যথা হয়ে যায়। মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিনা পয়সার বাস চলে, হলের সিঁড়িগুলি চলন্ত, তবু হাজার-হাজার বইয়ের স্টলের গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে হয়। প্রথমে ঢুকে তো আমি ভারতীয় প্রকাশকদের জন্য নির্দিষ্ট অংশটি খুঁজেই পাই না। চতুর্দিকে নতুন বইয়ের গন্ধ।

ভারতীয় বিভাগটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকাশকদের বই তাঁরাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তারপর প্রকাশকরা ওখানে গিয়ে আলাদা আলাদা দোকান সাজিয়ে বসেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের নিজস্ব একটি প্রদর্শনীও থাকে। ভারতীয় প্রকাশকদের মধ্যে দিল্লিরই আধিপত্য, কিছু বম্বের, মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রকাশকদের সংখ্যা খুবই কম। কলকাতার বেশ কয়েকজন প্রকাশক আছেন বটে, তবে অধিকাংশই ইংরেজি বইয়ের, এদের মধ্যে সদাব্যস্ত বিমল ধরের উপস্থিতি সর্বত্র বিরাজমান। ভারতীয় স্টলগুলির মধ্যে একটিতে এক ঝকঝকে ধারালো চেহারার রমণীর দিকে বারবার চোখ চলে যায়, কেমন যেন চেনা-চেনা লাগে। পরে জানা গেল, ইনি নর্তকী ও অভিনেত্রী মল্লিকা সারাভাই, পিটার ব্রুক্সের মহাভারতে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করে যিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন। মল্লিকাদেরও পারিবারিক প্রকাশনা-ব্যাবসা আছে, এ বছর তাঁরা ইংরেজি মহাভারতের একটি সংস্করণও প্রকাশ করেছেন।

ছিয়াশি সালে এসে বাংলা বইয়ের অনেকগুলি দোকান দেখেছিলাম। সে বছর মেলা কর্তৃপক্ষ ভারতকে মুখ্য আকর্ষণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ বছরের মুখ্য আকর্ষণ যেমন ফ্রান্স। সেবারে কলকাতার অধিকাংশ চেনা প্রকাশককে দেখেছিলাম এই মেলায়, এবছর বাংলা বই টিমটিম করছে মাত্র দুটি স্টলে, আনন্দ পাবলিশার্স ও ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় এলাকার বাইরেও বাংলা বই রয়েছে অন্যত্র আরও দুটি জায়গায়, থার্ড ওয়ার্লড কান্ট্রির এলাকায়, যেখানে কলকাতার মন্দিরা নামে এক প্রকাশক এবং বাংলাদেশের এক প্রকাশক আমন্ত্রিত।

এত বৃহৎ বিশ্ব বইমেলায় ভারতের স্থান নগণ্য, বাংলা বইয়ের উপস্থিতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যেতে পারে। যদিও বাংলা সারা পৃথিবীর সপ্তম প্রধান ভাষা। এই বইমেলায় পশ্চিমি দেশগুলির বই-ব্যাবসাই প্রধান, তাদেরই রমরমা। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু প্রতি বছর এই মেলায় বাংলা বই সাজিয়ে বসে থাকেন। একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার আছে ঠিকই, এই এলাহি বইমেলায় কলকাতার বাংলা বইয়ের প্রকাশক অকুতোভয়ে অংশগ্রহণ করছেন, বিশ্ব প্রকাশকদের তালিকায় তাঁদেরও নাম স্থান পাচ্ছে, কিন্তু ব্যাবসার কোনও সুরাহা হয় বলে মনে হয় না। এখানে খুচরো বিক্রির প্রশ্ন নেই, হোল সেল বিক্রির চুক্তি এবং অনুবাদের শর্ত বিনিময় হয়। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেছে বলে শুনিনি।

প্রায় ছেলেবেলা থেকেই আমি বইয়ের জগতের সঙ্গে জড়িত, মাছ যেমন জলের মধ্যে সাবলীল থাকে, সেই রকমই এত নতুন বইয়ের প্রদর্শনী আমাকে মুগ্ধ করে রাখে, যে-সব ভাষারও বইয়ের মলাট দেখে দেখে সময় কাটাই।

অনেক দেশের বড়-বড় প্রকাশকরা কিছু-কিছু উপহারও দেয়। যেমন কলম কিংবা পেপার ওয়েট কিংবা নানা রকম ঝোলানো ব্যাগ। ব্যাগের আকর্ষণই বেশি। বিনা পয়সায় কিছু পেতে শুধু যে আমাদের মতন গরিবদেশের মানুষদেরই উৎসাহ তাই-ই নয়, সচ্ছল শ্বেতাঙ্গরাও ঘুরে ফিরে সেই সব সংগ্রহ করে, কোনও-কোনও স্টলের অতি সুদৃশ্য ব্যাগ কেউ-কেউ নানা ছলে একাধিকও সংগ্রহ করে।

ভারতীয় কোনও স্টলেই কোনও উপহার নেই, বইয়ের মলাট ও ছাপা-বাঁধা পশ্চিমি

প্রকাশকদের তুলনায় ম্লান, তাই এই তল্লাটে ভিড়ও কম।

এক সময় এসে পড়লাম পেঙ্গুইন স্টলের সামনে। এবারে পেঙ্গুইন যেন কিছুটা আত্মগোপন করে আছে। ভাইকিং-এর সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা মাঝারি আকারের স্টলে বইগুলি সাজানো, কর্মীদের মুখে চোখে চাপা উদ্বেগ। কাছাকাছি সেপাই সান্ত্রিদের জমায়েত না দেখে একটু অবাক লাগছিল, পরে দেখি যে অনেক সশস্ত্র পাহারা-প্রহরী এখানে সেখানে আত্মগোপন করে আছে।

পেঙ্গুইনের ওপর একটা আক্রমণের হুমকি সর্বক্ষণই রয়েছে। যদিও এঁরা সালমন রুশদির বিতর্কিত বইটি এবার রাখেননি।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একখানি বই ও তার লেখককে নিয়ে এত আলোড়ন আগে কখনো ঘটেনি। এই লেখকের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছে, আততায়ীকে বিপুল পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তি। অনেকগুলি দেশের রাষ্ট্রনায়ক এই লেখকের পক্ষে বা বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, কূটনৈতিক সম্পর্কে বিপন্ন বা ছিন্ন হয়েছে এই একখানি বইকে কেন্দ্র করে। এক বছরেরও অধিককাল সেই লেখক প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে আছেন।

এবারের বইমেলার প্রবেশ দ্বারে সিকিউরিটির এত কড়াকড়ির মর্ম ক্রমশ জানা গেল।

স্যাটানিক ভার্সেস বইটির জার্মান অনুবাদ এই সময়ে প্রকাশের কথা ছিল। পশ্চিম জার্মানির সরকার গোলমালের আশঙ্কায় এই অনুবাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওসব গণতান্ত্রিক দেশে কোনও বই নিষিদ্ধ করা সহজ কথা নয়। জার্মান প্রকাশকদের সংস্থা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়, বাক-স্বাধীনতার ওপর এই হস্তক্ষেপ আদালতে গ্রাহ্য হয়নি। মামলায় জিতে সেই অনুবাদের প্রকাশক বইটি এবারের বইমেলাতেই সাড়ম্বরে উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন।

বইমেলা কর্তৃপক্ষ পড়ে যান বিপদে। বহু ফ্যানাটিক সংস্থা এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইরান এখনও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মুখ। বইমেলার মধ্যে বোমাবাজি হলে সাংঘাতিক ভয়ের ব্যাপার, চতুর্দিক কাগজের সমুদ্র, একবার আগুন লেগে গেলে সেই বহ্ন্যুৎসব হবে পৃথিবীর সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা।

মেলাকর্তৃপক্ষ সেইজন্য জার্মান প্রকাশকদের সঙ্গে একটা আপোসে এসেছেন। স্যাটানিক ভার্সেস-এর জার্মান অনুবাদ মেলার মধ্যে উদ্বোধন করা হবে না, পরে যে-কোনও একদিন হতে পারে। এর বিনিময়ে, কর্তৃপক্ষ এই মেলা থেকে ইরানকে বিতাড়িত করেছেন। ইরান যতদিন না একজন লেখকের ওপর থেকে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেয়, ততদিন ইরানকে বিশ্ব বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

তবু চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভীতি রয়ে গেছে। তা ছাড়া গোপন সূত্রে নাকি খবর পাওয়া গেছে যে পুরুষের বদলে সশস্ত্র নারী গেরিলারা এবার পেঙ্গুইন বা অন্য স্টলের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তাই ঢোকার মুখে এবার মেয়েদেরই বেশি তল্লাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন হলেও মেয়ে-পুলিশদের প্রাধান্য।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও আক্রমণের উদ্যম দেখা যায়নি। তবে একটি স্টল দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। নরওয়ে'র স্টলে পৃথিবীর বহু লেখকের ছবি টাঙানো রয়েছে, তার মধ্যে রুশদির ছবি! বহু বিতর্কিত বইটির নরওয়েজিয়ান অনুবাদও অকুতোভয়ে তাঁরা সাজিয়ে রেখেছেন। কোনও-কোনও দেশে যেমন যখন তখন বই নিষিদ্ধ করা হয়, তেমনই বিপরীত ভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে বাক স্বাধীনতা কিংবা যা খুশি লেখার ও পড়ার অধিকারের দাবি অত্যন্ত উগ্র।

এক-একসময় ক্লান্ত হয়ে বাংলা বইয়ের স্টলে এসে বসি। অন্য দেশীয়দের জনস্রোত পাশ দিয়ে চলে যায়, বাংলা বইয়ের র‍্যাকগুলির দিকে তাদের চোখ থামে না। বাংলা ভাষা কিংবা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যেন কারুর কোনও আগ্রহ নেই। অন্যদের আকৃষ্ট করার মতন তেমন উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। ইংরিজি ও জার্মান ভাষায় উল্লেখযোগ্য বাংলা বইগুলির সিনঅপসিস, লেখক-পরিচিতি

কিংবা সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভালোভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত সমবেতভাবে বাংলা প্রকাশকদের। আনন্দ পাবলিশার্স একটি ইংরিজি ক্যাটালগ এনেছেন। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়। আরও অনেক তথ্যপূর্ণ চকচকে, ঝকঝকে তালিকার প্রয়োজন।

ক্বচিৎ দু-একজন বাংলা-জানা জার্মান আসেন, কিংবা অন্য কোনও দেশের প্রকাশক সত্যজিৎ রায়ের বইয়ের অনুবাদের জন্য আগ্রহ দেখান। পশ্চিম বাংলার কোনও কোনও বাঙালি আসেন আড্ডা দিতে আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজ নিতে, আর আসেন বাংলাদেশীয়রা।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যপ্রেমী

হফ্‌ট বানহফ অর্থাৎ প্রধান রেল স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে একদিন উঠে আসছি, একটি যুবক আমার পাশে এসে ইংরিজিতে বিনীতভাবে জিগ্যেস করল, আপনার নাম কি অমুক? নিশ্চিত হয়ে সে অতি উৎসাহের সঙ্গে ডেকে আনল তার বন্ধুদের, এবং প্রায় জোর করেই আমাকে, বাদল বসুকে এবং ফার্মা কে এল-এর রণজিৎ মুখার্জিকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।

ছেলেটির নাম বাবুল। সে এবং তার অতি তরুণী স্ত্রী থাকে বইমেলার কাছে এক অ্যাপার্টমেন্টে। বাবুল ও তার বন্ধুরা আমাদের রান্নাবান্না করে খাওয়াল। এবং কয়েকটা দিন হইচই ও আড্ডায় মাতিয়ে রাখল। এই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, কেউ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা হোটেলে কাজ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাদের উৎসাহ সবসময় টগবগ করছে। সেই তুলনায় পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা দুর্গা পূজা কিংবা গান বাজনার জলসায় যতটা আগ্রহী, সাহিত্য সম্পর্কে তেমন নয়। একজন ফিল্ম স্টার কিংবা গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে তাঁরা মাতামাতি করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকদের খোঁজ খবর বিশেষ রাখে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলিতে এমন অনেক বাঙালি থাকেন, তাঁদের অবস্থাও মোটামুটি সচ্ছল, কিন্তু তাঁরা সাহিত্য নিয়ে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন, এমন ক'টা শোনা যায়?

বাবুল ও তার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে এমন আন্তরিক ব্যবহার করতে লাগল, যেন আমরা তাদের অনেক কালের আত্মীয়। আমরা তিনজনেই উঠেছিলাম এক জার্মান পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে, কিন্তু বাবুলরা এমন করতে লাগল, যেন আমাদের খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্বও ওদের। প্রত্যেকের বাড়িতেই বেশ কিছু বাংলা বই রয়েছে, বাংলা পত্রিকা রাখে, কথায়-কথায় বাঙলা সাহিত্য থেকে নানা রকম উদ্ধৃতি দেয়, প্রবাসী হয়েও মাতৃভাষার সেবা ও সম্মান করতে তারা একটুও ভোলেনি।

হাইডেনবার্গের কাছাকাছি হিসবার্গ শহরে থাকেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ইনি বহুকাল ও-দেশবাসী হলেও দেশের সঙ্গে পুরোপুরি সংযোগ রেখেছেন, প্রত্যেক বছর কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যান। এখানকার কোন লিটল ম্যাগাজিনে কী লেখা বেরিয়েছে, সে সম্পর্কে অলোকরঞ্জন জার্মানিতে অক্লান্তভাবে বাংলা সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সেমিনারে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলেন, নিজে অনেক অনুবাদ করেছেন এবং আমাদের অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করাচ্ছেন এ সবই অলোকরঞ্জনের ভালোবাসার পরিশ্রম।

অলোকরঞ্জন আমাকে ও বাদল বসুকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। সেখানে তাঁর পত্নী টুডবার্টার আদরযত্ন এবং তাঁর জননীর স্নেহচ্ছায়ায় আমার অবস্থা যেন অতি প্রশ্রয় পাওয়া কোনও বালকের মতন। টুডবার্টা এক অসাধারণ রমণী যেমন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী, তেমনি তাঁর কর্মক্ষমতা। তিনি চারবেলা নানা রকম রান্নাবান্না করে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, তারই মধ্যে আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন, আবার কখনো গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। টুডবার্টা বাংলা সাহিত্য

সম্পর্কেও অনেক খবর রাখেন, বাংলা গান ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীত তাঁর প্রিয়, গাড়ি চালাতে-চালাতে সেই সব গান-বাজনা শোনেন।

ট্রুডবার্টার সেবা যত্নেরও তুলনা নেই। আবার শীতে কষ্ট হবে, ঠান্ডা লেগে যাবে ভেবে (শীত লাগছিল না) তিনি প্রায় জোর করেই তাঁর ক্লোসেট থেকে একটি ওভারকোট আমাকে পরিয়ে দিলেন। মাসিমার পায়ে ব্যথা, সেই জন্য ট্রুডবার্টা হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর শাশুড়ির পায়ে একদিন জুতো পরিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এরকম বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইদানীং এমন দৃশ্য দুর্লভ।

ওই বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লোথার লুৎসে। ইনি শুধু আমার নন, অনেক ভারতীয় লেখকেরই পূর্ব পরিচিত। লোথার হিন্দি খুব ভালো জানেন, বাংলা জ্ঞানও যথেষ্ট। ভরাট স্বাস্থ্য, উৎসাহে সর্বক্ষণ টগবগ করছেন, ইনি দাশগুপ্ত পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

এক বিশেষ ধরনের সুস্বাদু জার্মান স্যুপে চুমুক দিতে-দিতে লোথার আমাকে জিগ্যেস করলেন, সুনীল, তুমি তোমার কোন বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছ?

আমি বললাম, সে রকম কিছু না তো! আমার কোনও বইয়ের অনুবাদ তো বেরুচ্ছে না।

লোথার জিগ্যেস করলেন, তা হলে তুমি এ সময় ফ্র্যাঙ্কফুর্টে এসেছ কেন?

আমি বললাম, এমনিই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে।

লোথার আমার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে আমার কিছু কাজ আছে, যাবার পথে আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলা ঘুরে যাচ্ছি, কারণ, এতে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া লাগবে না। শুধু এই কারণে এসেছি, তা লোথার লুৎসের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় লেখকরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত না হলে আসেন না। কোনও কোনও প্রকাশক নতুন বই প্রকাশ উপলক্ষে সেই লেখককে নিয়ে আসেন, তাঁকে নিয়ে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রচার মাধ্যমগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। বাংলা বইয়ের লেখকদের নিয়ে সে রকম কোনও অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নেই এখানে, বাংলা বইয়ের অনুবাদও হয় কদাচিৎ, তাও অনেকটা যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন। অনুবাদ বেরুলেও বিক্রি হবে কেন? বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে অন্যান্য দেশের পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের কোনও ব্যবস্থা নেই। বাংলাভাষার নামই এখানে অনেকে জানে না।

লোথার লুৎসে বইমেলাতে একদিনও যাননি, তার কারণ, ওই মেলায় বাণিজ্যই প্রধান। নতুন বই বিক্রিরও কোনও ব্যবস্থা নেই।

সত্যি, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলা দেখলে মনে হয়, মোটর গাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি ইত্যাদির মতন বই নিয়েও এক বিশাল বাণিজ্য চলছে। সেই বাণিজ্য প্রায় পুরোপুরিই পশ্চিমি প্রকাশকদের আওতায়। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির (এই তৃতীয় আখ্যাটা শুনলেই আমার গা জ্বলে যায়)। প্রকাশকদের অবস্থা যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে হরিজনদের মতন।

লণ্ডনে বাংলা সাহিত্য

অন্য কোনও দেশে যাওয়া-আসার পথে লন্ডনে থেকে যাওয়া সহজ। তা ছাড়া আমার খুব ছেলেবেলার বন্ধু ভাস্কর দত্ত এখানে থাকেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা না করে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, সেই জন্য আমি বেশ কয়েকবার লন্ডনে গেছি।

এই প্রথম আমি লন্ডনে এলাম আমন্ত্রিত হয়ে। না, ঠিক প্রথম নয়, বহুকাল আগে একবার এসেছিলাম, ইংলন্ডেশ্বরীর আমন্ত্রণে, শুনতে গালভারী শোনালেও সেটা আসলে অতি ফর্মাল ব্যাপার ছিল। এবারে এসেছি বাংলা ভাষাভাষীদের ডাকে।

এবারে যেন দেখলাম এক নতুন লন্ডন। আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এখানকার ক'জনই বা জানেন যে কলকাতা ও ঢাকার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তৃতীয় কেন্দ্র এখন লন্ডন।

'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি সংস্থা নেমন্তন্ন করেছেন শামসুর রাহমান এবং আমাকে। তিন দিনের সাহিত্য সম্মেলন এবং একদিন টেমস নদীতে বজরা ভ্রমণের ব্যবস্থা। এই সংস্থার সভাপতি কাদের মাহমুদ এবং সম্পাদক সৈয়দ শাহীন।

প্যারিস থেকে ভাস্কর, বাদল বসু ও আমার লন্ডনে পৌঁছনোর কথা সকাল সাড়ে নটায়, বিমানের গণ্ডগোলে আমরা হিথরো এয়ারপোর্টে পা দিলাম বিকেল পাঁচটায়। সেই সকাল নটা থেকে সৈয়দ শাহীন ও তার বন্ধু বেলাল এয়ারপোর্টে ঠায় বসে আছে। তাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতার সেই প্রথম পরিচয়।

ভাস্কর তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবেই। কিন্তু শাহীনদের দাবি, তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে, সুতরাং এবার তাদের কাছেই আতিথ্য নিতে হবে। দু-একদিন পরে গিয়ে অবশ্যই থাকব, এই কথা দিয়ে সেদিনকার মতন ছাড়া পাওয়া গেল।

অন্যান্যবার লন্ডনে এসে পরিচিত ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিছু-কিছু বাঙালি গোষ্ঠী যে সানডে স্কুল বা রবিবারের বাংলা স্কুল খুলেছেন, সে খবরও আমি জানি ভাস্করের সঙ্গে গিয়ে একটা স্কুল দেখেওছি। এখানে আছে টেগোর সোসাইটি ও টেগোরিয়ান নামে সংস্থা। দেশ থেকে গান-বাজনা-নাচের দল প্রায়ই ইংলন্ডে গিয়ে অনুষ্ঠান করে আসেন। কিন্তু আধুনিক বাংলাসাহিত্য নিয়ে বড় ধরনের কোনও অনুষ্ঠান কিংবা কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা লন্ডনে বাঙালিরা কখনও করেছেন বলে শুনিনি।

লন্ডনে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিদের তুলনায় বাংলাদেশিদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের উপস্থিতি সর্বত্র টের পাওয়া যায়, দক্ষিণ লন্ডনের কোনও-কোনও পাড়ায় সিলেটিদের পাড়া বলা যেতে পারে। সেখানকার স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো হয়, অনেক জায়গায় বিভিন্ন সরকারি নোটিশ লেখা থাকে বাংলায়।

এখানকার বাংলাদেশি লেখকদের মধ্যে কয়েকজন আমার বন্ধু স্থানীয়, বি বি সি-র বাংলা বিভাগের অনেকের সঙ্গে আড্ডা হয় বুশ হাউজে গেলে। কিন্তু বাংলাদেশিরা যে বাংলা নিয়ে এখানে এত কর্মকান্ড ঘটিয়ে চলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা ছিল না।

এখন ইংল্যান্ড থেকে সাতখানি বাংলা পত্রিকা বেরোয় নিয়মিত। সেগুলি সখের পত্রিকা কিংবা লিটল ম্যাগাজিন নয়, রীতিমতো ব্যাবসায়িকভাবে চলে, অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে কাজ করে, সেটাই তাদের জীবিকা। লন্ডনে বাংলা ছাপারও কোনও অসুবিধে নেই আর, এই সব পত্রিকা মূলত রাজনীতি এবং সংবাদমূলক, সাহিত্যের জন্য আলাদা পৃষ্ঠাও বরাদ্দ আছে। অদূর ভবিষ্যতে লন্ডন থেকে কোনও বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লন্ডন থেকে বাংলা বই ছাপাও শুরু হয়ে গেছে। ওখানকার লেখকদের আর কলকাতা কিংবা ঢাকার ওপর নির্ভর না করলেও চলবে। এর মধ্যে প্রায় ষাটখানি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে লন্ডন থেকে। প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, উপন্যাস জাতীয় কয়েকটি বই আমি দেখেছি, ছাপা-টাপা বেশ ভালো। পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু-কিছু লেখকের বইও প্রকাশিত হতে পারে লন্ডন থেকে।

এই সব কিছুরই উদ্যম বাংলাদেশিদের। পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের কেমন যেন উদাসীন মনে

হয়। অনেকেই বাংলা বইটই পড়েন না। তবে, তাঁরা কিছুই করছেন না, এটা বলাও ঠিক নয়। হিরন্ময় ভট্টাচার্যের 'সাগর পারে' একটি সুপরিচিত পত্রিকা, আরও কয়েকজন বই লিখে লন্ডন থেকে প্রকাশ করছেন।

বন্ধুবর আবদুল গাফফর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পর। তিনি সহৃদয়ভাবে আলিঙ্গন করলেন আমাকে। আমি বললাম, আপনি 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের একটি চরিত্র, তিনি বললেন, আমিও আপনাকে নিয়ে একটি গল্প লিখেছি; দেখা হল প্রাবন্ধিক হাসন মুরশেদ এবং সম্পাদক সফিক রেহমান এবং আরও অনেকের সঙ্গে। নতুন পরিচিত বহু অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধ। কয়েকজন কী চমৎকার আবৃত্তি করে। বাইশ থেকে তিরিশ বছর বয়স্ক প্রবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়রা অনেকেই ভালো করে বাংলায় কথাই বলতে পারে না, বাংলা কবিতা পাঠ তো দূরের কথা।

প্রথম অনুষ্ঠানটি হল লন্ডন ইউনিভার্সিটির ম্যানিং হলে। প্রেক্ষাগৃহটি বিশেষ বড় নয়, কিন্তু এক সময় সব আসন পূর্ণ, কিছু কিছু লোকজন দাঁড়িয়েও ছিল। আজকাল বিদেশের সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলিতে লোকজন বিশেষ হয় না, এখানে এই জনসমাগম দেখে হকচকিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। গোটা অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া বাংলা, দু-একজন সাহেব আলো-মাইক ঠিক করছিল, না হলে বোঝবারই উপায় নেই যে ব্যাপারটা লন্ডন শহরে ঘটছে।

পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সেন্টার ও টয়েনবি হলে। যদিও শনি-রবিবার ছুটির দিনে ব্যবস্থা, কিন্তু ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই সঙ্গে নভেম্বরের শীতল বাতাস। লন্ডনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বহুদূর, তবু উৎসাহীদের সংখ্যা কম নয়। কলকাতা ও ঢাকা থেকে আমরা দু'জন, আর বিলেতের অনেক লেখক-প্রাবন্ধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করলেন। প্যারিস প্রবাসী বাংলাদেশের মূকাভিনয় শিল্পী পার্থপ্রতিম মজুমদারও দুর্দান্ত মূকাভিনয় দেখালেন একদিন।

লম্বা বক্তৃতার বদলে আমি কিছুটা সময় প্রশ্নোত্তরের প্রস্তাব করেছিলাম। বক্তৃতা দিয়ে সাহিত্যের কোনও সুরাহা হয় না। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন এলে বোঝা যায়, তাঁরা সাহিত্য সম্পর্কে কতদূর খোঁজ খবর রাখেন, সাম্প্রতিক লেখা-জোখার সঙ্গে কতটা ওয়াকিবহাল। এখানে অনেকেই বেশ পড়াশুনো করেছেন মনে হল। শামসুর রাহমানের সঙ্গে শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর বেশ জমে উঠেছিল। শামসুর চমৎকার কবিতা-পাঠ করেন, সুবক্তাও বটে।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই বাংলাদেশি তো বটে, দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও তাই। অনিন্দ্য রায় কিংবা অমলেন্দু বিশ্বাসের মতন দু-একজন কবির যথেষ্ট উৎসাহ আছে বটে কিন্তু অন্য অনেককেই এই সব অনুষ্ঠানে দেখা গেল না। বাংলাদেশিদের সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার বাঙালিদের ঝগড়া নেই বটে, ব্যক্তিগতভাবে এদিকের সঙ্গে ওদিকের কারুর-কারুর বন্ধুত্বও আছে, কিন্তু সমবেতভাবে কোনও কিছু করার বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় না। আমি অনেক সময় বলি, আর কিছুদিন পর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হবেন বাংলাদেশিরাই, ভারত থেকে বাংলা ক্রমশ মুছে যাবে। এতে অনেকে চটে যান। কিন্তু পৃথিবীতে এখন বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছে, ভারতের এই প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনেকের খেয়াল থাকে না। ভারতীয় বাঙালিরা কতটুকু সময় দান করেছেন মাতৃভাষার জন্য? কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশেই বাংলাদেশিরা মাতৃভাষার জন্য গর্বিত, এই ভাষার প্রসার ও সম্মান বর্ধনের জন্য যত্নশীল।

দু-একজন বাংলাদেশী তরুণ অভিমান ভরে আমাকে বলেছেন, ভারতীয় বাঙালিরা তাঁদের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণ জানান না। কিন্তু বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠানে ভারতীয় বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, কার্ড পাঠানো হয়, তবু প্রায় কেউই আসেন না। এই অভিযোগ কতদূর সত্য তা আমি জানি না, আমি কতটুকুই বা দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধান যাই-ই থাকুক, অন্যান্য ব্যাপারে যতই মতবিরোধ ঘটুক, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুনিয়ার

সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের এককাট্টা হয়ে থাকা উচিত। দুই বাংলার বাঙালিরা একসঙ্গে বাংলো সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য প্রয়াস চালালে, বিশ্বের কাছে এই ভাষা সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন হবে, তাতে তো সকলেরই লাভ। এটা আমার আশা, সকলে যে মানবেন তার কোনও মানে নেই!

॥ পঁচিশ ॥

বাংলা সন-তারিখ-মাসের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও যোগ নেই এখন। টাকা পয়সার লেনদেন, অফিসের মাইনে, ছুটি, ভ্রমণ ও সবই ইংরেজি মতে হয়। সুতরাং বাংলা মাসের হিসেবের দরকারও তো নেই। এমনকি এ বছর দুর্গা পুজো কবে জিগ্যেস করলে যে কেউ বলবে অতই অক্টোবর।

আমাদের স্বাধীনতা হয়েছিল ১৫ আগস্ট, সেটা কত বাংলা তারিখে তা ক'জন জানে তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ শিশুদের জন্মতারিখ অবশ্য বাংলায় লিখে রাখা হয়। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনে অবশ্য এখনও কোনও রহস্যময় কারণে, যদিও সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য নেমন্তন্নর কার্ডে ইংরেজি তারিখটি দেওয়া থাকে যথারীতি। জন্মতিথির হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর আমাদের জন্ম তারিখ বদলাবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইংরেজি কায়দা অনুযায়ী আমরা ইংরেজিতেই নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ ঠিক করে ফেলেছি আজকাল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটিই ২৫শে বৈশাখের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে।

বিয়ে-পৈতে-শ্রাদ্ধর নেমন্তন্নতে আমি বিশেষ যাই না বলে গত এক বছরে তারিখ বিষয়ে সচেতন হবার তেমন সুযোগ হয়নি। তবে বাংলা মাস ও ঋতুর এখনও বলতে গেলে একচ্ছত্র আধিপত্য আছে এক জায়গায়, বাংলা কবিতায়। সেখানে এখনো কাল বৈশাখীর বদলে মার্চ মাসের ঝড় আসেনি। আশ্বিনের সাদা মেঘের বদলে সেপ্টেম্বরের আকাশ বললে ঠিক ছবি ফোটে না। কোজাগরি পূর্ণিমা ঠিক কোন মাসে হয় খেয়াল না থাকলেও কবিরা ওই রকমই লেখেন, জ্যৈষ্ঠের দুপুর না লিখলে ঠিক খাঁ খাঁ গরম হয় না। ইংরিজি মতে তো হেমন্তকাল বলে কিছু নেই-ই কিন্তু বাংলায় আছে। সুতরাং কবিতা পড়বার বা লেখবার সময় বাংলা মাস ও ঋতুর কথা আমারও মনে পড়েছে বারবার। এ রকম বর্ণনায় অবশ্য রসাভাসও ঘটে মাঝে-মাঝে। বাংলা বর্ণনায় 'চৈত্রের রুক্ষ প্রান্তর' এরকম বর্ণনা লেখা হচ্ছে অনেক কাল থেকে, এখনো লেখা হয়। ছবিটা হচ্ছে এই ফসল কাটা হয়ে গেছে, নতুন ফসল বোনা হয়নি, এমন অবস্থায় পড়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত জমি। কিন্তু ট্রেনে করে বর্ধমানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, ওই সময়ে দু-পাশের মাঠে সবুজের ঢেউ খেলছে। ইরিগেশনের কল্যাণে যে চাষের সময় ওলট পালট হয়ে গেছে, তা অনেকের খেয়াল নেই। 'বাঘের থাবার মতো মাঘের হিমানী' লিখেছিলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই আর মাঘ মাসে লেপ গায়ে দিতে হয় না। এ বছর মাঘে পাখা খুললে ভালো হত, বরং শীত পড়ল ফাল্গুনের শেষে।

গত বছর আমি দু-বার মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। একবার এখানেই, একবার পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। অশ্লেষা মঘার কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা জানি না। তবে দু-বারেই, তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতন মৃত্যু আমায় বলেছিলেন, এখন বিশেষ ব্যস্ত আছি তবে আপনার নাম লিখে রাখছি, যথাসময়ে দেখা হবে।

আরও একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল গত বছর, তাঁর নাম সাতচল্লিশ। আগে ভদ্রলোকের সম্পর্কে ভুল ধারণা ছিল ভেবেছিলুম উনি হবেন বিষন্ন কিংবা নৈরাশ্য আক্রান্ত। কিন্তু সাতচল্লিশ সে রকম নন, একটু গাম্ভীর্য মাখানো হলেও সুরসিক, বেশ মজবুত চেহারা এবং মাথা

ভরতি অনেক পরিকল্পনা। আমি একটা দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়েছিলুম, তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় বললেন, ইতস্তত করছেন কেন। উঠে আসুন! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি, এখনও অনেকটা দূরে যেতে হবে তো। ওর সঙ্গে খানিকটা যাওয়ার পর উনি আর একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তাঁর নাম আটচল্লিশ।

বেশ কয়েকটি পাহাড়ের সঙ্গেও পরিচয় হল এই এক বছরে। একটি পাহাড় ওড়িশায়, একটি পাহাড় মধ্যপ্রদেশে, একটি পাহাড় ইউরোপে, একটি ক্যানাডায়। মধ্যপ্রদেশের পাহাড়টির সঙ্গে ক্যানাডার পাহাড়টির শুধু এইটুকুই তফাৎ যে, দ্বিতীয়টিতে বরফ জমে। ওড়িশার পাহাড়টিতে উঠেছিলাম জিপে, ইউরোপের পাহাড়টিতে আরও আরামদায়ক গাড়িতে, মধ্যপ্রদেশের পাহাড়টিতে পায়ে হেঁটে আর ক্যানাডার পাহাড়টিতে বিদ্যুৎচালিত চেয়ারে। ভারতের প্রায় সব পাহাড়ের ওপরেই একটা মন্দির থাকে, পাশ্চাত্যে কিন্তু অত উঁচুতে গির্জা বানায় না। ধর্মের জন্য অত কষ্ট ওরা দাবি করে না। ক্যানাডার পাহাড়টির নাম ব্যান্‌ফ, ভারী চিত্ররূপময় জায়গাটি, ওপরে শুধু খাবার জায়গা, শখের জিনিসপত্তরের দোকান আর দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থা। পাশের জঙ্গল থেকে কয়েকটি বুনো ভেড়া সেখানে ছিটকে চলে এসেছে, লোকেরা তাদের আদর করে খাবার দিচ্ছে, কেউ তাদের খাদ্য বানাবার জন্য মারতে ছুটল না।

ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ইওরোপ বা ক্যানাডার যে কোনও পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালেই কিন্তু আকাশটাকে একই রকম দেখায়।

গত বছর বেশ কয়েকটি জঙ্গলও দেখা হল।

কোনও জঙ্গলই একবার কেন, পাঁচবার দেখলেও ঠিক চেনা যায় না। কোনও জঙ্গলের সঙ্গে বেশি ভাব হয়ে গেলেও আর বেশি ভালো লাগে না। একটু ছমছমে রহস্যময় থাকাই জঙ্গলের মূল আকর্ষণ। সেই হিসেবে সুন্দরবনকে কক্ষণো ঠিক চেনা যায় না। বিশেষত আমাদের মতন শহুরে মানুষের পক্ষে। রাত্তির বেলা সপ্তমুখী নদী ধরে ভয়াল জঙ্গলের পাশ দিয়ে নৌকো চড়ে যাওয়া, কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু সেই নির্জনতার অঙ্গ হিসেবেই মাঝে-মাঝে ট-র-র-র, ট-র-র-র করে একটা রাতপাখির ডাক। গরমের জন্য ছই এর বাইরে এসে হাওয়া খাচ্ছিলুম, মাঝি বলল, বাবু কার্তিক মাসের হিম লাগাবেন না। কালোরাডোর জঙ্গল তেমন গা ছমছমে নয়, বরং বেশি নয়ন শোভন, তবু সেখানে ঘুরতে-ঘুরতে পথপ্রদর্শকটি যখন হঠাৎ বলল, সাবধান, এই সময় কিন্তু র‍্যাটল সাপ বেরোয়...তখন আমার ওই সুন্দরবনের মাঝিটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

প্রত্যেকটি নতুন নদী দেখারই একটা বিশেষ আনন্দ আছে। ব্রহ্মপুত্র এক রকম লাগে, মিসিসিপি অন্যরকম। তবে জঙ্গলের মাঝখান-চেরা নদী দেখলে আমার বুকের মধ্যে কিছু একটা লাফিয়ে ওঠে। সে রকম কোনও নদীর ধারে শেষ বিকেলের নরম আলোয় দাঁড়ালে আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আঃ বেঁচে থাকা কী সুন্দর।

॥ ছাব্বিশ ॥

ইংরেজি মতে চারটি ঋতু হলেও আমাদের ঋতু ছটি। এই অতিরিক্ত দুটি ঋতুর মধ্যে বর্ষাকে প্রবলভাবে টের পাওয়া গেলেও অন্য ঋতুটি অর্থাৎ হেমন্ত যে কখন আসে আর কখন চলে যায়, তা ঠিক বোঝা যায় না। যদিও অনেক কবির কবিতায় এর উল্লেখ থাকে খুব।

যাই হোক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমাদের শীত মাত্র দু-মাস। সারা বছরের মধ্যে এই দুটি মাসই কলকাতা শহরে সবচেয়ে উপভোগ্য লোডশেডিং উপেক্ষা করা যায়, নানা রঙের পোশাকের জন্য রাস্তার মানুষদের বেশ খুশি খুশি মনে হয়, বাজারের তরিতরকারি বেশ স্বাস্থ্যবান থাকে। অনেক

উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী হয় এই দু-মাস জুড়ে। বরফের দেশ থেকে হাজার-হাজার পাখি আসে। আর আসে ইউরোপ আমেরিকা থেকে প্রবাসী ভারতীয়রা।

দু-তিন বছর অন্তর অন্তর তারা দেড় মাসের ছুটি নিয়ে আসে নিজের দেশ দেখতে। এরা অনেকেই সান্টা ক্লশের মতন ঝুলি ভরতি করে আনে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, আধুনিকতম গান বাজনার ক্যাসেট, ব্লেড, সাবান, পারফিউম আর দু-এক বোতল স্কচ। ভাগ্যবান আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সেগুলি বিলানো হয়। যত সামান্যই হোক, যেকোনও টুকিটাকি বিদেশি জিনিস পেলেই আমরা খুশি। বিদেশি দ্রব্য এখনও আমাদের কাছে অতি পবিত্র।

বাইবেলের প্রডিগাল সনের মতন এদের প্রত্যাবর্তনে মহা ধুমধাম পড়ে যায়, বাড়িতে-বাড়িতে। এদের জন্য বাজার থেকে কিনে আনা নব্বই টাকা কেজির চিংড়ি মাছ, কলকাতার শ্রেষ্ঠ দোকানের সন্দেশ। নিজের বাড়িতে এরকম এলাহি বন্দোবস্ত থাকে তো বটেই, তা ছাড়াও প্রত্যেকদিনই থাকে কোনও না কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন, সেসব জায়গাতেও পরিবেশিত হয় আট দশ রকমের আহার্য পদ। এদিকে, অনেকদিন বিদেশে থাকার ফলে এদের খাদ্যাভ্যাস বদলে গেছে, বাঙালি ভূরিভোজনে এরা আর অভ্যস্ত নয়, সামান্য একটি দুটি খাবার এরা খুঁটে মুখে দিয়ে হাত জোড় করে বলে আর পারছি না! ক্ষমা করুন।

বাবা-মায়েরা প্রবাসী কৃতী ছেলে বা মেয়ের গর্বে নিজেরাই বেশি গর্বিত হয়ে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে তাদের দেখাতে নিয়ে যায়। প্রায় ভুলে যাওয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সামনে এই সব বিদেশি পাখিরা বিনীত মুখ করে বসে থাকে যতদূর সম্ভব কম ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে এবং রূপকথার গল্প শোনায়। অবশ্য দু-চার দিনের মধ্যেই তারা এই ভূমিকায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে, এবং তারপর তারা তাজমহল কিংবা কাশ্মীর দেখতে চলে যায়।

শীতকালে কোনও না কোনও আড্ডায় এই রকম বিদেশ-ফেরত কারুর না কারুর সঙ্গে দেখা হবেই। আজকাল বিদেশ যাওয়া অনেকটা জলভাতের মতন। খুব বেশি লেখাপড়া জানারও দরকার হয় না, তবলায় দু-একটা চাঁটি লাগাতে জানলে কিংবা একটু আধটু পল্লি গীতি গাইতে শিখলে কিংবা খানিকটা যোগ ব্যায়াম দেখাতে পারলেই দু-একবার ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে আসা যায়। আর সাংবাদিক হলে তো অঢেল সুযোগ। প্রবাসী ভারতীয়রাও একথা জানে তাই দেশে ফিরে এইসব আড্ডায় তারা চট করে বিদেশ-এর গল্প শুরু করে না। নেহাৎ যারা বুদ্ধি কম তারা ছাড়া অন্যরা ইংরেজিতে কথাও বলে না, এবং খুব বেশি পোশাকের চাকচিক্যও দেখায় না। তবে প্রায় আলাপের প্রথমেই তারা জানিয়ে দেয়, কে কত বছর বাইরে আছে। কেউ ন'বছর, কেউ বারো বছর, কেউ সতেরো বছর। যে যত সিনিয়র তার তত সম্মান। মনে করুন, ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আসা কোনও প্রবাসীর সঙ্গে আলাপ হবার পর আপনি জিগ্যেস করলেন, ম্যাঞ্চেস্টারে আমার এক বন্ধু আছে, অমুক দাশগুপ্ত, তাকে চেনেন? তিনি ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলবেন, ও হ্যাঁ, চিনি সে তো মাত্র দুবছর ধরে আছে। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের প্রতি থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের যে রকম একটা অবজ্ঞার ভাব থাকে, এদের কথাতেও সে রকম একটা ভাব থাকে।

এই সব বিদেশ থেকে স্বদেশ ভ্রমণ করতে আসা মানুষদের সঙ্গে আলাপ করতে আমার ভালোই লাগে। এদের চেহারায় পোশাক ও কথাবার্তায় বেশ একটা টাট্‌কা বাতাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। এমনকি এরা যখন কলকাতার নোংরা রাস্তা, অতিরিক্ত ভিড়, ট্রেন প্লেনের অনিয়মিত চাল-চলনের নিন্দে করেন, তাতেও রেগে যাই না। এরকমই তো স্বাভাবিক। মানুষ যেখানে দশ বারো বছর ধরে থাকে সেখানকার জীবন যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। গ্রামের ছেলে অনেকদিন শহরে কাটানোর পর আবার গ্রামে ফিরে গেলে কমোড ছাড়া বাথরুমে স্বস্তি বোধ করে না। এদের কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন অহংকার ফুটে বেরুলেও আশ্চর্য হই না। মানুষের যখন কোনও দুর্বলতা থাকে কিংবা গোপন দুঃখ থাকে, তখনই তারা বেশি অহংকারের ভাব দেখায়।

তবে, একটা ব্যাপারে আমি এদের খুবই অপছন্দ করি। বিদেশি দস্যুর মতন এরা আমাদের দেশের সুন্দরী মেয়েদের লুঠ করে নিয়ে যায়।

এক সময় ভারতীয় ছেলেরা বিলেত আমেরিকায় পড়াশুনা বা চাকরি করতে গেলে প্রায় অবধারিতভাবেই বিদেশি বউ নিয়ে ফিরত। ষাটের দশক পর্যন্ত আমরা অনেক মেম-বউ দেখেছি কিন্তু এখন মেম বিয়ে করার রেওয়াজ আর নেই বললেই চলে। শতকরা পাঁচজনের বেশি ভারতীয় এখন আর বিদেশিনী বিয়ে করে না। সাধারণত বিদেশে কয়েক বৎসর থেকে খানিকটা সেট্‌ল করে তারপর এরা দেশে এসে বিয়ে করে যায়। এখানকার খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী কলমেও এরকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখা যায়। "বিদেশি উচ্চ চাকরিরত (মাসিক আয় আড়াই হাজার ডলার বা আটশো পাউন্ড) পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, রূপবতী, গান-বাজনা রান্না জানা সদবংশীয় পাত্রী চাই! বিদেশে বসবাসের উপযুক্ত মানসিকতা থাকা চাই!" ইংল্যান্ড-আমেরিকায় ভারতীয়দের দ্বারা প্রকাশিত পত্রপত্রিকাতেও আজকাল এরকম বিজ্ঞাপন থাকছে। কলকাতায় অনেক স্কুল-কলেজে বাছা-বাছা সুন্দরী মেয়েদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রবাসীদের উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে তৈরি হয়ে ওঠার জন্য। তারা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি বা জার্মান ভাষার কোর্স নেয়। বিদেশ থেকে প্রতি বৎসর ঝাঁক-ঝাঁক ছেলে এসে এদের নিয়ে চলে যায়।

এইসব মেয়েদের সঙ্গে হয়তো কোনওদিনই আমার আলাপ পরিচয় হত না। একটিও কথা বলার সুযোগ পেতাম না। কিন্তু পথে-ঘাটে দেখতে তো পেতাম। কলকাতা থেকে এইসব সুন্দরীরা চিরকালের জন্য চলে যায় বলে আমার দুঃখ বোধ হয়। এদেশ থেকে যত ইচ্ছে ব্রেন-ড্রেইন হোক তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, কিন্তু এরকম সুন্দরী নারীদের রফতানি মেনে নিতে পারি না।

যেসব মেয়ের বাবারা মেয়েদের এই রকম বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত কিংবা ছেলেমেয়েদের খুব বেশি লেখাপড়া শেখান তাঁদের অনেকেরই শেষ বয়েসের ট্র্যাজেডি আমি দেখেছি। অনেক মধ্যবিত্ত বাবা নিজেদের কষ্টার্জিত টাকায় ছেলে মেয়েদের ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার করে তোলেন। তারপর সেইসব ছেলেমেয়েরা আরও উচ্চশিক্ষার জন্য বা চাকরি পেয়ে বিদেশে চলে যায়। আর ফেরে না। এক জাঁতাকলে আটকে পড়ে। বাবা মায়ের কাছে তারা নিয়মিত চিঠি লেখে ও মানি অর্ডার পাঠায়, যত বছর যায়, ততই চিঠির ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাকার পরিমাণ কমতে থাকে। একসময়ে বৃদ্ধ বাবা-মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, তাঁদের অসুখ হলে পাশে দাঁড়াবার জন্য কারুকে পাওয়া যায় না। যখন তখন অসুখের খবর জানিয়েও তাঁরা অতদূরের সন্তানদের বিব্রত করতে চান না। একমাত্র তাঁদের মৃত্যুর পরই যদি টেলিগ্রাম ঠিক সময় পৌঁছোয় কিংবা টেলিফোন কানেকশান পাওয়া যায়, তা হলে তাঁদের ছেলে মেয়েরা বিমানে উড়ে আসে। বাবা কিংবা মায়ের মৃতদেহের সঙ্গেও শেষ দেখা হয় না।

॥ সাতাশ ॥

"তোমার চোখের নরম আলো আমাকে ভোরের হাওয়ার মতো ছুঁয়ে যায়। তোমার কণ্ঠস্বরে ঝর্ণার জলের শব্দ শুনতে পাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

"যতবার তোমার চোখের দিকে তাকাই, আমার মনে পড়ে ভোরের পরিষ্কার নীল আকাশ, রাত্রির রহস্য তাতে এখনও লেগে আছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

"ভোনি, আমার সোনামনি, তোমাকে যতক্ষণ না দেখি, আমার বুকের মধ্যে অন্ধকার হয়ে থাকে। কারাগারের শৃঙ্খলের শব্দ শুনতে পাই। তারপর যখনই তোমাকে জানালা দিয়ে দেখি, তুমি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছো, তক্ষুনি আমার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'তোমার নীল চোখ দুটি ভূমধ্যসাগরের জলের মতন, তোমার ভুরু দুটি যেন দুই উড়ন্ত পাখি, তোমার থুতনি দেখলে উপত্যকার কথা মনে পড়ে, তোমার বুক...ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

এই হল কতকগুলি আধুনিক প্রেমপত্রের নমুনা। প্রতিযোগিতাটি একবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল লণ্ডনে। প্রেমপত্রের প্রতিযোগিতায় প্রায় পাঁচশো প্রতিযোগী যোগদান করেছিল, তাঁদের মধ্যে ন'জন উঠে ছিল ফাইনালে। যেসমস্ত রচনাকারী পাঠক প্রেম-ট্রেমের মতন হালকা জিনিস পছন্দ করেন না, তাঁরা রচনাটি এখানেই পড়া বন্ধ করবেন না।

প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত সুইস ইয়ং। প্রেমপত্রের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁর একটা অপ্রত্যক্ষ স্বার্থ আছে, শ্রীযুক্ত ইয়ং একজন বিবাহের পোশাক বিক্রেতা। শ্রেষ্ঠ প্রেমপত্রের লেখককে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৫০ গিনি। এবং প্রেমিক শ্রেষ্ঠর "স্যার প্যালাহাড" এই খেতাব। ছেলেদের প্রেমপত্রই প্রতিযোগিতার বিষয়—কিন্তু কয়েকজন মেয়েও যোগ দিয়েছিল। এই হিসেবে যে, তাদের চিঠিগুলো তাদের প্রেমিকের লেখা।

প্রাথমিক পরীক্ষা হয়েছিল হাইড পারকে, ফাইনাল হয় সোহো পল্লির এক রেস্তোঁরায়। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গদগদ ভাষায় প্রেমের কথা বলতে কারুরই সাহসের অভাব হয়নি। একজন জ্যান্ত প্রেমিকাও সেখানে উপস্থিত ছিল অবশ্য। উদ্যোক্তারা লেসলি হিল নামে একজন মডেলকে প্রেমিকদের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন। মডেলটি জানালার পাশে বসে উদাস চোখে প্রেমিকা সেজে খুব ভাব দিচ্ছিল।

আধুনিক ছেলেদের ওইসব প্রেমপত্রও পুরোনো ন্যাকামিতে ভরতি। সেই উচ্ছ্বাসময় জোলো ভাষা, চাঁদ-তারা-ফুলও যথেষ্ট।

মেয়েরা তাদের প্রেমিকের লেখা হিসেবে যে ক'টি প্রেমপত্র পাঠ করেছে তার দু-একটিতে কিছু নতুনত্ব আছে। একজন প্রেমিক লিখছে, সে তার প্রেমিকাকে ভালোবাসে, কারণ মেয়েটি "উত্তম্যানস্ ওউন" জাতীয় পত্রিকা পড়ে সময় নষ্ট না করে প্রামাহ গ্রীন আই-রীস মারডক—প্রভৃতি ভালো ভালো লেখকের বইও পড়ে। আরেক জন "তোমাকে আমি প্রত্যেক থিয়েটারে প্রথম দিন আর শেষ দিনের টিকিট কেটে রাখবো।"

শুনতে-শুনতে বিচারক কয়েকজনের হাই উঠছিল। একজন বলেছিলেন এতেই বোঝা যাচ্ছে প্রেম জিনিসটা কী বিরক্তিকর। অন্য এক জন, "আধুনিক ছেলেদের কাছ থেকে আমি অন্য রকম দুঃসাহসিক কিছু আশা করেছিলাম।'

যাই হোক প্রতিযোগিতায় প্রথম হল গ্রেগরি পেইন নামে ২০ বছরের একটি ছেলে। তার চিঠির এক লাইন "তোমার জন্য আমার হৃদয় এমন মধুর বাসনায় পূর্ণ হয়ে আছে—তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না।" বিচারকদের মতে তার চিঠিতে এমনই এলোমেলো ভাব এবং অসংযত উচ্ছ্বাস রয়েছে—যা খাঁটি প্রেমের চিহ্ন।

গ্রেগরি পেইন তো পুরস্কারের চেকটা নিয়ে হাসিমুখে পকেটে পুরল। তার চিঠিতে প্রেমিকার নাম ছিল জেনি। অনেকে জেনিকে নিয়ে একটু রঙ্গরস করতে চাইল। জেনি কে, সে এখানেই আছে নাকি? কবে তাকে বিয়ে করছ?

আকাশ থেকে পড়লো পেইন। জেনি? ও নামে সে কারুকে চেনে না। কোনও মেয়ের প্রেমে সে পড়েনি। সম্প্রতি একটা নভেল পড়ছিল সে—সেই নভেলের নায়িকার নাম জেনি। মোটামুটি সেই নায়িকার কথা ভেবেই লিখেছে। চিঠিটা লিখতে-লিখতে তার কোনও বান্ধবীর মুখ তার একবারও মনে পড়েনি? উহু তার বান্ধবীরা ওই ধরনের কথা শুনলে হাসবে। আর বিয়ে? যেন এরকম অসম্ভব কথা সে আর শোনেনি। বিরক্তির মুখ কুঁচকে সে বলেছে, বিয়ে? ধুৎ।

বস্তুত বিয়ের পোশাক বিক্রেতার পক্ষে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় কোনও লাভ হয়নি। ৫০০ খানি প্রেমপত্রের মধ্যে কোনও প্রেমিকই প্রেমিকার কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানায়নি।

॥ আঠাশ ॥

পনেরোই আগস্ট সকালে উত্তর কলকাতায় একটি অভিনব মিছিল বেরিয়েছিল। আগে আমরা স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যেক পাড়াতেই দেখেছি প্রভাতফেরি কিংবা বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যদের শোভাযাত্রা। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে কিশোর কিশোরীরা গান গাইতে-গাইতে যেত, অনেকে আবার কেবল ড্রাম, বিউগ্‌ল নিয়ে ব্যাগ পাইপ বাজাত, সেইসব গানের সঙ্গে কচি-কচি উজ্জ্বল মুখ ও সেই দিশি গান ও বিলেতি বাজনার অদ্ভুত সংমিশ্রনই ছিল স্বাধীনতা দিবসের প্রধান অঙ্গ, এ ছাড়া বক্তৃতা টক্তৃতা তো আছেই।

এবারের যে মিছিলের কথা বলছি, তা একেবারে অন্যরকম। কয়েক হাজার নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু ছিল এই মিছিলে, তাদের অধিকাংশরই খালি পা, অনেকেরই গায়ে জামা নেই, কারোরই মুখে হাসি নেই। এরা কলকাতার মানুষ-আবর্জনা। কলকাতা শহর পরিষ্কার করার প্রশ্ন উঠলেই এদের বাইরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সম্প্রতি বাগবাজার আর নারকেলডাঙ্গা গলির দুপাশ, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাই পাসের দু-ধার, ভি, আই পি, রেল ব্রিজের নীচে এবং উল্টোডাঙ্গা রেল ব্রিজের কাছাকাছি জায়গাগুলো পরিষ্কার করার জন্য এইসব মানুষগুলোর অস্থায়ী ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে এদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, শুধু আবর্জনা হলে তা পচিয়ে ফেলা যায় বা পুড়িয়ে ফেলা যায়, কিন্তু এরা উঠে দাঁড়ায়, ফিরে আসে এবং আবার আশ্রয় চায়।

মিছিলটি আমি দেখতে যাইনি। আমার দু-একজন বন্ধু আমাকে যাবার জন্য বলেছিল, কিন্তু ছুটির দিন সকালে আমার দেরি করে ঘুম ভাঙে, এবং বাড়িতে বসে আলস্য করিতেই বেশি ভালো লাগে। খবরের কাগজ নিয়ে অনেকক্ষণ সময় কাটাবার পর হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল। পনেরোই আগস্ট সকালটি যেন বড় বেশি শান্ত। আমাদের সরকার কি এই উৎসব বর্জনের ডাক দিয়েছে। কই, কাগজে তো সে রকম কোনও উল্লেখ নেই।

একটু বাদে আমার এক বন্ধু এসে প্রায় একই কথা জানাল। সে বলল, রাস্তা দিয়ে এলুম, কোথাও উৎসবের চিহ্ন নেই। পাড়ার ক্লাবগুলো কোনও শোভাযাত্রা বার করেনি, মাইক্রোফোনে গান নেই, কোনও বাড়িতেই জাতীয় পতাকা উড়ছে না। আজকের দিনটি যে এতবড় একটি জাতির স্বাধীনতা দিবস, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। শুধু টেলিভিসনে ইন্দিরা গান্ধির বক্তৃতা, ব্যাস আর কিছু না।

আমি বন্ধুটিকে উত্তর কলকাতার মিছিলটির কথা জানালুম। বন্ধুটি সঙ্গে-সঙ্গে চটে উঠল। সে একজন কলকাতা প্রেমিক, সে কলকাতার উন্নতির জন্য চিন্তা ভাবনা করে। বিদেশিরা যখন কলকাতার নিন্দে করে, তাতে তার গায়ে লাগে।

সে বলল, ওদের সম্পর্কে আমার কোনও সহানুভূতি নেই। ব্যাঙের ছাতার মতন ওরা যেখানে সেখানে ঝুপড়ি বানাবে, রাস্তাগুলিকে ওদের ল্যাট্রিন বানাবে, এক পয়সা ট্যাক্স দেবে না, শহরটাকে দিন-দিন আরও নোংরা করবে, আর তোমরা তাই সহ্য করবে? কোথাও একটা সীমারেখা তো টানতে হবে? বাইরে থেকে যে কেউ যদি এসে ভাবে যে কলকাতায় যে কোনও জায়গায় বিনা পয়সার ঝুপড়ি বানিয়ে থাকা যায়, তা হলে এই শহরটার আর কোনও ভবিষ্যৎ আছে?

আমি তর্কবাগীশ নই। কেউ বাছা-বাছা যুক্তি প্রয়োগ করলে আমি তক্ষুনি পালটা যুক্তি প্রয়োগ

করতে পারি না। আমার মনে হল বন্ধুটি ঠিকই বলছে। একটা শহরের যেখানে সেখানে এরকম ঝুপড়ি গজিয়ে উঠবে এটা কেউই মেনে নিতে পারে না। অবশ্য আমি নিজে যদি ওরকম কোনও বাসিন্দা হতুম তাহলে নিশ্চয়ই একটা কিছু জোরালো যুক্তি দিতে পারতুম।

বন্ধুটিকে জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, এরা কারা বলো তো? ঝুপড়ির সংখ্যা দিন দিন তো বেড়েই চলেছে, এরা কোথা থেকে আসে? এরা কি পূর্ব বাংলার রিফিউজি?

বন্ধুটি বলল না, না। পূর্ববাংলার রিফিউজিদের সমস্যা তো অন্যরকম। তাদের কলোনিগুলো শহরের প্রান্ত এলাকায়। এরা অনেকেই এসেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে, অন্য জেলা থেকেও আসে। বিহার থেকে আসে। এদের ঝুপড়িগুলো হল সমাজ বিরোধীদের আড্ডা, মদ-চোলাই, জুয়া, মেয়ে-মানুষের ব্যাবসা কী না হয় ওখানে। সন্ধ্যের পর ওই সব জায়গা দিয়ে মানুষ হাঁটতে ভয় পায়।

—তুমি কোনও দিন হেঁটেছ?

—না, আমি কোনও দিন ওসব দিকে যাই না। কিন্তু কাগজে তো এরকম ঘটনা প্রায়ই থাকে।

—আচ্ছা ভাই, এরা কি একজন দুজন করে এসে ঝুপড়ি বানায়, না দল বেঁধে আসে?

প্রথমে একজন দুজন করেই আসে। তারপর সুবিধে বুঝে ভাই বেরাদরদের ডেকে আনে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস যখন তৈরি হতে শুরু হয় তখন ওখানে কোনও বসতি ছিল না। তারপর দেখলুম একটা দুটো ঝুপড়ি তৈরি হচ্ছে। কয়েক মাসের পরই রাস্তার দুদিক ভরে গেল।

—প্রথম যখন একজন দুজন এসে-এসে ঝুপড়ি বানায়, তখনই কেউ বাধা দেয় না কেন? আমি কি ইচ্ছে করলেই কলকাতার গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি বানাতে পারি? পুলিশ এসে বাধা দেবে নিশ্চয়। সেই রকম ওদের মধ্যে প্রথম লোকটি ঝুপড়ি বানায়, তাকে কেন পুলিশ বুঝিয়ে দেয় না যে এইরকমভাবে কলকাতায় থাকার চেষ্টা করা বেআইনি? আর একটা সরল প্রশ্নও আমার মনে আসছে। এই সব ঝুপড়িগুলোতে যদি মদ তৈরি, জুয়া আর মেয়ে মানুষের কারবার চলে, তা বলে পুলিশ তাদের ধরে জেলে পুরছে না কেন? শুধু ঝুপড়ি ভেঙে বা পুড়িয়ে দিয়ে এই সব অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া হয়, সেটাও তো সাংঘাতিক ব্যাপার!

—পুলিশ তাদের কর্তব্য কতখানি পালন করছে না করছে, সেটা আলাদা প্রশ্ন। আমি বলছি, এইসব ঝুপড়ি ভেঙে দিয়ে শহর পরিষ্কার করা, নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য কি না। আমি সমর্থন করি।

বন্ধুটি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে আমি তাকে একটা সিগারেট দিলুম। তারপর বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বললুম, আবার বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। এবারে ঠিক বর্ষাকাল শুরু হওয়ার সময়েই এই সব হতভাগ্য লোকদের বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হল, পুড়িয়ে দেওয়া হল। বর্ষার সময় এই লোকগুলো থাকবে কোথায় সে কথা কি কেউ ভাববে না? তুমি নীতিগত প্রশ্ন তুললে বলেই আমিই তোমায় দু-একটা প্রশ্ন করি। বাগবাজারের খালের ধারে আমি এই সব ঝুপড়ি খুব কাছ থেকে দেখেছি। মানুষের এর থেকে খারাপ বাসস্থান আর সম্ভব নয়। এর থেকে সামান্য একটু ভালো জায়গায় যদি এদের পক্ষে থাকা সম্ভব হত, তা হলে নিশ্চয়ই এরা সেখানেই চলে যেত। তা ঠিক নয়? আর কোনও যাওয়ার জায়গা নেই বলেই এরা এখানে থাকে। বছরের পর বছর বেঁচেও আছে। এখানে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সবই চলছে। তুমি কি জানো, এইসব ঝুপড়ির মানুষদের জন্য কমিউনিটি সার্ভিসেস সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রায় তিরিশটি ইস্কুল চালায়। এখানকার অনেকেই সেখানে পড়তে আসে তুমি এদের সবাইকেই সমাজ-বিরোধী, অপরাধী বলে দিলে? চায়ের দোকানে যে ছোট ছেলেমেয়েরা কাজ করে, যারা ঠ্যালা চালায়, রিক্সা চালায়, দিন মজুরি করে,

বাড়িতে ঠিকে ঝি-র কাজ করে, তারা কি সবাই সমাজ-বিরোধী? তাদের জন্য এই শহর কোনও থাকার জায়গা দিয়েছে? অথচ এদের আমরা প্রত্যেকদিনই কাজে লাগাই! এরা তো পোকা মাকড় কিংবা কুকুর বেড়াল নয় যে শহর পরিষ্কার করবার নামে এদের যখন তখন তাড়িয়ে দেওয়া যায়। এরা মানুষ আমরা কি এখনও আগেকার দিনের সেই জমিদার কায়দা চালিয়ে যাচ্ছি, যে যখন ইচ্ছে হল তখনই গরিব লোকদের বাড়ি ঘর ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দেব?

বন্ধুটি বলল, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। এই সব কথা অনেকবার শুনেছি। বোঝাই যাচ্ছে, এই শহরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হোক, তুমি তা চাও না।

এবার আমার উত্তেজিত হবার পালা। আমি জোর দিয়ে বললুম, না চাই না! কলকাতা শহর আরও নোংরা হোক, তাতেও কিছু আসে যায় না। এদের জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে এদের নির্দিষ্ট জীবিকার ব্যবস্থা না করে যদি পুলিশ দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তাকে আমি বলব বর্বরতা।

বন্ধুটি হাসতে-হাসতে বলল, বসো বিয়ার খাওয়া যাক।

বিকেলবেলা রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে আমার চা খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে আমি গেলুম না। সেখানে অনেক মান্যগণ্য ভি. আই. পি. আসবেন, সেখানে যদি হঠাৎ আমি বলে ফেলি, আসাম থেকে বহিরাগতদের তাড়াবার প্রশ্ন উঠলে আপনারা প্রতিবাদ করেন, এখন কলকাতা থেকে আপনারাই বহিরাগতদের তাড়াচ্ছেন কেন? তাহলে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হবে, সুতরাং আমার না যাওয়াই ভালো।

সারাদিন বাড়ি বসে থাকার পর সন্ধেবেলা গেলুম একটা সিনেমা দেখতে। ন'টার সময় ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতে-ফিরতে অবাক হয়ে গেলুম। ক্যামাক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিটের কিছু অংশ, সার্কুলার রোড একেবারে অন্ধকার। আজও লোডশেডিং? পনেরোই আগস্ট, আজ সমস্ত কলকারখানা, অফিস কাছারি বন্ধ, তবু লোডশেডিং? ছেলেবেলায় এই দিনটিতে কতরকম আলোকসজ্জা দেখেছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা দিবসের কোন স্মৃতি মনে রাখবে?

গাড়ির হেড লাইটের আলোয় একটি মূর্তি দেখে চমকে উঠলুম পার্কস্ট্রিট ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি উলঙ্গ নারীমূর্তি। একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে গভীর বিস্ময়ে কী যেন দেখছে। এক নিমেষের জন্য মনে হল, কাকে দেখছি? পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারলুম, না, একজন সাধারণ পাগলি, এরকম তো প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়!

॥ উনত্রিশ ॥

প্রথম মানব আদিমের জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম সেম। সেই সেমের বংশধররাই সেমেটিক বা সেমাইট জাতি। অর্থাৎ জু, ইহুদি। ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য জাতি। শেক্সপিয়ার মার্চেন্ট অব ভেনিসের শাইলকের বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু সংক্ষেপে বলেছেন—'হি ইজ আ জু।' অর্থাৎ আর কিছু নিন্দাবাদের দরকার নেই। শুধু 'ইহুদি'—এই শব্দের উচ্চারণেই ঝরে পড়ে তীব্র ঘৃণা। হাজার হাজার বছর ধরে ইহুদিরা সারা পৃথিবীর কাছ থেকে ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করেও স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে। মূল্যহীন, দেহহীন ইহুদিরা ইতিহাসের বুকের উপরে চির ভ্রাম্যমাণ।

ইহুদিদের ওপর প্রথম অত্যাচার শুরু হয়েছিল মিশরে। আজও পৃথিবীর একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্রের প্রবলতম শত্রু মিশর। তিন হাজার বছরেরও আগে আর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন সন্ত মোজেজের নেতৃত্বে ইহুদিরা মিশর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেই ঘরছাড়া মানুষদের জন্য

মোজেজের লোকান্তরের পর ইহুদিদের নেতা জেসুয়া বাহুবলে জয় করলেন প্যালেস্টাইন, স্থাপিত হল প্রথম ইহুদি রাজ্য।

প্যালেস্টাইনে কয়েকশো বছর সুখ ও সমৃদ্ধির সুখ দেখেছিল ইহুদিরা। তারপরেই রোমান আক্রমণ। যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু। রোমানরা শুধু প্যালেস্টাইনকে পদানত করেই খুশি হল না, প্যালেস্টাইন থেকে উচ্ছেদ করে দিতে শুরু করল ইহুদিদের। ইহুদিরা আবার বিবাগি, ঘরছাড়া। প্যালেস্টাইনের সমস্ত ইহুদি মন্দির ও ধর্মস্থান ধ্বংস করে দিয়েছিল রোমানরা, অবশিষ্ট ছিল মাত্র একটি দেয়াল— যে দেয়ালটির জন্য দেশ বিদেশের ইহুদিরা বিলাপ করতো।

প্যালেস্টাইনের এক অংশের এখন নতুন নাম ইজরাইল। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে এক অংশের নাম হল জর্ডন একটি আরও চলমান রাষ্ট্র। অপর অংশটি ইজরাইল নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন ইহুদি রাজ্য। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল আরবদের বিদ্বেষ। প্রায় দু-হাজার বছর পর মাতৃভূমি ফিরে পাওয়া এবং দেশ বিদেশ থেকে মানুষ এসে একটি নতুন রাজ্য গড়ে তোলার এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অভূতপূর্ব। এবং রোমাঞ্চকর সেই ইতিহাস।

চতুর্দশ শতকে যখন সারা ইউরোপ জুড়ে প্লেগের উপদ্রব দেখা দিল, ইতিহাসে যার নাম দিয়েছে ব্ল্যাক ডেথ। হাজার হাজার মানুষ মরতে লাগল বিনা চিকিৎসায়, তখনও দোষ পড়লো ইহুদিদের ওপর। ওরা জাদুকর, ওরা মন্ত্র জানে, ওরা শয়তান, ওরা খারো। এই রব উঠল। প্রথম এড ওয়ার্ড ইংল্যান্ড থেকে সমস্ত ইহুদিদের বিদায় করে দিলেন। রাশিয়াতেও চরম অত্যাচার হয়েছে— জারেরা প্রচার করলেন, খ্রিস্টানদের রক্ত না হলে ইহুদিদের কোনওরকম পূজা-আচ্চা হয় না। সুতরাং ইহুদিদের পুড়িয়ে মারার ঢালাও হুকুম। পোলান্ডে কসাক আক্রমণের সময় পাঁচ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। ১৮৮১ সালে রাশিয়ার খবর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হন সন্ত্রাসবাদীদের বোমার আঘাতে। সন্ত্রাসবাদীদের দলে ছিল একটি ইহুদি মেয়ে, সেই মেয়ের অপরাধে রাশিয়ায় গ্রহণ করা হয়েছিল ধারাবাহিক ইহুদি নিধন পরিকল্পনা, 'প্রোগ্রোম'। লক্ষাধিক ইহুদি মরেছিল সেই সময়।

তবে ইহুদি হত্যার চরম কৃতিত্ব পাবার অধিকার হিটলার। পরশুরামের পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন করার পরিকল্পনার আধিপত্য ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের। এই দুই শক্তি সে সময় একটি বিখ্যাত চাল চালে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত হবার পর্যায়ে এসে। তুরস্ক যোগ দিয়েছিল জার্মানির সঙ্গে— তাই তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের খেপিয়ে দেবার জন্য ঘোষণা করা হল যে, যুদ্ধ শেষ হলে এবং ইংল্যান্ড ফ্রান্স জয়লাভ করলে—আরবদের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

নেল লরেন্স—'মরুভূমির লরেন্স' নামে যিনি খ্যাত—তাকে লাগানো হল আরবদের সঙ্ঘ-বদ্ধ করার কাজে। আর অন্যদিকে, ইহুদিদেরও জানানো হল যে যুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের স্বাধীন রাজ্য দেওয়া হবে—এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জার্মানির ইহুদিরা যাতে জার্মানির পক্ষে লড়াই না করে। ইহুদিদের প্রতি সেই ঘোষণা, 'বালফোর ডিক্লারেসান' নামে খ্যাত। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ ফরাসীরা কোনও প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেননি। তখন শুরু হল আরব ইহুদিদের পৃথকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা। এতকাল পর তারপর নিজেদের বুকের ওপর আর একটি বিদেশি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। কারণ এতদিনে ইহুদিদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ইউরোপীয়দের মতো হয়ে গেছে—সুতরাং স্বদেশে ফিরলেও তারা এখন পুরোপুরি সাহেবি। এই দ্বিমুখী শত্রুতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসে গোপনে লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ইহুদিরা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারল।

ইহুদিদের প্রতি খ্রিস্টান ও মুসলমান—দুই ধর্মাবলম্বীরাই বিদ্বেষী। কারণ প্যালেস্টাইনে

জেরুসালেম শুধু ইহুদিদের নয়, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামেরও পবিত্র তীর্থ। জেরুজালেম যিশুখ্রিস্টের স্মৃতি বিজড়িত। আবার রোমানরা এই নগর ধ্বংস করে যাওয়ার পর ইহুদি মন্দিরের শেষ দেয়ালটির পাশে খলিফা ওমর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই দেয়াল ইহুদিদের কাছে মহা পবিত্র : 'উইপিং ওয়াল,' অশ্রু প্রাচীর নামে পরিচিত। সেই দেয়ালের সেখানে কপাল ঠুকে ইহুদিরা যখন কাঁদে— তখন মুসলমানরা মনে করে যে ওমরের মসজিদের অবমাননা করা হচ্ছে।

ইহুদিদের সঙ্গে আরবদের জীবনযাত্রার অনেক তফাৎ। ইহুদিরা আরবদের তুলনায় অনেক শিক্ষিত, ধনবান এবং বিজ্ঞানের সাহায্যপুষ্ট। সুতরাং আরবদের বিদ্বেষ থাকা সংগত। সঙ্গে আছে ধর্মবিদ্বেষ। অতএব ইজরাইল রাষ্ট্রকে ধ্বংসে করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলি মিলিত-ভাবে উদ্যোগী। মিশরের নাসের সেই দলের নেতা। সমস্ত প্রতিবেশী শত্রু দেশগুলির মধ্যে ঘেরা অবস্থায় ইজরাইল নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

সম্প্রতি ইজরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলির বিবাদ নতুন রূপ নিয়েছে। আমেরিকা ইজরাইলকে সাহায্য করে। পশ্চিম জার্মানি পূর্ব পাপের স্খালন হিসাবে ইজরাইলকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করছে। অপর পক্ষে মিশরও আমেরিকায় জার্মানির সাহায্য করছে। কিন্তু ইজরাইলের যে বন্ধু, সে কখনও মিশর বা কোনও আরব রাষ্ট্রের বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং নাসের চাইছেন পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে সমগ্র আরব দুনিয়ার সম্পর্ক ছেদ করতে এবং আমেরিকার প্রতি অভিমানে ঝুঁকে পড়ছেন রাশিয়ার দিকে।

আরব, ইজরাইল ও পশ্চিমি শক্তির বর্তমান মনকষাকষি ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্বের মতোই জটিল।

ছবির দেশে কবিতার দেশে

॥ ১ ॥

"আমি খুলে ফেলি পোশাক ও টুপি সেই মুহূর্তে
বালির ওপর উলঙ্গ দেহে চিৎ হয়ে শুই
বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।"

—জাঁ ককতো

আমি দেশের বাইরে গিয়ে জীবনে প্রথম যে-বিদেশের মাটিতে পা রাখি, সেটা ফরাসিদেশ। সে অনেককাল আগেকার কথা।

আমার তখন অল্প বয়েস, বেশ গড়া-পেটা শরীর স্বাস্থ্য, ঝুঁকিবহুল জীবন কাটাতে ভালোবাসি। হঠাৎ হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে বনে-পাহাড়ে চলে যাই, কিংবা সিমলা-হায়দ্রাবাদের মতন বড় শহর দর্শন করতে গিয়ে পয়সার অভাবে এক-আধদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিই। কিংবা মধ্যরাত্রে কলকাতা শহরে অকারণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মারামারি বাঁধিয়ে পুলিশের গুঁতো খাই, গারদে চোর-পকেটমারদের সঙ্গে রাত কাটাই। তবু কিছুই গায়ে লাগে না, সবই যেন মজা। স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের মধ্যে জীবনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা।

কিন্তু আমার বিদেশ যাওয়ার, বিশেষত সাহেবদের দেশে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সে বড় দামি, দুর্লভ ব্যাপার।

যদিও অল্প বয়স থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব ভ্রমণের। বলা যেতে পারে, কাটা মুণ্ডের দিবাস্বপ্ন। কিংবা অন্ধের অভ্র-পুষ্প চয়ন। আমি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু ও অতি গরিব পরিবারের সন্তান, কলেজ জীবনের শুরু থেকেই একাধিক টিউশনি ও নানারকম খুচখাচ পার্ট টাইম কাজ করে পড়াশুনো চালিয়েছি, তাই পড়াশুনোয় খুব মন দিতে পারিনি। তেমন একটা মেধাবী ছাত্রও ছিলাম না। তা ছাড়া সেই সময় থেকেই মাথায় কবিতা লেখার পোকা ঢোকে, লিট্‌ল ম্যাগাজিন বার করা ও কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আড্ডা মারাটাই পরমার্থের মতন মনে হত। খুব ভালো ছাত্র ছাড়া অন্য কারুর সে সময়ে বিদেশে যাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। ধনী ব্যক্তিরা যে নিজ ব্যয়ে বিদেশ ভ্রমণে যেতেন আগে, তাও পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে ফরেন এক্সচেঞ্জ কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য ভারত সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মনসা মথুরা ব্রজ। বিভিন্ন লেখকের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে এবং গ্লোব ও ম্যাপ সামনে রেখে আমি পৃথিবী পরিক্রমা করেছি বহু অলস দুপুরে। ম্যাপ দেখা ছিল আমার প্রিয় নেশা। স্নানের সময় বাথরুমের নিভৃতিতে কখনও আমি স্পেনের জলদস্যু, কখনও আলাস্কার অভিযাত্রী। কাল্পনিক তলোয়ার এতবার চালিয়েছি যে আমার ধারণা হয়েছিল আমি ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের সঙ্গে লড়ে যেতে পারব।

যাই হোক, দারিদ্র্য, বাউণ্ডুলেপনা ও কবিতা নিয়ে হইহই করে দিন-টিন বেশ ভালোই কাটছিল, এমন সময় অকস্মাৎ আমার জীবনে একটা পরিবর্তন এসে গেল।

মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ছিল তখন কলকাতার একটি বিশিষ্ট উৎসব। বাংলার সবরকমের পল্লীগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের এমন মিলিত অনুষ্ঠান এখন আর হয় না। বড় চমৎকার ছিল ব্যাপারটা। আমি এবং আমার বন্ধুরা অল্প বয়েস থেকেই গান পাগল। বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের বেশি দামের টিকিট কেনার সামর্থ্য ছিল না বলে আমরা ফুটপাতে খবরের কাগজ পেতে রাতের পর রাত সেই গান শুনতে গিয়ে কাটাতাম। এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রাঙ্গণও ছিল তরুণ কবিদের একটি আড্ডাস্থল। কয়েকবার আমরা এখানে কবিতার স্টল দিয়েছি, লোকজনদের জোর করে ধরে এনে কবিতার বই গছিয়েছি, 'যে কবিতা পড়ে না, তার বেঁচে থাকা উচিত না', এই ধরনের চিৎকারে গলা ফাটিয়েছি। একবার এক টুকটুকে ফরসা বৃদ্ধা মহিলাকে ডেকে এনে বলেছিলাম দিদিমা, আমাদের কবিতা কিনুন। তিনি বললেন, দু-চার লাইন পড়ে শোনাও তো! আমাদের কেউ একজন খুব ভাব দিয়ে পড়তে লাগল, কয়েক লাইন শোনার পর সেই বৃদ্ধা ফিক করে মিষ্টি হেসে বললেন, এখন আর আমি এসব বুঝতে পারব না, দাঁত নেই।

এক সন্ধেবেলা সেই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে আমরা জটলা করে বসে আছি। কেউ ঘাস ছিঁড়ে দিচ্ছি দাঁতে, কেউ একটা সিগারেট ধরাতেই অন্য একজন চেয়ে নিচ্ছে। খুব কাছ থেকেই ভেসে আসছে গান। আমরা এক কান দিয়ে গান শুনছি, অন্য কান আড্ডায়। এমন সময় রঙ্গস্থলে একজন সাহেবের প্রবেশ।

কলকাতায় তখনও সাহেব-মেম তেমন কিছু দুর্লভ ছিল না। আমার পরাধীন আমলে জন্ম, রাস্তায়-ঘাটে সাহেব-মেম দেখেছি প্রচুর। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বেশ কিছু ইংরেজ থেকে গিয়েছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিল চোখে পড়বার মতন। পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত চৌরঙ্গি-পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলকে বলা হত সাহেবপাড়া। তখনও এক শ্রেণির বাঙালি বা মাড়োয়ারির ছেলেরা এরকম সাহেব হয়নি, যুবকরা প্যান্ট পরা শুরু করলেও ধুতি বর্জন করেনি একবারে। বিদেশ থেকেও অনেক সাহেব-মেম আসত কলকাতায়। বেশ সুন্দর, ঝকঝকে, প্রাণ-চাঞ্চল্যময় এই শহরটিকে সেই সময়ে কেউ 'আবর্জনা নগরী' কিংবা 'মৃত নগরী' আখ্যা দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ভারতের প্রথম ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একবার কলকাতাকে শুধু 'মিছিল নগরী' বলায় বাঙালিদের কাছ থেকে বেশ ভর্ৎসনা পেয়েছিলেন।

অনেক বিদেশিরা আসতেন কলকাতায়, তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু কবি-লেখক-শিল্পীরও দেখা পাওয়া যেত। ষাটের দশকের শেষার্ধে উগ্রপন্থা সারা পৃথিবীকেই কাঁপিয়ে দেয়। তারপর থেকে একটু নামকরা ব্যক্তিরা কেউ আর পৃথিবীর কোনও দেশে সহজ সাবলীলভাবে ঘোরাফেরা করতে পারেন না। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী পালমে-হত্যা মানব-ইতিহাসের একটি অতি কলঙ্কজনক ঘটনা। আমি যখনকার কথা বলছি, ষাটের দশকের শুরু, তখনও বহু রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রদূত, রাজনৈতিক নেতারা শরীর-প্রহরী বিনাই থিয়েটার-সিনেমা দেখতে যেতেন, সন্ধেবেলা রাস্তায় ইচ্ছেমতন একলা বেড়াতে বেরুতেন। পাবলো নেরুদা কিংবা স্টিফেন স্পেন্ডার কলকাতায় ঘুরে গেছেন যথেচ্ছভাবে। আঁদ্রে মালরো যখন ফরাসিদেশের মন্ত্রী, তখনও তিনি দিল্লিতে এসে একা ঘুরে বেড়িয়েছেন। সুতরাং হঠাৎ কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিকে দেখলে আমরা চমকে উঠতাম না। বিদেশি পর্যটকদের কাছে তখনও কলকাতা ছিল একটা অবশ্যদ্রষ্টব্য স্থান।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে সেদিন আমাদেরই কোনও প্রৌঢ়-পরিচিত যে সাহেবটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তাঁর নাম পল এঙ্গেল, বেশ দীর্ঘকায়, সুঠাম চেহারা, বয়েসে প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তিনি একজন অধ্যাপক ও কবি। সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ভাস্কর দত্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়,

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যাঁদের বলা হত কৃত্তিবাসের দল, তাঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পল এঙ্গেল যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি কথা বলেন জোরে জোরে, হাসেন গলা ফাটিয়ে, বেশ একটা সারল্য ফুটে ওঠে তাঁর ব্যবহারে। তিনি আসছেন অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে, ভারতে এসেও দিল্লি-বোম্বাইতে বহু কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে, কলকাতাতেও প্রবীণ-প্রখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর, আমাদের সঙ্গেও বেশ আড্ডা জমে গেল।

এর পরের তিন-চারদিন তিনি ঘোরাঘুরি করলেন আমাদের সঙ্গে, কলকাতার কিছু কিছু জায়গা তাঁকে দেখালাম আমরা। নিমতলা শ্মশানঘাটটি ছিল আমাদের একটি প্রিয় জায়গা, রবীন্দ্রনাথকে যেখানে পোড়ানো হয়েছিল, সেই ঘেরা স্থানটিতে দাঁড়িয়ে রাত্রির গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আঃ কী সুন্দর। তিনি তাঁর কবিতা পড়ে শোনালেন আমাদের, আমরাও আমাদের দুর্বল ইংরিজি অনুবাদে কবিতা পাঠ করলাম, সেই সঙ্গে পানাহার ও হাসিঠাট্টা, শক্তি-শরৎকুমার ও ভাস্কর দত্ত যেখানে উপস্থিত থাকে, সেখানে 'নেভার এ ডাল মোমেন্ট' যাকে বলে।

এরপর পল এঙ্গেল পাড়ি দিলেন ফিলিপিনস হয়ে জাপানের দিকে। আমরাও মন দিলুম যে যার ভাবনায়। আমি কয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম চাইবাসা-হেসাডি'র দিকে। ফিরে এসে দেখি বড় বড় স্ট্যাম্প লাগানো একটি বিদেশি খাম আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। পল এঙ্গেল চিঠি লিখেছেন জাপান থেকে। তিনি জানতে চেয়েছেন, আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে আমি যোগ দিতে রাজি আছি কি না। আমার প্লেন ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ ওঁরাই দেবেন।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমে আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এই পল এঙ্গেল। তিনি অক্সফোর্ডে পি.এইচ.ডি করেছেন এবং রোডস স্কলার, কিন্তু অধ্যাপনার চেয়েও কবিতার প্রতিই তাঁর বেশি ঝোঁক। তিনি কবিদের বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, তাঁর ধারণা পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তেই যে যে কবিতা লেখে, তারা সবাই সবাইকার আত্মীয়। মাঝে মাঝে তিনি আত্মীয়-সম্মিলন ঘটাতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজি সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে তিনি এই ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম খুলেছেন, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, এমনকী সেই চরম কোলড ওয়ারের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ান, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি থেকেও, কবিদের আমন্ত্রণ করে আনেন। সেখানে পারস্পরিক মেলামেশা, কবিতা পাঠ, আলোচনা, অনুবাদ এই সব হয়। খরচ চালাবার জন্য তিনি আমেরিকার বড়লোক চাষা ও কিছু কিছু কোম্পানির মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা তোলেন, আমেরিকার সরকারের সঙ্গে এ উদ্যোগের কোনও সংস্পর্শ নেই। পৃথিবীতে কোথাও যে কবিদের জন্য এরকম একটি কেন্দ্র আছে, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। পল এঙ্গেল খাটতে পারেন দৈত্যের মতন, তিনি একার চেষ্টায় যে এরকম একটি কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন, তা অনেকটা অবিশ্বাস্য লাগে, কিন্তু পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু খ্যাপাটে লোক আছে বলেই তো পৃথিবীটা এত বর্ণময়। পরবর্তী কালে অবশ্য এই কেন্দ্রটি অনেক বড় হয়েছে, প্রায় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আফ্রিকার কালো দেশ, সোসালিস্ট দেশ, আরব দেশ, আমাদের মতন গরিব দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের শত শত কবি ও লেখক ওই আয়ওয়ার মতন ছোট্ট শহরে থেকে এসেছেন পল এঙ্গেলের আমন্ত্রণে। আমার পরে ওখানে গিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কবিতা সিংহ প্রমুখ, ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকেও অনন্তমূর্তি, দিলীপ চিত্রের মতন বর্তমানের খ্যাতিমানেরা।

আমার কাছে সেই চিঠি একটা বিরাট লটারি প্রাপ্তির মতন হলেও প্রথমে বেশ কয়েক ঘণ্টা আমার খুবই বিমূঢ় অবস্থায় কেটেছিল। প্রস্তাবটি এমনই অপ্রত্যাশিত যে প্রায় অলীকের পর্যায়ে পড়ে। এত কবি-লেখক থাকতে আমার মতন নগণ্য একজনকে ডাকা হল কেন? আমি অবশ্য নিজেকে নগণ্য মনে করতাম না, তখন সদর্পে কৃত্তিবাস নামে কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করছি, বাংলা কবিতা নিয়ে খুব একটা ভাঙচুর করার স্পর্ধা পোষণ করি মনে মনে, তবু সাংসারিক দারিদ্র্যের জন্য বাইরে একটা হীনমন্যতা বোধ কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারি না। কিছুদিন আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে

অপরিণত বয়েসে, ভাই-বোনেরা ছোট ছোট, পারিবারিক দায়িত্ব অনেকটা আমার কাঁধে। আমার সাংঘাতিক ভ্রমণের নেশা, তবু চোদ্দো হাজার মাইল দূর থেকে হুট করে ডাক এলেই তো যাওয়া যায় না। দু'চারদিনের ব্যাপার নয়, যেতে হবে বছরখানেকের জন্য।

দোনামনা করে কাটল বেশ কয়েকটা দিন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কয়েকজনকে জানাতে তারা অবশ্য উৎসাহ দিতে লাগল খুব। আমাদের কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর মধ্যে তখন একমাত্র শরৎকুমারেরই বিদেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল, পড়াশুনো করার জন্য তিনি এর মধ্যেই ক'বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছেন, তিনি ভরসা দিতে লাগলেন অনবরত। এমনও জানা গেল, আমেরিকায় ওঁরা আমাকে যা হাত খরচ দেবেন, তার থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে দেশে নিজের পরিবারের জন্য পাঠানো যেতে পারে। ওখানকার এক টাকা, দেশে পাঁচ টাকা। দু-তিন মাস অন্তর দেশে একশো ডলার পাঠালেই পাঁচশো টাকা, ষাটের দশকের গোড়ায় পাঁচশো টাকা মানে যথেষ্ট টাকা, ইস্কুল মাস্টারদের মাইনে দেড়শো টাকার বেশি হত না, পোনা মাছের কিলো ছিল সাড়ে তিন টাকা।

তখনও হিপি-আন্দোলন শুরু হয়নি, হিপি শব্দটাই ছিল অজ্ঞাত। হিপিরা এসে সারা বিশ্বে একটা পোশাক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। পুরোনো আমলের লোকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, হিপিরা আসবার আগে লন্ডনের রাস্তায় টাই না পরা পুরুষ দেখাই যেত না। প্যান্টের মধ্যে শার্ট না গুঁজে কেউ বাইরে বেরুলে অন্য লোকেরা ভুরু কুঁচকে বলত, বাথরুমের পোশাক পরে রাস্তায় এসেছ কেন? বহু হোটেল রেস্তোরাঁয় পোশাকের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল। দিনের বেলা নেমন্তন্নে একরকম সাজ, রাত্তিরের নেমন্তন্নে আর একরকম। মোজার সঙ্গে টাইয়ের রঙের সামঞ্জস্য থাকা চাই। হিপিরা এইসব নিয়ম কানুন ভেঙে দেয়। নীল রঙের জিন্স যা ছিল কুলি-মজুরদের পরিধেয়, তা জাতে ওঠে। এখন জিন্স আর গেঞ্জি পরে পৃথিবীর সর্বত্র ঘোরা যায়। কিন্তু তখনও সেই স্বর্ণযুগ আসেনি। কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ কলকাতার রাস্তায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরতেন, কিন্তু দেশে ফেরার সময় তাঁকে ওই পোশাকে প্লেনে উঠতে দেওয়া হয়নি, তাঁকেও প্যান্ট-কোট-টাই কিনতে হয়েছিল।

সুতরাং আমারও একটা ওইরকম পোশাক চাই। আমি তখন ওয়াছেল মোল্লার দোকান থেকে কেনা রেডিমেড প্যান্ট পরি, চৌরঙ্গির ফুটপাত থেকে শার্ট কিনি আর পায়ে বাটা কোম্পানির সাত টাকা নিরানব্বই পয়সা দামের চটি। একরঙা প্যান্ট-কোট, যাকে স্যুট বলে, তা আমাদের বংশে কেউ কখনও গায়ে দেয়নি। ওরকম এক প্রস্ত তো কিনতে হবেই। সাহেবদের দেশে যে হেতু বরফ পড়ে, তাই আমাদের ধারণা ছিল, ওসব দেশে সারাবছরই খুব শীত। তখন অগাস্ট মাস, তবু বানানো হল একটা আধো উলের স্যুট, তার খরচ পড়ল পাঁচশো টাকা, শরৎকুমার এবং ভাস্কর দত্ত দুজনে ভাগাভাগি করে সেই টাকাটা দিয়েছিলেন।

এরপর পাসপোর্ট। ওঃ, সে কথা ভাবলে গায়ে এখনও জ্বালা ধরে। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে যে-কোনও নাগরিকেরই পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তখন পাসপোর্টের জন্য কী হয়রানিই না ছিল। দিনের পর দিন পাসপোর্ট অফিসে ঘোরাঘুরি করি, ধমক খেয়ে ফিরে আসি। এদিকে পয়লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছোতে না পারলে আমন্ত্রণটাই নষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল তারকা নই, নামকরা কোনও পরিবারের সন্তান নই, নিতান্তই এক হেঁজিপেজি এবং নিছক বাংলা কবিতা লিখি, তবু আমাকে বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয় প্লেন ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবে, এক বছর থাকতে-খেতে দেবে, এটা যেন পাসপোর্ট অফিসারের কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। প্রত্যেকবার হাজাররকম জেরা এবং প্রত্যাখ্যান। রাগের চোটে এক এক সময় মনে হত ঘুষি মেরে লোকটার দাঁত ভেঙে দিই! রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে হোম সেক্রেটারি চিফ সেক্রেটারিকে ধরাধরি করেছি, কোনও কাজ হয়নি, এমনকী দিলীপ দত্ত নামে এক বন্ধুর আত্মীয়তা সূত্রে গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। এখন যেমন পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবিচারের কথা খুব শোনা যায়, কংগ্রেস আমলেও এই সুরই ছিল। 'রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ', এই বাক্যবন্ধটি খবরের

কাগজে আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আমার পাসপোর্টের জন্য টেলিফোন করলেন, তবু কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসার তা অগ্রাহ্য করলেন। সেই অফিসারটি আমায় বলেছিলেন, আমি কি প্রফুল্ল সেনের কাছ থেকে মাইনে পাই? এরপর একটা ম্যাজিকের মতন ব্যাপার হল। তারাপদ রায়ের মেসোমশাই দেবী রায় এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার, তখন লালবাজারের ডি সি ডি ডি। তারাপদ রায় আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর মেসোর কাছে, মেসো মুচকি হেসে বললেন, হয়ে যাবে। তখন আর মাত্র একটা দিন বাকি।

কলকাতা বিমানবন্দরটি সেই সময়ে এমন রুগ্‌ণ হয়ে যায়নি, বহু বিদেশি বিমান এখানে ওঠা-নামা করত। আমার টিকিট ছিল প্যান অ্যামের, রাত দুটোয় যাত্রা। আগের দিন পর্যন্ত ধারণা হয়েছিল যাওয়াই হবে না, শেষ মুহূর্তে পাসপোর্ট সংগ্রহ, ভিসা, রিজার্ভ ব্যাংক ক্লিয়ারেন্স ইত্যাদির জন্য ছোটাছুটি করতে গিয়ে ক্লান্তিতে আমি কুকুরের মতন জিভ বার করে হাঁপাচ্ছিলাম। তবু সব ক্লান্তি মুছে গিয়েছিল বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসায়। আমাদের দমদমের বাড়িতে প্রচুর বন্ধু এসেছিল আমাকে বিদায় জানাবার জন্য, বেহালা থেকে এসেছিলেন অরবিন্দ গুহ, সে রাতে আর তিনি বাড়ি ফিরতেই পারেননি। অবশ্য সব বন্ধুই যে খুশি হয়েছিল তা নয়, দু-একজন খুবই ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার মুখ দেখা বন্ধ করেছিলেন। যেন আমাকে নির্বাচন করা আমারই অপরাধ। এ জন্য আমার মনে অবশ্য খানিকটা লজ্জার ভাবও ছিল।

অগাস্ট মাসের গরমে, গরম স্যুট পরে, শু-মোজা পায়ে, গলায় মেরুন টাই বেঁধে, নব কার্তিকের মতন চেহারায় ঘামতে ঘামতে উঠলাম বিমানে। আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিমানটি প্রথম থেমেছিল করাচিতে। অস্পষ্ট উষালোকে করাচি বিমানবন্দরের বাংলা অক্ষরে নাম লেখা দেখে রোমাঞ্চ হয়েছিল। এখন নিশ্চয়ই সেই বাংলা নাম মুছে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিরতি রোমে, তখন আমি ঘুমন্ত। তারপর প্যারিসে পৌঁছে আমাদের বিমান থেকে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল ট্রানজিট লাউঞ্জে। সারারাত ঘুমিয়ে সব অবসাদ দূর হয়ে গেছে, ঠোঁট থেকে মুছে গেছে আগের দিনের হয়রানির বিরক্তি, শরীর বেশ টাটকা, ঝরঝরে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ আমার রোমাঞ্চ হল। গতকাল সকালেও ভেবেছিলাম পাসপোর্ট পাব না, এখন আমি সত্যি বিদেশে এসে গেছি। প্যারিস, এই সেই প্যারিস?

আমাদের চোখে তখন ফ্রান্স ছিল স্বর্গের সমতুল্য। অগণন শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের লীলাভূমি। কে যেন বলেছিলেন, প্রত্যেক শিল্পীরই দুটি মাতৃভূমি, একটি, যেখানে সে জন্মেছে, অন্যটি হল ফ্রান্স। এখানেই ছিলেন দেগা, মোনে, মানে, গগ্যাঁ, মাতিস, রুয়ো-র মতন মহান শিল্পীরা, এখনও এখানে ছবি আঁকছেন পিকাসো। র‍্যাঁবো-ভের্লেন-বোদলেয়ার-মালার্মে-ভালেরি-আঁরি মিসোর মতন কবিদের এই দেশে আমি সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে আছি?

সেই সময় আমি আমেরিকার সাহিত্য বিশেষ কিছু পড়িনি। তখনও টিভি আসেনি, মিডিয়ার এমন ব্যাপক প্রসার ছিল না, আমেরিকা ছিল ভূপৃষ্ঠের অন্যদিকের বহুদূরের দেশ। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আমেরিকার যতটা পরিচিতি ছিল, সেই তুলনায় ওখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জানা ছিল না, হলিউডের ফিল্ম ছাড়া। তখন আমরা অনেকেই ফরাসি সংস্কৃতি ও কাব্যে বিভোর। এলেইন মার্কস সম্পাদিত 'ফ্রেঞ্চ পোয়েট্রি ফ্রম বোদলেয়ার টু দা প্রেজেন্ট' নামে বইখানি ছিল আমার প্রতিদিনের সঙ্গী, সে যাত্রাতেও সুটকেসে নিয়েছি।

শার্ল দ্যগলের নামে এয়ারপোর্ট তখনও তৈরি হয়নি, দ্যগল সে সময়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। ওর্লি বিমানবন্দরের কাচের দেওয়ালে নাক ঠেকিয়ে আমি প্যারিস নামক অমরাবতীকে দেখার চেষ্টা করছি, আর মনে মনে আবৃত্তি করছি ভাঙা ভাঙা কবিতার লাইন। জাঁ ককতোর একটি কবিতাই বেশি মনে পড়েছিল, কারণ সেই কবিতায় একজন ভারতীয়'র উল্লেখ আছে :

'...বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নীচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়...'

আমিই সেই ভারতীয়। আমার গায়ের চামড়া জলপাই রঙের, আমি এসেছি জাঁ কক্‌তো'র শহরে।

এক সময় বলা হত, প্যারিস শহরের প্রধান দুটি দ্রষ্টব্য হল, ইফেল টাওয়ার আর জাঁ কক্‌তো। তিনিই এখানকার এক নম্বর নাগরিক। একাধারে তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। নিজে ফিলম্ ও নাটক পরিচালনা করেছেন, নিজে তাতে অভিনয়ও করেছেন। সাহিত্য শিল্পের যে-কোনও শাখায় তিনি স্মরণীয়। বিদগ্ধ নাগরিকতার উজ্জ্বল প্রতিভূ। প্যারিসের অদূরে তাঁর জন্ম, এখানেই তাঁর মৃত্যু। কী অসাধারণ সেই মৃত্যুদৃশ্য। বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এদিথ্ পিয়াফ ছিলেন কক্‌তোর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দুজনের জীবনে কী প্রচণ্ড অমিল, আবার কী দারুণ মিল। কক্‌তো ধনী পরিবারের সন্তান, আর এদিথ্ পিয়াফ ছিলেন পথের ভিখারিনী। চোর-গুণ্ডা-খুনে ও বেশ্যাদের মধ্যে প্রতিপালিত এই গায়িকাটি নিজের প্রতিভার জোরে উঠে এসেছিলেন সমাজের শীর্ষে। এক সময় কক্‌তো আর পিয়াফ দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, দুজনেই মৃত্যু শয্যাশায়ী, কক্‌তো প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় লোক পাঠাচ্ছেন পিয়াফ কেমন আছে জেনে আসতে। তারপর এক সময় প্রায় একই সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন দুজনে। অমরলোক যদি কিছু থাকে, তবে সেখানে ওই দুজনের নিশ্চয়ই আবার দেখা হয়েছে।

আমি কবিতা নিয়ে মগ্ন হয়ে আছি, কত সময় কেটে গেছে জানি না, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কীরকম যেন একটা উদ্ভট শব্দ শুনতে পেলাম। গ্যাগো প্যাডিই-ই-ই...শুনিল গ্যাগো প্যাডি-ই...। আরে এটা আমার নাম নাকি। আমি ছুটে কাউন্টারে যেতেই একজন উত্তেজিতভাবে ফরাসিতে কী যেন বলতে লাগল, আমি যত বলি যে জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে, আমি ফরাসি ভাষা জানি না, তবু সে থামে না। শেষ পর্যন্ত একজন ইংরেজি জানা লোক এসে বলল, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে? ওই দ্যাখো, তোমার প্লেন ছেড়ে যাচ্ছে।

আমি সেদিকে দৌড় লাগাতে যেতেই সে আমার হাত ধরে বলল, সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে দেখছ না? তোমার আর ওই প্লেনে যাওয়া হবে না।

আমি আঁতকে উঠলাম। বলে কী? ওই বিমানে আমার সুটকেস রয়েছে। আমার পকেটে মাত্র আট ডলার। আমি এখানে কারুকে চিনি না, এখন কোথায় যাব?

॥ ২ ॥

"কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুরি
ভুলবো না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিঃশ্বাস
বসন্তে আরও লুকানো যে মঞ্জরী..."

—লুই আরাগঁ

আমি যখন প্রথম বিদেশে যাই, তখনও জাহাজের যুগ পুরোপুরি শেষ হয়নি, বিমানের যুগ শুরু হয়ে গেছে। আগেকার দিনে আমরা কত ভ্রমণকাহিনিতে জাহাজযাত্রার বর্ণনা পড়েছি। সমুদ্রপৃষ্ঠে তৈরি হয়েছে কত রোমান্স, গল্প-উপন্যাস। স্বদেশ ছেড়ে বিদেশযাত্রার সময় জাহাজের আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও অন্যান্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিনের মেলামেশায় মনকে অনেকটা প্রস্তুত করে তোলে,

একটা কালচার শক হয় না। সেই তুলনায় বিমানভ্রমণের কয়েকটি ঘণ্টা নিতান্তই বর্ণহীন।

সেই সময় আমার পরিচিত নামকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই, যেমন অমর্ত্য সেন, নবনীতা দেবসেন, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত প্রমুখ, সমুদ্রপথেই প্রবাসে গিয়েছিলেন। আমারও বাল্যকাল থেকেই সমুদ্রভ্রমণের স্বপ্ন ছিল। বাচ্চা বয়েসে যখনই কেউ আমাকে জিগ্যেস করত, তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও, আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিতাম, নাবিক! অথচ প্রাপ্ত বয়েসে আমাকে প্রথম সমুদ্র ডিঙোতে হল, হনুমানের মতন, আকাশপথে।

এখন অনেক বাচ্চা ছেলেও জানে, ট্রানজিট লাউঞ্জ কাকে বলে, কিংবা নির্দিষ্ট দিনে বিমানে না চাপলেও আন্তর্জাতিক টিকিট নষ্ট হয় না। কিন্তু সেই সময়ে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কারুরই বিদেশে বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতা ছিল না। কেউ আমাকে কিছু বলে দেয়নি, টিকিটটি একেবারে শেষ মুহূর্তে পেয়েছিলাম বলে বিমান কোম্পানির লোকেরাও কোনও পরামর্শ দেয়নি আমাকে। সেইজন্যই, প্যারিসে আমার নির্দিষ্ট ফ্লাইট ধরতে না পেরে আমি যৎপরোনাস্তি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আমার আর আমেরিকায় যাওয়া হবে না, এখান থেকেই বা দেশে ফিরব কী করে। প্যারিসে আমায় পড়ে থাকতে হবে, এখানে একজনকেও চিনি না, পকেটে মাত্র আটটি ডলার। ক্লোশার নামে এক ধরনের ভিখিরির কথা পড়েছি ফরাসি উপন্যাসে, আমাকেও সেন্ নদীর ব্রিজের তলায় সেইরকম ভিখিরিজীবন কাটাতে হবে।

আমার ছটফটানি ও ব্যাকুলতা দেখে তিন-চারজন বিমানকর্মী ঘিরে ধরল আমাকে, হাত-পা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে ভয় নেই, ঘণ্টাচারেক বাদে অন্য এয়ার লাইনসের এক বিমানে আমাকে তুলে দেওয়া হবে, আমার সুটকেস নিউইয়র্কে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। তাতেও খুব একটা ভরসা পেলাম না। নিউইয়র্কের বিশাল এয়ারপোর্টে কীভাবে একটা সুটকেস খুঁজে বার করতে হয়, তাই বা কে জানে।

সেই অপেক্ষার সময়টা নানারকম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটছিল, হঠাৎ একসময় মনে হল, দুর ছাই। যা হওয়ার তা হবে! আমি বসে আছি প্যারিসের বুকে, আর শুধু শুধু সুটকেস, টিকিট, টাকা-পয়সার মতন বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করছি! এই চার ঘণ্টায় শহরটা খানিকটা ঘুরে দেখা যেতে পারত, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে দেবে না, আমি বিমানবন্দরেরই চতুর্দিকে টহল মারতে লাগলাম, যদি কোনও দিকের কাচের দেওয়াল দিয়ে এই কবি-শিল্পীদের স্বর্গস্থানটি দেখা যায়। যা দেখা যায়, তা যৎসামান্য, আশ মেটে না। সোফাগুলিতে গা এলিয়ে যে-সব যাত্রী-যাত্রিণীরা বসে আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ ফরাসিদেশের বড় শিল্পী কিংবা খ্যাতিমান কবি। একজন দাড়িওয়ালা মধ্যবয়স্ক সাহেব নোটবই খুলে কী যেন লিখছেন। বার্নার্ড শ' চলন্ত বাসে নোট বইতে নাটকের সংলাপ লিখে রাখতেন। এখানেও বোধহয় কোনও কবি মহাকাব্য রচনা করেছেন। লোভ হয় পাশে গিয়ে উঁকি মারতে, আবার দুর্মর সঙ্কোচে যেতেও পারি না।

পরে আমার এই ধরনের চিন্তার কথা শুনে মার্গারিট হেসে কুটিকুটি হয়েছিল। সে বলেছিল, দুর বোকা, ট্রানজিট লাউঞ্জে ফরাসি কবি-শিল্পীরা বসে থাকতে যাবে কেন? ওখানে তো আটকে থাকে শুধু বিদেশিরা। যে-লোকটা খাতা খুলে কিছু লিখছিল, সে নিশ্চয়ই ব্যাবসার হিসেবপত্র টুকে রাখছিল!

সেই চার ঘণ্টা কোনও একজন ব্যক্তির সঙ্গেও আমার আলাপ হয়নি। ফরাসি বলতে হবে এই ভয়ে মুখ খুলিনি।

আমি ফরাসি ভাষা জানি না। কিন্তু এই চমৎকার ভাষাটি শেখার একাধিক সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়েছি।

তখন কলকাতায় আমার পরিচিতদের মধ্যে দুজন ছিলেন ফরাসি ভাষাবিদ। প্রখ্যাত লেখক কমলকুমার মজুমদার এবং তৎকালীন বাংলা প্রকাশনা জগতের সবচেয়ে সাড়া জাগানো প্রতিষ্ঠান

সিগনেট প্রেসের অন্যতম অংশীদার সুনন্দ গুহঠাকুরতা। বুঢ়ঢা এই ডাকনামেই যে পরিচিত ছিল, সে আমাদের সমবয়েসি বন্ধু। বুঢ়ঢা পরবর্তীকালে হয়েছিল বহুভাষাবিদ, অন্তত পনেরো-ষোলোটি ভাষা, গ্রিকসমেত, সে লিখতে ও বলতে পারে। তার মতন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন মানুষ আমি দ্বিতীয় দেখিনি। এ দেশের দুর্ভাগ্য যে এরকম সুরসিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিটি বহুকাল দেশছাড়া।

কমলকুমার আমাদের প্রথম যৌবনের অ্যারিস্টটল। তিনি বহু বিষয়ে আমাদের দীক্ষাগুরু। অ্যারিস্টটলের মতনই কমলকুমারকে আমরা বসে থাকতে দেখেছি কদাচিৎ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা চলন্ত অবস্থায় তিনি কথা বলতেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন পেরিপাটেটিক দার্শনিক। কলেজ স্ট্রিট কিংবা ওয়েলিংটনের মোড়ই ছিল আমাদের আথেন্সের লাইসিয়াম।

কমলকুমারের গল্প-উপন্যাসের ভাষা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হলেও তাঁর মুখের ভাষা ছিল খাঁটি কলকাতার চলতি ভাষা, কলকাতার ককনিও বলা যেতে পারে। তার সঙ্গে মিশে থাকত ফরাসি শব্দ। ওয়েলিংটনের মোড়ে ভেজাল তেলে ভাজা হাঁসের ডিমের ওমলেট খেতে খেতে তিনি বলতেন, বঁ, সে বঁ! বেড়ে কাঁচালঙ্কার ঝালটি দিয়েছে, কী বলো? কিংবা, কোনও তরুণ কবিকে সস্নেহ ভর্ৎসনা করার সময় তিনি বলতেন, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না, বুঝলে। পভ্‌র পোয়েত্‌ ত্রাভাইয়োঁ।

কোনও রেস্তোরাঁ বা পানশালায় দাম দেওয়ার সময় তিনি টাকা বার করতেন কোনও বইয়ের পাতার ভাঁজ থেকে। সবসময়েই তাঁর হাতে থাকত এক একখানা ফরাসি বই, পুরোনো ক্লাসিক, ট্রামে-বাসে পড়তেন, আবার সেই বই-ই তাঁর মানিব্যাগ। সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি ও ধুতি পরিহিত এই বলিষ্ঠকায় মানুষটি একদিকে অত্যন্ত ভারতীয় আর্য, আবার ফরাসি সংস্কৃতিতে খুব বেশি আপ্লুত। ইংরেজদের তিনি পছন্দ করতেন না, এদেশের ইংরেজ-মনস্ক বাঙালিরা ছিল তাঁর উপহাসের পাত্র। এমনও তিনি বলেছিলেন যে, বঙ্কিমের আমল থেকেই বাংলা গদ্য লেখা হচ্ছে ইংরিজি সিনট্যাক্স-এ, এর বদলে ফরাসি গদ্যকে আদর্শ হিসেবে ধরলে আমাদের গদ্য অনেক উন্নত হত। সম্ভবত তিনি ফরাসি সিনট্যাক্স-এ বাংলা গদ্য লেখার চেষ্টা করেছেন। ফরাসি ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে, যেমন লাল গোলাপের বদলে গোলাপ লাল, এরকম নিদর্শন আছে তাঁর রচনায়।

দেশের বাইরে কখনও পা দেননি কমলকুমার, এককালে সে সুযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল, তাঁর ছোটভাই শিল্পী নীরোদ মজুমদার বহুকাল কাটিয়ে এসেছেন ফরাসিদেশে, কিন্তু কমলকুমার ইচ্ছে করেই যাননি। কোনও বিলেতফেরত ব্যক্তিকে অতি সাহেবিপনা করতে দেখলে তিনি হেসে বলতেন, আমার বাবার বাবার বাবার বাবা হাফ্‌ পেন্টুল পরে বিলেত গেস্‌ল, বুঝলে। ফরাসিদেশ থেকে অনেক জ্ঞানী-গুণী, লেখক-শিল্পী সমালোচক কলকাতায় এলে কমলকুমারের খোঁজ করতেন, কমলকুমার তাঁদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন খালাসিটোলায় দিশি মদের দোকানে। চতুর্দিকে নোংরা ছড়ানো সেই আধো অন্ধকার স্থানটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন হালকা সুরে।

কলকাতার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি কমলকুমারের কাছে ফরাসি ভাষার ছাত্র ছিলেন। আমরাও একসময় বায়না ধরেছিলেন, কমলদা, আমাদের ফরাসি শেখান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি, তবে দুটি শর্তে। বিনা পয়সায় শেখা চলবে না, তাঁকে মাইনে দিতে হবে মাসে এক টাকা। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, তাঁর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আমরা প্রকাশ্যে অন্যদের কাছে একটাও ফরাসি বাক্য উচ্চারণ করতে পারব না। শুনেছি, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র নির্দেশ ছিল, টানা সাত বছর স-র-গ-ম না সাধলে তাঁর শিষ্যরা এক লাইনও গান গাইতে পারত না।

উত্তর কলকাতায় গ্রে স্ট্রিটে আমার বন্ধু আশুতোষ ঘোষের বাড়িতে সপ্তাহে দুদিন ধরে দুপুরে তিনি পড়াতে আসতেন আমাদের। ওঃ, কী ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা। এমন সুরসিক, আড্ডাবাজ কমলকুমার শিক্ষক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, কোনওরকম হাস্য-পরিহাস নয়, আমাদের শুধু

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ফরাসি শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হবে। আজকালকার ডাইরেক্ট মেথডে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, বাক্য গঠন দিয়ে শিক্ষা শুরুর মজা আমরা পেলাম না, শুধু নীরস ব্যাকরণ। যেন তেঁতুলগাছ তলায় বুনো রামনাথের টোলে মাথায় টিকিওয়ালা ছাত্রদের মতন দুলে দুলে অ্যাভোয়ার-এর নানারূপ আউড়ে যাওয়া। দুমাসের মধ্যেই আমাদের ধৈর্য চলে গেল! আমাদের সময়ে স্কুলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল, শব্দরূপ-ধাতুরূপ মুখস্থ করার ভীতিতে সে ভাষাও ভালো করে শিখিনি, ফরাসি ভাষায় বিদ্বান হওয়ার উচ্চাকাঙক্ষা আমাদের অচিরেই বিলীন হয়ে গেল।

মূল ভাষায় ফরাসি কবিতা পাঠ করার বাসনা আমার একেবারে যায়নি। এর পরে, বন্ধুদের না জানিয়ে, গোপনে আমি আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজেও ছাত্র হিসেবে ভরতি হয়েছিলাম একবার। সেখানেও বেশিদিন লেগে থাকতে পারিনি নিজেরই দোষে। সেই সময়ে অন্তত, উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাই প্রধানত পড়তে যেত আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে, চমৎকার তাদের চেহারা, আর জামা-কাপড়ের কত বাহার। এক একজন জন্মদিনে ক্লাসের মধ্যে দামি চকোলেট বিলি করে, একগাদা সহপাঠী-সহপাঠিনীদের নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কোনও দামি রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। সেই তুলনায় আমার চেহারা ও পোশাক অতি মলিন, পকেটে হাত দিয়ে প্রায় সময়ই খুচরো পয়সা গুনি। কারুর সঙ্গে মিশতে পারতাম না, পেছনের দিকে চুপ করে থাকতাম। জানি, এটা বোকামির পর্যায়ে পড়ে, অন্যদের চাকচিক্য তুচ্ছ করাই উচিত। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে থাকলে আমি বাঘ, একা হয়ে পড়লেই মুখচোরা। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম না কিছুতেই। তা ছাড়া বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও ধরা পড়ে গেলাম অবিলম্বে। ফরাসি কনসুলেটে যাতায়াত করছি শুনে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডাধারীরা অনেকে বলতে লাগল, খুব আঁতেল হতে চাস বুঝি! আঁতেল শব্দটি গালাগালের পর্যায়ে পড়ে। আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে পড়াবার ধরন খুবই আকর্ষণীয় ছিল, সুন্দরী তরুণী মেমরা পড়াত, কিন্তু তা আমার ভাগ্যে সইল না।

পরবর্তীকালে, অনেক বছর পরে, ওই আলিয়াঁজ ফ্রাঁসেজ-এর সামনের রাস্তায় আমি এক একদিন বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকতাম অন্য কারণে। ওখানকার এক ছাত্রীকে মাঝপথে ধরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আমার সঙ্গে ময়দানে টোটো করে ঘুরে বেড়াবার কুপ্ররোচনা দিতাম। এইভাবে আমি আমার পূর্বতন ব্যর্থতার শোধ নিয়েছি বলা যেতে পারে।

ফরাসি ভাষা শেখা হয়নি বটে, কিন্তু ফরাসি বাক্য মুখস্থ করেছিলাম বেশ কিছু। আমার বন্ধু বুদ্ধদেব শিখিয়েছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, ভুলে ভু কুশে আভেক্ মোয়া? এর অর্থ আমি বলে দেব না। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, ভুলেও যেন কখনও এই বাক্যটি কোনও সদ্য-পরিচিত বিদেশিনীর সামনে উচ্চারণ করবেন না।

প্যারিসের প্রথম দিন সেই চার ঘণ্টার অপেক্ষায় আমি কিছুই দেখিনি। পৃথিবীর সব বড় বড় শহরের বিমানবন্দরই একরকম, চরিত্রহীন। জাহাজ কিংবা ট্রেনযাত্রা নিয়ে কত অসংখ্য কাহিনি রচিত হয়েছে, সেই তুলনায় বিমানযাত্রা নিয়ে কিছুই না।

নিউইয়র্ক পৌঁছে আমার সুটকেসটা খুঁজে পেয়েছিলাম ঠিকই। নিউইয়র্কে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি, চিনতামই না কারুকে। বস্তুত, সারা আমেরিকায় অ্যালেন গিনসবার্গ ও পল এঙ্গেল ব্যতীত আমার পরিচিত কেউ ছিলই না। তখনও, সেই তেষট্টি সালে, এত রাশি রাশি বাঙালি ছেলেমেয়ে মার্কিনদেশে গিয়ে থিতু হয়নি।

নিউইয়র্ক থেকে একটু পরেই বিমান বদলে শিকাগো, সেখানে এক হোটেলে রাত্রিবাস। সে-ও এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। এখন কলকাতা থেকে কেউ বিদেশে গেলে আর পাঁচজন তাকে অনেক কিছুই শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তখন আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি। মাঝপথে কোথাও রাত কাটাতে হলে তার জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করা যে বিমান কোম্পানির দায়িত্ব, তা কি জানতাম তখন। শেষ দিন হাতে টিকিট পেয়েছি, তার মধ্যে হোটেল ভাউচার নেই।

এর মধ্যে দুটি পিকচার পোস্টকার্ড কিনে পঞ্চাশ সেন্ট খরচ করে ফেলেছি, আমার আর সম্বল মাত্র সাড়ে সাত ডলার। সে আমলেও শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোনও হোটেলের ঘর দশ ডলারের কমে পাওয়া যেত না। শুধু থাকা, খাওয়া নয়। একটা হোটেলে পৌঁছে অতি দীনভাবে আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে আমার কাছে পয়সা কম আছে। কাউন্টারের তরুণ ম্যানেজারটি দয়া করেছিল আমাকে।

এইসব প্রসঙ্গ আমি আগে অন্যত্র লিখেছি। প্রথম দিকে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি মার্জনীয়।

পরের দিন ভোরবেলা আমি যখন আয়ওয়ার উদ্দেশে ছোট্ট একটি প্লেনে চাপলাম, তখন আমি কপর্দকশূন্য। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় আমি পৌঁছব নিঃস্ব অবস্থায়। কোনও কারণে যদি পল এঙ্গেল খবর না পেয়ে থাকেন, কিংবা এয়ারপোর্টে কারুকে পাঠাতে ভুলে যান, তা হলে আমি কী করব জানি না।

বাগডোগরা কিংবা তেজপুরের মতন ছোট্ট এয়ারপোর্ট আয়ওয়া সিটি। রানওয়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পল এঙ্গেল। আমি নামতেই তিনি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেই উষ্ণতায় বুক ভরে গিয়েছিল।

তারপর ম্যাজিকের মতন ব্যাপার ঘটতে লাগল। আমাকে কিছু জিগ্যেস না করেই পল এঙ্গেল কী করে যেন বুঝে গেলেন যে আমি খুবই ক্ষুধার্ত, প্রথমেই তিনি আমাকে এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। আমার জন্য তিনি আগেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছিলেন, সেখানে যাওয়ার আগে ইউনিভার্সিটিতে নাম রেজিস্ট্রেশান, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা, টেলিফোন ও গ্যাসের কানেকশান নেওয়া ইত্যাদি সারা হল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। তারপর তিনি একটি নির্জন রাস্তায় এক দোতলা বাড়ির সুসজ্জিত অ্যাপার্টমেন্টে আমায় পৌঁছে দিয়ে বললেন, এবার তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আমি আবার সন্ধেবেলা আসব।

মাত্র একদিন আগেও আমি ছিলাম কলকাতার এক কনিষ্ঠ কেরানি, দমদমে এক রিফিউজি পল্লির ফ্ল্যাটবাড়ির দু-খানা ঘরে সবাই মিলে গাদাগাদি করে থাকতাম, মাসের মাঝখান থেকেই ধারের চিন্তা করতে হত, পুরো এক প্যাকেট সিগারেটের বদলে কিনতাম দুটো দুটো করে, সেই আমারই এখন একটা নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট, টেবিলের ওপর টেলিফোন, রান্নাঘরে গ্যাস স্টোভ আর ফ্রিজ, বাথরুমে বাথটাব। কলকাতায় আমার নিজস্ব কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টই ছিল না। ফ্রিজ-টেলিফোন-বাথটাব এসব তো স্বপ্নের জিনিসপত্র। এখানকার ব্যাংকে আমার নামে জমা পড়েছে চারশো ডলার, ঘ্যাঁচ করে যখন ইচ্ছে চেক কেটে ফেলতে পারি। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন ঠিক স্পর্শসহ মনে হয় না, কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে।

এ পর্যায়ে আমি আমেরিকা-প্রবাস বিষয়ে কিছু লিখব না। শুধু পটভূমিকা বোঝাবার জন্য এতখানি অবতরণিকা।

মাস দু-একের মধ্যেই টেলিফোন-ফ্রিজ-বাথটাব ইত্যাদি আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। ও দেশের জীবনযাত্রায় ওসব সাধারণতম সামগ্রী। এমনকী টিভি, যা কলকাতায় তখন তো ছিলই না, ভারতের কোথাও এসেছে কি না সন্দেহ, ওদেশে গিয়েই প্রথম দেখি, তারও আকর্ষণ কিছুদিনের মধ্যেই চলে যায়। আমার সর্বক্ষণ কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, অথচ ওদেশে থেকে যাওয়ার পক্ষে যুক্তি অনেক।

আমার মতন ছেলের পক্ষে সেই সময়ে কলকাতায় একটা ভদ্রগোছের চাকরি জোগাড় করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, আমেরিকায় আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল। বাড়িতে প্রতি মাসে মা-ভাই বোনদের জন্য টাকা পাঠাতেও কোনও অসুবিধে নেই। বিয়ে করিনি, পিছুটানও নেই অন্য কোনও। পল এঙ্গেলের দেওয়া স্কলারশিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও অন্য কোনও চাকরি পাওয়ার অনেক সুযোগ হয়েছিল। আমার ভিসা ছিল পাঁচ বছরের, টানা পাঁচ বছর থাকার কোন অসুবিধেই নেই।

তখন অনেক ভারতীয় এইরকম পাঁচ বছরের ভিসা নিয়ে আমেরিকা পৌঁছে কিছু না কিছু চাকরি জুটিয়ে নিত, তারপর ভিসার মেয়াদ শেষ হলে চলে যেত পাশের কানাডায়, সেখানে ভিসা লাগে না, সেখানে কোনওক্রমে মাস ছয়েক কাটিয়ে আবার আমেরিকায় ঢুকলেই আবার পাঁচ বছরের ভিসা। তার মধ্যেই পাওয়া যায় স্থায়ী পারমিট। কয়েকজন ভারতীয় এই পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিল আমাকে।

যদি তা মেনে নিতাম, তা হলে এতদিনে আমেরিকায় আমার নিজস্ব একটা বাড়ি হত, গোটা দুয়েক অন্তত গাড়ি, মেম বউ, কিংবা একফাঁকে টুক করে দেশে এসে বিয়ে করে নিয়ে যেতাম কনভেন্টে-পড়া কোনও রূপসীকে, আমার ছেলেমেয়েরা বাংলা না শিখে শুধু ইংরিজি বলত, আমার আবলুস কাঠের মতন গায়ের রংটাও বোধহয় ফরসা হয়ে যেত। দু-তিন বছর অন্তর দেশে ফিরতাম একগাদা অল্পদামের ক্যামেরা, ঘড়ি, টেপ রেকর্ডার, পারফিউম, গেঞ্জি-সোয়েটার নিয়ে, উদারভাবে সেগুলো বিলোতাম আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে। আর নাক সিঁটকে বলতাম, কলকাতা শহরটা এত নোংরা কেন, রাস্তাগুলোর কেন এমন বদখত অবস্থা। এদেশের মানুষ কোনও কাজকর্ম করে না, দিল্লি-বোম্বে যাওয়ার প্লেনগুলো সময়ের ঠিক রাখে না, ছি ছি ছি!

আমি তো গেছি গরিব দেশ থেকে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, এমনকী ইংল্যান্ড থেকেও যেসব কবি লেখকরা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও আমেরিকার এমন সুলভ জিনিসপত্র এবং চাকরি পাওয়ার সুবিধে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বেশ কয়েকজন এখানে পাকাপাকি থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, দু-চারজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হয়ে ডিগ্রি বাড়াবার চেষ্টায় মাতলেন, একজন বিয়ে করে ফেললেন দুম করে, যাতে আর ফেরার প্রশ্নই না ওঠে। কিন্তু দু-তিন মাসের মধ্যেই আমার মনের মধ্যে যাই যাই রব। কিছুই ভালো লাগে না। যেন আমি বন্দি, যদিও আমেরিকার মতন সর্বত্র ঘোরাফেরার স্বাধীনতা পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। কয়েকজন নবলব্ধ ভারতীয় বন্ধু আমার ছটফটানি দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, কোনওরকমে একটা বছর কাটিয়ে দাও। প্রথম এক বছরই খুব হোম সিকনেস থাকে, তারপর একদম কেটে যায়। আমি তা শুনে শিউরে উঠে ভাবতাম, তবে তো কোনওক্রমেই এক বছর পার হতে দেওয়া চলবে না।

কলকাতায় সবসময় বন্ধু-বান্ধব কিংবা ছুটোছুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, ফাঁকা সময় প্রায় ছিলই না। আয়ওয়াতে গিয়েই পুরোপুরি নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছি অনেক সময়। এমনও দিন গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পা দিইনি, নিজের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। সেই নির্জন ঘরে, আয়নার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আমি নানারকম প্রশ্ন করতাম। এখানে থেকে যাওয়া কিংবা ফিরে যাওয়া, এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলো সাজাতাম বারবার। জাগতিক নিয়মে ওদেশে থেকে যাওয়ার পক্ষেই যুক্তি প্রচুর, তবু একটা প্রশ্ন থাকে, এ জগতের কাছে আমি কী চাই? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার আনন্দ। তা হলে কীসে আমার সর্বাধিক আনন্দ?

এতদিন পর্যন্ত জীবনের কোনও ব্যাপারেই কোনও গুরুত্ব দিইনি। লেখালিখিও চলছিল খেলাচ্ছলে। কিছু কবিতা লেখা ও ছোট কবিতার পত্রিকা চালানো নিয়ে মেতে ছিলাম, কিন্তু তা নিয়েই সারাজীবন কাটবে কি না ভেবে দেখিনি। আয়ওয়াতে ফাঁকা ঘরে দিনের পর দিন নিজেকে প্রশ্ন করে আমার একটা উপলব্ধি হল। টাকাপয়সা রোজগার, নিশ্চিন্ত জীবিকা, আরামের উপকরণ, ভালো ভালো খাদ্য পানীয়—এই সব কিছুর চেয়েও বেশি আনন্দ পাই যখন মাথায় ঘাম ছুটিয়ে কিছু লেখালিখি করি। তা যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, আমার কাছে তার মূল্য অনেক। দু-চার লাইন লেখার সময় যে রোমাঞ্চ হয়, নারীসঙ্গের চেয়েও তা কম রোমহর্ষক নয়।

আমার ইংরিজি ভাষায় দক্ষতা নেই, লিখি শুধু বাংলায়। আর বাংলায় লিখে যেতে হলে এই পরবাসভূমি ছেড়ে আমাকে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। জানি, দেশে ফিরলে সহজে জীবিকা জুটবে না। কবিতা লিখলে পেটের খিদে থেমে থাকবে না, তবু একটাই যখন জীবন,

তখন ঝুঁকি নিয়েও তো আনন্দের সন্ধানই করা উচিত। লাইব্রেরি অ্যাসিস্টেন্টের চাকরি কিংবা একটা মাস্টারি জুটিয়ে এদেশে বাড়ি-গাড়ি বানালেও তো আমি সে আনন্দ পাব না। আমাকে ফিরতেই হবে। একজন বড় বিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসক দেশে ফিরে গেলে দেশের অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার দ্বারা সেরকম কিছুই হবে না, আমার সঙ্কল্প আমার একান্তই ব্যক্তিগত।

তবু ফেরার ব্যাপারে আমার একটা দ্বিধা এসে গেল অন্য দিক দিয়ে।

আয়াওয়া সিটি একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ছোট শহর। এখানে লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য বিশেষ কোনও উদ্যোগ নিতে হয় না। ইউরোপীয়দের মতন, আমেরিকানরা ফর্মাল নয়, একেবারে কেউ পাশে বসলে নিজে থেকে কথা বলতে শুরু করে। ওদের সামাজিকতার আর একটা সুন্দর দিক আছে। পথে-ঘাটে যে-কোনও লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সেটা অভদ্রতা, বরং হাসি মুখে বলে, হাই! অর্থাৎ এই যে! প্রথম প্রথম হকচকিয়ে গেলেও পরে আমার এটা বেশ ভালোই লাগত।

কলকাতার আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর উচ্চবিত্ত সহপাঠী-সহপাঠিনীরা কেউ আমার সঙ্গে যেচে কথা না বললেও, ওখানকার রাইটার্স ওয়ার্কশপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজের থেকেই আলাপ করল, এবং কয়েকজনের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। লন্ডনে যেমন পাব, আমেরিকার ছোট শহরে তেমনি ট্যাভার্ন, সেখানে বসে প্রতি বিকেলে আড্ডা। কোনও একজনের বাড়িতে দল বেঁধে হানা দেওয়া হয় যখন তখন।

আমার বাড়িতেও একদিন চার-পাঁচজন যুবক-যুবতী আড্ডা দিতে এল। সবাই লেখক-লেখিকা নয়, তাদের বন্ধু-বান্ধবী, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও দু-একজন। সন্ধের পর তারা চলে যাওয়ার পর দেখি, একখানা বই কেউ ফেলে গেছে। সেখানা লাইব্রেরির বই, সুতরাং কে রেখে গেছে, তা বোঝার উপায় নেই। সেখানা মূল ফরাসিতে মলিয়ের-এর নাট্যসংগ্রহ। উলটে-পালটে দেখি, দাঁত ফোটাতে পারি না।

দু-দিন বাদে সকালবেলা একটি নারীকণ্ঠের টেলিফোন। তার নামটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সে বলল, গত পরশু আমার বন্ধু ডোরি-র সঙ্গে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে কি? আমি কি তোমার বাড়ি গিয়ে বইটা নিয়ে আসতে পারি?

আমি তিনবার বললাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

ইংরিজি ভাষা ও উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় মেয়েটি আমেরিকান নয়। সেদিনের চার-পাঁচজনের মধ্যে এ মেয়েটি কোন্ জন?

একটু পরেই যে এল, সে বেশ দীর্ঘাঙ্গিনী তরুণী, মাথাভরতি অলোকলতার মতন এলোমেলো সোনালি চুল, গায়ে একটা ভোরের সূর্যের মতন লাল রঙের সোয়েটার, সারা মুখে সুস্বাস্থ্যের ঝলমলানি। তার হাতে একগুচ্ছ শিশিরভেজা সাদা লিলি ফুল।

এই মেয়েটি আগের দিন এক কোণে বসেছিল, বেশি কথা বলেনি, তাই তার নাম আমার মনে নেই।

আমি দরজা খোলার পর সে বলল, হাই, সুনীল। আমার নাম মার্গারিট ম্যাতিউ। সেদিন তোমার ঘরে কোনও ফুল দেখিনি, তাই তোমার জন্য এই লিলির গুচ্ছ এনেছি। না, না, না, কিনিনি, আর্ট ডিপার্টমেন্টের বাগান থেকে চুরি করে এনেছি। তুমি বুঝি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলে? তোমার ঘরে সুন্দর কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বইটা দাও!

আমি বইটা এনে জিগ্যেস করলাম, একটু বসে যাবে না?

মার্গারিট বলল, আমাকে এক্ষুনি ক্লাসে ছুটতে হবে। এমন দারুণ রোদ উঠেছে, এরকম সকালে ক্লাস করার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর একদিন এসে ভারতীয় চা খেয়ে যাব। মের্সি বকু।

বইটা হাতে নিয়ে সে ঝড়ের মতন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও আবার উঠে এল কয়েক ধাপ। সারল্যমাখা মুখখানি উঁচু করে বলল, তুমি আমাকে শকুন্তলার কথা একটু বলবে একদিন?

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, শকুন্তলা? কে শকুন্তলা? আমি তো কোনও শকুন্তলাকে চিনি না।

মার্গারিট বলল, গিয়ম অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতায় যে শকুন্তলার উল্লেখ আছে।

তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এ নিশ্চয়ই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রসঙ্গে। অ্যাপোলিনেয়ারের সে কবিতা তো আমি পড়িনি।

মার্গারিট আবার বলল, তুমি যদি আমাকে একদিন শকুন্তলার উপাখ্যানটা বুঝিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে আমি অনেক ফরাসি কবিতা পড়ে শোনাতে পারি।

॥ ৩ ॥

"শকুন্তলার পতি মহারাজ
রাজ্যজয়ের ক্লান্তি শরীরে
হর্ষ পেলেন পুনরায় দেখে
বিরহিনী বালা আছে পথে চেয়ে
কৃশ ও পাণ্ডু উদ্বেগে, প্রেমে
আদর করছে হরিণ শিশুকে..."

—গিয়ম আপোলিনেয়ার

আয়ওয়া সিটি একটি ছোট জায়গা, একান্তই বিশ্ববিদ্যালয়-নির্ভর, জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র সাতাশ হাজার। নামে শহর হলেও একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা চলে, কাছাকাছি কলকারখানা কিছু নেই, কিন্তু রেল স্টেশন ও এয়ারপোর্ট আছে এবং অনেকরকমের দোকানপাট, যেখানে বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। একটা বইয়ের দোকান এত বড়, যে-রকম কলকাতা শহরেও একটিও নেই।

নিউইয়র্ক কিংবা সানফ্রান্সিসকোর মতন বড় শহরের বুদ্ধিজীবীরা আয়ওয়ার মতন অঞ্চলের নাম শুনলে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে বলে, মিড ওয়েস্ট? ও তো চাষাভুষোদের জায়গা, ওখানে আবার কোনওরকম সংস্কৃতি আছে নাকি? হ্যাঁ, পল এঙ্গেল একটা সাহিত্য-কেন্দ্র খুলেছে বটে, কিন্তু ওই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে কে যাবে?

শেষ দিন পর্যন্ত আমার আসা এমনই অনিশ্চিত ছিল যে আমি আমার বন্ধু অ্যালেন গিনস্‌বার্গকেও কোনও খবর দিতে পারিনি। এখান থেকে তাকে একদিন ফোন করলাম, আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেও সে বিশ্বাসই করতে চায় না, বারবার বলতে লাগল, এ যে অতি সুখকর চমক! সুখকর চমক! কিন্তু সুনীল, তুমি কলকাতার ছেলে, ওই গণ্ডগ্রামে কি টিকতে পারবে? শিগগির চলে এসো নিউইয়র্কে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে তোমার থাকার জায়গা হয়ে যাবে।

আমি তখুনি যাইনি অবশ্য।

কলকাতা থেকে ষোলো হাজার মাইল দূরে চলে এলেও মাঝখানে ইউরোপ-আমেরিকার কোনও বড় শহর দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যেন একটা ঝড় দেড়দিনের মধ্যে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলেছে আমেরিকার শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে। একদিক থেকে হয়তো সেটাই ভালো হয়েছে, অচেনা বড় শহরের হইহল্লার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে। সেই তুলনায়

আয়ওয়ার মতন শান্ত জায়গায় স্নায়ুগুলি স্নিগ্ধ হওয়ার অবসর পায়।

হলিউডের ছবিতে আমরা তখন আমেরিকার যে-চিত্র দেখেছি, তার সঙ্গে আয়ওয়ার কোনও মিল নেই। এখানে কেউ মদ খেয়ে মাতলামি করে না, কথায় কথায় ছুরি-বন্দুক বেরোয় না, একটি নারীকে নিয়ে দুজন পুরুষের টানা-হ্যাঁচড়া চলে না। যখন তখন স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্সও হয় না, বরং কোনও ডিভোর্সের ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে রীতিমতন গুঞ্জন চলে। এখানকার মানুষ সর্বক্ষণ ছোটে না, র‍্যাট-রেস প্রত্যক্ষ করা যায় না। বরং এখানে জীবন চলে ধীর ছন্দে, রাস্তায় ঘাটে অচেনা লোকও ডেকে আলাপ করে, দোকানদাররা রসিকতা করতে ভালোবাসে।

এই শহরের আশেপাশের চাষারা বেশ বড়লোক। অনেকেরই নিজস্ব প্লেন আছে। স্থানীয় ফুটবল ম্যাচের দিনে স্টেডিয়ামের বাইরে সারি সারি প্লেন দাঁড়িয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কিছুদিন আগে এসেছিলেন আয়ওয়া রাজ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও কর্ণধারের আমেরিকায় আগমন। আয়ওয়ার এক গমের খেতের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রুশ্চেভ ভুরু তুলে বলেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার চাষারা আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। এক একর জমিতে এত ফসল সমাজতান্ত্রিক কোনও দেশেই ফলে না।

আমাদের মতন গরিব দেশের মানুষদের আমেরিকার ফসল উৎপাদনের কারবার শুনে চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত। এক এক বছর গমের উৎপাদন এত বেশি হত যে কয়েকটি জাহাজে গমের বস্তা ভরে তা ডুবিয়ে দেওয়া হত সমুদ্রে, না হলে গমের দাম খুব কমে যাবে, চাষিরা মার খাবে। পরে অবশ্য আমেরিকা তার কৃষিনীতি বদল করে। চাষের আগেই হিসেব করা হয়, নিজের দেশে সারা বছর কতখানি গম প্রয়োজন, তা ছাড়া পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে দান-খয়রাতি করা হবে কতটা এবং আর কোন কোন দেশ কী পরিমাণ কিনতে পারবে। সেই অনুযায়ী চাষ। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতি বছরই আমেরিকা থেকে গম কেনে। চাষের আগেই তাদের অর্ডার দিয়ে রাখতে হয়। অধিক ফসল যাতে না ফলে যায়, সেইজন্য সরকার কোনও কোনও চাষিকে নির্দেশ দেয়, এ বছর তুমি চাষ কোরো না, জমি এমনি ফেলে রাখো। চাষের বাবদ তোমার যা লাভ হত, সেই টাকাটা সরকার থেকেই দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ফসল না ফলিয়েও, বাড়িতে আরাম-চেয়ারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থেকে উপার্জন।

আমেরিকায় এক শ্রেণির মানুষ বিশেষজ্ঞ, আর বেশিরভাগ মানুষই নানা বিষয়ে অজ্ঞ। আমাদের দেশের অশিক্ষিত গরিব চাষি হয়তো বাইরের পৃথিবীর বিশেষ খবর রাখে না, কিন্তু আমেরিকার মোটামুটি শিক্ষিত, প্লেন চালাতে জানা ধনী চাষিরাও যে নিজের দেশের বাইরে যে-পৃথিবী, সে-সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, তা দেখে বেশ অবাক লাগে। আমাকে একজন চাষা জিগ্যেস করেছিল, তুমি ভারতীয় না পাকিস্তানি? আমি যখন বললাম, আমি ভারতীয়, তখন সে জানতে চাইল পাকিস্তানটা ভারতের কোন দিকে? আমি যখন জানালাম যে পাকিস্তান ভারতের দুদিকে, পশ্চিমে আছে, পুবেও আছে, তা শুনে সে হোহো করে হাসতে লাগল। তার ধারণা, এটা আমার রসিকতা।

এই সরল, ভালোমানুষ চাষারা বিদেশিদের সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী। বর্ণ বিদ্বেষের ব্যাপারটা এ অঞ্চলে একেবারেই নেই বলা চলে। চাষিরা আমাদের মতন বহিরাগত লেখক-শিল্পীদের প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চায়। বেশ মজার অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। গোবরের গন্ধ নেই, এ আবার কীরকম চাষির বাড়ি? গরু-মোষের সঙ্গে চাষের সম্পর্ক এসব দেশ থেকে বহুদিন উঠে গেছে। কোনও কোনও বাড়ির ছেলেমেয়েরা একটাও জ্যান্ত গরু দেখেনি কখনও, কারণ কোনও গরুই মাঠে চরে না। বাড়িগুলি দেখে মনে হয় ছবির বই দেখে বানানো। এরা খাওয়ায়-দাওয়ায় ভালো, আর নানারকম উদ্ভট প্রশ্ন করে। একজন জানতে চেয়েছিল তাজমহল নামে বস্তুটা জাপানে, না ইজিপ্টে? কেউ কেউ কাঁচুমাচু মুখে বলে, আমি তোমাদের দেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না। তোমাদের ভাষাও জানি

না, কিন্তু তোমরা আমাদের ভাষা জানলে কী করে?

নতুন পরিবেশের সঙ্গে আস্তে আস্তে নিজেকে মানিয়ে নিলেও মনের মধ্যে সবসময় এই প্রশ্নটা ঘোরে, আমি এখানে থাকব কেন? যখন তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে কলকাতা, তার জন্য যে মন কেমন করে তা নয়, বরং কিছুটা অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খায়। কলকাতায় আমার আত্মীয়-স্বজন, অনেক বন্ধু-বান্ধবের তুলনায় আমি যে এখানে আরামের জীবনযাপন করছি, সেটা কি স্বার্থপরতা নয়? যারা এদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসে, কিংবা বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ চায় কিংবা বিশাল কোনও চাকরির উচ্চাকাঙক্ষী, তাদের তবু থেকে যাওয়ার যুক্তি আছে, আমি বাংলো ভাষায় লেখালিখি করতে চাই, আমি কেন পড়ে থাকব এমন একটা জায়গায়, যেখানে সারাদিনে একটিও বাংলা কথা শোনা যায় না?

এখানে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সংখ্যা তখন পঞ্চাশ-ষাট জন, তাঁদের মধ্যে দু-তিনজনের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র, সাহিত্যের সঙ্গে অনেকেরই কোনও সম্পর্ক নেই। দু-একটি শনিবারের সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি, শুধু রান্না-বান্নার রেসিপি-বিনিময়েই অর্ধেক সময় কেটে যায়, এ ছাড়া কে কোন গাড়ি কিনেছেন বা কিনবেন, সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আমি কোনও আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করতে পারি না।

বাঙালি মেয়ে দেখেছি মাত্র একজনকেই, তার নাম ভারতী মুখার্জি, সে ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী। ভারতী অবশ্য বাংলা না-জানা বাঙালি। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লার্ক ব্লেইজ নামে এক তরুণ কেনেডিয়ান লেখকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়, পরবর্তীকালে ভারতী উত্তর আমেরিকায় লেখিকা হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করে, তার 'টাইগার্স ডটার' নামে উপন্যাসটি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ভারতী আর ক্লার্ক দু'জনে মিলেও একটি বই লিখেছিল, 'ডেইজ অ্যান্ড নাইটস্ ইন ক্যালকাটা', সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম্ 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' অনুকরণে এই নামকরণ।

ক্লার্ক আর ভারতীর সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে আড্ডা দিলেও অন্য বাঙালিদের এড়িয়ে চলতাম, কারণ দেখা হলেই তাঁরা আমাকে উপদেশ দিতেন, তুমি শুধু শুধু সময় ও সুযোগ নষ্ট করেছ কেন? তোমার তো পয়সা লাগবে না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-একটা কোর্স করে নাও, ইংরিজি সাহিত্য, জার্নালিজম, ফোটোগ্রাফি, মার্কেটিং, লাইব্রেরিয়ানশিপ, ম্যানেজমেন্ট যা খুশি। যে-কোনও একটা কোর্স করলেই চাকরি-বাকরির অনেক সুবিধে। তাঁরা সহৃদয়, আমার উন্নতির জন্য তাঁরা বিনা স্বার্থে মাথা ঘামাতেন, কিন্তু ওসব কথা শুনলেই আমার পালাতে ইচ্ছে করত। ফর্মাল লেখাপড়া সম্পর্কে তখন আমার গভীর উপেক্ষা জন্মে গেছে, আমি আর ছাত্র সাজতে রাজি নই। দেশে থাকতে আমি অনর্থক একটা এম এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও জানতাম, ওই ডিগ্রি আমার কোনওদিনই কাজে লাগবে না, কারণ মাস্টারি কিংবা অধ্যাপনা করা আমার ধাতুতে নেই। আমার মা বলেছিলেন, তোর মামারা সবাই এম এ পাশ, আর আমার ছেলেরা কেউ এম এ হবে না? কয়েক বছর পরে অবশ্য আমার অন্য ভাইবোনেরাও মাকে খুশি করেছে।

আমাদের রাইটার্স ওয়ার্কসশপটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে হাজিরা দেওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নদীর ধারে ঘাসের ওপর বিভিন্ন দেশের লেখক-লেখিকারা যদি একসঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা দেয়, সেটাও রাইটার্স ওয়ার্কশপ। পল এঙ্গেলের বাড়ি সন্ধেবেলা নেমন্তন্ন খেতে খেতে কেউ চেঁচিয়ে নিজের কবিতা পড়ে শোনাল, কেউ কেউ তর্ক বাধাল, সেই-ই তো যথেষ্ট। পল এঙ্গেল আমায় বলেছিলেন একজন লেখকের শ্রেষ্ঠ ওয়ার্কশপ অবশ্য তার নিজস্ব টেবিল। কোনও লেখা মাথায় আসুক বা না আসুক, সেই টেবিলে প্রত্যেকদিন কয়েক ঘণ্টা বসা উচিত।

অন্য লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যাওয়া কিংবা সারাদিন সম্পূর্ণ একা কাটাবার

স্বাধীনতা আমার ছিল। এক একদিন আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াই। এই শহরটি সুন্দর, পাশে পাশে ছোট ছোট টিলা, প্রচুর সবুজের সমারোহ, একমাত্র অসুন্দর এই নদীটি। বাগবাজারের খাল কিংবা টালির নালার চেয়ে একটু বেশি চওড়া, জলের রং নোংরা-কালো। দূরের কোনও কোনও কারখানার পরিত্যক্ত গাদ বোধহয় এই নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই এ নদীতে কেউ স্নান করতে নামে না, এখানে কেউ মাছ ধরে না। তবু এই নদীটিকে সুন্দর করার কতরকম চেষ্টা। এই তো একরত্তি শহর, তা হলেও এখানে এই নদীর ওপর অন্তত গোটা ছয়েক সেতু, প্রত্যেকটির ডিজাইন আলাদা। দুই তীরে নানারকম ফুলের কেয়ারি।

একদিন নদীপ্রান্ত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্য পারে দেখলাম সেই ফরাসি মেয়েটিকে। একগাদা বইপত্র হাতে নিয়ে সে প্রায় দৌড়োচ্ছে। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই সে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি আর আমার বাড়িতে এল না তো? অপোলিনেয়ারের কবিতায় শকুন্তলার উল্লেখ আছে, সে আমার কাছে শকুন্তলার কাহিনি শুনতে চেয়েছিল।

ওর ঠিকানা বা ফোন নম্বর আমি রাখিনি, কিন্তু ও ফরাসি বিভাগে পড়ায়, সেখানে গেলেও ওর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজে থেকে গিয়ে তাকে ডাকতে খুব সঙ্কোচ হয়। ডোরি ক্যাট্জ নামে আর একটি মেয়ের ও বান্ধবী, ডোরির সঙ্গেই প্রথম দিন আমার বাড়িতে এসেছিল। সেই ডোরির সঙ্গে এর মধ্যে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু তার কাছেও লজ্জায় মুখ ফুটে মার্গারিটের কথা জিগ্যেস করতে পারিনি।

মেয়েটি নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে আসে। এরপর তিন চারদিন আমি লাইব্রেরিতে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে লাগলাম।

এই বিশ্ববিদ্যালয় শহরের লাইব্রেরির ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ না-হয়ে উপায় নেই। দরজা খোলে সকাল সাতটায়, বন্ধ হয় রাত দুটোয়। চাঁদা লাগে না, এখান থেকে একসঙ্গে যত খুশি বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। যাদের গাড়ি আছে, তারা এক একবারে পঞ্চাশ-ষাটখানা বইও নিয়ে গিয়ে বাড়িতে সাজিয়ে রাখে। সেই বই অন্য কারুর প্রয়োজন হলে লাইব্রেরি কর্মী বাড়িতে টেলিফোন করে অনুরোধ জানাবে ফেরত দিয়ে যাওয়ার জন্য। অনেক ভাষার বই এখানে, বহু দেশের সংবাদপত্র। আমাদের টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, দ্য স্টেটসম্যান, এমনকী আনন্দবাজার পত্রিকার ফাইলও দেখেছি।

রাত একটায় কোনওদিন হয়তো একজন মাত্র বসে পড়াশুনো করছে, তার জন্য জেগে আছে তিন-চারজন লাইব্রেরি কর্মী।

কয়েকদিন এই লাইব্রেরিতে বসে কিছু কিছু পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কয়েকটি বিচিত্র তথ্যের সন্ধান পাই। এই ছোট্ট শহরে রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন একবার। কবিতা পাঠ করতে এসেছিলেন ডিলান টমাস, তিনি অবশ্য এমন একটা কীর্তি রেখে গেছেন, যা আর কেউ ভাঙতে পারবে না। ট্রেন থেকে নামার সময় টমাস আছাড় খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান, তখন তিনি বদ্ধ মাতাল। তিনদিন পরে সেইরকম মাতাল অবস্থাতেই তাঁকে আবার ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের কবিতা পাঠ শোনার সৌভাগ্য এখানে কারুর ঘটেনি।

আমরা যে রাইটার্স ওয়ার্কশপের সদস্য, এ বছর থেকেই সেখানে বিদেশি লেখক-লেখিকাদের আমন্ত্রণ জানানো শুরু হয়েছে। এর আগে ওয়ার্কশপ-এ যোগ দিতেন শুধু আমেরিকান কবি-সাহিত্যিকরা। একেবারে গোড়ার দিকে এখানে এসেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার টেনেসি উইলিয়াম্স, একথা জেনে রোমাঞ্চ হয়। এর মধ্যে তিনি আর আসবেন না।

একদিন সন্ধেবেলা লাইব্রেরি থেকে বেরুচ্ছি, দেখি যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে মাথাভরতি উশকোখুশকো সোনালি চুলওয়ালা সেই মেয়েটি। আমি বললাম, হাই। সে-ও হাই বলে আমাকে পাশ কাটিয়ে উঠে যাচ্ছিল, আমি আবার বললাম, তুমি আমার কাছে শকুন্তলার গল্প শুনতে এলে না?

এবার সে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরাল। তারপর হাসি ছড়িয়ে বলল, আমি তো আমাকে ডাকোনি?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কিন্তু সেদিন যে তুমি বললে তুমি ভারতীয় চা খেতে আর গল্প শুনতে আসবে?

মার্গারিট বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তারপর তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করবে না? তুমি নিজে থেকে তোমার বাড়িতে দুবার গেছি, তারপরেও কি আবার সেধে সেধে যাব?

একে আমার আমন্ত্রণ জানান উচিত ছিল। তা তো ঠিকই। সে কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। বাঙাল আর কাকে বলে?

আমি মিনমিন করে বললাম, তোমার ঠিকানা জানি না।

সে বলল, এই লাইব্রেরিই তো আমার ঠিকানা। ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্ট আমার ঠিকানা।

আমি বললাম, সত্যি ভুল হয়ে গেছে। আমি কি এখন তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি? আজ সন্ধেবেলা যদি তোমার সময় থাকে।

মার্গারিট এবার খিলখিল করে হেসে বলল, তুমি এদেশের নিয়মকানুন কিছু শেখোনি? এখানে কোনও মেয়ের সঙ্গে একটা সন্ধে কাটাতে চাইলে অন্তত চারদিন আগে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। নইলে মেয়েটি অপমান বোধ করে।

এ প্রথার কথা এখানে শুনেছি বটে, কিন্তু সবসময় কি মনে থাকে। আমাদের কলকাতায় আড্ডা ছিল একেবারে নারী-বর্জিত। সে সময়ে কুমারী মেয়েদের সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকা দারুণ অপরাধ বলে গণ্য হত। প্রেম-ট্রেম হত গোপনে। প্রেম নয়, শুধু একসঙ্গে একটি সন্ধে কাটাবার জন্য কোনও বাঙালি মেয়েকে প্রস্তাব জানানো ছিল অকল্পনীয়।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আজ তো মঙ্গলবার, তুমি এই শুক্রবার আসতে পারবে?

মার্গারিট সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, এখানকার অন্য মেয়েদের বেলায় এ ভুল আর কোরো না। কিন্তু আমি এদেশের মেয়ে নই। কোনওদিন আমেরিকান হতেও চাই না। আজ সন্ধেবেলা লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করার চেয়ে তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে বেশি ইচ্ছে করছে।

বেশ শীত পড়েছে, এবার যে-কোনওদিন তুষারপাত শুরু হবে, আমার দিশি সোয়েটারে ঠিক ঠান্ডা আটকানো যাচ্ছে না। মার্গারিট গায়ে দিয়ে আছে একটা পার্কা, মাথাটা আধা-ঘোমটার মতন ঢাকা। নদীর ধার দিয়ে, একটা সেতু পেরিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম বাড়ির দিকে। মার্গারিট বেশ জোরে জোরে আপোলিনেয়ারের কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগল। আমি বললাম, মূল ফরাসি তো আমি বুঝব না। ইংরিজি অনুবাদ করে শোনাও!

মার্গারিট প্রায় ধমকের সুরে বলল, গিয়ম আপোলিনেয়ারের "লা সাঁজো দু মাল এইমে" একটা বিশ্ববিখ্যাত কবিতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কয়েকটি কবিতার মধ্যে একটা, সেই কবিতার রস কি ইংরাজির মতন একটা কেজো ভাষায় পাওয়া যায়? শব্দের ঝঙ্কারই তো আসল! আমি তোমাকে একটু একটু ইংরিজি বুঝিয়ে দিচ্ছি...

কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যে বহুরকম রেফারেন্স রয়েছে। শকুন্তলার উল্লেখ আছে একটি স্তবকে মাত্র একবার। আর ফরাসি ভাষায় শকুন্তলাকে বলে 'সাকোনতাল'। আসলে স্তবকটিতে দুষ্মন্তের কথাই বলা হয়েছে, কারণ পুরো কবিতাটাই এক ভগ্নহৃদয় পুরুষের উক্তি, কিন্তু দুষ্মন্তের মতন খটোমটো শব্দ এড়িয়ে গিয়ে কবি তাকে বলেছেন শকুন্তলার স্বামী।

"লোপো রইয়্যাল দ্য সাকোনতাল
লা দ্য ভ্যাক্‌র সা রেজুই
কাঁ ইল লা র‍্যাত্রুভা প্লু পাল ..."

শুনতে-শুনতে আমি ভাবছিলাম, অধিকাংশ ফরাসি পাঠক কি এই 'সাকোনতাল'-এর অর্থ বুঝবে? মার্গারিট ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পি এইচ ডি করছে, সে শুধু জানে এটা একটা ভারতীয় নাম, অন্তর্নিহিত বিরহ-উপাখ্যানটি তারও অজানা। কবিতার সব পাঠক তো পি এইচ ডি করে না। এক সময় জার্মানির কবি-সম্রাট গ্যেটে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সেই সুবাদে ইউরোপীয় কবিরা আশ্রম-দুহিতা শকুন্তলার কথা জেনে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ পাঠকদের অবহিত হওয়ার কথা নয়। তবু অ্যাপোলিনেয়ার কেন এই স্তবকটি লিখেছিলেন তা বোঝা যায়। কবিরা মাঝে মাঝে পাঠকদের সঙ্গে একটা দুর্বোধ্যতার আড়াল সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু সেই আড়ালটিও শিল্প হয়ে ওঠা চাই, নিরেট দেওয়াল হলে সবটাই ব্যর্থ, বরং একটা রহস্যময় যবনিকা, পাঠক অনুমান করতে পারে ওপারে কিছু আছে, কিন্তু ছুঁতে পারে না। কবিরা এমনও আশা করে, ভবিষ্যতের কোনও পাঠক বা পাঠিকা ঠিক বুঝে নেবে।

সেই কবে মারা গেছেন অ্যাপোলিনেয়ার। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর মাথায় একটা গোলার টুকরো লেগেছিল। মস্ত বড় একটা ব্যান্ডেজ মাথায় বেঁধে তিনি দাপিয়ে বেড়াতেন প্যারিসের পথ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পঁয়তাল্লিশ বছর পরে বহু দূরের এক জায়গায় তাঁর ওই কবিতা এক যুবতী পাঠ করে শোনাচ্ছে শকুন্তলার দেশের একজন মানুষকে।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছেই মার্গারিট বলল, এবার শকুন্তলার কাহিনি শোনাও।

আমি বললাম, আগে চা-টা বানাই। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?

মার্গারিট বলল, না, না, ওসব কিছু চাই না। আমি শকুন্তলার জীবনের কথা জানতে চাই!

আমি কালিদাসের নাটকের আখ্যান শুরু করলাম বটে, কিন্তু একটানা বলে যাওয়া খুব মুশকিল হয়ে পড়ল। মার্গারিট যেমন ছটফটে, তেমন কোমল। আমি যখন বললাম যে, শকুন্তলার মা মেনকা ওই মেয়ের জন্ম দেওয়ার পরই তাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, একটি পাখি অর্থাৎ শকুন্ত ডানা মেলে ওর মুখের ওপর পড়া রোদ আড়াল করে, তখন মার্গারিট সজল চোখে জিগ্যেস করে, কেন, কেন ওইটুকু বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেল কেন? কোনও মা কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে? আশ্রম ছেড়ে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যে সে ফোঁপাতে থাকে। রাজসভায় দুষ্মন্ত যখন কটু ভাষায় শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন মার্গারিট চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে, থামো, থামো, মেয়েটি এবার আত্মঘাতিনী হবে নাকি? ওঃ, না, না।

সমস্ত কাহিনিটি শোনার পর মার্গারিট কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। মার্গারিট জল মুছে আমার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে বলল, এর আগে আমি কোনও ভারতীয় লেখককে দেখিনি। ভারত শব্দটা শুনলেই আমি যেন দু-তিন হাজার বছর আগেকার অতীত ইতিহাস দেখতে পাই। এখানকার দু-তিনটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ কবি নয়, সাহিত্যের ধার ধারে না। যারা কবিতা ভালোবাসে না, তাদের সঙ্গে আমার একটুও মিশতে ইচ্ছে করে না।

একটু থেমে ফিক করে লাজুকভাবে হেসে বলল, তোমাকে এবার একটা সত্যি কথা জানাব? প্রথম দিন তোমার এখানে আমার বইটা আমি ইচ্ছে করে ফেলে গিয়েছিলাম, যাতে ওই ছুতোয় তোমার এখানে আবার আসতে পারি!

আমি বললাম, তা হলে আমিও একটা সত্যি কথা বলি? তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছ, আজ লাইব্রেরির সিঁড়িতে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছে। আসলে, গত চার-পাঁচদিন ধরে আমি লাইব্রেরির সামনে ঘোরাঘুরি করছি, যদি তোমার দেখা পেয়ে যাই এই জন্য।

এরপর দু'জনেই হাসতে লাগলাম একসঙ্গে।

॥ ৪ ॥

"আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগন্তুক
শুধুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজানা ভাষায়
কেননা তুমিই বুঝি হতে পার একমাত্র আমার স্বদেশ
আমার বসন্ত, টুকরো খড়কুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত বৃক্ষশাখে"
—ফিলিপ জাকোতে

ফরাসি দেশের পোয়াতিয়ে অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম লুদাঁ। সেই গ্রামের মেয়ে মার্গারিট ম্যাতিউ। আমিও পূর্ব বাংলার ফরিদপুরের মাইজপাড়া গ্রামের ছেলে। আমাদের দেখা হয়ে গেল সুদূর মধ্য আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরে। এ এক বিচিত্র যোগাযোগ।

লুদাঁ গ্রামের ইস্কুলে লেখাপড়া শেষ করে মার্গারিট তার বান্ধবী এলেন-এর সঙ্গে চলে এল প্যারিসে। এলেন-এর নামের বানান অবশ্য হেলেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ফরাসিরা কিছুতেই 'এইচ' অক্ষরটা উচ্চারণ করতে চায় না। অথচ 'আর' অক্ষরটা উচ্চারণ করার সময় তার মধ্যে খানিকটা 'হ' মিশিয়ে দেয়।

দুই বান্ধবী প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করছিল, এর মধ্যে এলেন এক গ্রিক যুবকের প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলল। আর মার্গারিট পোস্ট ডক্টরেট করতে চলে এল আমেরিকায়। ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করার জন্য খোদ ফরাসি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় আসাটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমেরিকাতেই পড়াশুনো চালিয়ে যেতে যেতে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। নানারকম অ্যাসিস্টেন্টশিপ পাওয়া যায়। মার্গারিট এখানে রিসার্চ স্কলার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপিকা। আমেরিকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষার আলাদা বিভাগ আছে। আয়ওয়ার ফরাসি বিভাগের যিনি প্রধান, সেই মসিউ অ্যাসপেল একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত, তিনিও ফরাসি দেশ ছেড়ে এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন, তার কারণ মাইনে অনেক বেশি।

আমি ফরাসি ভাষা জানি না, ফরাসি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানও যৎসামান্য, আর মার্গারিট বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, রবীন্দ্রনাথের নামটা শুধু জানে, তাঁর কোনও লেখাই পড়েনি। তবু আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

আরও অনেক ব্যাপারে আমাদের প্রচণ্ড অমিল। মার্গারিট গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান, তার অন্য দু-বোন মঠের সন্ন্যাসিনী হয়েছে। এমন পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সে যে লেখাপড়ার চর্চা করছে, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। অবশ্য তার মা-বাবা ও ধর্মের প্রতি টান রয়ে গেছে যথেষ্ট, সে প্রতি রবিবার গির্জায় যায়, মন বেশি উতলা হলে অন্য দিনেও যায় এবং মুসলমানদের রোজা রাখার মতন, সেও 'লেন্‌ত'-এর সময় সারাদিন উপোস করে থাকে। আর আমি পৈতে ছাড়া, গরু-খাওয়া বামুন, ভগবান নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাইনি, যে কোনও ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধিনিষেধ আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। আমার ধর্ম আমার যুক্তি। মানুষের ধর্ম মানবতাবাদ। নিতান্ত আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া অন্য কোনও মানুষকে আঘাত করা উচিত নয়, এটাই আমার একমাত্র পালনীয় নীতি। আমি এখন অনেক সহনশীল হয়েছি, অন্যের ব্যাপারে বিশেষ মন্তব্য করি না, কিন্তু সেই বয়েসে, উগ্র নাস্তিকতায় যে-কোনও কারুর ধর্মীয় বাড়াবাড়ি দেখলে উপহাস করতে ছাড়তাম না। মার্গারিটকেও বিদ্রূপ করেছি অনেকবার। মার্গারিট শান্তভাবে বলত, তুমি যত চাও নাস্তিক হতে পারো, আমার একার বিশ্বাসই দুজনের সমান। চার্চে গিয়ে আমি তোমার নামেও প্রার্থনা করব।

ওইটুকু শহর আয়ওয়া, সেখানেও নানান ডিনোমিনেশানের বেশ কয়েকটি চার্চ। প্রতি রবিবার

সকালে প্রত্যেকটিতে বেশ ভিড় হয়। তখন বলা হত যে, আমেরিকানরা নিয়মিত গির্জায় যায় কিন্তু আসলে ধর্মপরায়ণ নয়। আর ইংরেজরা গির্জায় যায় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ধর্ম মানে। আমার বাড়ির কাছেই ছিল একটা গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ, তার সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি আমি ঘরে বসে বসে উপভোগ করি, আর মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা সেই গির্জার উদ্যান থেকে ফুল চুরি করে আনি। ফুল চুরির ব্যাপারে মার্গারিটেরও কোনও গ্লানি বোধ ছিল না। কিছুদিন পরে অবশ্য ফুল বিষয়ে আমার মত বদলে যায়। শুধু গির্জার বাগান থেকেই নয়, যে কোনও গাছ থেকেই ফুল ছিঁড়তে আমার খারাপ লাগে। মনে হয়, ঘরের মধ্যে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার বদলে গাছের ফুল গাছেই মানায়। এ বিষয়ে বার্নার্ড শ'-এর একটি উক্তি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। শ' বলেছিলেন, আমি ছোট ছেলেমেয়েদেরও খুব ভালোবাসি, তা বলে তাদের মুণ্ডু কেটে ঘরে সাজিয়ে রাখি না! চৌষট্টি সাল থেকে আর কখনও ফুল ছিঁড়িনি। এখন কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির মৃতদেহে ফুলের মালার স্তূপ দেখলে বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়।

মার্গারিট বার্নার্ড শ'কে মোটেই বড় লেখক মনে করত না। সেই জন্য সে ওই উক্তিটা গ্রাহ্য করেনি, সে তবু ফুল নিয়ে আসত মাঝে মাঝে। মার্গারিট সব বিষয়েই উগ্র ফরাসি, ব্রিটিশদের কোনও কিছুই ভালো দেখত না সে। ইংরেজরা আবার ছবি আঁকতে জানে নাকি? কনস্টেবল আর টার্নার ছাড়া ওদের আর গর্ব করার মতন কোনও পেইন্টার আছে? ওরা বেনের জাত, গান-বাজনা কিচ্ছু জানে না। একটাও বড় কোনও কমপোজার আছে ওদের দেশে? আর সাহিত্য? বিশ্বের বাজারে ওরা অনেক বই বিক্রি করে বটে, কিন্তু ফরাসি সাহিত্যের রথী-মহারথীদের তুলনায় ওদের কে আছে? এক ওই শেকসপিয়রকে নিয়ে চারশো বছর ধরে মাতামাতি করছে। আমাদের রাসিনও কম বড় নাট্যকার নন, তুমি যদি পড়ো তাহলে বুঝবে। কবিতা নিয়ে কত আন্দোলন হয়েছে ফরাসি দেশে, সে তুলনায় ইংরেজরা কী করেছে?

ইংরেজ ফরাসিদের লড়াই বেশ কয়েক শতাব্দীর ঘটনা। মার্গারিটের সঙ্গে আমার তর্ক করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আমি ইংরেজদের ধামাধরা নই। ইংরেজদের নিন্দে করার সময় মার্গারিটের চোখমুখ জ্বলজ্বল করে, কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ায়, ছটফট করে, তা দেখে আমি হাসি খুব।

একদিন মার্গারিট জিগ্যেস করল, তুমি আমার আগে আর কোনও ফরাসি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ?

আমি ওকে কলকাতায় আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর তরুণী শিক্ষয়িত্রীদের গল্প বলি। তা ছাড়া কলকাতা তখনও একটা আন্তর্জাতিক শহর, বহু বিদেশিরা আসত, কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস (দেওয়ালে কী সুন্দর ফ্রেস্কো ছিল তখন!)। একবার তিনটি ফরাসি মেয়ে আমাদের টেবিলে বসে গল্প করে গিয়েছিল সারা সন্ধে। অনেক ছেলেবেলায় আমি একবার চন্দননগরে গিয়েছিলাম, তখনও ওই শহরটা ছিল ফরাসি-কলোনি, খাঁটি ফরাসিদের বেশ কয়েকটি দোকান ছিল, এক দিদিমার বয়েসি ফরাসি মহিলা দোকানদারনি আমার গাল টিপে দিয়েছিলেন।

চন্দননগরের নাম শুনে মার্গারিট উত্তেজিত হয়ে বলল, উই, উই, স্যান্দারনাগার, স্যান্দারনাগার! সেটা বুঝি কলকাতার কাছেই? ইস, সুনীল, দুশো বছর আগে ফরাসিরা যদি বুদ্ধি করে ইন্ডিয়াটা জিতে নিত ইংরেজদের কাছ থেকে, তা হলে তোমরা ওই বিচ্ছিরি ইংরিজি কালচারের বদলে কত উন্নত একটা কালচারের ঘনিষ্ঠ হতে।

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, অ্যাই! তোমারও বুঝি কলোনিয়াল মেন্টালিটি আছে? তুমি আমার কাছে মেমসাহেব হতে চাও!

মার্গারিট একটু লজ্জা পেয়ে বলল, তা নয়, তা নয়, আমি যেকোনও জাতির ওপরেই অন্য জাতের আধিপত্য ঘেন্না করি। কিন্তু সেই সময়, দুশো বছর আগে, ইউরোপীয় লুঠেরাদের সঙ্গে

লড়াই করার মতন ক্ষমতা তো ভারতবর্ষের ছিল না। কেউ না কেউ ওই দেশটা জয় করে নিতই। সেইজন্যই বলছি, ইংরেজদের বদলে ফরাসিরাও তো নিতে পারত। চন্দননগরে আমাদের সেনাপতি দুপ্লে, তিনি বড় বীর ছিলেন, ইচ্ছে করলে ক্লাইভকে ছাতু করে দিতে পারতেন, কিন্তু তখন প্যারিসে নানারকম বিশৃঙ্খলা চলছে, মেইন ল্যান্ড থেকে দুপ্লেকে কোনও সাহায্যই পাঠানো হল না। কী দুর্ভাগ্য।

আমি বললাম, নেপোলিয়ানেরও তো ভারত জয় করার খুব ইচ্ছে ছিল।

মার্গারিট বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। জানো, বাচ্চা বয়েসে বোনাপার্ট যখন ক্যাডেট কলেজে ছাত্র, তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল, ভারত নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতরকম জাতপাতের ভেদ, তাও তিনি জানতেন।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান যখন ইজিপ্ট অভিযানে গিয়েছিলেন, তখন তো উনি কোরানও পাঠ করেছিলেন জাহাজে বসে। সেখানকার মুসলমানদের মন জয় করবার জন্য তিনি তখন কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিতেন নিজের সুবিধেমতন। ইজিপ্টে গিয়ে উনি একটা নতুন নামও নিয়েছিলেন না? সুলতান এল কেবির!

মার্গারিট অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, তুমি এটাও জানো? কী করে জানলে?

আমি বললাম, এমিল লুডউইগের লেখা নেপোলিয়ানের জীবনী পড়লেই জানা যায়। সে বই কে না পড়েছে!

মার্গারিট বলল, ফরাসি বিপ্লবের সময় তো চার্চের অধিকার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় নেতারা সবাই নাস্তিক হয়ে পড়েছিলেন, তোমার মতন। ফরাসি দেশে তখন কোনও ধর্ম ছিল না। নেপোলিয়ান ইজিপ্টে গিয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছিলেন, খ্রিস্টান-বিদ্বেষী মুসলমানদের কাছে গিয়ে বললেন, দ্যাখো, ইসলামের সঙ্গে আমাদের বিশেষ তফাত নেই! বাইবেলের মতন কোরানের বাণীও আমরা মেনে নিতে পারি। তবে উনি ইজিপ্টে যাওয়ার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলেন, ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যের দিকে এগোবেন। আসলে নেপোলিয়ান তো ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ কর্সিকার লোক, সুতরাং তাঁকে হাফ ওরিয়েন্টাল বলতে পারো। ভারত ছিল ওঁর অবসেশান। উনি ঠিক করেছিলেন, ইজিপ্টে পনেরো হাজার সৈন্য রেখে, আর তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আলোকজান্দারের মতন, পারস্যের ভেতর দিয়ে ভারতে পৌঁছবেন। এই জন্য বুদ্ধি করে তিনি পারস্যের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ না করে, তাঁর দেশের ওপর দিয়ে শুধু গমনাগমনের অধিকার চেয়েছিলেন। সকলেরই প্রধান শত্রু ইংরেজ, সুতরাং নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন একটা ইংরেজ-বিরোধী সম্মিলিত শক্তি গড়ে তুলতে।

আমি বললাম, নেপোলিয়ান আমাদের টিপু সুলতানকেও চিঠি লিখেছিলেন জানি।

মার্গারিট হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিপু, টিপু সাহিব!

বেশ কিছুক্ষণ ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে নেপোলিয়ান সম্পর্কে কথা বলে যাচ্ছিল মার্গারিট, আমি তাকে এক সময় খানিকটা রূঢ়ভাবেই থামিয়ে দিই। অনেক রম্য-ইতিহাসে, ফিল্মে নেপোলিয়ানকে একটি রোমান্টিক চরিত্র বানানো হয়েছে, 'মেরি ওয়ালেউস্কা' নামে একটা হলিউডের ছবিতে চার্লস বোয়ার অপূর্ব অভিনয় করে নেপোলিয়ানকে এক ট্র্যাজিক স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেব ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তবু আমি কোনওকালেই নেপোলিয়ানের ভক্ত নই। ইতিহাসের এই সব বিখ্যাত চরিত্রগুলি তো আসলে বিখ্যাত খুনী। নেপোলিয়ানও এক রক্তলোলুপ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বৈরাচারী ছাড়া আর কী। হিটলারের সঙ্গে তাঁর তফাত অতি সামান্য।

আমি মার্গারিটকে জিগ্যেস করলাম, তোমরা ফরাসিরা বুঝি নেপোলিয়ানকে এখনও খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করো?

একটু থতোমতো খেয়ে মার্গারিট বলল, না। আমরা, অন্তত আমি, ভালোবাসি বোনাপার্টকে। যে বোনাপার্ট ছিলেন সেনাপতি ও কনসাল, যিনি ফরাসি দেশে প্রথম আইন-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন, যিনি দর্শন-কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি শুধু নেপোলিয়ান হলেন, সেদিন থেকে তাঁকে আর পছন্দ করতে পারি না।

আমি বললাম, অর্থাৎ যেদিন থেকে তিনি সম্রাট হলেন! পোপের সামনে নেপোলিয়ান রাজমুকুটটা নিজেই নিজের মাথায় পরে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেই মুকুটটা তাঁর দিকে কে এগিয়ে দিয়েছিল? তোমরা ফরাসিরাই দাওনি? তাঁর নামে নতুন যে মুদ্রা বেরোয়, তাতে 'প্রজাতন্ত্রের সংবিধানসম্মত সম্রাট' লেখা ছিল না? সোনার পাথরবাটি! কাঁঠালের আমসত্ত্ব। প্রজাতন্ত্রের আবার সম্রাট!

মার্গারিট হাসতে-হাসতে বলল, ওটা উনি নিজেই লিখিয়েছিলেন। আসলে উনি বরাবরই ছিলেন ছেলেমানুষ! জানো, করোনেশানের সময় উনি ওঁর ভাই জোসেফকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, ইস, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন! বাবা যদি আমাকে এই মুকুটপরা অবস্থায় দেখতেন।

মার্গারিট যাই বলুক, যে নেপোলিয়ান ফরাসি জাতটাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই মানুষটি সম্পর্কে ফরাসিদের এখনও বেশ দুর্বলতা আছে মনে হয়। হিটলারও তো এই একই স্বপ্ন দেখিয়ে জার্মান জাতটাকে চুপ করিয়ে রেখেছিলেন। দেশপ্রেম অতি অন্ধ কুসংস্কার!

মার্গারিট আমেরিকানদেরও খুব বিরোধী। যখন তখন মার্কিনিদের চুটিয়ে নিন্দে করে। ফরাসিদের তুলনায় আমেরিকানরা যেন কোনও ব্যাপারেই নখের যোগ্য নয়। আমরা দুজনেই আমেরিকানদের পয়সায় খাচ্ছি-দাচ্ছি, আবার সেই দেশে থেকেই তাদের নিন্দে করছি ঘরের মধ্যে বসে। অবশ্য আমেরিকানদের নিন্দে ঘরের মধ্যে গোপনে করার দরকার হয় না, প্রকাশ্যেই যা খুশি বলা যায়, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা সেই সব শুনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ইটস্ আ ফ্রি কানট্রি!

শুধু মার্গারিট নয়, সেই ষাটের দশক পর্যন্ত অধিকাংশ ফরাসিই ছিল উগ্র আমেরিকান-বিদ্বেষী। তার একটা সহজবোধ্য কারণও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি তখনও দগদগে হয়ে আছে। অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস, ফিল্ম-নাটকই যুদ্ধের পটভূমিকায়। স্বাভাবিক কারণেই হলিউডের ফিল্মগুলিতে আমেরিকানদের শৌর্য-বীর্যই বড় করে দেখানো হয়, যেমন সোভিয়েত ফিল্মগুলিতে থাকে শুধু সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় অভিযান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শুরুতেই জার্মানির থাপ্পড় খেয়ে ফ্রান্স ধরাশায়ী হয়েছিল। বেশ কয়েকটা বছর ফ্রান্সের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল নাতসি বাহিনী। এইরকম সময়ে যা হয়, কিছু ফরাসি জার্মানদের পা চেটেছে, সেনাপতি দ্য গল পালিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ডে বসে গঠন করেছেন প্রবাসী সরকার আর দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক ফরাসিরা দেশের মধ্য থেকেই গোপনে গোপনে চালিয়েছে রেজিস্টান্স মুভমেন্ট বা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু ফরাসি দেশ জার্মানদের কবল থেকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয় নর্মান্ডিতে মিত্রবাহিনী অবতরণের পর। যে মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল আমেরিকা। বিজয়ীর গরিমা নিয়ে মার্কিন সৈন্যরা প্রবেশ করে প্যারিসে। এই জয়-কাহিনি আমেরিকান গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রে ঢাকঢোল পিটিয়ে বারবার তো বলা হবেই। কিন্তু এজন্যে ফরাসিরা কি চিরকাল আমেরিকানদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা অতি দুর্লভ বস্তু। কোনও বড় দেশ কোনও ছোট দেশের উপকার করলে অচিরেই সেই ছোট দেশটি বড় দেশের শত্রু হয়ে ওঠে। সামরিক শত্রুতা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে নিন্দে-গালাগালির বন্যা বয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যান্ড-হাঙ্গেরি-চেকোস্লোভাকিয়া-বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশগুলিকে মুক্ত করলেও সেখানে খুব বেশিদিন জনপ্রিয় থাকেনি। আয়ওয়াতে আমি যে বাড়িতে থাকি, সে বাড়িরই দোতলায় রয়েছে এক পোলিশ লেখক, তার নাম ক্রিস্তফ জারজেস্কি। বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ হবে, কিন্তু মাথার চুল ধপধপে সাদা, সেইজন্যই বোধ হয় সব সময় টুপি পরে থাকে। ক্রিস্তফ অত্যন্ত বিনয়ী ও আদব-কায়দা দুরস্ত। প্রত্যেকবার দেখা হলে সে করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, মার্গারিটকে দেখলে সে মাথার থেকে টুপি খুলে, শরীর একটু বেকিঁয়ে গ্রিট করে। মার্গারিট এলে আমার ঘরে সে মাঝে মাঝে

আড্ডা দিতে আসে। ক্রিস্তফ এমনিতে সাবধানী ধরনের মানুষ, প্রকাশ্যে একটাও বেফাঁস কথা বলে না। কিন্তু মার্গারিট যখন আমেরিকানদের নিন্দে করে, তখন সে মুচকি মুচকি হাসে, তারপর বলে, রুশ নেতারা আমাদের দেশে কী করেছে শুনবে? তারপর সে এমন সব রুশ-বিরোধী রসিকতা শোনায় যা শুনলে চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। ওদের দেশের পার্টির কর্তাব্যক্তিরা এই সব রসিকতা শুনলে নিশ্চয় ক্রিস্তফ-কে জেলে দিত। রসিকতার ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ আছে প্রখ্যাত চেক লেখক মিলান কুন্দেরার 'দা জোক' নামের উপন্যাসে। প্রাগ শহরে কলেজের একটি ছাত্র ইয়ার্কি করে তার বান্ধবীকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিল, তার মধ্যে ছিল ট্রটস্কির নাম। সেখানে ট্রটস্কি মানে লেনিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কি নন, শরীরের একটি গোপন অঙ্গ। সেই পোস্টকার্ড ইউনিয়ানের এক পার্টির সেক্রেটারির হাতে পড়েছিল, সে কিছুতেই রসিকাতাটা বুঝতে চাইল না। সামান্য একটা পোস্টকার্ড উপলক্ষ করে ওই ছেলেটি ও তার বান্ধবী, দুজনেরই বাকি জীবন ধ্বংস হয়ে গেল।

নভেম্বরের শেষ থেকেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শোঁ-শোঁ বাতাসে রাস্তার পাশের উইলো গাছগুলো কাঁদে। এখানে ঠিক কবে থেকে তুষারপাত শুরু হবে, তা নিয়ে টিভিতে, খবরের কাগজে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। অনেক রকম পুরস্কার থাকে। মার্গারিট প্রত্যেকবার সে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েও কিছু পায়নি। নভেম্বরেই তুষারপাত ফ্রান্সে হয়তো দুর্লভ ঘটনা, তাই সে ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। এখানে প্রথম দিনটি ছিল খুবই রোদ্দুর ঝকঝকে, সুপারমার্কেট থেকে মাংস-আনাজপত্র কিনে বড় বড় ঠোঙা হাতে আমি হেঁটে ফিরছিলাম; পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ আলো কমে এল, খুব ছোট ছোট পাখির পালকের মতন দুলতে-দুলতে নামতে লাগল তুষার। দৃশ্য দেখতে সত্যি অপরূপ। আকাশে কোথায় জমে ছিল এত তুষার? মার্গারিট আমার পাশে পাশে হাঁটছিল, তার ঠোঙাগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সে আনন্দে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে।

আমি একবার বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে খিলান মার্গে তুষারপাত দেখেছি। সুতরাং এ অভিজ্ঞতা আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। কিন্তু যেটা আমার কাছে একেবারে অভিনব, তা হল নদী জমে যাওয়া। কালো রঙের আয়ওয়া নদী একটু একটু করে সাদা হতে শুরু করল। তারপর এক সময়ে একেবারে জমাট বরফ, পুরো নদীটাই যেন একটা রাস্তা, কেউ কেউ তার ওপর ছোটাছুটি করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়ার দায়-দায়িত্ব নেই, তাই সকালের দিকে তুষারপাত শুরু হলে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠিই না, চওড়া কাচের জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখি। মার্গারিটকে খুব সকালবেলা ক্লাস নিতে যেতে হয়। ক্যাম্পাস থেকে ওর হস্টেলটা খানিকটা দূরে, বরং আমার বাড়িটাই বেশ কাছে। মাঝে দু-একটা পিরিয়ড অফ থাকলে মার্গারিট ছুটে চলে আসে আমার অ্যাপার্টমেন্টে। ওকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছি। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখলে ও ছদ্ম-ঈর্ষায় বলে, ইস কী মজা তোমার। কেল ভি। তুমি প্রভুর মতন দুপুরের আগে বিছানা ছাড়ো না!

মার্গারিট আমাকে চা-কফি বানিয়ে দেয়। কোনও কোনওদিন এসে বলে, আজ ব্রেকফাস্ট খাবারও সময় পাইনি, খুব খিদে পেয়েছে, আমাকে কী খাওয়াবে?

আমি তড়াক করে উঠে পড়ে বলি, দাঁড়াও, খুব ভালো ওমলেট বানাতে শুরু করেছি। তোমাকে আজ মস্ত বড় একটা ওমলেট খাওয়াব!

মার্গারিট চোখ বড় বড় করে বলল, মস্ত বড় ওমলেট? পেলিক্যানের ডিমের নাকি?

আমি বললাম, না, পেলিকানের ডিম কোথায় পাব?

মার্গারিট বলল, তুমি কবি রোবেয়ার দেনোর নাম শুনেছ? খুব ভালো কবি ছিলেন, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। রেজিটান্স মুভমেন্টে ছিলেন, ধরা পড়ে জার্মানি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে ছিলেন। তাঁর বেশ মজার একটা কবিতা আছে শুনবে?

ক্যাপটেন জোনাথন আঠারো বছর বয়সে

দূর প্রাচ্যের এক দ্বীপে ধরলেন এক পেলিকান

জোনাথনের সেই পেলিক্যান একদিন সকালে
ডিম পাড়ল একটা ধপধপে সাদা, এবং কী আশ্চর্য
তার থেকে বেরিয়ে এল ঠিক আগেরটার মতন এক পেলিকান
এই দ্বিতীয় পেলিকানটাও যথাসময়ে
একটা সাদ ডিম পাড়ল, এবং তার থেকে
অবধারিতভাবেই এল আর একটি এবং এইরকম চলতেই থাকল...

এই পর্যন্ত বলার পর থেমে গিয়ে মার্গারিট জিগ্যেস করল, এর পর কী বলো তো?
আমি ভুরু তুলে রইলাম।
মার্গারিট হাসতে-হাসতে বলল শেষটাই তো আসল!

এই ব্যাপারটা চলতে পারে বহুকাল ধরেই
যদি না কেউ মাঝপথে একটা ওমলেট বানিয়ে নেয়।

রান্নাঘরের গ্যাস স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে কবিতা কিংবা ফরাসি দেশের নানান গল্প শোনায়। আমেরিকায় পৌঁছবার দু-তিন মাসের মধ্যেও মার্কিন সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ঘটল না। কিন্তু মার্গারিটের সুবাদে আমার অদেখা দেশ ফ্রান্স সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানার সুযোগ হল। আমাকে ফরাসি ভাষা শেখাবার জন্যও মার্গারিট বদ্ধপরিকর!

এরই মধ্যে একদিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমার পোলিশ বন্ধু ত্রিস্তফ বলল, সুনীল, আজ ইউনিয়ন ক্যান্টিনে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। একজন বলল, সুনীল নামে ওই ইন্ডিয়ান ছেলেটা মার্গারিট ম্যাতিউর পাল্লায় পড়েছে? এরপর ও বুঝবে ঠ্যালা। কেন এ কথা বলল বলো তো?

শুনে আমার যতটা না বিস্ময়, তার চেয়েও বেশি রাগ হল। মার্গারিট সম্পর্কে এরকম উক্তির মানে কী? মার্গারিটের স্বভাব অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও স্বার্থের লেশমাত্র নেই। অন্যদের অনেক উপকার করতেও আমি ওকে দেখেছি। ও কখনও মিথ্যে কথা বলে না, একটু পাগলি ধরনের, একটু টেম্পারামেন্টাল ঠিকই, কিন্তু কোনওরকম প্রবঞ্চনা ওর চরিত্রে থাকতেই পারে না। আমি মানুষ চিনি না?

তখন আমার মনে পড়ল, পল এঙ্গেলের একজন সহকারী, মার্ক ডগলাস নামে এক তরুণ লেখক দু-তিন দিন আগে আমায় জিগ্যেস করেছিল, ফরাসি ডিপার্টমেন্টের মার্গারিট তোমার বান্ধবী? এই প্রশ্নের সঙ্গে খানিকটা কৌতুক এবং অনেকটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল মার্কের মুখে।

এখানে ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কেউ কোনও মন্তব্যও করে না। তবু মার্গারিট সম্পর্কে এরকম প্রশ্ন, এমন বিস্ময় কেন?

॥ ৫ ॥

"লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল

তোমারই জন্য
হে আমার প্রেম..."
—জাক প্রেভের

মার্গারিট আমার দু বছর আগে এদেশে এসেছে, সে অনেককে চেনে, অনেকেই তাকে চেনে। কিন্তু কারুর সঙ্গেই তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। রাস্তায় ঘাটে কিংবা ক্যান্টিনে-রেস্তোরাঁয় অনেক যুবকই তার সঙ্গে যেচে কথা বলে, তার সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখায়। মার্গারিটকে তেমন একটা রূপসি বলা যায় না, বেশ লম্বা বড়সড়ো চেহারা, নাক-চোখ এমন কিছু আহামরি নয়, তবে সব মিলিয়ে একটা আলগা লাবণ্য আছে, মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে। তার মাথাভরতি সোনালি চুল সব সময় ছড়োকুড়ো, মনে হয় জীবনে কখনও আঁচড়ায় না, সাজ-পোশাকের দিকে কোনও মনোযোগ নেই, সে কথা বলে ঝড়ের গতিতে, রাস্তা দিয়ে হাঁটার বদলে ছোটে, যে-কোনও ছোটখাটো ব্যাপারেও তার দারুণ বিস্ময় ও ভালোলাগা, সর্বক্ষণ যেন জীবনীশক্তিতে টগবগ করছে। সব মিলিয়ে সে এক আকর্ষণীয়া নারী, তা ছাড়া ফরাসিনী বলেও একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ আছে। আমেরিকান যুবকরা পাল্লা দিয়ে তার পাশাপাশি হাঁটে, ক্যান্টিন-রেস্তোরাঁয় নিজের টেবিলে ডেকে বসাতে চায়, মার্গারিট আপত্তিও করে না, তাদের সঙ্গে হেসে গল্প করে, কিন্তু বেশিক্ষণ না, দশ-পনেরো মিনিট বাদে সে সরে যায়।

শুক্র-শনিবার সন্ধেবেলা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডেটিং এখানে প্রায় একটা অবশ্য পালনীয় রীতি। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য ডেট করা মানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের সন্ধেবেলায় একসঙ্গে কোথাও খেতে যাওয়া, বেড়ানো, সিনেমা দেখা, গল্প করা ও বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু শুক্র-শনিবার সন্ধ্যায় কোনও মেয়ে যদি একলা বাড়িতে বসে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে, সে হয় অসুস্থ কিংবা তার মনে বা শরীরে কোনও খুঁত আছে। মার্গারিট যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী তরুণী। হাসি-ঠাট্টা-মজাতে কোনও ক্লান্তি নেই, তবু সে কারুর সঙ্গে ডেট করে না। সন্ধেগুলো লাইব্রেরিতে কাটায়।

আমি কানাঘুষো শুনলাম, গত বছর গ্রেগরি নামে আর্ট ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে মার্গারিটের প্রেমে পড়েছিল খুব। দিনের পর দিন সে মার্গারিটের সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকত, মার্গারিটের অনেকগুলো স্কেচও করেছিল, তারপর হঠাৎ ওদের মধ্যে কী হল তা আর জানা যায় না, ওদের বিচ্ছেদ হল তো বটেই, গ্রেগরি এমন মুষড়ে পড়ল যে অনেকের ধারণা হল, তার মেলানকোলিয়া রোগ হয়েছে। কিছুদিন পরেই গ্রেগরি এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল।

আরও কয়েকজন যুবকের ব্যবহারে লক্ষ করেছি, মার্গারিট সম্পর্কে বেশ একটা রাগ-রাগ ভাব। খুব সম্ভবত তারাও মার্গারিটের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে পাত্তা পায়নি।

এই সব ঘটনা জেনেও মার্গারিটকে কিছু জিগ্যেস করতে পারি না, আমার বাধো-বাধো লাগে।

আমার সঙ্গে মার্গারিটের একটা সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যেই। আমি সকালের দিকে বেশি বেরুই না। মার্গারিটই যখন তখন আমার ঘরে চলে আসে। মার্গারিট কবিতা নিয়েই কথা বলতে ভালোবাসে বেশি, তা ছাড়া সে আমাকে ইউনিভার্সিটি ক্যামপাসের নানারকম গল্প শোনায়। সেই গল্পে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, অনেক দিন আমরা দুজনে মিলে রান্না করি, আমার তৈরি খিচুড়ি (প্রায় জগাখিচুড়ি বলা যায়) খেয়ে মার্গারিট মুগ্ধ, এক একদিন সে বাইরে থেকেও নানা রকম খাবার কিনে আনে।

আমি লক্ষ করেছি, টাকা পয়সা সম্পর্কে মার্গারিটের বিন্দুমাত্র মোহ নেই। টাকার হিসেব করতেও যেন জানে না। ও যা উপার্জন করে, মাসের গোড়ার দিকেই তা দু' হাতে খরচ করতে থাকে, মাসের শেষে কীভাবে চলবে, তা চিন্তাও করে না। পরোপকারের দিকে তার খুব বেশি ঝোঁক।

কোনও আড্ডাতে কেউ যদি দৈবাৎ বলে ফেলে, আমি অমুক জিনিসটা খুঁজছি, কিছুতেই পাচ্ছি না, তা হলে মার্গারিট নিশ্চিত পরের দিন সারা শহরের সব কটি দোকান ঢুঁড়ে সেই জিনিসটা কিনে এনে দেবে, তার দাম নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। লিন্ডা নামে আমাদের দুজনেরই পরিচিত একটি মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে শিকাগো যাওয়ার পথে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে পড়ে, লিন্ডার দুটি চোখই নষ্ট হয়ে যায়। মার্গারিট তার জন্য কেঁদে ভাসিয়েছে, লিন্ডা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর নিয়মিত তার সেবা করেছে। এখানে কালো মানুষের সংখ্যা কম, তবু রাস্তায় কখনও কোনও গরিব কালো লোক দেখলে মার্গারিট আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করবে নানারকম, এর ফলে তাকে দু-একবার বেশ বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে, কিন্তু মার্গারিটের যেন সে বোধই নেই। তার হৃদয়ে মায়া-মমতা, পরের জন্য সহানুভূতি, এই সবই যেন বেশি বেশি। সে কখনও পরনিন্দা করে না, আমি একবারও তার মুখে কোনও ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে মন্দ কথা শুনিনি।

মার্গারিট ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম কিংবা রাইটার্স ওয়ার্কশপের সঙ্গে যুক্ত নয়, সুতরাং যেসব পার্টিতে আমি আমন্ত্রিত হই, তার অনেকগুলিতেই মার্গারিটের নেমন্তন্ন থাকে না। তার জন্য মাঝে মাঝে আমি খুব অস্বস্তিতে পড়ি। আমার ঘরে বসে মার্গারিট আর আমি হয়তো কোনও কবিতা পড়ছি, মার্গারিট ফরাসি ভাষা থেকে আক্ষরিক অনুবাদ করে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় পল এঙ্গেলের টেলিফোন। পলের সব সময়েই ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। পল বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আমি এসে তোমাকে গাড়িতে তুলে নেব, পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া একজন লেখক এসেছেন, তাঁর সম্মানে পার্টি।

আমার দ্বিধা হয়, মার্গারিটকে কী করে একা ফেলে চলে যাই। ও আমার জন্য পিৎসা এনে রেখেছে। দু'জনে একসঙ্গে খাওয়ার কথা। কিন্তু মার্গারিটই উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি যাও না, ঘুরে এসো, তোমার যাওয়া উচিত, আমি একলা একলা বসে কিছুক্ষণ পড়াশুনো করব। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। মার্গারিটের হস্টেলের ঘরটা একটি মেয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হয়, সে মেয়েটির বিরুদ্ধে মার্গারিট কোনও কথা বলেনি, তবু বোঝা যায়, দু'জনের রুচির খুব একটা মিল নেই। তাই হস্টেলের ঘরটার থেকে মার্গারিট আমার অ্যাপার্টমেন্ট বেশি পছন্দ করে। পার্টি থেকে ফিরে এসে আমি দেখি, টেবিলের ওপর মার্গারিট একটা সুন্দর চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে।

একদিন বিকেলবেলা খুব তুষারপাত আর ঝড়ো হাওয়া চলছে, মার্গারিট হঠাৎ এসে বলল, সামনের জঙ্গলটায় কী কাণ্ড হয়েছে, জানো? চলো, চলো, শিগগির দেখবে চলো!

তার কণ্ঠস্বরে এমনই ব্যগ্রতা যে মনে হয় সেই অবশ্যদ্রষ্টব্য ব্যাপারটির কাছে না যাওয়াটাই একটা পাপ। অতি দ্রুত জুতো-মোজা পরে, একটা ওভারকোট চাপিয়ে (ওভারকোটটা স্যালভেশান আর্মির দোকান থেকে অতি সস্তায় সেকেন্ড হ্যান্ড কেনা) বেরিয়ে পড়লাম। আমার বাড়ির রাস্তাটার নাম সাউথ ক্যাপিটাল, ডান দিকে একটুখানি এগোলেই একটা ছোট জঙ্গলমতন জায়গা, এলোমেলো গাছপালা ও অযত্নের জলাশয়, অনেক সময় এখানে হরিণ দেখা যায়। এদেশে হরিণ মারা নিষিদ্ধ, একদিন একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ বড় রাস্তায় এসে পড়ে সাংঘাতিক ট্র্যাফিক জ্যাম ঘটিয়ে দিয়েছিল, তবু কোনও একজনও হরিণটার গায়ে হাত ছোঁয়ায়নি।

সেই জঙ্গলের প্রান্তে এসে মার্গারিট আমাকে একটা মরা পাখি দেখাল।

পাখিটা শীতে জমে শক্ত হয়ে গেছে। চড়ুই পাখির চেয়ে একটু বড় আকারের, মোটাসোটা ধরনের, পাখিটার নাম জানি না। এরা বোধহয় বেশি উড়তে পারে না, সেইজন্য শীতের সময় চলে যেতে পারে না গরম দেশে, আবার চড়ুই পাখির মতন মানুষের কোঠাবাড়ির আশ্রয়ের উষ্ণতাও নিতে জানে না। তাই শীতের কামড়ে অসহায়ভাবে মরে।

প্রায় এক ফুটের মতন বরফ জমে গেছে মাটির ওপর, এদিক-ওদিকে আরও কয়েকটা মৃত পাখি দেখা গেল। মার্গারিট সেই বরফের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পাখিগুলো কুড়োতে লাগল। ফিসফিস

পরে ফরাসিতে বলল :

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চিরজীবনের শেষ...

আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি, মার্গারিট অঞ্জলিতে মৃত পাখি নিয়ে কবিতা পাঠ করছে। আমারই যেন অন্য একটা স্বরূপ একটু দূর থেকে দেখছে এই দৃশ্য।

এক সময় মার্গারিট তার কাতর মুখখানি তুলে জিগ্যেস করল, পাখিগুলো এইভাবে পড়ে থাকবে? আমরা ওদের কবর দিতে পারি না?

মার্গারিটকে সাহায্য করবার জন্য আমি ওর পাশে বসে দু'হাত দিয়ে খুঁড়তে লাগলাম বরফ।

তখন আমার মনে হল, আমি একা গাছতলায় কোনও মৃত পাখি দেখলে হয়তো দু-এক মিনিট থমকে দাঁড়াতাম, পরে কোনও কবিতা লেখার সময় হয়তো এসে যেত এই দৃশ্যটা, কিন্তু ওই মৃত পাখিদের কবর দেওয়ার কথা তো কখনও আমার মনে আসত না। বাস্তবের মৃত পাখিটাকে ফেলে গিয়ে আমি তাকে ব্যবহার করতাম কবিতার রূপকল্পে। মার্গারিটের অনুভূতি কি আমার চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম? কিংবা এটা তার ছেলেমানুষি? কিংবা সে সব সময় কাব্যের মায়াময় জগতে বিচরণ করে?

মোট পাঁচটি পাখিকে বরফের নীচে চাপা দেওয়া হল। মার্গারিট তার ওপর এঁকে দিল ক্রুশ চিহ্ন। আমি গ্লাভস করে আসিনি, আমার আঙুলগুলো ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। ফ্রস্ট-বাইট না হয়ে যায়। মার্গারিট স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, আমি তাকে তাড়া দিয়ে বললাম, শিগগির ঘরে চলো—

প্রায় ছুটতে-ছুটতে ফিরে এসে, অ্যাপার্টমেন্টের উষ্ণতায় কাঁপুনি থামল। এখন শরীরটাকে চাঙ্গা করা দরকার। মার্গারিট কয়েকদিন আগে আমাকে এক বোতল রেমি মারথ্যাঁ উপহার দিয়েছিল, দুটি গেলাসে ঢেলে ফেললাম চটপট। মার্গারিট তার গেলাসটা হাতে নিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের তুষার ধারাপাত দেখতে লাগল একমনে।

আমি পাশে এসে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে জিগ্যেস করলাম, তুমি তখন যে কবিতাটা বললে, ওটা কার?

মার্গারিট বলল, রেনে শার-এর। তুমি চিনতে পারোনি?

আমি বললাম, রেনে শার-এর নাম শুনেছি, ওঁর কবিতা বিশেষ কিছু পড়িনি।

মার্গারিট বলল, ফরাসি ভাষার জীবিত কবিদের মধ্যে প্রধান এই রেনে-শার। ফরাসিরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কারণ তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, নিজে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছেন।

আমি বললাম, তোমাদের অনেক সাহিত্যিক-সাংবাদিকই প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন, তাই না?

মার্গারিট বলল, রেনে শার-এর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। তিনি আমাদের জাতীয় বীর। আবার খুব বড় কবি। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানো, রেনে-শার তাঁর দেশপ্রেমের সঙ্গে কবিতাকে মেশাননি। তিনি লড়াই করেছেন প্রাণপণে কিন্তু কখনও দেশাত্মবোধক কবিতা বা উত্তেজক কবিতা বা চ্যাঁচামেচির কবিতা লেখেননি। তিনি মনে করতেন, কবিতা অতি বিশুদ্ধ শিল্প, তার মধ্যে যুদ্ধ-টুদ্ধ মেশানো উচিত নয়। কবিতা দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না, সে চেষ্টা করতে গেলে, সেগুলো কবিতাও হয় না, অস্ত্রও হয় না।

আমি বললাম, তুমি ওই ওরিওল পাখি বিষয়ে মূল কবিতাটা আর একবার শোনাও তো।

কবিতা পাঠের সময় মার্গারিটের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে যায়, ভেতরে যেন একটা আলো জ্বলে ওঠে। ও সময়ে তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

পাঠ শেষ হলে আমি মার্গারিটকে আমার দিকে আকর্ষণ করে মৃদু গলায় জিগ্যেস করলাম, তোমাকে একটা চুমু খাব?

সঙ্গে-সঙ্গে যেন চিনে লণ্ঠনের ভেতরের বাতিটা নিভে গেল। বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখখানা। আমার হাত ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। কী হল ব্যাপারটা, আমি কি কোনও অন্যায় করেছি? একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর তাকে চুমু খেতে চাওয়া তো পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাও তো আমি জোর করিনি। ওর কাছে অনুমতি চেয়েছি মাত্র। আমি প্রাচ্যদেশীয়, কালো লোক বলে ওর আপত্তি? তা হতেই পারে না। এই কদিনের পরিচয়ে আমি বুঝেছি, কালো-সাদার বিভেদ নিয়ে মার্গারিটের কোনও রকম সংস্কার নেই। মার্গারিটের এঁটো জ্ঞানও নেই, আমার হাত থেকে ও যখন তখন জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে টানে, আমার গেলাসের পানীয়তে বিনা দ্বিধায় চুমুক দেয়, তবে একটা চুম্বনে কিসের দ্বিধা।

মার্গারিট কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি জানতাম একদিন এরকম হবে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম, ...সুনীল, তোমার কাছে আসতে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমি শরীরিক সম্পর্কে বিশ্বাস করি না; এই যে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা, পারস্পরিক ভালোবাসা আছে কি না তার তোয়াক্কা করে না, ভালোবাসার কিছু বোঝেই না, তবু যখন তখন শুয়ে পড়ে, আমি এটা বিষম ঘৃণা করি। আমি কখনও কারুর সঙ্গে...আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ভারতীয়রা শরীরের পবিত্রতায় বিশ্বাস করো...কিন্তু তুমি কবি...আমি পারব না, সুনীল, আমায় ক্ষমা করো...

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, আমার চাই না, এমনিই হঠাৎ বলেছি, তোমার যদি ইচ্ছে না হয়—

মার্গারিট বলল, না, তুমি একবার মুখ ফুটে বলেছ, তুমি পুরুষ, আমি বাধা দিলে তুমি অপমানিত হবে, তোমার রাগ হবে, তোমার ভেতরে-ভেতরে সব সময় ইচ্ছেটা থাকবে, তুমি স্বাভাবিক হতে পারবে না, তুমি বিশ্বাস করো সুনীল, আমি শুধু তোমাকে বাধা দিচ্ছি না, আমি জীবনে এ পর্যন্ত কোনও পুরুষকেই চুম্বন করিনি।

এবার আমার স্তম্ভিত হওয়ার মতন অবস্থা। বলে কী? একটি সাতাশ বছরের স্বাধীনা ফরাসিনি মেয়ে, সে এ পর্যন্ত একটাও চুমু খায়নি। অথচ আমাদের ধারণা, সব ফরাসি মেয়েদের ষোলো-সতেরো বছর বয়েসে যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। আমেরিকান মেয়েদের যে অনেকেরই হয় তা তো স্বীকৃত সত্য। গল্প-উপন্যাস পড়ে আমাদের মনে হয়, ফরাসি মেয়েরা যৌন লীলাখেলায় সর্বক্ষণ মেতে থাকে। অথচ আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এক মূর্তিমতী ব্যতিক্রমকে।

মার্গারিট যে মিথ্যে কথা বলছে না, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। মিথ্যে ব্যাপারটাই নেই ওর চরিত্রের মধ্যে। গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে, ওর দুই বোন সন্ন্যাসিনী, মার্গারিটের মনের মধ্যেও কি রয়ে গেছে কোনও ধর্মীয় সংস্কার? ওর সারা মুখখানি এখন বেদনাময়।

আমি ওর হাত চেপে ধরে ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে বললাম, ঠিক আছে, আমি ওই প্রসঙ্গই আর তুলব না, প্লিজ, প্লিজ, তুমি শান্ত হও, তুমি আমাকে রেনে শার-এর আরও দু'একটা কবিতা শোনাও।

কিন্তু মার্গারিটকে কিছুতেই আর ধরে রাখা গেল না। জোর করেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি এখন আর থাকতে পারব না, সুনীল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি এখন একা একা প্রার্থনা করব, তোমার কথায় আমি একটুও রাগ করিনি, হয়তো আমারই দোষ , আমি প্রথম দিনেই তোমাকে কিছু বলিনি, আমাকে ছেড়ে দাও।

সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মার্গারিট বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওর হস্টেল প্রায় এক মাইল দূরে। জানলা দিয়ে আমি দেখলাম, মার্গারিট মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছে, কী জানি কাঁদছে কি না। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার আর কী করা উচিত

পেলে পাইনি। এক সময় মার্গারিট মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

তারপর তিন চারদিন তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

ভ্রমণকাহিনিতে একটি মেয়েকে চুম্বন করা হল কি হল না, এর উল্লেখ অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু যে-কোনও ভ্রমণকাহিনিই তো আসলে আত্মজীবনীরও একটা টুকরো অংশ। আমার জীবনের এই অতি ব্যক্তিগত ব্যাপারটি আমি অকপটে বর্ণনা করছি, তার কারণ ওই ঘটনাটি নিয়ে সেই সময়ে আমার মনে যে একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, সেটা আমি প্রকাশ করতে চাই।

আমি একটি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করেছি, নিজেও লেখালেখি করেছি কিছু, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য বিশেষ কিছু পড়াশুনো করিনি, সুযোগও পেয়েছি কম। যদিও বিশ্বের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে একটা অসীম ক্ষুধা অনুভব করতাম। নিজেদের লেখা নিয়ে লাফালাফি বা আত্মশ্লাঘা করতে গিয়ে এক এক সময় থমকে মনে হত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কী লেখা হয়েছে, কতখানি লেখা হয়েছে, তাও তো জানা দরকার। নিছক কূপমণ্ডূপের মতন কয়েকজন বন্ধু মিলে পরস্পর পরস্পরের পিঠ চাপড়ানি দিলেই তো হয় না, তাতে বেশিদূর এগোনো যায় না। বাংলায় অনুবাদ শাখাটি বেশ দুর্বল। অন্যান্য ভাষার যা কিছু পড়েছি, সবই ইংরিজি অনুবাদে, তাও যে-টুকু পাওয়া যায়। সাধারণত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার সাহিত্য অনুবাদে জনপ্রিয় হয়। আমরা ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কাকে নিয়ে এক সময় এমন মাতামাতি করেছি, যেন তিনি একজন নতুন লোক। হাইনে কিংবা রিল্‌কে সমসাময়িক কবি! আমরা ইংরিজির মাধ্যমে কিছু ফরাসি কবিতা সম্পর্কে জেনে পুলকিত হয়েছি, কবিতাগুলির মূল শব্দের মর্ম গ্রহণ করতে পারিনি, টের পাইনি তার ঝঙ্কার। আমরা দেগা, গগ্যাঁ, ভ্যান গঘ, মাতিসের মূল ছবি একটাও দেখিনি, দেখেছি শুধু কিছু প্রিন্ট। সব কিছুতেই সেকেন্ড হ্যান্ড, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন।

মার্গারিটের সঙ্গে আকস্মিক পরিচয় আমার পক্ষে দারুণ সৌভাগ্যজনক হয়েছিল। সাহিত্য-শিল্প তার ধ্যানজ্ঞান। আমার সঙ্গে গল্পে, আড্ডায়, নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে, এমনকি এক সঙ্গে রান্না করতে করতেও সে ফরাসি কবি ও শিল্পীদের সম্পর্কে এমনভাবে সব কথা বলত, যা আজও আমি কোথাও পড়িনি। মূল ফরাসি কবিতার দু'তিন লাইন বলার পর প্রতিটি শব্দ ভেঙে-ভেঙে বুঝিয়ে দিলে, আমি পেয়ে যেতাম অনেক গূঢ় অর্থ। ফরাসি দেশের ছবি আঁকার বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে দুটো একটা ছোট ঘটনা তার মুখ থেকে শুনে পরিষ্কার হয়ে যেতে অনেক কিছু। সে আমার বান্ধবী, তবু তার থেকে আমি যা শিখছিলাম, কোনও গুরু বা শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান আমাকে তা শেখাতে পারত না। তার বন্ধুত্বের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আমার কাছে উপভোগ্য এবং মহার্ঘ।

আবার এ কথাও তো ঠিক, আমি তখন একটি স্বাস্থ্যবান, মুক্ত, পিছুটানহীন যুবক। একটি মেয়ের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক সঙ্গে কাটাই, অনেক সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে (শীতের দেশে কেউ কখনও ঘরের দরজা খুলে রাখে না) দুজনে থাকি, একই খাবার দুজনে ভাগ করে খাই, পরস্পরের ওপর বিশ্বাসও ন্যস্ত করেছি, তাহলে কোনও এক সময় সেই মেয়েটিকে কি আমার আদর করতে বা চুমু খেতে ইচ্ছে করবে না? এরকম ইচ্ছে না জাগাটাই তো অস্বাস্থ্যকর বা রুগির লক্ষণ। আমি দেশে কোনও বাগদত্তা কিংবা প্রেমিকা রেখে আসিনি যে তার প্রতি মিথ্যাচার হবে। মার্গারিটেরও কোনও প্রেমিক নেই। তাহলে কেন সে বাধা দেবে? তার ধর্মীয় সংস্কার যদি এত প্রবল হয়, তবে তা কি আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব?

মার্গারিট বলেছিল ভারতীয়রা নাকি শরীরের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে। ভারতীয়দের সম্পর্কে কতরকম ভুল ধারণা যে বিদেশে চালু আছে।

মার্গারিট আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি খুব ক্রুদ্ধ বা অপমানিত না হলেও খানিকটা যে আহত হয়েছিলাম, তাও ঠিক। আমার পৌরুষে ঘা লেগেছিল। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম,

অনেক আমেরিকান ছেলে কেন মার্গারিটের ওপর চটা। তারা কেউ কেউ মার্গারিটের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে অচিরেই শারীরিকভাবে কাছাকাছি আসতে চাইবেই। তারা সকলেই যে হৃদয়হীন তাও নয়, শরীরের মধ্য দিয়েই তারা হৃদয়কে খোঁজে। এটা অনেকটা সামাজিকভাবে স্বীকৃতও বটে। অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা যদি বাড়ির বাইরে ভোর রাত পর্যন্ত কাটিয়ে আসে, তাতেও বাবামায়েরা আর প্রকাশ্যে আপত্তি জানাতে পারেন না। সুতরাং মার্গারিট যদি কোনও ছেলেকে প্রত্যাখ্যান করে রূঢ় কথা শোনায়, তা হলে সে তো চটে লাল হবেই, তার কাছে মার্গারিটের এই ব্যবহার মনে হবে ন্যাকামি!

সারা সন্ধে আমি মাথা চেপে বসে রইলাম। মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কিছু একটা ভুল করে ফেলেছি, তবু নিজেকে ঠিক অপরাধী মনে করতে পারছি না। বারবার মনে পড়ছে, মার্গারিটের দারুণ নৈরাশ্য আর বেদনামাখা, মুখখানি। কী করুণভাবে হেঁটে গেল তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে। আমি যতটা আহত হয়েছি, মার্গারিট যেন আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমরা মনে করি আমরা অন্যায় করছি না, তবু আমাদের কোনও কোনও ব্যবহারে অন্য কেউ আঘাত পেতে পারে। এই সব উপলব্ধি আমার কাছে নতুন।

মার্গারিট আর আসবে না আমার কাছে? এ কথাটা ভাবতেই বুকটা বিষম খালি খালি মনে হতে লাগল। না, কোনও কিছুর বিনিময়েরই আমি মার্গারিটকে হারাতে রাজি নই!

॥ ৬ ॥

"বিদায় বিষাদ
স্বাগত বিষাদ
তুমি আঁকা আছো দেওয়ালের কড়িকাঠে
তুমি আঁকা আছো আমার ভালোবাসার চোখে
তুমি নও সম্পূর্ণ দুঃখ
কেননা দরিদ্রতম ওষ্ঠও তোমাকে
ফিরিয়ে দেয়
এক টুকরো হাসিতে..."

—পল এলুয়ার

মার্গারিট শুধু তার হাতব্যাগটা নিয়ে চলে গেছে, আমার ঘরে ছড়িয়ে আছে তার অনেক জিনিসপত্র। তার বই-খাতা, টাইপ-রাইটার, রেন কোট, এক জোড়া মোজা, আরও কত কি টুকিটাকি। আমাকেও এর মধ্যে সে উপহার দিয়েছে অনেক কিছু। যেমন একটা ড্রেসিং গাউন। দেশে থাকতে আমি বাংলা সিনেমার নায়িকাদের বাবাদেরই শুধু ড্রেসিং গাউন পরতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ যে আলখাল্লা পরতেন, সেটাও এক ধরনের ড্রেসিং গাউন বলা যায়। ও জিনিস গায়ে জড়াবার ইচ্ছে আমার কখনও হয়নি। কিন্তু এ দেশে একটা মুশকিল এই যে, যে-কোনও পোশাকে বাইরের লোকের সামনে দরজা খোলা যায় না। আমি রাত্তিরে দিশি প্রথায় পাজামা আর গেঞ্জি পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুই, স্লিপিং সুট-ফুট কিছু কেনা হয়নি। কিন্তু এক একদিন দেরি করে ঘুমোলে, সকালে কেউ যদি দরজায় নক করে তখনই হয় মুশকিল। আমার শয়নকক্ষ আর বসবার ঘর একই। কেউ এসে ডাকলেই আমি, ওয়ান মিনিট প্লিজ, বলে তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে, ম্যাজিশিয়ানদের মতন

খাও দ্রুত পোশাক পালটাই, পাজামার বদলে ট্রাউজার্স, একটা শার্ট গলিয়ে ভেতরে গুঁজে বেল্ট বাঁধতে হয়, তারপর দরজা খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসিমুখে বলি গুড মর্নিং। এমনকি, কেউ না ডাকলেও, একতলা থেকে খবরের কাগজ কিংবা চিঠি আনতে হলেও ওরকম ভদ্রস্থ পোশাক পরে যেতে হয়।

প্রথম প্রথম দরজা খুলতে আমার দেরি দেখে মার্গারিট জিজ্ঞেস করত, তুমি এতক্ষণ কী করো বলো তো? আমি সত্যি কথাটা জানিয়ে দিলে ও হাসতে হাসতে বলেছিল, আমার সঙ্গে তোমার অত ভদ্রতা করতে হবে না, তুমি যে-কোনও সাজে থাকতে পারো। তবে, অন্যদের জন্য, তুমি ড্রেসিং গাউন কিনে নাও না কেন, ওতে সাত খুন মাফ। এমনকি তুমি ভেতরে নগ্ন অবস্থাতেও একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিলে, সেটাও ভদ্রতাসম্মত।

আমাকে কেনার সুযোগই না দিয়ে পরের দিনই মার্গারিট একটা নীল রঙের তোয়ালের কাপড়ের ড্রেসিং গাউন নিয়ে এল। সেটা পরেই এখন আমি বসে আছি। অথচ মার্গারিট আর আসবে না।

আমার ঘরে মার্গারিট তার টাইপ রাইটার ও এত বই কাগজপত্র ছড়িয়ে দেখে গেছে। সে কি কখনও ভেবেছিল, হঠাৎ তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে?

মার্গারিটদের হস্টেলের বারান্দায় বারোয়ারি ফোন। দু'বার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া গেল না। এর মধ্যে পল এঙ্গেল ফোন করে আমাকে মার্শাল টাউন নামে একটি অদূরবর্তী শহরে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। পল এঙ্গেল এমন জোর দিয়ে দিয়ে কথা বলেন যে তাঁর কোনও প্রস্তাবেই না বলার উপায় নেই। ফ্রেঞ্চ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে মার্গারিটের জন্য একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে এলাম। তার কাছে এখন আমার ঘরের দ্বিতীয় চাবি আছে, সে যে-কোনও সময় আসতে পারে।

পল এঙ্গেলের গাড়িটা থান্ডারবার্ড। রেড ইন্ডিয়ান নাম। একটা বোতাম টিপলে জানলা কাচ আপনি ওঠে নামে। এসব জিনিস সিনেমায় ছাড়া আগে দেখিনি। গাড়ি চলতে চলতে সামান্য ঝাঁকুনি লাগলে যে গাড়ির চালককে 'সরি' বলতে হয়, সেটাও নতুন জানা হল। পল এঙ্গেল কাকে সরি বলছেন, রাস্তাকে, না আমাকে?

যেতে-যেতে পল তাঁর এই মার্শাল টাউন অভিযানের উদ্দেশ্যটা আমাকে জানালেন। সে এক বিচিত্র ব্যাপার। পল এঙ্গেল যখন তিন-চার বছরের শিশু, তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। মা সম্পর্কে তাঁর কোনও স্মৃতি নেই। মায়ের যে দুখানা ফটোগ্রাফ ছিল, তাও নানা গোলমালে কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং হঠাৎ তাঁর জননী সম্পর্কে একটা অনুভূতি হচ্ছে, যে-জননীর কোনও মুখ নেই, যাঁর কণ্ঠস্বর, স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও পুত্রের কোনও ধারণা নেই। পল এঙ্গেলের মায়ের এক সহপাঠিনী এতদিন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়াগো-তে, সদ্য এসেছেন মার্শাল টাউনে। তিনিই এক মাত্র জীবিত, যিনি পলের মাকে চিনতেন। পল যাচ্ছেন সেই সুজান কেন্ট নামে মহিলার কাছে, তাঁর মায়ের গল্প শোনবার জন্য।

পলের বয়েস তখন ষাটের কাছাকাছি সুতরাং তাঁর মায়ের বান্ধবীর বয়েস আশি-পঁচাশি হওয়াও স্বাভাবিক। সেই রকম বৃদ্ধা সন্দর্শনে যাওয়া আমার পক্ষে খুব একটা উৎফুল্ল হওয়ার মতন কিছু নয়। পল কখনও একলা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন না, সঙ্গে সব সময় কারুকে না কারুকে চাই। এই জন্যই তিনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এই ভেবে প্রথমে আমি খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। পরে বুঝেছি, পল আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। সুজান কেন্ট নামের বৃদ্ধা এবং তাঁর বাড়ি, দুটিই অতি দর্শনীয় ব্যাপার। সুজান ও পলের সাক্ষাৎকারও আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

সুজান কেন্ট তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দুই স্বামীরই সম্পত্তি পেয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর প্রথম স্বামীর একমাত্র ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ায় তাঁরও বিশাল

বাড়ি ও টাকাপয়সা সুজান কেন্টের নামে বর্তেছে। মার্শাল টাউনের বাড়িটাই সেই বাড়ি। আমেরিকানদের এত কম ছেলেমেয়ে হয় যে, অনেক সময় কোনও ধনী ব্যক্তি মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী খুঁজতে উকিলরা নাজেহাল হয়ে যায়।

আমরা পৌঁছলাম বিকেলের দিকে। শোনা গেল, ডিনারের পর, ঠিক আটটা বেজে পনেরো মিনিটে সুজান কেন্ট আমাদের দর্শন দেবেন। আমাদের দেওয়া হল দুটি গেস্ট রুম। বাড়ি তো নয় প্রাসাদ, প্রধান গেট থেকে মূল বাড়িতে পৌঁছবার যে ড্রাইভওয়ে, সেটা প্রায় সিকি মাইল, দু' পাশে অজস্র ফুলের বাগান ও কয়েকটি মর্মরমূর্তি। অতিথি কক্ষটি রাজা-মহারাজাদের থাকার যোগ্য। বাথরুমে আট-দশ রকমের পারফিউমের শিশি, সবই নতুন। জলের কলগুলি এমনই চোখ ধাঁধানো ঝকঝকে হলুদ যে মনে হয় খাঁটি সোনার তৈরি। অবশ্য সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি। আমি আসল সোনা আর নকল সোনার পার্থক্য বুঝবই বা কী করে। বাথরুমটি অনেক বেডরুমের চেয়ে বড়, তার এক পাশে আছে বইয়ের র‍্যাক, তাতে নানা ধরনের বই, কবিতা-প্রবন্ধ, ডিটেকটিভ উপন্যাস।

এ দেশে দাস-দাসীর প্রথা উঠে গেছে, কিন্তু ধনীদের বাড়িতে হেলপিং হ্যান্ড থাকে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো পয়সার বিনিময়ে বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, রান্নার কাজ করে দিয়ে যায়। সে রকম তিন-চারজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম, তা ছাড়া একজন বাটলারও আছে মনে হল। ডিনার টেবিলে শুধু পল আর আমি, সেসব খাবার-দাবারের আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই, তবে দু'ফুট লম্বা সেই চিংড়ি মাছটির কথা জীবনে ভুলব না। ও রকম লবস্টার কখনও চর্মচক্ষে দেখিনি। সেই ব্যাঘ্র-চিংড়িটিকে আস্ত অবস্থায় ওয়াইনে সেদ্ধ করা হয়েছে, সেই ভাবেই একটা রুপোর ট্রে-তে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেনি-বাটালির মতন জিনিস দিয়ে মাঝখানটা কেটে আমি ভেতরের খানিকটা চিংড়ি-মাংস খেলাম, বাকি সবটা পড়ে রইল। এত বড় একটা চিংড়িতে দশ-বারোজনের খাওয়া হয়ে যেত। কী অপচয়, কী সাংঘাতিক অপচয়। এ দেশের এ রকম অপচয় দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। খুব দুর্লভ দামি কোনও খাবার খেতে বসে আমার দেশের স্বজন-বন্ধুদের কথা মনে পড়ে, আমি ভালো করে খেতে পারি না। তখনই দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। এখানে আসবার আগে কফি হাউসের মাটন ওমলেট কখনও পুরো একা খেতে পাইনি, দু-তিনজনে ভাগ করে নিতে হয়েছে, তবু সে-ও অনেক ভালো।

খাবার টেবিলে পল এঙ্গেল বললেন, আমার মা সাধারণ চাষি পরিবারের মেয়ে ছিলেন, পড়াশুনো করার সময় রেস্তোরাঁয় বাসন ধোওয়ার কাজ করতেন। এই সুজান কেন্টও তাঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন, একই কাজ করতেন, ভাগ্যচক্রের খেলায় তিনি আজ এত ধনী হয়েছেন।

এক সময় এক দেবদূতের মতন রূপবান যুবক (সেও আসলে কাজের লোক) আমাদের জানাল যে সুজান কেন্ট আমাদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। যেন কোনও মহারানির দরবারে ডাক পড়ল আমাদের।

এটাও বিশেষ অত্যুক্তি নয়। ফিল্মে ইওরোপীয় রাজা-মহারাজাদের শয়নকক্ষ এর চেয়ে বেশি তো সাজানো হয় না। প্রায় ঘরের অর্ধেক জোড়া বিশাল একটি পালঙ্ক, বিছানার রং, দেওয়ালের রং, পর্দার রং, সবই গোলাপি, অর্থাৎ এটা পিংক রুম। ধনীদের বাড়িতে এরকম ব্লু রুম, হোয়াইট রুমও আলাদা আলাদা থাকে। সেই বিছানার প্রান্তে কয়েকটি বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন সুজান কেন্ট, বুক পর্যন্ত একটা সোনালি লেপ দিয়ে ঢাকা। প্রথম দর্শনে তাঁকে সম্পূর্ণ অলীক মনে হয়। মাথার চুল পাউডার পাফের মতন সাদা, ঠোঁটে লাল রং, কুঞ্চিত গালে রুজ মাখা, বয়েসের তুলনায় চোখ দুটি উজ্জ্বল, গাঢ় নীল। আমরা খাটের পাশে দাঁড়াতেই তিনি দু-হাত বাড়িয়ে অত্যন্ত সরু গলায় ব্যাকুলভাবে বললেন, পলি, পলি, কাম ক্লোজার, কাম ক্লোজার।

ষাট বছর বয়স্ক পল এঙ্গেল ওঁর বুকের কাছে মাথাটা নিয়ে গেলেন, আর সেই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা পলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে শিশুর মতন তাঁকে আদর করতে লাগলেন।

এরপর সুজান কেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলেটি কে?

পল বললেন, এ আমার এক ভারতীয় বন্ধু।

বৃদ্ধা ভুরু তুলে জিগ্যেস করলেন, ইন্‌জান?

এই রে, ইনি আমাকে রেড ইন্ডিয়ান মনে করেছেন। রেড শব্দটা এখন উঠেই গেছে, শুধু ইন্ডিয়ান শুনলে সবাই এখানে এদের অধিবাসীদের কথাই ভাবে। পল আমার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়ার পর সেই মহিলা আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ক্যালকাটা? নাইনটিন ফর্টিওয়ানে আমি গিয়েছিলাম সেখানে, বেশ ভালো শহর, ঘোড়ার গাড়িতে ঘুরেছি, একটা বেশ সুন্দর নদী আছে।

একজন পরিচারক ছোট ছোট গ্লাসে লিকিওর দিয়ে গেল আমাদের। বৃদ্ধাও সেই সুগন্ধ সুরায় চুমুক দিতে লাগলেন।

এদেশের সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে। পল তাঁর মায়ের বান্ধবীকে মাসি না বলে বললেন, সুজান, তুমি আমার মায়ের কথা বলো, কেমন দেখতে ছিল মাকে। সে কি বদমেজাজি ছিল, না কোমল?

সুজান কেন্ট বললেন, তোর মা রুথ, আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে। ওঃ, কী রূপ ছিল তার, আমার চেয়ে অনেক সুন্দরী, আমি তাকে হিংসে করতাম। অনেকটা লম্বা, সরল উন্নত চেহারা, কী মসৃণ চামড়া, সে কোনও জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাত। বাচ্চাদের প্রতি তার বিশেষ স্নেহ ছিল, রাস্তাঘাটে কোনও শিশু দেখলেই আদর করত। একবার কী হয়েছিল জানিস...

পল এঙ্গেলের মা মারা গেছেন ছাব্বিশ বছর বয়েসে। তারপর তাঁর আর বয়েস বাড়েনি। সেই ছাব্বিশ বছরের তরুণীর বর্ণনা করছেন এই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা।

এক সময় পল বললেন, সুনীল, তুমি আর এখানে বসে থেকে কী করবে? এসব আমাদের ব্যক্তিগত কথা তোমার শুনতে ভালো লাগবে না। তুমি বরং এই বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দ্যাখো, এখানে অনেক ছবি আছে।

সুজান কেন্টও আমাকে সেই অনুমতি দিলেন।

একটি যুবক আমাকে নিয়ে গেল বাড়ির দক্ষিণ প্রান্তের দোতলার একটি হলঘরে। এ যে প্রাইভেট মিউজিয়াম। ঠিক কোনও মিউজিয়ামের ঘরের মতনই সমস্ত দেওয়াল ছবিতে সাজানো, ঘরের মাঝখানে সাজিয়ে রাখা আছে কিছু ভাস্কর্য। সেই ভাস্কর্যগুলির মধ্যে একটি হেনরি মুরের। ছবিগুলির অনেক শিল্পীই আমার অচেনা, তবু তার মধ্যে আমি কামিল পিসারো, জাঁ রেনোয়াঁ এবং পাবলো পিকাসোর তিনটি ছবি আবিষ্কার করে ফেললাম। এই সব শিল্পীদের মূল ছবি। আমার সর্ব অঙ্গে শিহরণ হল। গোটা ভারতবর্ষে কোথাও পিকাসোর একটাও মৌলিক পেইন্টিং আছে বলে শুনিনি, অথচ মার্শাল টাউনের মতন এত ছোট্ট একটা শহরে রয়েছে। আমরা ছবির বইতে ছোট ছোট রিপ্রোডাকশান ছাড়া আর তো কোনও পিকাসো দেখিনি। এটা বেশ বড় মাপের ক্যানভাস, পিকাসোর ব্লু পিরিয়ডের আঁকা।

সেই ছবিগুলির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ। বারবার মনে হতে লাগল, মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ছবিগুলো কত ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারত, এই সব শিল্পীদের সম্পর্কে কত গল্প শোনাত।

হলঘরটির দ্বারে অটোমেটিক রাইফেলধারী একজন প্রহরী দণ্ডায়মান। তা তো হবেই, এই সব ছবির দাম কোটি কোটি টাকা।

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িটাতে আমাকে থাকতে হল তিন দিন। পল এঙ্গেল আমাকে একা থাকার এবং ইচ্ছেমতন বই পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে পড়ত মার্গারিটের কথা। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের চেয়েও অনেক বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু শারীরিক ছোঁয়াছুঁয়ি

চলবে না। এ যে বড় দুঃসহ ব্যাপার।

মার্গারিটের ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকলেও সে সিগারেট খায়, সুরাপানেও আপত্তি নেই। সে হুইস্কি-রাম দু'চক্ষে দেখতে পারে না, কিন্তু ফরাসি হয়ে জন্মেছে, ওয়াইন তো খাবেই। সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে তার কোনও ছুঁতমার্গ নেই। ন্যুড স্টাডি ফরাসি শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কবিতা উপন্যাসে কোনও বর্ণনায় কোনও শব্দকেই সে অশ্লীল মনে করে না। সেই সময় ফরাসি সাহিত্যে জাঁ জেনে-কে নিয়ে খুব হইচই চলছে। জেনে একজন জন্ম-অপরাধী, সারাজীবন চুরি ও গুণ্ডামি করেছেন, মাতাল-ব্যভিচারী ও খুনীদের সঙ্গেই শুধু মিশেছেন। কোনও এক অপরাধে জেনে-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, তখন পর্যন্ত তাঁর নামও কেউ শোনেনি। জেলখানায় বসে এই দাগি কয়েদিটি একখানা বই লিখতে শুরু করে। শ' দু-এক পাতা লেখা হল, তারপর জেলখানার ঝাড়ুদার একদিন সেই পুরো পাণ্ডুলিপি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিল। জেনে আবার সেটাই লিখতে বসলেন, দিনের পর দিন আপন মনে লিখে চললেন। পরে কোনও এক সময় সেই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি জেলের বাইরে চলে আসে। কোনও এক প্রকাশক সেটি প্রকাশ করার পর আচম্বিতে ফরাসি সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই বই, 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর স্বাদও অনাস্বাদিতপূর্ব, বহু লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ফরাসি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে জেনে-কে মুক্ত করেন কারাগার থেকে।

জাঁ পল সার্ত্র গোটা একটি বই লিখেছেন এই জেনে সম্পর্কে। সেই বইয়ের নাম 'সন্ত জেনে।' দাগি আসামিকে সন্ত বলেছেন তিনি বিশেষ কারণে। সার্ত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই একজন মানুষ, যার জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, যার খ্যাতির মোহ ছিল না। বই লিখে অর্থোপার্জনেরও কোনও প্রশ্ন ছিল না, সাহিত্যকীর্তি স্থাপনের কথা যে জানতই না, তবু সে লেখে কেন? তবে কি এটাই দৈব প্রেরণা! এই প্রেরণা যে পায়, সেই তো সন্ত! একবার পুরো পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও সে লিখেছিল।

জেনের এই উপন্যাসের ভাষা পাগলের মতন অসংলগ্ন, তবু সেটাই এক নতুন ভাষা। তিনি যখন-তখন বিস্তি খেউর ও চোর-ডাকাত-বেশ্যা-সমকামীদের ব্যবহৃত শব্দ মিশিয়ে দিয়েছেন, তবু তা এক মৌলিক সৌরভ এনে দিয়েছে। পরে অবশ্য জাঁ জেনে নাট্যকার হিসাবেও খ্যাতিমান হন।

মার্গারিট সেই 'আওয়ার লেডি অফ দা ফ্লাওয়ার্স'-এর মূল ফরাসি থেকে আমাকে অংশবিশেষ পড়ে পড়ে শোনাত। কোনও শব্দেই তো তার আপত্তি হয়নি। তবু কেন সামান্য একটা চুম্বনের আবেদনে তার এত অনীহা?

মার্শাল টাউনের সেই বাড়িতে বসে বসেই আমি ঠিক করে ফেললাম, থাক, ওসব আমার কিছু চাই না। সংযম দেখাবার মধ্যেও একটা অহংকার আছে। আমেরিকান ছেলেরা যা পারেনি, তা আমি নিশ্চয়ই পারব। মার্গারিটের সাহচর্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ফিরে এলাম রবিবার সকালে। দশটার সময় মার্গারিট গির্জায় যায়। সেই গির্জার রাস্তায় ধরলাম তাকে। মাথায় একটা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা মার্গারিট অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল, আমাকে দেখে চমকে গেল।

আমি সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, তুমি আমার ওখানে আর আসবে না?

মার্গারিট ফ্যাকাশেভাবে বলল, কী জানি।

আমি ওর হাত ধরে বললাম, এই দ্যাখো, আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কক্ষনো ওরকম দাবি করব না। তোমার বন্ধুত্ব ছাড়া কিছুই চাইব না।

মার্গারিট বলল, প্রতিজ্ঞা করলেও তোমার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ রয়ে যাবে। তুমি ইচ্ছেটাকে দমন করবে। সেটা তো ভালো নয়। আমি কেন তোমার কষ্টের কারণ হবো, বলো। তাতে আমারও কষ্ট হবে।

আমি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না?

ও বলল, আমি যে খুব চাই। তুমি যখন ছিলে না, আমি দুবার গেছি তোমার ঘরে। শোনো সুনীল, আমি আজ গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার সময় অনুমতি চাইব। যদি কোনও সাড়া পাই—

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কীসের জন্য প্রার্থনা করবে বললে?

মার্গারিট লাজুকভাবে বলল, তুমি যা চেয়েছিলে।

সেই মুহূর্তে হাসি সামলানো আমার পক্ষে সত্যি খুব কষ্টকর হয়েছিল।

মার্গারিট চুমু খেতে পারবে কি না সে সম্পর্কেও ভগবানের কাছে অনুমতি চাইতে হবে? আমার দৃঢ় ধারণা ওর ভগবান ওকে সেই অনুমতি দেবেন না। এই সব ভগবান-টগবানেরা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর তো নিজের মুখেই সে কথা স্বীকার করেছিলেন।

॥ ৭ ॥

"কুমারী, উত্তর দাও তুমি
যে বাক্য অশ্রুত অন্ধকার
আমার হৃদয় মৃদু ঝোঁকে
চাপ দেয় তোমার হৃদয়ে
যদি দেখি কখনও তোমার
রূপান্তরে কোনও অস্থিরতা
তবে সেই অস্থিরতা এই;
তোমাকে প্রেমের আগে আমি
তোমার প্রেমকে ভালোবাসি।"

—রেনে গি কাদু

বছর প্রায় ঘুরে এল। এপ্রিলে রাস্তায় পাশের বরফ ভেদ করে উঁকি মারল একটা ছোট্ট ফুলগাছের চারা। এত ঠান্ডার মধ্যেও এই গাছ কী করে এত কাল ঘুমিয়ে ছিল, আবার বেঁচে উঠল, জানতে আশ্চর্য লাগে। বরফ গলে যাওয়ার পরেই দেখা যায় সেখানে অনেক রঙের ঘাসফুল। এত ছোট, এত সুন্দর অথচ কী তেজী এই ফুলগুলি।

কাগজে কলমে এপ্রিল মাস এখানে বসন্ত, কিন্তু তখনও শীত যায় না। মে মাসে এক একদিন দুপুরে বেশ ঝকঝকে রোদ, তার মধ্যেই এক ঝাঁক পায়রার মতন ঝটাপট করে বৃষ্টি এসে যায়। বৃষ্টির পরেই হিমেল বাতাস। কোথাও কোথাও মে মাসেও তুষারপাতের খবর শোনা যায়। তবু চেরি গাছগুলোতে থোকা থোকা ফুল এসেছে। পপলার গাছগুলি দীপ্তিময় সবুজ। নদীতে ফিরে এসেছে স্রোত, তার পাশে পাশে ঝুঁকে আছে উইলো গাছ।

পেট্রোল শব্দটি এখানে অপরিচিত, তার বদলে বলে গ্যাসোলিন বা গ্যাস। হঠাৎ জুন মাসে এখানে গ্যাসের দাম কমে গেল। আমার বাড়ির ঠিক সামনেই গ্যাস স্টেশনে (অর্থাৎ পেট্রোল পাম্পে) খুব বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, 'টু সেন্টস্ অফ পার গ্যাল।' গ্যাল মানে গ্যালন। এদেশে এরা অনেক কিছুকেই ছোট ছোট করে বলে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে স্কুল, যুবতীকে বলে বেবি, বেড়ালকে বলে ক্যাট।

আমাদের দেশে কোনও জিনিসের দাম কমলে আমরা খুশি হই, এরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ গ্যাসের দাম কমল কেন, তা হলে কি দেশের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছে? তখন এক গ্যালন গ্যাসের স্বাভাবিক দাম ছিল পঁচিশ সেন্ট, অর্থাৎ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, তার থেকেও দু' সেন্ট অর্থাৎ দশ পয়সা কমে যাওয়া তো সাংঘাতিক ব্যাপার। সত্যিই সেই ধাক্কায় একটা জমজমাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস ঝাঁপ ফেলে বন্ধ হয়ে গেল। গ্যাসের দাম কমার সঙ্গে একটা জামা-কাপড়-বাসনপত্র ইত্যাদির দোকান উঠে যাওয়ার কী সম্পর্ক তো অবশ্য আমার বোধগম্য নয়। এ যেন কপালে এসে লাগল তির, রক্ত পড়তে লাগল হাঁটু দিয়ে।

পল এঙ্গেলের সহকারী মার্ক এই সময় বিশেষ উৎসাহ নিয়ে আমাকে গাড়ি চালানো শেখাতে লাগল। মার্ক-এর গাড়িটি একটা হলুদ রঙের ফোর্ড, বাইরের চেহারাটি অটুট, চলেও বেশ ভালো। দু-তিন দিন ফাঁকা রাস্তায় ত্যাড়াবাঁকাভাবে গাড়িটা চালাতে আমার বেশ মজাই লাগছিল। মার্ক আমার কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বলল, এই তো অনেকটা হয়ে গেছে, আর কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস করলেই তুমি ড্রাইভিং টেস্ট পাশ করে যাবে।

আমি বললাম, যাঃ, আমার গাড়িই নেই, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ড্রাইভিং টেস্ট দিতে যাব কেন?

মার্ক বলল, তুমি এতদিন এদেশে আছ, তোমার গাড়ি নেই কেন? তোমার বান্ধবী রাগারাগি করে না? কিনে ফ্যালো, চটপট একটা গাড়ি কিনে ফ্যালো। কতই বা দাম পড়বে! তুমি আমার এই গাড়িটা কিনতে চাও? আমি পঞ্চাশ ডলারে দিয়ে দিতে পারি।

আমি হতবাক্। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মার্ক আমাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে। ওর স্বার্থ আছে। মার্ক নিশ্চয়ই এই গাড়িটার বদলে একটা হাল ফ্যাশানের নতুন গাড়ি কিনতে চায়। এদেশে পুরোনো গাড়ি বিক্রি করা তখন খুব শক্ত ছিল। যেখানে সেখানে গাড়ি গড়িয়ে ফেলে দিত, তাও ধরা পড়ে গেলে মুশকিল। সেই জন্য দিকে দিকে তৈরি হয়েছিল অটোমোবিল গ্রেভ ইয়ার্ড। মানুষের কবরখানার মতনই লোকে পয়সা দিয়ে পুরোনো গাড়ি জমা করে আসত সেখানে। একটুও ভাঙেনি, নষ্ট হয়নি, এমন শত শত গাড়ি সেখানে ধ্বংস হওয়ার প্রতীক্ষায় পড়ে থাকত।

মার্ক আবার বলল, কিনতে চাও তো বলো, আজই তোমায় গাড়িটা দিয়ে দিতে পারি পঞ্চাশ ডলারে। তেলের দাম কমে গেছে, এখন গাড়ি চালাতে তোমার খরচও বেশি পড়বে না!

আমার বুকটা একবার ধক করে উঠেছিল। এত সস্তায় একটা চালু গাড়ি! পঞ্চাশ ডলার মানে তখনকার হিসেব মাত্র আড়াইশো টাকা। আমাদের দেশে এরকম একটা গাড়ির দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা তো হবেই। বেশ ধনীরাই এরকম গাড়ি চড়ে। এখানে পঞ্চাশ ডলার আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি, তার বিনিময়ে একটা নিজস্ব গাড়ি হবে।

তারপরেই ইচ্ছে করেছিল ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় কষাতে। গাড়ির লোভ! এর পরে ইচ্ছে করবে বাড়ি কিনতে। তারপর মেম বউ। তারপর পায়ের নীচে শেকড় গজাতে আর বাকি থাকবে কী?

মার্ককে বললাম, দুঃখিত, তুমি শুধু শুধু কয়েকটা দিন নষ্ট করলে, আমার গাড়ি কেনার কোনও বাসনাই নেই। তুমি আমাকে এটা বিনা পয়সায় দিলেও আমি নেব না!

দেশে ফেরার জন্য একসময় যে মন উচাটন হয়েছিল, তা কি আস্তে-আস্তে কমে আসছে? এখনও প্রত্যেকদিন কয়েকবার জপ করি ফিরে যাব, ফিরে যাব, কিন্তু সেরকম কোনও উদ্যোগ তো নেওয়া হচ্ছে না। কারণ, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্গারিট নাম্নী তরুণীটি। ঝট করে দেশে ফিরে গেলে মার্গারিটকে চিরতরে ছাড়তে হবে, কিন্তু সেটা যে ভাবতেই পারি না কিছুতেই!

এখন প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা মার্গারিট আর আমি একসঙ্গে কাটাই। আমার ঘরে, টেবিলের দু'দিকের দুই চেয়ারে বসে আমরা নিজস্ব পড়াশুনো বা লেখালেখি করি। আমার রান্নাঘরটাও দুজনের। অর্ধেক বাঙালি রান্না ও বাকিটা ফরাসি খাবারে আমরা লাঞ্চ-ডিনার সারি। মার্গারিট আমাকে ফরাসি

শেখায়, আমি ওকে শেখাই বাংলা। মাঝে মাঝে বাইরের লোকের সামনেও আমাদের ইংরিজি-বাংলা-ফরাসি গুলিয়ে যায়। টেলিফোনে কারুকে ইংরিজিতে ও-কে বলার বদলে আমি ভুল করে বলে ফেলি, দাকর, দাকর। আর মার্গারিট বলে ফেলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে! প্রয়োজনীয় কোনও কিছু খুঁজে না পেলে আমি বলি, ম্যারদ্! আর মার্গারিট বলে, দূর ছাই! এই 'দূর ছাই' ওর খুব পছন্দ। অনেক সময় কিছু কেনাকাটি করতে গিয়ে দোকানদারের মুখের ওপরেও মার্গারিট বলে ওঠে, দূর ছাই! সেই ফরাসি ওষ্ঠে দূর ছাই বড় সুমিষ্ট শোনায়।

এর মধ্যে মার্গারিটের ভগবানও আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, যদিও সবটা নয়, একটুখানি।

মাসের প্রথমে মার্গারিট যা মাইনে পায় এবং আমি যা স্কলারশিপ পাই, সব টাকা রাখা হয় একটি ড্রয়ারে। বেহিসেবিভাবে দুজনে ইচ্ছে মতন তার থেকে খরচ করি, প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে খাওয়াই, অনেকক্ষণ আড্ডা হয়। মাসের শেষে টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমরা অন্য কারুর বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণে ঠিক ডিনার টাইমে হাজির হই এবং গালে হাত দিয়ে নিরীহ মুখে বসে থাকি। আমাদের পোলিশ বন্ধু ক্রিস্তফ্ এর মধ্যেই বেশ টাকা জমিয়েছে, তার কাছে যখন তখন ধার পাওয়া যায়। ক্রিস্তফের কাছে এক প্যাকেট সিগারেট ও আধ ঠোঙা চিনি চাইতে গেলে ও বলে, সিগারেটটা ফেরত দিতে হবে না, কিন্তু চিনিটা ফেরত দিও। ওদের দেশে চিনির খুব অনটন!

এর মধ্যে আমি রাইটার্স ওয়ার্কশপে অনুবাদের কাজ বিশেষ কিছু না করলেও নিজস্ব লেখালেখি শুরু করেছিলাম বেশ প্রবলভাবেই। 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই সেই কয়েক মাসে লেখা। যদিও অতদূরের এক জায়গায় বসে লিখছি, কিন্তু বিদেশের কোনও প্রসঙ্গ আসেনি সেই সব কবিতায়, কেন আসেনি, তাও তো আশ্চর্য ব্যাপার। কবিত লেখার সময় আমি মনেপ্রাণে দেশে ফিরে যাই। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা আমার আত্মার একটা টুকরোর সমান। আমি হঠাৎ বিদেশে চলে আসায় এই পত্রিকার ভার নিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁকে সাহায্য করতেন প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ও উৎপলকুমার বসু। কৃত্তিবাসের খবরাখবরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, তার জন্য লেখা পাঠাতাম নিয়মিত।

এই সময় আমি একটা গদ্য রচনাও শুরু করি।

মার্গারিট আর আমি পালা করে কখনও কোনও ভারতীয় কাহিনি, কখনও কোনও ফরাসি বা ইউরোপীয় কাহিনি শোনাতাম পরস্পরকে। আমি ওর কাছে বিস্তৃতভাবে রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বর্ণনা করার পর ও আমাকে শুনিয়েছিল ত্রিস্তান ও ইসল্টের প্রেম-বিরহ গাথা, এই বিশ্ব-বিখ্যাত প্রেম কাহিনিটি বাংলায় তখনও পর্যন্ত অপরিচিত ছিল। একসময় ইওরোপের দেশে দেশে ত্রুবাদুররা এই আখ্যান গেয়ে গেয়ে বেড়াত। পশ্চিমি সাহিত্যে অসংখ্যবার এর উল্লেখ আছে। প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, বীণাবাদক, দক্ষ নাবিক, আবার ব্যর্থ প্রেমিক ও ভিখারী ত্রিস্তানের চরিত্রের কোনও তুলনা নেই। টেনিসন, ম্যাথু অর্নল্ড, সুইনবার্ন, টমাস হার্ডি প্রমুখ লিখেছেন এই দুঃখী ত্রিস্তান ও তার প্রেমিকা সোনালি ইসল্টকে নিয়ে, ভাগনার রচনা করেছেন অমর গীতিনাট্য।

আমার মনে হয়েছিল বাঙালি পাঠকদেরও এ কাহিনি জানা উচিত। আমি লিখতে শুরু করলাম, মার্গারিটের তাতে কী দারুণ উৎসাহ। সে অনেক বইপত্র নিয়ে আসে, নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করে দেয়। ফরাসি ভাষায় জোসেফ বেদিয়ে ত্রিস্তান কাহিনির সব কটি ভাষ্য মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন, মার্গারিট তার সারাংশ আমায় শোনায়। একই সঙ্গে নতুন কিছু জানা, পড়া ও লেখার সমন্বয় হলে তা বড়ই আনন্দদায়ক হয়। সারা দিনে দু-তিন পাতা লিখতে পারলেও মনে হয় দিনটা সার্থক। বেশ একটা ঘোরের মধ্যে দিনগুলোতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যে 'সোনালি-দুঃখ' নাম দিয়ে সেই পুরো কাহিনিটিই আমার লেখা হয়ে গেল। বলতে গেলে সেটাই আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্য রচনা।

মার্গারিটের বন্ধুত্ব প্রায় সর্বগ্রাসী। সে নিজের মুখেই স্বীকার করত, তার খুব হিংসে; আমাকে

অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে একলা মিশতে দেখলেই তার রাগ হয়। সুতরাং একমাত্র পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি ছাড়া আর কোনও মার্কিন মহিলাকে আমার ভালোভাবে জানার সুযোগই হয়নি। মাঝে মাঝে পল এঙ্গেলের বাড়িতে আমাকে যেতেই হত, এ ছাড়া আমরা দুজনকে নিয়েই মগ্ন ছিলাম।

অকস্মাৎ মার্গারিটের দেশ থেকে টেলিগ্রাম এল, তার মা খুব অসুস্থ। মার্গারিট কান্নাকাটি করল খানিকক্ষণ, তারপর ঠিক করল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে মায়ের কাছে পৌঁছতেই হবে। তখন মাসের শেষ, আমাদের দুজনের হাতেই টাকা নেই, তবু কোনওক্রমে ব্যাংক থেকে ধার পাওয়া গেল, টিকিটও সংগ্রহ হল, আমি মার্গারিটকে তুলে দিয়ে এলাম এয়ারপোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অনেক কাজ ফেলে যাচ্ছে, ওকে দু-সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, মার্গারিট চলে যাওয়ায় আমি সাময়িকভাবে মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। ও আমাকে বড্ড বেশি ঘিরে রেখেছিল। যে দেশে এসেছি, সে দেশটাকে খোলা চোখে ভালো করে দেখতেও পারিনি। যে-কোনও বন্ধন, এমনকি ভালোবাসার বন্ধনও এক এক সময় অসহ্য লাগে।

এবার আমি শুরু করলাম ভ্রমণ। শিকাগো, লস এঞ্জেলিস, সানফ্রান্সিসকো, বার্কলে, অ্যারিজোনান মরুভূমি, মেক্সিকোর প্রান্ত শহর। একা একাই ঘুরি, কোথাও কোনও বাঙালিকে চিনি না, পল এঙ্গেলের রেফারেন্সে দু-একটা বড় শহরে আমেরিকান অধ্যাপক বা লেখকদের কাছে আতিথ্য নিই। সানফ্রান্সিসকোতে দেখা হল অ্যালেন গিনসবার্গের বন্ধু কবি লরেন্স ফেলিংগেটির সঙ্গে। দীর্ঘকায় সেই প্রৌঢ়টি আলাপের তৃতীয় বাক্যেই আমাকে জিগ্যেস করল, আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে? অ্যালেন কলকাতায় থেকেছে, বারাণসীর গঙ্গা দেখেছে, আমি কেন পারব না?

মার্গারিটের ঠিক সময়ে ফেরা হল না। সপ্তাহে সে আমাকে তিনখানা চিঠি লেখে, এর মধ্যে দু'বার লং ডিসটেন্স টেলিফোনেও কথা হয়েছে। তার মায়ের ব্যাধি বেশ কঠিন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না উঠলে মার্গারিটের ফেরার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রত্যেকটি চিঠিতে এবং টেলিফোনেও মার্গারিট জিগ্যেস করেছিল, সুনীল, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর আমি এক অন্যরকম আলোড়ন টের পেলাম। আমার এই নবলব্ধ মুক্তিও তো আমি ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। সবসময় একটা অস্থিরতা। মার্গারিটের সান্নিধ্য ছাড়া আর সব কিছুই আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে।

পল এঙ্গেল একদিন খাবার নেমন্তন্ন করে জিগ্যেস করলেন, তুমি আগামী সেমেস্টার থেকে আমাদের বিভাগে সহকারী হিসেবে যোগ দেবে? মার্ক চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় তোমাকে নিতে পারি। তোমার উপার্জন খানিকটা বৃদ্ধি পাবে।

আমি দুম করে বলে ফেললাম, আমিও চলে যাব। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না!

পল চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, চলে যাবে? কেন, এখানে তোমার কীসের অসুবিধে হচ্ছে?

আমি কাঁচুমাচুভাবে বললাম, না, এখানে কোনওই অসুবিধে নেই। প্রচুর আরামে আছি। কারুর কাছে থেকে কখনও মন্দ ব্যবহার পাইনি। তবু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

পল বললেন, দেশে তো তোমার স্ত্রী নেই, তবে কার জন্য ফিরবে? তোমার চাকরিও নেই, ফিরে গেলে খাবে কী?

আমি বললাম, আমি বাংলায় লেখালিখি করতে চাই, আমার কি নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই ফিরে যাওয়া উচিত নয়?

পল বললেন, ইন্ডিয়াতে কি শুধু লেখালেখি করে সংসার চালানো যায়?

আমি বললাম, খুবই কষ্টকর নিশ্চয়ই। তবু তো একটা ঝুঁকি নিতেই হবে।

পল বললেন, তবু তুমি আমার একটা কথা শোনো। তুমি আর এক বছর অন্তত এখানেই থেকে যাও। এখানে বসেও লেখালেখি করার অনেক সময় পাবে। এর মধ্যে দেশে চিঠিপত্র লিখে

দ্যাখো, সেখানে কোনও জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারো কি না। সেরকম যদি কিছু পাও, তারপর চলে যেও!

পল এঙ্গেলের স্ত্রী মেরি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সব সময় প্যান্ট-শার্ট পরেন, ছোট্টখাট্টো বালকের মতন তাঁর চেহারা। রান্নাঘর থেকে এসে সব শুনে মেরি জোর দিয়ে বললেন, না, না, এ কোথায় যাবে? এই দুষ্টু ছেলেটাকে আমি কোথাও যেতে দেব না।

আমার গালে গাল ঠেকিয়ে মেরি আরও আদর করে বললেন, এ ছেলেটাকে আমি আমার পোষ্যপুত্র করে রেখে দেব!

সেদিনকার মতন কথা ওখানেই থেমে রইল। কিন্তু আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি।

সে-বছর আমার মতন যে-এগারোজন বিদেশি লেখক-লেখিকা যোগ দিয়েছিল আয়ওয়ার ওয়ার্কশপে, তাদের মধ্যে সাতজনই আরও এক বছর অন্তত থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল এর মধ্যেই। সেই ষাটের দশকের গোড়ায় আমেরিকায় চাকরির সুযোগ ছিল প্রচুর, বিদেশিদের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়িও ছিল না। সারা বিশ্ব থেকে দলে দলে ছেলেমেয়েরা ছুটে যাচ্ছে সেই দেশে। আমিই বোকার মতন উলটো স্রোতে সাঁতার কাটতে চাইছি।

আমার সংকল্পের কথা কারুকে জানালাম না। গোপনে গোপনে ব্যবস্থা করতে লাগলাম, মিটিয়ে দিলাম যার কাছে যা ছিল ধার। খরচ বাঁচাবার অছিলায় এই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে ডর্মিটরিতে চলে যাব বলে মার্গারিটের জিনিসপত্র রেখে দিলাম ক্রিস্তফের ঘরে। ক্রিস্তফ এর মধ্যে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছে যে দেশ থেকে সে আনিয়েছে তার স্ত্রীকে। সেই পোলিশ মহিলা একবর্ণ ইংরিজি জানেন না, তাঁর সঙ্গে আমরা বোবার মতন হাত-পা নেড়ে কথা বলি। ওয়ারসতে ক্রিস্তফ একটা অনুবাদ সংস্থায় চাকরি করত, সেখান থেকে আরও ছ'মাসের ছুটি আদায় করে নিয়েছিল, সুতরাং ওরা দুজনেই এখানে থাকবে আপাতত।

পল আমার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। একদিন একটা ফর্ম দেখিয়ে বললেন, এইখানে সই করো।

আমি কাঁচুমাচু মুখে জানালাম, আমি কালই চলে যেতে চাই।

পল চুপ করে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তিনি খানিকটা আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই। যে কোনও কারণেই হোক, অন্যান্য বিদেশি লেখক-লেখিকাদের তুলনায় পল আমার প্রতি একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব করতেন। সেবারে ওই দলটির মধ্যে আমিই ছিলাম কনিষ্ঠতম, তা ছাড়া ভারত সম্পর্কে দলের খানিকটা মোহ ছিল। পল আমাদের কলকাতার আড্ডা দেখেছেন, ওখানে প্রায়ই সেই সব গল্প করতেন। অন্যান্য সদস্যরা আমাকে অনেক সময় ঠাট্টা করে বলত, পল দেখছি তোমার কথা বলতে শুরু করলে আর থামেনই না। এড্রিয়ান মিচেল নামে একজন ব্রিটিশ লোক ঠোঁট উলটে বলেছিল, এখানে দেখছি পলই একমাত্র আমেরিকান, যার মুখে কলকাতায় প্রশংসা শুনতে পাই! তাহেরে শফরজাদে নামে একটি ইরানি মেয়ে বলেছিল, তুমি ভারতীয়, তুমি নিশ্চয়ই জাদু জানো। নইলে পল আর মেরি শুধু তোমাকেই এত ঘন ঘন নেমন্তন্ন করে কেন?

দুঃখিত হলেও পল আমাকে আর বাধা দেননি। তিনি আমার মনোভাব বুঝেছিলেন। তিনি বললেন, মানুষের একটাই তো মাত্র ছোট্ট জীবন, যার যেটা ভালো লাগে সেটাই তো করা উচিত।

আমার কাছে একটা রাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড বিমান-টিকিট ছিল আগে থেকেই, তাতে আমি পৃথিবীর যে কোনও দেশে যখন খুশি নামতে পারি। তখন ভিসারও কড়াকড়ি ছিল না এমন। এক দেশ থেকে অন্য দেশের ভিসা সংগ্রহ করা যেত কয়েক মিনিটে। এমনকি অনেক দেশের এয়ারপোর্টে নেমেও ভিসা পাওয়া যেত। কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে, ইংল্যান্ডে তো বটেই, আমাদের ভিসার প্রয়োজনই হত না। পৃথিবীটা তখনও অনেকটা সরল ছিল।

বাড়িওয়ালাকে নোটিস দিয়ে রেখেছিলাম আগেই। কিন্তু জিনিসপত্রের কী হবে? এর মধ্যে

আমার নিজস্ব অনেক জিনিসও জমে গেছে। ভালো ভালো কম্বল, বিছানার চাদর, টেবিল ল্যাম্প, অত্যাধুনিক ইস্ত্রি, কত রকম গেলাস, কাপ-সসার, রান্নাঘরের অতি সুদৃশ্য সব থালা বাসন, যা দেশে পাওয়া যায় না, আরও কত কী। এগুলো কী করে নেওয়া হবে? অনেকে এসব ছোট ছোট প্যাকেট বানিয়ে জাহাজ ডেকে দেশে পাঠিয়ে দেয়, দু-তিন মাস বাদে পৌঁছয়। এখন বসে বসে কে এত সব প্যাকেট বানাবে? আমার অস্থির অস্থির লাগছে। তারপর এক সময় মনে হল, ধুৎ! ফিরব দমদমের দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে, সেখানে এত সব আবর্জনা বাড়িয়ে কী হবে? থাক, সব পড়ে থাক! মার্গারিট আমার পাশে থাকলে ঠিক এই একই কথা বলত।

আয়ওয়া থেকে যখন বিমানে চাপতে যাচ্ছি, পল এঙ্গেল আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আবার দেখা হবে! আমি তাঁর প্রতি প্রবল টান অনুভব করলেও ভরসা করে এর পুনরুক্তি করতে পারিনি।

এই মহাদেশ ত্যাগ করার আগে কয়েকটা দিন থেকে যেতে হবে নিউ ইয়র্কে। ওই অঞ্চলটা ভালো করে ঘোরা হয়নি। যদিও মার্গারিটের দেখার জন্য ছটফট করছি, কিন্তু নিউ ইয়র্কেও রয়েছে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ। সে এর মধ্যে অনেকবার টেলিফোনে বলেছে, চলে এসো, চলে এসো।

॥ ৮ ॥

"অসংখ্য সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে
সময়ের স্রোত
এবং কেই বা বিখ্যাত হতে চায় এবং অটোগ্রাফ সই করতে চায়
সিনেমা স্টারদের মত...
...আমি জানতে চাই আমার মৃত্যুর পর কী হবে..."
—অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ

অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ আমাকে জানিয়েছিল যে ওর তখনও কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, গ্রিনিচ ভিলেজে একটি বিশেষ বইয়ের দোকানে ওর খোঁজ করতে। নিউ ইয়র্ক শহরে আমি তখন কোনও বাঙালিকেই চিনতাম না। আর কারুর বাড়িতে আতিথ্য নেওয়ার প্রশ্নই নেই, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে আমি এসে উঠলাম ওই গ্রিনিচ ভিলেজেরই একটা সস্তার হোটেলে। হোটেলটা আমাদের শিয়ালদা স্টেশানের কাছাকাছি হোটেলগুলোরই মতন, বেশ নোংরা, সরু একচিলতে ঘর, খাট-বিছানা আর ওয়ার্ডরোব ছাড়া আর কিছুই নেই, ভাড়া তখনকার হিসেবে বারো ডলার, অর্থাৎ ষাট টাকা।

সেই ঘরে জিনিসপত্র রেখে, তালা দিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম বইয়ের দোকানটির সন্ধানে। দোকানটির নাম এইটথ্ স্ট্রিট বুক শপ। নিউ ইয়র্কে রাস্তা খোঁজা বেশ সহজ, আমার হোটেল পাঁচ নম্বর রাস্তায়, মাত্র তিনটে ব্লক হেঁটে যাওয়া কিছুই না।

অগাস্ট মাসের দুপুর, বাতাসে শীত নেই, ঝকঝক করছে রোদ, রাস্তায় প্রচুর মানুষজন, কত বিচিত্র রকমের পোশাক। গ্রিনিচ ভিলেজে চব্বিশ ঘণ্টাই মানুষের চলাচল। আমাদের দেশের জনতার সঙ্গে তফাত এই যে, নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান তো বটেই, হয়তো নারীদের সংখ্যা বেশি।

দোকানটা বেশ বড়, ভেতরে প্রচুর অল্প বয়েসি ছেলেমেয়েদের ভিড়, আমি প্রথমে ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, সেখানে শুধু আধুনিক লেখকদের বই-পত্র রাখা আছে। 'ভিলেজ ভয়েস' এবং 'এভার গ্রিন রিভিউ' আধুনিকদের নামকরা পত্রিকা, সেগুলিও রয়েছে গাদা গাদা। একসময় আমি কাউন্টারের

যুবকটিকে জিগ্যেস করলাম, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

যুবকটি মুখ তুলে বলল, তোমার নাম কী? তুমি কি ভারতীয়?

আমার নাম শুনে সে বলল, 'হ্যাঁ, অ্যালেন তোমার কথা বলে রেখেছে। তুমি এই পাশের সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে যাও।

তিন তলায় এসেই আমার সর্বাঙ্গে একটা শিহরন হল। ডান দিকের একটা ঘরে একটা গান বাজছে, সেটা শুধু যে বাংলা গান তাই-ই নয়, সেটা একটা লোকসঙ্গীত, ফান্দেতে পড়িয়া বগা কান্দে রে...।

এক বছর আমি কোনও বাংলা গান শুনিনি। এরকম একটা লোকসঙ্গীত নিউ ইয়র্কে এসে শুনব, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঘরের দরজা খোলা, একটা খাটের ওপর আধ-শোওয়া হয়ে অ্যালেন পা নাচাচ্ছে, পাশের টেবিলের ওপরে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজছে সেই গান।

অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের বয়েস তখন চল্লিশের কাছাকাছি, আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়। তার মুখভর্তি দাড়ি, দু-একটিতে পাক ধরেছে, মাথায় বাবরি চুল। সবচেয়ে চমকপ্রদ তার পোশাক, সে একেবারে মিলিটারি সেজে আছে, সেইরকমই প্যান্টকোর্ট, শুধু মাথায় টুপিটা নেই।

আমাকে দেখেই অ্যালেন তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে জড়িয়ে ধরল, ফটাফট দু'গালে চুমো দিয়ে বলল, এসেছ? এসেছ তা হলে? খুব ভালো করেছ! ক'দিন থাকবে? আবার কবে আয়ওয়া ফিরতে হবে?

আমি বললাম, আর আয়ওয়াতে ফিরছি না।

অ্যালেন বলল, চমৎকার। চমৎকার! ওই মিড ওয়েস্টে মানুষ থাকতে পারে? শুধু গমের খেত। মানুষগুলো সব সেকেলে।

আমার কিন্তু আয়ওয়ার নিন্দে পছন্দ হল না। আয়ওয়ার প্রকৃতি আমার ভালো লেগেছে, মানুষেরা সহৃদয়, আয়ওয়ার এক বছর আমার জীবনে একটা রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে।

অ্যালেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শক্তি, তারাপদ, জ্যোতি, শরৎকুমার, সন্দীপন, উৎপল, মতি নন্দী এই সব বন্ধুদের খবর জিগ্যেস করতে লাগল। শক্তির সঙ্গে অ্যালেনের খুবই ভাব হয়েছিল, সে বলল, আই মিস শাক্‌টি!

কলকাতার গল্প করতে-করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একসময় অ্যালেন বলল, এই রে, ভাত পুড়ে গেল বুঝি!

পাশের রান্না ঘরে অ্যালেন ভাত চাপিয়েছিল, বেশ ফুটে উঠেছে এর মধ্যে।

অ্যালেন বলল, আমি রান্না করছি, তুমি আমার সঙ্গে খাবে? আমি খুব ভালো ডাল রান্না করতে শিখছি।

রান্নার প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতায় একদিন একটা কলা খেতে-খেতে অ্যালেন একটা কথা খুব সুন্দর করে বলেছিল।

সেটা ছিল মর্তমান কলা, ঠিক ঠিক পাকা, হলুদ রঙের খোসাটা বড় স্নিগ্ধ। খোসা ছাড়িয়ে কলায় এক কামড় দিয়ে অ্যালেন বলেছিল, অতি চমৎকার, নিখুঁত স্বাদ, দোকানের কোনও খাবারের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। ঈশ্বর খুব ভালো রাঁধুনি। একটু থেমে অ্যালেন আবার বলেছিল, গড ইজ দা বেস্ট কুক!

খেতে বসে আবার চলল নানারকম গল্প। কিন্তু অ্যালেনের পোশাকটা আমার দৃষ্টিকটু লাগছিল। অ্যালেন ঘোরতর যুদ্ধবিরোধী আমি জানি, অথচ তার অঙ্গে সামরিক সাজ। অ্যালেন যখন কলকাতায় ছিল, সেই সময় কিউবার সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়েছিল, আমেরিকা কিউবার দিকে পাঠিয়েছিল গানবোট, ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও যুদ্ধজাহাজ পাঠাবার হুঁসিয়ারি দিয়েছিল, কয়েকটা

দিনের জন্য আর একটা বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনায় কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তখন কেনেডি, অ্যালেন তাঁকে গুণ্ডার সর্দার, মাথা মোটা প্লে-বয় ইত্যাদি যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়েছিল আমাদের সামনে। পৃথিবীর যে-কোনও যুদ্ধেরই বিরোধী অ্যালেন। এই প্রসঙ্গে সে প্রখ্যাত ফরাসি ঔপ্যাসিক সিলিন-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল আমাদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও সিলিন ছিলেন প্যাসিফিস্ট, এ জন্য অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাঁকে। এক রেস্তোরাঁর মধ্যে দাঁড়িয়ে সিলিন চিৎকার করে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি একজন কাওয়ার্ড। যুদ্ধের বিরোধিতা করা যদি কাপুরুষতা হয়, তবে আমি নির্লজ্জভাবে কাপুরুষ!

আমি অ্যালেনকে জিগ্যেস করলাম, তুমি এই বিদ্‌ঘুটে পোশাক পরে আছ কেন?

অ্যালেন হেসে বলল, কেন, আমাকে মানায়নি? ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো, আমার এক বন্ধু আর্মিতে ছিল, সে মারা গেছে। তার বিধবা তার সব পোশাক-আসাক আমাকে দিয়ে দিয়েছে, আমার জামাকাপড় ছিল না, বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে। আমার থাকার জায়গাও নেই, এক একদিন এক এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। তবে, এবার আমরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি, সেটা সারানো হচ্ছে। পিটার আসুক, সেটা আমরা দেখতে যাব।

একটু বাদেই পিটার এসে উপস্থিত। পিটার অরলভস্কি, অ্যালেনের স্ত্রী। অ্যালেন ঘোষিত সমকামী এবং পিটারের মতন একজন লম্বা-চওড়া পুরুষকে প্রকাশ্যে নিজের স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে তার কোনও দ্বিধা নেই। এই নিয়ে আমেরিকেও তখন হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল, আমাদের দেশ কেউ তো এ ব্যাপার সহ্যই করতে পারবে না। পরবর্তী যুগে সমকামীদের একত্র বাস অনেক দেশে বৈধ হয়েছে, কিন্তু সেই আমলে এটা ছিল অভিনব, বহু নিন্দিত ব্যাপার। কবি হিসেবে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ তখন আমেরিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয়, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী তার ভক্ত কিন্তু মার্কিন সরকার বা বিভিন্ন এস্টাব্লিশমেন্ট তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। অ্যালেন আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রীয় নীতিরও কড়া সমালোচক। তার 'আমেরিকা' নামের বিখ্যাত কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন এরকম সাংঘাতিক ঃ

> America I've given you all
> and now I am nothing
> America two dollars and
> twenty seven cents January 17, 1956
> I can't stand my own mind
> America when will we end
> the human war?
> Go fuck Yourself with your atom bomb...

পিটারের মতন এমন সরল, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। অ্যালেন বুদ্ধিজীবী, প্রচুর পড়াশুনো করেছে, সব সময় সে একটা সাহিত্য-শিল্পের ঘোরের মধ্যে থাকে। পিটার সব কিছুই নিজের অনুভূতি দিয়ে বোঝে। তার শরীরে রাগ বলে কোনও বস্তু নেই, সে ভুলেও অন্য কারুর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটবে না। অনেক সময় অ্যালেনের চেয়ে পিটারের সঙ্গে কথা বলতেই বেশি ভালো লাগে।

পিটার আমাকে দেখে কোনওরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। শান্তভাবে বলল, ও, সুনীল, সুনীল, ইয়েস, ইয়েস, খাচ্ছ, খেয়ে নাও, আমার খাওয়া হয়ে গেছে...। যেন কালই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে।

পরের দিনই হোটেল থেকে পিটার আমার মালপত্র তুলে নিয়ে চলে এল ওদের নতুন বাড়িতে।

আমরা সাধারণভাবে নিউ ইয়র্ক বললেও মূল শহরটির নাম ম্যানহাটান। দ্বীপটাকে যদি একটা মাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে এর লেজের দিকটা গরিব পাড়া। বিশাল বিশাল চওড়া

কয়েকটি রাজপথ চলে গেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, সেগুলির নাম এভিনিউ, আর এগুলোকে সমান্তরালভাবে কাটাকুটি করে গেছে বহু রাস্তা, এগুলিকে বলে স্ট্রিট। ঠিকানা শুনলেই বোঝা যায় কে কোন পাড়ায় থাকে। তিনি নম্বর, পাঁচ নম্বর রাস্তায় বেকার, ভবঘুরেদের বাস, আর বাহাত্তি কিংবা উনআশি নম্বর রাস্তার অধিবাসী মানেই রীতিমতন ধনী।

এই নীচের দিকের পাড়াগুলো, যাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড কিংবা লোয়ার ওয়েস্ট সাইড, এবং কাছাকাছি গ্রিনিচ ভিলেজ। একসময়, ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ছিল যত রাজ্যের গরিব শিল্পী-সাহিত্যিকদের আখড়া, অনেকটা এককালের প্যারিসের মমার্ত-এর মতন। পরে অবশ্য ওই দুই অঞ্চলই টুরিস্টদের ভিড়ে চরিত্র নষ্ট করে ফেলে।

ম্যানহাটানের গরিব এলাকা নিয়ে সেই সময় একটা চমৎকার ফিল্ম তোলা হয়েছিল, 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'। হলিউড প্রচুর নিকৃষ্ট ফিল্ম উৎপাদন করে। কিন্তু কিছু কিছু মিউজিকাল ছবি তুলনাহীন। আমেরিকার মিউজিকালস্ অনেকগুলিই সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' একটি ক্লাসিক ছবি হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। অসামান্য বুদ্ধির প্রয়োগ আছে এর কাহিনি নির্মাণে। শেকসপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট-এর গল্পটিকেই যেন হুবহু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক আধুনিক পটভূমিকায়। রোমিও-জুলিয়েটে দুই প্রতিবেশি বনেদি পরিবারের ঝগড়া, এক পরিবারের ছেলের সঙ্গে অন্য পরিবারের মেয়ের প্রেম, প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিকার ভাইকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, সবই অবিকল রয়েছে এখানে। তবে বনেদি পরিবারের বদলে গরিব পোর্টুরিকান আর সেইরকমই গরিব আর বেকার শ্বেতাঙ্গদের দু'টি পাড়ার বিবাদ রয়েছে কাহিনির কেন্দ্রে। ঘটনাগুলি সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়, কিন্তু ছবিটির আরও বড় আকর্ষণ, এর সংলাপ সবই গানের সুরে বাঁধা, প্রত্যেকটি চরিত্রের পদক্ষেপে আছে নাচের ছন্দ।

ফিল্মটা আমি আগেই দেখেছি দুবার, তাই অ্যালেনদের নতুন বাড়ির তিন নম্বর লোয়ার ওয়েস্ট সাইড পাড়াটা আমার খুব চেনা লাগে। পোর্টুরিকান, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঘুরছে, এখানে সেখানে ভাঙা বোতল, রকে বসে এক একটা দঙ্গল বিয়ার পান করছে কিংবা গাঁজা টানছে, হঠাৎ হঠাৎ মারামারিও লেগে যাচ্ছে দুই দলে, তারপরই শেয়ালের ডাকের মতন শব্দ তুলে ছুটে আসছে পুলিশের গাড়ি।

অ্যালেনদের অ্যাপার্টমেন্টটা পাঁচতলায়। লিফট নেই। ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে কত যে খারাপ কথা লেখা, তার আর ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশেও এরকম বাড়ি দেখলে আমার বেশ আরাম লাগে।

অ্যাপার্টমেন্টটাও বড় বিচিত্র। একখানাই মাত্র ঘর, সেটা টানা, লম্বা, প্রায় চারখানা ঘরের সমান, তার একদিকে রান্নার জায়গা, তারপর বসার জায়গা, তারপর শোওয়ার জায়গা, মাঝখানে দেওয়ালের কোনও বালাই নেই। এই ঘরখানিতেও খানিকটা জীর্ণ ভাব আছে, ওয়াল পেপার স্থানে স্থানে ছেঁড়া, রান্নার জায়গায় সিংক্‌টা ফুটো, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, সেটার তলায় একটা গামলা রাখতে হয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমি অ্যালেনের সংসারে বেশ একাত্ম হয়ে গেলাম। সংসার তো নয়, চাঁদমেলা। কত লোক যে আসছে-যাচ্ছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই, যার যখন খুশি রান্না করে নিয়ে খাচ্ছে, রাত্তিরেও শুয়ে পড়ছে দশ বারোজন।

ফ্লাওয়ার চিলড্রেন কিংবা হিপিদেরও আগের সময়কার কথা। তখন বিট জেনারেশনের আন্দোলন চলছে, লোকে এদের বলত বিটনিক। এটা ছিল মূলত লেখক-শিল্পী-সঙ্গীতকারদেরই আন্দোলন, তখন এর প্রধান দুই নেতা ছিল জ্যাক কেরুয়াম এবং অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ।

অ্যালেনের তত্ত্ব ছিল এই যে, শিল্প-সাধনা একটা চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, লেখক-শিল্পীদের কোনও চাকরি-বাকরি করা উচিত নয়। সরকার কিংবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকেও তারা কোনওরকম

সাহায্য গ্রহণ করবে না। নিজেদের সাহিত্য-শিল্প সামগ্রীর বিনিময়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের কাছ থেকে যা পাবে, তা দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে। সেজন্যই জীবনযাত্রার মানও হবে অতি সরল, পেট ভরাতে হবে অতি সাধারণ খাবারে, যে-কোনওরকম পোশাকে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এমনকি দাড়ি কামাবার পয়সাও বাঁচানো যেতে পারে। আমেরিকার সমাজে সেই প্রথম ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আবির্ভাব। অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ যথেষ্ট শিক্ষিত, সে একসময় 'নিউজ উইক' পত্রিকায় চাকরি করছে, ইচ্ছে করলেই সে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে, সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে থেকে, উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এরকম ত্যাগের জীবন বেছে নিয়েছিল।

অ্যালেনের কাছে অনেকেই আশ্রয় নিতে লাগল, তার কারণ অন্যদের তুলনায় অ্যালেনেরই কিছু রোজগার ছিল। তরুণ কবি-লেখকদের বই বিশেষ বিক্রি হয় না, গায়ক-শিল্পীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গিন্‌স্‌বার্গ তখন অসম্ভব জনপ্রিয়। সে কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখে না, তার কবিতার বই 'হাউল' তখনই এক লক্ষ কপির বেশি বিক্রি হয়ে গেছে। সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কাডিস'ও বিক্রি হচ্ছে হু হু করে। এর থেকে প্রাপ্য সব অর্থই অ্যালেন খরচ করে অন্যদের জন্য।

অ্যালেনের বন্ধু এবং বিটনিকদের অপর গুরু জ্যাক কেরুয়াম-ও তখন গদ্য লেখক হিসেবে খুব সার্থক। কেরুয়াক তখন বছরে তিন-চারখানা করে উপন্যাস লিখছে। তার উপন্যাসে প্লট খোঁজার কোনও ঝামেলা নেই, অধিকাংশই তার নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। কিন্তু সেই সময় জ্যাক কেরুয়াক খানিকটা রেকলুজ বা একা-চোরা ধরনের হয়ে পড়েছিল, অ্যালেনের মতন সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলার সে পক্ষপাতী ছিল না। সে একা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত লং আয়ল্যান্ডে। তার এরকম ব্যবহারে বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই কিছুটা ক্ষুব্ধ, তার সমসাময়িক অপর বিখ্যাত কবি গ্রেগরি করসো একদিন খুব রাগারাগি করল। ঈষৎ মত্ত অবস্থায় গ্রেগরি ফোন করে বলল, এই জ্যাক, তুই আমাদের নিয়ে উপন্যাস লিখছিস, আমাদের চরিত্র বানাচ্ছিস, তা হলে তুই তোর রয়ালটির ভাগ আমাদের দিবি না কেন রে? দে, টাকা দে!

টেলিফোনের ওপাশ থেকে জ্যাক কেরুয়াক কী উত্তর দিয়েছিল, তা আমার শোনা হয়নি।

অ্যালেনের এই অ্যাপার্টমেন্টে সর্বক্ষণ হইচই। দলে দলে ছেলেমেয়ে এসে, কেউ ওখানেই ছবি আঁকতে বসে যাচ্ছে, কেউ গিটার বা ভায়োলিন বাজিয়ে গান জুড়ে দিচ্ছে, কেউ জোর করে কবিতা শোনাবেই। অ্যালেন নিজেও তখন গানের চর্চা শুরু করেছে। এর আগে সে উইলিয়াম ব্লেকের কিছু কবিতায় সুর দিয়ে গান গাইত, এই সময় সে শুরু করল হরে কৃষ্ণ নাম গান। কলকাতা থেকে অ্যালেন একটা ছোট হারমোনিয়াম কিনে নিয়ে গিয়েছিল, ওই বস্তুটি আমেরিকায় কেউ কখনও দেখেনি। সেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, হরো রাম, হরে হরে গাইতে গাইতে অ্যালেন জিগ্যেস করত, সুনীল দ্যাখো তো, সুরটা ঠিক হচ্ছে কি না।

এই গান আমরা ছেলেবেলায় অনেক শুনেছি, গ্রামের অনেক মানুষ সকালে এই গান গাইত, ভিখিরিরাও এই গান গেয়ে ভিক্ষে করতে আসত। কিন্তু আমার জানা সুরের সঙ্গে অ্যালেনের ঠিক মেলে না। অ্যালেন এই গান শিখেছিল বেনারস থেকে, সুতরাং হিন্দি আর আমেরিকান উচ্চারণ মিলে মিশে সে এক অন্যরূপ ধরেছিল। অ্যালেনের মুখে গানটা এইরকম শোনাত : হ্যা-রে কৃ-ষ-ষ-না, হ্যা-রে কৃ-ষ-ষ-না, হ্যারে রা- ম্-মাঃ, হ্যারে রাম্-মাঃ...ইত্যাদি। আমি খুব হাসতাম বলে অ্যালেন জোর করে আমাকে গেয়ে শোনাতে বলত, তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে গলা মেলাত। ম্যানহাটানের সেই অ্যাপার্টমেন্টে বসে যেত এক সঙ্কীর্তনের আসর।

শুধু গান-বাজনা আর কবিতাই নয়, এখানে মাদক সেবন এবং সহবাসও চলত অবাধে। গাঁজা-চরস ওদেশে সাংঘাতিকভাবে নিষিদ্ধ, ধরা পড়লেই পাঁচ বছর জেল, তবু ছেলেমেয়েরা জোগাড়

ধরে আনত যে-কোনও উপায়ে। অল্প বয়েসিদের এই মাদক সেবনের অভ্যেস ছাড়াবার নানারকম চেষ্টা চলছে, স্যালেভশান আর্মি গ্রিনিচ ভিলেজে কফি পার্লার খুলেছে, যাতে ছেলেমেয়েরা কফি খেয়ে অন্য বদ অভ্যেস ছাড়ে। অনেকেই সেই বিনা পয়সার কফি দু'তিন কাপ খেয়ে নিয়ে তারপর যেত গাঁজা টানতে। সেই সঙ্গে এল এস ডি।

কলকাতাতেই শক্তি ও আমি একদিন এল এস ডি খেয়ে দেখেছি। তারাপদ রায়ের বাড়িতে শক্তি ও আমি সেই এল এস ডি খেয়ে চার ঘণ্টা আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, অপূর্ব সেই অভিজ্ঞতা, শেষের দিকে শক্তির মৃত্যুভয় এসে গিয়েছিল, তবু সে হাসছিল, হা-হা করে, আমি বারবার দেখতে পাচ্ছিলাম একটি সাত-আট বছরের রক্তমাংসের বালককে, যার মুখ ঠিক আমার বাল্যের ওই বয়েসের। আমেরিকায় গিয়ে কিন্তু আমি আর এল এস ডি খাইনি। যে-কোনও নতুন জিনিসই একবার চেখে দেখতে কিংবা পরীক্ষা করতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কোনও কিছুরই দাস হওয়া আমার স্বভাবে নেই। অ্যালেনের ঘরে নব্য লেখক-লেখিকারা আমাকে মাদক গ্রহণের জন্য বারবার পেড়াপিড়ি করলেও আমি রাজি হইনি কিছুতেই।

নেশার ঘোরে যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে প্রবলভাবে জড়াজড়ি শুরু করত একসময়। যে-হেতু লম্বা ঘরের মধ্যে কোনও আব্রু নেই, তাই একদিকের আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে গল্প করত আর একটি দল। অনেক মেয়েরই খুব পছন্দ ছিল পিটারকে। পিটার একদিকে যেন অ্যালেনের স্ত্রী, আবার অন্য দিকে মেয়েদের প্রেমিক। কোনও কিছুতেই তার আপত্তি নেই, সে এমনই নিরাসক্ত। অ্যালেনের কি ঈর্ষা হত না এ জন্য? পিটার কোনও মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে অ্যালেন আপত্তি করত না বটে, কিন্তু অমি লক্ষ করতাম, সেই সময় অ্যালেনের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ অন্যদের বকাবকি শুরু করে দেয়। এ যেন, 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই অঙিনা দিয়া...।'

পিটারের একটি বান্ধবী ছিল প্রকৃতই অসাধারণ। তার নাম রোজ মেরি। সে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপিকা, কাব্য-সাহিত্যেও প্রচুর উৎসাহ, অন্য অনেক বিষয়েই প্রভূত জ্ঞান। কিন্তু এ হেন বিদুষী রোজ মেরির দুর্ভাগ্য তার চেহারা নিয়ে। সে ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা, শুধু টিং-টিঙে লম্বাই নয়, সেই অনুপাতে চওড়া, অর্থাৎ সে একটি নারী দৈত্য, আমি গোপনে তার নাম দিয়েছিলাম হিড়িম্বা। এত লম্বা-চওড়া বলেই রোজ মেরির কোনও পুরুষ বন্ধু জোটেনি, তার বিবাহের কোনও আশাই নেই। তবে, এই দর্শনের অধ্যাপিকাটিরও রক্ত-মাংসের ক্ষুধা ছিল, সে জন্য সে বেছে নিয়েছিল পিটারকে। দুজনের মনের মিলের কোনও প্রশ্নই নেই, শুধু শারীরিক ভালোবাসা। ওদের দেশে লাভ আর লাভ মেকিং-এর মধ্যে অনেক তফাত। এই রোজ মেরির রান্নার হাত ছিল চমৎকার, আড্ডা মারতে মারতে উঠে গিয়ে একসময় সে আমাদের জন্য রান্না করে দিত। রাঁধতে গিয়ে তার পোশাকটা যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য সে খুলে রাখত তার গাউনটা, সম্পূর্ণ নগ্ন। তখন তার দিকে এক পলক তাকালেই মাথা ঘুরে যাওয়ার মতন অবস্থা, যেন ববডিংনাগদের দেশ থেকে কোনও রমণী সেখানে দৈবাৎ এসে পড়েছে। তখনই হয়তো অ্যালেন সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে আমাকে উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম-এর কবিতা বোঝাচ্ছে, কিন্তু আমার পক্ষে মনঃসংযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত খুবই।

রোজ মেরি নাম্নী এক বিশাল রমণী শরীর দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, যার গায়ে একটা সুতোও নেই, তার দিকে বারবার আমার চোখ চলে যাবে না?

কয়েক দিনের মধ্যে অ্যালেন এই সব হইহল্লায় তিতিবিরক্তি হয়ে উঠল। সর্বক্ষণ ঘরের মধ্যে হট্টগোল, সে নিজের লেখাপড়ারও সময় পায় না। তখন অ্যালেন নিয়ম করে দিল, সকাল বারোটার আগে কেউ আসতে পারবে না। তাতেও লাভ হল না বিশেষ, প্রত্যেক রাতেই আড্ডা চলে প্রায় ভোর তিনটে-চারটে পর্যন্ত, তার ফলে ঘুমোতে হয় বেলা বারোটা পর্যন্ত। সবাই অ্যালেনের পয়সায়

খাচ্ছে-দাচ্ছে, তাই অ্যালেন হুকুম দিল সবাইকেই কিছু না কিছু করত হবে, পালা করে কেউ বাজার করবে, কেউ বাসন মাজবে, কেউ কাপড় কাচবে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ব্রেকফাস্ট বানানোর, হট ডগ সেদ্ধ করা, ডিম ভাজা আর পাঁউরুটি সেঁকা আমার পক্ষে অতি সহজ কাজ।

এখানে স্থায়ী বাসিন্দা আমরা চারজন, তার মধ্যে গ্রেগরি করসোকে দিয়ে কোনও কাজই করানো যায় না। তাকে ঘর ঝাঁট দেওয়ার ভার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঝাঁটা হাতে নিয়েও গ্রেগরি একটা লম্বা গল্প শুরু করে, তারপর নিজের গল্পে নিজেই হেসে লুটোপুটি খায়। একসময় অ্যালেন তার হাত থেকে ঝাঁটাখানা নিয়ে নিজেই শুরু করত ঝাঁট দিতে। এইরকম প্রতিদিন।

গ্রেগরি করসো অতিশয় বিশুদ্ধ ধরনের কবি, এবং একেবারেই পাগলাটে ধরনের মানুষ। তার ইটালিয়ান অরিজিন চেহারায় স্পষ্ট, খুবই রূপবান, কিন্তু সকাল থেকেই নেশা শুরু করে, গাঁজা-ভাঙ ছাড়াও তার মদেও যথেষ্ট আসক্তি, দাড়ি কামায় না, স্নান করে না, দাঁতও মাজে না। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই সে হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে অ্যালেনের কাছে এক-একটা শব্দের বানান জিগ্যেস করে। মনে আছে, একদিন সে জিগ্যেস করেছিল, অ্যালেন, পোয়েট্রির প্লুরাল কি পোয়েট্রিজ হয়? অ্যালেন বলেছিল, না, পোয়েমস লেখো। তারপরই অ্যালেন আবার বলেছিল, হ্যাঁ, কেন হবে না, গ্রেগরি করসো লিখলে পোয়েট্রিজ-ও বিশুদ্ধ!

গ্রেগরি এক একদিন স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, সিল্কের জামা পরে বেরিয়ে যেত। সবাই হাসতে-হাসতে বলত, ও বিয়ে করতে যাচ্ছে। বড়লোকের মেয়েদের ঠকানো ছিল গ্রেগরির একটা পেশা। তার সুন্দর চেহারা ও খ্যাতির জন্য আকৃষ্ট হত অনেক মেয়ে, গ্রেগরি তাদের বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিত, দু-একজনকে সত্যি বিয়ে করে তাদের পয়সায় জুয়া খেলতে যেত, কিন্তু কোথাও সাত দিনের বেশি টিকতে পারেনি। সে একেবারে জন্ম-বাউন্ডুলে।

অ্যালেন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, গ্রেগরি টাকা ধার চাইলে খবরদার দেবে না। ও কখনও ফেরত দেয় না। গ্রেগরিকেও ধমকে দিয়েছিল, তুমি খবরদার সুনীলের কাছে টাকা চাইবে না, ওর টাকা নেই। গ্রেগরি বলত, না, না, তুমি থাকতে আমি এ গরিব ইন্ডিয়ানের টাকা মারব, তাও কি হয়!

বেশ কয়েকদিন আমি মেতেছিলাম এখানে। মার্গারিটকেও ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়। আয়ওয়ায় থাকার সময় আমার মন টিকছিল না, তখন মনে হত আয়ওয়াটাই আমেরিকা, কিন্তু এখানে পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। এক দল ছেলেমেয়ে সবসময় উৎসাহে টগবগ করছে, সাহিত্য-শিল্প ছাড়া আর কোনও কথা নেই, জীবন-যাপনের কোনও চিন্তা নেই, এই বোহেমিয়ানিজমের আকর্ষণ এমনই তীব্র যে কাটানো প্রায় অসম্ভব। অ্যালেনও আমাকে বলেছিল, এখানে থেকে যাও, কোনও অসুবিধে নেই, তোমার কিছু লেখা-টেখা আমি অনুবাদের ব্যবস্থা করে দেব, তাতেই তোমার হাতখরচ চলে যাবে।

একদিন রাত্তিরে অ্যালেন ও আমি লম্বা হলঘরটার এক প্রান্তে শুয়ে আছি। নানারকম গল্প করতে-করতে অ্যালেন একসময় আমার গালে দুটো হালকা চাপড় মেরে বলল, সুনীল, হবে নাকি?

সমকামী অ্যালেন আমাকে তার পার্টনার হতে বলেছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে আমি ভাবলাম, মন্দ কী? দেখাই যাক না, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। ক্ষতি তো কিছু নেই। আমি বললাম, ঠিক আছে, হোক। তুমি একবার, তারপর আমি একবার।

অ্যালেন আঁতকে উঠে বলল, না, না, তা হবে না। আমি অ্যাকটিভ। আমি প্যাসিভ হতে পারি না।

আমি বললাম, ওসব অ্যাকটিভ-প্যাসিভ আমি বুঝি না। আমি অভিজ্ঞতাটা পুরোপুরি চাই। তুমি যা করবে, আমিও তাই করব।

অ্যালেন বলল, থাক, দরকার নেই। দরকার নেই।

পরদিন সকালবেলা অ্যালেন বলল, তুমি কোনও মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ না কেন? এখানে

শত মেয়ে আসে, একজনকে বেছে নাও।

তখনই মার্গারিটের কথা আবার মনে পড়ে গেল আমার। এখানে অনেক যুবতীর সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কিন্তু কারুর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হয়নি। যখন তখন কারুর সঙ্গে শুয়ে পড়া আপাতত চলতি ফ্যাশান, যেন সবরকম সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু মার্গারিট আমার মন প্রাণ জুড়ে আছে।

সেই দিনই একটা কাণ্ড হল। অ্যালেন, পিটার ও অন্যান্যরা দুপুরবেলা বেরিয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে শুধু আমি আর গ্রেগরি। গ্রেগরি স্নান-টান করে, ভালো জামা পরে বেরুবার উদ্যোগ করল, আমাকে বলল, এক রাজকুমারীর কাছে যাচ্ছি, দু'দিন ফিরব না। গ্রেগরিকেও এক রাজকুমারের মতনই দেখাচ্ছে। আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে, সন্দেহ হল, একা পেয়ে টাকা ধার চাইবে। কিন্তু গ্রেগরি কিছুই বলল না। সাড়ম্বরে গেল সে, শুনতে পেলাম তার জুতোর শব্দ। একটু পরেই সে ফিরে এল দৌড়ে, হাঁপাত-হাঁপাতে বলল, তোমার কাছে খুচরো পঞ্চাশ ডলার হবে, শিগগির দাও, শিগগির, আমি ট্যাক্সি ধরে দাঁড় করিয়ে এসেছি, ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে, পঞ্চাশটা ডলার, চটপট দাও।

এমনই অপূর্ব গ্রেগরির কায়দা যে আমি প্রত্যাখ্যান করার কোনও সুযোগই পেলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের মতন তার হাতে তুলে দিলাম পঞ্চাশ ডলার। সে আবার হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল।

গ্রেগরি চেয়েছিল খুচরো পঞ্চাশ ডলার, ঠিক যেন খুচরো পঞ্চাশ পয়সা চাইছে। আমার কাছে ছিলই মোট সত্তর ডলার। গ্রেগরি চলে যাওয়ার পর শুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। অ্যালেন সাবধান করে দিয়েছিল, তবু ঠকতে হল, দোষ আমারই। তারপর মনে হল, যাক ভালো হয়েছে। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে পৌঁছেছি, সেইভাবেই ফিরে যাব। অ্যালেনের ঘর থেকে ফ্রান্সে একটা ফোন করলাম মার্গারিটকে। আমি প্যারিস যাব শুনে সে দারুণ খুশি, তার মা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্যারিসে আমার থাকার জায়গারও কোনও অসুবিধে হবে না। টাকা-পয়সার জন্য চিন্তা নেই।

সেই দুপুরেই বেরিয়ে আমার প্লেনের টিকিটটা কনফার্মও করে আনলাম পরের দিনের জন্য। বিকেলে অ্যালেনকে জানালাম অভিপ্রায়। অ্যালেন বলল, প্যারিস ঘুরে আবার চলে এসো এখানে।

সে রাত্রেও আড্ডা ও গান হল প্রায় ভোর পর্যন্ত। একেবারে শেষের দিকে ফিরে এল গ্রেগরি। সগর্বে চেঁচিয়ে বলল, আজ জুয়া খেলায় অনেক জিতেছি, এই নাও সুনীল, তোমার পঞ্চাশ ডলার। আরও দশ ডলার দিচ্ছি, উইথ মাই কমপ্লিমেন্টস।

সবাই একেবারে থ। গ্রেগরি করসোর জীবনে এটা নাকি রেকর্ড। সে এ পর্যন্ত কারুর ধার শোধ করেনি।

পরদিন সকাল সাতটায়, সবাই তখন ঘুমোচ্ছে, কারুকে না জাগিয়ে আমি সুটকেস নিয়ে নেমে গেলাম নীচে। এক বছর আগে নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে একা নেমেছিলাম, কেউ আমাকে নিতে আসেনি, এবারেও একাই ফিরে গেলাম সেখানে। আমার আমেরিকা-প্রবাসের এখানেই ইতি।

॥ ৯ ॥

"রক্তের মধ্যে এক তোলা ভালোবাসা
আত্মার মধ্যে এক বিন্দু সত্য
মাত্র কয়েক দানা খুদ, খুব শীতের একটি দিনে
একটি চড়াই পাখির বাঁচার জন্য যেটুকু দরকার

তোমরা কি ভাবো, পৃথিবীর মহত্তম সন্তদের ওজন
এর চেয়ে বেশি?"

—পিয়ের এমানুয়েল

একই সঙ্গে শূন্যতা ও পূর্ণতার বোধ মানুষের হয়। মানুষের বুকের খাঁচাটা এমনই এক রহস্যময় স্থান।

আটলান্টিক মহাসমুদ্র পেরুবার সময় আমার বুকটা খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। যেন অজান্তে বিষম একটা অপরাধ করে ফেলেছি। চিরকালের মতন ছেড়ে যাচ্ছি আমেরিকা, পাঁচ বছরের ভিসা থাকলেও খরচ করে ফেলেছি টিকিটটা, আর টিকিট কাটার সাধ্য আমার কখনও হবে না। আয়ওয়া নামের ছোট্ট সুন্দর শহরটির ওপর আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল, সেখানে আমার নিজস্ব একটা ঘর ছিল, ইচ্ছে মতন লেখা-পড়া করার সময় ছিল, সেখানে থেকে গেলে আমাকে আর কখনও অর্থ চিন্তা করতে হত না। ছেড়ে এসে কি ভুল করলাম? কিংবা, নিউ ইয়র্কে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের বাড়ির আড্ডা, কত কবি-শিল্পীর জমায়েত সেখানে, অ্যালেন থেকে যেতে বলেছিল, থাকলে আমার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হত। ঝোঁকের মাথায় সব ছেড়ে-ছুঁড়ে এরকমভাবে চলে আসা, ভুল করেছি, না ঠিক করেছি? কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

মেঘহীন, রবিকরোজ্জ্বল দিন। বিমানের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নীল জলরাশি। মাথার ওপরে ও নীচে বিশাল নীল শূন্যতা। বিমর্ষতার মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে লাগছে এক একটা ঢেউয়ের ঝাপটা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্যারিসে পৌঁছব, মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হবে। সেই সম্ভাবনার আনন্দে ভরে যাচ্ছে আমার বুক। শুধু প্যারিস দেখা নয়। মার্গারিটের সঙ্গে প্যারিস দেখা, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?

যাওয়ার পথে প্যারিস বিমান বন্দরে পা দেওয়ার সময় আমার মুখ-চোখে একটা ভীতু ভীতু ভাব ছিল, এক বছরের পশ্চিমি প্রবাসে আমি অনেক সাবালক হয়েছি। দুটো চারটে ফরাসি বাক্যও জানি। কোনও কারণে মার্গারিট আমাকে রিসিভ করতে না আসতে পারে যদি, তা হলেও একেবারে হারিয়ে যাব না।

কাস্টমস্ বেরিয়ারের ওপাশে অনেক লোকজন প্রতীক্ষা করে। আমার প্রথমেই চোখ পড়ল হলুদ স্কার্ট পরা, সোনালি চুলের যুবতীটির ওপর। মার্গারিট ছাড়া আর কারুকেই দেখতে পেলাম না। যেন একটা শূন্য স্থানে সে একা দাঁড়িয়ে আছে।

ধরা-ছোঁয়ার দূরত্বের মধ্যে আসতেই মার্গারিট আমায় দুহাত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। ফরাসি কায়দায় দুগালে। তারপর হাসি-কান্না মেশানো গলাল বলল, আমি খুব দুর্বল, সুনীল। মাকে ছেড়ে চড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, আর তোমাকে ছেড়েও এতদিন থাকতে পারছিলাম না কিছুতেই।

সেই আনন্দের মুহূর্তেও আমার মাথায় একটা নিষ্ঠুর সত্য ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল। মার্গারিটকে ছেড়েও আমাকে চলে যেতে হবে। আমি ফ্রান্সে অনন্তকাল থাকতে আসিনি। কিন্তু তখনই সেই কথাটা মার্গারিটকে বলা যায় না।

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে মার্গারিট আমাকে জিগ্যেস করল, আমরা ট্যাক্সিতে যাব, না বাসে?

আমি বললাম, ট্যাক্সি? তোমার মাথা খারাপ নাকি? অত পয়সা কোথায়? আমি কিন্তু প্রায় সব টাকাই খরচ করে ফেলেছি।

মার্গারিট বলল, ভালোই হয়েছে। আমার কাছেও টাকা নেই। মায়ের চিকিৎসার জন্য হাতে যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। তবে, সুখের কথা এই যে, মা কালই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। আমি এখন প্যারিসে ইচ্ছে মতন তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারব।

আমি বললাম, তা হলে আমাদের চলবে কী করে?

মার্গারিট বলল, ধার করব। আমার বেশ কয়েকজন বান্ধবী আছে, যাদের কাছে টাকা ধার করে এক বছর পরে ফেরত দিলেও চলবে।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, আমর থাকব কোথায়?

মার্গারিট হাসতে-হাসতে বলল, এখন তো ঠান্ডা নেই, যে-কোনও জায়গায় শুয়ে থাকতে পারি। স্যেন নদীর ধারে ভবঘুরেদের সঙ্গে কাটানোই বা মন্দ কী? রেড ওয়াইন আর লম্বা রুটি খাব! সত্যি, সুনীল, কয়েকটা দিন নদীর ধারে শুয়ে শুয়ে কাটিয়েই দেখা যাক না।

মেয়েটা সত্যি পাগলি। নদীর ধারে ক্লোশার-রা শুয়ে থাকে আমি জানি। তাদের সম্পর্কে অনেক গল্পও শুনেছি, কিন্তু আমি তাদের সমগোত্রীয় হব কী করে? আমি বিদেশি, পুলিশ আমাকে দেখতে পেলেই তুলে নিয়ে যাবে! আলজিরিয়ান কিংবা ভিয়েতনামি হলেও না হয় কথা ছিল, ফ্রান্সের প্রাক্তন কলোনির অনেক মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছে। যেমন ইংল্যান্ডে ভিড় করেছে বহু ভারতীয় ও পাকিস্তানি।

অবশ্য মার্গারিটের এই প্রস্তাবের উত্তরে আমার কোনও বাস্তবসম্মত উত্তর দেওয়া সাজে না। আমি বললাম, বাঃ, চমৎকার। নদীর ধারে শুয়ে থাকা তো অতি উত্তম ব্যাপার। কলকাতায় আমি গঙ্গার ধারের শ্মশানে শুয়ে থেকেছি কয়েকবার।

একটা বাসে চেপে আমরা চলে এলাম শহরের কেন্দ্রস্থলে, আবার অন্য বাসে প্লাস পিগাল-এ। আসবার পথে আমি ক্ষুধার্ত চোখে গিলছিলাম প্যারিস শহরটিকে। আমরা পরজীবনে বিশ্বাস করি না, এই তো আমাদের স্বর্গ। রাস্তার ধারে, ফুটপাথের ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার-টেবিল পাতা, সেখানে বসে বসে অনেক অলসভাবে কফি কিংবা বিয়ার-এ চুমুক দিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যেসব তরুণীরা, তারা সাজগোজ করেছে ঠিকই, কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না, প্রসাধনের পর সেটা গোপন করাই একটা আর্ট।

এক জায়গার দেওয়ালে একটা পোস্টার দেখে চমকে উঠলাম। সেখান বড় বড় অক্ষরে আমার নাম লেখা। তারপর ক্রমশ পোস্টারের সংখ্যা বাড়তে লাগল, সবগুলিতেই সুনীল, সুনীল! প্যারিসের দেওয়ালে দেওয়ালে আমার নাম, এই শহর কি আমার মতন এক অজ্ঞাত কুলশীলকে স্বাগত জানাচ্ছে? আমি যে আজই আসব, তা জানল কী করে নগরের মেয়র?

এটা আমার স্বপ্ন নয়। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্য যে সেদিন প্যারিসের দেওয়ালে অসংখ্য পোস্টারে আমার নাম দেখেছি। শুধু আমার নাম, আর কিছু লেখা নেই। আসল ব্যাপারটা হল, SUNIL নামে একটা নতুন সাবান বেরুতে যাচ্ছে, ওইসব পোস্টারে তারই বিজ্ঞাপন! অনেক বছর পরেও আমি জার্মানির এক দোকানে ওই SUNIL নামের গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট দেখেছিলাম। সম্প্রতি ওদেশে এক নতুন বিস্কুটের বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে, সেই বিস্কুটের নাম মুক্তি। এখন মুক্তি নামের কোনও বঙ্গীয় নারী প্যারিসে গিয়ে সেই বিজ্ঞাপনের পোস্টারগুলি দেখলে আমারই মতন চমকিত ও পুলকিত হবেন।

মুল্যাঁ রুজ নামে রেস্তোরাঁ নাইট ক্লাবটি বিশ্ব-বিখ্যাত। তার সামনে আমরা বাস থেকে নামলাম। মার্গারিট দোকানটির দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বলল, আমরা এখন ওখানে যাব?

আমি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে তাকালাম। কী ব্যাপার, মার্গারিট কি লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে নাকি?

মার্গারিট রহস্যময় ওষ্ঠে হাসতে লাগল। তারপর ঠিক মুল্যাঁ রুজ-এর মধ্যে নয়, তার পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে এল ভেতরে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে গেলাম তিনতলায়। বোঝা গেল সেটা একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ি, লম্বা টানা বারান্দা। এক তলায় নানান দোকান ও অফিস, ওপরের দিকে অ্যাপার্টমেন্ট। একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি লাগাতে লাগাতে মার্গারিট বলল, এটা এখন আমাদের।

ভেতরটা বেশ সুসজ্জিত, তিনটি শয়ন কক্ষ, বসবার ঘরটাতে বইপত্রের স্তূপ। তা হলে নদীর ধারে, আকাশে নীচে শুতে হবে না? এটা কার অ্যাপার্টমেন্ট, মার্গারিট কী করে জোগাড় করল, সে-রহস্য সে সহজে ভাঙতে চায় না, খালি উলটোপালটা কথা বলে। শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তা বেশ মজার।

মার্গারিটের এক কলেজের বান্ধবীর নাম মোনিক। সেই মোনিক তার অন্য দুজন বান্ধবীর সঙ্গে এই অ্যাপার্টমেন্টটা ভাড়া নিয়েছিল, তিনজনেই চাকরি করে। এর মধ্যে একজন বিয়ে করে নতুন অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে, দ্বিতীয়জন গেছে ও মাসের শুরুতেই। আগে তিনজন ভাগাভাগি করে ভাড়া দিত, এখন মোনিক একা এত বড় অ্যাপার্টমেন্ট রাখতে পারবে না, সে-ও চলে যাবে অন্য জায়গায়। এই মাসটার ভাড়া দেওয়া আছে, তাই থাকতে বাধা নেই, খালি দুখানা ঘর সে মার্গারিটকে ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বিনা পয়সায় আমাদের এই বিলাসের বাসস্থান!

মোনিকের সঙ্গে আলাপ হল বিকেলবেলা। মার্গারিটের সহপাঠিনী হলেও মোনিককে একটু বড় দেখায়, তার মুখে মার্গারিটের মতন সারল্য ও কৌতুক নেই, বরং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। ছিপছিপে তরুণী, কলার তোলা কালো রঙের একটা পোশাক পরা। তার কাটালো মুখখানা যে-কোনও ভাস্করকে আকৃষ্ট করবে। আমাকে স্বাগত জানালেও একটু পরেই বোঝা গেল, সে কথা কম বলে। একটিও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে না সে, আমি তার সব কথা বুঝে উঠতে পারি না। বারবার পারদোঁ পারদোঁ বললে, সে একটা মোটকা ডিকশনারি এনে আমার সামনে রাখল, সেটার নাম পেতি লারুস।

পরে আমি জেনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এই মোনিক একটি পাবলিশিং হাউজে চাকরি করে, সেখানে তার কাজ শেক্সপিয়র অনুবাদ। কতখানি ইংরিজি ভাষাজ্ঞান থাকলে একজন শেক্সপিয়র অনুবাদ করতে পারে তা অনুমেয়, তবু সে মুখে কিছুতেই ইংরিজি বলবে না! এমনই ছিল ফরাসিদের ভাষা-অভিমান! এখন এই গোঁড়ামি অনেকটা কমেছে।

মোনিক সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে অফিসে চলে যায়, আমি আর মার্গারিটও নগর সন্দর্শনে বেরিয়ে পড়ি। তখনকার ফ্রান্স কী গৌরবোজ্জ্বল, মহীরুহ সদৃশ লেখক-শিল্পীরা সেখানে বিচরণ করছেন। জাঁ পল সার্ত্র তখনও বেঁচে, তিনি এক রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন সকালে কফি পান করতে যান, জীবিত আছেন আরি মিশো, রেনে শ্যার-এর মতন কবিরা। ছবি আঁকছেন পিকাসো, রাস্তায় হঠাৎ দেখা যায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে কিংবা চার্লি চ্যাপলিনকে। পশ্চিমি জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিরা জনতাকে এড়িয়ে চলেন না। লোকেও তাঁদের বিশেষ বিরক্ত করে না। হইহই হয় পপ স্টার কিংবা পপ সিংগারদের নিয়ে। সেই সময় বিটলস্‌দের অভ্যুত্থান ঘটছে। সেই চারটি ব্রিটিশ ছোকরা গায়কদের নিয়ে তরুণ-তরুণীদের কি মাতামাতি! একবার আমি পল এঙ্গেলের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের প্লাজা হোটেলে দিন দু-এক কাটিয়েছিলাম, সেই হোটেলেই উঠেছিল বিট্‌লসরা, তাদের জন্য সর্বক্ষণ হোটেলের সামনে ট্রাফিক জ্যাম। অথচ ওখানেই ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা অ্যালেক গিনেস, তিনি লবিতে বসে কাগজ পড়তে-পড়তে চায়ে চুমুক দিতেন, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে কোনও ভিড় নেই।

প্যারিসে তখন এসেছিলেন রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেলর, কোনও শ্যুটিং উপলক্ষে নয়, এমনিই বেড়াতে, তাঁদের প্রেমকাহিনি নিয়ে প্রমোদ-জগৎ উত্তাল, সমস্ত পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁদের ছবি। উন্নাসিক ফরাসিরাও ওই যুগল চিত্রতারকাকে দেখার জন্য ক্ষ্যাপামি করছে শুনে মার্গারিটের কী রাগ!

আমি তখন তাকে একটা গল্প শোনালাম। একদিন নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সেই রাস্তারই অন্য ফুটপাতে এককালের হলিউডের নায়িকা লানা টার্নার, যাঁর অভিনয়ের চেয়ে বক্ষদেশের প্রসিদ্ধিই ছিল বেশি। লানা টার্নারকে দেখামাত্রই রাস্তায় ভিড় জমে গেল। তখন আইনস্টাইনের এক সঙ্গী আপসোস করে

বললেন, স্যার, দেখুন, দেখুন, এ যুগের সভ্যতার কী ট্রাজেডি! আপনি, আপনি আলবার্ট আইনস্টাইন এখানে রয়েছেন, তবু আপনাকে কেউ চিনতে পারছে না, আর সবাই হ্যাংলার মতন ওই মেয়েছেলেটির দিকে ছুটছে!

আইনস্টাইন হেসে বললেন, এটাকে ট্রাজেডি বলছ কেন? লোকে তো দেখবেই, ওই মেয়েটির অনেক কিছু দেখাবার আছে, আমার তো আর তা নেই।

আমরা যাকে বলি আইফেল টাওয়ার, ফরাসিরা বলে তুর দেফেল, তার পাশ দিয়ে আমরা দুজনে হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু মার্গারিট আমাকে কিছুতেই ওর ওপরে চড়তে দেবে না। টুরিস্টরা প্যারিসে এসেই আইফেল টাওয়ারের দিকে ছুটে যায়, টুরিস্টরা যা যা করে কিংবা দেখে, তার কোনওটাই আমার চলবে না। মার্গারিটের নির্দেশ, প্রথম দিন যতখানি সম্ভব পায়ে হেঁটে প্যারিস শহরটা দেখতে হবে। শুধু এর রাস্তা। নদীর ওপর সেতুগুলি, বিচিত্র সব হর্ম্যসারি এবং গাছপালার দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম না করলে এখানকার সংস্কৃতিও বোঝা যাবে না।

কোনও নতুন জায়গা দেখতে হলে পায়ে হেঁটে ঘোরাই যে প্রকৃষ্টতম, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ক্লান্ত হলে যে-কোনও জায়গায় বসে পড়া যায়। এ তো আর কলকাতা শহর নয় যে বসার জায়গা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্যারিস শহরে রয়েছে প্রচুর উদ্যান, নদীর দুধার আগাগোড়া বাঁধানো, যে-কোনও জায়গায় বসে পড়া যায়। এত টুরিস্টদের ভিড়, তবু অনেক বেঞ্চ খালি পড়ে আছে। এরা সব কিছুই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রাখে।

প্যারিস শহরটার সৌভাগ্য এই যে কখনও এখানে বোমা পড়েনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লন্ডন শহর জার্মান বোমা বর্ষণে ছাতু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্যারিস রয়েছে অক্ষত। শত্রুরাও এই শহরটিকে ভালোবাসে। ফরাসিরা বোধহয় তাদের অতি গর্বের এই নগরীটিকে বাঁচাবার জন্য আগেই হিটলারের কাছে হার স্বীকার করে বসেছিল। পরে আমেরিকানরাও শত্রু অধিকৃত এই সুন্দরীকে আহত করতে চায়নি। জার্মানিতেও ফ্রাংকফুর্ট শহরটাকে মিত্রবাহিনী বোমা মেরে মেরে একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু অদূরের হাইডেলবার্গ শহর তারা ধ্বংস করতে যায়নি। হাইডেলবার্গও এতই সুন্দর ও ঐতিহ্যসম্পন্ন যে তাকে নষ্ট করতে শত্রুরও হাত কেঁপেছিল।

প্যারিস বোমার ঘা খায়নি বটে, তবু বোমা-ভীতি ছিল নিশ্চয়ই। সেই জন্যই যুদ্ধ লাগার সময় প্যারিসের বিখ্যাত ভবনগুলি ধূসর রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ওপর থেকে ঠিক চিনতে পারা না যায়। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের অর্থনীতি এমনই দুর্বল হয়ে যায় যে, সেই ধূসর রং তুলে শহরের রূপ ফিরিয়ে আনাও সাধ্যে কুলোয়নি। যুদ্ধ থামার প্রায় কুড়ি বছর পর সেই কাজ শুরু হয়েছে, আমরা হাঁটতে-হাঁটতে দেখতাম, লুভর প্রাসাদ, নতরদাম গির্জার গায়ে ভারা বেঁধে মিস্তিরিরা ঘষাঘষির কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঁচ আমরা ভারতে তেমন টের পাইনি, কিন্তু ইউরোপে তার চিহ্ন অত বছর বাদেও সর্বত্র। সেই সময়কার অধিকাংশে ফিলম্ ও থিয়েটার যুদ্ধ-কেন্দ্রিক।

হাঁটতে-হাঁটতে কখনও রাস্তার ধারের কোনও রেস্তোরাঁয় বসা যায়। বুলেভার-এর ওপরেই চেয়ার-টেবিল পাতা। এক ফ্রাঁ দিলেই কফি পাওয়া যায়, তখন এক ফ্রাঁ আমাদের এক টাকার সমান। কফিতে চুমুক দিতে দিতে দেখা যায় পথের চলমান দৃশ্য। প্যারিসের সব কিছুই যেন আলগা ধরনের লাবণ্যময়।

এক কাপ কফি নিয়েও বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যত কম পয়সার খদ্দেরই হোক, কোনও খদ্দেরকেই উঠে যেতে বলার নিয়ম নেই এ-শহরে। এমনকি পরিচারকরা আশেপাশে এসে ঘুরঘুরও করবে না। আরও একটা চমৎকার নিয়ম আছে এখানে। প্রত্যেক রেস্তোরাঁয় বাথরুম রাখতেই হবে। অনেকে বাথরুম ব্যবহার করার জন্য আলাদা পয়সা নেয়, অনেকে নেয় না। কিন্তু বাথরুম ছাড়া কোনও দোকান খোলাই যাবে না। এই জন্যই তো শহর এমন পরিষ্কার থাকে।

দ্রষ্টব্য হিসেবে মার্গারিট আমাকে প্রথম নিয়ে গেল একটা কবরখানায়!

পের লাসেজ নামে এই কবরখানা দেখে আমি চমকে উঠলাম। এখানে বহু বহু বিখ্যাত লেখক-শিল্পী, সমাহিত, সেই জন্যই মার্গারিট আমাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কী অদ্ভুত যোগাযোগ, এই কবরখানা যে আমার খুব চেনা।

অন্যান্য সমাধিফলকের দিকে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে এসে এক জায়গায় থেমে মার্গারিট বলল, এই দ্যাখো, এখানে গিয়ম অপোলিনেয়ার শুয়ে আছেন।

গিয়ম আপোলিনেয়ারের কবিতায় শকুন্তলার উল্লেখ আছে, সেই উপলক্ষ্যে মার্গারিটের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই কবি আমাদের দুজনের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছেন। মার্গারিট ফুলের তোড়া এনেছে সেই কবির জন্য।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি।

মার্গারিট অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কী করে জানলে?

আমি বললাম, আমার বন্ধু অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গেরও প্রিয় কবি এই অপোলিনেয়ার। সে পের লাসেজ-এ এই সমাধিস্থানটা নিয়ে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছে। এখানে আসবার কয়েক দিন আগেই আমি নিউ ইয়র্কে অ্যালেনের সাহায্য নিয়ে সেই কবিতাটা অনুবাদ করেছি বাংলায়। কবিতাটার মধ্যে অনেক রেফারেন্স আছে, সেসব আমি জানি না। অ্যালেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল, তাতে আমার অনুবাদ করতে অনেক সুবিধে হয়েছে।

চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে আমি আবার বললাম, আপোলিনেয়ারের কবিতা, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের কবিতা, আর তোমার আমার বন্ধুত্ব, সব যেন মিশেছে এখানে।

মার্গারিট বলল, তুমি পুরো কবিতাটা অনুবাদ করেছ? শোনাও, শোনাও, আমাকে বুঝিয়ে দাও?

আমি উচ্চারণ করলাম কয়েকটি লাইন :

...ফিরে এসে একটা কবরের ওপর বসে তোমার
স্মৃতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে আছি
অসমাপ্ত লিঙ্গের মতো একখণ্ড পাতলা গ্রানাইট
পাথরে একটি ক্রুশ মিলিয়ে যাচ্ছে, পাথরে দুটি কবিতা
একটি ওলটানো হৃদয়
অপরটি প্রস্তুত হও আমার মত অলৌকিক
উচ্চারণ করেছি আমি কসত্রোউইত্‌স্কির গিয়ম আপোলিনেয়ার
কে যেন ডেইজি ফুল ভর্তি একটি আচারের বোতল
রেখে গেছে, এবং একটি
৫ বা ১০ সেন্টের সুররিয়ালিস্ট ধরনের কাচের গোলাপ
ফুল এবং ওলটানো হৃদয়ে ছোট্ট সুখী সমাধি
এবং একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে যার সাপের মতন
গুঁড়ির কাছে আমি বসেছি
গ্রীষ্মের বাহার এবং পাতাগুলো সমাধির ওপর ছাতা
এবং কেউ এখানে নেই
কোন অশুভকণ্ঠ কাঁদে গিয়ম কোথায় তুমি এলে
তার নিকটতম প্রতিবেশি একটি গাছ
সেখানে নীচে হাড়ের স্তূপ এবং হলুদ খুলি হয়তো
এবং ছাপানো কাব্য আলকুলস্ আমার পকেটে
তার কণ্ঠস্বর মিউজিয়ামে...

॥ ১০ ॥

"রাত্রি বেলায়
রাত্রি বেলায়
আমি নিজেকে যুক্ত করি রাত্রির সঙ্গে
সীমানাহীন রাত্রি
আমার, সুন্দর, আমার
রাত্রি, জন্মের রাত্রি
যা আমার কান্নায় আমাকে ভরে দেয়..."
—আঁরি মিশো

প্যারিস বা পারি একটি রাত-জাগা শহর। এখানে অনেক রেস্তোরাঁই খোলা থাকে রাত দুটো পর্যন্ত, কোনও-কোনওটার ঝাঁপ বন্ধ হয় ভোর চারটের সময়। আমরা তো আর সেসব জায়গায় যাই না, আমাদের পয়সা কোথায়? আমরা বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া খরচ করি টিপে-টিপে, দুপুরবেলায় রুটি আর খানিকটা চিজ আর স্যালামি কিনে নিয়ে কোনও পার্কে বসে খিদে মিটিয়ে নিই, বড় জোর এক কাপ কফি খাবার জন্য কোনও রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ বসি। ফরাসিদেশের কুলি-মজুররাও রাস্তার ধারে বসে লাঞ্চ খাবার সময় এক বোতল রেড ওয়াইন খায়। ওয়াইন নানা রকম দামের হয়, হাজার টাকা বোতলও আছে, আবার দু-টাকাতেও পাওয়া যায় এক বোতল। সস্তার ওয়াইন মার্গারিট একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই আমরা ওয়াইন কিনি না। মার্গারিটের বাড়ির তৈরি কয়েক বোতল ওয়াইন সে এনে রেখেছে, নৈশভোজের সময় বাড়িতে বসে তা পান করা হয়। আমাদের দেশে আগে অনেক বাড়িতেই কাসুন্দি তৈরি হত, ফরাসিদেশে অনেক পারিবারিক ওয়াইনই সেরকম।

আমাদের নৈশভোজও অতি সংক্ষিপ্ত। সন্ধের সময় বাড়ি ফেরার পথে একখানা রুটি, বেশ শক্ত এবং প্রায় দুহাত লম্বা রুটি, কিনে আনি। এই রুটির নাম বাগেত, লাঠির মতন একখানা বাগেত হাতে নিয়ে অনেক লোক বাড়ি ফিরছে, এটা সন্ধেবেলার একটা পরিচিত দৃশ্য। একখানা রুটিতেই দু তিনজনের খাওয়া হয়ে যায়। সঙ্গে কিছু স্যালাড, মাখন আর চিজ, কিছু একটা মাংসের টুকরো, তারপর আইসক্রিম।

এক একদিন ভাত খাবার জন্য আমার মন খুব আনচান করে। দিনের পর দিন স্যান্ডুইচ চিবোতে-চিবোতে মনে হয় বাংলাভাষাই বুঝি ভুলে গেছি, আমার হাসির আওয়াজটাও সাহেবদের মতন হয়ে যাচ্ছে। মার্গারিট আর মোনিক ভাত অপছন্দ করে না, কিন্তু ফ্যান গালতে জানে না বলে রাঁধতে হয় আমাকেই। আমেরিকায় তখন ইনস্ট্যান্ট রাইস বেরিয়ে গেছে, মাপ মতন জল দিয়ে পাঁচ মিনিট ফোটালেই ধপধপে সাদা ভাত হয়ে যায়, ফ্যান-ট্যান থাকে না, কিন্তু ফ্রান্সে সেই ইনস্ট্যান্ট রাইস খুঁজে পাইনি। ভাত তো আর স্যালামি কিংবা চিজ দিয়ে খাওয়া যায় না, তার জন্য ডাল-তরকারি-মাছ-মাংসের ঝোল লাগে। সুতরাং, ভাত খাওয়ার দিন পুরো রান্নার ভারই আমার ওপর। সকালবেলা আমি একটা থলে হাতে নিয়ে বাজার করতে যাই। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, কুর্জেৎ নামে এক ধরনের কুমড়ো আর আলু পেঁয়াজ কিনি। টাটকা মাছ সে পাড়ায় পাওয়া যেত না, ফ্রোজেন মাছ আর ওসব দেশের মুরগি আমার বিস্বাদ লাগে। গরুর মাংসের বেশ দাম, আমাদের পক্ষে বিলাসিতা, এক মাত্র কখনও কেউ নেমন্তন্ন করলে বিফ খাওয়ার সুযোগ ঘটত। সে সময় ঘোড়ার মাংস বিক্রি হত খুব, সেটাই সস্তা, তারপরই খরগোশের মাংস। আমি ঘোড়া কিংবা খরগোশের মাংসই কিনে এনে ঝোল বানাতাম। স্কুলে পড়ার সময় আমি বয়েজ স্কাউট ছিলাম, তখন রান্না

শিখে কুকিং ব্যাজ পেয়েছি, আমার রান্নার কেউ নিন্দে করতে পারবে না।

সারাদিন আমরা ঘোরাঘুরি করতাম বলে দুপুরের খাওয়াটা যেনতেনভাবে সেরে নিতে হত, ভাত খাওয়ার আড়ম্বর রাত্তিরে। মোনিক প্রায়ই দেরি করে ফেরে, সে তার স্টেডি বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে দামি-দামি রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। কিন্তু যেদিন আমি ভাত রান্নার কথা ঘোষণা করি, সেদিন মোনিক ইন্ডিয়ান ফুড আস্বাদ করার জন্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। মোনিকের ভাষায় সেটা 'হিন্দু খাদ্য'।

রান্না ঘরটি বেশ বড়। আমি আদা-জিরে-পেঁয়াজবাটা মেখে যখন মাংস করি, তখন দুই যুবতী দুপাশে দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে দেখে। কখনও আমি গরম ডেকচিতে ভুল করে হাত দিয়ে ছ্যাঁকা খেলে ওরা হেসে হেসে একে অন্যের কাঁধে ঢলে পড়ে; ভাজবার জন্য গরম তেলে ফুলকপি ছাড়তেই সেই শব্দ শুনে ওরা কৃত্রিম ভয়ে দৌড় মারে। আবার কখনও মাংস প্রায় সেদ্ধ হতেই ওদের একজন হাতায় করে খানিকটা ঝোল তুলে চুমুক দিয়ে সেই হাতাটা আবার ডুবিয়ে দেয়। ফরাসিদের এঁটো জ্ঞান তো বিন্দুমাত্র নেই বটেই, ফরাসি বা ইংরিজি ভাষাতেও এঁটো শব্দটাই নেই।

খাওয়ার টেবিলে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হয়। আমার রান্না ভাত-তরকারি মাংসের সঙ্গে মার্গারিটের মায়ের বানানো রেড ওয়াইন আর মোনিকের পিসির পাঠানো কালভাডোজ (আপেলের সুরা)। মার্গারিটের অধিকাংশ গল্পই কাব্য-সাহিত্য ও লেখক-শিল্পীদের সম্পর্কে। মোনিক কথা কম বলে, কিন্তু মাঝে মাঝে টুক টুক করে বেশ মজা করতে পারে! হঠাৎ কোনও প্রশ্ন করে আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারলেও সে বেশ আনন্দ পায়।

একদিন সে জিগ্যেস করল, তুমি কীরকম ফরাসি শিখেছ, দেখি। এই কবিতার মানে বলো তো। সে গড়গড় করে বলে যেতে লাগল :

পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন পারসিয়েন পারসিয়েন
পারসিয়েন?

আমি চোখ গোল গোল করে বললাম, এ আবার কী কবিতা? এ তো মোটে একটাই শব্দ।

মোনিক বলল, এটা একটা বিখ্যাত কবিতা।

আমি বললাম, যাঃ, হতেই পারে না, এটা একটা ধাঁধা।

মোনিক বলল, তুমি বিখ্যাত কবি লুই আরাগঁ-এর নাম শোনোনি? এটা তাঁর লেখা!

লুই আরাগঁ-এর নাম শুনে আমার মাথা আরও ঘুলিয়ে যায়। তার নাম কে না শুনেছে? শুধু কবিতা নয়, আমি অনুবাদে আরাগঁ-এর লেখা উপন্যাসও পড়েছি। কিন্তু এটার মানে কী?

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ ও অসহায় অবস্থা দেখে দুই সখী হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল। ঝরনার কলস্বরের মতন তাদের হাসির ঝংকারে মুখরিত হল মধ্যরাত।

শেষ পর্যন্ত ওরা মানেটা বুঝিয়ে দিল। ফরাসি ভাষায় 'পারসিয়েন' শব্দটির দুটি মানে হয়। একটা হল ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডস্ যা আমরা যাকে বলি জানলার খড়খড়ি। আর একটা হল পারস্য দেশের রমণী। জানলার খড়খড়ি দিয়ে সামান্য আলো আসে, তার সঙ্গে মুখে ওড়না ঢাকা পারস্যরমণীর মিল খুঁজে পেয়ে আরাগঁ কৌতুক করেছেন।

কবিতাটি নিছক ধাঁধা নয়, পরে অনেক কাব্য সংকলনে আমি এই কবিতাটি দেখেছি। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, কবিতা কী? কবিতা অনেক রকম! সেই উক্তির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই রচনাটি।

রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত আড্ডা মেরে আমরা শুতে যাই। তিনজনের তিনটি ঘর। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ আমার ঘুম আসে না। সেপ্টেম্বর মাস, শীত একেবারেই নেই, একটা জানলা খোলা, বাইরে নানারকম শব্দ শুনে বোঝা যায়, নগরী এখনও জেগে আছে। প্লাস-পিগাল একটা প্রমোদ পাড়া, সারারাত আলোয় ঝলমল করে। নানা রকমের নাইট ক্লাব রয়েছে এখানে, তেমন আবার গুণ্ডাদের উপদ্রবও আছে শুনেছি, আবার সকালবেলা অনেক নিরীহ বুড়ো বুড়ি কিংবা অফিসযাত্রীদের ছোটাছুটি করতেও তো দেখেছি।

অল্প বয়েসে আমার ছেলেমানুষি ধারণা ছিল, প্যারিস বুঝি শুধু শিল্পী আর কবিদের শহর। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ এখানে এখনও জ্বলজ্বল করে। আসলে তো আর তা না, এই সুন্দর শহরটিতে, চোর-জোচ্চোর-বদমাশদের সংখ্যাও কম নয়, বহু ধরনের ব্যবসায়ীদেরও একটা আড্ডাস্থল, বিশ্বের বহু দেশেই ধনীরা এখানে আসে প্রমোদ সন্ধানে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করার জন্য বহু রকমের ছলা-কলা বিস্তার করে রয়েছে অনেক-নারী পুরুষ, এদের তুলনায় কবি শিল্পী আর ক'জন! কবি-শিল্পীরা সব দেশের অতি মাইনরিটি। তবু বিশ্বের অন্য বিখ্যাত শহরগুলির তুলনায় প্যারিস শহরের ইতিহাসে সাহিত্যিক-শিল্পীরা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ রাত্তিরের পথের দৃশ্য দেখি। কোথা থেকে যেন একটা ক্ল্যারিওনেটের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। একটি উজ্জ্বল লাল রঙের স্কার্ট পরা তরুণী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, একটু বাদেই সে আবার হাতে এক গোছা সাদা ফুল নিয়ে ফিরে এল। এত রাতেও কি কোথাও ফুল বিক্রি হয়? মনে হয় যেন একটা স্বপ্নের দৃশ্য।

আমার মুশকিল এই যে, আমি বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারি না। অনেককে দেখেছি, লোকে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত দিব্যি ঘুমোতে পারে। কিন্তু আমি যত রাতেই শুতে যাই, সূর্যের আলো ফোটার পর আর বেশিক্ষণ বিছানায় থাকতে পারি না। সাতটা-সওয়া সাতটার মধ্যেই চা-তৃষ্ণা পায়।

মার্গারিট আর মোনিক জাগে না, আমি প্যান্ট, জুতো-মোজা পরে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে আসি। এক একদিন ব্রেক ফাস্টের খাবারপত্র কিনে আনি। সন্ধেবেলা যেমন বাগেত রুটি, সকালবেলা তেমনি ক্রোয়ার্স। ফরাসিরা পাউরুটি টোস্টের বদলে ক্রোয়াশ বেশি পছন্দ করে। অনেকটা [illegible]রাং-এর মতন, গাঢ় বাদামি রঙের এই মুচমুচে খাদ্যটিকে ঠিক রুটি বলা যায় না, বরং ঢাকাই বাখরখানির সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে। ইংরেজ-আমেরিকানরা সকালবেলা অনেক কিছু খায়, সেই তুলনায় ফরাসিদের ব্রেকফাস্ট অতি সংক্ষিপ্ত। একখানা ক্রোয়ার্স, একটুখানি জেলি বা মার্মালেড, আর খানিকটা চিজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এরা কতরকম চিজ যে খায়, তার ইয়ত্তা নেই। ওয়াইন এবং চিজ নিয়ে আলাদা কালচার আছে। ফরাসিরা বলে, আমাদের ওয়াইন এবং চিজ ঠিক মতন উপভোগ করতে না শিখলে কেউ ফরাসি শিল্প-সংস্কৃতিও ঠিক মতন বুঝতে পারবে না।

আমাদের মতন এদের বিছানায় শুয়ে কিংবা চায়ের টেবিলে কাগজ পড়ার অভ্যেস নেই। রবিবার ছাড়া, অন্যান্য দিনে অনেকেই বাড়িতে খবরের কাগজ রাখে না। কাগজ পড়ার সময় কোথায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাওয়ার পথে এরা কাগজ কিনে নেয়, ট্রেনে কিংবা বাসে যেতে যেতে পড়ে, তারপর কাগজটা ফেলে দিয়ে যায়।

প্রথম জাগে মোনিক। একটা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে ছুটে এসে সে রান্নাঘরের স্টোভে গরম জলের কেটলি বসিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে বঁ ঝুর বলেই সে টেবিলে বসে দুহাতে মাথা চেপে ধরে। তার চোখে তখনও ঘুম, ঠোঁটের রেখায় বিরক্তি। ঘড়িতে আটটা পঁয়তিরিশ, তাকে নটার মধ্যে বেরুতেই হয়।

আমি জিগ্যেস করি, আজ অফিস না গেলে হয় না?

মোনিক কাঁধ শ্রাগ্ করে। তারপর আপসোসের সুরে বলে, কেল ডি। তোমরা আজ কোথায় বেড়াতে যাবে?

আমি বলি, ভার্সাই যাব ভাবছি।

মোনিক বলে, তোমাদের কী মজা, এই চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছ, রোজ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর আমার এই সারা সপ্তাহ দারুণ কাজ।

বিনা প্রসাধনে, বিনা বিশেষ সাজে, সদ্য ঘুম ভাঙা অবস্থাতেই মোনিককে সবচেয়ে ভালো দেখায়। মোনিক চা খায় না, কফিতে তার আসক্তি। পর পর দুকাপ কফি খেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপর বাথরুম ও ব্রেকফাস্ট টেবিলে হুড়োহুড়ি করে সে সত্যি নটার মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। এরই মধ্যে চুলের কায়দা করেছে, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, ভুরু আঁকা, চোখে কালো চশমা, খাঁটি প্যারিস-নাগরিকা সেজে, সে হাতে অফিসের ফাইল নিয়ে, আমার দিকে আরভোয়া ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

পশ্চিমি দেশে মেয়েদের এই স্বাধীন রূপটি দেখে আমি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছি। মেমসাহেব বলে তো আর আলাদা কিছু নয়, কয়েকদিন একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামশো করলেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এদের অনেক মিলও আছে। এদেরও রয়েছে সেন্টিমেন্ট, এক ধরনের নীতিবোধ, কর্তব্যজ্ঞান, মা-বাবার সম্পর্কে টান ভালোবাসা। মোনিকের বাবা নেই কিন্তু তার মা এবং তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী থাকেন অরলিঁয়-তে, সেখানে মোনিক মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। নিয়মিত চিঠি লেখে, বাড়ি থেকে নানারকম উপহার আসে। মার্গারিটেরও বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন! কিন্তু এই সব মেয়েরা লেখাপড়া শেখার জন্য বাড়ির বাইরে চলে আসে, নেহাত দরকার না পড়লে বাড়ি থেকে টাকা নেয় না, নিজেদের পড়ার খরচ নিজেরাই উপার্জন করে, নিজেরাই থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। তারপর যখন চাকরি শুরু করে, তখন তারা কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে মিশবে, বিয়ে করবে কি করবে না, এসব ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের জীবনটা কীভাবে চালাবে, সে সম্পর্কে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। এই স্বনির্ভরতার জন্য পৃথিবীর সব বিষয়েই এদের একটা নিজস্ব মতামত গড়ে ওঠে। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যে-কোনও আলোচনাতেই এরা অংশ নিতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নারীজাতির মতন এদেরও শাড়ি-গয়না (ড্রেস মেটেরিয়াল, কস্ট্যুম-জুয়েলারি, জুতো) সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, নিজেদের মধ্যে এক এক সময় সে আলোচনাতেও মেতে ওঠে, কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই যে পৃথিবীতে এদের অধিকার কিছু কম, তা এরা কক্ষনো মনে করে না।

মার্গারিট প্রত্যেক দিনই দেরি করে ওঠে এবং দারুণ লজ্জিত হয়। আয়ওয়াতে ওকে ভোরবেলা ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যেতে হত, এখানে সে দায় নেই বলেই ও যেন বেশি ঘুমিয়ে শোধ তুলছে। এক একদিন আমি কফির কাপ নিয়ে ওর দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি, কাফে ও লে, মাদমোয়াজেল। বঁ ঝুর, বঁ ঝুর! পেতি দেজুনে (প্রাতরাশ) তৈরি আছে, দশটা যে বাজতে চলল।

সেজেগুজে আমরা শহর-অভিযানে বেরিয়ে পড়ি সাড়ে দশটার মধ্যে। এই অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি অ্যাপার্টমেন্টে বেশ কিছু পরিবার থাকে। তাদের কয়েক জনের সঙ্গে আলাপও হয়ে গেছে। দেখা হলেই তাঁরা বঁ ঝুর বলেন ও একটু গল্প করতে আসেন। তাঁদের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারি, আমি কালো রঙের মানুষ বলে তাদের চোখে-মুখে উপেক্ষার সামান্য চিহ্নও নেই। বুড়ো-বুড়িদের ব্যবহারও বেশ সহৃদয়। আগে শুনেছিলাম, ফরাসিরা বিদেশিদের সঙ্গে মিশতেই চায় না, কিন্তু এখানে দেখছি, অনেকেই নিজে থেকে কথা বলতে আসে। আমার মতন একজন পুরুষ যে একটি অ্যাপার্টমেন্টে আর দুটি নারীর সঙ্গে বাস করছে, এ ব্যাপারেও যেন কারুর আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কেউ কোনও কৌতূহলও প্রকাশ করে না।

পয়সার অভাবে আমি ফলি বার্জার কিংবা বিখ্যাত কোনও শো দেখিনি, কোনও নাইট ক্লাবেও

চিনি, কিন্তু রাত্রির প্যারিস দেখেছি। পায়ে হেঁটে। এক শনিবার রাতে মোনিক আর মার্গারিটের সঙ্গে আমি ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েছিলাম।

সারা বছর প্যারিসের রাত নিশ্চয়ই এরকম উৎসব-মুখর থাকে না। বেশি শীতে তো বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না, তা ছাড়া বছরের অনেক সময়ই বৃষ্টি পড়ে। কিন্তু অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণত আকাশ থাকে পরিষ্কার, দিনের বেলা এমন ঝকঝকে রোদ ইংরেজরা কদাচিৎ দেখতে পায়, সুইডেন-নরওয়েতে রোদ্দুর খুবই দুর্লভ। আমাদের চোখে সব সাহেব-মেমই ফরসা, কিন্তু ওখানে গিয়ে জেনেছি, ফরাসি বা ইতালিয়ানদের তুলনায় ইংরেজ বা সুইডিশরা বেশি ফরসা, কারণ ওদের গায়ে কম রোদ লাগে। এরকম আবহাওয়ার জন্যই প্যারিসে দু'মাস টুরিস্টদের সাংঘাতিক ভিড় হয়। খাঁটি প্যারিসিয়ানদের আবার টুরিস্টদের সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, তারা অনেকে এই সময় ছুটি নিয়ে প্যারিস থেকে পালায়।

নিউ ইয়র্কও রাত-জাগা শহর, অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরেছি, কিন্তু প্যারিসের মাদকতার সঙ্গে তার তুলনা হয় না। প্যারিসের সব রাস্তার মধ্যমণি শাঁজেলিজে-তে রাত দুটোর সময় এসে হঠাৎ মনে হয়, রাত আর দিনের ব্যাপারটা কি হঠাৎ উলটে গেল নাকি? অত চওড়া রাস্তাতেও এত নারী-পুরুষ যে গাড়ি চলার কোনও উপায়ই নেই। হাঁটার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে লোকের গায়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। সমস্ত দোকানপাট খোলা, চতুর্দিকে আলো, এরই মধ্যে কোথাও আলজিরিয়ানদের একটা ছোট দল ম্যাজিক দেখাচ্ছে, কিছু অফ্রিকান কালো মানুষ বিক্রি করছে নানা খেলনা, এক একটা দল যাচ্ছে চেঁচিয়ে গান গাইতে-গাইতে। একটি ঈষৎ নেশাগ্রস্ত রমণী জিপসিদের কায়দায় নাচতে শুরু করল, অমনি প্রচুর লোক তাকে ঘিরে হাততালি দিয়ে তাল দিতে লাগল। চতুর্দিকেই মজা।

এক সময় আমরা ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে চলে এলাম নদীর ধারে। এখানেও নারী-পুরুষ কম নয়। কপোত-কপোতীর মতন অনেকেই ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আছে। শুনেছি, অনেকে প্রকাশ্যে চুম্বনে বেশি আনন্দ পায়।

আমরা একটা বাগানের ধারে, নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে উৎসবের ধ্বনি। প্যারিসের সঙ্গে বীরভূমের কেঁদুলি জায়গাটার চেহারার কোনও মিলই নেই বটে, কিন্তু এর আগে আমি শুধু কেঁদুলির বাউলমেলাতেই সারারাত জেগে উৎসব দেখেছি। আমার সেই মেলার কথা মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ কানে এল একটা বেহালার সুর। আমাদের কাছাকাছি একটা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে একজন লোক বেহালা বাজাচ্ছে। তাকে ঘিরে আর কোনও মানুষজন নেই। সে একা। সে বাজিয়ে যাচ্ছে আপন মনে। কথা বন্ধ করে আমরা শুনতে লাগলাম সেই বেহালার করুণ মধুর সুর।

একসময় মার্গারিট বলল, সামনের ওই লোকটাকে দ্যাখো। জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে।

সত্যিই আগে দেখিনি, অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক নদীর একেবারে ধারে গিয়ে বসেছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের দিকে, একটুও নড়ছে না।

মার্গারিট বলল, তুমি বলছিলে না, এটা কবি আর শিল্পীদের শহর। অন্তত একজন শিল্পী আর কবিকে দেখা গেল। ওই যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে আপন মনে, সে নিশ্চয়ই শিল্পী। আর জলের ধারে ওই লোকটিকে কবি বলে মনে হচ্ছে না? ও যেন জলের সঙ্গে কথা বলছে।

মার্গারিটের মতন মোনিক মোটেই রোমান্টিক নয়। সে বিদ্রুপের হাসি দিয়ে বলল, ধ্যাত, কী যে বলিস তুই মার্গারিট! ও লোকটা কবি মোটেই নয়। কবিরা মোটেই রাত জাগে না, তারা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। ফরাসি কবি-সাহিত্যিকরা সবাই সকালবেলা লেখে। আর জলের সঙ্গে যে কথা বলে, সে কবি হতে যাবে কেন, সে নির্ঘাত পাগল কিংবা মাতাল। কবিরা এই সব জিনিস চমৎকারভাবে বানায়, নিজেরা কিছু করে না। আর ওই যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছে, ও নিশ্চয়ই

ভিখিরি। মেট্রো রেল স্টেশনে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করে। এখন কোনও নতুন সুর তুলছে। মোটেই ভালো বাজাচ্ছে না!

মোনিকের সিনিসিজম এমনই জোরালো যে প্রতিবাদ করা গেল না।

একটু বাদে মোনিক জিগ্যেস করল, সুনীল, তুমি মার্গারিট নামটার মানে জান?

আমি বললাম, না তো। তোমাদেরও নামের মানে থাকে বুঝি। আমি মোনিক মানেও জানি না।

মোনিক উঠে গিয়ে বাগান থেকে একটা সাদা রঙের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল। সেটা আমার সামনে ধরে বলল, এই ফুলের নাম মার্গারিট। নাও, তোমাকে দিলাম!

॥ ১১ ॥

"নাইটিঙ্গেল পাখিটি একটা উঁচু ডালে বসে
নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবছে
সে যেন পড়ে গেছে নদীতে
সে বসে আছে একটা ওক গাছের শীর্ষে
তবু তার ভয় ডুবে যাবার :"

—সিরানো দ্য বারজেরাক

মার্গারিট আমাকে ইফেল টাওয়ারে উঠতে দেবে না, তা বলে কি আমি লুভ্‌র মিউজিয়ামও দেখব না? সেখানেও অজস্র টুরিস্ট ভিড় করে ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলিও তো সেখানে না গেলে দেখা হবে না!

মোনিক একদিন আমাদের ধমক দিয়ে পাঠাল। সেই সকালটায় রোদ নেই, টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। মার্গারিটের হাতে একটা লাল রঙের ছাতা, মোনিক আমাকে একটা ম্যাকিনটস ধার দিয়েছে! এটা তার অন্য এক বন্ধবীর বয় ফ্রেন্ডের, একদিন ফেলে গেছে ও বাড়িতে। রেনকোট, ম্যাকিনটস, ওভারকোট, পার্কা এসব এদেশে অনেকেই একজনেরটা অন্যজন ব্যবহার করে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট বলল, লুভ্‌র মিউজিয়াম একদিনে পুরোটা দ্যাখা যায় না, অনেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবটা সেরে নিতে চায়, আসলে কিন্তু তারা কিছুই দেখে না। এক একদিনে এক একটা অংশ ভালো করে দেখতে হয়। তুমি কাদের ছবি দেখতে চাও? তুমি কি আগেকার ছবি, যাতে বাইবেলের গল্প, উড়ন্ত পরী, দেবশিশু আর 'চর্বির গোলা' নারীদের ছবিও দেখবে?

আমি বললাম, না, না, প্রি-র‍্যাফেলাইট ছবিতে আমার আগ্রহ নেই। আমার বেশি দেখার ইচ্ছে পল সেজান, এডুয়ার মানে, দেগা, ক্লদ মোনে, কামিল পিসারো, রেনোয়া, পল গগ্যাঁ এঁদের ছবি।

মার্গারিট বলল, তুমি যাদের নাম করলে, তারা সবাই ইমপ্রেশানিস্ট দলের। তুমি বুঝি এই গ্রুপটাকেই বেশি ভালোবাস!

আমি বললাম, এঁদের ছবিই আমার বেশি পছন্দ। দেশে থাকতে এই সব শিল্পীদের মূল ছবি তে কিছুই দেখার সুযোগ হয় না, শুধু প্রিন্ট দেখেছি। বাংলায় একে বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো, কিংবা মধুর অভাবে গুড় খাও!

ঘোল এবং গুড়, এই দুটো কী বস্তু, তা মার্গারিটকে অনেক কষ্টে বোঝাতে হল।

মার্গারিট বলল, তুমি নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলো দ্যাখোনি?

আমি বললাম, তা দেখব না কেন? নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের চমৎকার কালেকশান আছে। তা ছাড়া শিকাগোতেও দেখেছি। আর পল এঙ্গেলের সঙ্গে মার্শাল টাউনে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানেও এঁদের কয়েকটা মূল ছবি আছে। সেই সব দেখে আরও তৃষ্ণা বেড়ে গেছে।

মার্গারিট ফস করে জিগ্যেস করল, আচ্ছা সুনীল, বলো তো, ইমপ্রেশানিজম কথাটা কী করে তৈরি হল?

আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর চোখ গরম করে কৃত্রিম রাগে বললাম, অ্যাই, তুমি আমাকে পরীক্ষা করছ? আমার ওপর মাস্টারি ফলাচ্ছ বুঝি?

মার্গারিট সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায়, মরমে মরে গিয়ে বলল, না, না, এমনিই হঠাৎ বলে ফেলেছি, ছি ছি ছি, কিছুদিন মাস্টারি করে আমার এই অবস্থা হয়েছে, তুমি আমার থেকে অনেক বিষয়ে বেশি জানো...

লজ্জায় মার্গারিটের শরীরটা যেন কুঁকড়ে গেছে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। ওর লজ্জা দেখে আমারও খুব লজ্জা করতে লাগল, কিছুতেই ওর মুখ থেকে হাত সরানো যায় না।

আমি বললাম, আমি সত্যিই জানি না ইমপ্রেশানিস্টদের নামটা কী করে এল। তুমি বলে দাও।

মার্গারিট প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

সত্যিই তো এই সব বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই ভাসা ভাসা। আমি তো শিল্পী নই, কিছু ছবি দেখেছি, দু'চারটে বই এলোমেলো ভাবে পড়েছি। ফরাসিদেশে অনেকবার অনেকরকম শিল্প-আন্দোলন হয়েছে, তার ইতিহাস আমি কতটুকুই বা জানি! এই সব বিষয়ে মার্গারিটই তো আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ওর সঙ্গে একটা ঠাট্টা করতে গিয়ে ফল হয়ে গেল বিপরীত। মার্গারিট আর মুখ খুলতে চায় না।

অবশ্য আমার একটা উপায় জানা আছে। এটা গায়কদের ক্ষেত্রে আমি পরীক্ষা করে সুফল পেয়েছি। অনেক সময় বিখ্যাত গায়ক-গায়িকারা কিছুতেই মুখ খুলতে চান না। কোনও একটা ঘরোয়া আড্ডায় কিংবা পিকনিকে তাঁদের গান গাইতে অনুরোধ করলে তাঁরা বলেন, গলা খারাপ, মুড নেই, হারমোনিয়াম নেই ইত্যাদি। এই সময় একটা কৌশল বেশ কাজে লাগে। ভালো গায়ক-গায়িকাদের সামনে বেসুরো গান শুরু করতে হয়। আমি সেরকম কোনও গায়ক বা গায়িকার কাছে জিগ্যেস করি, আচ্ছা, 'খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোল' গানটার সুর কি এইরকম? বলেই আমি হেঁড়ে গলায় বন্দে মাতরমের সুরে সেটা গাইতে আরম্ভ করি। প্রকৃত গায়ক-গায়িকারা তাতে আঁতকে ওঠেন, আসল সুর আপনি বেরিয়ে আসে তাঁদের গলা থেকে। এইভাবে আমি সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, ঋতু গুহ'র অরাজি ভাঙিয়েছি অনেক জায়গায়।

মেট্রো ট্রেনে লুভ্‌র নামে একটা স্টেশানই আছে। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে দুবার ট্রেন বদলাতে হবে, নতুন করে টিকিট কাটতে হয় না। তবু সেরকমভাবে বদল না করে মার্গারিট উঠে এল ওপরে। এখনও বৃষ্টি থামেনি। গতকালও শীতের নামগন্ধও ছিল না, এখন শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তার দুপাশের চেস্টনাট, পপলার, মেপল গাছ থেকে খসে পড়ছে অসংখ্য পাতা। মাথার ওপর গাছের পাতা খসে পড়ার অনুভূতিটা বড় চমৎকার।

আমি মার্গারিটের একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বললাম, এককালে বিদ্রোহী তরুণ শিল্পীরা একটা সংঘ স্থাপন করে আলাদা প্রদর্শনী করেছিল। নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছিল 'ইমপ্রেশানিস্ট স্কুল', তাই না?

মার্গারিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই সংঘের নাম ছিল 'সোসিয়েতে আনোনিম' (নামহীন সমিতি)।

আমি বললাম, তা হলে কবি বদলেয়ার ওই দলটার ওইরকম নাম দিয়েছিল।

মার্গারিট বলল, বদলেয়ার ছিল ওই শিল্পীদের বন্ধু। ইমপ্রেশানিজম আখ্যাটা প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছিল গালাগাল হিসেবে।

আস্তে-আস্তে পুরো বিষয়টা জানা গেল।

মাত্র একশো বছর আগে এই সব জগৎবিখ্যাত শিল্পীরা প্যারিস এবং কাছাকাছি অঞ্চলে থাকতেন, নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে যেসব ছবি এঁকেছেন, সেই সব এক একখানা ছবির দাম এক লক্ষ লক্ষ টাকা। এই তো কয়েকদিন আগেই কাগজে দেখেছি, পল সেজান-এর একটা ছবি কেউ কিনত না, সমালোচকরা যাচ্ছেতাই বলেছে, ধিক্কার দিয়েছে, দারুণ ক্ষোভে সেজান একসময় প্যারিস ছেড়ে এক্স-এ চলে গিয়ে বলেছিলেন, তিনি সারাজীবন ছবি এঁকে যাবেন, কিন্তু বিক্রি করার চেষ্টাও করবেন না, কারুকে দেখাবেনও না। আর ক্লদ মোনের দারিদ্র্য এমন চরম অবস্থায় নেমে এসেছিল যে বন্ধুদের কাছে প্রায় ভিক্ষে করতে হত। কামিল পিসারো নিজের এক গাদা ক্যানভাস পিঠে করে নিয়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন, বাড়ি ভাড়া মেটাবার জন্য তাঁকে ঘটি-বাটি বন্ধক দিতে হয়েছে অনেক সময়।

সরকারি প্রদর্শনীতে এঁদের স্থান হত না বলে এই সব শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগে একটা সমবেত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শিল্পের ইতিহাসে এই রকম ঘটনা সেই প্রথম! সেই প্রদর্শনীটির চরম ব্যর্থতা ও অসাফল্যও ঐতিহাসিক। একজনও প্রশংসা করেনি, বরং উপহাস, ভর্ৎসনা ও গালমন্দের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কেউ বলল, বাচ্চারা যখন রং নিয়ে ছেলেখেলা করে, তাও এই সব ছবির চেয়ে ভালো। কেউ বলল, এ যেন পিস্তলের মধ্যে রং ভরে ক্যানভাসে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বলল, এই লোকগুলো পাগল ছাড়া কিছুই না। এদের আঁকা মেয়েদের গায়ের রং স্প্যানিশ তামাকের মতন, ঘোড়াগুলোর রং হলদে, আর জঙ্গলের রং নীল। একজন যা বাঁধাকপি এঁকেছে, তা দেখে এমন ঘেন্না হল যে জীবনে আর বাঁধাকপি খাবই না। ওদের আঁকা নিসর্গচিত্র দেখলে মনে হয়, চশমায় ধুলো জমেছে।

সেই প্রদর্শনীতে ক্লদ মোনের একটি ছবির নাম ছিল, ইমপ্রেশান : সানরাইজ। সেইটাই হল প্রধান ঠাট্টার বিষয়বস্তু। এক সমালোচক লিখল, ইমপ্রেশানই বটে! ওর মধ্যে সানরাইজ নেই, ইমপ্রেশানই আছে। আমার তো মনে হল, একটা অসমাপ্ত ওয়াল পেপার দেখলেও ওর চেয়ে ভালো সমূদ্রে সূর্যোদয়ের ইমপ্রেশান হয়!

নিন্দুকেরা ওই সব শিল্পীদের গোষ্ঠীটিকে ইমপ্রেশানিস্ট বলে দেগে দিল। শিল্পীরা কিন্তু সেই পরিচয়টাই মেনে নিল আনন্দের সঙ্গে। সত্যিই তো, তারা বাস্তবের অনুকরণ করতে চায় না। অরণ্যের ছবি বহু আঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু এক একটা অরণ্যের যে একটা নিজস্ব ঝংকার আছে, তার অনুরণন একজন শিল্পীর মনে যে অনুভূতি জাগায়, সেটাই তো নতুন করে আঁকার বিষয়।

এর আগে শিল্পীরা বিচ্ছিন্ন ছিল, যে-যার মতন ছবি আঁকত, এর পর থেকে শুরু হল ইমপ্রেশানিজমের আন্দোলন।

কথা বলতে-বলতে আমরা হাঁটছিলাম নদীর ধার দিয়ে। স্যেন নদীর দু'দিকের রাস্তা মার্গারিটের খুব প্রিয়, প্রতিদিন আমরা এর কাছাকাছি বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাই। নদীটাকে এরা কী সুন্দর কাজে লাগিয়েছে, নদীর জন্য শহরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।

মার্গারিট বাড়ির নম্বরগুলো লক্ষ করছে মনোযোগ দিয়ে। আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি কী খুঁজছ?

মার্গারিট বলল, এখানে বেশ একটা মজার বাড়ি আছে। লুভ্‌র যাওয়ার আগে সে বাড়িটা দেখে গেলে ভালো লাগবে।

রাস্তার ধারে বড় বড় দোকানপাটই দেখছি, এর মধ্যে মার্গারিট আমাকে বিশেষ কী দেখাতে

চায়?

মার্গারিট বলল, দু'বছর আগেও সেই বাড়িটা দেখে গেছি। এখন গেল কোথায়? এখানে এক সময় ছিল 'আকাদেমি সুইস'। সেটা কী জানো? প্যারিসে তুমি এখনও দেখবে, অনেক সালোঁ বা স্টুডিও আছে, যেখানে ছেলে কিংবা মেয়ে মডেল থাকে, অনেক শিল্পী সেই সব মডেল স্টাডি করতে যায়। অনেক শিল্পীই তো একা একটি মডেলের খরচ জোগাড় করতে পারে না, তাই এই সব জায়গায় তারা পাঁচ-দশ ফ্র্যাংক চাঁদা দিয়ে মেম্বার, তারপর এক সঙ্গে তিরিশ-পঁয়তিরিশজন শিল্পী একটি মডেলকে দেখে-দেখে আঁকে।

একশো বছর আগে সেই রকমই একটা জায়গা ছিল 'আকাদেমি সুইস'। পের ক্রেবাসোল নামে একজন সুইজারল্যান্ডের প্রৌঢ় এটা চালাত, মাসে চাঁদা ছিল দশ ফ্র্যাংক, তিন সপ্তাহ সেখানে একটি পুরুষ মডেল পাওয়া যেত, আর এক সপ্তাহ একটি নারী। হবু আর্টিস্টরা এক একটা নড়বড়ে টুলে বসে নিজস্ব ইজেলে সেই পুরুষ বা নারীর ন্যুড স্টাডি করত।

বহু ছেলে মেয়ে শিল্পী হওয়ার উন্মদনায় এক সময় রং-তুলি হাতে নেয়, অনেকেরই প্রতিভা থাকে না, তারা এক সময় হারিয়ে যায়, কিংবা ফ্যাশান ডিজাইনার হয় কিংবা বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকে। 'আকাদেমি সুইস' ইতিহাসে স্থান পেয়ে গেছে, তার কারণ, এক সময় একই সঙ্গে এখানে কয়েকজন তরুণ শিক্ষার্থী শিল্পী এসেছিল, যারা পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়। এদুয়ার মানে, রেনোয়া, দেগা, পিসারো, ক্লদ মোনে, সেজান। ওদের বন্ধু বন্ধুত্ব হয়েছিল এখানেই। কল্পনা করা যায় কি, একই কলেজের এক ক্লাসের পাঁচ-সাতজন বন্ধু প্রত্যেকেই নোবেল প্রাইজ পেল। অনেকটা সেইরকমই যেন ব্যাপার।

ওই বাড়িটা সম্পর্কে অনেক মজার গল্পও আছে।

বাড়িটার একতলায় ছিল সাবরা নামে এক ডেন্টিস্টের চেম্বার। আর দোতলায় শিল্পীদের মডেল স্টাডির ইস্কুল। একদিন মফস্বল থেকে এক তরুণ শিল্পী এসেছে ওই 'আকাদেমি সুইস'-এ ভরতি হতে। ভুল করে সে ঢুকে পড়েছে এক তলায়। সেখানে একজন লোক বীভৎস আর্তনাদ করছে! দাঁতের ডাক্তার সাবরা সদ্য সেই লোকটার একটা দাঁত তুলেছে, তখনকার দিনে দাঁত তোলার প্রক্রিয়া ছিল আসুরিক ব্যাপার, অ্যানেসথেসিয়া ছিল না, দুজন লোক রুগীকে চেপে ধরত, আর ডাক্তার একটা সাঁড়াশি দিয়ে দন্ত উৎপাটন করত। তরুণ শিল্পীটি ভাবল, সুইস পরিচালক বুঝি শিল্পীরা আঁকায় ভুল করলে এই রকম শাস্তি দেয়! সে 'মঁ দিউ' বলেই পেছন ফিরে চোঁ চাঁ দৌড়।

আর একবার দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পেতে পেতে একজন রুগী ভুল করে উঠে এসেছে দোতলায়। দরজা খুলেই দেখে একজন পুরুষ মডেল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে লোকটা ভাবল, এই বুঝি দাঁতের ডাক্তারের চিকিৎসা পদ্ধতি। সেও ব্যথা-ট্যথা ভুলে গিয়ে পিঠটান!

আকাদেমি সুইস উঠে গেছে কবেই, মার্গারিট আমাকে দেখতে চেয়েছিল শুধু সেই বাড়িটা। কিন্তু পাওয়া গেল না, যে ঠিকানায় ওই বাড়িটা থাকার কথা ছিল, সেখানে এখন একটি অসমাপ্ত প্রাসাদ, প্রচুর মিস্তিরি কাজ করছে। পুরোনো বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে মার্গারিট যেন শারীরিক কষ্ট পেল। বারবার বলল, ছি ছি ছি, এমন একটা বাড়ি নষ্ট করে ফেলল, এটা মিউজিয়াম করে রাখা উচিত ছিল, এই শহরের মেয়রটা একটা গরু!

আমরা যে রাস্তাটা ধরে হাঁটছি, তার নাম কে দেজরফেবর (Quai des Orfevres), নামটা আমার খুব চেনা লাগল। আমি মার্গারিটকে জিগ্যেস করলাম, এখানেই কি কাছাকাছি কোথাও পুলিশের হেড কোয়ার্টার?

শিল্পীদের বিষয় আলোচনা করতে-করতে হঠাৎ আমি পুলিশের প্রসঙ্গ তোলায় মার্গারিট হকচকিয়ে গেল খানিকটা। তারপর বলল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি সে কথা জানতে চাইছ কেন?

আমি বললাম, জর্জ সিমেনোঁর লেখায় আমি অনেকবার এই রাস্তাটায় নাম পড়েছি। গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর মেইগ্রে এই রাস্তা দিয়ে কতবার তার হেড অফিসে (আমাদের লালবাজার) গেছে, কখনও

এখানকার কোনও রেস্তোরাঁ কিংবা বিসত্রো-তে গিয়ে হোয়াইট ওয়াইন কিংবা বিয়ার পান করেছে।

মার্গারিট বেশ অবাক হয়েছে বোঝা গেল।

ছেলেবেলা থেকেই আমি গোয়েন্দা গল্পের পোকা। আমাদের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ, শশধর দত্ত আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিদেশের প্রচুর গোয়েন্দা গল্প পড়েছি। আমার মতে, এ যুগের গোয়েন্দাকাহিনির স্রষ্টাদের মধ্যে রানির স্থান যদি পান আগাথা ক্রিস্টি, তা হলে রাজার স্থান দিতে হবে জর্জ সিমেনোঁ-কে। সিমেনোঁর লেখাগুলি উৎকৃষ্ট ক্রাইম ও ডিটেকশান স্টোরি তো বটেই, তদুপরি তাতে আছে সাহিত্য রস। সাহিত্যের কাল্পনিক মানুষগুলির মধ্যে ইনসপেক্টর মেইগ্রে আমার অন্যতম প্রিয় চরিত্র। সিমেনোঁর লেখার গুণে মেইগ্রে-কে কাল্পনিক বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন পুলিশের সদর দফতরে গেলে এক্ষুনি সেই ভারী ওভারকোট পরা, মুখে পাইপ, দীর্ঘদেহী মানুষটিকে দেখতে পাব।

মার্গারিট শুধু উচ্চাঙ্গের কাব্য সাহিত্যের ভক্ত, কবিতাই তার বিশেষ প্রিয়, উপন্যাসকে সে কবিতার তুলনায় নিকৃষ্ট শিল্প বলে মনে করে। এই ধরনের সাহিত্যমোদিরা ডিটেকটিভ গল্প দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি ভাবলাম, সিমেনোঁ সম্পর্কে আমার উচ্ছ্বাস দেখে মার্গারিট চটে যাবে। তা ছাড়া, সিমেনোঁ বেলজিয়ান, ফরাসি সাহিত্যে বিরাট স্থান জবর দখল করেছেন। ফরাসি-ভাষী বেলজিয়ানদের সম্পর্কে খাঁটি ফরাসিদের খানিকটা অবজ্ঞার ভাব আছে।

কিন্তু মার্গারিট বলল, বাঃ, তুমি সিমেনোঁ পড়েছ? আমি তোমাকে সিমেনোঁর আরও বই দেব। উনি খুব ভালো ফরাসি গদ্য লেখন। আঁদ্রে জিদ ওঁর দারুণ প্রশংসা করছিলেন জানো তো! ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়াও সিমেনোঁ আরও অনেক অন্য, সিরিয়াস ধরনের উপন্যাসও লিখেছেন!

আমি অবশ্য সিমেনোঁ পড়েছি ইংরিজি অনুবাদে। ডিটেকটিভ গল্প ছাড়া ওঁর অন্যান্য উপন্যাসও পড়েছি কয়েকটা, তার মধ্যে হাসপাতাল নিয়ে একটি উপন্যাস অসাধারণ। বিভিন্ন ধরনের মানুষের চরিত্র স্টাডি করার অসম্ভব দক্ষতা আছে এই লেখকের।

সিমেনোঁ সম্পর্কে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে বলবার মতন। প্রিয় লেখকদের ব্যক্তিগত জীবন জানতেও অনেকের কৌতূহল হয়। আমরা পাঠকরাও অনেকটা জেনেছি। সিমেনোঁর নারী-প্রীতি সাংঘাতিক, তিনি নাকি কয়েক হাজার মহিলার সঙ্গে সাময়িক প্রেম ও সহবাস করেছেন। তিনি দুর্দান্ত বড়লোক। তাঁর বইয়ের বিক্রি তো প্রচুর বটেই, তা ছাড়া তাঁর গল্প থেকে অন্তত চল্লিশটা সিনেমা হয়েছে, পৃথিবীর চারখানা দেশে তাঁর বাড়ি আছে। যেখানে যখন আবহাওয়া ভালো থাকে, তখন তিনি সেখানে থাকতে যান। কোনও একটা নতুন বই লেখার আগে তিনি আগে ডাক্তারকে দিয়ে ব্লাড প্রেসার মাপান, রক্ত পরীক্ষা করান। তারপর বাড়ির দরজা বন্ধ করেন। টেলিফোন নামিয়ে রেখে লিখতে বসেন, টানা চোদ্দো-পনেরো দিন সকাল-বিকেল লিখে শেষ করেন একটা উপন্যাস। এবার দরজা খুলে পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বেড়াতে চলে যান কোনও প্রমোদতরণীতে। তাঁর প্রত্যেকটি বই-ই হিট যাকে বলে।

এহেন একজন দারুণ সার্থক লেখকেরও মনের মধ্যে একটা অতৃপ্ত, দরিদ্র, বাউন্ডুলে রয়ে গেছে। সিমেনোঁর অনেক উপন্যাসের নায়কই একজন ঘরছাড়া মানুষ, যে প্রেমে বঞ্চিত, যে ভালো ব্যাবসা বা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফুটপাতের মানুষদের পাশে শুয়ে থাকে। ধনীদের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের ভাব ফুটে ওঠে তাঁর সব লেখায়।

লুভ্‌র মিউজিয়াম আর বেশি দূরে নয়, কিন্তু খুব জোর বৃষ্টি নেমে গেল। আমরা দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম একটা কাফেতে। সামনেটা কাচে ঢাকা, ভেতরে ঠান্ডা নেই, কফির সৌরভে আমোদিত। নানা রঙের পোশাক পরা অনেক দেশের মানুষ সেখানে বসে আছে, কয়েকজন ভারতীয়ও চোখে পড়ল, আমরা গিয়ে বসলাম ভেতরের দিকে একটা খালি টেবিলে।

একটুক্ষণ গল্প করার পর মার্গারিট হঠাৎ চুপ করে গেল। অন্যমনস্ক, ঝুঁকে পড়েছে, আঙুল

দিয়ে টেবিলে দাগ কাটছে।

আমি তার বাহু স্পর্শ করে জিগ্যেস করলাম, কী হল, মার্গারিট?

মার্গারিট বলল, মনটা হঠাৎ খারাপ লাগছে।

মন খারাপের কথা শুনলে তার কারণ জানতে ভরসা হয় না। অনেক সময় মন খারাপের কারণ তো মুখে বুঝিয়ে বলাও যায় না।

মার্গারিট নিজেই আবার বলল, আমার মা হাসপাতাল থেকে বাড়ি চলে গেছেন, তারপর সাতদিন আমি কোনও খবরই নিইনি।

আমি অপরাধী বোধ করে বললাম, সত্যিই তো, তোমার একবার যাওয়া উচিত ছিল। তুমি যাও, ঘুরে এসো। আমি এখানে দু-একদিন একলা থাকতে পারব অনায়াসে।

মার্গারিট বলল, আমার বাড়িতে তোমাকেও কি নিয়ে যাওয়া উচিত নয়? বেশি দূর নয়, ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা।

আমি এবার উৎসাহের সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, আমিও যাব। গ্রাম দেখতে আমার ভালো লাগে। তুমি কোথায় জন্মেছ, সেই জায়গাটা আমি দেখতে চাই। চলো, কাল সকালেই যাই।

মার্গারিট বলল, কিন্তু আমার বাড়িতে তুমি গেলে...আমার বাবা-মা যদি তোমাকে দেখে রেগে যান...তুমি হিন্দু—

আমি ভুরু তুলে বললাম, তোমার বাবা-মা কি এমনই গোঁড়া ক্যাথলিক যে একজন হিন্দুকে দেখলেই চটে যাবেন? আমি হিন্দু বাড়িতে জন্মেছি বটে, কিন্তু কোনও ধর্মেরই তো চর্চা করি না।

মার্গারিট বলল, না, না, সেরকম নয়, আমার বাবা কিংবা মা হিন্দুদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না, এমনিতে কিছুই মনে করতেন না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, যদি ওঁরা ভাবেন, যদি ওঁরা ভাবেন...

মার্গারিট আমার হাত চেপে ধরে কাতর গলায় বলল, সুনীল, প্লিজ, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেও না! সে কথা শুনলে আমার বাবা-মা এমন দুঃখ পাবেন—

মার্গারিটের সারল্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সত্যিই আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কি একটা বিয়েপাগলা বুড়ো যে হুট করে ওকে বিয়ে করতে চাইব? পৃথিবীর আর কোনও মেয়ে কি এমন কথা এত সহজে বলতে পারবে?

আমি মজা করার জন্য বললাম, সে কী! তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না? সব যে ঠিকঠাক হয়ে গেছে?

মার্গারিট আরও দুর্বল হয়ে গিয়ে বলল, না, সুনীল, তুমি চাইলে আমি না বলতে পারব না। কিন্তু আমার মা-বাবা এমন কষ্ট পাবেন, আমার মা অবুঝ, তিনি এমন আঘাত পাবেন যে সহ্য করতে পারবেন না...না, তা আমি পারব না।

আমি বললাম, ওসব আমি শুনছি না। আমি তোমাকে বিয়ে করবই। কালই।

একটু বাদে মার্গারিট ইয়ার্কি বুঝতে পেরে ফিক করে হাসল। তারপর বলল, সত্যি, তোমাকে একবার আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে।

আমি জিগ্যেস করলাম, তোমার বাবা-মা রেগে গিয়ে কী করবেন, মার্গারিট। আমায় জুতোপেটা করবেন? পেটে ছুরি বসিয়ে দেবেন?

মার্গারিট বলল, যাঃ, সেরকম কিছু না। বাবা তো খুব লাজুক, আর মা...যদি তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলেন? তোমার একটুও অপমান হলে তা আমার বুকে বাজবে!

আমি বললাম, ও, এই। এর চেয়ে কত বেশি অপমান আমি সহ্য করেছি। এসব আমি গায়ে মাখি না। চলো, তোমাদের বাড়িতে যাব!

মার্গারিট বলল, সত্যি যাবে? আমাদের লুর্দা গ্রামে? তা হলে একটা ফোন করে নিয়ে আমরা কাল পরশুই যাব।

।। ১২ ।।

"যে শিশু মানচিত্র ও প্রতিলিপি ভালোবাসে
তার কাছে এই বিশ্ব তার ক্ষুধার মতনই প্রকাণ্ড
ওহ্, প্রদীপের আলোয় কতই বা বিশাল এই পৃথিবী
স্মৃতির চোখে এই পৃথিবী কতই না ছোট।"
—শার্ল বোদলেয়ার

মোনিক তার অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের থাকতে দিয়েছে, খাওয়ার খরচ আমাদের নিজস্ব। এই অ্যাপার্টমেন্টটাও মোনিককে সামনের পয়লা তারিখে ছেড়ে দিতে হবে, এত বড় জায়গার ভাড়া সে একা টানতে পারবে না, সে এর মধ্যেই একটা এক কামরার স্টুডিও ঠিক করে ফেলেছে। এক তারিখের পর আমাদের প্যারিসবাস খুব অনিশ্চিত। মার্গারিট আর আমার দুজনেরই টাকার টানাটানি। আমি আমেরিকা ছেড়েছি একশো ডলারেরও কম পকেটে নিয়ে। মার্গারিট তার মায়ের চিকিৎসার জন্য নিজস্ব টাকা শেষ করে ফেলেছে, এখন সে ধার করছে বন্ধুদের কাছ থেকে, মোনিকের কাছ থেকেই ধার নিয়েছে পাঁচ শো ফ্র্যাংক। এতেই চলে যাচ্ছিল বেশ, বাজার করে এনে বাড়িতে রান্না করে খেলে তেমন বেশি খরচ হয় না। কিন্তু এর মধ্যে বিপদ বাধিয়ে ফেলল মোনিকের এক বন্ধু।

মোনিকের এই বন্ধুটির নাম পিয়ের ক্রোদেল। বেশ শৌখিন ধরনের যুবা, মাথার চুলগুলো লাল, বাজপাখির ঠোঁটের মতন নাক, চওড়া কপাল, সে যতটা না লম্বা, সেই তুলনায় তার হাত দুটি বেশি লম্বা মনে হয়, আজানুলম্বিত যাকে বলে। সে ইংরিজি জানে, মোনিকের মতন সে তার ইংরিজি জ্ঞান গোপন না করে আমার সঙ্গে খুব ইংরিজি চালায়।

প্রথম আলাপের সময় আমি তার নামটা শুনে কৌতূহলী হয়েছিলাম। আমাদের দেশের মানুষের নামের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানদের নামের একটা বেশ তফাত আছে। আমাদের দেশের একই পদবির হাজার হাজার লোক আছে, এক চৌধুরি বা চ্যাটার্জির সঙ্গে অন্য এক চৌধুরি বা চ্যাটার্জির কোনও সম্পর্ক নেই। পদবির সংখ্যা সীমিত হলেও আমাদের দেশের নারী-পুরুষদের প্রথম নামটা বহু বিচিত্র ধরনের হয়। বাবা-মায়েরা অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের নতুন নাম বানিয়েও দেন। ক্রিশ্চিয়ানদের বেলায় এর ঠিক বিপরীত। ওদের প্রথম নামগুলো একেবারে ধরাবাঁধা। সব মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশটার বেশি হবে না, কিন্তু সারনেম বা পদবি অসংখ্য। সেইজন্য একই পদবির দু'জন অনাত্মীয় নারী-পুরুষ ওদেশে প্রায় দেখাই যায় না।

পিয়ের ক্রোদেল নামটি শুনেই আমার মনে পড়েছিল পল ক্রোদেলের কথা। পল ক্রোদেল খ্যাতনামা নাট্যকার, কবি ও কূটনীতিবিদ। খুবই গোঁড়া ক্যাথলিক, তাঁর শেষের দিকের রচনা ধর্ম-আরাধনায় ভরতি, সেই কারণেই মার্গারিট মাঝে মাঝে তাঁর লাইন মুখস্থ বলে।

আমি পিয়েরকে জিগ্যেস করলাম, পল ক্রোদেল তোমার কে হন?

পিয়ের অবহেলার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠাকুরদার ভাই। আমাকে আর কিছু জিগ্যেস কোরো না, আমি ওঁর লেখা বিশেষ কিছুই পড়িনি। নট মাই কাপ অফ টি!

অনেক সময়েই দেখেছি, বিখ্যাত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সামান্য একটু আত্মীয়তা থাকলেই অনেকে তা বেশি বেশি জাহির করার চেষ্টা করে। পিয়ের তার ঠাকুরদার ভাইকে কোনও পাত্তাই

দিল না।

যাই হোক, এই পিয়ের আমাদের এক সন্ধ্যায় এক রেস্তোরাঁয় নেমন্তন্ন করে বসল। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এর কাছে একটা বেশ বনেদি গোছের রেস্তোরাঁ, কেউ না খাওয়ালে এখানে আমাদের ঢোকার কোনও সাধ্যই ছিল না। এইসব দোকানে ঢুকলে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতোর জন্য একটা হীনমন্যতা বোধ হয়। প্রতিদিন জুতো পালিশ বা বুরুশ করা আমার ধাতে নেই, এক শার্টে তিন-চারদিন চালিয়ে দিই, কাঁধের কাছে একটু ময়লা হয়ে থাকে, আর গলাতেও টাই বাঁধি না।

পিয়ের অবশ্য হাসি-ঠাট্টা-গল্পে জমিয়ে রাখল সারাক্ষণ।

খাওয়ার ব্যবস্থাও এলাহি। অর দ্যভর দিয়ে আরম্ভ। তারপর একটার পর একটা ডিশ। ফোয়া গ্রা, অর্থাৎ হাঁসের লিভার, কাভিয়ের অর্থাৎ স্টার্জন মাছের ডিম, আর একটা চিংড়ি মাছের রান্না, ছাগলের দুধের চিজ, সেই সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন ও দু' বোতল বোর্দোর হোয়াইট ওয়াইন।

হোস্ট যখন বিল মেটান তখন সেইদিকে তাকানো অতিথিদের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত নয়। তবু আমি চোরা চোখে না তাকিয়ে পারিনি। পিয়ের একটার পর একটা একশো ফ্র্যাংকোর নোট গুঁজে দিচ্ছে, অন্তত পাঁচ-ছ খানা তো হবেই। সে আমলে ছ'শো ফ্র্যাংক অনেক টাকা। বাড়িতে খাওয়া আর রেস্তোরাঁর খাওয়া, বিশেষত এই ধরনের কায়দার রেস্তোরাঁর, আকাশ-পাতাল তফাত। কুড়ি-পঁচিশ ফ্র্যাংকের বাজার করে বাড়িতে রান্না করে খেলে মার্গারিট আর আমার দিব্যি চলে যায় দুবেলা। কিন্তু মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় খাওয়া এই সব দেশের জীবনযাত্রার অঙ্গ।

ওঠার একটু আগে মার্গারিট বলল, পিয়ের, এ-পাড়ায় একটা হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে তুমি কখনও খেয়েছে?

পিয়ের বলল, না খাইনি। চলো, কাল সন্ধেবেলা সেখানে ডিনার খাওয়া যাক। হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ-এর খুব নাম শুনেছি!

সেটাই ঠিক হল, পরের দিন সন্ধেবেলা আবার বাইরে খাওয়া। আমার নিশ্বাসের একটু একটু কষ্ট হতে লাগল। রীতি অনুযায়ী পরের দিন পিয়ের আর মোনিককে আমাদেরই খাওয়ানো উচিত, কিন্তু আমাদের সে পয়সা কোথায়? সাধের সঙ্গে যখন সাধ্য মেলানো যায় না, তখনকার গোপন কষ্টটা বোঝানোও যায় না কারুকে। ওদের কী করে বোঝাব যে আমরা কৃপণ নই, আমরা যে ভদ্রতা-সভ্যতা জানি না তাও নয়, কিন্তু আমরা অসহায়।

ফেরার পথে মার্গারিট বলল, কাল ওদের আমরা খাওয়াব।

আমি চমকে উঠে বললাম, টাকা পাবে কোথায়?

মার্গারিট বলল, তোমার আর আমার যা আছে, সব মিলিয়ে হয়ে যাবে। শ্যাম্পেন নেব না।

আমি বললাম, সব টাকা খরচ হয়ে গেলে...তারপর?

মার্গারিট বলল, সে পরে দেখা যাবে। কারুর কাছ থেকে ঠিক ধার পেয়ে যাব।

মার্গারিটের সারল্য ও টাকা-পয়সা সম্পর্কে উদাসীনতার কাছে আমি বারংবার হেরে যাই। টাকার চিন্তা আমি ভুলতে পারি না কেন? নিউ ইয়র্কে প্রায় শেষ মুহূর্তে গ্রেগরি করসো আমার টাকাটা ফেরত না দিলে তো প্রায় নিঃস্ব অবস্থাতেই আমাকে আসতে হত প্যারিসে, তাতে কী আর এমন হেরফের হত। আসলে আমার মধ্যে একটা পুরুষ-প্রাধান্য কাজ করে। মোনিক ও মার্গারিট সঙ্গে থাকলে আমার সব সময় ইচ্ছে করে, ওরা কিছু খরচ করবে না, আমিই সব দেব। অথচ আমার পকেট ফুটো।

আমার কাছে যা টাকাপয়সা ছিল, খুচরো-টুকরো সমেত সবই তুলে দিলাম মার্গারিটের হাতে। পরের দিন হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁর পিয়েরের সঙ্গে আমাদের প্রায় মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম।

দু-একটা কোর্স খাওয়ার পরেই পিয়ের বলল, 'শোনো, আগেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে

নিই। আমাদের ভারতীয় বন্ধুটি যেন বিল মেটাবার কোনও চেষ্টা না করে। আজকের বিলও আমিই দেব।

আমি বললাম, কেন, আমি কী দোষ করেছি? বিল মেটাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব কেন?

পিয়ের তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে বলল, তুমি আমাদের অতিথি। ইন্ডিয়াতে যখন যাব, তখন তুমি খাওয়াবে।

মোনিক বলল, সুনীলের পয়সা দেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ও আমাদের দেশ দেখতে এসেছে, ওর অনেক খরচ আছে। কাল পিয়ের দিয়েছে, আজ দেব আমি।

মার্গারিট বলল, তুই কেন দিবি রে? এই হাঙ্গেরিয়ান রেস্তোরাঁয় আমি তোদের নেমন্তন্ন করেছি না?

পিয়ের বলল, মোটেই না। তুমি রেস্তোরাঁর নাম বলেছিলে শুধু, এখানে আসার প্রস্তাব দিয়েছি আমি। ঠিক কি না বলো।

এইরকম তর্কাতর্কির মধ্যেই খাওয়া চলতে লাগল। শেষের আইসক্রিম খেতে খেতে পিয়ের বলল, ওয়েটার, বিলটা আমাকে দেবে, আর কেউ চাইলেও দেবে না!

ওয়েটারটি হাসতে লাগল। এরই মধ্যে এক ফাঁকে বাথরুমে যাওয়ার নাম করে উঠে গিয়ে মার্গারিট কাউন্টারে গিয়ে পুরো বিলের টাকা এবং বকশিশ-টকশিশ সব দিয়ে এসেছে।'

এরপর মার্গারিট আর আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা, তবু নিঃস্ব পক্ষেরই জয় হল।

সে রাতেও বাড়ি ফিরে গল্প হল অনেকক্ষণ ধরে। পিয়েরও যদিও প্রায়ই বলে যে সাহিত্য-টাহিত্য তেমন বোঝে না, তবু সে লেখকদের সম্পর্কে অনেক ঘটনা জানে।

রাত যখন অনেক হয়েছে, গল্পের একেবারে শেষ দিকে প্রায়, এক অলৌকিক টেলিফোন এল আমার নামে। তাতে এল এমনই এক চমৎকার বার্তা, যাতে আমার মস্তিষ্কে বয়ে গেল কুলকুল এক আনন্দের নদী। যারা ভক্ত এবং ধর্মবিশ্বাসী, তাদের কাছে এটা একটা মিরাক্ল মনে হতে পারে। আমি ভাগ্য কিংবা দৈবে বিশ্বাসী নই, তবু আমার জীবনে মাঝে মাঝে এরকম আকস্মিক ঘটনা ঘটে। সেইজন্যই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে বলেন, আমি নাস্তিক বলেই নাকি ভগবান আমাকে খুশি করার জন্য, নিজের দিকে টানার জন্য ওভার টাইম খাটেন।

আমি মার্গারিট-মোনিকের কাছে শোনা গল্পগুলো বলে নিই।

সেদিন দুপুরে মার্গারিট আর আমি শেষ পর্যন্ত লুভ্‌র মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে কোন কোন ছবি ভালো লেগেছে, সেই আলোচনা করতে করতে এদুয়ার মানে-র আঁকা 'ঘাসের ওপর মধ্যাহ্ন ভোজ' (Le Dejeuner Sur L'Herbe) ছবিটার কথা ঘুরে ফিরে আসছিল। মোনিক একবার জিগ্যেস করল, এই ছবিটা যখন প্রথম দেখানো হয়, তখন কী কাণ্ড হয়েছিল জানো?

আমি বললাম, জানি না। বলো, বলো। আমার এইসব কাহিনি শুনতে খুব ভালো লাগে।

মোনিক মার্গারিটকে জিগ্যেস করল, তুই সুনীলকে সালোঁ দে রেফুউজের ঘটনাটা বলিসনি?

মার্গারিট বলল, আমি ভালো জানি না। তুই বল।

আমরা যখন বসে গল্প করছি, তার ঠিক একশো এক বছর আগেকার ঘটনা। ফরাসি দেশের সম্রাট তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিসে হাজার হাজার শিল্পী গিসগিস করত। যাদেরই একটু আঁকার হাত বা শখ থাকত, তারা দূর দূর থেকে প্যারিসে এসে জমায়েত হত ভাগ্যান্বেষণে। প্যারিসের কোনও প্রদর্শনীতে একবার স্বীকৃতি পেলে সারা পৃথিবীতে নাম ছড়াবে। শুধু ফরাসিদের জন্যই নয়, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকার তরুণ শিল্পীদের কাছেও প্যারিস ছিল শিল্পের স্বর্গ।

শিল্প ও সংস্কৃতির মান বজায় রাখার জন্য কয়েকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও চালু করা

হয়েছিল সরকার থেকে। যেমন আকাদেমি ফ্রাঁসেজ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া হত লেখকদের, ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্বও এই আকাদেমির। সেইরকম, তরুণ শিল্পীদের যোগ্যতার বিচার হয়তো আকাদেমি দে বোজার। দু'বছর অন্তর অন্তর এই আকাদেমির উদ্যোগে হত এক বিশাল শিল্প প্রদর্শনী। তার আগে শিল্পীদের বলা হত মনোনয়নের জন্য ছবি জমা দিতে। হাজার হাজার তরুণ-প্রবীণ শিল্পী তাদের একাধিক ক্যানভাস জমা দিত, একটি কমিটি সেই সব ছবি দেখে দেখে বিচার করতেন। বাতিল হত অনেক, আর যেগুলি যোগ্য বলে প্রদর্শনীতে স্থান পেত, সেগুলি রসিক ও ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত তো বটেই, ওই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়াই ছিল শিল্পীদের স্বীকৃতি।

তবে এই যে আকাদেমির সর্বশক্তিমান বিচারক কমিটি, তার সদস্য হত সাধারণত মাঝারি প্রতিভার বয়স্ক শিল্পীরা, তারা সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এবং অভিজাতদের আশীর্বাদধন্য। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা রক্ষণশীল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনও এক্সপেরিমেন্ট দেখলে তারা শিউরে উঠত, নবীন প্রতিভাবানদের সমাদর করার বদলে তারা ট্র্যাডিশনাল শিল্পীদেরই মর্যাদা দিত বেশি।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে একদল যুগান্তকারী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এদুয়ার মানে, ক্লদ মনে, এডগার দেগা, জাঁ রেনোয়া, পল সেজান, কামিল পিসারো, সিসলে, হুইসলার এবং আরও অনেকে। পরে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয় ভ্যান গগ, পল গগ্যাঁ, মারি কাসাট, বার্থ মরিসো প্রমুখ। সেই ষাটের দশকে এদের কোনও গোষ্ঠী তৈরি হয়নি বটে, তখনও এঁরা ইমপ্রেশানিস্ট নামে পরিচিত নয়, কিন্তু এক কাফেতে আড্ডা মারতেন, কোনও কোনও স্টুডিয়োতে একসঙ্গে ছবি আঁকতেন।

এই দলটিকে আকাদেমি বোজার একেবারে পাত্তাই দিত না। বছরের পর বছর এঁদের ছবি বাতিল হয়ে ফিরে আসত। সে-যুগের যারা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাদেরই ভাগ্যে জুটত সরকারি উপেক্ষা। প্রদর্শনীতে স্থান না পেয়ে বাতিল ছবি তাঁরা ঘাড়ে করে ফিরিয়ে আনতেন, পরের বার আবার নতুন ছবি জমা দিতেন, এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও তো নেই।

এক বছর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সেটা ১৮৬৩ সাল, সেবার এই দলের শিল্পীদের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এক নতুন শিল্পরীতি তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি জমা দিলেন। অন্যান্য বছর এই দলের দু-একজনের একটা-আধটা ছবি নির্বাচিত হয়েছে, এবার এঁদের ধারণা, সকলেই একসঙ্গে স্থান পাবেন, দর্শকরা বুঝবেন, শিল্পজগতে একটা পালাবদল এসেছে!

সে বছর সবাই বাতিল!

অন্যান্যবারের মতন তরুণ শিল্পীরা এবার আর মুখ বুজে এই অবিচার মেনে নিতে চাইল না। তারা তাদের নির্দিষ্ট কাফেতে গিয়ে হইচই, চিৎকার শুরু করল, গালমন্দের ঝড় বইয়ে দিল। কেউ কেউ টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বলতে লাগল, এবার দেখে নেব।

শিল্পীরা অধিকাংশই খুব গরিব, সরকারের ওপরের মহলে কোনও চেনাশুনো নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন এদুয়ার মানে। তিনি ধনীর সন্তান। তাঁর বাবা তাঁর ছবি আঁকার বাতিক ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেছেন, ছেলেকে শিল্পীর অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে দিতে চাননি। একবার মানে-কে একটা জাহাজের চাকরি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যাতে মানে-র এই রোগ কেটে যায়, কিন্তু মানে ছবি আঁকার জন্য জীবন পণ করেছিলেন।

মানে সেই কাফেতে বসে বললেন, আমার বাবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট, আমি বাবাকে দিয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাব!

আর একজন বলল, আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর চেনা আছে, আমি তাঁকেও জানাব যে এসব কী চলছে।

শিল্পীদের এই বিক্ষোভের কথা কিছু কিছু ছাপা হল খবরের কাগজে, বেশ কয়েকটা চিঠি গেল সরকারের কাছে। প্রবীণ শিল্পী দেলাক্রোয়া নবীনদের প্রতি সমর্থন জানালেন। ক্রমে এই কথাটা

সম্রাটের কানে গেল।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান সব সময় বিপ্লব-বিদ্রোহের জুজুর ভয় পেতেন। শিল্পীদের নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহ শুরুর সম্ভাবনা তিনি একেবারেই পছন্দ করলেন না। তিনি খবর পাঠালেন, স্বয়ং তিনি সালোঁতে গিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি দেখবেন।

স্বর্ণমণ্ডিত রথে চেপে বাদশা এলেন একদিন। তাঁর সিংহাসনটিও নিয়ে আসা হল। তাতে বসে তৃতীয় নেপোলিয়ান দেখলেন সব বাতিল ছবি। একটার পর একটা ছবি এনে দেখানো হল তাঁকে। তারপর তিনি আদেশ দিলেন, এবার আনো তো কোন ছবিগুলো মনোনীত হয়েছে।

সেগুলিও দেখার পর তিনি বললেন, মনোনীতগুলোর চেয়ে বাতিলগুলো তো কোনও অংশে খারাপ দেখছি না।

আকাদেমির পরিচালক বললেন, কিন্তু হে সম্রাট, জুরিদের বিচারেই তো ভালো ছবিগুলি নির্বাচিত হয়েছে।

সম্রাট বললেন, জুরিরা চুলোয় যাক। কুকুরের গায়ে যেমন এঁটুলি লেগে থাকে, ওরাও তেমনি সর্বাঙ্গে সংস্কারগ্রস্ত। এই সব বাতিল ছবিও এবার টাঙাতে হবে!

কিন্তু জায়গা পাওয়া যাবে কোথায়?

জায়গা খোঁজো। নতুন বাড়িতে টাঙাও!

সম্রাটের আদেশে সেবার দুটি প্রদর্শনী চালু হল। একটি পূর্ব-নির্বাচিত শিল্পীদের, অন্যটি বাতিলদের। দ্বিতীয়টির নামই হল সালোঁ দে রেফুউজে। কিন্তু এই বাতিলদের প্রদর্শনী কে দেখতে আসবে? সম্রাট সেদিকেও চিন্তা করেছিলেন। উদ্বোধনের দিন তিনি নিজে আসবেন সদলবলে, তা হলেই আসবে অভিজাতরা, এবং এই সমাগম দেখেই উপস্থিত হবে কৌতূহলীরা। সম্রাট সেইরকমভাবেই কিছুক্ষণের জন্য এলেন। তরুণ শিল্পীদের খুশি করার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ান চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাতেও কোনও লাভ হল না!

কৌতূহলী দর্শকে হল ভরতি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে সবাই চুপ। সম্রাট চলে যাওয়ার পর শুরু হল গুঞ্জন, তারপর ঠাট্টা-ইয়ার্কি, অট্টহাসি। মেয়েরা মুখে রুমাল চাপা দিল, পুরুষরা পেট চেপে ধরেও হাসি সামলাতে পারে না। শিল্পরসিক প্যারিসের দর্শকদের চোখে এই সব কোনও ছবির মধ্যেই শিল্প নেই।

সবচেয়ে বেশি ভিড় হলো এদুয়ার মানে-র 'ঘাসের ওপর মধ্যাহ্ন ভোজ' এবং হুইস্লারের 'শ্বেত বালিকা' ছবির সামনে। সবচেয়ে বেশি বিদ্রূপও বর্ষিত হল এই দুটি ছবির ওপরে। মানে সম্পর্কে চেঁচিয়ে বলা হতে লাগল, পাগল। লোকটা বদমাস। অশ্লীল ছবি এঁকেছে। এই ছবিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।

সারা পৃথিবীতে যারা ছবি ভালোবাসে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে মানে-র এই ছবিটি দেখিনি। ছবিটির কম্পোজিশান যে খুবই বিচিত্র, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের ওপর বসে আছে দুজন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত পুরুষ। তাদের পাশে একটি রমণী সম্পূর্ণ নগ্ন, একটু দূরে আর একটি পাতলা জামা পরা রমণী জলে পা ধুচ্ছে। দুজন সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পুরুষের পাশে নগ্ন রমণীটিই যাবতীয় কৌতূহলের কারণ, যদিও ছবিটির মধ্যে অশ্লীলতার আভাসমাত্র নেই। অশ্লীলতা পোশাক দিয়ে বিচার করা যায় না, অশ্লীলতা ফুটে ওঠে ভঙ্গিতে।

বর্তমানে ছবিটি বিশ্ববন্দিত, লুভ্‌র মিউজিয়ামে টাঙানো রয়েছে, অথচ একশো বছর আগে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল দর্শকরা, শিল্পীর ভাগ্যে জুটেছিল লাঞ্ছনা।

কথায় কথায় মোনিক বল., এদুয়ার মানে-র এই ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। লেখকরা যেমন অন্য লেখকদের কাছ থেকে ভাব ধার নেয়, এদুয়ার মানে-ও সেরকম এ ছবিটার কমপোজিশান ধার করেছেন, মানসানতানিও রাইমণ্ডির 'এনগ্রেভিং আফটার রাফায়েল'স জাজমেন্ট

অফ প্যারিস' থেকে।

মার্গারিট এটা মানতে কিছুতেই রাজি নয়। দুজনে তর্ক লেগে গেল। তর্ক থামাবার জন্য আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, সেই সময় লেখক-কবিরা এই শিল্পীদের সাহায্য করেনি? আমি তো জানতাম, বোদলেয়ার এদের পক্ষ নিয়ে লিখেছিলেন।

পিয়ের বলল, বোদলেয়ারের আর কী ক্ষমতা ছিল? তিনি তখন নিজের জ্বালায় মরছেন। কেউ তাঁর লেখা ছাপে না, চতুর্দিকে ধার, বিধবা মায়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন নানা ছুতোয়, ওদিকে আবার জান দুভাল নামে এক রক্ষিতাকে টাকা দিতে হয়। বোদলেয়ারের মৃত্যুও তখন কাছাকাছি এসে গেছে। ওদের আর এক লেখক বন্ধু ছিলেন এমিল জোলা। এমিল জোলা ছিল পেল সেজান-এর স্কুলের বন্ধু। দুজনেই এসেছেন এক্স-অঁ প্রভাঁস থেকে। তবে এমিল জোলাও তখন ঠিক মতন প্রতিষ্ঠিত নন, বিশেষ কেউ চেনে না, তিনি খবরের কাগজে কিছু কিছু লিখতেন বন্ধুদের সম্পর্কে।

আমি জিগ্যেস করলাম, আর ভিক্তর হুগো? তিনি তো তখন রীতি মতন প্রতিষ্ঠিত।

ভিক্তর হুগোর নাম শুনে পিয়ের হো হো করে হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে।

ওর হাসির কারণটা জানা হল না, এই সময় বেজে উঠল টেলিফোন। মোনিক উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে এক মিনিট কথা বলে, হাত উঁচু করে বলল, সুনীল, তোমার—।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। প্যারিসে আমি এদের বাইরে আর কারুকেই চিনি না, আমায় কে ফোন করবে? তাও রাত সাড়ে বারোটায়? উঠে গিয়ে কণ্ঠস্বর শুনেও আমার বিস্ময় একটু কমল না।

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের ওপার থেকে পল এঙ্গেল বলল, হাই সুনীল, কী খবর তোমার? এখান থেকে চলে যাওয়ার পর একটা চিঠি লিখলে না। ফোন করলে না।

আমি লজ্জায় জিভ কাটলাম। সত্যি এটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমি বড্ডই তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি। সেই সময় ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু, ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, প্রতিভা বসু কত ভালোবাসা ও যত্নের সঙ্গে আমাকে একবার কাছে রেখে খাইয়েছিলেন, ওদের ছেলে পাপ্পার সঙ্গে ছিল আমার খুব ভাব। ওঁদেরও কিছু জানিয়ে আসা হয়নি, একসঙ্গে এসব মনে পড়ে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম, পল, তুমি এখানে আমাকে কী করে ফোন করলে? আমি যে এ বাড়িতে থাকব, তা তো প্যারিসে আসবার আগে আমিও জানতাম না।

পল এঙ্গেল বললেন, এটা এমন কিছু শক্ত নয়। তুমি কোনও ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে যাওনি। আমি ভেবেছিলাম, নিউ ইয়র্ক থেকে তুমি কলকাতায় ফিরে যাবে। নিউ ইয়র্কে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গকে ফোন করে জানলাম, তুমি প্যারিসে। অ্যালেনই এই নাম্বারটা দিল।

নিউ ইয়র্ক থেকে আমি একবার মার্গারিটকে ফোন করেছিলাম বটে, নাম্বারটা লিখে রেখেছিলেন ওদের অ্যাপার্টমেন্টের দেওয়ালে, সেখানে আরও বহু নাম্বার লেখা, অ্যালেন তার মধ্য থেকে এটা ঠিক খুঁজে বার করেছে।

পল এঙ্গেল জিগ্যেস করলেন, প্যারিসে তুমি কোথায় আছ? প্যারিস তো খরচের জায়গা। আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি।

আমি বললাম, তার দরকার নেই। আমি একটা থাকার জায়গা পেয়ে গেছি।

পল এঙ্গেল বললেন, তুমি মেরির সঙ্গে দেখা করে যাওনি। মেরি খুব রাগ করেছে। আজ সারাদিন সে তোমার কথা বলছিল।

এবার আমার লজ্জায় কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। পলের স্ত্রী মেরি আমায় সত্যিই খুব ভালোবাসেন। অনেকবার তিনি আমায় আদর করে বলেছেন, এই ছেলেটাকে আমি পোষ্যপুত্র হিসেবে রেখে দেব! মেরির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া খুব কঠিন হত বলেই আমি তাঁর সঙ্গে শেষ

দেখা করিনি। এটা খুবই অন্যায় হয়েছে।

আমি কোনওক্রমে বললাম, আমি ক্ষমা চাইছি, পল। একবার কি মেরির কাছে ক্ষমা চাইতে পারি?

পল এঙ্গেল বললেন, না, পারো না। মেরির আজ আবার খুব ডিপ্রেশান হয়েছে, সারাদিন রাগারাগি করছিল, এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ঘুমোচ্ছে, তুমি তো জানো...

মেরির এই অসুস্থতার কথা আমি জানি ঠিকই। মেরির খুব রাগ তাঁর স্বামীর ওপর। মাঝে মাঝে তাঁর ডিপ্রেশান হয়। মেরির অভিযোগ একটাই, তাঁর ব্যস্ত স্বামী তাঁর জন্য সময় দিতে পারেন না। সারাদিন ও সন্ধে, কখনও দিনের পর দিন ও রাত মেরিকে একা একা কাটাতে হয়। সেইসব দিনে মেরি জিন পান করতে শুরু করেন, ক্রমশ নেশা বেড়ে যায়, কিছু জিনিসপত্র ভাঙেন ও একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। ওদেশে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধাদের নিজের নেশা করা একটা অতি পরিচিত রোগ। প্যারিসে এখন মধ্যরাত হলেও আমেরিকায় এখন বিকেল, এরই মধ্যে মেরি অজ্ঞান।

আমি অনুতপ্তভাবে বললাম, মেরিকে আমি চিঠি লিখব ক্ষমা চেয়ে।

পল এঙ্গেল বললেন, 'শোনো, মেরি তোমাকে একটা উপহার দিতে চায়। আজ সারাদিন সেই কথাই বলছিল। তুমি কাল প্যারিসের যে-কোনও আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে গিয়ে তোমার পাসপোর্ট দেখালে ওরা তোমাকে দুশো ডলার দেবে।

আমি বললাম, না, না, আমার এখানে টাকা লাগবে না। আমার এখানে বেশ চলে যাচ্ছে, কয়েকজন বন্ধু পেয়েছি।

পল এঙ্গেল ধমক দিয়ে বললেন, এটা মেরির উপহার। তোমার প্রয়োজন আছে কি না, তা জেনে কেউ উপহার দেয় না। তুমি না নিলে মেরি দুঃখ পাবে।

টেলিফোনটা রাখার পর আমি একটুক্ষণ হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যে স্বপ্নের মতন। মেরি আমাকে এত ভালোবাসে। মায়েদের যেমন একটা ইন্‌সটিংক্ট থাকে, সেইরকমই কি মেরি ঠিক আজই আমার অবস্থাটা অনুভব করে এই উপহার পাঠাল?

দুশো ডলার বিরাট কিছু সম্পদ নয়, তখনকার হিসেবে এক হাজার টাকা। কিন্তু আমার সেই অকিঞ্চন অবস্থায় সেই টাকাটাই লটারির ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার মতন।

হঠাৎ আমার চোখ জ্বালা করে উঠল। পল ও মেরির এই যে আমার প্রতি অকারণ ভালোবাসা, আমি ও দেশ ছেড়ে চলে এসেছি তবু আমার জন্য উদ্বেগ, আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা, আমি কি এত কিছুর যোগ্য?

॥ ১৩ ॥

"বেলাভূমির ওপর দরজাগুলি খোলা, দরজাগুলি খোলা নির্বাসনে
চাবিগুলি রয়েছে লাইট হাউসের লোকদের কাছে
এবং প্রবেশদ্বার পাথরের চক্রের ওপর ভেঙে পড়েছে রোদ
হে বন্ধু, এই বালুকাবেলায় তোমার কাচের বাড়িটি আমাকে দিয়ে যাও..."

—সাঁ জন পার্স

এই সেই ব্যাস্তুইট হল। কী আশ্চ না, আজ ১ অক্টোবর। আর এক ১ অকটোবরে এই ব্যাস্কুইট হলে দারুণ খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, তারপর থেকেই বলতে গেলে এ দেশের ইতিহাস বদলে গিয়েছিল।

মার্গারিট অতি উৎসাহে, কলস্বরে আমাকে টুকরো টুকরো ইতিহাসের কাহিনি শোনালেও আমি তেমন আগ্রহ বোধ করছিলাম না। ভার্সাই-এর রাজপ্রাসাদ দেখতে এসে খানিক পরেই আমার ক্লান্তি এসে গেল। তার একটা কারণ ভিড়, বড্ড বেশি ভিড়, আজ ছুটির দিন বলে এখানে গিসগিস করছে মানুষ। এত বড় প্রাসাদটাও ভরতি হয়ে গেছে কয়েক হাজার মানুষে, লাইন করে ঢুকতে হচ্ছে প্রতিটি ঘরে। কোনও কোনও দলের সঙ্গে রয়েছে গাইড, তারা জার্মান-ইটালিয়ান-ইংরিজিতে অনেক কিছু বোঝাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি।

এত ভিড়ের মধ্যেও মার্গারিট ও আমি পরস্পরকে নিয়ে আলাদা হয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু কাল রাত থেকে আমার মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেছে। মোনিক তার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে, তাই কাল সন্ধেবেলা আমাদের বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে উঠে যেতে হয়েছে মার্গারিটের আর এক বান্ধবী মারি দোমিয়ে'র বাড়িতে। এটা অ্যাপার্টমেন্ট নয়, একটা পুরো বাড়ি, মমার্ত অঞ্চলে। বেশ সুন্দর কাঠের বাড়ি, সামনে একটু বাগান। এই এলাকাটা খানিকটা উঁচু, এখান থেকে প্যারিসের অনেকখানি দেখা যায়। রাত্রের আলো-ঝলমল নগরীর রূপ জানলা দিয়েই চোখে পড়ে। তবু সে বাড়িতে ঢুকে খানিকক্ষণের মধ্যেই আমার অস্বস্তি হতে লাগল। এখানে একেবারে পারিবারিক আবহাওয়া, মারির স্বামী এবং দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে, এবং একজন বৃদ্ধা, তাঁর পরিচয়টা ঠিক বোঝা গেল না। ছেলেমেয়ে দুটি হস্টেলে থাকে। ছুটিতে এসেছে। মোনিকের বাড়িতে আমরা ছিলাম স্বাধীনভাবে, নিজেরা রান্না করে খেতাম। যত রাত পর্যন্ত ইচ্ছে আড্ডা দিতাম, কিন্তু একটা অপরিচিত সংসারে এসে সেরকম করা যায় না। মারির স্বামী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, ভদ্রতার অভাব নেই, কিন্তু সে আমাদের এরকম উড়ে এসে জুড়ে বসা পছন্দ করেছে কি না, তা বোঝা দুষ্কর।

মার্গারিটকে আমি বললাম, এখন তো আমি কিছু টাকা পেয়েছি, সস্তার হোটেলে থাকতে পারি। কিন্তু মার্গারিট কিছুতেই রাজি নয়। শুধু মাথা গোঁজার জায়গার জন্য আমার পয়সা খরচ করা চলবে না। এই নিয়ে মার্গারিটের সঙ্গে আমার সামান্য ঝগড়াও হয়ে গেল।

মেজাজটা ভালো নেই বলেই ভালো ভালো জিনিস আজ উপভোগ করতে পারছি না। ভার্সাই প্রাসাদে খানিকক্ষণ ঘোরার পর মনে হল, দূর ছাই, এমনকি আর দেখার আছে, এখানে না এলেও চলত। আজ আমার বারবার দেশের কথা মনে পড়ছে।

মার্গারিট বলল, জানো, ১ অক্টোবর এখানে একটা বিরাট ভোজসভা হয়েছিল। প্যারিসে তখন বাস্তিল কারাগার ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। উন্মত্ত জনতা যাকে তাকে শাস্তি দিয়ে তার ছিন্নমুণ্ড বর্শায় গেঁথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুরু হয়ে গেছে ফরাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্র টলমল করছে। ফরাসি দেশের পতাকার রং আগে ছিল সাদা, জনতার ইচ্ছেতেই তাতে তখন যুক্ত হয়েছে লাল ও নীল রং। সম্রাট ষোড়শ লুই সে সময় সপরিবারে রয়েছেন এই ভার্সাইতে, বেশ অসহায় অবস্থায়। এরই মধ্যে একটি সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হল এখানে। তাতেই বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করল, রাজতন্ত্র এবার নিরাপদ, সম্রাটের গায়ে কেউ আর হাত দিতে পারবে না। সেনাবাহিনীর অফিসারদের খাতির করার জন্য বিরাট ভোজ হল। রাজা ও রানি দুজনেই সেখানে উপস্থিত। সকলের কাছে বিলোনো হলো সাদা পতাকা। বিপ্লবীদের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে সবাই হো-হো করতে লাগল।

মার্গারিটকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে, চলো, এখান থেকে একটু বাইরে যাই।

ভিড় এড়িয়ে আমরা একটা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

মার্গারিটকে ঐতিহাসিক স্মৃতি পেয়ে বসেছে। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে বাইরের বাগান দেখছ, এইসব জায়গায়, ভার্সাইয়ের সব রাস্তা-ঘাটে সেই পয়লা অকটোবরের পরের এক রাতে শুয়ে ছিল হাজার-হাজার মানুষ। এই রাজবাড়ির ভোজসভার কথা রটে গিয়েছিল প্যারিসে,

ওদিকে সেখানে তখন কোনও খাদ্য নেই। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসে রুটি দাবি করেছিল। অক্টোবরের পাঁচ তারিখে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা ঠিক করল, তারা ভার্সাইয়ে এসে রাজার কাছে বলবে, আমাদের খাদ্য দাও, নইলে তুমি নিপাত যাও।

প্যারিস থেকে হেঁটে চলে এলো সেই বিশাল ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ মানুষের মিছিল। তাদের মধ্যে নারী ছিল কয়েক হাজার। রাজা ষোড়শ লুই প্রত্যেক দিন শিকার করতে যান, সেদিনও শিকার থেকে ফিরে এসে দেখলেন ভার্সাই প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে মারমুখী জনতা।

আমি জিগ্যেস করলাম, সেইদিনই বুঝি রানি মারি আঁতোয়ানেৎ বলেছিলেন, ওরা রুটি খেতে পাচ্ছে না। তা হলে তার বদলে কেক খায় না কেন?

মার্গারিট চোখ বড় বড় করে বলল, না, না, ও কথাটা ভুল। মারি আঁতোয়ানেৎ কোনওদিনই ও-কথা বলেননি। ও বেচারার নামে ভুল করে ওই কথাটা চলে আসছে।

আমি বললাম, সেদিন এখানে অনেক রক্তপাত হয়েছিল।

মার্গারিট বলল, খুব বেশি হতে পারত। রাজার রক্ষীবাহিনী গুলি চালিয়েছিল, এদিকে বিদ্রোহী জনগণের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার, তাদের অনেকেই তো সশস্ত্র। কুড়ি হাজার মানুষকে কি মেরে ফেলা যায়? এর মধ্যে এসে পড়লেন জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার লাফাইয়েৎ। এই লাফাইয়েৎ জনতার চোখে হিরো। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় ইনি নিজে থেকেই ফ্রান্স থেকে অত দূরে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকানদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে। লাফাইয়েৎ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করলেন জনতাকে, রাজাও ব্যালকনিতে এসে (এমনও হতে পারে, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই) দর্শন দিয়ে রুটি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর সবাই ঘুমোতে চলে গেল। ভোররাতের দিকে আবার কয়েকশো লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল প্রাসাদের মধ্যে। অতর্কিত অসতর্ক রাজকীয় রক্ষীদের কচু-কাটা করতে-করতে তারা উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। ওই দ্যাখো, ওই যে রানির ঘর, প্রায় ওই পর্যন্ত এসে পড়েছিল তারা। এবারেও লাফাইয়েৎ এলেন ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। প্রায় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে দু-পক্ষকে থামালেন। কী রকম এক একটা ইতিহাসের মুহূর্তে ভেবে দ্যাখো। আর একটু দেরি হলেই হয়তো সেই লোকগুলো এই প্রাসাদেই রাজা-রানিকে শেষ করে ফেলত।

পরদিন সকালে দাবি উঠল, শুধু রুটির প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, রাজাকে ভার্সাই ছেড়ে এই জনতার সঙ্গেই প্যারিসে যেতে হবে! রাজা-রানি একবার পালাবার কথা ভেবেও নিরস্ত হলেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, জল-কাদার রাস্তা দিয়ে রাজা সপরিবারে চললেন প্যারিসের দিকে। তাঁর জুড়ি গাড়ির পাশে-পাশে মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে এক-একটা লোকের হাতের বর্শার ডগায় কোনও রাজরক্ষীর ছিন্ন মুণ্ড। রাজা-রানি আর কোনওদিন ভার্সাইতে ফিরে আসেননি।

এরপর আমরা আরও কয়েকটি ঘর ঘুরে দেখে উদ্যানে এসে বসলাম। রাজা-রানিদের শয়নকক্ষ, খাবার ঘর, বসবার ঘরে আজকাল জনগণের অবাধ প্রবেশ অধিকার। সেইসব ঘর দেখে মনে হয় না, আগেকার রাজা-রানিরা খুব একটা আরামে থাকতেন এখনকার তুলনায়। আজকালকার টাটা-বিড়লা কিংবা ফোর্ড-রকফেলার প্রমুখ নিশ্চয়ই সিরাজউদ্দৌলা, সাজাহান, নেপোলিয়ান, রানি ভিক্টোরিয়ার তুলনায় অনেক বেশি বিলাসী জীবন কাটান। কারণ, আগেকার ওঁরা এয়ার কণ্ডিশনিং পাননি, কল খুললেই পাননি ঠাণ্ড-গরম জল এক সঙ্গে। লিফটের বদলে কত সিঁড়িই না ভাঙতে হয়েছে সারা জীবনে।

ভার্সাইয়ের বাগান এখন অনেকের কাছে দর্শনীয়, কিন্তু আমার ভালো লাগেনি। ফরাসিদের বাগান বড় বেশি বেশি সাজানো। কোথাও একটাও স্বাভাবিক গাছ নেই। সব গাছ কেটেকুটে নানারকম আকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফুলের বাগানগুলিকে দেওয়া হয়েছে জ্যামিতিক আকৃতি। গাছপালার ওপর এত বেশি ছুরি-কাঁচি চালানো দেখলে আমার কষ্ট হয়।

একটু পরে আমি বললাম, মার্গারিট, এখানে এসে তোমার ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে পড়ছে, এটা স্বাভাবিক। আমার কিন্তু মনে পড়ছে অন্য বিষয়। ভার্সাই চুক্তির কথা তুমি জানো? সেটা ফরাসি বিপ্লবের ছ' বছর আগেকার কথা। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ আর ফরাসিদের মধ্যে খুব লড়াই চলছে। আমাদের দেশটাকে তখন এই দুই শক্তির মধ্যে কে কতটা ভাগাভাগি করে নেবে, তা ঠিক হয়নি। অবশ্য ইংরেজদের কূটনীতি ও রণকৌশল ছিল ফরাসিদের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। যাই হোক, ভারতের মাটিতে যাতে এই দুই পক্ষ অযথা শক্তিক্ষয় না করে, সেই জন্য ভার্সাইতে হয়েছিল একটা শান্তি চুক্তি। ইংরেজরা ফরাসিদের ছেড়ে দিল পণ্ডিচেরি, মাহে এবং সুরাটের খানিকটা অংশ। ভারতীয়রা কিছু জানলই না যে তাদের ভাগ্য ভাগাভাগি হচ্ছে ভার্সাইয়ের প্রাসাদে।

মার্গারিট বলল, ইতিহাসে পড়েছি, দক্ষিণ ভারতে হায়দার আলি নামে একজন নবাব ছিল, সে ফরাসিদের সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের পুরোপুরি হটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু হায়দার আলি হঠাৎ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে টিপ্পু সাহিব...

আমি বললাম, এই ভার্সাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাংলা কবিতারও খানিকটা যোগ আছে। আমাদের একজন বাঙালি কবি এখানে কিছুদিন ছিলেন, এখানে বসে লিখেছেন, তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রাজা-রাজড়ার কাহিনির চেয়ে কবিদের সম্পর্কেই মার্গারিটের উৎসাহ অনেক বেশি। সে বলল, বাঙালি কবি, তার নাম মাইকেল? নিশ্চয়ই ক্রিশ্চিয়ান, সে বাংলায় কবিতা লিখেছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি খাঁটি বাঙালির ছেলে খ্রিস্টান হয়ে ইংরিজিতে লিখতে শুরু করেছিলেন। তারপর বাংলা ভাষায় ফিরে আসেন এবং আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভার্সাইতে এসেছিলেন ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগে, অন্তত বছর পঁচিশেক আগে।

মার্গারিট জিগ্যেস করল, সে হঠাৎ ভার্সাইতে থাকতে এসেছিল কেন। একজন বিদেশির পক্ষে প্যারিসে থাকাই তো স্বাভাবিক ছিল।

আমি বললাম, সেটা আমি জানি না। খুব সম্ভবত প্যারিসের চেয়ে ভার্সাইতে বাড়ি ভাড়া ও জিনিসপত্রের দাম কম ছিল সেকালে। মাইকেলের দারুণ অর্থকষ্ট চলছিল তখন, সঙ্গে বউ ছেলে মেয়ে। এক একদিন তাঁরা কিছুই খেতে পাননি। ধার শোধ করতে না পারার জন্য মাইকেলের জেলে যাওয়ারও উপক্রম হয়েছিল।

যেন মাইকেল নামের কবিটি এখনও জীবিত, যেন তার ছেলেমেয়েরা আজই খেতে পাচ্ছে না, এইরকম একটা দৃশ্য ভেবে নিয়ে মার্গারিটের চোখ-মুখ করুণ হয়ে এল। সে বেদনাময় গলায় বলল, একজন কবিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হবে, ছেলেমেয়েরা উপবাসী থাকবে, ইস, পৃথিবীটা এমন খারাপ জায়গা।

আমি বললাম, না, পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা নয়। তোমারই মতন কোনও দয়াবতী ফরাসি মহিলা এই কবি পরিবারটির দুর্দশা দেখে গোপনে অনেক সাহায্য করেছিলেন, চুপি চুপি ওদের বাড়ির দরজার কাছে দুধ আর রুটি রেখে যেতেন।

এরপর মাইকেলের পুরো জীবন কাহিনিটি আমাকে শোনাতে হল। শুধু তাই নয়, মাইকেলের কবিতাও সে শুনতে চায়, আমি মেঘনাদবধকাব্য থেকে আবৃত্তি করলাম কয়েকটি লাইন। হঠাৎ কীরকম মুড এসে গেল। বাংলা শব্দের ঝংকার যেন মধুবর্ষণ করল আমার কানে, অনেকদিন তো এরকম উচ্চকণ্ঠে বাংলা পড়িনি। আমি গড় গড় করে অনেকখানি বলে যেতে লাগলাম, সেই দুর্বোধ্য শব্দাবলিই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল মার্গারিট।

একটু পরে সে জিগ্যেস করল, মাইকেলের পর তুমিই দ্বিতীয় বাঙালি কবি এই ভার্সাইতে এলে?

আমি বললাম, ভ্যাট। আরও কত কবি এসেছেন। বাঙালি লেখকরা অনেকেই ফরাসি দেশ ঘুরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ আসেননি? তবে, মাইকেলের পর আমিই দ্বিতীয় গরিব বাঙালি কবি এখানে এসেছি বলতে পারো! মাইকেল এখানে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়েছিলেন একসময়, তাঁর স্ত্রী কান্নাকাটি করছিলেন, হঠাৎ কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর নামে একজন বিরাট মানুষের কাছ থেকে টাকা এল মানি অর্ডারে। আমিও তিন দিন আগে একেবারে নিঃস্ব ছিলাম, তাই না?

ভার্সাইতে মাইকেল যে বাড়িতে ছিলেন, এই কয়েক বছর আগে ফ্রান্সের বাঙালিরা সে বাড়িতে একটা নাম ফলক বসিয়ে দিয়েছেন। আমি যাওয়ার সময় সেটা ছিল না, আমি অবশ্য মাইকেলের সে বাড়ি খোঁজার চেষ্টাও করিনি।

ভার্সাই থেকে ফিরে আমরা তুইলারি প্রাসাদের বাগানে কাটালাম কিছুক্ষণ। রাজা ষোড়শ লুইও ভার্সাই ছেড়ে এসে এখানে উঠেছিলেন। এ বাড়িটি রাজা-রানির জন্য তৈরি ছিল না, প্রথম রাতটা তাদের ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে শুতে হয়েছিল। আমরা অবশ্য বাড়িটার মধ্যে আর গেলাম না। একদিনের মধ্যে দুটো রাজবাড়ি হজম করা যায় না।

এখান থেকে আবার মারির বাড়িতে ফিরে যেতে হবে ভেবেই আমার মনটা খচখচ করতে লাগল। হয়তো ওরা খুবই ভালো ব্যবহার করবে, তবু এরকম আতিথ্য আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমাকে শুতে দেওয়া হয়েছে বৈঠকখানায়। এ দেশের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রায় সব বৈঠকখানাতেই একটা সোফা-কাম-বেড থাকে, আমেরিকায় যাকে বলে ড্যাভেনপোর্ট। দিনের বেলা সোফা, রাত্তিরে সেটা খুলে নিলেই বিছানা। কিন্তু আমাকে সকালবেলা ঘুম থেকেই উঠেই বিছানা গুটিয়ে ঘরখানা ফিটফাট করতে হবে, দিনের বেলা ইচ্ছে হলেও বিছানায় গড়ানো যাবে না। এরকম শয়ন-ব্যবস্থায় প্রাইভেসিও থাকে না।

প্যারিসে দু-দশ ঘর বাঙালি আছে নিশ্চয়ই। তাদের কারুর কাছে চাইলে কি আশ্রয় পাওয়া যেত না? কিন্তু আমি একজনকেও চিনি না!

মার্গারিট কিছুতেই আমার অস্বস্তির কারণটা ঠিক বুঝতে পারছে না। আমি কিছু বলতে গেলেই ও বলে, তুমি ভুল করছ, সুনীল, আমরা মারির বাড়িতে জোর করে উঠিনি। ওর বাড়িতে থাকি না বলে ও কতবার রাগারাগি করেছে। ও নিজেই বিশেষ করে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে, মারি ভারতীয় যোগব্যায়াম সম্পর্কে খুব আগ্রহী। ও একবর্ণও ইংরিজি জানে না বলে তোমার সঙ্গে ঠিক মতন কথা বলতে পারছে না। আর দু-একদিনের মধ্যে আড়ষ্টতা কেটে যাবে, তখন দেখবে, তোমাকে যোগব্যায়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করে কান ঝালাপালা করে দেবে!

হায় রে, আমি মারিকে যোগব্যায়াম শেখাব। ও বিষয়ে আমি কিচ্ছু জানি না।

আমি বললাম, মার্গারিট, তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কী হল? চলো, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দু-একদিন থেকে আসি। হোক না গ্রাম, আমার গ্রাম খুব পছন্দ। আমি নিজেও তো গ্রামের ছেলে!

মার্গারিটের মা-বাবা আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে ও এখনও নিশ্চিন্ত নয়। তাই মার্গারিট ও ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাচ্ছে না। রোজই একবার ফোন করে বাড়িতে, এর মধ্যে আমার কথা উল্লেখ করেছে কি না কে জানে?

রাত্তিরে আমার অস্বস্তি বেড়ে গেল আরও বেশি। মার্গারিটের বান্ধবী মারিই রান্না করে আমাদের খাওয়াল নানারকম। কথায় কথায় জানা গেল, সে আবার গর্ভবতী। মার্গারিটেরই সমবয়েসি সে, অথচ এর মধ্যে দুটির পর তৃতীয় সন্তানের জননী হতে চলেছে, বোধহয় এটা যোগব্যায়ামের সুফল। এই অবস্থায় আমাদের জন্য তাকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে।

ওদের বাড়িতে নিজস্ব সেলার আছে, সেখানে নানারকম ওয়াইনের স্টক। মারির গম্ভীর প্রকৃতির স্বামীটি ওয়াইন খেতে ও খাওয়াতে বেশ ভালোবাসে। পানাহার বেশ ভালোই হলো বটে,

মিশু মোনিকের বাড়িতে যে চমৎকার আড্ডা হত, সেই মজা এখানে একেবারেই পাওয়া গেল না। ওরা গল্প করতে লাগল তার কলেজ জীবন ও চেনাশুনো লোকদের সম্পর্কে, যাদের আমি বিন্দুমাত্র চিনি না। ওদের রসিকতাগুলো প্রাইভেট জোক্স পর্যায়ের, ওরা যখন হাসে তখন আমি হাসতেও পারি না, আবার মুখ গম্ভীর করে বসে থাকলে বোকা বোকা লাগে। তা ছাড়া ফরাসি মেয়েরা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলে, তখন অনেকটা বাঙালি মেয়েদের মতনই এমন ঝড়ের বেগে কলকল স্বরে সব কিছু বলে সে বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য!

সকালবেলা মার্গারিট আবার ফোন করলে তার মা-বাবাকে। তারপর আমাকে বলল, আজ মায়ের কাছে খুব বকুনি খেলাম।

আমি ভয় পেয়ে জিগ্যেস করলাম, এই রে, আমার কথা বলেছ বুঝি।

মার্গারিট বলল, না, সে জন্য নয়। আয়ওয়া থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। ওখানে ইউনিভার্সিটিতে নতুন সেমেস্টার শুরু হয়ে গেছে। আমি এখনও নাম রেজিস্ট্রি করিনি। ওরা জানতে চেয়েছে, আমি এই সেমেস্টারেও পড়তে চাই কি না। দেরি করলে আমার নাম কেটে দেবে। মা তাই জানতে চেয়েছে, আমি শুধু শুধু এতদিন প্যারিসে বসে আছি কেন?

আমি বললাম, তা হলে তো তোমাকে আমেরিকায় ফিরতেই হবে।

মার্গারিট একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ও কথা পরে চিন্তা করা যাবে। আজ আমাদের রেনোয়ার একক প্রদর্শনী দেখতে যাওয়ার কথা। চলো, চলো, আর দেরি কোরো না।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

মার্গারিটের সঙ্গে আমার সংলাপ আমি যেভাবে লিখছি, এটা সঠিক নয়। আমাদের মধ্যে ছিল তুই-তুকারির সম্পর্ক। ইংরিজিতে তুই-তুমি আপনি'র ব্যাপার নেই। সব ইউ দিয়ে সেরে নেওয়া হয়। ফরাসিতে কিন্তু আছে তু আর ভু। এর মধ্যে তু একেবারে তুই-এরই মতন শোনায়, হিন্দিতেও তো তু মানে তুই। আমি মার্গারিটের সঙ্গে যখন দু-চারটে বাংলা কথা বলতাম, তখনও তাকে তুই-ই বলতাম। সুতরাং শেষের দু'টি সংলাপ আসলে ছিল এরকম:

এই খুকি, তা হলে তো তোকে এবার আমেরিকায় ফিরতেই হবে!

সে কথা পরে ভেবে দেখব। সুনীল, আর দেরি করিস না, চটপট তৈরি হয়ে নে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে!

॥ ১৪ ॥

"কবি যা আবিষ্কার করে, তা সে জমিয়ে রাখে না;
লিখে ফেলার পর দ্রুত সেটা হারিয়ে ফেলে। সেখানেই
তো তার অভিনবত্ব, তার অসীম, এবং তার দুর্যোগ।"
—রেনে শার

লুভ্‌র মিউজিয়ামেরই পাশের এক অংশে চলছিল পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া'র একক ধারাবাহিক প্রদর্শনী। একজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর এতগুলি ছবি একসঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়।

লুভ্‌র প্রাসাদের সামনে যে চত্বর, সেখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট বলল, জানো, বাচ্চা বয়েসে রেনোয়া এখানে খেলা করতেন। রেনোয়া ছিলেন গরিবের ছেলে, ওঁর বাবা ছিলেন একজন সাধারণ দর্জি, ওঁরা এই পাড়াতেই থাকতেন। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে একদিন ওই ছেলেটির আঁকা ছবি লুভ্‌র মিউজিয়ামে টাঙানো হবে।

আমার একটু খটকা লাগল। ইমপ্রেশানিস্ট দলের শিল্পীদের মধ্যে রেনোয়া-ই যে সবচেয়ে গরিব ও সাধারণ পরিবার থেকে এসেছিলেন, সেটা আমার জানা ছিল। কিন্তু গরিবরা এই পাড়ায় থাকত কী করে? এই লুভ্‌র এককালে ছিল রাজপ্রাসাদ, সেন্য নদীর ধারের এই এলাকাটা প্যারিসের সবচেয়ে বনেদি অংশ, অদূরেই তুইলারির বাগানে আর একটা রাজপ্রসাদ, এর মাঝখানের অংশে তো ধনী রাজকর্মচারীদের থাকবার কথা। ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসের পাশে গরিবরা থাকে, এটা কি ভাবা যায়?

মার্গারিট বলল, সেটা তুমি ঠিকই ধরেছ। এখানকার বড় বড় বাড়িগুলোতে বড়লোকরা এবং উচ্চপদস্থ অফিসাররাই থাকতেন এক সময়। তারপর ফরাসি সম্রাটরা যখন ভার্সাইতে চলে যান, তখন সেইসব লোকেরাও সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এখানকার বিশাল হর্ম্যগুলি ক্রমশ মেরামতির অভাবে ঝুরঝুরে হয়ে পড়ে। সেগুলি সংস্কারের জন্য অনেক টাকার দরকার। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তখন সেই ভাঙাচুরো বাড়িগুলিতে গরিবরা আশ্রয় নিয়েছিল। যে-কোনও সময় তাদের মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়তে পারত।

রেনোয়া দর্জির ছেলে হয়েও বাবার পেশা নেননি?

না, অল্প বয়সে রেনোয়া ভালো গান গাইতে পারতেন, একটা গির্জায় বাচ্চা গায়কদের সঙ্গে গলা মেলাতেন। সেই গির্জায় কয়ার মাস্টার ছিলেন শার্ল গুনো, তখন তাঁর নাম কেউ জানত না, কিন্তু পরে 'ফাউস্ট'-এর সুর দিয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। সেই গুনো এই ছেলেটির মিষ্টি গলার আওয়াজ শুনে তাকে গানের জগতে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাচ্চা বয়সে তো বটেই, চিরকালই রেনোয়া ছিলেন লাজুক প্রকৃতির, তিনি ওদিকে গেলেন না। জীবিকার জন্য তেরো বছর বয়েসে ইস্কুল ছেড়ে রেনোয়া একটা পোরসিলিনের কারখানায় অ্যাপ্রেনটিস হলেন। তাঁর কাজ হল পোরসিলিনের কাপ-গেলাস পুষ্পদানিতে ছবি আঁকা।

রেনোয়া হয়তো সারা জীবন সেই কাজই করে যেতেন, তাঁর বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাঁর মনোভাব ছিল, যেমন চলছে চলুক! কাপ-ডিস-ঘটিতে ছোট ছোট ফুল-পাখি আঁকতেন, দুপুরে লুভ্‌র মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতেন আর নিজের শখে একটু-আধটু অয়েল পেইন্টিং-এর চর্চা করতেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে সেই পোরসিলিনের কারখানাটা উঠে গেল। তখন ছাপার যুগ চলে এসেছে। প্রত্যেকটা কাপ-গেলাসে আলাদা করে ছবি হাতে আঁকার বদলে, একটা ছবিই হাজার-হাজার কাপ-গেলাসে ছাপার পদ্ধতি চালু হয়েছে। আধুনিক এই সব কারখানার সঙ্গে পুরোনো কারখানাটি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারল না। বেকার হওয়ার পরেই রেনোয়ার সত্যিকারের শিল্পের দিকে ঝোঁক এল।

ভেতরে ঢুকে আমরা রেনোয়ার একেবারে গোড়ার দিকের আঁকা ছবি দেখতে শুরু করলাম। 'ডায়না' নামের ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট বলল, দ্যাখো, এই ছবিটা যখন এঁকেছিলেন, তখন রেনোয়ার বয়েস ছাব্বিশ।

পাথরের ওপর বসে আছে একটি নগ্ন নারী, হাতে ধনুক, পায়ের কাছে একটা মৃত হরিণ। এখনকার বহু বইতে এই ছবিটা থাকে। অথচ তখনকার সরকারি সালোঁ এই ছবিটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেই প্রত্যাখাত শিল্পীরাই ইমপ্রেশানিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, রেনোয়া ছিলেন তার এক উল্লেখযোগ্য সদস্য।

মার্গারিট বলল, দ্যাখো, এই যে মেয়েটির শরীর, তা একেবারে বাস্তবের কাছাকাছি, এখনকার যে-কোনও মেয়ের মতন। ওঁর আগেকার শিল্পীরা যখন দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন, তখন নগ্ন শরীরের চামড়া এত স্পষ্ট করতেন না, খানিকটা আলোছায়া মিশিয়ে দিতেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আকাশ ও গাছ, তা কিন্তু ইমপ্রেশানিস্টদের মতন স্বাভাবিক, উজ্জ্বল রঙের নয়, এ যেন স্টুডিওতে বসে আঁকা গাছ। সুতরাং এটাকে একটা মিশ্র স্টাইলের ছবি বলা যেতে পারে।

আমি জিগ্যেস করলাম, মার্গারিট, তুমি এত সব জানলে কী করে? তুমি কি ছবি সমালোচনার কোনও কোর্স নিয়েছিলে?

মার্গারিট বলল, যাঃ। এ তো ফ্রান্সের সব ছেলেমেয়েই জানে। ছবি চিনতে শেখা আমাদের এখান শিক্ষার একটা অঙ্গ। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই লুভ্‌র মিউজিয়াম ও আরও অনেক মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি আমার স্কুল-কলেজ জীবনে ছবি সম্পর্কে কিছুই শিখিনি। আমাদের ওসব পাটই নেই। কৃত্তিবাস পত্রিকাকে ঘিরে আমরা যখন কবিতা নিয়ে মাতামাতি শুরু করি, তখন আস্তে আস্তে তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ হয়। নিখিল বিশ্বাস, যোগেন চৌধুরী, প্রকাশ কর্মকার, সুনীল দাস, রবীন মণ্ডল, বিজন চৌধুরী, শর্বরী রায়চৌধুরী, মাধব ভট্টাচার্য চারু খান, ব্রজগোপাল, সনৎ কর, সদা-বিদ্রোহী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। তখন কিছু ছবি দেখেছি, সেই সূবাদে দু-চারটে বইটইও পড়েছি।

আমি বিদ্যে ফলাবার জন্য বললাম, আচ্ছা, মার্গারিট, রেনোয়ার আঁকা নারীমূর্তিগুলির মধ্যে খানিকটা রুবেনস্-এর প্রভাব নেই।

মার্গারিট উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছ তো। রেনোয়া বলতে গেলে সারাজীবনই টিশিয়ান আর রুবেনস-এর মতন আগেকার মাস্টারদের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। অথচ মজার ব্যাপার এই, রেনোয়া'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্লদ মোনে ওঁদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। মোনে এঁকেছেন উজ্জ্বল আলো ও রং দিয়ে প্রকৃতির ছবি, যে-রকম আগে কেউ আঁকেনি। সেই হিসেবে রেনোয়াকে পুরোপুরি ইমপ্রেশানিস্ট বলাও যায় না। উনি নিজেই এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এক সময়, সেটা অবশ্য স্বার্থপর কারণে।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে, গলার সুর বদল করে মার্গারিট বলল, আমাকে তাড়াতাড়ি আমেরিকায় ফিরতেই হবে। না হলে পরের সেমেস্টারে পড়াবার কাজটা পাব না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, সুনীল?

আমি বললাম, কী করে যাব? আমি যে টিকিট খরচ করে ফেলেছি। আবার টিকিট কাটার টাকা কোথায় পাব?

মার্গারিট গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আমি একা ফিরে যাব? আয়ওয়াতে আমি একা থাকব?

আমি খানিকটা দূরে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, তুমি রেনোয়া-কে স্বার্থপর বললে কেন? এই ছবিটা, এই যে একটা পোর্ট্রেট, এই মহিলা কে?

মার্গারিটের মন অমনি আবার ছবির দিকে ঘুরে গেল। আমার পাশে এসে বলল, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এই সব শিল্পীদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সে তখন রাজনৈতিক গোলযোগ চলছে, ছবি কেনার লোকও খুব কম, আর এই তরুণ শিল্পীদের তো কেউ পাত্তাই দিত না। মাঝে মাঝে এরা খেতে পেত না পর্যন্ত, তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, এদের রং-তুলি ক্যানভাস কেনার পয়সা পর্যন্ত জুটত না। তুমি ভাবো তো, সুনীল, শিল্পের জন্য এরা আর সব কিছু ছেড়ে এসেছে, অথচ ছবিও আঁকতে পারছে না। রেনোয়া এক একদিন তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে রুটি চেয়ে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধু ক্লদ মোনে-কে খাওয়াত।

সাত-এর দশকে রেনোয়া অনেকটা পয়সার জন্যই পোর্ট্রেট আঁকার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সরকারি সাঁলোতে ছবি টাঙালে তবু খানিকটা পরিচিতি হবে, ছবি বিক্রির সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেই জন্য রেনোয়া তাঁর বন্ধু ইমপ্রেশানিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার সরকারি উদ্যোগে বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় ছবি জমা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের আন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাসঘাতকতাই করেছিলেন বলা যায়। রেনোয়া স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, আমি সরকারি সালোঁতে ছবি দিচ্ছি নিছক ব্যাবসাগত করণে। সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমি আর

সময় নষ্ট করতে চাই না!

এই যে চমৎকার পোর্ট্রেটখানা দেখছ, এটা মাদাম সারপেতিয়ের, কী রকম গর্বিত মুখখানা, একবার দেখো! ইনি কে জানো? তখনকার দিনের বিখ্যাত প্রকাশক জর্জ সারপানতিয়ের স্ত্রী। এই মহিলা ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত হস্টেস, প্যারিসের সমাজের মধ্যমণি হতে চেয়েছিলেন। তুমি এই ধরনের ফরাসি রমনিদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ? এঁরা এঁদের বাড়ির বৈঠকখানায় বিখ্যাত সব লেখক-শিল্পীদের নিয়মিত আপ্যায়ন করতেন। ফরাসি দেশের একটা ট্র্যাডিশন। গরিব শিল্পী রেনোয়া ভিড়ে গেলেন এই উচ্চবিত্ত সমাজে, এই সব নারী-পুরুষদের মুখচ্ছবি এঁকে তাঁর অবস্থা খানিকটা ফিরল। তিনি ফ্যাশনেবল পোর্ট্রেট শিল্পী হিসেবে পরিচিত পেলেন, তবু অতৃপ্তি ছিল তাঁর মনে। এই সময় তিনি ঘুরে বেড়ালেন কিছুটা, দেখলেন আলজিরিয়া, ইতালি; আলজিরিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আঁকলেন বিরাট ক্যানভাসে 'আলজিরিয়ায় মুসলমান উৎসব' কিংবা 'আলজিরিয়ানদের সাজে ফরাসি রমণীরা'।

আমি জিগ্যেস করলাম, রেনোয়া যে এত নগ্ন নারীদের ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলোও বিক্রি হত না?

মার্গারিট হেসে ফেলে বলল, ফরাসিরা সবাই তো নগ্ন মেয়ে আঁকে। তাতে তার আলাদা আকর্ষণ কী আছে? ছবিটা কেমন, সেটাই বড় কথা। আসলে কী জানো, রেনোয়ার যখন চল্লিশ বছর বয়েস, তখন তিনি আলিন শারিগো নামে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। আমার মতে, সেই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেইসব নারী-প্রতিকৃতির মধ্যেই সত্যিকারের একটা আলাদা ব্যাপার আছে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর পরের দিকের অনেক ছবিতেই একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি। খুব বাচ্চা নয়, সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে। যেমন, 'বাগানে দুটি মেয়ে', 'তরুণী স্নানার্থিনী', কিংবা 'কিশোরী মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।' সব তো একই মডেল মনে হয়।

মার্গারিট বলল, মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়, নাকটা একটু বোঁচা, চোখ দুটো বেড়ালের মতন, কিন্তু মুখে কি স্বর্গীয় সারল্য, নগ্ন হলেও মনে হয়, এখনও জানে না কুমারীত্ব ভঙ্গ করা কী ব্যাপার। রেনোয়া অবশ্য পরে এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছিলেন।

আমি বললাম, মার্গারিট, তোমার নাক বোঁচা নয়, চোখ দুটো বেড়ালের মতন নয়, তবু এই মেয়েটির মুখের আভার সঙ্গে তোমার মুখের মিল আছে।

মার্গারিট আমার স্তুতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আমাকে যদি দু-চারদিনের মধ্যেই আমেরিকায় চলে যেতে হয়, তাহলে তোমাকে প্যারিস কিংবা ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গা কে দেখাবে?

আমি বললাম, তুমি চলে গেলে আমার তো এখানে আর থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আমিও ফিরে যাব।

মার্গারিট তবু অবুঝের মতন প্রশ্ন করল, কোথায় ফিরে যাবে?

আমি বললাম, আমার ফিরে যাওয়ার একমাত্র জায়গা আমার দেশে। তা ছাড়া আর কোথায় যাব বলো!

মার্গারিট বলল, কলকাতায়? আর আমি যাব আয়ওয়া-তে, মাঝখানে বিশাল দূরত্ব, আমি থাকব কী করে, সুনীল?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই বলেই আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, পিয়ের অগুস্ত রেনোয়া অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, তাই না? শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের ছবির সমাদর দেখে গিয়েছিলেন?

মার্গারিট পরে আছে একটা গোলাপি রঙের ড্রেস। বুকের কাছে ফ্রিল দেওয়া। শীত নেই বলে ও প্যান্টি হোস পরে না, নগ্ন পা। চুলগুলো যথারীতি এলোমেলো, দু' চোখে সব সময় পাখির মতো বিস্ময়।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে ও একটু সময় নিল। তারপর বলল, হ্যাঁ, রেনোয়া বেঁচে ছিলেন অনেকদিন, শেষ বয়সে ভোগ করেছেন খ্যাতি, সেই দর্জির ছেলে অনেক টাকা পয়সা পেয়েছিলেন, গাড়ি কিনেছিলেন সাউথ অফ ফ্রান্সে। কিন্তু কষ্টও পেয়েছেন খুব। একবার সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে আর্থারাইটিস আর প্রচণ্ড বাত হয়ে যায়। ডান হাত নাড়তে পারতেন না ভালো করে। কিন্তু ছবি আঁকার নেশা ছাড়তে পারেননি কিছুতেই। আঙুল অচল, তবু ডান হাতে একটা ব্রাশ বেঁধে নিয়ে আঁকতেন ছবি, যন্ত্রণায় তাঁর মুখ কুঁকড়ে যেত, তবু থামতেন না। একবার নাকি একজন কে বলেছিলেন, যথেষ্ট তো হয়েছে, অনেক ছবি রেখে যাচ্ছেন। এখন এত কষ্ট পাচ্ছেন, আর আঁকার কী দরকার? রেনোয়া এর উত্তরে বলেছিলেন, সব যন্ত্রণাই এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শিল্প থাকে।

দ্যাখো, তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে আঁকা স্নানার্থিনীদের আর একটা বড় ছবি। ১৯১৮ সালে, রেনোয়া তখন খুবই অসুস্থ, তাঁর ছেলে যুদ্ধে সাংঘাতিভাবে আহত হয়েছে, কিন্তু এই ছবিতে কি সেই সব কষ্টের কোনও চিহ্ন আছে?

একজন মাত্র শিল্পীর এই প্রদর্শনী আমরা দেখেছিলাম প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় ধরে। মাঝখানে একবার খাবার জন্য বেরিয়ে আবার ফিরে এসেছি। এইরকমভাবে যে প্রতিটি ছবির কাছে বারবার ফিরে আসতে হয়, তার ফলে সেই ছবি মনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়, তা আমার আগে জানা ছিল না। একটুও ক্লান্ত বোধ করিনি, সে কি মার্গারিটের সাহচর্যের জন্য? এ কথা ঠিক, একা হলে এতক্ষণ ধরে ছবি দেখার ধৈর্য আমার থাকত না।

মোট তিনদিন লুভ্‌র মিউজিয়ামে গেছি, কিন্তু আমি বিশ্ববিখ্যাত 'মোনালিসা' দেখিনি। অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য। মার্গারিট আমাকে দেখতে দেয়নি। যাবতীয় টুরিস্টরা লুভ্‌র মিউজিয়ামে এসেই 'মোনালিসা' দেখার জন্য পিঁপড়ের মতো সারি দিয়ে ছোটে, এটা মার্গারিট সহ্য করতে পারে না। 'মোনালিসা' ছবিটার ওপর ওর কোনও রাগ নেই, কিন্তু দর্শকদের এই গ্রাম্যপনা তার দু'চক্ষের বিষ। ইতালিয়ান ছবির অন্য ঘরগুলি ভালো করে না দেখলে কি লিওনার্দোর ওই একটি ছবির মর্ম বোঝা যায়? দূর থেকে কয়েকবারই দেখেছি, 'মোনালিসা' ছবির সামনেই সব সময় সাংঘাতিক ভিড়।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে খানিকবাদে আমরা গেলাম 'শেকসপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি' নামে বইয়ের দোকানটি দেখতে। তেমন বড় কিছু দোকান নয়, কিন্তু ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এখানে এক সময় আসতেন বিখ্যাত সব লেখকরা। শিল্পীদের মতনই এক সময় দেশ-বিদেশের লেখকরাও এসে জমায়েত হতেন প্যারিসে। লিখতেন অন্য ভাষায়, কিন্তু এই মোহময়ী নগরীর পরিমণ্ডল তাঁদের প্রেরণা জোগাত। শোনা যায়, এই দোকানে বসেই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে গার্ট্রুড বলেছিলেন, ইউ আর আ লস্ট জেনারেশান।

নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা নতরদাম গির্জার চাতালে এসে বসলাম। ঘড়িতে সন্ধে সাতটা, কিন্তু আকাশ ঝকঝকে নীল, গির্জার চূড়ায় যে বিশাল ঘণ্টাটি ধরে কোয়াসিমোদো দুলেছিল, সেটার ওপর ঠিকরে পড়েছে রোদ। এখানে শরৎকালে অন্ধকার বেশ দেরিতে নামে।

আমরা প্রতিদিনের আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু পশ্চিম দেশের এরা নির্মল আকাশ, রোদ-ঝলমলে দিন ও শীতহীন বাতাস পেলে ছেলেমানুষের মতন উল্লসিত হয়, সেই আনন্দ সারা শরীরে উপভোগ করে।

মার্গারিট বলল, এখন প্যারিসের দিনগুলো চমৎকার, এর মধ্যে আমেরিকা চলে যাওয়ার কোনও মানে হয়? আচ্ছা সুনীল, আমি যদি না যাই? একটা সেমেস্টার আমার পড়াশুনো আর পড়ানো বাদ দিলে কী হয়? তা হলে আমরা দুজনে আরও ভালো করে প্যারিস দেখতে পারব, তোমাকে নিয়ে নরমান্ডি যাব, লোয়ার নদীর উপত্যকার অনেক ভালো ভালো সাতো দেখাব।

আমি বললাম, তুমি একটা সেমেস্টার ছেড়ে দেবে? এই চার-পাঁচ মাস আমি ফ্রান্সে থাকব? টাকা পাব কোথায়?

মার্গারিট বলল, তোমার অত টাকার চিন্তা করবার দরকার কী? ও ঠিক জুটে যাবে। এমন সোনালি রোদের দিনগুলো ছেড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

আমি বললাম, আয়ওয়া-তে এই সময় ঝকঝকে রোদ পাবে।

মার্গারিট রেগে গিয়ে বলল, আমেরিকার রোদ আর প্যারিসের রোদ কি এক? এখানকার রোদের আলাদা রং, আলাদা গন্ধ, তুমি টের পাও না?

আমি সিগারেট ধরাবার ছলে খানিকটা সময় নিয়ে বললাম, ভালো কথা মনে পড়েছে। আচ্ছা মার্গারিট, সেদিন মোনিকের বাড়িতে রাত্তিরে আড্ডায় আমি জিগ্যেস করেছিলাম, সে যুগের কবি-সাহিত্যিকরা যে সব তরুণ শিল্পী পরীক্ষামূলক ছবি আঁকছে, স্টুডিও ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে, রঙের মধ্যে রং না মিশিয়ে উজ্জ্বলতা আনছে, তাদের সাহায্য করেছিলেন কি না। আমি ভিক্তর হুগো'র নাম করতেই পিয়ের হো-হো করে হেসে উঠল। তুমি আর মোনিক-ও হাসছিল। কেন? তোমরা ভিক্তর হুগোকে বড় লেখক মনে করো না?

মার্গারিট হেসে বলল, 'অবশ্যই যুগো খুব বড় লেখক। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ফরাসি সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু তুমি যে-সময়টার কথা বললে, সেই সময়টায় যুগো নানারকম পাগলামি করছিলেন। সে খুব মজার ব্যাপার।

কী ধরনের পাগলামি?

তখন ফোটোগ্রাফ চালু হয়ে গেছে। ভিক্তর যুগোর সেই সময়কার একটা ছবি পাওয়া যায়, চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বসে আছেন। তিনি নিজেই সেই ছবির তলায় ক্যাপশান লিখেছিলেন, 'ভিক্তর যুগো ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপরত'। তিনি খুব প্ল্যানচেট করতেন তা জানো? একবার নাকি স্বয়ং মৃত্যু এসে দেখা দিয়ে যুগো-কে একটা নতুন লেখার নির্দেশ দিয়েছিল। যুগো নিজেকে যিশুর মতন একজন অবতার বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ভয়ংকর আত্মম্ভরিতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, নিজেই নিজের নতুন নাম দিয়েছিলেন 'ওলিমপিয়ো'।

তুমি প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করো?

ধ্যাৎ, ওসব বাজে ব্যাপার। কোনও খাঁটি ক্যাথলিক এই সব হেরাসি মানতে পারে না। যুগোর তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওঁর ছেলে শার্ল হত মিডিয়াম, সে সাহিত্য-টাহিত্যর ধার ধারত না, কিন্তু প্ল্যানচেটের সময় সে নাকি গড় গড় করে যুগোর মতন নতুন কবিতা বলে যেত। এই প্ল্যানচেটের সময় শেক্সপিয়র আসতেন বারবার।

তাই নাকি? শেক্সপিয়র কী ভাষায় কথা বলতেন হুগোর সঙ্গে?

অবশ্যই ফরাসিতে। কারণ যুগো কিংবা শার্ল কেউই ইংরিজি জানত না। শেক্সপীয়র মৃত্যুর পর ফরাসি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন ধরে নিতে হবে।

শেক্সপিয়র সূক্ষ্ম শরীরে এসে এই ফরাসি লেখককে কী বলতেন, তার কোনও রেকর্ড আছে?

সেইটার জন্যই তো সবাই হাসে। শেক্সপিয়র এসে দারুণ প্রশংসা করতেন যুগো'র লেখার। একদিন বলেছিলেন, যুগোর নতুন লেখা পৃথিবীতে প্রকাশিত হলেই স্বর্গে সব লেখকরা সেই রচনা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহলী হয়ে পড়েন। শেক্সপিয়র সেটা পাঠ করেন জোরে জোরে, অন্যরা তাঁকে ঘিরে বসে শোনেন। একদিন দান্তে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রেমের বর্ণনা শুনে, ইসকিলাস আবেগে কাঁপছিলেন, আর সারভেনতিস আঙুল তুলে মলিয়ের-কে বলেছিলেন, এই, চুপ করো, শুনতে দাও! বুঝে দ্যাখো কাণ্ড। শেক্সপীয়র নাকি জানিয়েছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর পর ভিক্তর যুগোই সবচেয়ে বড় কবি।

বিখ্যাত লেখকদের খামখেয়ালিপনার গল্প শুনতে-শুনতে আমিও হাসতে লাগলাম।

হঠাৎ মার্গারিট জিগ্যেস করল, আচ্ছা সুনীল, তোমাদের কলকাতায় এই সময় ভালো রোদ ওঠে?

আমি বললাম, আমাদের দেশে আর যত কিছুরই অভাব থাকুক, রোদ্দুরের কোনও অভাব নেই। সারা বছরই রোদ।

আমি আমেরিকায় না গিয়ে, তোমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারি না?

তা কী করে হবে, মার্গারিট। তোমার পি-এইচ-ডি শেষ করবে না? তা ছাড়া কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তোমাকে রাখব কোথায়? আমি ফিরে যাচ্ছি বেকার অবস্থায়। এরপর কীভাবে খরচ চালাব তার কোনও ঠিক নেই। আমাদের বাড়িতে এমন জায়গাও নেই যে তোমার জন্য একটা ঘর দিতে পারব। না, মার্গারিট, আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমাকে বেশ একটা বিপদের মধ্যে ফেলা হবে।

ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল একটা ধাঁধার মতন। মার্গারিটের আমেরিকায় ফিরে যাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু ও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়, সেটা সম্ভব নয়। মার্গারিট একটা সেমেস্টার নষ্ট করে আরও চার-পাঁচ মাস কাটাতে চায় ফ্রান্সে, কিন্তু আমি অন্যদের গলগ্রহ হয়ে থাকব কী করে? মার্গারিটকে কলকাতায় নিয়ে আসাও একটা অবাস্তব ব্যাপার। তা হলে?

মার্গারিট নতমুখে নরম গলায় বলল, তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া খুব দরকার, তাই না?

আমি ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললাম, আমাকে তো কিছু একটা কাজ করতে হবে? বাংলা ভাষায় লেখালেখি ছাড়া আর আর কোনও কাজ যে আমার ভালো লাগে না। আর কোনও কাজ বোধহয় আমি পারবও না। তোমাকেও পি-এইচ-ডি শেষ করতেই হবে, এটা আমার আদেশ।

পরদিন আমরা প্রায় পাশাপাশি দুটি এয়ার লাইন্স অফিসে আমাদের টিকিট কনফার্মড করতে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, প্যান অ্যাম এবং এয়ার ফ্রান্স জানাল, দু-জায়গাতেই ঠিক পরের দিন একটা করে সিট খালি আছে, তার পরের দিন দশেকের মধ্যে মার্গারিট সিট পেলেও আমি পাব না। সুতরাং একই দিনে, কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমরা উড়ে যাব সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে, পৃথিবীর দুই প্রান্তে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা দেখতে গেলাম জাক তাতি'র একটা মজার সিনেমা। মঁসিয়ো হুলোর হলিডে। দুজনে খুব হাসলাম প্রাণ খুলে।

বিমানবন্দরে মার্গারিটের কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটির বর্ণনা আমি এখানে আর দিতে চাই না।

॥ ১৫ ॥

"ভুলব না আমি ফ্রান্সের সেই প্রিয় উদ্যানগুলি
ওরা যেন বহু প্রাচীন কালের ভোরে প্রার্থনা গান
নৈঃশব্দ্যের ধাঁধা সন্ধ্যার যাতনা কেমনে ভুলি
ছিল আমাদের যাত্রার পথে গোলাপ যে অফুরান..."

—**লুই আরাগঁ**

যাকে বলে জীবনযুদ্ধ কিংবা সংসারযাত্রার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা, তাতে আমি হাবুডুবু খেতে লাগলাম কলকাতায় ফিরে এসে। বিদেশে বসে আমি বাংলা লিখে নিজস্ব খরচ চালাবার একটা মরীচিকা দেখেছিলাম, এবার টের পাওয়া গেল, সেটা বড়ই নিষ্ঠুর মরীচিকা।

ফেরার পথে লন্ডন, জেনিভা, রোম ঘুরে আমি শেষ থেমেছিলাম কায়রোতে। ইতিহাস আমার বরাবরের প্রিয়, ভেবেছিলাম আর এ জন্মে কোনওদিন বিদেশে আসার সুযোগ হবে কি না কে জানে, মিশরের পিরামিড কয়েকটা দেখে যেতেই হবে। কায়রোতে চিনি না কারুকেই, তাতে কী আসে যায়, সুটকেস হাতে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে বার করেছিলাম একটা সস্তার হোটেল। স্ফিংক্স ও স্টেপ পিরামিড দেখার পর একদিন একলা উট ভাড়া করে মরুভূমির ওপর দিয়ে গিয়েছিলাম দূরের পিরামিডগুলো দেখতে।

একদিন পয়সা-কড়ি হিসেব করে দেখলাম, হোটেলের বিল মেটাবার পর আমার কাছে আর মাত্র দশ ডলার থাকবে। এরপর ডামাস্কাসে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তা আর হবে না। আমার প্লেনের টিকিটে যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন হবে কী দিয়ে? এবার তা হলে মুসাফির বাড়ি ফেরো।

যেদিন কলকাতা ছেড়ে গিয়েছিলাম, সেদিন তিরিশ-চল্লিশ জন বন্ধু গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। ফেরার সময় কারুকে খবর দিইনি, আমার জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় কেউ নেই। প্যান অ্যাম-এর বিমানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার মনে হল, একটা নতুন দেশে এসেছি।

ট্যাক্সি ধরার ঝামেলার দরকার কী। আমি একটা বাসে চড়ে চলে এলাম নাগের বাজার। সেখান থেকে একটা সাইকেল রিক্সায় বাড়ি।

ষাটের দশকের গোড়াতেও বিলেত-ফেরত লোকদের বেশ খাতির ছিল। তারা বাড়ির মধ্যেও প্যান্টের মধ্যে শার্ট গুঁজে পরে থাকত, দয়া করে বাংলা বললেও তা কেনসিংটনের অ্যাকসেন্টে, কেউ কেউ কাঁটা-চামচ দিয়ে ভাত ও মাছের ঝোল খেত। দৈবাৎ কোনও বিলেত-ফেরতকে যদি দেখা যেত যে হাত দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, তাহলে ভিড় জমিয়ে ফেলত পাড়ার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। প্লেন থেকে নেমে রিক্সা চেপে বাড়ি ফেরা কোনও বিলেত-ফেরতের পক্ষে ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। আমি মাত্র দিন পনেরো ইংল্যান্ডে ছিলাম, তবু বিলেত-ফেরত তো বটে, সেদিক দিয়ে আমি একটা রেকর্ড করেছি বলা যায়।

দুপুরবেলা মায়ের স্নেহ-মাখা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে, ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে সন্ধেবেলা প্যান্ট-শার্ট ও চটি পরে কফি হাউসে হাজির। তখন কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে ছিল আমাদের নিত্য আড্ডা। এই দল থেকে চ্যুত হয়ে আমিই প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলাম বলে অনেকেই আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল। হঠাৎ পাগলা দাশুর মতন আমার প্রত্যাবর্তনে অনেক যেন ভূত দেখেছিল। বন্ধুদের দলের মধ্যে শংকর আজ আর নেই বলেই তার কথা বেশি মনে পড়ে। শংকরই প্রথম উঠে এসে, তুই এসেছিস, বলে বিশালভাবে চেঁচিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে।

রাস্তায় ঘাটে চেনাশুনো লোকেরা দেখা হলে জিগ্যেস করত, কবে ফিরলে? আমি উত্তর দিতাম, গত কাল।...তিন দিন আগে...। গত সোমবার...। দিন দশেক কেটে যাওয়ার পর কেউ আর কিছু জিগ্যেস করে না, আমি ঝাঁকের কই, ঝাঁকে মিশে গেলাম। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যেক রাতে স্বপ্ন দেখতাম অদ্ভুত ধরনের। আমি কী যেন একটা অতি দরকারি জিনিস ফেলে এসেছি, সেটা আমার আনার জন্য চেপেছি আবার বিমানে। কিংবা আমি কোনও একটা অচেনা শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু মার্গারিটকে স্বপ্নে দেখিনি একবারও। দিনের বেলা প্রায় সর্বক্ষণ মার্গারিটের কথা মনে পড়ে, অথচ তাকে স্বপ্নে দেখি না। স্বপ্নের নিয়ম বোঝা দুষ্কর।

আমি চিঠি লেখার আগেই মার্গারিটের প্রথম চিঠি এসে গেল। পি-এইচ-ডি শেষ করার পরই মার্গারিট চলে আসবে কলকাতায়, তার আগে সে আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে একটা চাকরি নিয়ে

নেবে, মাইনে যতই কম হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। পল এঙ্গেল মার্গারিটকে জানিয়েছে, সুনীল ফিরে এলে তার জন্য এখনও সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্গারিট পল এঙ্গেলকে আমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিয়েছে যে, এমনভাবে ফিরে আসার জন্য সুনীল জোর করে দেশে চলে যায়নি। দেশে তার অনেক কাজ আছে।

পল এঙ্গেলকে আমি যা চিঠি লিখতাম, তা আসলে মিথ্যের ফুলঝুরি। পলকে আমি জানাতাম যে দেশে ফেরা মাত্র আমি দু-তিনটে কাগজ থেকে লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। টাকা দিচ্ছে বেশ ভালো, আমাদের কবিতার কাগজ দারুণ চলছে, তা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছি, তারা ভালো ফি দেয়, ইত্যাদি। আসল ব্যাপারটা হল, কেউ পাত্তাই দেয়নি আমাকে। তখন নকশাল আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ, চতুর্দিকে আমেরিকা-বিরোধী হাওয়া। আমি যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছি, তার কোনও গুরুত্ব নেই, আমি কেন আমেরিকা গিয়েছিলাম, সেই প্রশ্ন তুলে অনেকে চোখ রাঙায় (তাদের কেউ কেউ পরে বিলেত-আমেরিকায় পলায়ন করেছে, সেখানে অহংকার ও গ্লানির মিশ্র জীবন যাপন করছে)।

দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে অন্য দেশের কবিতা অনুবাদের সিরিজ চালাতে বলেছিলেন, বলতে গেলে প্রথম বছরে সেটাই ছিল আমার একমাত্র মরুদ্যান।

আমার অনুপস্থিতিতে কৃত্তিবাস পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শরৎকুমার ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু ও ভাস্কর দত্ত। ফিরে এসে আমি এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই পত্রিকা নিয়ে মেতে উঠলাম, কবিতা নিয়ে হইচই করাই ছিল আমার প্রধান সাধ। কিন্তু নিজের মা-ভাই-বোনদের সাহায্য করতেই দিশেহারা অবস্থা, এর মধ্যে পত্রিকা চালাবার অতিরিক্ত খরচ। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে গদ্য লেখা শুরু করতে হল। সংবাদপত্রের ফিচার। হাওড়া স্টেশনের ভিড়, পোষা বেড়াল, বাড়ির ঝিয়ের শিশু, হিটলারের ছবি আঁকার নেশা, বেনারস শহরের বুড়ি বিধবা ইত্যাদি কত বিষয়েই যে আমি লিখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। কিছু বন্ধু-বান্ধব ও বয়স্ক লেখক-শুভার্থীরা বলতেন, ওহে, খবরের কাগজে অত ফিচার লিখলে ভাষা খারাপ হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর কবিতা কিংবা গল্প-উপন্যাস লিখতে পারবে না। আমি বলতাম, দাঁড়ান, আগে খেয়ে তো বাঁচি, পত্রিকাটাকে বাঁচাই, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখা যাবে।

সন্তোষকুমার ঘোষ আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে একটা চাকরি দিয়ে দুর্গাপুরের প্রতিনিধি করে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। আমার মনে হয়েছিল, কলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরেই যদি যাব, তা হলে আমেরিকায় থাকলাম না কেন? আরও দু-একটা চাকরির প্রস্তাব এসেছিল। তখনও আমার দু-চারটে বিদেশি জামা-প্যান্ট ছিল, আমার বেগুনি গালে ছিল খানিকটা লাল ছোপ, সুতরাং বিদেশি ছাপওয়ালা দু-একটা অফিসে আমার চাকরির সুযোগ ছিল কিছুটা, কিন্তু আমি দাঁতে দাঁত চেপে চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অহংকার বজায় রেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর।

বাংলা লেখালেখির জন্য মূলত পয়সা পাওয়া যায় আনন্দবাজার থেকে। আমি তখন তিনখানা ছদ্মনাম সমেত মোট চারটি নামে লিখতাম। আমার কিছু বিদেশ ফেরার অভিজ্ঞতা আছে বলে সন্তোষকুমার ঘোষ কিছুদিন পর আমাকে আনন্দবাজারে 'দেশে দেশে' নামে একটি সাপ্তাহিক পৃষ্ঠা চালাবার ভার দিলেন। সেজন্য ওই অফিসে আমার জন্য একটা চেয়ার-টেবিলেরও ব্যবস্থা হল। বাইরের লোকের ধারণা, আমি আনন্দবাজারে তখন চাকরি করি, আসলে তা নয়, দিন আনি দিন খাই-এর মতন লিখলে টাকা, না লিখলে কিছুই না। এমনও হয়েছে, আমি 'দেশে দেশে'র পুরো পৃষ্ঠা লিখে ও পেজ মেকআপ করে বাড়ি চলে গেলাম, পরদিন দেখি সে জায়গায় বাটা কোম্পানির এক পাতা বিজ্ঞাপন, আমার ভাগ্যে লবডঙ্কা। এই ভাবে টানা পাঁচ বছর চালিয়েছি।

কিন্তু এসবও তুচ্ছ মনে হত। গায়ের জোরটাকেই মনে হতো মনের জোর। এই পথ আমি নিজে বেছে নিয়েছি, সুতরাং হার স্বীকার করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কেউ বেশি অপমান করলে আমার উপকারই করত আসলে, সেই রাত্রেই একটা কবিতা লিখে ফেলতাম। অপমান কিংবা অবজ্ঞা বরাবরই আমায় কবিতা লেখার প্রেরণা দিয়েছে।

মার্গারিটের দু-তিনটে চিঠি পেলে আমি উত্তর দিতাম একটা। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার আলস্যের কথা মার্গারিট জানত, সে বলেই দিয়েছিল, তোমাকে বেশি লিখতে হবে না। ওর পি-এইচ-ডি শেষ হল দু-বছরে, কিন্তু তারপরেই কলকাতায় আসা সম্ভব হল না। মাঝখানে ও একটা গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল, তাই একটা সেমেস্টার বাদ গেছে। শেষ বছরটায় ও অ্যাসিস্টেন্টশিপ না নিয়ে শুধু পড়াশুনো করেছে, সেজন্য অনেক ধার হয়ে গেছে, চাকরি করে সেই ধার শোধ না দিলে ওর পক্ষে আমেরিকা থেকে বেরুনো সম্ভব নয়।

আমার পরে মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্ত গেলেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার পরে শঙ্খ ঘোষ। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মার্গারিটের, আমার বন্ধুদের মার্গারিট তার বন্ধু করে নিয়েছিল।

এরপর কেটে গেল প্রায় তিন বছর। সময় ও দূরত্বে অনেক দৃঢ় বন্ধনই ক্রমশ আলগা হতে থাকে। মার্গারিটের কলকাতায় আসা হল না, তার জন্য বুক টনটন করে কখনও কখনও, আবার অনেক সময় তার কথা ভুলেও যাই। কলকাতার উত্তাল জীবনে আয়ওয়ার দিনগুলির স্মৃতি ক্রমশ ফিকে হতে থাকে।

এর মধ্যে ফরাসি জানা এক বাঙালি যুবতী, আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর এক ছাত্রী স্বাতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। কয়েক মাসের মধ্যেই আমার জীবন ঘুরে গেল অন্যদিকে।

আমি স্বাতীকে জানালাম মার্গারিটের সব কাহিনি। মার্গারিটকেও চিঠিতে জানালাম স্বাতীর কথা। ওরা পরস্পরকে চিঠি লেখা শুরু করল। মার্গারিটের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল গাঢ় বন্ধুত্বের, খানিকটা বিচিত্র বন্ধুত্ব মনে হতে পারে ঠিকই, আমরা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি গিয়েছিলাম, কিন্তু বিয়ে বা একনিষ্ঠতার প্রতিশ্রুতি কেউ কারুকে দিইনি। আমি মাঝে মাঝে ইয়ার্কির ছলে জানতে চাইতাম, ও কোনও খাঁটি ক্যাথলিক বন্ধু পেয়েছে কি না, যে ওর মা-বাবাকে খুশি করতে পারবে। মার্গারিট জানাত যে এখন ওর অনেক বন্ধু, কিন্তু একজনও সেরকম বন্ধু নেই।

আমাদের বিবাহের সময় মার্গারিট কলকাতায় আসবেই ঠিক করেছিল, কিন্তু এই সময় ওকে আয়ওয়া ছেড়ে অন্য একটি শহরে পড়াবার চাকরি নিয়ে যেতে হল। নতুন চাকরিতে ছুটি পাওয়া যায় না। মার্গারিটের প্রত্যেক চিঠিতে ফুটে ওঠে কলকাতার জন্য ব্যাকুলতা। এই শহর সম্পর্কে সে অনেক কিছু শুনেছে। এখানে এসে সে আমার বাড়ি দেখবে, স্বাতীর সঙ্গে ভাব করবে, কবির দলের সঙ্গে আড্ডা দেবে, কিন্তু ক্রমশই তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

. এক বছরের মধ্যে আমাদের পুত্র সন্তানের জন্মের খবর পেয়ে মার্গারিট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠি দিল, খামের মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দিল কিছু টাকা। সে টাকা আমাদের নিতেই হবে, কেন-না, মার্গারিট হয়েছে ওই ছেলের গড় মাদার, গির্জায় গিয়ে সে শিশুটির শুভ ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেছে।

এরপর মার্গারিট হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। তিন-চার মাস কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমি চিঠি দিয়েও কোনও উত্তর পাই না। একটা ক্রিসমাস পার হয়ে গেল, তবু মার্গারিটের কাছ থেকে কোনও কার্ড এল না দেখে আমি রীতিমতন চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মার্গারিট কাজে-কর্মে যতই ব্যস্ত হয়ে পড়ুক, কিংবা এর মধ্যে যদি কোনও যুবকের সঙ্গে তার সত্যিকারের প্রেম হয়েও থাকে, তাহলেও সে তার পুরোনো বন্ধুকে ক্রিসমাসের কার্ড পাঠাবে না, এ তো হতেই পারে না। চিঠি লিখতে ও খুব ভালোবাসে, এমনও হয়েছে যে আমি একই দিনে ওর দু-খানা খামের চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠিতে ও আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে বলে জানিয়েছিল, তারপর

কী হল?

মার্গারিটের খবর জানবার জন্য আমি পল এঙ্গেলকে চিঠি দিলাম। মার্গারিট কখনও পল এঙ্গেলের ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়নি, তবু পল এঙ্গেল তাকে ভালোই চিনতেন। পল এঙ্গেল উত্তরে আমাকে আয়ওয়া সম্পর্কে অনেক খবর দিলেন, কিন্তু তাতে মার্গারিটের নাম একেবারে উহ্য।

তবে কি মার্গারিট কোনও কারণে আমেরিকা ছেড়ে ফ্রান্সে ফিরে গেছে। মোনিকের নতুন বাড়ির ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু মার্গারিটের গ্রামের বাড়ির ঠিকানা আমার কাছে লেখা আছে। খুব বিনীতভাবে মার্গারিটের বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম, তাঁর মেয়ে এখন কোথায় আছে সেটুকু জানতে চেয়ে। কিছুদিনের মধ্যেও উত্তর না পেয়ে মনে হল, ওঁর বাবা-মা বোধহয় ইংরেজি বোঝেন না। তখন আমার ফরাসি ভাষাবিদ বন্ধু বুদ্ধাকে দিয়ে চিঠিখানা অনুবাদ করে পাঠালাম আবার। এবারেও কোনও উত্তর নেই।

মার্গারিটের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সমস্ত সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

মার্গারিট আমাকে ভুলে গেছে মনে করে অভিমান হত মাঝে মাঝে, আবার ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হত না। মার্গারিটের মতন মেয়ে কোনও বন্ধুকে এমনভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না।

ততদিনে গদ্য ফিচার লিখতে-লিখতে আমাকে গল্প-উপন্যাসের জগতেও বাধ্য হয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। লেখালেখির ব্যস্ততা, তুমুল আড্ডা এবং যখন তখন কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার মধ্যে অভিমান কিংবা মন খারাপেরই বা সময় কোথায়? কখনও পঞ্চাশ-একশো টাকা জুটলেই চলে যাই বন-জঙ্গলে, শক্তির সঙ্গে, সন্দীপনের সঙ্গে, শরৎকুমারের সঙ্গে। একবার শেলপাহাড়ির এক কাঠ গুদামের মধ্যে রাত্তিরে খোলা আকাশের নীচে একটা খাটিয়ায় আর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে শুয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয়েছিল, আমেরিকায় আমি গাড়ি চালানো শিখছিলাম, আর একটু হলেই গাড়িটা কিনে ফেলতে হত, তারপর গাড়ির সঙ্গে বাড়ি কিনে আমি ওদেশেই যদি থেকে যেতাম, তা হলে জীবনটা কি এর চেয়ে ভালো কাটত? নাঃ, কিচ্ছু আসে যায় না, বেশ আছি!

ফরাসি ভাষা যেটুকু শিখেছিলাম, তাও ভুলে যেতে লাগলাম আস্তে-আস্তে। মার্গারিট আমাকে একটা ছোট তেরঙা ফরাসি পতাকা দিয়েছিল, সেটা শুধু অনেকদিন রেখে দিয়েছিলাম আমার পড়ার টেবিলে। পশ্চিমি জগতে আর কোনওদিনও আমার যাবার সম্ভবনা ছিল না। তখন বিদেশ বলতে আমার দৌড় নেপাল ও বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ যুদ্ধের বছরে গিন্‌সবার্গ একবার কলকাতা ঘুরে গেল। আগে থেকে চিঠিপত্র না লিখে সে হঠাৎ আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে হাজির। বাড়িতে তখন আর কেউ নেই, শুধু আমাদের রাঁধুনি গোপালের মা ছাড়া। অ্যালেন তাকেই আমার মা ভেবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় গোপালের মা সারাদিন ধরে হেসে-কেঁদে অস্থির। একমুখ দাঁড়ি ভর্তি সেই গৌরবর্ণ পুরুষটিকে গোপালের মা মনে করেছিল কোনও দেবতা।

অ্যালেনকে আমি নিয়ে গেলাম সীমান্তের শরণার্থীদের দুর্দশা দেখাতে। সে বছর বন্যা হয়েছিল এমন যে যশোর রোড ডুবে গিয়েছিল অনেকটা। গাড়ি ছেড়ে আমরা নৌকো করে গিয়েছিলাম বনগাঁ পেরিয়ে। তারপরেই অ্যালেন লেখে তার বিখ্যাত কবিতা, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। তার কয়েকটা লাইন এরকম :

> Millions of souls nineteen seventy one
> Homeless on Jessore Road under gray sun
> A million are dead, the millions who can
> Walk toward Calcutta from East Pakistan...

Wet Processions families walk
Stunted boys big heads don't talk
Look bony skulls & silent round eyes
starving balck angels in human disguise...

অ্যালেন এই দীর্ঘ কবিতাটিতে সুর দিয়ে গান করেছিল ফিরে গিয়ে। তার বন্ধু বব ডিলান ও অন্যান্য বিখ্যাত গায়করা অনেক টাকা চাঁদা তুলেছিল এই শরণার্থীদের জন্য।

কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় অ্যালেন আমাকে জিগ্যেস করেছিল, তুমি আর নিউ ইয়র্ক আসবে না?

আমি বলেছিলাম, পাগল নাকি! পয়সা কোথায় পাব? তোমার বাড়িতে থাকার জায়গা দিলেও প্লেন ভাড়ার অত টাকা আমায় কে দেবে? আমার এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মতন অবস্থা।

তখন আর ইউরোপ-আমেরিকা ফিরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেও আমার হয়নি।

অ্যালেন চিনত না মার্গারিটকে, সুতরাং তার কাছে ও প্রসঙ্গও তুলিনি।

আরও কয়েক বছর পর পল এঙ্গেল আবার এলেন কলকাতায়। সস্ত্রীক, কিন্তু এ স্ত্রী অন্য। মেরির সঙ্গে ইতিমধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে, দুঃখে, অভিমানে মেরি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সে কথা শুনেই আমার মধ্যে অপরাধ বোধ জাগল। মেরি আমাকে মাতৃবৎ স্নেহ করতেন, দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা না পেলে আমার রোম-ইজিপ্ট দেখাই হত না, তবু মেরির সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখিনি, একখানার বেশি চিঠি লিখিনি।

পল এঙ্গেলের দ্বিতীয়া স্ত্রী বেশ সুন্দরী, মধ্যবয়স্কা এক চিনা রমণী। হুয়া লিং একজন বিশিষ্ট লেখিকাও বটে, আধুনিক চিনা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ স্থান আছে। হুয়া লিং আগে ছিলেন তাইওয়ানের মেয়ে, পরে মেইন ল্যান্ড চায়নার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তখন কিসিংগার-নিকশনের তৎপরতায় এবং চৌ-এন লাইয়ের ব্যগ্রতায় আমেরিকার সঙ্গে চিনের বেশ দহরম মহরম শুরু হয়ে গেছে, চলছে ব্যাবসা-বাণিজ্য, টুরিস্ট ও সাংস্কৃতিক বিনিময়। পল এঙ্গেল কলকাতায় এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু তাঁর আসল গন্তব্য বেইজিং-এর দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি।

পল এঙ্গেলের বয়েস তখন সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু বয়েস তাকে স্পর্শ করেনি। তাঁর চোখ-মুখ নব বিবাহিত যুবকের মতন উদ্ভাসিত, আর হুয়া লিং-এর আগের পক্ষের দুটি বড় বড় সন্তান থাকলেও তাঁকে তরুণী বলে মনে হয়।

দমদম এয়ারপোর্টে জ্যোর্তিময় দত্ত অনেক বাজি পুড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এই দম্পতিকে। পল মহা উৎসাহে তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে লাগলেন, কলকাতা কত গ্রেট সিটি, এখানেই জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্রনাথের সেই 'সমাধি-স্থানটিতে' গতবার গিয়েছিলাম, মনে আছে, গঙ্গা নদীর কী অপূর্ব রূপ। হুয়া লিংকে এই সব দেখতে হবে! হুয়া লিং চিনে হলেও জীবনে এই প্রথম রিকশা দেখবে।

নানান গল্পের ফাঁকে প্রথম একটু সুযোগ পেয়েই আমি ওঁকে নিভৃতে জিগ্যেস করলাম, পল, তুমি কি মার্গারিট ম্যাথিউ নামে মেয়েটির কোনও খবর জানো? ওকে তোমার মনে আছে?

চিঠিতে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন পল এঙ্গেল, কিন্তু আমার সামনাসামনি মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না। আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, জানি।

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে তার? আমার চিঠির উত্তর দেয় না, সে এখন কোথায় আছে?

পল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, সামথিং হ্যাজ হ্যাপন্ড। সে ঘটনা তোমার না শোনাই ভালো, সুনীল, তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে কিছু জানাইনি।

॥ ১৬ ॥

"হে বন্ধু, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব—কেইসড্রাট গাছের নীচে
জলপোতের অধিপতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি
অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সূর্য ডুবে গেলে
ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে
...সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন?

—লেওপোল্ড সেঙ্ঘর

ছিল একটা রুমাল, হয়ে গেল একটা বিড়াল।

ছিল একজন বাসনা-লঘু তরুণ কবি, হয়ে গেল এক উপন্যাস লেখক। শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস, ধারাবাহিক উপন্যাস। গদ্য লেখা একবার শুরু করলে যেন পায়ের তলায় রোলার স্কেটার লেগে যায়, থামার উপায় নেই।

সেই বিদেশ থেকে ফেরার পর এক যুগ কেটে গেছে। তারপর হঠাৎ আবার একবার প্যারিস নগরী, যেন নদীর স্রোতে রূপালি মাছের মতন, আমার চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল!

তখন আমি পুরোপুরি ভেতো বাঙালি হয়ে গেছি। বিশ্ব ভ্রমণের শখ মেটাই অন্য লেখকদের ভ্রমণ-কাহিনি পাঠ করে এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার পাতা উলটে। অনেকে বলে, বর্তমানের তুলনায় সদ্য অতীত কিংবা যে-কোনও অতীতের দিনগুলোই ভালো ছিল। কিন্তু আমার মতে এখনকার তুলনায় সপ্তম দশকটি ছিল খুবই দুর্যোগপূর্ণ, খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কোনওক্রমে পার হয়ে এসেছি।

সেইরকমই একটি দিনে, আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা গণেশ নাগ একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। অফিসের কোনও কাজে গণেশবাবুর সঙ্গে আমার কখনও কোনও কথা হয়নি, তার দরকারও হয়নি, তবে অফিসের বাইরে অনেক নেমন্তন্নে ও আড্ডায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, গল্প-গুজব হয়েছে, এক সঙ্গে তাসও খেলেছি। তিনি সজ্জন, বন্ধুবৎসল। বাঙালিদের মধ্যে কে কতখানি মাছের ভক্ত, তা নিয়ে যদি কখনও কোনও প্রতিযোগিতা হয়, তাহলে গণেশ নাগ নিশ্চিত প্রথম স্থান অধিকার করবেন। একবার ডায়মন্ডহারবার গিয়ে তিনি বত্রিশটা ইলিশ মাছ কিনেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিলোবার জন্য। আর একবার ঢাকা থেকে প্লেনে ফেরার সময় তিনি হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে ভরে এনেছিলেন কই মাছ।

নিজের চেম্বারে তিনি গোপন কথার ভঙ্গিতে বললেন, সুনীলবাবু, আপনি প্যারিস যাবেন?

আমি হকচকিয়ে গেলাম একেবারে। এমন প্রস্তাব গণেশবাবু দেবেন, ভাবতেই পারা যায় না। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কর্তা হঠাৎ আমাকে প্যারিস পাঠাতে চাইবেন কেন?

আরও রহস্য করে তিনি বললেন, আপনি যদি প্যারিসে কোনও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হলে আপনাকে আমি বিনা ভাড়ায় ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।

তখনই আমার মনে হল, কয়েক মাস আগের ঘটনা। সেদিন দুপুরে অফিসে আমার টেবিলে বসে আছি। এমন সময় এক লম্বা মতন, অপরিচিত যুবকের প্রবেশ। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথার

চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখখানা খানিকটা গাম্ভীর্য মাখানো। হাত তুলে বললেন, নমস্কার, আমার নাম অসীমকুমার রায়, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

এরকম অনেকেই আসে, আমি বলেছিলাম, বসুন, আপনি কোনও লেখা দেবেন তো?

অসীমকুমার রায় বললেন, না, আমি লেখা দিতে আসিনি। অসীম রায় নামে অন্য একজন লেখক আছে আমি জানি। আপনার সঙ্গে শুধু আলাপ করতেই এসেছি। আমি প্যারিসে থাকি, ওখানে আমার একটা বাড়ি আছে। আপনাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছি, একবার চলে আসুন না ওদিকে, আমার বাড়িতে কিছুদিন থেকে যাবেন।

আমি বললাম, থাকায় জায়গা তো দিতে চাইছেন, কিন্তু প্যারিস যাওয়া কি মুখের কথা! ভাড়া জুটবে কোথা থেকে।

অসীম রায় বললেন, চেষ্টা করলেই যাওয়া যায়। লেখকদের তো ভ্রমণের নেশা থাকে। তা ছাড়া, বাঙালি লেখকদের পশ্চিম জগৎটা একবার ঘুরে দেখে আসা উচিত। ওদিকটার লেখকরা পৃথিবীর কত বিচিত্র জায়গায় যায়, ওদের লেখার জগতটাও সেজন্য অনেক বিস্তৃত হয়।

আমি বললাম, তারা তো আর বাংলা ভাষায় লেখে না। বাঙালি লেখকদের সংসার চালাতেই হিমসিম খাওয়ার মতন অবস্থা। এদেশে লেখকদের সাহায্য করার মতন কোনও ফাউন্ডেশনও নেই।

অসীম রায়ের সঙ্গে আরও নানা বিষয়ে গল্প হল। যুবকটি বহু বছর প্রবাসী। পেশায় টেলিফোন-বিশারদ, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি টান-ভালোবাসা আছে। প্যারিসে কিছু বন্ধু-বান্ধবী মিলে বাঙালি ক্লাব করেছেন। তাদের একটি বাংলা বইয়ের লাইব্রেরিও আছে। সে বইগুলি থাকে অসীম রায়েরই বাড়িতে।

আমি যে এক সময় প্যারিসের রাস্তা পায়ে হেঁটে চষে বেড়িয়েছি, তার উল্লেখ করলাম না একবারও। অনেককাল আগের কথা। বলেই বা লাভ কী?

বিদায় নেওয়ার সময় অসীম রায় তার ঠিকানা রেখে বলে গেলেন, আমার নেমন্তন্নটা মনে রাখবেন, কখনও প্যারিসে গেলে আমার বাড়িতে উঠবেন।

গণেশ নাগের প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, এ তো ভারী আশ্চর্য যোগাযোগ। গণেশবাবু বলছেন, তিনি বিনা ভাড়ায় আমায় প্যারিস পাঠাবেন। আর অসীম রায়ের বাড়িতে বিনা খরচ থাকা যাবে। তা হলে তো আর কোনও সমস্যা নেই। এক্ষুনি যেতে চাই।

বিনা ভাড়ায় প্যারিস যাওয়ার রহস্যটা গণেশবাবু একটু পরে ভেঙে বুঝিয়ে দিলেন।

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বড় বড় উড়ো জাহাজগুলো কেনা হয় ফ্রান্স থেকে। সেই সব এয়ার বাস এক বছর দু-বছর অন্তর প্যারিসে পাঠাতে হয় সংস্কারের জন্য। সেরকমই একটি এয়ার বাস শিগগির যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী এই ধরনের ফ্লাইটে টিকিট-কাটা যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু এয়ার লাইনসের কর্মী বা অতিথিরা যেতে পারে। সেইজন্য ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস ঠিক করেছে, কিছু গায়ক-শিল্পী-লেখকদের নিয়ে যাবে, দিন পনেরো পরে ফিরিয়ে আনবে।

গণেশ নাগের দাদা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একজন খুব উঁচু অফিসার। তিনি আমাকে ওই দলটির অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারেন।

সেদিন প্রায় হাওয়ায় উড়তে-উড়তে বাড়ি ফিরলাম। গণেশবাবু বলেছেন, ইচ্ছে করলে আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে পারি। সুতরাং খবরটা এক্ষুনি স্বাতীকে জানানো দরকার।

আমি তো শুধু বাঙালি নই, খাঁটি বাঙাল, গরম ভাত, ডাল আর বেগুন ভাজা আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। স্বাতী ভালোবেসে স্যান্ডুইচ। কাঁচা স্যালাড কোনওদিনই আমার পছন্দ নয়, স্বাতীর বিশেষ প্রিয়। স্বাতী ইলিশ মাছে আঁশটে গন্ধ পায়, আদর করে পুডিং খায়। আমি মিষ্টি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ভাগ্যিস সে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বিভূতিভূষণের লেখা বিশেষ ভালোবাসে, না হলে এ মেয়ের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা কি আমার পক্ষে সম্ভব হত?

স্বাতী প্রায়ই বলে যে আগের জন্মে ও ফরাসি ছিল। কলেজ জীবনে সে পয়সা জমিয়ে ফরাসি শিল্পীদের ছবির বই কিনেছে, শখ করে ফরাসি ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ভরতি হয়েছে। আমার মুখে আমেরিকা ভ্রমণের গল্প শুনে ও বলত, আমেরিকায় আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় সব কিছুই বড্ড বড় বড়, কিন্তু একবার ইউরোপ যেতে খুব ইচ্ছে করে, বিশেষ করে ফ্রান্সে। আমি মাঝে মাঝে প্যারিসের স্বপ্ন দেখি।

ওর স্বপ্নকে সম্ভব করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। কিছুদিন আগে আমরা বাংলাদেশ ঘুরে এসেছি, তাই দু জনেরই পাসপোর্ট চালু আছে। আর কোনও অসুবিধেই নেই।

আগেকার দিনের গল্প-উপন্যাসে প্রায়ই এরকম একটি লাইন থাকত, 'তখন নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিলেন।' আনন্দবাজারে গণেশবাবু যখন প্রস্তাবটি দেন, তখন তাঁর চেম্বারের দরজায় কান দিয়ে নিয়তিদেবী নিশ্চিত খিলখিল করে অনেকটা হেসে নিয়েছিলেন। আমার জীবনে যেমন অকস্মাৎ কিছু কিছু সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে, তেমনি ভাগ্যের অনেক ঠাট্টা-মস্করাও সহ্য করতে হয়েছে আমাকে।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সেই খালি জাহাজে জায়গা পাওয়ার জন্য গোপনে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। উৎসাহী হয়ে উঠলেন সরকারি আমলারা। তারপর রাজনীতির নেতারা। এ কালে নেতাদেরই গায়ের জোর বেশি, তাঁরা ধাক্কা দিয়ে অন্যদের ঠেলে ফেলে দিতে লাগলেন। তারপর নেতাদের সংখ্যাও এত বেশি হয়ে গেল যে তাঁরা ধাক্কাধাক্কি করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। বিনা পয়সায় প্যারিস ঘোরার অনেক ক্যান্ডিডেট।

এই বিষয় নিয়ে হঠাৎ একদিন পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠে গেল। সব শুনেটুনে ইন্দিরা গান্ধী রাগ করে বললেন, কারুকেই নিতে হবে না। উড়োজাহাজ খালিই যাবে প্যারিসে।

সব ব্যাপারটাই যেন শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্নের মতন।

এরপর আবার কেটে গেল বছর দেড়েক।

একদিন শুনতে পেলাম আমাদের সহকর্মী ও লেখক বন্ধু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আমেরিকা যাচ্ছেন। এবং আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সিরাজের কাছ থেকে সব বৃত্তান্তটা জানা গেল। তিনি যাচ্ছেন পল এঙ্গেলেরই আমন্ত্রণে। তবে সেখানকার রাইটার্স ওয়ার্কশপ এখন অনেক বিস্তৃত ও নিয়ম-কানুনবদ্ধ হয়েছে। আগেকার মতন পল এঙ্গেল নিজে আর বিশ্বময় ঘুরে-ঘুরে লেখক নির্বাচন করেন না। এখন বিভিন্ন দেশের মার্কিন দূতাবাস এক একজন লেখককে পাঠান। সিরাজ এবার সেই সুযোগ পেয়েছেন। আমি খুব খুশি হয়ে সিরাজকে আমার অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনালাম কিছু কিছু।

পল এঙ্গেল আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলেন অনেক দিন। আমারই উত্তর দেওয়া হয়ে উঠত না। একেই চিঠি লেখাতে আমার খুব আলস্য, তাও আবার ইংরিজিতে। সিরাজ আয়ওয়াতে গেলে পল নিশ্চয়ই তাঁকে জিগ্যেস করবেন আমার কথা, সেইজন্য আমি দ্রুত খসখস করে কয়েক লাইনের একটা চিঠি লিখে দিয়ে দিলাম সিরাজের হাতে।

সেই ছোট্ট চিঠির একটা মস্ত বড় উত্তর এল। পল এঙ্গেল চিঠি লেখার জন্য বিখ্যাত। লাইফ ম্যাগাজিনে একবার তাঁর এক ইন্টারভিউতে পড়েছিলাম। তিনি বছরে তিন হাজারের বেশি চিঠি লেখেন। সবই নিজের হাতে টাইপ করা। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। পল ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমার ব্যক্তিগত খবরাখবর জানতে চেয়েছেন। তারপর একটা আমন্ত্রণ। সুনীল, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। তুমি আর একবার চলে এসো আয়ওয়াতে। সস্ত্রীক এসো। যদি কোনওক্রমে চলে আসতে পার, এখানে তোমাকে তিন-চার মাসের জন্য রেখে দেব। তোমার থাকা-খাওয়া নিয়ে কোনও চিন্তা করতে হবে না।

এই আমন্ত্রণ সরকারি নয়, ফর্মাল নয়, পল এঙ্গেলের ব্যক্তিগত। তিনি আয়ওয়াতে আমাকে

আতিথ্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু যেতে হবে নিজের উদ্যোগে। অত ভাড়ার টাকা পাব কোথায়? মার্কিন দূতাবাস আমাকে সাহায্য করবে না।

তখন আমি একটি উপন্যাস লেখার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রচুর ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বইটি শেষ করার পর মনে হয়েছিল, আর এক বছর কিছু লিখব না। কিন্তু কলকাতায় থাকলে কিছু না কিছু লিখে যেতেই হবে। একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। আমেরিকার মতন খরচের দেশে তিন-চার মাসের আতিথ্য পাওয়ার প্রলোভনও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আমেরিকার টিকিট কাটলে ইউরোপে থেমে যাওয়া যায়। এর আগে স্বাতীকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করতে পারিনি। নিজের স্ত্রীর কাছে হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করারও এই এক সুযোগ। অসীম রায়ের ঠিকানাটা এখনও হারাইনি।

আবার গেলাম গণেশ নাগ-এর কাছে। বললাম, সেবারে আপনি আমাকে বিনা ভাড়ায় প্যারিস পাঠাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, সেটা শেষ পর্যন্ত হল না। এবারে আমি নিজেই প্যারিস যেতে চাই, আপনাকে ভাড়ার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

গণেশ নাগ তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে অফিস থেকে আমার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন, খুব সুবিধেজনক শর্তে, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে শোধ দিলেই চলবে।

ঠিক সতেরো বছর পর, দ্বিতীয়বার আমি ফিরে এলাম প্যারিসে। যেন অন্য একজন মানুষ। বয়েস বেড়েছে, চেহারা বদলে গেছে। প্লেনের যাত্রীরাও অন্যরকম। সেই ষাটের দশকে পশ্চিম আকাশের বিমানে ভারতীয় দেখা যেত কদাচিৎ। এখন সর্বত্র ভারতীয়। সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশের ফলে এখন যে-কোনও ভারতীয়ই পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকারী। ফরেন এক্সচেঞ্জের কড়াকড়িও হ্রাস হয়েছে। আগেকার দিনে ভারত মাতা তাঁর সন্তানদের মাত্র আটটি ডলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদেশে পাঠাতেন, এখন পাঁচশো কুড়ি ডলার অনায়াসে নেওয়া যায়; তাই ইওরোপ-আমেরিকা যাওয়া এখন অনেকের কাছে জলভাত। আমি আর স্বাতী যাচ্ছি শুনে শিবাজী রায় নামে আমাদের এক প্রতিবেশি যুবক সঙ্গী হতে চাইল, সে পাসপোর্ট ভিসা ফরেন এক্সচেঞ্জ পেয়ে গেল ঝটাপট। আর সেই ষাটের দশকে শুধু পাসপোর্ট বার করতেই জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল আমার।

অসীম রায়ের কথাবার্তার ধরনটি একটু রুক্ষ ও চাঁছাছোলা। মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে যায়। আগেরবার আমি নেমেছিলাম ওর্লি বিমান বন্দরে, এখন শার্ল দ্যগলের নামে বিশাল নতুন বিমান বন্দর হয়েছে। সেখান থেকে অসীম রায়ের বাড়ি বেশ দূরে। গাড়ি করে সে আমাদের নিয়ে গেল; বাড়িতে পৌঁছোবার একটু পরেই বলল, শুনুন, একটা ব্যাপার আগেই পরিষ্কার করে দিই আপনাদের কাছে। আমার বাড়িতে এসেছেন বলেই যেন ভাববেন না, আমি আপনাদের রান্না করে খাওয়াব, আপনাদের বাসন মাজব! দেশের লোকেরা নিজেরা কিছু কাজ করে না, ঝি-চাকরদের খাটায়, এখানে এসেও মনে করে সেরকম সব কিছুই অন্যরা করে দেবে। আপনাদের রান্না ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, কী করে গ্যাস জ্বালাতে হয় বুঝিয়ে দিচ্ছি, নিজেদের সব কিছু করে নিতে হবে।

আমরা সদলবলে তার সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুকে একটি নাতিক্ষুদ্র লেকচার শুনলাম। আমি যে পুরো একটি বছর আমেরিকায় ছিলাম, এই রকম চার উনুনের গ্যাস স্টোভে নিজের হাতে রান্না করে খেয়েছি, সে অভিজ্ঞতার কোনও মূল্যই দিল না সে। তার সামনে গ্যাস জ্বালানো ও নেভানোর পরীক্ষা দিয়ে দেখাতে হল।

রান্নাঘর পর্ব শেষ করার পর সে বসবার ঘরে এসে আমার হাতে তুলে দিল একটি টুরিস্ট গাইড বই এবং একটি মেট্রো ট্রেনের শাখা-প্রশাখার মানচিত্র। তারপর তার দ্বিতীয় লেকচার। তাকে প্রত্যেকদিন অফিস যেতে হবে, সন্ধের পর সে ক্লান্ত থাকে, সুতরাং সে আমাদের প্যারিস ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে না একেবারেই। ঘুরতে হবে নিজেদেরই। এইভাবে মেট্রোর টিকিট কাটতে হয়, সাতদিনের টিকিট একসঙ্গে কাটলে অনেক সস্তা হয়, কোথায় কোথায় ট্রেন বদল করতে হয়, ইত্যাদি।

তারপর সে শুরু করল এক গল্প। কিছুদিন আগেই একজন বিখ্যাত, প্রবীণ বাঙালি লেখক এসেছিলেন প্যারিসে, তিনি নানা রকম ছেলেমানুষি আবদার করে এখানকার বাঙালিদের জ্বালিয়ে গেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত রাগ করে একজন কেউ তাকে কোনও হোটেলে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল...।

আমি ও স্বাতী ত্রস্তভাবে চোখাচোখি করলাম। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা! এই লোকটি তো আমাদের নেমন্তন্ন করেছিল, চিঠিতেও অনেক উৎসাহ দেখিয়েছে। এখন যেন মনে হচ্ছে আমরা ওর কাঁধের ওপর বোঝা হয়ে পড়েছি!

পরদিন সকালে কিন্তু আমরা জাগবার আগেই অসীম রায় চা বানিয়ে আমাদের ডেকে তুলল। একটু পরে ব্রেকফাস্টেরও ব্যবস্থা করে ফেলল সে। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে সে আমাদের সারাদিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনে বলল, চলুন, আপনাদের অন্য একটা জায়গা দেখিয়ে আনি। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করল তক্ষুনি।

দু-তিন দিন পরেই বোঝা গেল, সে আমাদের রান্না করেও খাওয়াবে, নিজের গাড়িতে নানা জায়গায় নিয়েও যাবে, কিন্তু তার ভাবখানা এই, তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করা চলবে না। একটা বেশ গেরেমভারি ভঙ্গি নিয়ে থাকতে সে খুব পছন্দ করে। এই ব্যাপারটা বুঝে যাওয়ার ফলে তার সঙ্গে ওঠা-বসা করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

অসীম রায় বিবাহ করেনি, প্যারিস শহরের প্রান্তে তার নিজস্ব একটি দোতলা বাড়ি, দেশ থেকে অনেকেই গিয়ে তার ওখানে ওঠে। এই সব অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ খুবই অবুঝ। বিদেশের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যাদের কোনও ধারণা নেই, তাদেরও কিছুটা অন্তত খোঁজখবর নিয়ে যাওয়া উচিত। এ তো সবারই জানার কথা যে ওসব দেশ থেকে ঝি-চাকর প্রথা উঠে গেছে। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার করা, এ সবই করতে হয় নিজেদের। সুতরাং অতিথিদেরও তাতে অংশ নিতে হবে সমানভাবে। নইলে গৃহস্বামী যে অতিথিদের গৃহভৃত্য হয়ে যায়। ওখানে সারা সপ্তাহ যন্ত্রের মতন খাটতে হয়। যখন তখন ছুটি নেওয়ার কোনও উপায় নেই, তবু অনেকে আশা করে, যিনি আতিথ্য দিয়েছেন, তিনিই তাদের সর্বক্ষণের ভ্রমণ গাইড হবেন। কোনও এক ধনী-দুলাল নাকি নিজের গেঞ্জি-আন্ডারওয়্যার বাথরুমে ফেলে রেখে যেত, তার ধারণা, অসীম রায় ওগুলো কেচে দেবে!

প্রথমবার যখন আসি, তখন প্যারিসে একজনও বাঙালিকে চিনতাম না। এখন পেয়ে গেলাম বেশ কয়েকজনকে। বিপ্লবী বাঘা যতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেশে থাকতেই দেখা হয়েছিল। আমাদের কফি হাউসের এক কালের বন্ধু, কবি ও শিল্প সমালোচক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এক ফরাসি রমণীর পাণিগ্রহণ করে এখানে থাকেন; অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না তার সঙ্গে, এবার দেখা হল। দেশ পত্রিকার নিয়মিত লেখেন প্রীতি সান্যাল, তাঁর স্বামী বিকাশ সান্যাল ইউনেস্কোর শিক্ষা বিভাগের এক হোমরা-চোমরা, দুজনেই খুব আড্ডা-প্রিয়। শিল্পী শক্তি বর্মণ এখানে রয়েছেন বহুকাল; এসেছেন তরুণ শিল্পী সম্বিৎ সেনগুপ্ত। অসীম রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূপেশ দাস একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, তিনি কথাবার্তা বলেন কম, কিন্তু প্রতিটি মন্তব্যই সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত। আর শুভেন্দু চৌধুরী সব সময়েই নিঃশব্দ শ্রোতা। আমরা সারাদিন প্যারিস শহরে ঘুরে বেড়াই, সন্ধের পর অসীমের বাড়ি কিংবা অন্য কারুর বাড়ি খাওয়া দাওয়া ও আড্ডা বসে।

প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়েই স্বাতী জিগ্যেস করেছিল, তোমার খুব মার্গারিটের কথা মনে পড়ছে, তাই না?

না মনে পড়লে ধরে নিতে হত যে আমার মন বলে কিছু নেই।

কিন্তু সতেরো বছর বড় দীর্ঘ সময়। এতদিন পর হঠাৎ মার্গারিটকে দেখলে কি আমি চিনতে পারতাম? কিংবা সে আমাকে?

এই প্যারিস শহরেই তো এক মাস ধরে কত রাস্তা হেঁটেছি, কত দ্রষ্টব্য স্থান তন্নতন্ন করে

দেখেছি, কিন্তু এখন সব কিছুই যেন অচেনা লাগছে। মেট্রো ট্রেন ও স্টেশনগুলো পালটে গেছে কত! সাতলে লে আল স্টেশনের কী চোখ ধাঁধানো রূপ। এক সময় ওই লে আল অঞ্চলে এক বিশাল, লোক গিসগিসে বাজার ছিল। মেট্রো ট্রেনগুলোর চেহারাও ছিল বেশ লঝঝরে, লন্ডনে এখনও অনেক টিউব ট্রেন যেমন। কিন্তু এবার এসে দেখি মেট্রো একেবারে ঝকঝকে। আগে যে সময় এসেছিলাম, তখনও ফ্রান্স যুদ্ধ-পরবর্তী ডিপ্রেশান কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এখন সেই ফ্রান্স যেন অনেক সমৃদ্ধ।

মার্গারিটের কথা যখন তখন মনে পড়ে বটে, কিন্তু সেই স্মৃতির মধ্যে বিষাদ কিংবা কাতরতা নেই। বরং যেন স্মৃতিটাকে কম্বলে মুড়ে রাখা হয়েছে, আমার বুকের খানিকটা অবশ লাগে। মার্গারিটের প্রসঙ্গ উঠলেই আমি অন্য কথায় চলে যেতে চাই।

এবারের প্যারিস আসা যেন স্বাতীকেই সব কিছু দেখাবার জন্য। ওর মুগ্ধতা দেখে আমার আনন্দ হয়। ও ছবি দেখতে ভালোবাসে, এ শহরে রয়েছে ছবির স্বর্ণভাণ্ডার। আসবার পথে আমরা অ্যামস্টারডামে নেমে ভ্যান গঘ ও রেমব্রান্ডট্ দেখে এসেছি দু-চোখ ভরে; এখানে দেখছি ওঁদের সমসাময়িকদের। শিল্প সমালোচক সুপ্রিয়কে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ওর সঙ্গে স্বাতীর বেশ ভাব জমে গেল। সুপ্রিয় আমাদের নিয়ে যায় বাছাই করা ছবির জায়গায়।

আমি আগের বার অতদিন ছিলাম, তবু ইফেল টাওয়ারে চাপিনি আর মোনালিসা দেখিনি শুনে সবাই হাসে। এবারে ওই স্তম্ভচূড়াতেও ওঠা হল, ওই ইতালীয় গর্ভিণীকেও দেখা হল। লুভ্‌র মিউজিয়ামে ঘুরতে-ঘুরতে রেনোয়া'র একটি ছবির সামনে স্বাতী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বড় আকারের স্নানরতাদের ছবি। প্রকৃতি ও নগ্ন নারী, রেনোয়ার প্রিয় বিষয় ছিল। এই ছবিটা রেনোয়া'র মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে আঁকা। যখন রেনোয়া বাতের ব্যথায় খুব কষ্ট পেতেন, আঙুল নাড়াতে পারতেন না, আঙুলের ফাঁকে ব্রাশ বেঁধে নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আঁকতেন।

স্বাতীকে এইসব কথা বোঝাতে-বোঝাতে হঠাৎ আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সতেরো বছর আগে, ঠিক এই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মার্গারিট আমাকে এই কথাগুলোই বলেছিল। তা হলে আমি সেসব ভুলিনি, কিছুই ভুলিনি।

॥ ১৭ ॥

"তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো।
বন্ধু ও শত্রুদের প্রতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা,
প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বন্ধ্যা ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর—
তোমার গ্রাম্য ও পাগলাটে পরিবার...
তুমি বেশ করেছ, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাস্তা,
লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা..."

—রেনে শার

যেহেতু প্যারিসের শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আবার দেখার তেমন আগ্রহ নেই আমার, তাই এক একদিন দুপুরে স্বাতী ও অন্যরা বেরিয়ে যায়, আমি বাড়িতে শুয়ে থাকি। অসীম রায়ের সংগ্রহের বইগুলি নাড়াচাড়া করি। অসীম রায়ের নেশা ফটোগ্রাফি, নিজে ভালো ছবি তোলে তো বটেই, অনেক ফটোগ্রাফির ম্যাগাজিনও বাড়িতে রাখে। তা ছাড়া বাংলা ও ফরাসি ভাষায় কাব্য উপন্যাস আছে কিছু কিছু, ইংরিজি খুবই কম।

একলা থাকতে আমার ভালোই লাগে। কখনও বাগানে ঘুরি, কখনও টিভি দেখার চেষ্টা করি। সাধারণত টিভি দেখার জন্য মানুষকে কোনও চেষ্টা করতে হয় না, বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করে দিয়ে সামনে বসে থাকলেই তো হল। কিন্তু অসীম রায়ের বাড়িতে টিভি দেখা অত সহজ নয়। তাঁর টিভির পেছনের পাল্লাটা একেবারে খোলা, ভেতরের হাজার হাজার যন্ত্রপাতি ও সূক্ষ্ম তারের খেলা সব পরিদৃশ্যমান। অর্থাৎ টিভির পেছন দিকটা সম্পূর্ণ দেখা যায় কিন্তু সামনের ছবি তেমন স্পষ্ট হয় না। অসীম রায় কোনও এক সময় টিভিটা সারাবেন বলে ঠিক করেছেন, আপাতত তিনি পেছনের ডালাটা এগিয়ে পিছিয়ে ছবি পরিস্ফুটনের পরীক্ষা করেন। অসীম রায় সেটা পেরে যান, কারণ তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষতা আছে, আমি আবার এসব যন্ত্রে হাত দিতে ভয় পাই। সুতরাং একলা থাকলে টিভি দেখার সুবিধে হয় না। আমার ইচ্ছে ছিল, টিভি শুনে শুনে ফরাসি ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া।

বৃষ্টি না পড়লে বাগানে বেশ ভালোই সময় কাটে। ইওরোপের বাড়িগুলোর এই বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের বাড়ির সামনে-পেছনে খানিকটা লন ও বাগান থাকবেই। এদেশে সব ভদ্রলোকই ঘেসুড়ে, সপ্তাহে একদিন বাগানের ঘাস ছাঁটা বাধ্যতামূলক। মালি রাখার প্রশ্নই নেই। কারুর বাগানের ঘাস বেশি বেড়ে গেলে অন্যরা অবজ্ঞার চোখে তাকায়। অসীম রায়কে সাহায্য করার জন্য আমিও দু-একবার লন মোয়ার দিয়ে ঘাস হেঁটেছি।

এসব বাড়িগুলিকে বলে সেমি ডিটাচ্‌ড। অর্থাৎ দূর থেকে একটাই বাড়ি মনে হলেও আসলে মাঝখান থেকে দু-ভাগ করে দুটি বাড়ি হয়েছে। আলাদা বাগান, আলাদা প্রবেশ পথ, আলাদা সব কিছু, তবু বাড়ি দুটো পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতন। এইসব বাড়িতে আর সবরকম সুযোগ-সুবিধে থাকলেও বেশি রাত পর্যন্ত হইহল্লোড় করা যায় না। তাতে প্রতিবেশীর ঘুমের অসুবিধে হয়।

অসীম রায়ের প্রতিবেশী এক জোড়া বুড়ো-বুড়ি, তাদের সঙ্গে অসীম রায়ের বেশ সৌহার্দ্য আছে। এক বাড়ির মালিক ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গেলে অন্যজনকে চাবি দিয়ে যায়, অন্যজন দুটো বাগানের গাছেই জল দেয়, দৈবাৎ জলের কল বা গ্যাস লিক করলে চাবি খুলে মেরামত করে, চিঠিপত্র রেখে দেয়। তা বলে কিন্তু এরকম ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরাও পরস্পরের বাড়িতে যখন তখন যাওয়া আসা করে না। কেউ কারুর ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি মারে না। ভদ্রতার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করা পশ্চিমি সভ্যতার অঙ্গ। বাগানের বেড়ার দু'পাশ থেকে একবার সৌজন্য বিনিময় হয়, সেইটুকুই যথেষ্ট।

শহরতলির অধিকাংশ বাড়িই বৃদ্ধ দম্পতিতে ভরতি। ছেলেমেয়েরা কেউ সঙ্গে থাকে না। ছেলেমেয়েরা হয়তো বছরে একবার দেখা করতে আসে কিংবা দূর থেকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠায়। বার্ধক্যে নিঃসঙ্গতা এদের নিয়তি। আমাদের কাছে এটা নিষ্ঠুর ও করুণ মনে হলেও, এদের বোধহয় সহ্য হয়ে গেছে।

আপেল গাছ এদেশের সব বাগানেই আছে, মনে হয় যেন বিনা যত্নেই এ গাছ বেশ বাড়ে। আমাদের দেশের আম কাঁঠালের মতন। তা ছাড়া অসীমের বাগানে আছে ন্যাসপাতি ও চেরি গাছ, হাত বাড়িয়েই সেগুলির ফল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাওয়া যায়। অসীম টমাটো আর কুর্জেৎ নামে এক ধরনের কুমড়ো লাগিয়েছেন। রান্নার সময় বাগান থেকে সেগুলো তুলে আনা হয়। কাঁচা লংকা নেই। ফরাসিরা কাঁচা লংকা খায় না, কিন্তু এখন ফ্রান্সে কিছু কিছু ভিয়েতনামিদের কলোনি হয়েছে, তাদের বাজারে কাঁচা লংকা, চালকুমড়ো, খলসে মাছ সবই পাওয়া যায়।

অনেকের বাগানেই একটি দোলনা থাকে। অতি সামান্য পোশাক পরে মেয়েরা সেই দোলনায় দুলতে-দুলতে রোদ পোহায়। কিংবা বই পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় অসীমের বাড়ির দুপাশে সেরকম কোনও তরুণী থাকে না, তাহলে দুপুরবেলা আমার বাগানে ঘোরা অনুচিত হত। প্রতিবেশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে আমি একবার শুধু বঁ ঝুর বলে অনায়াসে বই পড়তে পারি। নির্মল

ফরাসি আকাশের নীচে, চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, ন্যাসপাতি গাছের ছায়ায় একটা সাদা রঙের চেয়ারে আমি একলা বসে আছি, হাতে বই, এরকম একটা দৃশ্য হিসেবে নিজেকে আমি উপভোগ করি সারা দুপুর ধরে।

অসীমের সংগ্রহের বাংলা বইগুলি আমার অধিকাংশই পড়া। ফরাসি বইগুলির পাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখি, কিছু কিছু শব্দের মানে বুঝলেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার ভুলে গেছি। ইংরিজির সন্ধানে একদিন একটা আটলান্টিক ম্যাগাজিন পেয়ে গেলাম। তাতে রেনে শার বিষয়ে একটা রচনা রয়েছে।

রেনে শার মার্গারিটের প্রিয় কবি ছিলেন। মার্গারিট প্রায়ই ওঁর কথা বলত। শুধু কবি হিসেবেই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেজিস্টান্স মুভমেন্টের বীর সেনানী হিসেবেও তাঁর দারুণ সম্মান।

এই কবি প্রথম জীবনে যোগ দিয়েছিলেন সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে; তারপর এক সময় সুররিয়ালিস্টরা কেউ কেউ সাম্যবাদের দিকে ঝোঁকে, রেনে শার হলেন জাতীয়তাবাদী। তিনি মনে করতেন, জীবনে ও বেঁচে থাকায় প্রত্যেক কবিই তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বও তাঁকে নিতে হবে। কিন্তু কবিতা রচনা, তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনার ব্যাপার। অর্থাৎ একজন কবি প্রতিবাদের মিছিলে যোগ দিতে পারে, কিন্তু তা বলে তাঁকে মিছিলের, চ্যাঁচামেচির কবিতা লিখতে হবে, তার কোনও মানে নেই। দেশের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করেছেন শার, কিন্তু উগ্র দেশাত্মবোধের কবিতা লেখেননি।

জাতীয় বীরের সম্মান পেলেও রেনে শার পরবর্তীকালে সরকার গঠনে অংশ নেননি, মন্ত্রী-টন্ত্রী হননি। বরং তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থান লিল-সুর-সরলেই-তে। ভাক্লুজ অঞ্চলে সেটা একটা ছোট্ট জায়গা। শুধু কবিতা লিখেছেন আর তাঁর সমসাময়িক শিল্পী মিরো, ব্রাক-এর ওপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

শার-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আলবিয়ার কাম্যু। কাম্যুর মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসি কবি। অবশ্য শার-এর সব কবিতার মর্ম বোঝা মোটেই সহজ নয়। তাঁর একটি ছোট্ট কবিতার নাম 'ওরিওল পাখি', সেটি এরকম ঃ

> ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
> তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
> সব কিছু আজ চির জীবনের শেষ।

এই কবিতাটি পড়ার সময় জানত হবে যে এর রচনাকাল ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯, অর্থাৎ মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ইওরোপের কালো আকাশ পেরিয়ে উড়ে আসছে একটা ওরিয়ল। ওরিয়ল মানে সোনালি পাখি। আমাদের দেশে যে হলদে পাখিগুলো 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে ডাকে, অনেকটা সেকরম, এদেশে খুব দেখা যায়। শার মনে করতেন, কবিতায় কোনও সম্পূর্ণ অর্থ থাকার দরকার নেই। কবির আবেগ বা বিশেষ অনুভূতির শুধু প্রথম অংশটুকু নিয়েই হয় কবিতা, সেইটুকু অবলম্বন করে পাঠকদের মানস যাত্রা। অর্থাৎ এই কবি পাঠকদের ওপর অনেকখানি দায়িত্ব দিতে চান।

এই ছোট্ট কবিতাটি আমি মার্গারিটের মুখে বারবার আবৃত্তি শুনেছি। একবার তুষারপাতের সময় কয়েকটা মৃত পাখি দেখে...

শার-এর একটি কবিতা আছে র‍্যাঁবোর ওপরে। কবিতাটির নাম, 'তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো'। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে র‍্যাঁবো-র কবিতা হঠাৎ কলকাতায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। র‍্যাঁবোর অতি নাটকীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতা মিলিয়ে বিশেষ একটি আকর্ষণ তৈরি হয়। মাত্র আঠারো বছরের এই বালকটি কবিতা লিখে হুলুস্থুলু ফেলে দেয় ফরাসি দেশে,

তারপর হঠাৎই কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে যায় আফ্রিকায়। তারপর থেকেই র‍্যাঁবো একটি লিজেন্ড। একাধিক বাঙালি র‍্যাঁবোর কবিতা অনুবাদ করেছেন। আমারও একসময় ইচ্ছে ছিল র‍্যাঁবোর একটি জীবনী লেখার।

র‍্যাঁবো প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল। ফরাসি উচ্চারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বাংলার র‍্যাঁবো নামটি দেখে অনুমান করা দুঃসাধ্য ওই নামের মূল ফরাসি রূপ। ফরাসিরা র-অক্ষরটিকে অনেক সময় হ্র-র মতন উচ্চারণ করে, রেডিও হয়ে যায় হ্রাদিও। Rimbaud-কে আমি মার্গারিটের কণ্ঠে হ্র্যাম্বো শুনেছি। একসময় আমি 'অন্য দেশের কবিতা' নামে একটি অনুবাদের সিরিজ প্রকাশ করছিলাম। তাতে 'র‍্যাঁবো'র বদলে লিখেছিলাম 'হ্র্যাম্বো'। আর যায় কোথায়, অনেকেই অবজ্ঞায় ওষ্ঠ ওলটাতে লাগল আমি ফরাসি শব্দের উচ্চারণ জানি না বলে, আবার ফরাসি ভাষায় পণ্ডিত সৈয়দ মুজতবা আলি দেশ পত্রিকার পাতায় ধমক দিয়ে লিখলেন, আজকাল হয়েছে এই এক ধরনের এঁচোড়ে পাকা, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, র‍্যাঁবোর বদলে লিখেছে হ্র্যাম্বো, এটা কোনও কবির নাম না ছাগলের ডাক তা বোঝাই যায় না।

আমি আলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম, আপনি আমার ইয়ার্কিটা বুঝতে পারেননি? ফরাসি উচ্চারণ নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে, ওটা তাদের সম্পর্কে খানিকটা মজা করার জন্য। আমি তো কিছুই জানি না, আমাদের দেশে ক'জনই বা সঠিক ফরাসি জানে, বলুন? আমরা নেপোলিয়ান কিংবা প্যারিস দেখলে চিনতে পারি, তার বদলে নাপোলিয়ঁ কিংবা পারি লেখার দরকার আছে কি?

আলি সাহেব বললেন, না লিখলেও চলে। ইংরেজদের ধরনে ফরাসি উচ্চারণই লোকে বোঝে।

আমি বললাম, আমেরিকানরা বলে র‍্যাঁমবো। তবে কি এসব ঝামেলা এড়াবার জন্য বানান অনুযায়ী রিম্‌বড লেখা উচিত?

উনি বললেন, না, না, এতদিন ধরে র‍্যাঁবো চলছে, সেটাই চলুক।

এই সূত্রে আমার প্রতি সৈয়দ মুজতবা আলির একটা স্নেহের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। পরবর্তী কালে তিনি আমাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন।

যাই হোক, সেদিন দুপুরবেলা কেন যেন র‍্যাঁবোর চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছিল। দেশপ্রেমিক রেনে শার দেশত্যাগী র‍্যাঁবো সম্পর্কে এতখানি সহানুভূতি দেখিয়েছেন কেন? রেনে শার সারা জীবন কবিতার সাধনা করেছেন, কিন্তু র‍্যাঁবো যে আঠারো বছর বয়সেই কবিতা লেখা ছেড়ে, একেবারে সাহিত্য জগৎ ছেড়েই চলে গেল, সেটাকে কেন তিনি বললেন, 'তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালোই করেছ, আর্তুর র‍্যাঁবো'?

সাহিত্য একটা তীব্র নেশা, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, যাকে একবার এই নেশা ধরে, তার আর অন্য কোনও গতি থাকে না। আবার এ কথাও হয়তো ঠিক, অনেক লেখকই এক এক সময় এই নেশা থেকে মুক্তি পেতে চায়। সাহিত্য সৃষ্টিতে খ্যাতি-কীর্তি-অর্থের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তার জন্য লেখককে ভেতরে-ভেতরে কত কষ্ট যে সহ্য করতে হয়! এক একসময় রক্তক্ষরণের মধ্যে মিশে যায় শব্দের বিষ, তা অন্যদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। প্রত্যেক লেখকেরই বোধহয় জীবনে কোনও না কোনও সময় মনে হয়, দুর ছাই, আর জীবনে এক লাইনও লিখব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা যায় না। যে দু-একজন পারে, তাদের প্রতি অন্য লেখকদের শ্রদ্ধা ও ঈর্ষাবোধ হয়। খুব সার্থক কোনও লেখক সম্পর্কে যেমন অন্য লেখকদের ঈর্ষা থাকে, তেমনি কোনও ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক অবহেলায় সাহিত্যজগৎ ছেড়ে গেলে তাঁর প্রতিও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ঈর্ষা থাকতে পারে। র‍্যাঁবো সম্পর্কে রেনে শার-এর এত উচ্ছ্বাস কি সেইজন্য?

র‍্যাঁবোর জীবনের নানা ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। আঠেরো বছর, মাত্র আঠারো বছরের একটি ছেলে 'নরকে এক ঋতু'র মতন অবিস্মরণীয় কাব্য লিখে ফেলেছিল? আমরা আঠেরো বছর

বয়েসে কী করেছি। কতটুকু জেনেছি সাহিত্য সম্পর্কে? আর কীভাবে র‍্যাঁবো রচনা করেছিল সেই কাব্য? সেই সময়ে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভেরলেইন-এর সঙ্গে ঝগড়া, ভেরলেইন রাগের মাথায় র‍্যাঁবোকে গুলি করেছিল, এ ঘটনা তো অনেকেরই জানা। ভেরলেইনকে গ্রেফতার করে পুলিশ জেলে ভরে দিল, আহত অবস্থাতেও র‍্যাঁবো পুলিশকে জানাল যে বন্ধুর বিরুদ্ধে তার কোনও অভিযোগ নেই, পুলিশ তা মানল না। র‍্যাঁবোর তখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, কোনও বন্ধু নেই, কপর্দকশূন্য অবস্থা, খাবার জোটাবার সঙ্গতিও নেই। গৃহত্যাগী এই ছেলেকে তার পরিবারের লোকরাও পছন্দ করে না, সকলের ধারণা কুসঙ্গে মিশে সে উচ্ছন্নে গেছে। (ভেরলেইনের সঙ্গে তখন র‍্যাঁবোর সমকামিতার সম্পর্কের গুজব বহুল প্রচারিত) নিরুপায় র‍্যাঁবো গ্রামের বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হল, পায়ে হেঁটে, এক হাতে তখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা, শীর্ণ শরীর। বাড়িতে সবাই তখন খাবার টেবিলে বসেছে, মা, দুই বোন, এক ভাই। সেখানে এসে দাঁড়াল সেই অভিশপ্ত পুত্র র‍্যাঁবো। প্রথমে সবাই নিশ্চুপ, র‍্যাঁবো বুঝতে পারছিল না যে তাকে এ বাড়িতে গ্রহণ করা হবে, না তাড়িয়ে দেওয়া হবে! তারপর মা ছেলেকে বললেন, আয়, বোস। সেই সামান্য স্নেহের ডাক শুনেই র‍্যাঁবো টেবিলে মাথা গুঁজে হু হু করে কাঁদতে লাগল।

মায়ের কাছে র‍্যাঁবো আবেদন জানাল যে এখন থেকে বাড়িতে থেকে সে তার বইটি শেষ করতে চায়। এই বইটি ছাপিয়ে সে দেখতে চায়, তার সাহিত্য প্রচেষ্টার সত্যিকারের কোনও মূল্য আছে কি না। মা সাহায্য করতে রাজি হলেন, এমনকি বই ছাপাবার খরচও দেবেন বললেন। ওদের নিজস্ব ফার্মে অন্য ভাই-বোনেরা ও মা রোজ সকাল থেকে চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, শুধু এই একটি ভাই কিছু করে না, সে লেখে। তার এক বোন ভিতালি ডায়েরিতে লিখেছিল, আমরা যখন কাজ করতে যাই, আর্তুর আমাদের সঙ্গে আসে না, সে তার কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আমি এক একদিন শুনেছি, সে একা একা যন্ত্রণায় চ্যাঁচায়, গালাগালি দেয় দরজায়, যেন সে কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

বইটি শেষ হওয়ার পর মা পাণ্ডুলিপিটা পড়লেন। কিছুই বুঝতে না পেরে, ভ্যাবাচ্যাকা, বিমূঢ় অবস্থায় ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, এ সবের মানে কী? শান্তভাবে ছেলে উত্তর দিয়েছিল "It means exactly what I've said, literally and completely, in all respects."

পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হল প্যারিসে, ছাপাও হল, কিন্তু কেউ উচ্চবাচ্য করল না, প্রকাশকের কাছে গাদা হয়ে পড়ে রইল সব বই। ওদের অসামাজিক জীবনযাপন, বিশেষত গুলি ছোঁড়ার ঘটনা ও ভেরলেইনের জেল খাটার জন্য, এই দুজনকে ফরাসি লেখক-সাহিত্যিকরা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছিল।

কিছুদিন বাদে র‍্যাঁবো প্যারিসে এল তার এই সাহিত্যকীর্তিটি সম্পর্কে লেখককুলের প্রতিক্রিয়া জানতে। কাফে তাবুরি ছিল সাহিত্যিকদের আড্ডা স্থল, সেখানে র‍্যাঁবো আর ভেরলেইনও একসময় প্রচুর সময় কাটিয়েছে। সেটা একটা ছুটির দিন, র‍্যাঁবো এসে বসল একটা টেবিলে, অন্য টেবিলগুলোতে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক ও তাদের বান্ধবীরা তুমুল হল্লা করছে, তাদের অনেকেই র‍্যাঁবোকে চেনে, কিন্তু কেউ ডাকল না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলল না। এই আঠারো বছরের যুবকটি যেন শয়তান, তার দিকে তাকাতেও নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা র‍্যাঁবো বসে রইল একা। কঠিন মুখে, মাথা নীচু করে। তার অহংকার কম নয়, সেও নিজে থেকে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না।

সম্ভবত এই দৃশ্যটি সম্পর্কেই রেনে শার লিখেছেন তাঁর কবিতাটি। 'প্যারিসের কবিদের ন্যাকামি...লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা'...।

সে রাতে বাড়ি ফিরে এসে র‍্যাঁবো তার সব লেখার পাণ্ডুলিপি ও বইপত্রে আগুন ধরিয়ে দিল। তার এক বোন সেই বহ্ন্যুৎসব দেখেও থামাতে পারেনি। সাহিত্যের প্রতি সেই আগুনই ছিল র‍্যাঁবোর শেষ উপহার।

র‍্যাঁবো সম্পর্কে পড়তে-পড়তে ও ভাবতে-ভাবতে আমি একটু একটু রেড ওয়াইন খাচ্ছিলাম। অসীম রায়ের সেলারে অনেক বোতল ওয়াইন জমা করা ছিল, তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি, কিন্তু প্যারিসে এসে ইচ্ছে মতন ওয়াইন খাব না, তা কখনও হয়?

কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে দুটো নেশা আমায় পেয়ে বসল। রেড ওয়াইনের নেশায় মাথাটা হালকা হয়ে গেল, আর আঠারো বছরের সেই দুরন্ত কিশোরটি যেন শতাব্দী পেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে আমায় বলতে লাগল, এসো, এসো, চলে এসো, লেখাটেখা ছেড়ে দাও, কী হবে লিখে? কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে যে লিখতেই হবে? না লিখলে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হয় না। আরও অনেক ভালো ভালো লেখক আছেন, তোমার কিছু না লিখলেও চলবে।

সত্যি সত্যি কাল থেকে যদি ঘোষণা করে দিই, আর কক্ষনো এক লাইনও লিখব না, তা হলে কেমন হয়? পাঠক-পাঠিকারা অবশ্য মাথাও ঘামাবে না, কিন্তু চেনাশুনো, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হবে নিশ্চয়ই। তাদের অবিশ্বাসের ওপর বিচ্ছুরিত হবে আমার অহংকার। না-লেখার অহংকার।

আগেও আমার একবার এরকম হয়েছিল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসে। কিছু একটা অভিমানে আমি ঠিক করেছিলাম, জীবনে আর এক লাইনও কবিতা লিখব না। আমার সংগ্রহের সমস্ত কবিতার বই ও পত্র-পত্রিকা আমি বিলিয়ে দিয়েছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও কবিতা জিনিসটার মুখদর্শনও করব না। সেবারে সে প্রতিজ্ঞা সাতাশ দিনের বেশি রাখতে পারিনি।

এবারে, একাকী প্যারিসের প্রান্তে এক বাড়ির বাগানে বসে রোদ পোহাতে-পোহাতে র‍্যাঁবোর প্রভাব আমাকে আবার অনুপ্রাণিত করে। যেন আমি মাথার টুপি তুলে বলছি, সাহিত্য জগৎ, বিদায়। র‍্যাঁবো সাইপ্রাসে চলে গিয়ে বাড়িঘর বানানোর মিস্তিরির কাজ নিয়েছিলেন, আমি সাঁওতাল পরগনায় কোনও কাঠ গুদামে কাজ নিতে পারি। আমাকে বিয়ে করার সময় স্বাতী বলেছিল, দরকার হলে ও আমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে গিয়ে থাকতেও রাজি আছে। তা হলে তো আর কোনও অসুবিধে নেই।

একাধিক রেড ওয়াইনের বোতল শেষ হয়ে গেল। স্বাতীরা ফিরল ঘোর সন্ধেবেলা। তখনই ওদের কাছে কিছু ভাঙলাম না। নৈশাহারের সময় আরও ওয়াইন পান হল। তারপর হল এক কাণ্ড। মাঝরাত্তিরে আগুনের আঁচে ঘুম ভেঙে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বিছানায় আগুন লেগে গেছে, কম্বল জ্বলছে, তোশক জ্বলছে।

শুয়ে-শুয়ে বই পড়ার সময় হঠাৎ আমার ঘুম এসে গিয়েছিল। হাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। রাত্তিরে শুয়ে সিগারেট টানা যে বিপজ্জনক, তা কি আমি জানি না? অন্য দিন তো এরকম করিও না। বেশি ওয়াইন খেলে এরকম করা তো একদমই উচিত না, তবু কি আমার মাথায় র‍্যাঁবোর ভূত পেয়েছিল?

কম্বল ফুটো হয়ে তোশকের ভেতরটা জ্বলছে। তুলোর আগুন নেভানো সহজ নয়। অন্যদের ঘুম না ভাঙিয়ে স্বাতী জল এনে-এনে অনেকক্ষণ ধরে সেই আগুন নেভাল। সারারাত আমাদের শুয়ে থাকতে হল সেই ভেজা বিছানায়। আর আমার ঘুম আসে না। নেশা-ফেশা সব ঘুচে গেছে, অপরাধবোধে আমি মরমে মরে যাচ্ছি। এদিকে সবই কাঠের বাড়ি। ছ্যাঁকা লেগে জেগে না উঠলে যদি দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত, তা হলে সারা পাড়া জুড়ে একটা অগ্নিকাণ্ড হত। অসীম রায়ের সঙ্গে সদ্য পরিচয়, তিনি তাঁর বাড়িতে অনুগ্রহ করে আমাদের থাকতে দিয়েছেন, এই কি তার প্রতিদান? তিনি রাগী ধরনের মানুষ, এই সব দেখে কী ব্যবহার করবেন কে জানে।

সকালবেলা অসীম রায়কে সব কিছু জানাতেই হল। তাঁর অফিস যাওয়ার তাড়া ছিল, তিনি দগ্ধ বিছানা নিরীক্ষণ করে বিনা মন্তব্যে চলে গেলেন। আমার মাথা থেকে র‍্যাঁবোর ভূত চলে গেছে, অসীম রায় বকুনি দিলে আমি কীভাবে ক্ষমা চাইব, তার সাতরকম ভাষ্য তৈরি করেছিলাম মনে-

মনে, কিন্তু অফিস থেকে ফিরেও অসীম সে প্রসঙ্গই তুললেন না।

স্বাতী দু-তিনবার বলল, কাল কী কাণ্ড হতে যাচ্ছিল বলুন তো!

অসীম বললেন, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি তো। বলুন, আজ কোথায় বেড়াতে যাবেন?

অসীম যে এত বড় ব্যাপারটায় কোনও গুরুত্বই দিলেন না, তাতেই অস্বস্তি কাটছে না। আমিও আমার সাতরকম ভাষ্য শোনাবার সুযোগ পাচ্ছি না। একবার আমি জানালাম যে কাল তাঁর সেলার থেকে আমি দু-বোতল রেড ওয়াইন শেষ করেছি। তার উত্তরেও অসীম বললেন, আমি তো আপনাদের এখানে নেমন্তন্ন করে এনেছি। এমনি এমনি তো আসেননি। আমার বাড়িতে এসে আমার ওয়াইন খাবেন না?

কিন্তু নিমন্ত্রিত হয়ে এসে বিছানা পুড়িয়ে দেওয়াও কোনও কাজের কথা নয়। অসীম রায়ের কাছ থেকে কিছু ধমক আমাদের প্রাপ্য তো বটেই।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে আমি একবার বললাম, দেখুন, আপনার বাড়ির জন্য একটা তোশক আর কম্বল আমরা কিনে দিতে পারি কি? ও দুটো ফুটো হয়ে গেছে।

এবার অসীম রায় আমার দিকে ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনার বাড়িতে গিয়ে কেউ যদি একটা কাচের গেলাস ভাঙে, আপনি বুঝি তার দাম চান? ঠিক আছে, কমপেনসেশান হিসেবে আপনি আমাকে আপনার লেখা একটা কবিতার বই দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে সেই দিন থেকে অসীম রায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

॥ ১৮ ॥

"নর্তকীরা নাচে। নাচ
নিজে কখনও নাচে না
নাচের ঠিক কেন্দ্রস্থলে গতিশূন্য হয়ে থাকে নাচ
রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে গতিশূন্য হয়ে থাকে যুদ্ধ..."
—জাক্ ওদিব্যারতি

উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল ভাস্কর দত্ত। ক্লাস থ্রি-ফোর থেকে আমরা একসঙ্গে বর্ধিত হয়েছি। কলেজে এসে আমাদের স্ট্রিম আলাদা হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভাস্করের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রইল। আমাদের স্কুল-কলেজ জীবনের বন্ধুদের একটা ঘননিবদ্ধ দল ছিল, আশুতোষ ঘোষ, উৎপল রায়চৌধুরী, সত্যময় মুখার্জি এবং আরও কয়েকজন, আমরা প্রায়ই আড্ডা দিতে যেতাম ভাস্করের বাড়িতে। ভাস্কর কলকাতার বনেদি বাড়ির ছেলে, ওদের বাড়িতে একটা বৈঠকখানা কালচার ছিল। আমরা তাস খেলা কিংবা সাহিত্য-রাজনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি করতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর মাঝে মাঝেই বাড়ির ভেতর থেকে চা-জলখাবার চলে আসত।

তারপর আমি কৃত্তিবাস পত্রিকা চালানো এবং লেখালেখির জগতে অনেকখানি চলে আসার পর অন্য একটি বন্ধু গোষ্ঠী তৈরি হয়। স্কুল-কলেজের বন্ধুরা কিছুটা দূরে সরে যায় আস্তে আস্তে, তারা যে যার জীবিকাতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ভাস্কর এই লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যেও মিশে গেল। সে কিন্তু লেখে না। তার ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য-জ্ঞান যথেষ্ট। কবিতার প্রতি তার বিশেষ ভালোবাসা আছে, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে লেখালেখির লাইনে একেবারেই এল না। এক সময় ভাস্করের বাড়িটাই ছিল কৃত্তিবাস পত্রিকার অফিস, কাগজ ছাপার ব্যাপারে সে বিশেষ উদ্যোগী, কিন্তু কখনো সে নিজের কবিতা ছাপানোর দুর্বলতা প্রকাশ করেনি। সে আমলে বহু তরুণ লেখক-লেখিকা ভাস্করকে বিশিষ্ট

বন্ধু বলে গণ্য করত।

আমাদের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম লন্ডন গিয়েছিলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, উচ্চশিক্ষার্থে। তিনি ফিরে এলেন দু'তিন বছরের মধ্যেই। তারপর দৈবাৎ আমি। আমিও সাত রাজ্য ঘুরে ড্যাং ড্যাং করে ফিরে এলাম এক সময়ে। তখন ভাস্কর বলল, তা হলে আমিও একবার বিলেতটা ঘুরে আসি, ওখানে আমার নামে একটা রাস্তা করে আসব। এখানকার চাকরি ছেড়ে ভাস্কর চলে গেল লন্ডনে, তারপর কিছুদিন বাদে সে ডেকে নিল উৎপলকুমার বসুকে। এক সময় উৎপলও প্রত্যাবর্তন করল স্বদেশে, কিন্তু ভাস্করের আর ফেরা হল না।

অনেকদিন ভাস্করের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু যেদিন দেখা হল, মনে হল যেন আগের রাত্রেই এক সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। উত্তর কলকাতার সেই আড্ডাবাজ মেজাজটি ভাস্করের অবিকল একই রয়ে গেছে। ওদেশের চাকরিতে অনেক আগে থেকে বলে-কয়ে না রাখলে ছুটি নেওয়া যায় না। কিন্তু ভাস্কর যে-কোনওদিন বলতে পারে, দূর ছাই আজ আর অফিস যাব না! বিলেত-আমেরিকায় পাশ বালিশ বা কোল বালিশ নামে কোনও বস্তু নেই, কিন্তু ভাস্কর পাশ বালিশ, কান বালিশ, পা-বালিশ নিয়ে শোয়। ইংল্যান্ডে তার প্রায় দু'যুগ কেটে গেল, কিন্তু ওদেশের অনেক নিয়মকানুন সে মানে না, মাঝে মাঝে তার মধ্যে থেকে একটা দুরন্ত বালকের রূপ বেরিয়ে আসে।

ভাস্করের স্ত্রীর নাম ভিকটোরিয়া। নতুন কেউ দেখা করতে এসে হয়তো বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে, ভাস্কর বলল, আমি ভিকটোরিয়াকে ডাকছি, অমনি সেই লোকটি ভাবে, এই রে, এবারে বুঝি একজন মেমসাহেব আসবে, তার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে। আসলে ভিকটোরিয়া খুবই বাঙালি এবং হুগলির মেয়ে। ফরসা ফুটফুটে রং বলে তার ঠাকুমা-দিদিমারা তাকে ছোটবেলায় আদর করে রানি ভিকটোরিয়া বলে ডাকত। ভিকটোরিয়া কখনও কিছু খুব রাগ করে বলতে গেলেও হেসে ফেলে, আর সেই জন্যই তার অবাধ্য স্বামীটি যা খুশি করার প্রশ্রয় পায়। ভিকটোরিয়া নিজেও চাকরি করে। ভোরবেলা উঠে তাকে অফিস যেতে হয়, তবু বাড়িতে কোনও অতিথি এলে সে অন্তত দশ রকম ব্যঞ্জন না খাইয়ে ছাড়ে না। ভাস্করের মতে, ভিকটোরিয়া এক-একদিন এত বেশি রান্না করে যে ভাস্করকে হ্যারোর রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে লোক ডাকতে হয় বাড়িতে এনে খাওয়াবার জন্য। আমরা অবশ্য নিজেরাই দেখেছি, ভাস্কর এক একদিন ভিকটোরিয়াকে কিছু না জানিয়ে বাইরে থেকে গোটা তিরিশেক লোককে বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে আসে।

প্যারিস থেকে লন্ডনে এসে ভাস্করদের সঙ্গে হইচই করে কাটানো গেল কয়েকটা দিন। প্যারিসের অসীম রায়ের সঙ্গে ভাস্করের পরিচয় ছিল না, আমাদের সূত্রে যোগাযোগ হল, তারপর থেকে বেশ কয়েক বছর প্যারিসই হল আমাদের আড্ডার একটা কেন্দ্র।

সেবারে আমেরিকা ও কানাডায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করে দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরই আমি সোভিয়েত ইউনিয়ান পরিদর্শনের একটা নেমন্তন্ন পেলাম। আশির দশকে এসে হঠাৎ যেন বিশ্বের অনেকগুলি দেশের দরজা খুলে গেল আমার জন্য। কোনওরকম চেষ্টা করতে হয় না। বাড়ি ফিরে নানা রকম চিঠিপত্রের মধ্যে আচমকা এক একখানা বিদেশি আমন্ত্রণপত্র পেয়ে যাই। ভ্রমণ আমার নেশা, সাঁওতাল পরগনা, উড়িষ্যার জঙ্গল, আসামের পাহাড়ে যখন তখন বেড়াতে যেতে আমার যেমন ভালো লাগে, তেমনি পৃথিবীর যে-কোনও অদেখা দেশের ডাক পেলেই আমি লাফিয়ে উঠি। একটা দেশে নেমন্তন্ন পেলে, কাছাকাছি দু-তিনটে দেশ নিজের উদ্যোগে ঘুরে আসি। প্রবল শীত কিংবা চরম গ্রীষ্মেও আমি অকুতোভয়, শূন্যের নীচে চল্লিশ ডিগ্রি ঠান্ডার জায়গাতেও আমি গেছি, আর একবার ইস্তানবুলের এক হোটেলের ঘরে গরমের জ্বালায় আমি এমন ঘামছিলাম, যে মনে হচ্ছিল আমার শরীরের অর্ধেকটাই গলে জল হয়ে যাচ্ছে। বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, এমনকি টার্কি কিংবা কেনিয়া গেলেও

মনে হয়, একবার ফ্রান্স ছুঁয়ে গেলে হয় না। আমি এ পর্যন্ত বহু দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলেও ফ্রান্স থেকে কখনও পাইনি, কিন্তু ফ্রান্সেই গেছি সবচেয়ে বেশিবার। মার্গারিট আমাকে প্রথমে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিল, সে দেশ এখনও যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানে।

রাশিয়া যাওয়ার সময় ভাবলাম, ওদের টিকিটের সঙ্গে সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই তো ফ্রান্স ঘুরে আসা যায়। অসীম রায়ের সঙ্গে এর মধ্যে আমার আপনি থেকে তুমি'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাকে সেই মর্মে চিঠি দিতেই সে উৎসাহের সঙ্গে জানাল, ঠিক আছে, চলে এসো, আমি ছুটি নিয়ে রাখব, গাড়ি করে বেশ দূরে কোথাও বেড়াবার পরিকল্পনা করা যাবে।

সেখান থেকে প্যারিস যাব শুনে রাশিয়াতে বেশ কয়েকজন সাহেব বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত দু -এক মুহূর্ত। যেন চোখে মুখে একটা ঈর্ষার ভাব। কেউ কেউ মশকরা করে বলেছিল, প্যারিস যাচ্ছ, দেখো, হারিয়ে যেও না যেন। বী গুড।

মস্কো থেকে প্যারিসে উড়ে এসে দেখি সেখানে আগে থেকেই ভাস্কর বসে আছে, সঙ্গে তার এক বন্ধু মৃণাল চৌধুরী। এই মৃণাল বর্ধমানের এক জমিদার বাড়ির ছেলে, এখন লন্ডনপ্রবাসী; তার স্বভাবে একটুও জমিদারি মেজাজ নেই, অতি বিনীত, ভদ্র ও নির্ভরযোগ্য মানুষ।

প্রথম দু'দিন কাটল কোথায়-কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে, সেই আলোচনায়। অনেক ম্যাপ দেখা, অনেক জল্পনা। চারজনের এই দলটির দলপতি কে হবে, তা নিয়ে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলল ভাস্কর আর অসীমের মধ্যে। অসীম গাড়ি চালাবে, নেতৃত্বে তারই অধিকার, কিন্তু যে-কোনও পরিবেশে ভাস্কর তার ব্যক্তিত্ব জাহির করতেই অভ্যস্ত। দেশে থাকতে আমরা যখন ধলভূমগড় কিংবা চাইবাসার দিকে বেড়াতে গেছি, তখন ভাস্করই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলপতি হয়েছে। কিন্তু এখানে মুশকিল এই, ভাস্কর ফরাসি ভাষা একবর্ণ জানে না ফ্রান্সের রাস্তাঘাট সম্পর্কেও তার কোনও ধারণা নেই।

অসীম নির্দেশ দিল বেরুতে হবে খুব ভোরবেলা, শেষ রাতে উঠে তৈরি হয়ে নিতে হবে সবাইকে। ভাস্কর সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, কেন, অত তাড়া কীসের? আমরা প্লেন ধরতে যাচ্ছি না, কোথাও ঠিক সময়ে পৌঁছোবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। এসেছি আরাম করে বেড়াতে হুড়োহুড়ি করতে যাব কেন? ব্রেকফাস্ট ও তিন কাপ চা খেয়ে বেরুব!

আমাদেরও সেরকমই ইচ্ছে, তাই প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেল অসীম।

অসীমের বাড়ির গেট ছাড়িয়ে গাড়িটা রাস্তায় পড়ল প্রায় দশটার সময়। চমৎকার রোদ্দুরে ধোওয়া দিন। এসব দেশে রোদ দেখলেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আমি লক্ষ করেছি, রোদ্দুরের সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে, যখন যেদেশে গেছি, রোদ পেয়েছি। এমনকি একবার সুইডেন গিয়েছিলাম অক্টোবর মাসে, সবাই বলেছিল, ওই সময় সুইডেনে সব সময় বৃষ্টি আর কুয়াশা, দিনের বেলাতেও রাস্তা দেখা যায় না, গাড়িগুলো ফগ লাইট জ্বেলে চলে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি প্রায় দিন দশেক স্টকহলমে রইলাম, মাঝে মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি ছাড়া আকাশ পরিষ্কার, দুপুরবেলা ঝকঝকে, সেখানকার অনেকেই বলেছে, এমন নাকি বহু বছর হয়নি। রোদ্দুরের সঙ্গে আমার এমনই বন্ধুত্ব যে দু-দুবার আমি চেরাপুঞ্জি গেছি, একবারও বৃষ্টি দেখিনি।

ঠিক হয়েছে যে, প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে নেমে যাব। বড় রাস্তা না ধরে, ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে যাব গ্রামের পথে, রাত্তির হয়ে গেলে যে জায়গাটা পছন্দ হবে, সেখানে কোনও হোটেলে উঠে পড়ব। দুপুরবেলা রুটি, মাখন, চিজ, সসেজ, পাতে, ওয়াইন আর কিছু ফল কিনে নিয়ে রাস্তার ধারেই কোনও গাছতলায় পিকনিক হবে। রাত্তিরবেলা কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়া হবে খাঁটি ফরাসি ডিনার।

পশ্চিম দেশগুলিতে গাড়ির ড্রাইভারদের তো বটেই, ড্রাইভারের পাশে যে বসে তাকেও সিট বেল্ট বাঁধতে হয়। আমি ওই জন্য পারতপক্ষে, সামনের সিটে বসি না। অভ্যেস নেই, বলেই

সিট বেল্ট বাঁধলে কেমন যেন বন্দি বন্দি লাগে। আমি আগেভাগেই পেছনের দরজা খুলে উঠে এসেছিলাম, মৃণালও আমার সঙ্গে, ভাস্কর অসীমের পাশে। দূরপাল্লার যাত্রায় একজন ন্যাভিগেটর লাগে, ম্যাপ ছাড়া উপায় নেই। ভাস্কর কোলের ওপর একটা ম্যাপ খুলে বসেছে, বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে একটা চুরুট। সেটা জ্বালানো হয়নি। অসীম রায়ের গাড়িতে চাপতে গেলে কয়েকটা নিয়ম মানতে হয়। অসীম নিজে যদিও একজন স্মোকার, কিন্তু তার গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় কেউ সিগারেট খেতে পারবে না। কোনও এক সময় তার গাড়িতে অতি হাওয়ার বেগে কারুর হাত থেকে সিগারেট ছিটকে গিয়ে পড়েছিল অন্য একজনের গায়ে। সেই থেকে তার গাড়িতে সিগারেট নিষিদ্ধ। ভাস্কর নিয়মিত ধূমপান করে না, কিন্তু কখনও কখনও ব্যক্তিত্ব বাড়াবার জন্য সে হাতে একটা জ্বলন্ত সিগার রাখতে ভালোবাসে।

খানিক দূর যাওয়ার পর অসীম জিগ্যেস করল, ভাস্কর, দ্যাখো তো ভাই, সাঁশেরোঁ কোন দিকে?

ভাস্কর ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগল।

এক মিনিট যায়, দু-মিনিট যায়, ভাস্কর আর কোনও কথা বলে না।

অসীম অস্থিরভাবে বলল, কী হল? সামনে ক্রসিং আসছে, কোন দিকে যাব?

ভাস্কর বলল, সাশেঁরো, কই ওই নামে তো কোনও জায়গা দেখছি না?

অসীম নিজেই ম্যাপটা টেনে নিয়ে একটু দেখে বলল, এই তো। এটা কী?

ভাস্কর বলল, এটা আমি আগেই দেখেছি। কিন্তু এটা তো সেইন্ট চেরন।

অসীম বলল, এটা ইংল্যান্ড নয়। মনে রাখবে, সেন্ট ফরাসিতে হয় সাঁ, আর সিএইচ-এর উচ্চারণ শ।

ভাস্কর বলল, আর যেখানে সেখানে একটা করে চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দিলেই হয়, তাই তো!

অসীম ভাস্করের দিকে করুণার চোখে তাকাল। যেন ভাস্কর একটি অবোধ শিশু। আরও খানিকটা বাদে অসীম আবার জিগ্যেস করল, ভাস্কর, চট করে দেখো তো, শারত্র ডান দিকে, না বাঁ দিকে।

ভাস্কর আবার গভীর মনোযোগের সঙ্গে মানচিত্র দেখতে লাগল। সম্পূর্ণ নিঃশব্দ।

অসীম তাড়া দিয়ে বলল, ম্যাপটা ভালো করে দ্যাখো। তোমাকে সামনে বসিয়েছি কী জন্য?

ভাস্কর বলল, দূর ছাই, এই ম্যাপে নেই, অন্য ম্যাপে আছে বোধহয়।

অসীম ম্যাপটা নিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই যে এত বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, তাও দেখতে পাচ্ছ না।

ভাস্কর বলল, এটা তো দেখছি চারট্রেস।

অসীম বলল, একটু আগেই বললুম, সি-এইচ হবে শ!

ভাস্কর বলল, শারট্রেস। কিন্তু তুমি যে জাঁ পল সার্ত্র না কী যেন বললে!

অসীম বলল, ওঃ! এত বছর ইংলন্ডে রইলে ভাস্কর, সামান্য একটু ফরাসিও কী শেখোনি?

ভাস্কর উষ্মার সঙ্গে বলল, কী দুঃখে শিখতে যাব? এ দেশে স্ট্রিট সাইনের কোনও মাথামুণ্ডু নেই, আগে থেকে কিছু বোঝা যায় না। এদেশের উচিত ইংল্যান্ডে গিয়ে শিখে আসা। আমাদের ওখানে যে-কোনও মোড়ের দশ মাইল আগে থেকে সব রাস্তা দেখিয়ে দেয়, চোখ বুজে গাড়ি চালানো যায়। আর এদেশের ড্রাইভারগুলোও তো দেখছি গাড়লের মতন গাড়ি চালায়, কেউ কারুকে রাস্তা ছাড়ে না।

অসীম এ কথায় একটুও রাগ না করে হো-হো করে হেসে উঠে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাস্করকে খুব জব্দ করা গেছে, অ্যাঁ। এখানে গাড়ি থামিয়ে একটা বিড়ি খেয়ে নেওয়া যাক।

গাড়ি থামতেই ভাস্কর দরজা খুলে বলল, আমি পেছনে বসব, মৃণাল ভালো ন্যাভিগেটর

হতে পারব।

পেছনের সিটে আসা মানেই নেতৃত্বপদ থেকে ভাস্করের পতন।

আধ ঘণ্টাটাক মন-মরা হয়ে রইল ভাস্কর। তারপর হঠাৎই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল তার ব্যক্তিত্ব। বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাস্কর বলল, বাঃ, এই জায়গাটা বেশ সুন্দর তো। দারুণ সবুজ। অসীম, আমরা এখানেই কোথাও থেমে দুপুরের খাবার খাব!

অসীম বলল, আর একটু এগিয়ে যাই, সামনে আরও ভালো জায়গা পাওয়া যাবে।

ভাস্কর বলল, এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখানে গাড়ি থামাও! ওই তো সামনেই একটা খাবার-দাবারের দোকান আছে দেখতে পাচ্ছ না!

খানিকক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর অসীমকে মেনে নিতেই হল, ভাস্করের জয় হল।

জায়গাটা খুবই নিরিবিলি এবং সুন্দর। একটু দূরেই মাঝারি ধরনের একটা সুপার মার্কেট, পাশে একটা পেট্রোল পাম্প। পথে একটা জলাশয় দেখে এসেছি, এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে পিকনিকে বসব।

বাজার করার ভার ভাস্কর আর মৃণালের ওপর, ওরা চলে গেল দোকানে। অসীম পেট্রোল পাম্পে গেল কিছু একটা দেখাতে। দলের মধ্যে আমিই বলতে গেলে নিষ্কর্মা।

এক প্যাকেট সিগারেট কেনার জন্য একটা কাফের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েও আমি রাস্তার ধারে জায়গাটার নাম দেখে থমকে দাঁড়ালাম। জায়গাটার নাম লুদাঁ। লুদাঁ? এই নাম যে আমার খুব চেনা। এই নামে কি একাধিক জায়গা থাকতে পারে? আর একটা বড় রোড সাইন দেখলাম, এই জেলার নাম পোয়াতিয়ে। আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। পোয়াতিয়ে জেলার লুদাঁ, এটাই তো মার্গারিটের গ্রাম। কী অদ্ভুত যোগাযোগ, এই লুদাঁ-তেই আমাদের গাড়ি থামল।

সুপার মার্কেটের সামনে কিছু নারী-পুরুষ যাতায়াত করছে। ওদের মধ্যে মার্গারিট থাকতে পারে না? একজন মহিলা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলছেন, অনেকটা মার্গারিটের মতনই তো দেখতে। এখানে হঠাৎ মার্গারিটের দেখা পাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব?

পল এঙ্গেল দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি মার্গারিটের পুরো খবর প্রথমে কিছুতেই বলতে চাননি। একদিন আমি পল এঙ্গেলকে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে একটা বাংলা সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', ইংরিজি সাব টাইটেল ছিল। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, কিছুতেই সেই ফিলমটা পুরো দেখানো গেল না। তখন কলকাতা শহরে লোডশেডিং নামে ব্যাপারটা সবে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছে, সিনেমা দেখতে-দেখতে তিনবার আলো নিভল আর জ্বলল, তারপর মাঝামাঝি জায়গায় এসে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে ঘুটঘুটে কালো রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম গড়িয়াহাট ব্রিজের দিকে। এক সময় আমি ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম, পল, সত্যি করে বলো তো, মার্গারিটের কী হয়েছে? যতই মর্মান্তিক হোক আমি শুনতে চাই। তুমি বলো।

পল এঙ্গেল তবু খানিকটা দ্বিধা করে বললেন, আমি ঠিক জানি না, যতটা শুনেছি, খুবই দুঃখের ব্যাপার, তুমি তো জানো, মেয়েটি কত সরল ছিল। একদিন সন্ধেবেলা সে কোনও একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এমন সময় তার পাশে একটা গাড়ি থামে। কয়েকজন কালো লোক ছিল সেই গাড়িতে, খুব সম্ভব নেশাগ্রস্ত। তারা মার্গারিটকে একটা ঠিকানার কথা জিগ্যেস করে, তারপর সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মার্গারিটকে গাড়িতে তুলে নেয়। ওইরকম অবস্থায় কোনও মেয়েরই অপরিচিতদের গাড়িতে ওঠা উচিত নয়। কিন্তু মার্গারিট ওদের বিশ্বাস করেছিল। ওরা সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয়নি।

আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিগ্যেস করেছিলাম, তারপর?

পল এঙ্গেল বলেছিলেন, তারপর আর কিছু নেই। সেই থেকে মার্গারিট অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওই লোকগুলি খুব সম্ভবত মেয়েটিকে—

আমি বললাম, কেন? এমন হতে পারে না, ওদের মধ্যে কোনও একজন নিগ্রোকে, মানে, কালো লোককে ওর পছন্দ হয়ে গেছে, তাকে বিয়ে করে মার্গারিট ওদের সঙ্গেই কোথাও আছে?

পল এঙ্গেল বললেন, সেটা খুবই আনলাইকলি। কোনও শ্বেতাঙ্গ মেয়ের পক্ষে একজন কালো লোককে বিয়ে করা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। আজকাল অনেকেই তো করে। সেরকম হলে ওরা গোপন রাখবে কেন? মার্গারিট তার বন্ধু-বান্ধবদের এটা নিশ্চয়ই জানাত। না, সুনীল, আমার মনে হয়, সে আর নেই।

আমি তবু জোর দিয়ে বলেছিলাম, পুলিশ তার খোঁজ করেনি? পুলিশ কিছু জানতে পারেনি?

পল এঙ্গেল বললেন, পুলিশ অনেক তোলপাড় করেছে, খবরের কাগজে তিন চারদিন হইচই হয়েছে। কিন্তু মার্গারিটের শরীরটাও পাওয়া যায়নি। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, বললাম না?

একটু থেমে পল এঙ্গেল বললেন, এসবই আমার শোনা কথা। আমার ভুলও হতে পারে।

এরকম দুঃসংবাদ কেউ ভুল শোনে না। তা ছাড়া ঘটনাটা মার্গারিটের চরিত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমেরিকায় কালো মানুষরা নিপীড়িত ও নির্যাতিত বলে তাদের প্রতি মার্গারিটের বেশি বেশি সহানুভূতি ছিল, সে আগ বাড়িয়ে তাদের উপকার করতে যেত। কিন্তু তাদের মধ্যে মাতাল, গুণ্ডা খুনিও তো কম নয়। শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সর্বনাশ করতেও তারা অনেকে উৎসুক। আয়ওয়াতে আমার একদিনের ঘটনা মনে আছে। মার্গারিট তিনজন দৈত্যাকৃতি কালো মানুষকে নিয়ে এসেছিল। তারা রাস্তায় মার্গারিটকে কোনও একটা কফির দোকানের কথা জিগ্যেস করেছিল, মার্গারিট তাদের কফি খাওয়াতে চায়।

আমার স্পষ্ট মনে হয়েছিল, লোকগুলোর মতলব ভালো ছিল না, তাদের মুখে মদের গন্ধ, চোখে ধূর্ত দৃষ্টি। তারা ভেবেছিল, মার্গারিট একা থাকে, ঘরের মধ্যে আমাকে বসে থাকতে দেখে তারা ঈষৎ বিচলিত হয়েছিল। আমাকে তারা মোটেই পছন্দ করেনি, আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি, ইচ্ছে করলে তারা সেদিন আমাকেও খুন করে রেখে যেতে পারত।

মার্গারিট হারিয়ে গেছে, তার শরীরটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি?

ওরা সাধারণত তাই করে, কোনও চিহ্ন রাখতে চায় না। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোনও নোংরা ডোবার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এরকম বীভৎস কাণ্ড হয়েছিল বলেই কি মার্গারিটের বাবা-মা আমার চিঠির উত্তর দেননি? ওঁরাও কি আর বেঁচে আছেন এতদিন?

এমনও তো হতে পারে, মার্গারিটকে ওরা প্রাণে মারতে পারেনি, মার্গারিটের শরীর বিকৃত, বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। সেই জন্যই সে চেনাশুনো কারুর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেনি। তাহলে কি আমাকেও চিঠি লিখবে না? আমার সঙ্গে তো তার শরীরের সম্পর্ক ছিল না।

এই সেই লুর্দ। মার্গারিট বলেছিল, লুর্দ একটা গ্রাম, কিন্তু এখন আর তেমন গ্রাম বলে মনে হয় না! সুপার মার্কেট আছে, প্রচুর গাড়ি, তবে গাছপালাও প্রচুর। মার্গারিটের বাড়ির ঠিকানাটাও মনে নেই, লিখেও আনিনি। মার্গারিটের চেহারা যতই বদলে যাক, আমি ঠিক চিনতে পারব। তার কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজে। সুপার মার্কেটের সামনে যেখানে গাড়িগুলি পার্ক করা, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনও মহিলাকেই মার্গারিটের মতন মনে হয় না, কেউ আমার দিকে তাকায় না। কাকে গিয়ে মার্গারিট বিষয়ে প্রশ্ন করাটা বোধহয় অতি নাটকীয় হয়ে যাবে।

আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে যেন একটা গাছ হয়ে যাচ্ছি। এই লুর্দ গ্রামে এক সময় মার্গারিট খেলা করত, এখানেই সে বালিকা বয়েস থেকে কৈশোরে পৌঁছেছিল। সামনের দিকে একটা চার্চের পাশ দিয়ে ছোট রাস্তা চলে গেছে, এই রাস্তা দিয়ে সে হেঁটেছে বহুবার। এখানকার মেয়ে হয়ে সে কবিতা ও কবিদের এত ভালোবাসতে শিখল কী করে? সব সময় সে একটা শিল্পের ঘোরের মধ্যে থাকত, বাস্তবজ্ঞান ছিল না একেবারেই। এরকম

একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এই পৃথিবী বাঁচতে দিল না? সত্যিই মার্গারিট একেবারে হারিয়ে গেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। তার শরীরটা আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখানে অন্য যেসব তরুণীদের দেখছি, তারা কেমন যেন সদা ব্যস্ত, সংসারী ধরনের। কেউ কেউ বেশ রূপসি, কিন্তু কারুকেই মার্গারিটের মতন কাব্য-পাগল মনে হয় না। হঠাৎ কোনও গাড়ির আড়াল থেকে মার্গারিট এসে আমার সামনে দাঁড়াল, মেঘলা রাতের জ্যোৎস্নার মতন হাসল, পৃথিবীতে এমন মিরাকল কি ঘটতে পারে না?

পেছন থেকে ভাস্কর এসে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার ঘোর ভাঙাল।

ভাস্কর মার্গারিটের প্রসঙ্গ কিছুটা জানত। অসীমকে সংক্ষেপে জানালাম।

ভাস্কর বলল, ওদের পদবি ছিল ম্যাতিউ, চলো, লোকদের জিগ্যেস করে ম্যাতিউদের বাড়িতে একবার খোঁজ নেওয়া যাক।

অসীম এর ঘোর বিরুদ্ধে। কুড়ি বছর পরে কোনও মহিলার খোঁজ করতে হঠাৎ তাদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। অসীমের দৃঢ় ধারণা, সে মেয়েটি বেঁচে থাকতে পারে না। যদি কোনওক্রমে সে বেঁচেও থাকে, তা হলে ও এতগুলো বছর সে যখন কোনও যোগাযোগ রাখেনি, তখন জোর করে তার সন্ধান করতে যাওয়াও অসভ্যতা!

ভাস্কর তবু বলল, মেয়েটার বাড়ি অন্তত দেখে আসতে দোষ কী? ভাস্কর এগিয়ে গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোককে জিগ্যেস করল, এখানে ম্যাতিউ পরিবারের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?

বৃদ্ধটি সাদা চোখে তাকিয়ে রইলেন। ভাস্করের ইংরিজি এক বর্ণ বুঝতে পারেননি।

অসীম বলল, এটা কি একটা পশ্চিমবাংলার গণ্ডগ্রাম? ঠিকানা ছাড়া বাড়ি খোঁজা যায়?

ভাস্কর তবু ছাড়বে না। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে টেলিফোন গাইড দেখল। সুদ্যাঁ একটা গ্রাম হলেও এখানে প্রত্যেক বাড়িতে ফোন আছে, গাইডে দেখা গেল ম্যাতিউ নামে দশ-এগারো জন। তাদের বিভিন্ন ঠিকানা।

অসীম বলল, এখন কি এদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে একটি মেয়ের খোঁজ করা যায়? বিশেষত, মেয়েটি যদি বহুকাল আগে হারিয়ে গিয়ে থাকে...

আমার দিকে তাকিয়ে অসীম বলল, মার্গারিট হঠাৎ তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করেছিল, এটা অস্বাভাবিক, অন্তত ক্রিসমাস কার্ড পাঠাতই, নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে...

আমি চুপ করে রইলাম। যদি ঠিকানা খুঁজে পাওয়াও যায়, তবু মার্গারিটের বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না।

অসীম জোর দিয়ে বলল, আমরা এখানে খাব না। এখানে বসে থাকলে সুনীলের আরও মন খারাপ হবে। চলো ভাস্কর, আমরা আরও এগিয়ে যাই।

॥ ১৯ ॥

"আমি দাঁড়িয়ে আছি এই নারীসুলভ ভূমিদৃশ্যের সামনে
যেন আগুনের সামনে একটি বালক
ঠোঁটে অস্পষ্ট হাস্য চোখে অশ্রুবিন্দু
এই দৃশ্যের সামনে আয়না ঝাপসা হয়ে যায়,
আয়না ঝকঝক করে, প্রতিফলিত হয় দু'টি নগ্ন শরীর
এক ঋতুর প্রতি অন্য ঋতু"

—পল এলুয়ার

শহর দিয়ে কোনও দেশকে প্রকৃতভাবে চেনা যায় না। খুব বড় কোনও শহর কিংবা রাজধানী সেই দেশের মস্তিষ্ক ঠিকই, তাতে অনেকরকম বাহার থাকে বটে, আবার শিরঃপীড়াও কম থাকে না। প্রত্যেক বড় শহরই তার ভেতরে ভেতরে কিছু ক্ষত লুকিয়ে রাখে। কোথাও বেশি, কোথাও কম। কলকাতায় অনেক বস্তি-টস্তি আছে, তা বলে লন্ডন-প্যারিস-নিউ ইয়র্ক-প্রাগ-মস্কো-বেইজিং-এ বস্তি-ব্যারাক-বেশ্যালয় একেবারে নেই, তাও তো নয়!

আমরা ঠিক করেছিলাম, ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলই বেশি করে দেখব। রাত কাটাব ছোট্ট কোনও সরাইখানায়। বাঁধা পথে যাব না। আজকাল উন্নত দেশগুলির উন্নতির প্রধান চিহ্ন হচ্ছে রাস্তা। সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য রাস্তা এবং কোথাও একটুও ভাঙাচুরো নয়। ব্যস্ত মানুষদের জন্য আছে সুপার হাইওয়ে কিংবা অটো রুট, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, এবং সেইসব রাস্তায় পড়লেই বোঝা যায়, প্রতিদিন এই বহু ব্যবহৃত পথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের নজর আছে। অবশ্য সেজন্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পয়সাও নেওয়া হয় যথেষ্ট।

অটো রুটগুলি যেহেতু জনবসতি এড়িয়ে চলে, তাই দৃশ্য হিসেবে একঘেয়ে। আমার ভালো লাগে না। আমাদের কোথাও পৌঁছবার তাড়াহুড়ো ছিল না বলে আমরা গ্রাম্য পথ ধরেছিলাম। গ্রামের রাস্তা দেখলেই বোঝা যায় একটা দেশের প্রকৃত শক্তি কতখানি। এই সব দেশে এমন একটা গ্রামও নেই, যেখানে গাড়ি করে পৌঁছনো যায় না। গ্রামকে বঞ্চিত করে এরা এখন আর শহরের মাথা ভারী করে না, বরং শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধে এরা গ্রামের দ্বারপ্রান্তে এনে দেয়।

ছোট রাস্তা মানেই একটু ঘোরা পথ। তাতেও ক্ষতি নেই, আমরা মোটামুটি মানচিত্র ধরে নেমে যাচ্ছি নীচের দিকে। পোয়াতিয়ে ছাড়িয়ে ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এক সময় নেমে এলাম সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র মানে আটলান্টিকের ব্যাক ওয়াটার। ম্যাপে দেশের মধ্যে ঢুকে পড়া এক চিলতে নীল রেখা দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সামনে এলে সমুদ্র বলেই মনে হয়। আকাশ ও জলের রং একই রকম নীল, পরপার দেখা যায় না। এখানে গাড়িসুদ্ধু ফেরিতে পার হতে হবে। আর কী সুন্দর দিনটা। জাহাজের ডেকে দুটি ছেলে তাদের গায়ের জামা খুলে রোদ পোহাতে লাগল। সাহেবরা যেমন ঘরের মধ্যেও গলা-টেপা টাই পরে থাকে, তেমনি লোকজনের সামনেও খালি গা হতে এদের দ্বিধা নেই। যুবক দুটির স্বাস্থ্য এমন চমৎকার যে তাদের তরুণ দেবতার মতো মনে হয়! কেন দেবতার মতন মনে হল? আমি নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। আমাদের সব দেব-দেবীরাই খুব ফরসা! বহুকাল ধরে আমাদের পুরাণ, ধর্মগ্রন্থগুলিতে এরকমই বর্ণনা দেওয়া আছে। মানুষ তার ভগবান কিংবা ঠাকুর-দেবতাদের তো নিজের আদলেই গড়েছে, তা হলে ভারতীয়দের মতন চেহারার কেউ দেবতা হতে পারবে না কেন? কালো মানুষদের জন্য কালো ঈশ্বর নেই?

জিরঁদ প্রণালী পেরিয়ে খানিকটা নামলেই বোরদো শহর।

যারা দ্রাক্ষা-আসব রসিক, তাদের কানে বোরদো নামটা শোনালেই চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটবে। বোরদো'র ওয়াইন ভুবনবিখ্যাত। তা ছাড়া বোরদো শহরের খ্যাতির অনেক কারণ আছে।

ভাস্কর ব্রিটিশ নাগরিক, অসীম ফরাসি। বহু শতাব্দী ধরে ফরাসি-ইংরেজদের ঝগড়া এখনও তলায় তলায় রয়ে গেছে, ক্ষণে ক্ষণে শ্লেষ-বিদ্রুপ ছোড়াছুঁড়ি হয়। আমাদের এই দুই বাঙালি বন্ধুও এক এক সময় ব্রিটিশ ও ফরাসি হয়ে যায়।

বোরদো শহরটি বড়ই সুশ্রী। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে গারোন নদী, শহরের মধ্যে বড় বড় উদ্যান, ক্যাথিড্রাল এবং একটি বিখ্যাত বেল টাওয়ার।

নানারকম মূর্তি শোভিত একটি বিশাল ফোয়ারার কাছে আমরা মধ্যাহ্নভোজে বসেছি, এমন সময় ভাস্কর বলল, এই শহরটাকে বেশ সুপুরুষ দেখতে। ইংরেজরা বানিয়েছে তো!

অসীম সঙ্গে-সঙ্গে বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ভাস্কর? খোদ ব্রিটেনে এত সুন্দর

শহর একটাও আছে যে ফ্রান্সে এসে এমন গড়বে ইংরেজরা?

ভাস্কর বলল, বোরদো একসময় ইংরেজদের সম্পত্তি ছিল না? রাজা দ্বিতীয় হেনরি এটা বিয়ের যৌতুক হিসেবে পায়নি? দ্বিতীয় রিচার্ডের জন্ম হয়েছিল এই শহরে। তুমি ইতিহাসের কিস্যু জানো না।

অসীম বলল, ওসব ইস্কুলের ইতিহাস সবাই জানে। এই জায়গাটা ইংরেজদের ছিল সে কতকাল আগে। এটা একসময় ছিল রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে, তারপর ইংরেজরা কিছুদিন রাজত্ব করে গেছে, কিন্তু ফিফটিনথ সেঞ্চুরিতে ফরাসিরা এটা আবার জিতে নেয়। এই যে এখানকার এত বড় বড় সব বাড়িঘর, আর বাগান দেখছ, সব ফরাসি আমলে তৈরি। বোরদো ফ্রান্সের খুব বড় একটা ব্যাবসার কেন্দ্র।

ভাস্কর বলল, ইংরেজরাই এই জায়গাটাকে সভ্য করে দিয়ে গেছে। আগে এরা ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও কিস্যু জানত না।

আমিই বা এখানে একটু বিদ্যে ফলাতে ছাড়ি কেন? গাড়ি চলবার সময় আমার যেহেতু কোনও কাজ নেই তাই আমি জায়গাগুলোর কিছু কিছু তথ্য-বিবরণ ও ইতিহাস পড়ে নিই। আমি বললাম, আসলে এই চমৎকার শহরটার উন্নতির মূলে আছে আফ্রিকা।

ওরা অবাক হয়ে তাকাতেই আমি আবার বললাম, এই সব বড় বড় গির্জা-ক্যাথিড্রাল ও স্তম্ভওয়ালা বাড়িগুলো তৈরি হয়েছে কালো মানুষদের টাকায়। ইংরেজরা শোষণ করেছে ভারতবর্ষ আর এরা শোষণ করেছে আফ্রিকা। এই বোরদো'র বিশেষ সমৃদ্ধি হয়েছিল দু-শো বছর আগে, তখন এরা আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে চালান দিত ওয়েস্ট ইন্ডিজে। তা ছাড়াও আফ্রিকা থেকে আনত চিনি আর কফি। আর সেখানে এরা বিক্রি করত মদ আর বন্দুক। একেই বলা হত 'ত্রিকোণ ব্যাবসা'।

অসীম আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

বোরদো শহর ছাড়িয়ে আমরা যেতে লাগলাম ক্রোশের পর ক্রোশ আঙুর খেতের পাশ দিয়ে। এখানকার জমির দাম নাকি সোনার টুকরোর সমান। যতদূর চোখ যায়, শুধু আঙুর গাছ, সেগুলি বুক সমান উঁচু মাচার ওপর তুলে দেওয়া। লাল ও সাদা আঙুর ফলে আছে। আমাদের দেশ হলে নিশ্চিত চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হত, কিন্তু এখানে কোথাও জনমনুষ্য নেই, কাঁটা তারের বেড়া নেই। গাড়ি থামিয়ে নেমে আমরা এক জায়গায় বেশ কিছু আঙুর তুললাম, শিকারি কুকুর নিয়ে কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে এল না।

অসীম বলল, শুধু আঙুরের তো দাম বেশি নয়, ওয়াইন তৈরি হওয়ার পর মূল্য হয়। এমনি খাবার জন্য কেউ কয়েক থোকা আঙুর তুললে এরা গ্রাহ্য করে না।

আঙুর খেতের সামনে লাল লাল ফুল দেখে আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল, ওই বুঝি আঙুরের ফুল। তা নয়, ওগুলো এক ধরনের গোলাপ, সামনের দিকে দু-এক সারি ওই গাছ লাগিয়ে রেখেছে খুব সম্ভবত শোভা বৃদ্ধির জন্য। হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে, কিন্তু খেতগুলির সামনের দিকে ফুলের পাড় দেখতে চমৎকার লাগে। এ দেশের চাষিদেরও সৌন্দর্যবোধ আছে।

প্রথম রাত কাটাবার জন্য আমরা উঠলাম একটা ছোট্ট হোটেলে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তেই দুটো-তিনটে করে হোটেল। এত হোটেল, তবু জায়গা পাওয়া সহজ নয়। সন্ধের পর হোটেলের সন্ধানে আমাদের গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যেতে হয়, অনেক হোটেলের সামনেই লেখা আছে সব ঘর ভরতি। কোনও হোটেলে ঘর খালি থাকলেও পরিবেশটা আমাদের পছন্দ হওয়া দরকার, একেবারে জনবসতির মাঝখানে আমরা থাকতে চাই না।

হোটেলগুলির ভাড়া কিন্তু বেশি নয়। মাথা পিছু ষাট-সত্তর টাকা পড়ে। হোটেল মালিকদের সঙ্গে দরাদরি করার খুবই ইচ্ছে ভাস্করের, কিন্তু তারা ইংরিজি না বুঝলে ভাস্কর খুবই নিরাশ হয়ে যায়। কেউ কেউ ভাঙা ইংরিজি বলে এবং টুরিস্টদের কাছে সেই ইংরিজি জ্ঞান জাহির করতেও চায়। অসীম এত বছর এদেশে আছে, তার ধারণা, হোটেলের ভাড়া একেবারে নির্দিষ্ট, এখানে দরাদরি করার প্রশ্নই নেই, কিন্তু ভাস্কর ইংরিজি বলার একটু সুযোগ পেলে কিছুতেই ছাড়ে না। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, হোটেলের মালিকের সঙ্গে দু'মিনিটের আলাপে গলাগলি বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে দশ-কুড়ি টাকা ভাড়া কমিয়েও ফেলে।

অধিকাংশ হোটেলেই খাবারের ব্যবস্থা নেই। গাড়ি পার্ক করে, পোশাক বদলে আমরা রাত্তিরবেলা হেঁটে-হেঁটে রেস্তোরাঁ খুঁজতে যাই। সত্যিকারের গ্রাম, কিন্তু একটাও খোলার চালের বাড়ি কিংবা ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ে না। দোকানগুলি জিনিসপত্রে ঠাসা। তবে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে যে-সব পুরুষদের দেখা যায়, তারা অধিকাংশই ইতালিয়ান কিংবা গ্রিক। ওইসব গরিব দেশ থেকে শ্রমিকরা এখানকার গ্রামের খেতে-কলকারখানায় কাজ করতে আসে, ফরাসি তরুণরা উন্নত কাজের আশায় শহরে চলে যায়।

ভাস্কর আর অসীমের মতন দুই ব্যক্তিত্বের এক ঘরে স্থান হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া নাক ডাকার একটা সমস্যা আছে। দু'টি ঘরের একটিতে থাকে অসীম আর মৃণাল, অন্যটিকে ভাস্কর ও আমি। ভাস্করের বেশি রাত জাগা স্বভাব, অসীম সারাদিন গাড়ি চালায় বলে পরিশ্রান্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চায়। ভাস্কর আর মৃণাল দুজনেই গাড়ি চালানোতে দক্ষ, কিন্তু অসীম ওদের হাতে কিছুতেই নিজের গাড়ি ছাড়বে না। কারণ ওরা ইংরিজিমতে গাড়ি চালায়, ফরাসি মতটা তার ঠিক উলটো। ফরাসি গাড়ির স্টিয়ারিং বাঁদিকে, ইংরিজি গাড়ির ডান দিকে। সম্ভবত রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ শুধু ব্রিটেন, ভারত আর দু-চারটে কলোনিতে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ভাস্করের সঙ্গে আমার অনেক রাত পর্যন্ত গল্প চলে।

প্রথম রাতে ভাস্কর একসময় আমাকে জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, ওই লুদাঁ গ্রামের মার্গারিট নামে মেয়েটার সঙ্গে তোর যদি সত্যিই দেখা হয়ে যেত, তা হলে তুই কী করতিস?

আমি চুপ করে রইলাম।

ভাস্কর আবার বলল, মেয়েটা তোকে এত ভালোবাসতো, সে বেঁচে থাকলে তোর সঙ্গে হঠাৎ সব যোগাযোগ বন্ধ করে দেবে কেন? মেয়েটার সব কথা শুনে মনে হয়, এরকম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

ভাস্কর বলল, এই পৃথিবীটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে, যারা সত্যিকারের ভালো, তাদের কোন জায়গা নেই। আমাদের মতন তেয়েঁটে লোকরাই শুধু এখানে টিকে থাকতে পারে। মার্গারিটের জন্যই তুই ফ্রান্স এত ভালোবাসিস, তাই না?

এবার আমি হেসে বললাম, আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সাঁওতাল পরগনা।

পরের রাতটা আমরা কাটালাম লাস্কোর কাছে এক গ্রামের মধ্যে। এবার কোনও হোটেলেও না, এক চাষির বাড়িতে।

দরদোন উপত্যকা পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম লাস্কোতে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি দেখলে রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় জাগে। দরদোন-এর এমন সুবিশাল ও গভীর গিরিখাদ আমি আগে বা পরে কখনও দেখিনি। আর লাস্কো, এখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র। বেশিদিন আগের কথা নয়, মাত্র এই ১৯৪০ সালে আদিম মানুষদের এই চিত্রসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড় ও জঙ্গল এলাকা, চারটে ছেলে এখানে তাদের একটা হারানো কুকুর খুঁজতে-খুঁজতে লাস্কোর গুহার

মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সন্ধের পর আমরা পৌঁছলাম সেই অঞ্চলে। পরদিন গুহা দেখা হবে, আগে রাত্তিরের মতন থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে উৎসাহী লোকেরা লাস্কোর গুহাচিত্র দেখতে আসে বলে এখানে নানারকম হোটেল আছে। রাস্তার ধারে ধারে গাছের গায়ে টাঙানো বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, কোনও-কোনও চাষির বাড়িতেও রাত্রির শয্যা ও সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা আছে।

আমিই বেশি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, হোটেলের বদলে চাষির বাড়িতে থাকব। ওদের জীবনযাপনটাও খানিকটা দেখা হবে। আমার এই প্রস্তাবে অসীম প্রথমে রাজি হতে চায়নি, কারণ মূল রাস্তা ছেড়ে অনেকটা ভেতরে যেতে হবে, লাস্কো গুহা দেখতে হলে যাওয়া-আসায় পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটার বেশি লেগে যাবে। অনেক পীড়াপীড়িতে অসীম গাড়ি ঘোরাতে রাজি হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রিবাসে আমাদের হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

চাষির বাড়িটি দোতলা, পাথরের। কাছাকাছি হাঁস-মুরগি রাখার জায়গা আর গোরুর গোয়াল। সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। বেল বাজাতে দরজা খুললেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। চাষির বউ বললে আমাদের মনে যে ছবি ফোটে তার সঙ্গে কোনও মিল নেই, বেশ ঝলমলে স্কার্ট পরা, এবং এখনও তাঁকে বেশ রূপসিই বলা যায়, মুখখানায় ভালো মানুষের ছাপ আছে, হাসিটি সহৃদয়। ইনি একবর্ণও ইংরিজি জানেন না, সুতরাং অসীমকেই কথাবার্তার ভার নিতে হল।

এঁদের বাড়িতে এঁরা গোটা চারেক ঘর রেখেছেন সারা বছরই ভাড়া দেওয়ার জন্য। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, তা ছাড়া ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তাই খদ্দেরও ঠিক জোটে। এখন ঠিক দু'টি ঘর খালি আছে। আমরা দোতলায় উঠে দেখলাম, ঘরগুলো সাধারণ হোটেলের চেয়েও অনেক ভালো সাজানো, বিরাট বিরাট খাট, পরিষ্কার শয্যা, সিল্কের ওয়াড় দেওয়া লেপ। ভাড়া কিন্তু হোটেলের চেয়ে কম। সকালবেলা এই মহিলাই আমাদের চা ও ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দেবেন, তার জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগবে না। আমরা সবাই চোখে চোখে সম্মতি জানালাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ভাস্কর আর পারল না। মহিলার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আই অ্যাম ভাস্কর ডাট্। কামিং ফ্রম লন্ডন। ভেরি প্লিজড টু মিট ইউ।

মহিলাটি হাসি মুখে বললেন, জ্য ন পার্ল পা অংলে! ইংরিজি জানি না। লন্ডনে কখনও যাইনি। আমার নাম ওদেৎ। আমার স্বামী দোকানপাট করতে গেছে, একটু বাদেই ফিরবে।

ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও মহিলার সঙ্গে ভাস্করের ভাব জমে গেল। তিনি আমাদের কফি তৈরি করে খাওয়ালেন, এটা হিসেবের বাইরে। আগামীকাল সকালে উনি নিজেদের পালিত মুরগির ডিম খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এসব দেশে ফার্ম এগ্স রীতিমতন বিলাসিতার দ্রব্য।

গোলাবাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে-দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, র‍্যাঁবোর মা, ভাই-বোনেরা যে বাড়িতে থাকত, সেটাও কি এরকমই দেখতে ছিল? সেই বাড়িটাও কি ছিল দোতলা? এই চাষিদের অবস্থা বেশ সচ্ছলই তো মনে হয়। আমেরিকার চাষাদের দেখেছি বিরাট ধনী। সে-দেশে ক্ষুদ্র চাষি নেই-ই বলতে গেলে। আমি দেখিনি একটিও। আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষি মাত্র দশ-পনেরো বিঘে জমি চাষ করে, তাও সেচের জল পায় না, প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা অনেকখানি। এক একটি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য দু'পাঁচ বিঘে বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে তারা দিন দিন দারিদ্র্যসীমার অনেক নীচে নেমে যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে নৈশভোজের জন্য রেস্তোরাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার পর অসীম বলল, এই লাস্কো জায়গাটা শুধু গুহাচিত্রের জন্যই বিখ্যাত নয়। একটা বিশেষ খাবরের জন্যও এই জায়গাটার খুব নাম আছে। তবে খাবারটা খুব দামি।

ভাস্কর বলল, যতই দাম হোক, স্থানীয় ভালো খাবার আর ভালো ওয়াইন খেতেই হবে। জিনিসটা কী?

অসীম বলল, ফোয়া গ্রা। তোমরা নাম শোনোনি?

আমরা তিনজনেই মাথা ঝাঁকালাম দু'দিকে। ভাস্কর বলল, কী রে সুনীল, তুই তো একটু-আধটু ফ্রেঞ্চ জানিস, তুইও শুনিসনি? তোর বান্ধবী মার্গারিট তোকে এই ফোয়া-মোয়া কী বলছে অসীম, সেটা খাওয়ায়নি?

আমি বললাম, আমরা সেবার যখন প্যারিসে এসেছিলাম, আমাদের পয়সা খুবই কম ছিল, দামি খাবারের কথা চিন্তাও করিনি।

অসীম আমাদের ফোয়া গ্রা মাহাত্ম্য বুঝিয়ে দিল। তৈরির প্রক্রিয়াটি অতি নিষ্ঠুর ধরনের। এক ধরনের খয়েরি রঙের বড় বড় রাজহাঁসকে কয়েক দিন ধরে জোর করে খাবার খাওয়ানো হয়। তার ঠোঁট ফাঁক করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে শস্যের দানা। জোর করে গিলতে-গিলতে একসময় হাঁসটার মুমূর্ষু দশা হয়। তখন তার পেট চিরে বার করে নেওয়া হয় শুধু লিভারটা। সেই লিভারটাই ওই বিশেষ খাদ্য, হাঁসের মাংসটা নয়। একটা হাঁসের লিভার আর কতটুকু, সেই জন্য ফোয়া গ্রা বানাবার জন্য অনেক হাঁস মারতে হয়।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ছবির মতন সুশ্রী, নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই অর্ডার দেওয়া হল ফোয়া গ্রা আর বোরদো'র হোয়াইট ওয়াইন। ফোয়া গ্রা দিয়ে গেল নাপতে বাটির মতন ছোট্ট পোর্সিলিনের বাটিতে, দেখতে অনেকটা মাখনের মতন। পাতলা পাঁউরুটির টোস্টের ওপর ছোট ছোট টুকরোতে মাখিয়ে খেতে হয়। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলতে-দুলতে প্রথমবার মুখে দিলাম।

অনেক বিখ্যাত খাদ্যই প্রথমবার মুখে দিয়ে মনে হয়, দূর ছাই, এ আর এমন কী। এমন আমার হয়েছিল কাভিয়ের খেয়ে। আমি জীবনে প্রথম কাভিয়ের খাই লন্ডনে। কাস্পিয়ান হ্রদের স্টার্জন মাছের এই ডিমও পৃথিবীতে অতি দুর্মূল্য খাদ্য। প্রথমবার খেয়ে আমার মনে হয়েছিল, এর এত দাম? এর চেয়ে আমাদের ইলিশের ডিম অনেক ভালো। পরে রাশিয়াতে গিয়ে আমি আবার বেশ কয়েকবার কাভিয়ের খেয়ে তার টেস্ট অ্যাকোয়ার করেছিলাম। প্রথম বার শ্যাম্পেইন কিংবা রয়াল স্যালিউট আস্বাদ করেও আমাকে হতাশ হতে হয়েছিল।

কিন্তু ফোয়া গ্রা প্রথম মুখে দিয়েই মনে হল, এমন সুস্বাদু দ্রব্য আগে কখনও খাইনি। মুখের মধ্যে যেন একটা আনন্দের উপলব্ধি ছড়িয়ে যায়।

ওইটুকু খাবার পাঁচ মিনিটে শেষ। ভাস্কর বলল, মুখে দিতে দিতেই যে মিলিয়ে গেল, অসীম, আবার অর্ডার দাও। আমি সব দাম দেব।

ওদেশে ওদের সুবিধে এই, পকেটে টাকা-কড়ি কম থাকলেও অসুবিধে নেই। যে-কোনও জায়গায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যায়। গ্রামের রেস্তোরাঁও সেইসব কার্ড মান্য করে।

অসীম বলল, দামের জন্য নয়, বেশি ফোয়া গ্রা খেলে পেট গরম হতে পারে শুনেছি।

ভাস্কর বলল, গুলি মারো পেট গরম। আগে তো প্রাণ ঠান্ডা হোক।

আবার এল ফোয়া গ্রা। সেই সঙ্গে হোয়াইট ওয়াইন তো থাকবেই। এখানকার ওয়েটাররা এমন চালু যে কিছু একটা খাবারের অর্ডার দিলে অমনি জিগ্যেস করে, কী ওয়াইন দেব? যেন, সঙ্গে ওয়াইন পান না করাটা একটা বর্বরতা।

প্রায় ঘণ্টা দু-এক পরে আমরা ডিনার খেলাম। পেট গরম কিংবা মাথা গরম হল কি না জানি না, মেজাজটা খুব ফুরফুরে হয়ে গেল। আকাশ ভরে গেছে জ্যোৎস্নায়। রেস্তোরাঁর মধ্যে অন্য আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে গান গাইতে ফিরলাম সেই চাষির বাড়ির দিকে।

॥ ২০ ॥

"রাত্রি তুমি পবিত্র, রাত্রি তুমি পরিব্যাপ্ত, রাত্রি তুমি সুন্দর
বিশাল আঙরাখায় ঢাকা রাত্রি
রাত্রি তোমায় ভালোবাসি, তোমায় সাদর সম্ভাষণ জানাই,
তোমায় গৌরবোজ্জ্বল করি,
তুমিই আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং আমার সৃষ্টি
হে রূপসী রাত, বিশাল আঙরাখায় ঢাকা রাত
তারকা সজ্জিত আঙরাখায় ঢাকা আমার কন্যা
সেই উদার নিস্তব্ধতা, আমার অকৃতজ্ঞতার বন্যাধার
খুলে দেওয়ার আগে, যা এখানেই ছিল ছড়িয়ে..."
—শার্ল পেগি

এক একটা রাতে জ্যোৎস্নাকে মনে হয় তরল, কিংবা সাবানের ফেনার মতন, গায়ে লেগে যায়। এক একটা রাত বাতাস হয়ে যায় মখমলের মতন। এক একটা রাতে আকাশের নীচে অনেকক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করে।

আমরা ফিরে এসে দেখি চাষি পরিবার তখন খেতে বসেছে। এইসব দেশে নৈশ ভোজ সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। আমাদেরও তারা খাবর টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল।

কর্তা ও গৃহিণী ছাড়া অন্য গ্রাম থেকে এসেছে তাদের মেয়ে-জামাই এবং একটি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণী। এঁদের মধ্যে জামাইটিই একটু একটু ইংরিজি জানে, আমাদের দলের ফরাসি-ভাষী একমাত্র অসীম। তবু সকলে মিলে গল্প জমে গেল। ওরা আমাদের অনুরোধ করল নিজেদের বাড়ির তৈরি ওয়াইন পান করার জন্য, ভাস্করও নিজের স্টকের পানীয় দিল ওদের।

ওরা আগে কোনও হিন্দু (অর্থাৎ ভারতীয়) দেখিনি এত কাছ থেকে, ভারত সম্পর্কে ওদের জ্ঞানের বহর যৎসামান্য বললেও বেশি বলা হয়। আমাদের দলের দু'জন লন্ডন প্রবাসী শুনে ওরা বেশ মুগ্ধ, লন্ডন সম্পর্কে এদের বেশ একটা মোহ আছে মনে হল। এদের মধ্যে ওই জামাইটি ছাড়া আর কেউ লন্ডন দেখেনি।

বেশ সরল সাদা-সিধে মানুষগুলি, এরা প্রাণ খুলে হাসতে জানে। ভাস্কর এক বিন্দু ফরাসি না জেনেও জমিয়ে তুলল। আমরা অতদূরের ভারতবর্ষ থেকে লাস্কোর গুহাচিত্র দেখতে এসেছি শুনে বিস্ময় আর কাটে না। আমাদের অজন্তা কিংবা ভীম ভেটকার নামও ওরা শোনেনি।

পরিবারের কর্তাটি এক সময় উঠে গিয়ে আলমারি থেকে একটা পাথর এনে বলল, এটা দ্যাখো, খুব মূল্যবান জিনিস।

সেটা তিন নম্বর ফুটবলের সাইজের একটা পাথরের টুকরো, তার একদিকে সামান্য একটা মুখের আদল।

জামাইটি বলল, এখানে অনেক জমি খুঁড়ে এখনও প্রাগৈতিহাসিক পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও মূর্তি পাওয়া যায়। এটা এ বাড়ির চাষের জমিতেই পাওয়া গেছে। এরকম গোটা তিনেক।

কর্তাটি বলল, তোমাদের যদি খুব আগ্রহ থাকে, তোমাদের দিতে পারি। এই মূর্তিটা চালকোলিথিক পিরিয়ডের।

ভাস্কর পাথরটা হাতে নিয়ে বলল, বাঃ, ভারী সুন্দর জিনিস তো। সত্যি আমাদের দেবে?

কর্তাটি বলল, হ্যাঁ, নাও না। মাত্র পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক পেলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

চাষি বউটি তার মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করল। তারপর আমাকে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। কায়রো থেকে উটের পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম। একটা পিরামিডের ভগ্নস্তূপ থেকে একজন সান গ্লাস পরা লোক বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল, তোমাকে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো এক ফারাও-এর একটা মূর্তি দিতে পারি। খুব গোপনে নিয়ে যেতে হবে। এ দেশের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই এর অনেক দাম।

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। একটা এক বিঘৎ লম্বা পাথরের মূর্তি। সেটার বয়েস পাঁচ হাজার বছর নয়, খুব বেশি হলে পাঁচ মাস। কোনও পুতুল কারখানায় তৈরি। তৈরির পর খুব করে মাটি ঘষা হয়েছে।

লোকটি বলেছিল, তোমায় খুব সস্তায় দেব। মাত্র পঞ্চাশ ডলার।

আমি চাই না বলাতেও সে কিছুতেই ছাড়বে না, মূর্তিটা আমার হাত থেকে নেবে না। তার খুব ক্যাশ টাকা দরকার, একজনকে ধার শোধ করতে হবে, সেই জন্য সে এত সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, সে চল্লিশ ডলারেই বিক্রি করতে রাজি!

দর নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত সে দু-প্যাকেটে সিগারেটের বিনিময়ে সেটা দিতে রাজি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, কারখানায় তৈরি হলেও এটা মিশরীয় পুতুল তো, দু-প্যাকেট সিগারেটের বদলে নিলে ঠকা হবে না।

এখানে এই চাষিটির সাহস তো কম নয়। প্রথমেই চেয়ে বসল পাঁচ হাজার ফ্র্যাংক?

অসীম বাংলায় বলল, ভাস্কর, ওটা রেখে দাও। আমাদের বোকা ভেবে গালে চড় মারতে চাইছে।

ভাস্কর কিন্তু দাম শুনে একটুও চমকালো না। যদিও প্রথমে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল, লোকটি ওটা আমাদের বিনা পয়সায় উপহার দিতে চায়।

ভাস্কর বলল, পাঁচ হাজার ফ্রাঁ? এমন একটা ঐতিহাসিক জিনিসের আরও অনেক বেশি দাম হওয়া উচিত।

লোকটি উৎসাহিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, একজন বিশেষজ্ঞ দেখে বলেছিল, এর দাম অনায়াসে দশ হাজার হতে পারে।

ভাস্কর বলল, দশ কেন, চোদ্দো-পনেরো হাজার ফ্রাঁ-ও হতে পারে। দাম কমিও না একদম। কাঁধে দুটো ক্যামেরা ঝোলানো টাক-মাথা কোনও আমেরিকান টুরিস্ট পেলেই বেচে দিও। সঙ্গে যদি তার একটা কবি বউ থাকে, তা হলে শিওর তুমি ভালো দাম পাবে! আমাদের মতন ফেকলু পার্টিকে খবরদার যেন এ জিনিস আর কক্ষনো দেখিও না।

এরপর আর আড্ডা জমল না, সভা ভঙ্গ হল।

মেয়ে-জামাইরা বিদায় নিল, কর্তা-গিন্নি শুতে চলে গেল। আমাদের কিন্তু এর মধ্যেই ঘুমোতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই, ঘরের মধ্যেও বসে থাকার কোনও মানে হয় না, বাইরের আকাশে চাঁদ হাতছানি দিচ্ছে।

বাড়ির সামনেই একটা চাতাল, আমরা চারজন গিয়ে বসলাম সেখানে। বাগানে অনেক বড় বড় গাছপালা, এখন বাগানটিকে গভীর জঙ্গল বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে পনেরো-কুড়ি হাজার বছর আগেও মানুষের বসতি ছিল। সেইসব মানুষেরা বৃষ্টি কিংবা তুষারপাতের সময় গুহার মধ্যে বসে সময় কাটাবার জন্য ছবি এঁকেছে।

কিছু একটা গল্পে আমরা খুব হাসছিলাম, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খুলে গেল। চাষি গিন্নি

রাত-পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে কী যেন বলল, অসীম তার সঙ্গে বাক্যালাপ চালাল। তারপর সেই রমণী আবার দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই অসীম আমাদের জানাল যে গৃহকর্ত্রী আমাদের আড্ডা ভাঙতে বলেছে। এ বাড়িতে আরও দুটি ঘরে অতিথি আছে, আমাদের হাসি-গল্পের আওয়াজে অসুবিধে হচ্ছে তাদের।

এখন বেশ শীত শীত ভাব, আমরা চাদর জড়িয়ে বসেছি। এদের দেশে কেউ শীতের মধ্যে জানলা খুলে শোয় না। সব দরজা-জানালা বন্ধ, তবু আমাদের কথাবার্তায় অন্যদের এমন কী ব্যাঘাত হতে পারে? আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, আমরা যখন ইচ্ছে ঘুমোব।

আমরা ভেতরে যেতে রাজি হলাম না। তবে গলার আওয়াজ কমিয়ে দিলাম। কিন্তু ভাস্কর এমন সব মজার গল্প শুরু করেছে যে হাসি চাপা দায়। আর ফিসফিস করে তো কেউ হাসতে পারে না। দু-একবার হো-হো হা-হা হবেই।

আরও কিছুক্ষণ বাদে গৃহকর্তা এসে কড়া গলায় কী যেন বলল। এবার অসীম দু-তিনবার দা কর, উঁই উঁই বলল। এবং অসীমের তাড়নাতে আমাদের উঠে পড়তেই হল। ভেতরে কাঠের সিঁড়ি। উঠতে গেলে মচমচ শব্দ হয়, অসীম বলল, এই, আস্তে আস্তে। কিন্তু রাত্তিরবেলা সামান্য আওয়াজও বেশি শোনায়, কাঠের সিঁড়িতে একটু শব্দ হবেই। আমাদের শয়নকক্ষ দোতলায়, বাথরুম একতলায়, সুতরাং ওঠা-নামাও করতে হল দু-একবার। তারপর এক সময় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন বেলা আটটায় অসীম আমাদের ঘরে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, এই তোমরা কাল রাত্তিরে যা কাণ্ড করেছ, এরা ভয়ংকর চটে গেছে।

আমরা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কী করেছি কাল রাত্তিরে!

অসীম বলল, কাল অত রাত পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দিয়েছো, হই চই করেছ, এদের ঘুমের খুব ব্যাঘাত হয়েছে।

ভাস্কর বলল, অ্যাঁ অসীম, তুমি বুঝি আড্ডা দাওনি? তুমি বুঝি হাসোনি?

অসীম বলল, আমি তোমাদের মতন অত জোরে হাসিনি। সে যাই হোক, ওরা বলছে, এক্ষুনি আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

ভাস্কর বলল, সে কী। ব্রেকফাস্ট দেবে না?

অসীম বলল, না, দেবে না। চটপট তৈরি হয়ে নাও। দশটার মধ্যে ঘর ছেড়ে দিতে হবে বলেছে।

ভাস্কর বলল, আমরা একদিনের পুরো ভাড়া দিচ্ছি। সব জায়গায় বারোটা পর্যন্ত থাকা যায়।

অসীম বলল, সে তো হোটেলের নিয়ম। এটা চাষির বাড়ি। এদের সঙ্গে তর্ক করে তো লাভ নেই। চলে যেতে বলেছে, তারপরেও কি জোর করে থাকবে?

না, তা থাকা যায় না বটে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সকালবেলায় চা কিংবা কফি না পেয়ে বাথরুম-টাথরুম যাওয়া যায় না যে। সেগুলো সেরে তো বেরুতে হবে।

অসীম আর মৃণালের সে সমস্যা নেই, কিন্তু ভাস্কর আর আমার বেড টি খাওয়ার অভ্যেস। অসীম জানিয়ে দিল, সে এদের কাছে কিছু চাইতে পারবে না।

তখন আমাকেই উঠতে হল। বাড়িটা মনে হল জনশূন্য। এ বাড়ির অন্য অতিথিরা কোথায় কে জানে, হয়তো অনেক সকালেই বেরিয়ে গেছে। খাওয়ার ঘরে কেউ নেই। চাষিটিও বোধহয় কাজে গেছে। বাইরে মুরগির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চাষি গিন্নি।

আমি দূর থেকে বললাম, বঁ ঝুর, মাদাম!

তিনি এই সম্ভাষণের কোনও উত্তর দিলেন না। আমি আরও কাছে গিয়ে বলললাম, বঁ ঝুর, বঁ ঝুর, সিল ভু প্লে, পারদোঁ, সিল ভু প্লে...। এবার তিনি মুখ ফিরিয়ে বেশ রাগত স্বরে উত্তর দিলেন, বঁ ঝুর।

আমি বিনীতভাবে বললাম পারদোঁ, ভু প্রেনে দোনে মোয়া দে কাফে ও লে।

সেই সুন্দরী মহিলা মুখখানা খুব কঠোর করে ঝরঝর করে এক সঙ্গে অনেক কথা বলে গেলেন। অতি কষ্টে আমি তার মর্ম বুঝলাম। আমরা রাত্তিরে গোলমাল করেছি বলে আমাদের মতন অতিথি তিনি আর রাখতে চান না। তিনি আমাদের চা-কফি কিছু দিতে পারবেন না, তাঁর এখন অনেক কাজ আছে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা কাফে আছে, সেখানে গিয়ে আমরা জলখাবার খেতে পারি। দশটার সময় তাঁর বাড়িতে অন্য লোক আসবে, তার মধ্যে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

সুন্দরী মহিলাদের রাগ দেখলে আমার মজাই লাগে। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মহিলার সঙ্গে খানিকটা ইয়ার্কি-ঠাট্টা করার। ওঁর ওই বাক্যবাণের অনেক মজা করে উত্তর দিতে পারতাম, শেষ পর্যন্ত ওঁকে হাসিয়ে ছাড়তাম ঠিকই। কিন্তু আমি অসহায়। সেই ভাষার জোর যে আমার নেই! আমাদের গ্রামের কোনও চাষির কাছে গিয়ে শহরে বাবুরা ইংরিজিতে বুকনি ঝাড়লে যে অবস্থাটা হয়, এখানে হল তার ঠিক উলটো। এক চাষির বউ আমার ওপর ফরাসি ঝাড়ছে, আমি শহরে বাবু হয়েও উত্তর দিতে পারছি না।

আমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে দেখে ভাস্কর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, চল, তা হলে এক্ষুনি চলে যাব!

খুব দ্রুত আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। জুতো মোজা পরে নেমে এলাম নীচে। অসীম গম্ভীরভাবে চাষি গৃহিণীকে জিগ্যেস করল, আমাদের কত দিতে হবে?

মহিলাটি একটি কাগজে লিখে দিল টাকার অঙ্কটা। পুরো যা ভাড়া দেওয়ার কথা তাই-ই, যদিও এর মধ্যে ব্রেকফাস্ট পাওয়ার কথা ছিল। মহিলার মুখ দেখে মনে হল, উনি ধরে নিয়েছেন যে আমরা কিছু টাকা কমাবার চেষ্টা করব। উনি সেজন্য তর্কাতর্কি করার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু অসীম সে দিক দিয়েই গেল না। অত্যন্ত রাশভারী ভঙ্গিতে পকেট থেকে চেক বই বার করে খচখচ করে লিখে দিল সম্পূর্ণ অঙ্কটা। তারপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, মের্সি মাদাম।

প্রায় বিতাড়িত হয়েই আমরা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠলাম গাড়িতে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপর আবহাওয়া হালকা করার জন্য অসীম ভাস্করের পেছনে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, কী ভাস্কর, একেবারে চুপসে গেল যে। খুব যে কাল সন্ধেবেলা মহিলার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলে, ওর স্বামীকে আর জামাইকে তোমার দামি স্কচ খাওয়ালে, কত গল্প শোনালে, আজ সকালবেলা আশা করেছিলে ওরা তোমাকে নিজেদের ফার্মের মুরগির ডিম খাওয়াবে। সব ফক্কে গেল?

ভাস্কর দপ করে জ্বলে উঠে বলল, শালা, আমি এই সব চাষি-ফাসিদের বাড়িতে আর কক্ষনও থাকছি না। এর চেয়ে হোটেল অনেক ভালো। খাবার টেবিলে বসে জোরে হাসা যাবে না, বারান্দায় বসে হাসা যাবে না, এ রকম অদ্ভুত নিয়ম বাপের জন্মে দেখিনি। সকালে এক কাপ চা পর্যন্ত দিল না?

অসীম বলল, যেমন তোমরা গোলমাল করেছ। এরা আওয়াজ একেবারে সহ্য করতে পারে না। প্যারিসে কী হয় জানো, কোনও বাড়িতে রাত্রির পার্টিতে বেশি চ্যাঁচামেচি হলে পাশের বাড়ির লোক থানায় ফোন করে।

আমি বললাম, দ্যাখো অসীম, আমার তবু খটকা লাগছে। কাল অত ভালো ব্যবহার করল ওরা, সেধে কফি খাওয়াল, নিজেদের ওয়াইন খাওয়াল, কত গল্প করল, তারপর হঠাৎ এত বদলে গেল কী করে? শহরে পাশাপাশি বাড়িতে অসুবিধে হতে পারে, কিন্তু এখানে কাছাকাছি কোনও লোকজনই ছিল না, আমরাও এমন কিছু হইহল্লা করিনি; গল্প করেছি আর হেসেছি। হাসিটা এমন কী দোষের? তার জন্য সকালবেলা এতটা খারাপ ব্যবহার করার কোনও যুক্তি নেই।

অসীম বলল, তোমরা সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ করেছিলে?

ভাস্কর বলল, আমরা কি পাখি যে উড়ে উড়ে দোতলায় যাব? অসীম, তোমার বাড়ির কাঠের সিঁড়িতেও রাত্তিরে আওয়াজ হয়।

অসীম বলল, এটা তো গ্রাম। এরা ঘুমোতে খুব ভালোবাসে।

মৃণাল এমনিতে চুপচাপ থাকে। সে বলল, আপনারা কেউ পাথরের মূর্তিটা কিনতে চাইলেন না, তাই বোধহয় চটে গেছে!

ভাস্কর আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, একটা ঝুটো পাথর, সেটার ওপর উকো দিয়ে ঘষে একটা মুখ ফুটিয়েছে, সেটাকে বলে কি না প্রি-হিস্টোরিকাল। গাঁজা দেওয়ার আর জায়গা পায়নি! আবার পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দাম চায়, সাধ কত। আর একটু হলে আমি লোকটাকে গাঁট্টা মারতাম!

আমি বললাম, কোনও জায়গায় এসে ঘর ভাড়া নিলেই যে সে বাড়ির পাথর কিনতে হবে, এ রকম নিশ্চয়ই শর্ত থাকতে পারে না।

ফরাসি চাষিদের পক্ষ সমর্থন করার আর কোনও যুক্তি খুঁজে না পেয়ে অসীম বলল, ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, এবার ওসব বাদ দাও তো।

সেই সকালটাই আমাদের খারাপ কাটল। তখনও রাস্তার ধারের কাফে-রেস্তোরাঁগুলো খোলেনি বলে অনেকক্ষণ আমাদের সহ্য করতে হল চা-কফির তেষ্টা। তারপর অনেকখানি পথ উজিয়ে গিয়েও লাস্কোর বিশ্ববিখ্যাত গুহাচিত্রও আমাদের দেখা হল না।

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল একটা লম্বা নোটিশ ঝুলছে। তার মর্ম এই যে, লাস্কোর প্রাগৈতিহাসিক গুহার দরজা সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাটির তলায় ওই সব মহা মূল্যবান ছবি বহু মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা। সেইজন্যই একমাত্র ইতিহাস, নৃতত্ত্ব কিংবা শিল্পকলার গবেষক ছাড়া আর কারুকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেইসব গবেষকদেরও প্যারিস থেকে চিঠি আনতে হবে। তবে, একটু দূরেই একটা কৃত্রিম গুহা তৈরি করা হয়েছে, হুবহু ওই রকম, সেখানে একজন জাপানি মহিলা শিল্পী অবিকল সব গুহাচিত্র এঁকে রেখেছেন। টিকিট কেটে সেটা দেখা যেতে পারে।

অসীম সেটাই দেখতে চায়, কিন্তু ভাস্কর হাত-পা ছুঁড়ে বলল, অ্যাঁ? আসলেরও নকল? এখানে ভুমিমাল গছাবার চেষ্টা, তার জন্য আবার পয়সা দিতে হবে? হি হি হি, ফরাসি দেশটার হল কি! এত পয়সার খাঁই? ইংল্যেন্ডে যাও, বড় বড় মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি সব ফ্রি। এসব দেখতে হবে না, চল।

অসীম বলল, তবু একবার দেখে যাই। খানিকটা আন্দাজ তো পাওয়া যাবে!

ভাস্কর বলল, পয়সা খরচ করে আমি নকল জিনিস দেখব? কিছুতেই না। এর চেয়ে তো বইতে ছাপা ছবি দেখলেই হয়! আসল ব্যাপার তো গুহার ভেতরটার অ্যাটমোসফিয়ার।

আবার গাড়ির কাছে ফেরার সময় আমি চুপিচুপি অসীমকে জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার বলো তো, অসীম। তুমি ভাস্করের কাছে এত সহজে হার স্বীকার করলে? দ্বিতীয় গুহাটা না দেখেই চলে এলে?

অসীম মুচকি হেসে বলল, দ্বিতীয়টার কাছে গেলে দেখা যেত সেটাও বন্ধ। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আজ সোমবার। এ দেশে প্রত্যেক সোমবার সমস্ত মিউজিয়াম কিংবা এই ধরনের ব্যাপার বন্ধ থাকে।

চাষি পরিবারের কাহিনি কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

এবারে আমরা যাব এক্স অঁ প্রভাঁস-এর দিকে। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক্স শহরটির নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে সাহিত্য ও শিল্প-জগতের দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা। এমিল জোলা এবং পল সেজান। এই দুজন ছিল স্কুলের বন্ধু এবং সারাজীবন বন্ধু থাকার অঙ্গীকার করেছিল। তখন কেউই

জানত না, একজন হবে সাহিত্য জগতের মহারথী আর অন্যজন হবে শিল্পের এক বিস্ময়।

দু'জনকেই কৈশোর-যৌবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জোলাকে দারিদ্র্য তাড়া করে ফিরেছে অনেকদিন, প্যারিসে এসে খবরের কাগজে ফিচার লিখে কোনওক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে হত। আর পল সেজান অবস্থাপন্ন বাড়ির সন্তান হলেও তাঁর বাবা ছিলেন স্বৈরাচারী, শক্ত হাতে ছেলের রাশ ধরে রেখেছিলেন। পিতার ইচ্ছে ছিল ছেলে হোক আইনজীবী, পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশুনো করুক। আইন পড়া ছেড়ে সেজান যখন ছবি আঁকতে এক্স শহর ছেড়ে গেলেন প্যারিসে, তখন তাঁর বাবা অতি কম টাকা দিতেন। বাবার ভয়ে সেজান নিজের প্রেমিকাকে বিয়ে করতে পারেনি, তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রথম সন্তানের জন্মের পরও সে-খবর জানাননি বাড়িতে।

এই দুই প্রতিভার মধ্যে জোলা ছিলেন পরোপকারী ও বন্ধু-বৎসল, আর সেজান পাগলাটে, অতিশয় দুর্মুখ। ক্রমে ক্রমে জোলা ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেন, আর্থিক অবস্থাও ফিরল, সমাজে প্রতিষ্ঠা হল। আর সেজানকে তখনও কেউ বড় শিল্পী হিসেবে গণ্য করে না, কামিল পিসারো ছাড়া অন্য শিল্পীরা তাঁকে সহ্য করতেও পারে না। অথচ নিয়তির কৌতুক এই যে, পরবর্তীকালের সেজান এই দলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়েছেন। ইমপ্রেশানিস্টদের আন্দোলনের সময় তিনি কিছুদিন ছিলেন ইমপ্রেশানিস্ট, অথচ তখনই তাঁর মধ্যে পোস্ট-ইমপ্রেশানিজম্-এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তিনি এক্সপ্রেশানিস্টদেরও পুরোধা এবং কিউবিস্টদেরও পূর্বপুরুষ।

আমি আর অসীম এই দুই লেখক ও শিল্পীর জীবন ও শিল্প নিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলছিলাম। অসীম এক সময় জিগ্যেস করল, এদের এত গভীর বন্ধুত্বও কী করে নষ্ট হয়ে গেল, তা তুমি জানো সুনীল?

আমি বললাম, এমিল জোলার 'দা মাস্টারপিস' উপন্যাসটা উপলক্ষ করে তো?

এটা একটা ট্রাজেডি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু খুঁজতে-খুঁজতে এমিল জোলা শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধুদের জীবনকাহিনি অবলম্বন করলেন শুধু না, বন্ধুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেও ছাড়লেন না। উপন্যাসটিও তেমন কিছু উচ্চাঙ্গের হয়নি। 'দা মাস্টারপিস' উপন্যাসে জোলা তাঁর সমসাময়িক শিল্পীগোষ্ঠীর কথা লিখলেন, যে ইমপ্রেশানিস্টদের একসময় প্রবল সমর্থক ছিলেন তিনি, এখন দেখা গেল এঁদের শিল্পরীতি সম্পর্কে তাঁর তেমন উচ্চ ধারণা নেই। প্রধান চরিত্রটি, যে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করল, সেটি তাঁর প্রাণের বন্ধু পল সেজান-এর আদলে গড়া।

এমিল জোলার এই উপন্যাসটি তাঁর শিল্পী বন্ধুরা কেউই পছন্দ করেনি। এক কপি উপহার পাওয়ার পর পল সেজান অত্যন্ত নীরস ভদ্রভাষায় এবং ভাববাচ্যে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাই। পুরোনো দিনের স্মৃতিতে আমি তাঁর করমর্দনের অনুমতি প্রার্থনা করি।'

এরপর সেজান বাকি জীবনে আর কখনও জোলাকে কোনও চিঠি লেখেননি। কোনও যোগাযোগও রাখেননি।

গল্প করতে-করতে আমরা প্রায় দেড়শো কিলোমিটার চলে এসেছি, ভাস্কর একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এই রে, আমার শাল। অসীম গাড়ি থামাও।

অসীম ব্রেকে পা দিয়ে বলল, শাল মানে?

ভাস্কর বলল, আমার কাশ্মীরী শাল। দেশ থেকে আনা।

আমার সঙ্গে একবার বেলজিয়ামে বেড়াবার সময় ভাস্কর ওর দামি ক্যামেরা হারিয়েছিল। আর একবার লন্ডনে আমার সামনেই ওর পার্স পকেটমার হয়। ক্যামেরা, পার্স ইত্যাদি ও যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে, জিনিসপত্র হারাবার দিকে ভাস্করের বেশ ঝোঁক আছে। চাষির বাড়িতে হুড়োহুড়ি করে ব্যাগ গোছাবার সময় ও কাশ্মীরি শালটা ভরে নিতে ভুলে গেছে। তা ছাড়া তখন মেজাজও বেশ খারাপ ছিল।

গাড়ি থামিয়ে সব ব্যাগ খুঁজে দেখা গেল সত্যিই শালটা আনা হয়নি। অথচ গতকাল রাতে

ভাস্কর শালটা জড়িয়ে বসেছিল, আমরা সবাই দেখেছি। শালটার দাম যতই হোক, তার চেয়ে বড় কথা, শালটা ভাস্করকে ওর মা দিয়েছেন, সেটা হারাবার কোনও মানে হয় না!

আবার অতখানি রাস্তা ফিরে যেতে হলে আজকের সারাদিনটাই নষ্ট হবে। অথচ কীই বা করা যায়, যেতে তো হবেই। ভাস্কর নিজে অবশ্য বলল, আবার ওই গোমড়ামুখো মেয়েছেলেটির কাছে ফিরে যেত হবে? দূর ছাই, দরকার নেই, চলো চলো! ও ব্যাটারাই শালটা গায়ে দিক।

অসীম বলল, একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। চাষিদের বাড়িতে চিঠি লিখব, ওরা যেন শালটা ডাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ভাস্কর বলল, ওদের ঠিকানা তো আনিনি? আন্দাজে কোথায় চিঠি লিখব?

অসীম বলল, মহিলাটি আমাকে একটা রিসিট দিয়েছে। তাতে নাম-ঠিকানা সব আছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, চিঠি পেলেই ওরা ফেরত পাঠাবে? নিজেরা ডাক খরচ করে?

অসীম বলল, ডাক খরচ পরে পাঠিয়ে দেব। কিংবা ওরা ভি পি করে পাঠাতে পারে, আমরা ছাড়িয়ে নেব। হ্যাঁ, সেই ভালো, ভি পি-তে পাঠাবার জন্যই অনুরোধ জানাব।

এরপরেই রাস্তায় যে পোস্ট-অফিসটি পড়ল, সেখান থেকে লেখা হল চিঠি।

সেই চাষি পরিবারটিকে আজও আমরা মনে রেখেছি, তাদের প্রতি একটুও বিরূপ ভাব নেই, বরং পুরো ঘটনাটাই একটা মজার স্মৃতি হয়ে আছে এই জন্য যে, যথা সময়ে সেই শালটিকে কেচে, ভালোভাবে প্যাক করে তারা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

॥ ২১ ॥

"কাকে তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো, হেঁয়ালি-মানুষ, আমায় বলো?
তোমার বাবা, মা, বোন, ভাইকে?
—আমার বাবা নেই, মা নেই, বোন নেই, ভাই নেই।
—তোমার বন্ধুদের?
—তুমি এমন একটা শব্দ ব্যবহার করেছ, যার অর্থ
আমি আজ পর্যন্ত বুঝিনি
—তোমার দেশ?
—কোন দ্রাঘিমায় তার অবস্থান আমি জানি না
—সৌন্দর্যকে?
—আমি আনন্দের সঙ্গেই তাকে ভালোবাসতাম, যদি হত সে
কোনও দেবী এবং অমর
—সোনা?
—আমি তা ঘৃণা করি, যেমন তুমি ঈশ্বরকে
—তবে, কী তুমি ভালোবাসো, অসাধারণ আগন্তুক?
—আমি ভালোবাসি মেঘ, যেসব মেঘেরা ভেসে যায়, ওই ওখানে...
ওই সেখানে...বিস্ময়ময় মেঘেরা!"

—শার্ল বোদলেয়ার

ফরাসিদেশটা এককালে ছিল গল নামে এক জাতির দেশ। এই গল শব্দটা এখন বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি এবং পরবর্তী কালের রাষ্ট্রনায়ক দ্য গলের নামের

মধ্যে রয়ে গেছে সেই স্মৃতি, এ দেশের এক জনপ্রিয় সিগারেটের ব্র্যান্ড হচ্ছে গলোয়াজ। এই গলদের ওপর রোমানরা বেশ কিছুকাল প্রভুত্ব করেছিল। অ্যাস্টারিকস-এর জনপ্রিয় কমিক্সে জুলিয়াস সিজারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে গলদের একটু ক্ষুদ্র গ্রামের লড়াইয়ের অনেক কৌতুক কাহিনি পাওয়া যায়। রোমান সাম্রাজ্য যখন টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, তখন বিভিন্ন রোমান সামন্ত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হয়ে বসেছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে এই প্রভাঁস অঞ্চলও সেইরকম এক রোমান রাজার অধীনে ছিল কিছুকাল। তার কিছু ঐতিহাসিক চিহ্নও রয়ে গেছে।

এক্স শহরে আমাদের বেশিক্ষণ থাকা হল না। দেখা হল না এমিল জোলা কিংবা পল সেজান-এর বাড়ি, শুধু ঘুরে গেলাম রোমানদের গড়া এক অ্যামফিথিয়েটার, আজকাল যাকে আমরা বলি স্টেডিয়াম। চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর গড়া সেই বিশাল ব্যাপার, আজও অনেকটা অক্ষত। ওপরের দিকে গিয়ে দাঁড়ালে অনায়সে কল্পনা করা যায়, একদিকে বসে আছেন বিলাসী রোম সম্রাট, পাশে তাঁর ব্যভিচারিণী পত্নী, নেশাগ্রস্ত চোখে তারা উপভোগ করছেন আরিন্যার মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহদের সঙ্গে গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রাণপণ লড়াই। একটা সিংহ একজন মানুষকে মেরে হামহম করে খাচ্ছে, এই দৃশ্যও এককালে মানুষের কাছে উপভোগ্য ছিল।

এক্স শহর থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দুপুর-দুপুর। প্যারিস ছাড়ার পর আমরা তিন রাত কাটিয়েছি পথে, এবার কোথাও কয়েকদিনের জন্য থিতু হওয়া দরকার। অসীম একলা গাড়ি চালাচ্ছে, তাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

আমি ইংল্যান্ডের গ্রাম বিশেষ দেখিনি। লন্ডন থেকে কখনও গেছি অক্সফোর্ডে, কখনও ডোভারে, তাও বড় রাস্তা ধরে বিখ্যাত ব্রিটিশ কান্ট্রিসাইড আমার দেখা হয়নি আজও। কিছু গ্রাম দেখেছি বটে আমেরিকায়, কিন্তু সেগুলো কেমন যেন ছন্নছাড়া, ধূধূ করা মাঠ বা ফসলের খেতের মধ্যে একটা-আধটা বাড়ি। তা ছাড়া, আমেরিকার অধিকাংশ গ্রামগুলিরই নামের সঙ্গে সিটি বা টাউন যোগ করা। মোট শ'দেড়েক পরিবারের বাস, এমন জায়গার নাম স্টোন সিটি। বড় রাস্তার ধারে ধারে যেসব জায়গা পড়ে, সেখানকার জনসংখ্যা বোর্ডে লেখা থাকে। যে-জায়গায় জনসংখ্যা মাত্র ছত্রিশ, সেটাও একটা টাউন। আমেরিকায় ভূতের গ্রামও আছে একাধিক। জনশূন্য কিংবা পরিত্যক্ত কোনও এলাকার নাম গোস্ট সিটি।

সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা চিনের বড়-বড় শহরগুলিই শুধু আমি দেখেছি, গ্রাম দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ভারতের বাইরে সত্যিকারের বহু গ্রাম আমি শুধু দেখেছি ফরাসিদেশেই। ভারী চোখ জুড়োনো সেই সব গ্রাম। গ্রাম্য ভাব একেবারে মুছে যায়নি, অথচ ঝকঝকে তকতকে, বাড়িগুলি মনে হয় চকোলেটের তৈরি। এমনকি কবরখানাগুলিও বড়ো সুন্দর। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে সবসময় যে দারিদ্র্য কিংবা প্রাচুর্যের কোনও সম্পর্ক আছে, তাও বলা যায় না। ফরাসিরা এমন কিছু বড়লোক নয়, কিন্তু রাস্তার পাশের একটা কবরখানাও যে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়, অন্য লোকের চক্ষুপীড়ার কারণ না ঘটে, সে বোধটুকু তাদের আছে।

এক-একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে কোনও স্তম্ভের ওপর একটা পাথরের মুরগি। প্রথম প্রথম দেখে মজা লাগে। ব্রিটেনের জাতীয় প্রতীক যেমন সিংহ, আমেরিকার ইগল, সেরকম ফ্রান্সের জাতীয় প্রতীক মুরগি, মুরগিরও মূর্তি বানিয়ে রেখেছে।

দু-একটা ছোট-ছোট শহরে বা গ্রামের নাম দেখলে চমকে চমকে উঠতে হয়। মনে পড়ে যায় অনেক ইতিহাস ও কাহিনি। যেমন একটা অপূর্ব মনোহর জায়গায় কফি খাওয়ার জন্য অসীম গাড়ি থামিয়েছিল। সেই জায়গাটার নাম বারজেরাক। নামটা চেনা-চেনা লাগে। আমি অসীমকে জিগ্যেস করেছিলাম, এই জায়গাটার সঙ্গে সিরানো দ্য বারজেরাকের কি কোনও সম্পর্ক আছে?

অসীম বলল, ঠিক ধরেছ। এই জায়গাটিকেও কেন্দ্র করেই সিরানোর কাহিনি প্রচলিত।

সিরানো ছিল প্রেমিক, শিল্পী, কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার নাকটি ছিল বড় বেশি লম্বা।

তার মুখে, নাকের বদলে যেন মনে হত, একটা কলা বসানো আছে। সেই লজ্জায় সে কোনও মেয়ের সামনে বেরুত না। অন্য এক অপদার্থ প্রেমিক, তার আর কোনও গুণই ছিল না, শুধু চেহারাটা ছিল কার্তিকের মতন, তার হয়ে তার প্রেমিকার কাছে সিরানো প্রেমপত্র লিখে দিত। এমনকি সেই প্রেমিকার বাড়ির ব্যালকনির নীচে লুকিয়ে থেকে সিরানো তার বন্ধুর বকলমে বলে যেত অপরূপ সব প্রণয়বাক্য, যা আসলে তার নিজেরই হাহাকার। আমাদের ছাত্র বয়েসে এই কাহিনি নিয়ে চমৎকার একটি ফিল্‌ম হয়েছিল, যাতে নাক-লম্বা সিরানোর ভূমিকায় ছিল জোসে ফেরার।

আর একটি শহরের নাম লোত্রেক। শুনলেই মনে পড়ে শিল্পী তুলুজ লোত্রেকের কথা। ধনীর সন্তান লোত্রেক অল্প বয়েসে একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়, কোমরে ও পায়ে খুব চোট লাগে। সেই থেকে তার শরীর আর বাড়েনি, সে হয়ে গেল একটি বামন। কিন্তু সে অসাধারণ শিল্পী হয়ে উঠেছিল, মেয়েরা তার দিকে করুণার চক্ষে তাকালেও সে পানশালার নর্তকী ও বারবনিতাদের নিজের ছবিতে অমর করে রেখেছে। এই তুলুজ লোত্রেককে নিয়েও আমরা একটা ভালো ফিল্‌ম দেখেছি এক সময়, এবং কী আশ্চর্য ব্যাপার, সেখানেও ওই বামন শিল্পীর ভূমিকায় জোসে ফেরার অনবদ্য অভিনয় করেছিল।

নিম শহরটি দেখিয়ে অসীম বলেছিল, আজকাল যে জিনস-এর প্যান্ট পরার খুব ফ্যাশান হয়েছে সব দেশে, সেই জিনস কাপড়টার জন্ম এখানে।

ভাস্কর প্রতিবাদ করে বলল, যাঃ, জিনস তো চালু হয়েছে আমেরিকায়।

অসীম বলল, এইখান থেকে প্রথম কাপড়টা গেছে। এখনও দেখবে, জিনস-কে অনেকে বলে ডেনিম। ওই ডেনিম আসলে হচ্ছে দ্য নিম। ফরাসি দ্য মানে ইংরিজি অফ, বাংলায় ষষ্ঠী তৎপুরুষ। দ্য নিম, অফ নিম, অর্থাৎ নিম-এর জিনিস। একটু একটু ফরাসি শেখো, ভাস্কর।

ভাস্কর নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, কোন দুঃখে শিখতে যাব। না শিখেও জীবনের এতগুলো বচ্ছর কোনওই অসুবিধে হয়নি, বাকি জীবনটাও স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। ওই সব ফালতু জেনারেল নলেজের লেকচার তুমি সুনীলের ওপর যত ইচ্ছে ঝাড়ো না ভাই।

প্রায় বিকেলের দিকে আমরা এসে পৌঁছলাম সমুদ্রের কাছাকাছি। বাতাসে সমুদ্রের গন্ধ পাওয়া যায়, চোখে পড়ে সাদা ধপধপে পাখি। আমরা এসে গেছি ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে, বিশ্ববিখ্যাত 'সাউথ অফ ফ্রান্স'। কোত্ দাজুর।

মার্সেই একটা বড় বন্দর এবং ভিড় ভাট্টার জায়গা বলে সেখানটা এড়িয়ে আমরা এগুতে লাগলাম তটরেখা ধরে। সামনের দিকে কান, আনতিব, নিস-এর মতন নাম করা সব শহর, এ ছাড়াও সমস্ত তটরেখা জুড়েই ছোট-বড় অজস্র শহর। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ধনী, ফিল্‌মস্টার, শিল্পী, লেখকরা এখানে নিজস্ব বাড়ি করে রাখে। তা ছাড়াও পর্যটকদের জন্য কত রকমের যে হোটেল, গেস্ট হাউজ, লজ আর ইয়ত্তা নেই।

বিকেলের স্বর্ণাভ রোদ্দুরে অসীম এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলল, এবার?

আমরা কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

অসীম বলল, এখানে প্রথম দৃশ্যটা কী দেখবে তা কি জানো? কোনও আন্দাজ আছে? আমি ইচ্ছে করেই আগে কিছু বলিনি।

অসীম কী যে রহস্য করছে, তা সত্যি ধরা গেল না। এখানে ভূমধ্যসাগরের নিবিড় নীল সৌন্দর্য দেখব, এটাই তো জানি।

গাড়ি থেকে নেমে প্রায় সেনাপতির ভঙ্গিতে অসীম আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যেখানে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, একটা কাঁধ সমান উঁচু পাঁচিল। সেখানে এসে অসীম বলল, ওয়ান টু, থ্রি...।

সত্যিই এমন দৃশ্য কল্পনা করিনি। প্রথমে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হবেই।

আদিগন্ত নীল জলরাশির সামনের বেলাভূমিতে বালির ওপর শুয়ে-বসে আছে অন্তত হাজার খানেক নারী, পুরুষ, শিশু। কেউ শুয়ে আছে, কেউ পা ছড়িয়ে বসা, কেউ ছুটোছুটি করে নেমে যাচ্ছে জলে, খেলছে বাচ্চারা। সকলেই প্রায় উলঙ্গ। প্রায় বললাম এই কারণে যে, পুরুষ-নারী কারুরই উর্ধাঙ্গে একটা সুতোও নেই, নিম্নাঙ্গে এক চিলতে কটি-বস্ত্র আছে বটে, তাও প্রায় দেখাই যায় না।

পুরুষরা সুঠাম তরুণীদের নগ্ন বক্ষদেশে দেখে পুলকিত হবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দর্শনে আমার ঠিক কী অনুভূতি তাও অকপটে জানানো দরকার।

সেখানে কালো বা খয়েরি রঙের মানুষ একজনও চোখে পড়েনি। সবাই শ্বেতাঙ্গ, অনেকেরই সোনালি চুল, গায়ের রোমও সোনালি। সবাই কাছাকাছি শুয়ে-বসে আছে, এবং প্রায় নিঃশব্দ। হঠাৎ দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এরা কেউ মানুষ নয়, মানুষের পূর্বপুরুষ একদল বাঁদর। আমি আসামে, মানসের জঙ্গল একবার এক ঝাঁক গোল্ডেন লাঙ্গুর দেখেছিলাম, পুরুষ-স্ত্রী-শিশু মিলিয়ে চোদ্দো-পনেরো জনের একটা পরিবার, তাদের সারা গা সোনালি। অবিকল যেন সেই বাঁদরের ঝাঁকের মতন এই মানুষগুলি।

সেই গণ-নগ্নতা আমার তেমন পছন্দ হয়নি। প্রত্যেক মানুষের শরীরেই একটা রহস্য আছে, পোশাক তা ঢেকে রাখে। দু'জন মাত্র নারী-পুরুষ নিভৃতভাবে সেই রহস্য জানার চেষ্টা করে, ব্যাকুল হয়, অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবনেও জানা হয় না।

আমরা চারজন পুরো পোশাক-পরিহিত মানুষ এতগুলি প্রায় নগ্ন নারী-পুরুষের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বিসদৃশ, যদিও কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তবু আমরা সেখান থেকে সরে এলাম। পরে কখনও আমরাও সমুদ্র-স্নানে আসব নিশ্চিত, তার আগে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা দরকার।

এত রকম হোটেল থেকে বেছে নেওয়া সোজা কথা নয়। তা ছাড়া আমাদের সস্তার জায়গা খুঁজতে হবে। এখানে সব হোটেলের বাইরে স্পষ্টভাবে স্টার রেটিং দেওয়া থাকে। ফাইভ স্টার, ফোর স্টার, থ্রি স্টার হোটেলগুলোর ধারেকাছেও আমরা ঘেঁষি না। টু স্টারই যথেষ্ট, এমনকি ওয়ান স্টারেও আপত্তি নেই। এখানে আমরা তিন চারদিন থাকব। সুতরাং পাকাপাকি একটা ভালো আস্তানা খোঁজা দরকার।

বেশ কিছু বছর আগে অসীম তার এক বন্ধুর সঙ্গে এই অঞ্চলে বেড়াতে এসে একটা লজে ছিল, জায়গাটা পরিচ্ছন্ন ও সস্তা, সুতরাং অসীম সেখানেই যেতে চায়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু কোনওক্রমেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি না। হয় পেরিয়ে যাই, আবার ফিরতে গেলে রাস্তা হারাই। অসীম প্রায় দু'যুগ ধরে ফ্রান্সে আছে, প্রতিদিন গাড়ি চালায়, তবু রাস্তা ভুল করতে সে খুব ওস্তাদ।

এক সময় অতি কষ্টে জুয়াঁ লে-প্যাঁ তে আসা গেল বটে, কিন্তু অসীমের সেই চেনা বাড়ি মিলল না কোনওক্রমেই। অসীমও জেদ ধরেছে, সে বাড়িটা আগে দেখবেই। এক একটা রাস্তা তার অস্পষ্টভাবে চেনা-চেনা মনে হয়, কিন্তু সেখানে কোনও লজ নেই। এদেশে অনবরত বাড়ি-ঘর ভেঙে নতুন নতুন বাড়ি হয়, এমনকি গোটা রাস্তাটাই বদলে যায়। আমেরিকার আয়ওয়া শহরে দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি আগেরবার যে-বাড়িটাতে ছিলাম, সেটা কিছুতেই খুঁজে পাইনি। অথচ রাস্তার নাম, নম্বর সবই আমার মুখস্থ। কিন্তু মার্গারিটের মতন সেই বাড়িটাও শূন্যে মিলিয়ে গেছে, পুরো পাড়াটাই অন্যরকম।

এক সময় ভাস্করের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তার নেতৃত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সে এক ধমক দিয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, অসীম। তোমার ওই লে-প্যাঁ না যে-প্যাঁ ছাড়ো তো। এবার আমি সামনে যে টু-স্টার হোটেল দেখব, সেটাতেই উঠব।

ভাস্কর জোর করেই নেমে গেল গাড়ি থেকে। এতক্ষণ ধরে রাস্তা ভুল করে অসীমও খানিকটা

চুপসে গেছে।

তিন-চারটে হোটেল ঘুরে এক জায়গায় ঘর ঠিক করে ফেলল ভাস্কর। এবং অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। চার জনের জন্য দুটি ঘরের বদলে পাওয়া গেল একটা স্যুইট, তাতে একটা বড় ঘর, একটা বসবার ঘর, এমনকি সংলগ্ন একটা রান্নাঘরও ব্যবহার করা যাবে। এখানে সারা বিশ্বের ভ্রমণার্থীরা আসে বলে সব হোটেল মালিকই কিছু কিছু ইংরিজি জানে, সুতরাং ইংরিজি বলার সুযোগ পেয়ে ভাস্কর হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় এই হোটেল মালিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল অবিলম্বে, সেই সুযোগে ভাড়াও কমিয়ে ফেলল অনেক।

হোটেলের মালিকটি তরুণ বয়স্ক, অতিশয় সুপুরুষ, মুখখানি হাস্যময়। কথায় কথায় সে জানাল যে তার নাম লুই এবং সে কর্সিকার লোক। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পর এই দ্বিতীয় একজন কর্সিকানের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। সে শুধু হোটেলের মালিক নয়, সে একজন কবি, শিগগিরই তার প্রথম কবিতার বই বেরুচ্ছে, তার প্রুফ দেখা চলছে।

তার এই পরিচয় পেয়ে ভাস্কর আরও হইচই করে উঠে বলল, তবে তো চমৎকার, আমরা সবাই কবিতা ভালোবাসি, আজ আমরা তোমার কবিতা শুনব। কাল এখানে একটা কবি সম্মেলন হবে। তুমি ফরাসি কবিদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো?

লুই বলল, বোদলেয়ার। আমার দেবতা হচ্ছে শার্ল বোদলেয়ার।

ভাস্কর অসীম ও আমার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ওরা দু'জনেও খুব বোদলেয়ারের ভক্ত। ওই কবি সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, তোমার সঙ্গে জমে যাবে।

লুই বলল, আমার স্ত্রী ইংরেজ। সে এখন নেই। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। সে তোমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে আরও ভালো করে কথা বলতে পারবে।

ভাস্কর ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, তুমিও তো চমৎকার ইংরিজি বলছ। এই যথেষ্ট! এই তো যথেষ্ট। কাল তোমার বউ আর তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে। তোমাদের ভারতীয় রান্না খাওয়াব। তোমরা কাল আমাদের অতিথি। তা হলে ওই কথাই রইল?

এরপর নিজেদের ঘরে এসে জুতো-মোজা খুলতে খুলতে অসীম জিগ্যেস করল, এই যে, ভাস্কর, তুমি তো দিব্যি ওই কর্সিকান ছেলেটিকে কাল রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে বসলে। রাঁধবে কে?

ভাস্কর ভুরু তুলে বিরাট বিস্ময়ের ভাব করে বাওয়াল, কেন, তুমি রাঁধবে? তুমি ব্যাচিলার, এত বছর একলা একলা এ দেশে রয়েছ, রান্নাবান্নায় তোমারই বেশি ইন্টারেস্ট থাকার কথা। আমি তো মনে মনে আগে থেকেই তোমাকে ওই ভার দিয়ে রেখেছি। মৃণাল বাজার করে দেবে, আর তুমি রাঁধবে। আমার বউ তাই আমাকে বরাবর খাতির যত্ন করে, রান্না করে খাওয়ায়, আমি সেজন্য ও লাইনে নেই।

অসীম বলল, আমি রাঁধব? তোমার মাথা খারাপ? হোটেলে এসে নিজেরা রান্না করে খেতে যাব কেন? বাইরে খাব। কেন তুমি ঝামেলা করতে গেলে?

ভাস্কর বলল, এ হোটেলে একটা ফাঁকা রান্নাঘর পড়ে আছে কেন? নিশ্চয়ই অনেকে এখানে এসে নিজেদের পছন্দমতো রান্না করে খায়।

দুজনে বিতর্ক জমে উঠল।

এই সব হোটেলে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, দুপুরে ও রাত্তিরে খাবারদাবারের কোনও পাট নেই। যারা ঘর ভাড়া নেয়, তারা বাইরের কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসে।

ফ্রান্সের এই সব হোটেলের আর একটা ব্যাপার দেখে চমকে গেছি। এর আগে আমি যতগুলো দেশেই গেছি, সব জায়গাতেই কোনও হোটেলে এসে প্রথমেই কাউন্টারে মস্ত বড় খাতায় নাম-

নাম অনেক কিছু লিখতে হয়, পাসপোর্ট দেখাতে হয়, ফ্রান্সে এ পর্যন্ত কোনও হোটেলেই সে-রকম কোনও ঝামেলাই নেই। খাতায় নাম লেখার বালাই নেই, কেউ পাসপোর্টও দেখতে চায় না। অফিসঘরে কোনও লোকই থাকে না। বেল বাজালে একজন কেউ ভেতর থেকে আসে, ঘর দেখিয়ে, ভাড়া ঠিক করে, চাবি দিয়ে চলে যায়। তারপর আর সেই হোটেলের মালিক বা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখাই হয় না। কোনও অ্যাডভান্সও চায় না। আমাদের যখন হোটেল ছাড়ার ইচ্ছে হবে, তখন আবার অফিসঘরে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটি আসবে, তার হাতে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে দিলেই হবে। ভাড়া না দিয়েও যদি কেউ চলে যেতে চায়, তাকে আটকাবার ব্যবস্থা নেই কোনও।

আমার মনে এই প্রশ্নটা খচখচর করে। এরা কি সব লোককেই বিশ্বাস করে এতখানি? সকলেই গাড়ি নিয়ে আসে, কেউ কোথাও নাম সই করে না, সুতরাং যে-কোনও সময় গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে চলে গেলে কেউ তো ধরতে পারবে না? পরে কখনও দেখা হয়ে গেলেও আইনত টাকা চাওয়ার কোনও অধিকার থাকে না।

অসীম এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, কেউ কেউ ভাড়ার টাকা না দিয়েই চলে যায় হয়তো! এরা হিসেব করে দেখেছে, শতকরা তিন-চারজন খুব জোর টাকা মেরে দেয়। এরা সেটা গ্রাহ্য করে না। কারণ, কাউন্টারে একজন লোককে সারাক্ষণ রাখতে গেলে তাকে অনেক বেশি মাইনে দিতে হবে।

অদ্ভুত সহজ ব্যবস্থা। আমাদের দেশের হোটেলগুলোতে এই রকম ব্যবস্থা চালু করলে শতকরা ক'জন ভাড়া না দিয়ে পালাবে? কিংবা, প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করা যায়, শতকরা ক'জন ফাঁকা অফিসঘরে বেল বাজিয়ে মালিককে ডেকে ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দেবে।

অসীম কিছুতেই রান্না করতে রাজি নয়, শেষ পর্যন্ত ভাস্কর সবর্গে বলল তা হলে ঠিক আছে, আমি নিজেই মাংস রাঁধবো কাল। দেখবে কেমন রাঁধি।

অসীম আর মৃণাল হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল। অসীম বলল, ভাস্কর, তুমি নর্থ ক্যালকাটার বনেদি বাড়ির ছেলে, জীবনে কখনও এক কাপ চা তৈরি করেছ?

ভাস্কর বলল, রণক্ষেত্রে হবে পরিচয়। কাল রাত্তিরে এমন রাঁধব, জীবনে সেরকম কখনও খাওনি।

অসীম বলল, সে মাংস খেয়ে জীবনটাই চলে যাবে না তো?

এরপর ওরা তিনজন চিঠি লিখতে বসল। অসীম লিখছে কাজের চিঠি, বাকি দু'জন তাদের স্ত্রীদের। আমি জানলার কাছে গিয়ে সমুদ্রের জলে অস্তরাশির আভা দেখতে লাগলাম।

মৃণাল আমাকে জিগ্যেস করল, আপনি বাড়িতে চিঠি পাঠাবেন না।

আমি বললাম, দু-একদিন যাক, জায়গাটা ভালো করে দেখি, তারপর তো লিখব, এখন লেখার মতন কী আছে?

ভাস্কর বলল, কবিরা চিঠি লেখে না। তারা সব কিছু ছাপার জন্য লেখে।

এই কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা আছে। আমি ভাস্করকে সারা বছরে একটাও চিঠি লিখি কি না সন্দেহ!

মৃণাল বলল, কবিরা চিঠি লেখে না? রবীন্দ্রনাথ কত লিখেছেন, অন্তত কয়েক হাজার।

ভাস্কর বলল, রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তাঁর সব চিঠিই ছাপা হবে। মৃত্যুর পরেও বহু বছর পরে অপ্রকাশিত চিঠিপত্র বেরুবে।

অসীম বলল, রবীন্দ্রনাথ কী করে অত চিঠি লিখেছেন, ভাবলে সত্যি হাঁ হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর আর কোনও কবি বোধহয় এত চিঠি লেখেননি।

আমি বললাম, একই দিনে, একই ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি চিঠি লেখার রেকর্ড কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নয়। এক ফরাসি কবির। ওই কর্সিকান ছেলেটি যাঁর ভক্ত, সেই শার্ল বোদলেয়ারের।

চিঠিগুলো একটা হোটেলে বসেই লেখা।

ভাস্কর বলল, প্রেমিকাকে চিঠি লিখেছিল? একদিনে ক'খানা!

আমি বললাম, প্রেমিকাকে নয়, নিজের মাকে। ক'খানা আন্দাজ করতে পারবি? সাতখানা। প্রত্যেক ঘণ্টায় একখানা করে।

ঘটনাটি এই রকম।

বোদলেয়ারের তখন পঁয়তিরিশ বছর বয়েস। কিছুদিন আগে অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁর কবিতার বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে। চরম অর্থাভাব। সেই সময়ই বোদলেয়ারের মা তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হয়েছেন। উচ্ছৃঙ্খল ছেলের জন্য তিনি একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছেন বটে, কিন্তু ছেলের তাতে কুলোয় না। প্রচুর ধার দেনা করে ফেলে বোদলেয়ার মায়ের কাছে আরও টাকা চেয়ে কাকুতি-মিনতির চিঠি লেখেন।

ওঁদের এক পারিবারিক বন্ধু ছিলেন একজন আইনজীবী, তাঁর নাম আনসেল। একবার বোদলেয়ার এক হোটেল থেকে মাকে চিঠি লিখেছিলেন যে সেখানে তিনি সাংঘাতিক ঋণে আবদ্ধ। বোদলেয়ারের প্রকৃত অবস্থাটা কী, তা জানার জন্য আনসেল একদিন চলে এলেন সেই হোটেলে। তখন বোদলেয়ার ফেরার পর হোটেলের মালিক সাতকাহন করে লাগাল। একটা লোক এসেছিল স্পাইগিরি করতে, জিগ্যেস করছিল, ম্যসিউ বোদলেয়ার কত রাত করে বাড়ি ফেরেন, তাঁর ঘরে কোনও মেয়ে নিয়ে আসেন কি না, এই সব।

বোদলেয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আনসেলকে তিনি এমনিতেই দেখতে পারতেন না, আনসেলকে মধ্যস্থ রাখার শর্তটাও তাঁর অসহ্য ছিল। বোদলেয়ার ভাবলেন, এইভাবে গোয়েন্দাগিরি করতে এসে আনসেল তাঁকে অপমান করেছেন। বাল্যকাল থেকেই এই কবিটি বদরাগি, এখন এই ঘটনা শুনে রাগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন, চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এক্ষুনি তিনি আনসেলের বাড়ি গিয়ে তাকে মারবেন, তার সঙ্গে ডুয়েল লড়বেন।

তারপর তিনি তাঁর মাকে চিঠি লিখতে বসলেন। বেলা দুটোর সময় প্রথম চিঠি : আমি এক্ষুনি যাচ্ছি আনসেলের বাড়িতে। ওই ইতরটার আমি কান মুলে দেব ওর বউ ও ছেলের সামনে। ও বাড়িতে না থাকলে আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। আজ সব কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

বোদলেয়ার সেই রুদ্রমূর্তি দেখে বাড়িওয়ালিটি ভয় পেয়ে গেল। আসলে সে আনসেলের নামে অনেক কিছু বানিয়ে বলেছিল, আনসেল অপমানজনক কোনও প্রশ্ন বোদলেয়ার বিষয়ে করেননি।

বাড়িওয়ালা বোদলেয়ারকে আটকালেন। তখন বোদলেয়ার লিখলেন দ্বিতীয় চিঠি : আমি এক্ষুনি আনসেলের বাড়িতে যাচ্ছি না বটে, কিন্তু আনসেলকে ক্ষমা চাইতেই হবে। তাকে তুমি ধমকাবে।

তৃতীয় চিঠিতে লিখলেন, অপমানে আমার সারা শরীর জ্বলছে, আনসেল যদি ক্ষমা না চায়, প্রতিশোধ না নিলে আমি শান্ত হতে পারব না। আমি আনসেলকে থাপ্পড় মারব, ওর ছেলেকে থাপ্পড় মারব। তারপর গুণ্ডামির অভিযোগে পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে যায় তো যাক।

পরের চিঠি লেখার সময় বোদলেয়ারের স্ট্যাম্প কেনারও পয়সা ছিল না। বিয়ারিং চিঠি পাঠালেন তাকে। ততক্ষণে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব জড়ো হয়েছে, তারা কবিকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করতে লাগল।

সপ্তম চিঠিতে বোদলেয়ার লিখছেন, সবাই বলছে, ছেলেমেয়েদের সামনে একজন বৃদ্ধ লোককে চড় মারা একটা নোংরা কাজ। ঠিক আছে, তা আমি করব না, কিন্তু আমার অপমানের জ্বালা মিটবে কীসে? ও যদি ক্ষমা না চায়, আমি ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বউছেলেমেয়েদের সামনে আমি আমার

যা মনে আসে বলব। এর পরেও যদি লোকটা আমাকে অপমান করে? বাড়ি থেকে বার করে দেয়? মা, তুমি তোমার ছেলেকে এ কী সাংঘাতিক বিশ্রী অবস্থায় ফেললে?

রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে এতগুলি চিঠি লেখার ফলে বোদলেয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন খুব। বিছানায় শুয়ে রইলেন সাত দিন।

॥ ২২ ॥

"সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের কথা
পৃথিবীর এ অঞ্চলে সব পর্যটকরাই
সূর্যাস্ত বিষয়ে কথা বলতে একমত
এমন অসংখ্য বই আছে,
যাতে শুধু সূর্যাস্তেরই বর্ণনা
গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, সত্যি ভারী চমৎকার
কিন্তু আমি ভালোবাসি সূর্যোদয়
ভোর
আমি একটি প্রত্যূষও হারাই না
আমি ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি
নগ্ন
আমি একা সূর্যোদয়ের বন্দনা করি
কিন্তু আমি সূর্যোদয়ের বর্ণনা করতে চাই না
আমি আমার ভোরগুলি শুধু
নিজের জন্যই রেখে দেব।"

—ব্লেইজ স্যাঁদরার

পৃথিবীতে যতগুলো সমুদ্র আছে, তাদের মধ্যে ভূমধ্যসাগরই হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ। এশিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের মাঝখানের এই সমুদ্রের ওপর দিয়েই মানব সভ্যতা অনেকবার পারাপার করেছে। তা ছাড়া এই সমুদ্রটি দেখতে যত সুন্দর, তেমনই উপকারী। এর জল নরডিক রূপসিদের চোখের তারার মতন নীল। এখানে বড় বড় ঢেউ ওঠে না, তাই বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম, সেকেলে জাহাজগুলিও এই সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে গেছে। এখনও সন্তরণকারীরা নির্ভাবনায় বহুদূর চলে যায়, মায়েরা তাদের দু-তিন বছরের বাচ্চাদেরও দু'হাতে দুটি বেলুন বেঁধে এই সমুদ্রে ছেড়ে দেয়। হাঙর-কুমিরের মতন হিংস্র প্রাণীদের উৎপাতের কথা কখনও শোনা যায়নি। তার বদলে আছে প্রচুর মাছ, জাল ফেললেই জালভর্তি রুপোলি মাছ উঠে আসে। ভূমধ্যসাগর যেন এক বিশাল, নিরাপদ অ্যাকোরিয়াম।

এই সমুদ্রকে ঘিরে অনেকগুলি দেশ, স্পেইন, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রিস, টার্কি, সিরিয়া, ইজিপ্ট, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া। তবু দক্ষিণ ফ্রান্সের বেলাভূমিই বিশ্ববিখ্যাত, ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা সারা পৃথিবীর বিলাসীদের লীলাভূমি। কাছাকাছি ইতালিয়ান রিভিয়েরা'রও সুনাম আছে। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা'র আবহাওয়াও একটা বিশেষ আকর্ষণ, কখনও এখানে খুব শীত পড়ে না, তুষারপাত হয় না, আবার গ্রীষ্মকালেও গরমের আঁচ নেই।

পর্যটকরা এখানে টাকা খরচ করতে আসে, তাই সুদীর্ঘ বেলাভূমি সাজানো হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। বালির ওপরেই বেঁটে-বেঁটে পাম ও খেজুর গাছ, কোথাও ফুলের সমারোহ। যে-জায়গাগুলো শুধু পাথুরে ছিল, সেখানেও জাহাজে করে বালি এনে ফেলা হয়েছে। একসঙ্গে এত হোটেল ও রেস্তোরাঁর সমাবেশও পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আমরা চার বাঙালি এর মধ্যে পয়সার হিসেব করে চলি, দিনের বেলা সস্তার খাবার কিনি কিংবা স্যান্ডুইচ খেয়ে পেট ভরাই, রাত্তিরে বড় বড় হোটেলগুলি এড়িয়ে গলিঘুঁজির মধ্যে ছোট ছোট দোকান, যেখানে স্বামী-স্ত্রী মিলে রান্না করে খাওয়ায়, সেখানে ঢুকে পড়ি। বড় হোটেলের চেয়ে তাদের রান্না অনেকরকম বেশি সুস্বাদু হয়। অসীম-ভাস্কর-মৃণাল নিজেদের মধ্যে কিছু একটা চুক্তি করে রেখেছে, আমাকে তারা পয়সা খরচ করার সুযোগই দেয় না।

সকাল থেকেই এখানে চলে স্নানের উৎসব।

রিভিয়েরাতে এসে কেউ ঘরে বসে থাকতে চায় না। সমুদ্রই এখানকার প্রধান-আকর্ষণ, যে-যতক্ষণ পারে সমুদ্রকে উপভোগ করে। সাজ-পোশাকের বালাই নেই, একখানা তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। কেউ কেউ চার-পাঁচ ঘণ্টা জলের মধ্যে কাটিয়ে দেয়, কেউ খানিকক্ষণ সমুদ্রে গা ভাসিয়ে আবার বালির ওপর শুয়ে থাকে।

আমরা বেলাভূমির নানা অংশ ও ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে ঘুরে ঘুরে স্নানের জায়গা বদল করি। যে যেখানে খুশি যেতে পারে, কোনও বাধা নেই। এখানে বিশ্বের বহু ধনীর নিজস্ব বাড়ি আছে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। এক সময় কেউ কেউ নিজের বাড়ির দরজা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বেড়া বা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল, যাতে সেই জায়গার সমুদ্রটুকু তাদের নিজস্ব হয়ে যায়, তাদের প্রাইভেসি কেউ নষ্ট না করে। কিন্তু ফরাসি সরকারের আদেশবলে সেই সব বেড়া ও পাঁচিল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কারণ, যে-কোনও সাধারণ মানুষেরই সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটার অধিকার আছে, সমুদ্রের সৌন্দর্যকে কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি করতে পারবে না। বিখ্যাত চিত্রতারকা ব্রিজিৎ বারদো'র নিজস্ব বাড়ি আছে সাঁ ত্রোপে নামে এক নির্জন অংশে। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ব্রিজিৎ বারদো'র নাম শুনলে বুক কাঁপত না, এমন সিনেমা-দর্শক পুরুষের সংখ্যা বিরল। রজার ভাদিমের ছবি 'অ্যান্ড গড ক্রিয়েটেড উয়োম্যান' দেখে মনে হয়েছিল ব্রিজিৎ যেন পৃথিবীর নারী-সৌন্দর্যের প্রতীক। আমেরিকায় মেরিলিন মনরো, ইউরোপে ব্রিজিৎ বারদো। মেরিলিন যৌবন থাকতে থাকতেই আত্মহত্যা করে, ব্রিজিৎ যৌবন ফুরোবার আগেই সিনেমা থেকে বিদায় নেয়। গ্রেটা গার্বো যেমন কোনওদিন মা-মাসি-পিসির ভূমিকায় অভিনয় করেনি, নায়িকা থাকতে থাকতেই আত্ম-নির্বাসনে চলে যায়, কোনওদিন আর বাইরের লোকের সামনে দেখা দেয়নি, ব্রিজিৎ বারদোও তেমনি এখানে একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। তার জন্তু জানোয়ারের খুব শখ। মানুষের সঙ্গ পরিহার করে সেই রূপবতী এখন ঘোড়া ও কুকুরদের সঙ্গে সময় কাটায়।

ব্রিজিৎ বারদো'র বাড়ির সামনের পাঁচিলও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে সেখান দিয়েও হেঁটে যাওয়া যায়, আমরা অবশ্য যাইনি। চতুর্দিকেই অসংখ্য সুন্দরী, আলাদা করে সিনেমার নায়িকাকে দেখার কোনও প্রয়োজন হয় না।

সমুদ্রতীরে সাধারণ মানুষের এই অধিকারের কথা শুনে আমার মনে পড়ে সুইডেনের কথা। স্টকহলমে গিয়ে একটা সুন্দর নিয়মের কথা শুনেছিলাম। প্রকৃতির ওপর সব মানুষের সমান অধিকার। সুইডেনে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে। স্টকহলমের কাছেই নাকি চব্বিশ হাজার। ইচ্ছে করলেই পুরো একটা দ্বীপ কিনে ফেলা যায়। অন্যান্য দেশে যেমন লোকের গাড়ি থাকে, সুইডেনে অনেকের থাকে নিজস্ব মোটর বোট বা লঞ্চ। শহর থেকে নিজস্ব মোটর বোটে, নিজস্ব দ্বীপে তারা ছুটি কাটাতে যায়। কিন্তু এই সব দ্বীপে অন্য যে-কেউই পা দিতে পারবে, কেউ যদি দল বেঁধে কোনও দ্বীপে পিকনিক করতে চায়, মালিক বাধা দিতে পারবে না। এমনকি বাগানের ফুল-ফলও মালিকের

একার নয়, সেও তো প্রকৃতির দান, যার ইচ্ছে হবে সেই ফল ছিঁড়ে খেতে পারে। এমনকি রাজার বাগানও ব্যতিক্রম নয়। আমি নিজে স্টকহলমের রাজার বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি, বহু অফিসযাত্রী সেই বাগানের রাস্তায় শর্টকাট করে। রাজার পুকুরে বাইরে লোক এসে সাঁতার কাটে। অবশ্য ফুল-ফল ছিঁড়তে কারুকে দেখা যায় না, অনেক গাছ থেকে আপেল-আঙুর এমনিই ঝরে পড়ে যায়, কেউ খায় না।

সারাদিন স্নানের পর বিকেলবেলা আমরা পা ছড়িয়ে বসে থাকি বালিতে। ভূমধ্যসাগরের সূর্যাস্ত না দেখে ঘরে ফেরার কোনও মানে হয় না। প্রথমবার প্রবাসবাসের শেষে দেশে ফেরার সময় আমি বিমানে বসে এক সূর্যাস্ত দেখেছিলাম, সেই দৃশ্য আমার মনে আজও জ্বলজ্বল করে। আথেনস্ থেকে বিমানটি উড়ে যাচ্ছিল কায়রো'র দিকে, এই ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়েই। পাশ্চাত্য ছেড়ে আমি আসছি প্রাচ্যের দিকে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল পেছনের ইউরোপ যেন প্রবল আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর সামনের প্রাচ্য দেশে জমাট অন্ধকার!

এবারে এখানকার সূর্যাস্তে সেই আগুনের দীপ্তি নেই, সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল সোনালি আভা, সমুদ্রের নীল জলে যেন অন্তরীক্ষ থেকে ঝরে পড়ছে অসংখ্য স্বর্ণময় তীর। কিংবা স্বর্ণরেণুর বৃষ্টি।

অসীম বলল, ভাস্কর, এখানকার সানরাইজ আরও সুন্দর। কিন্তু তোমার তো দেখা হবে না, তুমি আটটার আগে ঘুম থেকে উঠবেই না।

ভাস্কর বলল, সানরাইজ আর সানসেট দুটো একসঙ্গে হজম হবে না ভাই। একটাই যথেষ্ট।

অসীম আবার বলল, জীবনে কখনও কি সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছেড়ে উঠছ?

ভাস্কর বলল, খামোখা ভোরবেলা জাগতে যাব কেন দুঃখে? আমি মেথর না মুদ্দোফরাস?

দুজনের খুনসুটি চলল কিছুক্ষণ। তখন আমার মনে পড়ল ব্লেইজ স্যাঁদরারের উপরিউদ্ধৃত কবিতাটি। সত্যিই তো, সূর্যাস্তের বর্ণনা যত লোক লিখেছে, সূর্যোদয়ের বর্ণনা সেই তুলনায় অনেক কম। আমাদের মুনি-ঋষিরা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গরমের দেশে তবু অনেকে ভোরবেলা ওঠে, কিন্তু এইসব ঠান্ডার দেশে খুব ভোরে কার বা বিছানা ছাড়তে সাধ হয়!

হঠাৎ আর একটা কথাও মনে পড়ল। এই কবিকে নিয়ে মার্গারিটের সঙ্গে আমার প্রায়ই তর্ক হত। ব্লেইজ স্যাঁদরার সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের গুরু, সেইজন্য তাঁকে আমার খুব পছন্দ, কিন্তু মার্গারিট বলত, স্যাঁদরার গুরু হলে কী হয়, তাঁর কবিতা নীরস, কর্কশ! তাঁর চেয়ে পিয়ের রেভার্দি অনেক বড়। আমি আবার বলতাম, পিয়ের রেভার্দি কাপুরুষ। সে কবিতা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

পীয়ের রেভার্দির জন্ম এই সাউথ অফ ফ্রান্সেই, গত শতাব্দীর শেষ বছরে। অল্প বয়েসে প্যারিসে গিয়েছিলেন একটা খবরের কাগজে প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে। তখন শিল্পে চলছে কিউবিস্টদের আন্দোলন, সাহিত্যে ডাডাইস্ট ও সুররিয়ালিস্টদের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। পিয়ের রেভার্দি এর মধ্যে জড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গিয়ম আপোলিনেয়ারের মতন পিয়ের রেভার্দিকেও যুদ্ধে যেতে হল। দুজনেই ফিরে এলেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই, আপোলিনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্দি ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে। এর কিছুদিন পরে প্রকাশিত হল বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুদ' (উত্তর-দক্ষিণ), রেভার্দি মেতে উঠলেন তা নিয়ে, তিনি তখন সাহিত্য জগতের তরুণ বিপ্লবী। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মনোজগতে কী পরিবর্তন এল কে জানে। বন্ধুদের সংসর্গ ছেড়ে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন, শুধু তাই নয়, তিনি চলে গেলেন এক নির্জন মঠে। লেখা তো বন্ধ করলেন বটেই, অন্য কারুর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখলেন না। পিয়ের রেভার্দি-এর পরেও বেঁচে ছিলেন ৩৪ বছর, কিন্তু সাহিত্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ পলাতক। মার্গারিট গোঁড়া ক্যাথলিক, সেইজন্যই পিয়ের রেভার্দিকে তার খুব পছন্দ ছিল।

এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তা আসে। আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

আমি জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা অসীম, ফ্রান্সে যদি কোনও মেয়ে নান বা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়, তা হলে তারা কি বাইরের কোনও লোককে চিঠিপত্রও লিখতে পারে না?

অসীম ধীর স্বরে বলল, তোমার বুঝি সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে? মার্গারিট?

আমি বললাম, মার্গারিট বলত, ওদের পরিবার খুব ধর্মভীরু। ওর এক বোন সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে থাকে। ওর বাবা-মা তাতে খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলেন। মার্গারিট কবিতা ভালোবাসত খুব, ওয়াইন ভালোবাসত, একটু-আধটু সিগারেটও টানত, সেই জন্য সন্ন্যাসিনী হয়নি, কিন্তু গির্জায় যাওয়া, বিশেষ বিশেষ খ্রিস্টান পরবে উপোস করা বাদ দিত না। আমি পল এঙ্গেলের কাছে যা শুনেছি, কয়েকজন কালো লম্পট ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা ওর ওপর শারীরিক অত্যাচার ও চরম অবমাননার পর যদি কোথাও ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যায়, তারপর যদি কোনওক্রমে ও বেঁচে ওঠে, তা হলে—

ভাস্কর বলল, তুই দুঃখ পাবি, তবু বলছি, সাধারণত ওরা চান্স নেয় না, একেবারে মেরেই ফেলে, মেরে কোনও এঁদো জলার মধ্যে ফেলে দিয়ে যায়।

আমি বললাম, ওর শরীরটা তো খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাং বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব কী? ধর যদি বেঁচে থাকে, তা হলে অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় ও হয়তো নান হয়ে যেতে পারে। পারে না?

অসীম বলল, তা হতে পারে। ওদের পরিবারে যখন ট্রাডিশান আছে, তাতে এটা অসম্ভব নয়। যদি সে কোনও মঠে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকে, তা হলে সে আর তোমাকে চিঠি লিখবে না। বাইরের কারুর সঙ্গে এ রকম যোগাযোগ ওদের রাখতে নেই।

আমি বললাম, ওর বাবা-মাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। তাঁরা উত্তর দেননি। সেটাও কি এই কারণে হতে পারে? সন্ন্যাসিনীদের সমস্ত পূর্ব পরিচয় একেবারে মুছে ফেলতে হয়?

অসীম বলল, মেয়েটি যদি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়ে থাকে, তাতেও তো তোমার খুশি হওয়ার কথা। সে বেঁচে আছে। এই ফ্রান্সেরই কোথাও সে আছে।

ভাস্কর বলল, এরপর নানদের কোনও শোভাযাত্রা দেখলেই সুনীল খুব খুঁটিয়ে দেখবে। যদি মেয়েটাকে চিনতে পারে।

অসীম বলল, সুনীল চিনলেও সে মেয়েটি চিনবে না। খুব সম্ভবত সে সুনীলের সঙ্গে একটাও কথা বলবে না।

আমি বললাম, কথা না বলুক, চিনতে না পারুক, তবু সে বেঁচে থাক। আচ্ছা অসীম, মঠে যারা সন্ন্যাসিনী হয়, তারা কি শুধু বাইবেল পড়ে, না অন্য কবিতাও পড়ে? মার্গারিট এমন কবিতা-পাগল ছিল, সব কি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব?

অসীম বলল, এত সব আমি জানব কী করে? আমার কি কোনও নান-এর সঙ্গে প্রেম হয়েছে? তবে যতদূর মনে হয়, আধুনিক কবিতা-টবিতা ওদের পড়তে দেওয়া হয় না। তাতে চিত্ত-বিক্ষোভ হতে পারে। নান হওয়া তো ছেলেখেলা নয়, সারাজীবনের মতন নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দিতে হয়।

ভাস্কর বলল, সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমাটা হওয়ার পর আমরা অ্যাবের ভেতরকার জীবন অনেকটা দেখতে পেয়েছি। কোনও নান যদি জুলি অ্যান্ড্রুজ-এর মতন হয়, গান গাইতে ভালোবাসে, টম বয়ের মতন ছুটোছুটি করে...।

তারপর ভাস্কর সাউন্ড অফ মিউজিকের একটা গানের লাইন গুনগুন করল, হাউ টু সল্ভ আ প্রবলেম লাইক মারিয়া—

অসীম আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, তুমি ঠিক বলেছ। আমার সঙ্গে ওর আর দেখা না হোক, আমাকে চিনতে পা পারুক দৈবাৎ দেখা হলেও, তবু ও বেঁচে থাক।

সূর্যাস্তের আলো অনেকক্ষণ লেগে থাকে আকাশের গায়ে। পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার পর আমাদের উঠে পড়তে হল।

অসীম বলল, ভাস্কর, তুমি হোটেলের মালিক আর তার বউকে নেমন্তন্ন করেছ। তোমাকে এখন গিয়ে রান্না করতে হবে, মনে রেখো।

ভাস্কর বলল, সে ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়! ম্যাজিক দেখাব, ম্যাজিক!

মৃণাল লন্ডনে ভাস্করের প্রতিবেশি। সে জানাল যে ভাস্কর শুধু ওমলেট ছাড়া আর কিছু রান্না করতে জানে, এমন কখনও শোনা যায়নি। ভিক্টোরিয়া কখনও দেশে গেলে ভাস্কর যাতে দিনের পর দিন শুধু টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে না কাটায়, সেইজন্য তার প্রতিবেশীরা তাকে প্রত্যেক দিন নেমন্তন্ন করে।

আমিও ভাস্করের বানানো ওমলেট ছাড়া অন্য কিছু কখনও খাইনি। কিছু একটা মাংস আমিও রেঁধে ফেলতে পারি, অসীম কিংবা মৃণালও ভালোই রান্না জানে। কিন্তু অসীম জেদ ধরে আছে, ভাস্করকেই রাঁধতে হবে। কারণ, ভাস্কর আগ বাড়িয়ে হোটেলের মালিককে নেমন্তন্ন করতে গেল কেন? কোথায় হোটেলের মালিক আমাদের খাওয়াবে, তা নয়, এ যে উলটো।

ভাস্করের বক্তব্য এই যে, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা না করলে লাভ কী? আর হোটেলের মালিক যখন কবি, তখন তার সঙ্গে আড্ডা মারা বিশেষ দরকার। তা ছাড়া, আমরা একবার খাওয়ালে পরদিন হোটেলের মালিকও নিশ্চয়ই আমাদের ভোজ দেবে। নতুন ধরনের কর্সিকান রান্না খাওয়া যাবে।

আমি চুপিচুপি ভাস্করকে বললেন, এখানে একটা গ্রিক দোকান দেখেছি, চল সেখান থেকে রান্না মাংস কিনে নিয়ে যাই। গ্রিক রান্না আর ভারতীয় রান্না অনেকটা এক রকম।

ভাস্কর ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর না। দ্যাখ না কী করি। আদা চাই, অনেকখানি আদা!

সব সুপার মার্কেটেই আদা পাওয়া যায়। আলু, মাংস, পেঁয়াজ আরও কী সব কিনল ভাস্কর। তারপর ফেরা হল হোটেলে।

হোটেলের তরুণ মালিক লুই একটু লাজুক ধরনের। তার স্ত্রী ইংরেজ, বয়েসে খানিকটা বড়, তাকে দেখলে অভিনেত্রী মনে হয়। সত্যি সে স্টেজে কিছুদিন অভিনয় করেছিল, তার মুখখানা অতিশয় ধারালো। লুই নিজের কবিতা পাঠ করতে লজ্জা পায়, তার কবিতা পড়ে শোনাল তার স্ত্রী। লুই আবৃত্তি করলে বোদলেয়ারের কবিতা। আমরা বসে আছি চওড়া বারান্দায়, আমাদের পায়ের কাছে লুটোচ্ছে চাঁদের আলো।

ভাস্কর রান্নাঘরে গিয়ে বিপুল উদ্যমে রান্না শুরু করে দিল। মাঝে মাঝেই বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার ঝনঝন, ঠন-ঠনাৎ শব্দ হচ্ছে। ভাস্কর ঘুরে-ঘুরে এসে কবিতা শুনে যাচ্ছে, গেলাসে ওয়াইন ঢেলে রান্নাঘরে গিয়ে খাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে গেলাস ভরতি করতে। যেন রান্নাটা কোনও ব্যাপারই না!

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ভাস্কর হাত ধুয়ে এসে বলল, রান্না কমপ্লিট। ভাত, মাংস, সালাড। আমরা সভয়ে পরস্পরের দিকে তাকালাম। অতিথিরা কী বলবে কে জানে।

আমিই প্রথমে খানিকটা মাংস টেস্ট করলাম। তারপর বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সত্যিই তো ম্যাজিক। অপূর্ব সুন্দর স্বাদ হয়েছে। নুন, ঝাল, মশলা সব ঠিকঠাক।

অতিথি দুজনও ধন্য ধন্য করতে লাগল। সেটা যে নিছক ভদ্রতা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাদের খাওয়ার পরিমাণে। কর্সিকান কবিটি তিনবার মাংস চেয়ে নিল। তার ইংরেজ পত্নী বলল, আমরা এত ভালো রাঁধতে জানি না, তবু তোমরা যদি কাল রাত্তিরে আমাদের কাছে এসে খাও, তা হলে ধন্য হব।

মুখে একটা চুরুট দিয়ে ভাস্কর বীরের মতন ভঙ্গিতে হাসল আমাদের দিকে চেয়ে।

॥ ২৩ ॥

"...আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না,
শূন্যতা শুধু জল,
দেখো, এখন সব কিছুই মিশ্রিত, তবু চারপাশে আমি
খুঁজি রেখা ও আঙ্গিক
দিগন্তের জন্যও কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার
রঙের অবশেষ
সব দ্রব্য মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল
আমি অনুভব করি
আমার চিবুকে গড়ানো অশ্রুর ধারায়...
—পল ক্লোদেল

কান শহরটির পরিচিত আমাদের কাছে প্রধানত চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। প্রত্যেক বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রতি থাকে সারা বিশ্বের ফিল্ম বাফদের মনোযোগ। এই ফেস্টিভালেরই একটি শাখায় সত্যজিৎ রায় নামের এক অখ্যাত তরুণ পরিচালকের 'পথের পাঁচালী' নামে একটি ফিল্ম পুরস্কৃত হয়ে পৃথিবী বিখ্যাত হয়।

অনেকে এই শহরটিকে নাম উচ্চারণ করে ক্যান। কান না ক্যান, কোনটা সঠিক আমি জানি না। তবে নামটির উৎপত্তির খুব সম্ভবত বেতসকুঞ্জ থেকে, এককালে এখানকার বালিয়াড়িতে বেতের ঝাড় ছিল অনেক।

রিভিয়েরাতে উপকূলবর্তী পরপর চোঁধ ধাঁধানো সব কটি শহরই এক সময় ছিল জেলেদের গ্রাম। তবু এসব গ্রামেরও দু' হাজার বছরের ইতিহাস আছে। ফোসিয়ান, কেল্ট ও রোমানরা এই সব গ্রামের অধিকার নিয়ে লড়ালড়ি করেছে। দশম শতাব্দীতে প্রাচ্যদেশ থেকে মুসলমানরা রণতরীতে এসে একাধিকবার আক্রমণ করেছে এই উপকূল।

নেপোলিয়ান যখন এলবা দ্বীপের নির্বাসন থেকে পালিয়ে আসেন, তখন প্রথম রাত্তিরটা তাঁবু গেড়ে ছিলেন এই কান গ্রামের বালিয়াড়িতে। ছোটখাটো একটি অনুচরবাহিনী সংগ্রহ করে এখান থেকে শুরু করে হয় তাঁর প্যারিস অভিযান।

আমরা গাড়ি চালিয়ে এক দুপুরবেলা উপস্থিত হলাম কান শহরে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় এখানে চিত্রতারকা, হবু চিত্রতারকা এবং সুযোগ সন্ধানীরা গিসগিস করে, এখন সেসব কিছু নেই, অন্য শহরগুলির মত-ই টুরিস্টদের ভিড়। সকালবেলা এক পশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছিল, এখন আবার নরম রোদ উঠেছে। বেলাভূমিতে শুয়ে আছে হাজার হাজার নারী পুরুষ। কারুরই ঊর্ধাঙ্গে কোনও বস্ত্র নেই, আর নিম্নাঙ্গের পোশাক সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনা ধার করে বলা যায়, 'আমার গলার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাঙ্গিয়া হয়ে যায়।'

আমরা কেউ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নই, প্রায়-অনাবৃতা রমণীদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। কিন্তু প্রথম দু-একদিন যেরকম চিত্তচাঞ্চল্য হচ্ছিল, আস্তে আস্তে তা বেশ কমে গেল, এখন পাশ দিয়ে কোনও আধা-উর্বশী হেঁটে গেলেও তেমন আকর্ষণ বোধ করি না, ফিরেও তাকাই না। আমি জন্ম-রোমান্টিক, নারীদের খানিকটা কল্পনার রহস্যে মুড়ে রাখতে চাই। এরকম প্রকাশ্য নগ্নতা আমার অরুচিকর লাগে।

জমকালো হোটেলগুলি দেখতে-দেখতে এক সময় মনে হয়, দুশো বছর আগেকার কোনও

জেলে যদি হঠাৎ এখানে ফিরে আসত, তা হলে তাদের গ্রামটাকে কি চিনতে পারত? স্বয়ং নেপোলিয়ানই যদি আবার আসতেন, তিনিও নিশ্চয়ই ভাবতেন, এ কোন অচেনা স্বর্গপুরীতে এলাম রে বাবা।

রিভিয়েরার গ্রামগুলির এই হঠাৎ সমৃদ্ধির মূলে আছে ইংরেজরা। এক সময় তারা ফ্রান্সের অনেকটা অংশ দখল করেছিল। ইংরেজরা দ্বীপবাসী হলেও তাদের নিজস্ব কোনও উল্লেখযোগ্য বিচ নেই। ফরাসিদেশের এই গ্রামগুলিতে তারা স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করতে শুরু করে। যতই ধুরন্ধর ব্যবসায়ী হোক, ইংরেজদের যে সৌন্দর্যসন্ধানী চোখ আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের দার্জিলিং-কালিম্পং-এর মতন সুন্দর পাহাড়ি শহর যে বানানো যায়, তা ইংরেজরাই তো খুঁজে বার করেছিল। বাঙালিরা পুরীতে তীর্থ করতে গেছে কিন্তু বাংলায় কোনও উপকূল নগরী বানায়নি, আর নিজের দেশের মধ্যে এত চমৎকার পাহাড় থাকতেও পাহাড়চূড়ায় বসতি স্থাপনের কথা তাদের মাথাতেই আসেনি।

উপকূলের রাস্তা ধরে গাড়ি চালাতে-চালাতে আমরা এক সময় নিস শহর ছাড়িয়ে গেলাম। কান আর নিস-এর বহিরঙ্গ রূপের তেমন কিছু তফাত নেই। সেই বড় বড় হোটেল, পাম গাছের সারি ও বালির ওপর শুয়ে থাকা নারী-পুরুষ। নিস শহরে না থেমে আমরা চলে গেলাম মনাকো।

ফ্রান্স আর ইতালির মাঝখানে মনাকো একটা আলাদা রাজ্য। ভূমধ্যসাগরের কিনারে ছোট্ট একটা বিন্দু। মনাকোতে কোনও গ্রামবাসী থাকে না, কারণ গ্রামই নেই, একটা শহরই একটা রাজ্য। স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র চব্বিশ হাজার।

আমাদের ছাত্র বয়েসে এই মনাকোর রাজা আমাদের বুকে বড়ো দাগা দিয়েছিলেন। মনাকোর নাম তখনই প্রথম শুনি। চলচ্চিত্র জগতে আমাদের প্রিয় নায়িকা ছিল গ্রেস কেলি, তাকে এই মনাকোর রাজা বিয়ে করে একেবারে চলচ্চিত্র জগৎ থেকেই সরিয়ে নিয়ে গেল। কান্ট্রি গার্ল, রিয়ার উইন্ডোতে গ্রেস কেলি অপূর্ব অভিনয় করেছিল। গ্রেস কেলির সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তার সারল্য মাখা মুখখানা দেখলে মনে হত, খুব সাধারণ মেয়ে, যেন পাশের বাড়িতেই থাকে। সেই গ্রেস কেলি হয়ে গেল রানি। বড়লোকরা সিনেমার নায়িকাদের যখন তখন বিয়ে করে নিয়ে যেত তখন, বিশ্ববিখ্যাত ধনী আগা খাঁর ছেলে যেমন হলিউড থেকে হরণ করেছিল রিটা হেওয়ার্থকে।

এ রাজ্যে ঢুকতে আলাদা কোনও ভিসা লাগে না। গাড়ি পার্ক করে আমরা হাঁটছি, রাস্তার এক পাশে শুধু হিরে-জহরতের দোকান।

অসীম বলল, সুনীল, এর কোনও একটা দোকানে ঢোকার চেষ্টা করবে নাকি?

আমি বললাম, কেন, ঢুকতে দেবে না নাকি?

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এসব দেশে যত বড়লোকি দোকান কিংবা হোটেলই হোক, সেখান থেকে কিছু কিনি বা না কিনি, থাকি বা না থাকি, তবু ঢুকতে কেউ বাধা দেয় না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এখানে এমনই প্রবল যে কারুর পোশাক দেখে তার ক্রয়ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তোলে না। সেই জন্যই অসীমের প্রশ্ন শুনে আমার একটু খটকা লাগল।

অসীম বলল, না না, ঢুকতে দেবে নিশ্চয়ই। ঢুকে একটা মুক্তোর মালার দাম জিগ্যেস করে দ্যাখো না কী হয়।

বুঝতে পারলাম, আমার সঙ্গে কিছু একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে চাইছে। ওই ফাঁদে আমি পা দিই, মাথা খারাপ।

চেপে ধরতে অসীম বলল, ওইসব দোকানের নাকি বিশেষ একটা কায়দা আছে। ওই সব দোকানের আসল খদ্দেররা কেউ কক্ষনো কোনও জিনিসের দাম জিগ্যেস করে না। কেউ দাম জিগ্যেস করলেই দোকাদাররা বুঝে নেবে, সে লোক ওই দ্রব্য কেনার উপযুক্ত নয়। খুব বিনীতভাবে তাকে জানাবে, ওটা বিক্রির জন্য নয়। আসল খদ্দের কোনও একটা জিনিস পছন্দ করে বলবে, এটা আমার

হোটেলে পাঠিয়ে দিন। সেই সব খদ্দেররা নিজেদের কাছে পয়সাও রাখে না, তারা পেছন ফিরে সেক্রেটারিদের বলে, পেমেন্ট করে দিও।

দোকানগুলোর শো-কেসে লক্ষ-কোটি টাকা দামের হিরে মুক্তোর হার সাজানো রয়েছে। এসব জিনিস বাপের জন্মে দেখিনি, দেখতে ক্ষতি কী? সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ বাধা দেয় না।

আর একটু এগোলেই দুনিয়াখ্যাত জুয়োর আড্ডা, মন্টিকার্লো। বহু কোটিপতি এখানে নিঃস্ব হতে আসে। জোচ্চোর ছাড়া, জুয়োখেলায় শেষ পর্যন্ত কেউ জেতে, এমন কদাচিৎ শোনা যায়। কাছাকাছি বড় হোটেলগুলি থেকে এই মন্টিকার্লোতে যাওয়ার জন্য মাটির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ আছে। পকেট ভরতি টাকা নিয়ে ওপরের রাস্তা দিয়ে কেউ যেতে সাহস করে না, মাঝপথে ছিনতাই হয়ে যেতে পারে।

আমরা মন্টিকার্লোর সামনে দাঁড়ালাম। বাড়িখানাও দেখবার মতন, সোনালি রঙের বিশাল গেট। ইচ্ছে করলেই ভেতরে ঢোকা যায়, পকেটে পয়সা না থাকলেও ঢুকে এক চক্কর মেরে বেরিয়ে এলে কেউ কিছু বলবে ন, কিন্তু জুয়াখানা দেখার কোনও আগ্রহ বোধ করলাম না।

মনাকো এমনই একটি রাজ্য, যেখানে একজনও গরিব নাগরিক নেই। প্রত্যেকের গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে, টিভি আছে। স্বর্গ-টর্গ কি এই রকমই? আমরা গরিবদেশের মানুষ, পৃথিবীরই একটা অংশের এরকম সচ্ছলতা দেখলে আমাদের ঈর্ষা হয়, রাগও হয়। এখানকার ট্রাফিক পুলিশদের পর্যন্ত সাজপোশাক দারুণ, প্রত্যেকের হাতে সাদা গ্লাভস।

ভাস্কর অনেকটা অকারণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, হুঁ, ব্যাটারা সাদা হাত দেখাচ্ছে। ফুটানি কত।

বলাই বাহুল্য, রাস্তাঘাটগুলো ঝকঝকে তকতকে। যেখানে সেখানে পার্ক। আমরা একটা পার্কে বসে আমাদের রুটি মাখন চিজ সালামি বার করে স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেতে শুরু করলাম। পার্কটা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। একেবারে তলায় ঘন নীল সমুদ্র। যেন ওলটানো আকাশ। অতি নয়নাভিরাম দৃশ্য। আমরা গরিবদেশের লোক হলেও এই দৃশ্যটি বিনা পয়সায় উপভোগ করা যায়। এখানে জনসংখ্যা এতই কম যে পার্কে লোকজন প্রায় দেখাই যায় না, তবু এত পার্ক বানিয়ে রেখেছে। আর কলকাতার মতন জনাকীর্ণ শহরে পার্কই নেই বলতে গেলে। আমার মতন নাস্তিকের মুখ দিয়েও আর একটু হলে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভগবানের কী অবিচার।

যারা আস্তিক, তাদের প্রতি আমার এই প্রশ্নটা করতে ইচ্ছে করে, তোমাদের ভগবান কি সত্যিই সব মানুষকে ভালোবাসে? এই যে একটা শহর, এখানে কিছু মানুষ নিছক জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে দিব্যি সুখে আছে, ভালো খাচ্ছে-দাচ্ছে, সব রকম আরাম ভোগ করছে। আর আমাদের দেশের একটা চাষা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা খেতে পায় না। তবু তোমরা বলবে, সব মানুষের মধ্যে ভগবান আছে? নাকি এর পর পূর্বজন্মের কর্মফলের মতন গাঁজাখুরি ব্যাপারও মানতে হবে!

অসীম একটা খবরের কাগজ কিনেছিল, তাতে একটা মজার খবর বেরিয়েছে। একজন জেলে একটা বিরাট মাছ ধরেছে সেটা সে বিক্রি করেছে একজন দোকানদারকে। দোকানদার সেই মাছটা কেটে দেখে, না, শকুন্তলার হারানো আংটি নয়, প্রায় আড়াই কেজি ডিম। মাছের পেটে ডিম থাকবে, এটা অভিনব কিছু নয়, কিন্তু মাছটা হচ্ছে স্টার্জন মাছ, সুতরাং তার পেটের ডিমটা হয়ে গেল ক্যাভিয়ের। ক্যাভিয়ের অতি দুর্মূল্য খাদ্য। মাছটার দাম বড়ো জোর হাজার খানেক টাকা হবে, কিন্তু ক্যাভিয়েরের দাম অন্তত এক লাখ টাকা। জেলেটি মাছটা চিনতে পারেনি, এখন দোকানদারের সৌভাগ্যোদোয় দেখে সেও ডিমের বখরা দাবি করছে। কিন্তু দোকানদারই বা তা দেবে কেন, সে তো কিনেছে পুরো মাছটা।

মনাকোর মতন রাজ্যে এই সবই হচ্ছে বড় খবর।

পার্কে কিছুক্ষণ বসার পর আমরা গাড়িতে পুরো রাজ্যটাই এক চক্কর ঘুরে এলাম। আধ ঘণ্টাও লাগল না, তাতেই একটা দেশ দেখা হয়ে গেল। এবার মনাকো ছেড়ে এসে অসীম গাড়ি

চালাল সামনের দিকে।

কিছুক্ষণ পর খেয়াল হল, আমরা ইতালিতে ঢুকে পড়েছি। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, এ কী, কী করছ, গাড়ি ঘোড়াও, গাড়ি ঘোরাও।

আমার ইতালিয়ান ভিসা নেই। অন্য তিনজন ইউরোপের যে-কোনও দেশে যখন খুশি যেতে পারে, কিন্তু আমাকে সীমান্তরক্ষীরা কঁ্যাক করে চেপে ধরবে। এর মধ্যে যে একটা চেকপোস্ট পেরিয়ে এসেছি, সেটা লক্ষই করিনি কেউ, ওরাও আটকায়নি। ফেরার পথে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল। আমাকে ওরা ধরে-টরে রাখবে কি না কে জানে।

কিন্তু খোলা গেট দিয়ে অসীম সোজা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এল। সীমান্তরাক্ষীরা রোদ্দুরে চেয়ার পেতে বসে রেড ওয়াইন পান করছে। তারা খোসমেজাজে আছে, কোনও গাড়িই চেক করছে না। অর্থাৎ আমি বিনা ভিসায় অনায়াসে ইতালির মধ্যে চলে যেতে পারতাম।

আজকাল ভিসার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি। কিন্তু বজ্র আঁটুনির মধ্যে ফস্কা গেরোও আছে। একবার সুইডেন থেকে নরওয়ে যাওয়ার জন্য ভিসা জোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। এখন দেশ ছাড়ার আগে কোন-কোন দেশে যেতে চাই, তা ঠিক করে ভিসা নিয়ে নিতে হয়। বিদেশে এসে হঠাৎ কোনও দেশের ভিসা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভবই বলতে গেলে। সেবারে আমার নরওয়ের ভিসা ছিল না, কিন্তু স্টকহলমে থাকতে থাকতেই অসলো'র একটি বাঙালি ক্লাব আমাকে নেমন্তন্ন করল। কিন্তু যাই কী করে। শেষ পর্যন্ত অসলোর উদ্যোক্তারা সেখানকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ধরে সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানিয়ে ভিসার ব্যবস্থা করেছিলেন, ভিসার ফি-ও দিতে হল চার-পাঁচশো টাকা। সেই ভিসায় সশস্ত্র হয়ে আমি স্টকহলম্ থেকে ট্রেনে চাপলাম দুপুরবেলা। তারপর সারা দুপুর বিকেল সন্ধে দু'ধারের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে রাত প্রায় দশটার সময় পৌঁছলাম অসলোতে, এর মধ্যে কেউ একবারও আমার পাসপোর্ট দেখতে চায়নি, স্টেশানেও কেউ আটকালো না। সুইডেন-নরওয়ের লোকেরা বিনা ভিসায় প্রতিদিন ট্রেন যাতায়াত করে, তার মধ্যে আমার মতন বিদেশি দৈবাৎ দু'একজন থাকবে কি না, তা নিয়ে বোধহয় কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ ভিসা জোগাড় করার কত ঝকমারি।

সুইডেনের ট্রেনের একটি অভিজ্ঞতা আজও মনে পড়ে।

প্রথম দিকে কামরায় অনেকরকম যাত্রী ছিল। একজন অত্যন্ত রূপবান যুবক ও এক প্রৌঢ়া আমার সামনেই বসেছিল, ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ওয়াইন পান শুরু করে দিল। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তারা ইঙ্গিতে আমাকে ওয়াইনের একটা গেলাস দিতে চাইল, কিন্তু অচেনা লোকদের কাছ থেকে আমি ওয়াইনে ভাগ বসাতে যাব কেন? আমার প্রত্যাখ্যানে মহিলাটি বেশ চটে গেলেন মনে হল। যুবকটির সঙ্গে মহিলাটির বয়েস তফাত অন্তত পনেরো বছর তো হবেই। যুবকটিকে রাজকুমারের মতন দেখতে বললে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু মহিলাটির মুখে বেশ ভাঁজ পড়ে গেছে, চুল এলোমেলো, একটুক্ষণের মধ্যেই তিনি বেশ মাতাল হয়ে গেলাম। শ্বেতাঙ্গ জাতিদের মধ্যে দেখেছি, একমাত্র সুইডিশরাই প্রকাশ্যে মাতলামি করতে লজ্জা পায় না। মহিলাটির ব্যবহার রীতিমতন বিরক্তিকর, কিন্তু যুবকটি দারুণ ধৈর্যে ও মমতায় মহিলাটিকে সামলাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে তার ওষ্ঠে চুম্বন করছিল।

এদের দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক তাই-ই আমি বুঝতে পারছিলাম না। এই দুটি চরিত্রকে নিয়ে যেন একটা গল্প লেখা যায়, শুধু ভেতরের কথা একটু জানা দরকার। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মহিলাটি এক সময় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন, একটা স্টেশানে ট্রেন থামতেই যুবকটি তাঁকে নিয়ে নেমে গেল, আমার অজানা রয়ে গেল ওদের গল্পটি।

খানিক বাদে পুরো কামরাটিই খালি হয়ে গেল, উঠল একটা নতুন ছেলে। তাকে আমি গ্রিক বলে ভুল করেছিলাম, পরে বোঝা গেল গেল সে আরবদেশীয়। বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, প্যান্টের

সঙ্গে কোটটা ঠিক মানানসই নয়। তখন সন্ধে হয়ে গেছে, বাইরে কিছুই দেখার নেই, আমার কাছে কোনও বই-ই নেই। ছেলেটি মুখ তুলতেই তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়।

একবার সে সুইডিশ ভাষায় আমায় কী যেন জিগ্যেস করল।

আমি ইংরিজিতে জানালাম যে আমি সুইডিশ বুঝি না।

তখন সে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে জিগ্যেস করল, তুমি কোন দেশের লোক?

আমি ভারতীয় শুনে সে বেশ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর জিগ্যেস করল, ভারত তো অনেক দূরের দেশ। তুমি সেখান থেকে এসেছ কি চাকরি করবার জন্য?

আমি বেড়াতে এসেছি জেনে সে আরও বিস্মিত হয়ে বলল, সুইডেনে বেড়াতে এসেছ? এখানে দেখবার কী আছে? এ দেশটা অতি বিশ্রী। এখানকার মেয়েরাও বিশ্রী।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। সুইডেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্ববিদিত। গ্রেটা গার্বো, ইনগ্রিড বার্গমানের দেশের মেয়েদের কেউ বিশ্রী বলতে পারে, এ যে কল্পনার অতীত। সুইডেনে অসুন্দর কোনও মেয়ে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

ছেলেটি আবার মুখ বিকৃতি করে বলল, এ দেশের সব কিছু বিশ্রী। কিচ্ছু ভালো না।

আমি বললাম, তুমিও তো বিদেশি। তা হলে তুমি এ-দেশে আছ কেন?

ছেলেটি বলল, আমার দেশ ইরাক। আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

আমার মনে হল, এই ছেলেটিও একটি গল্পের চরিত্র। আগেকার যুবক ও প্রৌঢ়ার কাহিনিটি জানা হয়নি, এই যুবকটি সম্পর্কে আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু শেষপর্যন্ত না জানা গেল, তা গল্প নয়, একটি বিভ্রান্তিকর করুণ কাহিনি।

ছেলেটি আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি জানো, আমাদের দেশের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ চলছে? যুদ্ধটা কেন হচ্ছে তুমি জানো?

সেই সময় ইরান ও ইরাকের মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছিল। দুটোই ইসলামিক আরব দেশ, সিয়া-সুন্নির বিভেদের জন্য তারা পরস্পরের ওপর কেন বোমাবর্ষণ করছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

ছেলেটি জানাল, তার বাড়ি ছিল বাগদাদ থেকে সত্তর মাইল দূরে। তাদের গ্রামের ওপর গোলাবর্ষণ হয়। তার এক ভাই যুদ্ধে যোগ দিয়ে মারা গেছে। দেশে থাকলে তাকেও যুদ্ধে যোগ দিতে হত, তাই সে পালিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছে সুইডেনে। এখানে অবশ্য তাকে এখন একটা কারখানায় কাজ করতে হয়। তার একটা সুইডিস বান্ধবীও জুটেছে। কিন্তু সুইডিস মেয়েদের তার পছন্দ নয়, কারণ, সবাই তাকে পড়াশুনো করতে বলে সব সময়। তাকে শিক্ষিত করতে চায়।

ছেলেটি খুব সরল ধরনের। সে বলল, তুমি ইরাকে বেড়াতে যাও, আমার গ্রামের ঠিকানা দেব, দেখে এসো, কী সুন্দর সেই গ্রাম। সুইডেনের চেয়ে অনেক ভালো। আমার খুব ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেখানে। কিন্তু ফিরলেই আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। যে যুদ্ধ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, কেন যুদ্ধ চলছে তাও জানি না, সেই যুদ্ধে যোগ দিতে আমি মরতে যাব কেন?

ছেলেটির চোখ ছলছল করে উঠল। ইরাকের গ্রাম তাকে টানছে। কিন্তু সেখানে তার ফেরার উপায় নেই। এক অদ্ভুত যুদ্ধ তাকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করেছে।

আমাদের পাশের বাংলাদেশের ওপর অনেক যুদ্ধবিগ্রহ গেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা কখনও যুদ্ধের আঁচ তেমনভাবে অনুভব করিনি। ছেলেটিকে দেখে আমার অসম্ভব মায়া হচ্ছিল। আমার মতন অচেনা এক বিদেশিকেও সে ব্যাকুলভাবে বার বার জিগ্যেস করছিল, এই সব যুদ্ধ কেন হয় বলো তো? কেন শুধু শুধু আমি যুদ্ধে গিয়ে মরব? কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি আর কী দেব। বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক, যারা যুদ্ধ বাধায়, তাদের মনে কি একবারও এই সব প্রশ্ন আসে না।

॥ ২৪ ॥

"এই ঘেরা চত্বরগুলোয় কে কোনটার মালিক? কার
পাহাড়ের একেবারে চূড়া পর্যন্ত ঢেকে থাকা
সুস্থির দেওয়ালগুলি, হলুদ গম, অ্যামন্ড বৃক্ষেরা?
এই সুন্দর সম্পত্তিটি কি তোমার, তোমার
এই বাড়ি, চমৎকার একটা পুকুর
উঠোনে যে শিশুটি কাঁদছে, সেও?
আহা, কে নিজের হাতে ধরে রাখতে পারে
ভেঙে পড়া সব দেওয়াল, অবিনশ্বর কুসুম
টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া জমিদারি, শুকিয়ে যাওয়া
কুয়ো
লতা পাতা গজিয়ে যাওয়া বিস্তৃত কবরখানায়
কে পড়বে মৃত পরিবারের সব কটা নাম?
এবং বাতাস, পাথর, মৃত্যু, এসব কার?"
—আন্দ্রে ফ্রেনো

মনাকো থেকে ফেরার পথে ভাস্করের হঠাৎ হেঁচকি উঠতে লাগল। প্রথমে আমরা তেমন কিছু গুরুত্ব দিইনি। হেঁচকি কেন যে যখন তখন আরম্ভ হয় তা কে জানে, আবার একটু বাদে থেমেও যায়। ভাস্কর একটা মজার গল্প আরম্ভ করেছিল, তার মাঝখানে হেঁচকির শব্দে বাধা পড়তে লাগল। অসীম বলল, জল খাও, ভাস্কর, জল খাও ভালো করে! তোমরা ইংল্যান্ডের লোকেরা শুধু কোলড ড্রিংকস আর বোতলের পেরিয়ের ওয়াটার খাও, এমনি জল খেতে ভুলেই গেছ।

আমি একবার আমেরিকার টি ভি দেখে হেঁচকির কয়েকটা চমৎকার টোটকা শিখেছিলাম। ওদেশে টিভি'র অনেকগুলি চ্যানেলে বহু রকম বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু একটা থাকে পাবলিক নেট ওয়ার্ক। সেটা সম্পূর্ণ অবাণিজ্যিক, তাতে কোনও বিজ্ঞাপন থাকে না। বড় বড় কোম্পানির চাঁদায় এটা চলে, এতে থাকে দেশি-বিদেশি নানারকম ভালো ভালো অনুষ্ঠান, বেশ কিছু আকর্ষণীয় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। মাঝে মাঝে দু' এক মিনিটের জন্য কিছু কিছু অসুখ সম্পর্কেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

তাতেই দেখেছিলাম যে হঠাৎ খুব হেঁচকি উঠলে দু' চামচ চিনি খেয়ে নিতে হয়। তাতে কাজ হয় ম্যাজিকের মতন। যারা চিনি খায় না, বা হাতের কাছে চিনি না থাকলে দু-তিনটে বিস্কুট গুঁড়ো করে এক সঙ্গে মুখে ফেলে দিলেও একই কাজ হবে। আমি নিজে পরীক্ষা করে এই টোটকার সুফল পেয়েছি প্রত্যেকবার। শুধু জল খেলে হেঁচকি কমতে চায় না, জল খাওয়ার সময় নাক টিপে ধরে দম বন্ধ করে থাকা দরকার।

ভাস্করের ওপর এই সব কটি টোটকা পরীক্ষা করেও কোনও কাজ হল না, তার হেঁচকি বাড়তেই লাগল। শরীর খারাপ হলে কোনও সুন্দর দৃশ্যই চোখে পড়ে না। ভাস্করের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত, তাতে সে বেশ বিরক্ত, ওই অবস্থাতেও সে জোর করে হাসি গল্প ও জানলার বাইরে মনোযোগ ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগল। যারা প্রকৃত ভদ্রলোক ও যাদের খাঁটি রসবোধ থাকে, তারা কক্ষনো নিজেদের শরীর খারাপ কিংবা অসুখ-বিসুখ নিয়ে অন্যদের বিব্রত করতে চায় না।

হোটেলে ফিরে আসার পর ভাস্করকে একটু শুয়ে থাকতে বলা হল। সে কিছুতেই শুনবে না, আমরা প্রায় জোর করেই তাকে শোয়ালাম। দেখা গেল, তাতে হেঁচকির প্রাবল্য বাড়ছে। উঠে এসে ভাস্কর বলল, বুঝেছি, এ কিছু না। খুব অ্যাসিডিটি হয়েছে, দুপুরের হোয়াইট ওয়াইনটা বড্ড টক টক ছিল। এই বলে দু-তিন রকম অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মট মট করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল ভাস্কর, তাতেও কাজ হল না কিছু।

সন্ধের দিকে আমরা বেশ বিচলিত হয়ে পড়লাম। ভাস্করের হেঁচকি এমন বেড়েছে যে ভালো করে কথাই বলতে পারছে না। ঠিক হেঁচকি না, এ যেন ঢেঁকুর আর হেঁচকির মাঝামাঝি একটা ব্যাপার। এরকম আগে কখনও দেখিনি। এক সময় ভাস্কর ছুটে গিয়ে বাথরুমে বমি করল।

অসীম বলল, চলো, কাল সকালেই ফিরে যাই। ভাস্করকে যদি ডাক্তার দেখাতে, হয়, প্যারিসেই সুবিধে।

আমি ও মৃণাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এখানে আরও দু-একদিন হেসে খেলে থেকে গেলে মন্দ হত না। সস্তায় পছন্দমতন হোটেল পাওয়া গিয়েছিল, আবহাওয়াও খুব সুন্দর। কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে ভাস্করই নানারকম পাগলামি ও গালগল্পে সব সময় জমিয়ে রাখে।

পরদিন বেশ ভোর ভোরই বেরিয়ে পড়া গেল।

এবার ধরা হল অন্য রাস্তা। অটো রুট। চওড়া এই মসৃণ পথে গাড়ি ছোটে একশো কুড়ি কিলোমিটার স্পিডে। আমেরিকার রাস্তায় পঞ্চান্ন মাইলের বেশি স্পিডে গাড়ি চালালেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ কঁ্যাক করে চেপে ধরে। ফ্রান্সে তখনও সে বালাই ছিল না। এই অটো রুট ধরে সন্ধের মধ্যেই প্যারিস পৌঁছে যাওয়ার কথা। আসবার পথে আমাদের দু'রাত কিংবা তিন রাত হোটেলে কাটাতে হয়েছিল, ফেরার সময় সে খরচ নেই বটে, কিন্তু কিছুদূর অন্তর অন্তর টোল দিতে হয়, তাও কম নয়, এক একবার সত্তর-আশি টাকা। গাড়ির চালকদের কাছ থেকে এত বেশি পয়সা নেয় বলেই এরা রাস্তাগুলো এত নিখুঁত রাখে। সব সময় দেখা যায়, কোথাও না কোথাও মেরামত কিংবা নতুন করে সাজাবার পালা চলছে।

অটো রুটগুলো কোনও বাধা মানে না বটে, এমনকি এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ও ব্রিজ দিয়ে জোড়া, তবে ট্রাফিক জ্যাম হতেই পারে যে-কোনও সময়। এত চওড়া রাস্তা, কিন্তু গাড়িও তো হাজার হাজার।

ট্রাফিক জ্যামে গাড়ির গতি মন্থর হলে আমি স্বস্তি বোধ করি। দিনের বেলা দু'ধারের দৃশ্য না দেখতে পেলে গাড়ি চড়ার আনন্দই মাটি। উল্কার বেগে গাড়ি ছুটলে কিছুই দেখি না।

অটো রুট দিয়ে যারা গাড়ি চালায় তারা দৃশ্য-ফৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের শুধু তাড়াতাড়ি পৌঁছবার ব্যস্ততা। গতি কমাতে হলে তারা বিরক্ত হয়।

এক জায়গায় গাড়ি একেবারে স্থির হয়ে গেল, সামনে অসংখ্য গাড়ি থেমে আছে। অসীম ছটফট করছে, আমি বললাম, বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও।

অসীম ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, এখানে তো শুধু মাঠ, দেখবার কী আছে? তবু যদি একটা সুন্দর জায়গায় থামতে হত।

আমি ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারলাম না। তবে আমার মনের মধ্যে যে কথা গুঞ্জরিত হল, তা হচ্ছে এই : দৃশ্য সব সময় সুন্দর হওয়ার তো দরকার নেই। অনেকখানি বিস্তীর্ণ মাঠের শূন্যতাও একটা দৃশ্য। একটা দুটো ন্যাড়া গাছও দৃশ্য। এক পাল গরুও দৃশ্য। এসব নিয়ে কবিত্ব করার দরকার নেই, কিন্তু এই সব ছবিও আমাদের মাথার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিক্রিয়া থেকে অন্যরকম একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এদেশে শহরে মানুষ আজকাল সব সময় কৃত্রিম জিনিস দেখে। গাড়ি-টেলিফোন-ফ্রিজ-টিভি-সানমাইকার টেবিল, চিনে মাটির বাসন, কংক্রিটের বাড়ি, কলম-পেন্সিল বই! এয়ার কন্ডিশানড ঘর। এয়ার কন্ডিশনড গাড়ি। এর মধ্যে প্রকৃতির কোনও এলিমেন্টাল

ব্যাপার নেই। এমনকি আমাদের দেশেও একবার এক হোমরাচোমরা অফিসারের ঘরে গিয়ে লক্ষ করেছিলাম, সেখানে সব কিছুই মানুষের ও মেশিনের তৈরি, প্রকৃতির কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া একটা কিছুও নেই। মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আমরা এইভাবে প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি, আমাদের চোখ কি এই জন্য তৈরি হয়েছে? একটা কারখানার ছবির চেয়ে সাধারণ একটা পাহাড়ের ছবি তা হলে এখনও আমাদের আকৃষ্ট করে কেন? পাহাড় তো ফালতু, তা থেকে আর কী পাওয়া যাবে, কারখানাই তো আমাদের সব কিছু দেয়।

কৃত্রিমতার জন্য মানুষের চোখ এখনও তৈরি হয়নি। এখনও অনেকটা জল, ফাঁকা মাঠ কিংবা দু-চারটে গাছ দেখলে আমাদের চোখের আরাম হয়। এর প্রভাব হয়তো তক্ষুনি বোঝা যায় না, কিন্তু মাথার মধ্যে কাজ করে যায়।

সুতরাং দৃশ্য মানেই ক্যালেন্ডারের সুন্দর ছবি হওয়ার দরকার নেই।

ভাস্কর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হেঁচকি এখন বন্ধ বলে আমরা স্বস্তি বোধ করছি।

আমি আর অসীম নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। সামনে অসংখ্য গাড়ির নিশ্চল ঢেউ। দু-চার কিলোমিটার আগে কিছু একটা ঘটেছে বোধহয়। অনেকেই গাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই একটা বাড়ি চোখে পড়ল। আমি খানিকটা কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইলাম। এ বাড়িটা যেন এখানে থাকার কথা নয়। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে, একেবারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। কোনও কারখানা, বা অফিসবাড়ি নয়। কারুর শখের বসতবাড়ি, সামনে বাগান, গেটের দুপাশে দুটি নগ্ন নারীমূর্তি, মাঝখানে একটা লিলি পুলের ওপর সুন্দর ছোট্ট ব্রিজ।

কাছাকাছি আট দশ মাইলের মধ্যে কোনও জনবসতি নেই, এখানে হঠাৎ এরকম একটা একলা বাড়ি থাকার মানে কী?

আমার প্রশ্ন শুনে অসীম বলল, কেন, কেউ কি ফাঁকা জায়গায় থাকার জন্য বাড়ি বানাতে পারে না? অনেক সময় বুড়ো-বুড়িরা থাকে!

আমি বললাম, ইলেকট্রিক, জলের লাইন, সেসবও না হয় এসব দেশে ব্যবস্থা হয়ে যায়, কিন্তু চোর ডাকাতেরও কি ভয় নেই?

অসীম বলল, চোর-ডাকাতদের খুব মুশকিল হয়ে গেছে আজকাল। বাড়িতে কেউ গয়না-গাটি রাখে না। ব্যাংকে থাকে। ক্যাশ টাকাও কেউ রাখে না। কয়েকখানা ক্রেডিট কার্ড রাখলেই কাজ চলে যায়। চোরেরা কী নেবে?

আমি বললাম, ফ্রিজ, টিভি এই সব কিছু দামি জিনিস তো থাকেই।

অসীম বলল, ওসব জিনিস গরিব দেশের চোরেরা নিতে পারে। এখানে পুরোনো ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদির রিসেল ভ্যালু খুব কম। এখন একমাত্র দামি জিনিস হল মেয়েদের যৌবন। সেজন্যই তো বললাম, ফাঁকা জায়গায় শুধু বুড়ো-বুড়িরাই থাকতে সাহস করে।

বাড়িটাকে দেখে মনে হয়, অনেকদিন এখানে কেউ থাকেনি। গেটে তালা। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ। পর্চে পড়ে আছে এলোমেলোভাবে কিছু পুরোনো কাগজ।

অসীম বলল, হয়তো বুড়ো-বুড়ি বন্ধ করে কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গেছে।

আমার অন্যরকম মনে হয়। হয়তো এখানে এককালে কোনও শৌখিন মানুষের সংসার ছিল। স্বামী স্ত্রী, ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে চলে গেছে শহরে, তারা কেন পড়ে থাকতে যাবে এই ধাদধাড়া গোবিন্দপুরে, বাবা-মায়েরাও মরে হেজে গেছে কবে, বন্ধ ঘরগুলোর মধ্যে রয়ে গেছে শুধু তাদের দীর্ঘশ্বাস। এখানে এই বাড়ি আর কেউ কিনবে না, আস্তে আস্তে খসে পড়বে জানলা-দরজা। পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি দুটোর হাত আর নাক ভাঙবে, চোখ অন্ধ হবে।

বাড়িটার পেছন দিকে, খানিকটা দূরে একটা টিলা। সেখানে কয়েক সারি গাছ। খুব একটা রোদ নেই আজ, ছায়া ছায়া ভাব। দৃশ্যটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। এক একদিন এরকম হয়, কোনও অচেনা জায়গায় এসেও মনে হয়, আগে দেখেছি। কোনও অচেনা মানুষ সম্পর্কেও মনে হয়, ঠিক এরকম একজনের সঙ্গে আগে কথা বলেছি।

এই অটো রুট দিয়ে আমি আগে কখনও যাইনি। অপ্রত্যাশিত ট্রাফিক জ্যাম না হলে এখানে থামারও কোনও প্রশ্নই উঠত না। তবু এই অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটা চেনা মনে হল কেন?

আমি এক সময় বিড়বিড় করে বলে উঠলাম, কামিল পিসারো।

অসীম বলল, কী?

আমি বললাম, ঠিক এরকমই একটা ল্যান্ডস্কেপ আছে না কামিল পিসারোর আঁকা? ব্যাক গ্রাউন্ডে টিলা, গাছের সারি, সামনের দিকে একটা বাড়ি, কি যেন ছবিটার নাম?

অসীম বলল, হ্যাঁ, আছে এরকম ছবি। দাঁড়াও, নামটা বলছি। রোড টু দা হার্মিটেজ। সেখানে অবশ্য একটা বাড়ি নয়, আরও দু-চারটে ছোট ছোট ঘর। পাশের দিকে একটা বেশ বড় গাছ।

আমি বললাম, তোমার তো বেশ মনে আছে ছবিটা।

অসীম বলল, পিসারো অতি সাধারণ সব গ্রাম্য দৃশ্যের ছবি আঁকতেন। তবু একবার দেখলেই মনে থেকে যায়।

আমি বললাম, পিসারো যেসব ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন, দৃশ্য হিসেবে সেগুলোর সত্যিই কোনও মূল্য নেই। কিন্তু দিনের আলোর স্বাভাবিক রং ব্যবহার করে তিনি যে-সব ছবি এঁকে গেছেন, সেগুলো প্রথম দেখলে মনে হয় কোনও অসাধারণত্ব নেই, তাঁর সমসাময়িক দেগা, রেনোয়া কিংবা সেজান-এর ছবি অনেক বেশি মৌলিক এবং নাটকীয়, তবু পিসারোর ছবি মনে একটা ছাপ ফেলে যায়।

অসীম বলল, পিসারোই তো ওপ্‌ন এয়ারে ছবি আঁকার জন্য সে সময় একটা আন্দোলন চালিয়েছিল। সেজান অনেক বেশি বিখ্যাত হয়েছিল, সেজান-এর মতন অহংকারী এবং দুর্মুখও কিন্তু পিসারোর কাছে শিষ্যের মতন ল্যান্ডস্কেপ আঁকা শিখেছিল। পিসারো মানুষটা ছিল সাধুর মতন, শান্ত মেজাজ, তখনকার আর্টিস্টদের মধ্যে অনেকের মধ্যেই ঝগড়া ছিল, এ ওর মুখ দেখত না, কিন্তু পিসারোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল সকলেরই। পিসারো সম্পর্কে একটা মজার গল্প শুনবে?

দূরে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ হতেই আর গল্প হল না, আমরা দৌড় লাগালাম। সমস্ত গাড়িই আবার শম্বুক গতিতে এগোতে লাগল বটে, কিন্তু সন্ধের মধ্যে প্যারিসে পৌঁছবার আশা দুরাশা।

অসীম বলল, মুশকিল হচ্ছে, আজ রবিবার তো। যারা উইক এন্ডের ছুটি কাটাতে শুক্রবার প্যারিস ছেড়ে বেরিয়েছিল, সবাই আজ ফিরছে।

গাড়ির সংখ্যা দেখলে মনে হয়, অন্তত কয়েক লাখ মানুষ সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তাও তো এই একটাই নয়, আরও বিভিন্ন দিকে আছে অটো রুট। আমার ধারণা, যারা মাসের পর মাস শহর ছেড়ে বাইরে যায় না, তাদের মাথার গোলমাল হতে বাধ্য।

জেগে ওঠার পর ভাস্করের আবার হেঁচকি শুরু হয়েছে। ভাস্কর তো সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আরও তিন চারদিন ছুটি আছে, সাউথ অফ ফ্রান্সের রিভিয়েরা ছেড়ে প্যারিসে যাওয়ার কোনও মানে হয়? চলো ফিরি। ওই হোটেলটায় আবার জায়গা পাওয়া যাবে। আরও কিছু সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আমার হেঁচকি ঠিক হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য আমি জিগ্যেস করলাম, অসীম, তুমি কামিল পিসারো সম্পর্কে কী যেন একটা গল্প বলতে যাচ্ছিলে?

অসীম আমার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝল, তারপর বলল, ও হ্যাঁ, সেই গল্পটা। একটা [illegible] মেয়ের গল্প। ভাস্কর, তুমি তো জানোই, ইমপ্রেসানিস্টরা এক সময় কী রকম গরিব ছিল, কত রকম কষ্ট সহ্য করেছে। এর মধ্যে পিসারোকে সহ্য করতে হয়েছে চরম দারিদ্র্য, কারণ তাঁর ল্যান্ডস্কেপ বিক্রি হতই না প্রায়। একবার ইউজিন মুরে নামের একজন লোক, তার একটা কেকপেস্ট্রির দোকান ছিল, সে পিসারোকে সাহায্য করবার জন্য পিসারোর একটা ছবি লটারি করবে ঠিক করল। এক টাকার টিকিট, তাতে যদি চার-পাঁচশো টাকা ওঠে, সেটাই পিসারোর লাভ, তখন তার বাড়িতে একেবারে না খেতে পাওয়ার অবস্থা। কিন্তু এই এক টাকার টিকিটও বিশেষ কেউ কিনতে চায় না। শেষমেশ চল্লিশখানা বিক্রি হলেও লটারির কথা যখন ঘোষণা করা হয়েছে, তখন করতেই হবে, যদিও এই কটা টাকায় রঙের দামও ওঠে না। লটারি হল, জিতল সেই পাড়ারই একটা সুন্দরী মেয়ে। যুবতী, আর বেশ ফচকে ধরনের। সে ছবিটা উলটে-পালটে দেখে জিভ উলটে বলল, ম্যাগো! এ ছবি কে নেবে?

দোকানদারকে সে বলল, এই ছবিটার বদলে আমাকে একটা ক্রিম বান দাও না!

ছবির বদলে সে একটা মিষ্টি রুটি নিয়ে চলে গেল।

ভাস্কর বলল, পাগলি। সে মেয়েটা ওই ছবিটা রাখলে আজ তার নাতি-পুতিরা লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারত!

বাকি পথ শিল্পীদের বিষয়ে গল্প করতে-করতে এলাম। অসীমের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে বেশ রাত হয়ে গেল। শেষের দিকে ভাস্করের হেঁচকি বেড়ে গেল বেশ। ভাস্কর অবশ্য একটুও না ঘাবড়ে বলল, বুঝেছি, পর পর কয়েকটা রাত ভালো ঘুম হয়নি। সেইজন্য এই ব্যাপার। আজ ঘুমের ওষুধ খেতে হবে।

পরদিন ভাস্কর বেশ স্বাভাবিক রইল। ও ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে চায় না। ফরাসি ডাক্তারের ভাষা বুঝতে পারবে না। নিজেও কিছু বোঝাতে পারবে না। ভুল ওষুধ খেয়ে মারা পড়বে নাকি! তাই সে ইচ্ছেমতন ওষুধ খেতে লাগল।

প্যারিসে কাফে-রেস্তোরাঁয় পূর্ব পরিচিতদের কারুর সঙ্গে দেখা হলে আমাদের কাছে সাউথ অফ ফ্রান্সের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শুনতে চায়। অনেকের ধারণা, ওখানকার ভ্রমণ বেশ ব্যয়বহুল, আমরা বেশ সস্তায় সেরে এসেছি শুনে তারা অবাক হয়। ভ্যারনার ল্যামবারসি নামে একজন নরওয়েজিয়ান কবি আমাদের নাম দিয়েছে, বেঙ্গলি মাফিয়া। চারজন পুরুষ মানুষ এক সঙ্গে দিনের পর দিন গাড়িতে করে ঘুরছে, এরকম দৃশ্য এসব দেশে প্রায় দেখাই যায় না। দুজন পুরুষ ও দুজন নারীটি স্বাভাবিক। একমাত্র খুনে গুণ্ডারাই নারীবর্জিত হয় অনেক সময়।

প্রীতি ও বিকাশ সান্যালের বাড়িতে এক সন্ধেবেলা। যতবারই প্যারিসে আসি, এ দম্পতির কাছে নেমন্তন্ন একেবারে বাঁধা। দুজনেই আড্ডা দিতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন, নেমন্তন্ন করেন [illegible] অনেককে। প্যারিসের বাঙালিদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত, নিছক সাধারণ চাকরি করতে কেউ ফ্রান্সে আসে না। কেউ বিজ্ঞান গবেষক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, বা বিশেষ ধরনের টেকিনিশিয়ান, কেউ সমাজতাত্ত্বিক, কিন্তু এঁরা সকলেই ফরাসি শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে খবর রাখেন। এটা বোধহয় ফরাসি দেশের জল হাওয়ার গুণ। অন্যত্র এমন দেখিনি। এখানকার আড্ডার আলোচনাও একটু উচ্চস্তরের, রসিকতাগুলি সূক্ষ্ম, কেউ একটাও অনার্য শব্দ ব্যবহার করেন না। এরই মধ্যে ভাস্কর একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। ভাস্কর কবিতা ভালোবাসে, ছবি দেখা ওর নেশা, কিন্তু কথাবার্তায় তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল সাজতে একেবারেই রাজি নয়, উত্তর কলকাতায় কাঁচা বাংলা যখন তখন বেরিয়ে আসে, যাকে খুব আপন আপন মনে করে, তাকে শালা বলে সম্বোধন করে। প্রীতি ও বিকাশের বাড়িতে ভাস্কর শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার কলকাতার চিনে পাড়ায় কয়েকটি এমন অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি শুরু করে দিল যে বিশিষ্ট অতিথিরা

আঁতকে উঠলেন প্রথমে, তারপর বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতায় এসব একেবারে নতুন।

গল্পের মাঝপথে ভাস্করের হঠাৎ আবার খুব হেঁচকি উঠতে শুরু করল। সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার যে বেশ কষ্ট হচ্ছে, তা বোঝা যায়।

অগত্যা পরের দিন ভাস্কর আর মৃণালকে প্রায় জোর করেই পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডনে। আমার বিমানের রিজার্ভেশান আরও দিন তিনেক পরে, আমাকে থেকে যেতে হবে। অসীমও অফিস যেতে শুরু করল, দুপুরে আমি সম্পূর্ণ একা। তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা আছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো যায়। এ শহরে আকর্ষণের কোনও অভাব হয় না। ছবির প্রদর্শনী লেগেই আছে। এবার আমার মাথায় কামিল পিসারো গেঁথে গেছে। আমি বিভিন্ন গ্যালারিতে গিয়ে তার ছবি দেখছি।

দুপুরবেলা সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কেও পাওয়া যায়। তার অফিস থেকে কেটে পড়ার কোনও অসুবিধে নেই বোধহয়। ইংরেজরা না-বলে ছুটি নেওয়াকে বলে ফ্রেঞ্চ লিভ। ফরাসিদের নাকি এ অভ্যেস আছেই।

সুপ্রিয় ছবি-বিশেষজ্ঞ, কোন গ্যালারিতে কোন ছবি আছে, সব তার নখদর্পণে। প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সে সারা প্যারিসে চষে বেড়ায়। কোথায় সস্তায় অত্যুত্তম খাবার পাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও আমি সব সময় সুপ্রিয়-অনুসরণকারী।

একদিন দুপুরবেলা সুপ্রিয় বলল, চলো, আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবে? তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হঠাৎ আমি আলবার্তো মোরাভিয়ার সঙ্গে আলাপ করতে যাব কেন? অত বিখ্যাত লেখকদের ধারে-কাছে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না।

সুপ্রিয় বলল, ইতালিয়ান দূতাবাসে মোরাভিয়া গির্জার কাচে আঁকা ছবি বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন, আমার কাছে দুটো কার্ড আছে, সেখানে গেলেই আলাপ হবে।

আমি বললাম, আমার কোনও দরকার নেই, সুপ্রিয়। মোরাভিয়ার দু-চারটে উপন্যাস ও গল্প এক সময় ভালো লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষটি সম্পর্কে আমার কোনওই আকর্ষণ নেই। প্রথম কথা, তিনি নিশ্চিত এখন বেশ বুড়ো। দ্বিতীয় কথা, ভারত সম্পর্কে তাঁর কোনও ভালো ধারণা নেই, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে দিল্লি গিয়ে তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাজমহল দেখতে এসেছি। তাহলে আমি মোরাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাব কেন?

সুপ্রিয় বলল, তুমি এই কথা বলছ? তোমাদের কলকাতায় অমুক প্রবন্ধ লেখক একবার প্যারিসে এসে জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সার্ত্র-কে চিঠি লেখা হল, উনি দেখা করতে রাজি হলেন না। তারপর যে কাফেতে সার্ত্র রোজ সকালে যেতেন সেখানে আমি ওই বাঙালি প্রবন্ধ লেখককে একদিন নিয়ে গেলাম। সার্ত্র তাঁকে পাত্তাই দিলেন না, বসতেও বললেন না, টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দু-চারটে কথা বলে বিদায় করে দিলেন। তারপর দেখি, সেই প্রবন্ধকার দেশে ফিরে সার্ত্র-এর ওপর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছেন।

সুপ্রিয়র কথা শুনে মনে হয়, জাঁ পল সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়া, রেনে শার, আলবার্তো মোরাভিয়া ইত্যাদি বিখ্যাত বহু ব্যক্তির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তুই-তুকারির সম্পর্ক। আমি বললাম, আমার ভাই কোনও খ্যাতিমান লেখকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ইচ্ছে নেই। আমি আসি স্রেফ বেড়াতে।

অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করেও হার মানতে হল সুপ্রিয়র কাছে। অগত্যা যেতে হল তার সঙ্গে ইতালিয়ান দূতাবাসে। সেখানে গিয়ে অবশ্য এক আকস্মিক নতুন অভিজ্ঞতা হল। বৃদ্ধ আলবার্তো মোরাভিয়ার বদলে আলাপ হল এক অত্যন্ত আকর্ষণীয়া মহিলা শিল্পীর সঙ্গে।

॥ ২৫ ॥

"যুবতীটি খেলা করছিল তার বেড়ালটাকে নিয়ে
কী চমৎকার সেই দৃশ্য
শুভ্র হাত আর একটি শুভ্র থাবা
জমে-ওঠা অন্ধকারে তাদের খুনসুটি

কালো সুতোর দস্তানার মধ্যে
লুকিয়ে রেখেছে সে—আহ্ কী চতুরা?
অলীক রত্নের মতো তার সাংঘাতিক নোখ
ক্ষুরের মতন ধারাল আর ঝকঝকে

বেড়ালটিও, তারই মতন, দেখতে যেন কত শান্ত
ঢেকে রেখেছে লোমশ থাবার মধ্যে তীক্ষ্ণ নোখ
কিন্তু তার মধ্যে রয়ে গেছে শিকারি শয়তান

আর সেই ঘরের মধ্যে হাসির হররা
ঝনঝন করছে পরীদের ঘণ্টার মতন
ঝলসে উঠছে চারটি সূক্ষ্ম ফসফরাসের স্ফুলিঙ্গ"
—পল ভ্যারলেইন

ইতালিয়ান দূতাবাসে আমরা যখন পৌঁছলাম, ততক্ষণে আলবার্তো মোরাভিয়ার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। তখন চলছে পানাহার। সুপ্রিয়র কাছে দুখানা কার্ড আছে, সুতরাং আমাদের যোগ দিতে বাধা নেই। বক্তৃতাটাই উপলক্ষ, সেটা না শুনে শুধু খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা উচিত কি না, এই ভেবে আমার একটু বিবেক দংশন হচ্ছিল, কিন্তু দরজার কাছে পেছন থেকে আমাদের ঠেলতে লাগল কয়েকজন। অর্থাৎ এখনও লোকজন আসছে, তারাও আসছে ইতালিয়ান ম্যাকারুনি ও রেড ওয়াইনের টানে।

প্রশস্ত হল ঘরে প্রায় শ দেড়েক লোক, কাছাকাছি আরও দু-তিনটে ঘরেও ছড়িয়ে আছে মানুষজন। মৃদু গুঞ্জন ও খুচখাচ হাসির শব্দে ঝনঝন করছে ভেতরের বাতাস। সকলেরই হাতে হাতে লাল সুরার গেলাস। সুপ্রিয় আমার হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিয়ে কাকে যেন খুঁজতে চলে গেল।

এতজন লোকের মধ্যে আমি একজনকেও চিনি না। আমি একটা নন এনটিটি'র মতন এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলাম। প্রথম প্রথম বিদেশে এসে এই ধরনের পার্টিতে আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করতাম। সব সময় মনে হত, অন্যরা ভাবছে, এই লোকটা আবার কে? আমার পোশাক নিশ্চিত ঠিকঠাক নয়। আমি এই সব জায়গায় একেবারেই অনুপযুক্ত, বেমানান।

আমেরিকান পার্টিতে অবশ্য বেশিক্ষণ একা থাকা যায় না, ওদের শিষ্টাচার অনুযায়ী কারুকে একলা দেখলেই অন্য কেউ না কেউ এগিয়ে এসে কথা বলবে। সে সব অবশ্যই খেজুরে আলাপ। একেবারেই অনাবশ্যক। মিনিট তিনেক পর সেই ব্যক্তিটি এক্সকিউজ মি বলে সরে পড়বে, আবার একজন আসবে, আবার ঠিক একই রকমের কথাবার্তা। ফরাসি বা ইতালিয়ানরা তেমন আলাপী নয়, আমার সঙ্গে যেচে কেউ কোনও বলল না। আমি একটা কোনও দেওয়ালের কাছাকাছি ফাঁকা

জায়গা খুঁজতে লাগলাম, যেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো যায়। যেখান থেকে সকলকে দেখা যায়।

মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর একটা ছবির নীচে আমি দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। দু-তিনজন লোক ট্রে-তে করে পানীয় নিয়ে ঘুরছে, সুতরাং খালি গেলাস ভরে নিতে অসুবিধে নেই। নিজের হীনমন্যতা কাটাবার জন্য আমি এইসব পার্টিতে শুধু নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা নিই। অন্যরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে তাতে কিছু আসে যায় না। আমি কী দেখছি, সেটাই বড় কথা। এমনকি কেউ যদি আমায় অবজ্ঞা করে, সেটাও আমার কাছে দর্শনীয়।

বাড়িটি পুরোনো আমলের, বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, দেওয়ালে দেওয়ালে ইতালিয়ান শিল্পীদের ছবির প্রিন্ট। রোম ছাড়া ইতালির আর কোন শহরে আমার যাওয়া হয়নি। অনেককাল আগে যেবার রোমে গিয়েছিলাম, তখন পকেটে পয়সা এত কম ছিল যে, অনবরত গুনতে হত। যে-কোনও সাধারণ একটা জিনিসের দাম দশ হাজার, পনেরো হাজার লিরা শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। যদিও লিরার মূল্যমান অতি সামান্য, তবু দশ-পনেরো হাজার শোনার অভ্যেস তো আমাদের নেই। সেবার রোম শহর আর ভ্যাটিকান-সিসটিন চ্যাপেল দেখতে দেখতেই পয়সা ফুরিয়ে গেল, পালাতে হল ওদেশ ছেড়ে। ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান শহরগুলির নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়, আমার দেখা হয়নি আজও।

দ্যবাতাসের এই পার্টিতে ইতালিয়ান ও ফরাসিদের এক মিশ্র সমাবেশ, সবাই বেশ সুসজ্জিত। আমি ছাড়া কালো কিংবা খয়েরি রঙের মানুষ আর একটিও নেই। সুপ্রিয় মুখার্জির গায়ের রং বেশ ফরসা, তেমন বয়েস না হলেও তার মাথার চুলগুলো ধবধবে সাদা, অনেক বড় সাইড বার্নস্, তাও সাদা, বহুদিন এদেশে থাকার জন্য তার মুখের ভঙ্গিরও খানিকটা বদল হয়েছে, সুতরাং তাকে অনেকটা সাহেব-সাহেব দেখায়। গ্রিক কিংবা যুগোশ্লাভদের অনেকের গায়ের রং একটু চাপা, সুপ্রিয়কে গ্রিক বা যুগোশ্লাভ বলে যে কেউ ভুল করতে পারে।

একটু বাদে সুপ্রিয় এসে বলল, একটা কোণের ঘরে আলবার্তো মোরাভিয়া বসে আছেন, চলো গিয়ে কথা বলে আসবে?

আমি কাকুতি-মিনতি করে সুপ্রিয়কে নিবৃত্ত করলাম। দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট, কাছে গিয়ে মোরাভিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

একটু পরে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি সুপ্রিয়কে দেখে দূর থেকে এসে কী যেন গল্প জুড়ে দিল। ভদ্রলোক এত তাড়াতাড়ি কথা বলেন যে, আমি তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। সুপ্রিয় আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। লোকটির নাম পিয়ের, রেডিয়োতে সাহিত্য বিষয়ক একটি শাখা পরিচালনা করেন। সুপ্রিয় তাঁর কাছে আমার সম্পর্কে এমন বাড়িয়ে বাড়িয়ে, সত্য-মিথ্যা জুড়ে পরিচয় দিতে লাগল যে আমি বারবার সুপ্রিয়র কোটের পেছন টেনে তাকে থামাবার চেষ্টা করলাম।

লোকটি আমার দিকে ফিরে তাঁর মাতৃভাষায় কিছু বলতে শুরু করতেই আমি কাঁচমাচু মুখে বললাম, এক্সকুজে মোয়া, জ্য ন পার্ল পা ফ্রাঁসে।

ভদ্রলোক এবার ইংরিজি বলতে লাগলেন, বেশ থেমে-থেমে, শব্দ খুঁজে-খুঁজে। এতে আমি স্বস্তিবোধ করলাম। অন্য ভাষা খুব ভালো করে না জেনে কথা বলতে গেলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকটা কমে যায়। এখন এই লোকটার মুখখানাও কাঁচমাচু ধরনের হয়ে গেছে।

ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ভিয়েনা থেকে প্রথমবার যখন একটা সেমিনারে যোগ দিতে প্যারিসে আসেন, তখন তাঁর অনেকটা এই অবস্থা হয়েছিল। বই পড়ে ফ্রয়েড ফরাসি ভাষা শিখেছিলেন, তাঁর ধারণা তিনি ওই ভাষা ভালোই জানেন। প্যারিসে এসে বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, প্রায়ই উপযুক্ত শব্দটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁকে থেমে যেতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। ফ্রয়েডের আত্মসম্মানে দারুণ আঘাত লাগল, তিনি ভাবলেন, কী, অশিক্ষিত লোকদের মতন তাঁকে ভাঙা-ভাঙা ভাষায় কথা বলতে হবে? এঁরা তাঁকে ভুল বুঝবে? সেমিনারে

যোগ না দিয়েই ফ্রয়েড ফিরে গেলেন ভিয়েনাতে। বছর দু-এক বাদে অত্যুত্তম চোস্ত ফরাসি শিখে তিনি আবার এসেছিলেন প্যারিসে।

ফ্রয়েডের মতন জেদ আর কজন মানুষের থাকে। বেশিরভাগ মানুষ ভাঙা ভাঙা ভাষায় কাজ চালায়!

পিয়ের বলল, এসো, চট করে খাবার খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে? মিশেলের ছবি দেখবে?

কে মিশেল?

পিয়ের বলল, মিশেল এখানেই আছে। দাঁড়াও আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

পাশের ঘর থেকে সে একটি রমণীকে ডেকে নিয়ে এল। গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট পরা সেই দীর্ঘাঙ্গিনীর মাথার চুল সোনালি। চোখ দুটি কাজল-টানা, যদিও কাজল লাগায়নি। পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তাকেই বলা যায়।

রমণীটিকে দেখে আমার প্রথম অনুভূতি হল বিস্ময়কর। সে খুবই সুন্দরী তো বটেই, তা ছাড়া কিছু যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। তার দৃষ্টি, তার মুখের ত্বক, তার হেঁটে আসার ভঙ্গি সবই যেন অন্যরকম। সে যৌবনের পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গেছে, তার বয়েস পঁয়তিরিশ থেকে পাঁয়তাল্লিশের মধ্যে। এই নারীরত্নটি ছবি আঁকে? একে নিয়েই তো বহু শিল্পীর ছবি আঁকার, কবিতা লেখার কথা। এ তো মূর্তিমতী প্রেরণা হতে পারে।

আমাদের দেখে সে ছেলেমানুষের মতন বলে উঠল, একদিনে দু'জন ভারতীয়। এর আগে আমার সঙ্গে একজন ভারতীয়েরও আলাপ হয়নি। আমি ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই, একবার সেই রহস্যময় দেশে যেতে চাই।

এই সুন্দরী যে একজন মহিলা শিল্পী তা আমি এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। সুপ্রিয় ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে আমি একদৃষ্টিতে ওকে দেখেছি। রূপসি হলেও রমণীটির মধ্যে অহংকারের ভাব নেই, কথাবার্তা বেশ সরল।

খানিক বাদে মিশেল বলল, তোমরা আমার ছবি দেখতে যাবে? আমার বাড়ি কাছেই।

আমরা সবাই খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলাম বটে, কিন্তু আমি মনে-মনে ধরেই নিলাম, এবার গিয়ে বেশ কিছু বাজে ছবি দেখতে হবে। সুন্দরীর আঁকা শখের ছবি আর কী আহামরি হবে!

প্যারিস শহরের কেন্দ্রস্থলে কেউ সচরাচর গাড়ি আনতে চায় না। গাড়ি পার্ক করতেই অন্তত এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। পিয়ের কিংবা মিশেলের সঙ্গে গাড়ি নেই, আমরা বাইরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। চারজন যাত্রী থাকলে এখানকার অনেক ট্যাক্সিই থামতে চায় না। ড্রাইভারের পাশে তার পোষা কুকুর থাকে, সেইজন্য সামনে বসতে দিতে চায় না কোনও যাত্রীকে। কিন্তু মিশেলের মতন যাত্রিণী দেখেও প্রত্যাখ্যান করবে, এমন পুরুষ ট্যাক্সি ড্রাইভার পৃথিবীতে থাকা সম্ভব নয়।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর মিশেল আমাকে জিগেস করল, প্যারিস তোমার কেমন লাগছে?

আমি যে আগেও বেশ কয়েকবার এ শহরে এসেছি তা গোপন করে বললাম, যত দেখছি, ততই বিস্ময় বাড়ছে।

মিশেল বলল, আমার কিন্তু শহরগুলোর রঙের ব্যবহার খুব খারাপ লাগে। ইউরোপের বেশিরভাগ রাজধানীগুলোতেই দেখবে লাল আর সোনালি রং খুব বেশি। প্রাসাদগুলো লাল, লোহার শিক বসানো গেট সব সোনালি। লাল হচ্ছে রক্তের রং, ক্ষমতার রং। আর সোনালি রং হচ্ছে লোভের রং। ক্ষমতা আর লোভ। একবার মস্কোতে গিয়ে দেখি, কী একটা উৎসবের জন্য যেন গোটা শহরটা লাল পতাকায় মোড়া। আমার মনে হচ্ছিল, চতুর্দিকে থকথকে রক্ত। এক সঙ্গে বেশি লাল রং কি মানুষের চোখে সহ্য হয়? কোনও শিল্পী তো এত লাল রং ব্যবহার করে না!

এবার আমি আর একটু অবাক হলাম। এ মেয়েটির শুধু রূপই নেই, নানা বিষয়ে চিন্তাও

করে। রূপসি মাত্রই বোকা হবে, এ ধারণাটাও অবশ্যই ভুল।

খুব বেশি দূর যেতে হল না। ট্যাক্সি এসে থামল একটা বড় বাড়ির সামনে। মিশেল একটা ফ্ল্যাটের দরজার তালা খুলে আমাদের বলল, এসো!

রেডিও পরিচালক পিয়ের যে মিশেলের বন্ধু, তা ওদের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়। এই বন্ধুত্বও খানিকটা বিচিত্র। পিয়েরকে মোটেই সুপুরুষ বলা যায় না, মাঝারি আকারের মোটাসোটা ধরনের মানুষ। অন্যমনস্ক অধ্যাপকের মতন তার পোশাকও বেশ অগোছালো। রেডিয়োতে কাজ করে সে কতই বা মাইনে পায়? এই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী তার বান্ধবী হল কী করে?

অ্যাপার্টমেন্টটাও খুব দামি। সোফা-সেটগুলি অ্যান্টিক, কয়েকটি অপূর্ব পাথরের মূর্তি সাজানো হয়েছে, দেওয়ালে ঝুলছে দুটি আসল মাতিস ও পিকাসো।

মিশেল ভেতরে চলে যেতেই পিয়ের আমাদের অনেক কিছু খুলে বলল। এই অ্যাপার্টমেন্টটা মিশেলের দ্বিতীয় স্বামীর। তার এই দ্বিতীয় স্বামী একজন ধনী ব্যবসায়ী। তার বয়েস আটাত্তর। ব্যাবসার কাজে তাকে প্রায়ই ইংলন্ড ও আমেরিকায় থাকতে হয়। সেই বৃদ্ধ সমাজে মিশেলকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেও মিশেলকে সে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। মিশেলের ছবি আঁকার ব্যাপারে তার অঢেল প্রশ্রয় আছে এবং এই সূত্রে মিশেলকে যে অনেকের কাছে যাতায়াত করতে হয়, তাতেও তার আপত্তি নেই। পিয়েরের মতন আরও দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে মিশেলের, সেটা তার স্বামী জেনেও না জানার ভান করে।

এসব শুনে মিশেলের অনুপস্থিত স্বামীর সম্পর্কে আমার বেশ শ্রদ্ধাই হল। লোকটি মোটেই সাধারণ ধনীদের মতন নয়। সে এই সুন্দরীকে কুক্ষিগত করে রাখেনি!

প্রায় গোটা দশেক ক্যানভাস ও চোদ্দ-পনেরোখানা ছবি ভেতর থেকে নিয়ে এল মিশেল। তারপর একেবারে উদীয়মান শিল্পীদের মতন লাজুকভাবে হেসে বলল, আমি মাত্র দু'বছর ধরে ছবি আঁকছি। এখনও কিছুই শিখিনি বলতে গেলে। তোমাদের কেমন লাগবে জানি না।

সুপ্রিয় জিগ্যেস করল, মাত্র দু'বছর? আগে তুমি কী করতে?

মিশেল বলল, আগে আমি সিনেমায় অভিনয় করতাম, জানো না? তুমি আমার কোনও ছবি দেখনি?

এবার আমার কাছে একটা রহস্য উন্মোচিত হল। এই জন্যই প্রথম থেকেই মিশেলকে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। শুটিং-এর সময় বহুক্ষণ কড়া আলো পড়ে অভিনেত্রীদের মুখের চামড়া একটু অন্যরকম হয়ে যায়। তাদের তাকানো, তাদের দাঁড়ানোও অন্যরকম। কথা বলার মধ্যে ঠিক ঠিক পজ এবং প্রো থাকে। এগুলিকে আমি ঠিক কৃত্রিম বলে খাটো করতে চাই না, সব শিল্পীই তো কৃত্রিম, কবিতা-ছবি-গান সবই তো অতিরঞ্জনের সুষমা।

মিশেল বহু নামকরা পরিচালক, যেমন ত্রুফো, গদার, রেনে'র ছবিতেও অভিনয় করেছে। নায়িকা নয়, পার্শ্বচরিত্র।

মিশেল নিজেই হাসতে-হাসতে বলল, আমার নিশ্চয়ই অভিনয় প্রতিভা নেই। তাই পরিচালকরা আমার শরীরটাকে বেশি করে দেখাতে চাইত। বৃষ্টিভেজা, জলে সাঁতার কাটা, চলন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া, এইসব দৃশ্য যে আমি কতবার করেছি। আর কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক, বিচ্ছিরি, কিন্তু আপত্তি জানাবার উপায় নেই! তারপর একদিন দূর ছাই বলে ছেড়ে দিলাম! আরও কেন ছাড়তে ইচ্ছে হল জানো, অন্তত পাঁচখানা ছবিতে আমাকে মৃত্যুদৃশ্যে অভিনয় করতে হয়েছে। বন্দুকের গুলি খেয়ে, ছুরি খেয়ে, এগারোতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে আমি খালি মরছি। তা একদিন ঠিক করলাম, আমি আর মরতে চাই না। আমি অন্যরকমভাবে বাঁচব। ছেলেবেলা থেকেই ছবি ভালো লাগে, শিল্পীদের ভালো লাগে, তাই ভাবলাম, আমি এদের সঙ্গে মিশব।

পিয়ের বলল, সিনেমা ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম মিশেল অনেক শিল্পীর মডেল হয়েছে। অনেকেই

মিশেলের ছবি এঁকেছে, তার মধ্যে দুটি ছবি বেশ বিখ্যাত হয়েছে। আমিই প্রথম মিশেল-এর নিজের আঁকা ছবি দেখে বলেছিলাম, তুমি নিজেই তো বেশ আঁকতে পারো, তা হলে তুমি শুধু শুধু মডেল হয়ে সময় নষ্ট করছ কেন?

মিশেল বলল, আমি নিজে যখন ছবি আঁকা শুরু করলাম, তখন কিন্তু অনেক শিল্পীই তা পছন্দ করেনি। অনেকেই আমার ছবি দেখে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

আমি বললাম, বার্থ মরিসো।

মিশেল বলল, ও লালা! তুমি বার্থ মরিসোর নাম জানো? একজাক্টমঁ!

সুপ্রিয় বলল, বার্থ মরিসো মিশেলের মতনই সুন্দরী ছিল। এদুয়ার মানে তাকে মডেল করে বেশ কয়েকখানা ছবি এঁকেছেন। তারপর বার্থ মরিসো নিজেই যখন ছবি আঁকতে শুরু করল, মানে তখন তা ঠিক মেনে নিতে পারেননি। মরিসো'র ছবির প্রদর্শনী সময় মানে আপত্তি জানিয়েছিলেন। একবার মানে মরিসোর একটা ছবিকে ভালো করে দেওয়ার জন্য তার ওপর তুলি চাপিয়ে সেটাকে কদাকার করে দিয়েছিলেন।

পিয়ের বলল, বার্থ মরিসো কিন্তু বরাবর মানে-কেই ভালোবাসত। শ্রদ্ধা ও প্রেম দুটো মিশিয়ে অর্ঘ্য দিত সেই শিল্পীকে। মানে বিবাহিত বলে বার্থ মরিসো বিয়ে করেছিল মানে'র ছোট ভাইকে, যদিও আরও অনেকেই বার্থ মরিসোকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

আমি বললাম, শেষ পর্যন্ত বার্থ মরিসো নামকরা শিল্পী হয়েছিলেন। ইমপ্রেশনিস্টদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান আছে।

মিশেল বলল, তখন যেমন, এখনও তেমনি এরা মহিলা শিল্পীদের দাঁড়াতে দেয় না। অবজ্ঞা করে। মেয়েরা যেন শুধু মডেলই হতে পারে, শিল্পী হতে পারে না। আমি লড়াই করে যাব! আমার প্রতিভা আছে কি না জানি না, কিন্তু সাধনার ত্রুটি রাখব না, দেখব শেষ পর্যন্ত।

এবার তবে ছবিগুলো দেখা যাক।

ছবিগুলো দেখে অবশ্য আমার বিস্ময় জাগল না। আগে যা ভেবেছিলাম, তাই। আমি ছবি তেমন বুঝি না, কিন্তু কোনও কোনও ছবি দেখলে মনে একটা আবেগের ঝাপটা লাগে। অনেক ছবি নিখুঁত কিন্তু মনে দাগ কাটে না। আবার কোনও ছবির সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, সত্যিকারের নতুন কিছু দেখছি রং, রেখা ও আয়তন নিয়ে খেলা করেছে কোনও মহৎ আঙুল।

মিশেলের ছবিগুলো ছেলেমানুষের আঁকা নয়। ফিগার ড্রয়িং সে জানে। মানুষ ও গাছপালা সে ঠিকঠাক আঁকে। রঙের ব্যবহার চোখকে পীড়া দেয় না। আপাতদৃষ্টিতে তার ছবিগুলিকে মনে হয় সুন্দর। শুধুই সুন্দর। তার বেশি কিছু না।

আমরা এক একটা ছবি দেখছি আর বলছি, বাঃ, চমৎকার! অপূর্ব! দারুণ! এই ছবিখানা এক্সেলেন্ট!

এরকমই বলতে হয়। একজন শিল্পী, তার ওপর রূপবতী নারী, সামনে বসে নিজের ছবি দেখাচ্ছে, তখন কি অন্য কথা বলা যায়?

সব শেষ হওয়ার পর মিশেল জিগ্যেস করল, এবার সত্যি করে বলো তো, কেমন লেগেছে। আমাকে খুশি করার জন্য প্রশংসা করার দরকার নেই। আমি প্রশংসা এ জীবনে অনেক শুনেছি।

আমি কথা ফেরাবার জন্য বললাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি? তোমার এত ছবির মধ্যে মাত্র তিন-চারখান ল্যান্ডস্কেপ। আর সব কটাই কোনও মেয়ের ছবি। ন্যুড স্টাডি। তুমি নিজে একজন মহিলা শিল্পী হয়ে শুধু মেয়েদের নগ্ন মূর্তি এঁকেছ কেন?

মিশেল আমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না, সম্ভবত আমার ভাষার দোষেই। সে ভুরু তুলে বলল, কেন? আমি অন্য মেয়েকে মডেল করে ন্যুড এঁকেছি। আঁকা ঠিক হয়নি?

আমি বললাম, তুমি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাও। শিল্পজগতে নিজের স্থান করে

নিতে চাও। তবু তুমি নগ্ন নারী আঁকবে কেন?

মিশেল বলল, নগ্ন নারী আঁকব না? কেন বলো তো?

আমি বললাম, এটা কি পুরুষদের অনুকরণ নয়? সব পুরুষরাই নগ্ন নারী আঁকে! তাদের মতে রমণী শরীরই সৌন্দর্যের আধার। একজন রমণীর নিশ্চয়ই সেরকম মনে হবে না। মেয়েরা নিশ্চয়ই পুরুষদের শরীরের গড়নে সেইরকম সৌন্দর্য খোঁজে।

মিশেল হো হো করে হেসে উঠে বলল, ও বুঝেছি! তুমি বলতে চাও, মেয়েদের বদলে আমার নগ্ন পুরুষদের আঁকা উচিত? যাঃ, তা আবার হয় নাকি।

আমি বললাম, কেন হয় না? তুমি নারীদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ। এই পুরুষশাসিত সমাজে সমস্ত পণ্যের বিজ্ঞাপনে, ফিল্মের পোস্টারে, এমনকি শিল্প-সাহিত্যেও নারীকে শরীরসর্বস্ব করে দেখানো হয়। তুমি মেয়ে হয়েও তা করবে কেন? আমার তো মনে হয়, কোনও মহিলা শিল্পীর পক্ষে পুরুষদের শরীর আঁকাই স্বাভাবিক।

সুপ্রিয় আর পিয়ের দুজনেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাদের বাধা দিয়ে বললাম, আমি মিশেলের বক্তব্যটাই জানতে চাই।

মিশেল বলল, এই যে নারীমূর্তিগুলি এঁকেছি তা আসলে নারী হিসেবে আঁকিনি, গাছ পাহাড়-নদীর মতনই একটা শিল্পের বিষয়বস্তু। বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমের শিল্পীরা নগ্ন নারীমূর্তি এঁকেছে, ন্যুড স্টাডি এখন শিল্পের ট্র্যাডিশানের অঙ্গ। যে কোনও শিল্পীকেই বারবার এই স্টাডি করতে হয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাবরণ নারী যে আঁকতে পারে না, সে যেন শিল্পীই নয়। তার শিল্পজগতে প্রবেশের যোগ্যতা নেই। পুরুষমূর্তি নিয়ে এরকম আঁকার যে ট্র্যাডিশন নেই।

আমি মিশেলের কথা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। পুরুষের হাতে বহু নারী-সৌন্দর্য অমর হয়েছে। কোনও মেয়ের তুলিতে পুরুষ-সৌন্দর্য মর্যাদা পাবে না কেন? একটি মেয়ে যদি পুরুষ মডেল নিয়ে নানারকম স্টাডি করে, তবে সেটাই তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করা উচিত।

মিশেল আবার আপন মনে বলল, শুধু ছবি আঁকলে তো হয় না, তার মধ্যে একটা জীবন-দর্শনের প্রতিফলন চাই। শুধু ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করাই যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে মেশাতে হয় নিজের আত্মা। আমি আমার জীবনদর্শনটাই খুঁজে পাচ্ছি না। ভারতীয় দর্শনের কথা আমি একটু একটু শুনেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিনি। আরও ভালো করে জানতে হবে। আচ্ছা, ভারতীয় দর্শন যাকে বলে, আধুনিক ভারত কি সেই অনুযায়ী চলে?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, না।

মিশেল বলল, ভারতেও মারামারি, কাটাকাটি, স্বার্থের লড়াই, এই সবই আছে?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। রেডিয়োর লোক হিসেবে পিয়ের ঘোষণার সুরে বলল, ভারত দু'দুটো যুদ্ধ করেছে, সীমান্তে প্রচুর সৈন্য রাখে। বুদ্ধ কিংবা গান্ধির অহিংসার বাণী এখন শুধু বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ।

মিশেল আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কলকাতা থেকে এসেছ। কলকাতায় অনেক মানুষ, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, প্রচুর মানুষ, সব সময় পথে পথে মানুষ গিসগিস করছে, প্রতিদিন শিয়ালদা স্টেশনে যত লোক নামে, নরওয়ে-ডেনমার্কের মতন দেশগুলোতে জনসংখ্যাই তার চেয়ে কম।

মিশেল কলকাতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নয়। বলল, আমি জানি, তোমাদের দেশবিভাগ হয়েছে, তারপরেই কলকাতার জনসংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ রেফিউজি এসেছে। রেফিউজিদের কী কষ্ট তা আমি জানি। আমি নিজে এক সময় রেফিউজি ছিলাম।

পিয়ের পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠল। এ খবর তারও অজানা। সে জিগ্যেস করল, তুমি আবার কবে রেফিউজি ছিল, মিশেল?

মিশেল বলল, আমার বাবা ফ্রেঞ্চ, মা ছিলেন ইতালিয়ান। আমরা ইতালিতেই থাকতাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ইতালি ছেড়ে পালাতে হয়। চতুর্দিকে বোমা পড়ছে, তার মধ্যে আমরা ট্রেনে চেপে পালাচ্ছিলাম স্পেনের দিকে। মাঝপথে ট্রেন থেমে গেল, তখন আমরা পায়ে হেঁটেছিলাম অনেকটা, আমার তখন চার-পাঁচ বছর বয়েস, তবু স্পষ্ট মনে আছে। বাবা মারা গেল পথেই, তিনটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মা আশ্রয় নিল একটা ফাঁকা রেলওয়ে প্লাটফর্মে। তিন চারদিন আমরা প্রায় কিছুই খেতে পাইনি। তখন ওই বয়েসেই বুঝেছিলাম, মানুষের ব্যবহার কত হিংস্র হতে পারে। তারপর লিবারেশানের সময় আমরা কী সাংঘাতিক কষ্ট করে যে ফ্রান্সে পৌঁছেছিলাম, তা তোমরা শুনলেও বিশ্বাস করতে পারবে না। পরবর্তী কালে মা যতবার সেই ঘটনা বলতে গেছে, অমনি ঝরঝর করে তার চোখ দিয়ে জল ঝরেছে।

কথা বলতে-বলতে মিশেলের স্বর গাঢ় হয়ে এল, চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল অশ্রুবিন্দু। সিনেমার অভিনেত্রী কিংবা জাঁহাবাজ সুন্দরী নয়। মিশেলকে এখন মনে হল খুব চেনা একজন মানুষ।

॥ ২৬ ॥

"সুন্দর দিনগুলি, সময়ের ইঁদুরেরা চিবিয়ে খাচ্ছে
একটু একটু করে আমার জীবন
হা ভগবান! এই বসন্তে প্রায় আঠাশ বছরে পৌঁছব
এর মধ্যেও অনেকটাই বাজে খরচ হয়ে গেছে, ইস্।
—গিয়ম আপোলিনেয়ার

এবার ফরাসি দেশের অন্য একটি দিকে অভিযান। কয়েকটি চরিত্রও নতুন। এর আগে আমি পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে আমন্ত্রণ পেয়ে ঘোরাঘুরি করেছি বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত জার্মানির কোনও অংশেই পা ছোঁয়াবার সুযোগ ঘটেনি। সেই সুযোগ পাওয়া গেল, ফ্রাংকফুর্টের বিশ্ব বইমেলার সৌজন্যে। সেবারে, ১৯৮৬ সালে, বিশ্ব বইমেলায় ভারত ছিল বিশেষ আকর্ষণ, সেই সূত্রে চোদ্দো-পনেরো জন ভারতীয় লেখক-লেখিকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেই তালিকায় কী করে যেন এই অধমেরও একটা স্থান জুটে গেল। এমন সুযোগ পাওয়া খুব আনন্দের তো বটেই, তার সঙ্গে খানিকটা আশঙ্কাও মিশে থাকে। এমনি এমনি তো নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে না, সেমিনারে একখানা বক্তৃতাও দিতে হবে। বক্তৃতার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার হৃৎকম্প হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্ক টোয়েনের একটা চমৎকার গল্প বলা যেতে পারে।

পশ্চিম দেশগুলিতে এক ধরনের আনুষ্ঠানিক ভোজের প্রচলন আছে। কোনও উপলক্ষে চাঁদা তোলার জন্য কিংবা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ভালো কোনও হোটেলে ফর্মাল ডিনার হয়, লোকেরা অনেক টাকা দামের টিকিট কেটে সেই ডিনার খেতে আসে। খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি একটি বক্তৃতা দেন। সুখাদ্যের সঙ্গে সেই বক্তৃতাটি উপরি পাওনা।

সে-রকম একটি ভোজসভায় মার্ক টোয়েন একবার প্রধান অতিথি হয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়া চুকে যাওয়ার পর মার্ক টোয়েনকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল। মার্ক টোয়েন প্রথম উঠতেই চাইলেন না, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, অন্যদের পেড়াপেড়িতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বেজার মুখে দাঁড়াতেই হল। কিন্তু বক্তৃতার বদলে তিনি একটা গল্প শোনালেন।

মার্ক টোয়েন বললেন, রোমান সম্রাটদের আমলে একবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সবাই জানেন নিশ্চয়ই, রোমান সম্রাটদের কিছু কিছু নিষ্ঠুর বিলাসিতা ছিল। গ্ল্যাডিয়েটররা লড়াই করতে-করতে একজন আর একজনকে খুন করছে, সেই দৃশ্য সম্রাট-সম্রাজ্ঞী উপভোগ করতেন। কিংবা স্টেডিয়ামের মাঝখানে বেঁধে রাখা হত কোনও ক্রীতদাস কিংবা ভিনদেশি বন্দিকে, তারপর একটি ক্ষুধার্ত সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হত সেখানে। সিংহটা সেই জ্যান্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, তাই দেখে উল্লাসে হাততালি দেবেন সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ও পারিষদরা।

সেই রকমই একবার এক বিদেশি কবিকে ধরে এনে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিন চার দিন ধরে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, এমন সময় একটা সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হল খাঁচা থেকে। সিংহটা বুক কাঁপানো গর্জন করে ছুটে গিয়ে সেই বন্দিকে প্রথম কামড়টা দিতে যাবে, এমন সময় বন্দিটি কী যেন বলে উঠল। সেই কথাটা শুনেই সিংহটা থেমে গেল, বুজে গেল তার হাঁ করা মুখ, ল্যাজ ঝুলে পড়ল। লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সিংহটা বিমর্ষভাবে ফিরে গেল খাঁচার মধ্যে।

সবাই হতবাক। এমন কাণ্ড কখনও ঘটেনি। সম্রাটের আদেশে তক্ষুনি বন্দি সেই কবিকে নিয়ে আসা হল তাঁর সামনে। সম্রাট বললেন, তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেব। তার আগে সত্যি করে বলো তো, তুমি সিংহটাকে কী বলে ফেরালে?

কবিটি বলল, হে সম্রাট, আমি সিংহটাকে শুধু মনে করিয়ে দিলাম, খাচ্ছ খাও! কিন্তু মনে রেখো, এরপর তোমাকে একটা আফটার ডিনার স্পিচ দিতে হবে!

যাই হোক, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলা দেখার সুযোগ, জার্মানির অন্যত্র ঘোরাঘুরি, ঐতিহাসিক বার্লিনের প্রাচীর সন্দর্শন এই সব ভালো ভালো সম্ভাবনার বিনিময়ে সেমিনারে একটা অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে আমি মনকে রাজি করিয়ে ফেললাম। তা ছাড়া জার্মানি গেলে আর একবার ফ্রান্সও ছুঁয়ে আসা যাবে। ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফ্রান্সের দূরত্ব মাত্র এক ঘণ্টা।

অসীমকে চিঠি লিখতেই সে জানাল, তুমি ফ্রাংকফুর্টে যাওয়ার দিন সাতেক আগেই প্যারিস চলে এসো। আমি অফিস থেকে ছুটি নিচ্ছি। একটা নতুন দিকে বেড়াবার পরিকল্পনা করে রেখেছি, চলো, আগে সেই দিকটা দেখে আসব। তারপর বইমেলাতে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ব বইমেলায় প্রতি বছর কলকাতা থেকে যোগ দিতে যান বাদল বসু। ইনি আনন্দ পাবলিশার্স-এর কর্ণধার। সেখানে বাংলা বইয়ের স্টল সাজিয়ে একলা বসে থাকেন। সে বছর কলকাতা থেকে অনেক প্রকাশক গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য কোনও কোনও বছরে বিশ্ব বইমেলায় বাংলা বই দেখা যায় একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্সের স্টলে।

বাদল বসু আমাকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কি স্বাতীকে নিয়ে যাচ্ছেন? তা হলে আমার স্ত্রীকেও এবার সঙ্গে নিতে পারি।

স্বাতী কোনওক্রমে কথাটা শোনামাত্র আর দ্বিরুক্তির অবকাশ পাওয়া গেল না। এ কালের স্ত্রীরা 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'তে বিশ্বাসী নয়। চরম শরীর খারাপ থাকলেও কোথাও বেড়াতে যাওয়ার নাম শুনলেই স্বাতী চাঙ্গা হয়ে ওঠে, এমনই ওর ভ্রমণের নেশা। তা ছাড়, জার্মানি থেকে অলোককরঞ্জন দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী ট্রুবার্টা আলাদাভাবে স্বাতীকে নেমন্তন্ন করেছেন, বইমেলা কর্তৃপক্ষও আমন্ত্রিত লেখকদের স্ত্রীদের আতিথ্য দিতে রাজি। সুতরাং বিশেষ অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার নেই।

বাদল বসুর স্ত্রীর নাম কুমকুম। এটা তার ডাক নাম, অন্য একটা কী যেন ভালো নাম আছে, সেটা মনেই থাকে না। কুমকুমই তো ভালো নাম। যেমন বাদলের পোশাকি নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ, কিন্তু বাদল নামটিতেই তাকে ঠিক ঠিক মানায়।

শরৎকালের এক সকালে আবার আমরা পৌঁছলাম ফ্রান্সে। বাদল সস্ত্রীক উঠল তার বাল্যবন্ধু শুভেন্দু চৌধুরীর অ্যাপার্টমেন্টে, আমি আর স্বাতী অসীম রায়ের আবাসে। গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই আমার মনে হল, অসীমের টিভি সেটটার অবস্থাটা আগে দেখতে হবে। বসবার ঘরে এসে আমি

প্রথমেই টিভির পাশে চলে গেলাম। চার-পাঁচ বছর ধরে যেমন দেখছি, সেই রকমই পেছনের ডালাটা সম্পূর্ণ খোলা, সমস্ত তার-ফার, যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আছে। বছরের পর বছর ধরেই অসীম ওটা সারাবার কথা ভেবে যাচ্ছে। ডালাটা ধরে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলেই অবশ্য ছবি ফোটে, কাজ চলে যায়।

সারা বাড়ির আর কোনও পরিবর্তন হয়নি, এমনকি আমি একবার যে কম্বল ও তোশক পুড়িয়ে ফুটো করে দিয়েছিলাম, সে সবও অবিকল এক জায়গায় রয়েছে। কিন্তু অসীমের রান্নাঘরটা দেখে আমরা চমৎকৃত। এ যে একেবারে নতুন রান্নাঘর। আগে ছিল মলিন ওয়ালপেপার, এখন ঝকঝকে নতুন, পাখি আঁকা সুদৃশ্য টালি সারা দেওয়ালে। নানারকম কাঠের খোপ, অনেক বাহারি ব্যবস্থা। এই সব কাজই অসীম নিজের হাতে করেছে। দেওয়ালে টালি বসানো, কাঠ কাটা, পেরেক, ইস্কুরুপ মারা, ঘষাঘষি, রং করা সব কিছু। এসব দেশে মিস্তিরি ডাকতে গেলে প্রচুর খরচ, তাই অনেককেই ছাদ সারাই থেকে জলের কল বদলানো পর্যন্ত সব কাজ শিখে নিতে হয়, নানারকম বই আছে এ সব বিষয়ে, সুবিধেজনক যন্ত্রপাতিও পাওয়া যায়। আমাদের দেশ থেকে যেসব ভালো ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকরা ও সব দেশে বসতি নেয়, তারা কিছু দিনের মধ্যেই খুব ভালো রাঁধুনি, ছুতোর ও কলের মিস্তিরি, ঘরামি ও মালি হয়ে যায়।

অবশ্য অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতন যদি কারুর ভাগ্যে অতিশয় পতিব্রতা ও দশভুজা স্ত্রী থাকে, তার কথা আলাদা। শুনেছি কবি অলোকরঞ্জন এখনও চা বানাতে জানেন না। এক দিন ফাঁকা বাড়িতে তিনি একটা ডিম সেদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, সসপ্যানের মধ্যে একটা ডিম রেখে সেটা চাপিয়েছিলেন উনুনে, কিন্তু সসপ্যানের মধ্যে যে খানিকটা জলও দিতে হয়, সেটা তাঁর জানা ছিল না। তার ফলে ডিমটার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল কে জানে!

অসীমের রান্নাঘরটা একেবারে চকচকে নতুন হয়ে গেলেও অনেক দিনের একটা তোবড়ানো কেতলি, যেটার তলাটা একেবারে ঝিরকুট কালো হয়ে গেছে, সেটা সে ফেলেনি। একটা হাতল ভাঙা ডেকচি, কয়েকটা চলটা ওঠা কাপও যথাস্থানে রয়েছে। অসীম বোধহয় এ-সবগুলোকে অ্যান্টিক বানাতে চায়।

পুরো একটা রান্নাঘর বানিয়ে ফেলেছে, অসীমের হাতের কাজ ভালোই। যদিও দু-একটা টালি ঈষৎ বাঁকা হয়েছে, তাতে কিছু আসে যায় না। অসীমের স্বভাবের অদ্ভুত দিক হচ্ছে এই যে, সে আশা করে, নতুন কেউ এলে তার রান্নাঘরটার প্রশংসা করবে। কিন্তু তারা যদি দু-একটা টালির বক্রতা সম্পর্কে উল্লেখ না করে, তা হলে অসীম বলবে, সেই লোকগুলোর পর্যবেক্ষণ শক্তি নেই!

অসীম টেলিফোন কোম্পানিতে বড় চাকরি করে তো বটেই, তা ছাড়া প্যারিস শহরে সে একটা রেস্তোরাঁর মালিক হয়েছে। সারাদিন অফিস করার পর প্রায় সন্ধেবেলাতেই সে তার রেস্তোরাঁ দেখতে যায়। প্রথমে সে তার এক সিলোনিজ বন্ধুর সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে রেস্তোরাঁর ব্যাবসা শুরু করেছিল, এখন জড়িয়ে পড়েছে পুরোদস্তুর। এ ছাড়া তার ছবি তোলার শখ, প্রাইজ পাওয়ার মতন ছবি তোলে, বই পড়ে, রবিবার সকালে বাগানের পরিচর্যা করে ও ঘাস ছাঁটে। ব্যাচেলর মানুষ, নিজস্ব একটা বাড়ি, অর্থ চিন্তা নেই, যখন যা খুশি করতে পারে। অসীমের এই একলা স্বাধীন জীবন ঠিক ঈর্ষাযোগ্য কি না আমি বুঝতে পারি না। আমাদের সকলেরই একাকিত্ব সম্পর্কে মোহ আছে। শহরে জীবনের হুড়োহুড়ি থেকে কিছুদিন বাইরে গিয়ে কিছু দিনের নির্জন বাস আমিও বেশ উপভোগ করি, কিন্তু কয়েক দিন পরেই তো মন আকুলি-বিকুলি করে। মানুষ বন্ধু-বান্ধবদের সংসর্গ পাওয়ার জন্য ছুটে যায়। আবার জীবনের একটা পর্বে বন্ধুর সংখ্যা কমতে থাকে হু হু করে, সেই উপলব্ধির নির্মমতাও বড় সত্য। অসীমের অবশ্য বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু-বান্ধবী আছে, সে একটা ফাঁকা বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু তাকে ঘিরে একটা বৃত্তও আছে। এ এক অন্যরকম জীবন, ঠিক ঘরোয়া

বাঙালিপনাও নেই, আবার পুরোপুরি পশ্চিমিও নয়।

দুপুরবেলা বসা হল ম্যাপ ও বইপত্র নিয়ে। এবার যাওয়া হবে কোন দিকে? অসীম আগে থেকেই খানিকটা এঁকে রেখেছে, আমায় বলল, নর্মান্ডির দিকে গেলে কেমন হয়? একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত চলে গিয়ে ধার দিয়ে দিয়ে এগোব। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখনও আছে। তারপর একেবারে মঁ-সাঁ-মিশেল দেখে আসব। সেটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলতে পারো।

আমি মঁ-সাঁ-মিশেল নামটা আগে শুনিনি। জিগ্যেস করলাম, সেখানে কী আছে?

আগে থেকে এই জায়গাটার নাম না জানা আমার অপরাধ, সেই জন্যই অসীম আমাকে ধমক দিয়ে বলল, গেলেই দেখতে পাবে।

এবারে প্রশ্ন উঠল, ভাস্করকে নেওয়া হবে কি-না। ভাস্কর প্রত্যেকবার আমাদের সঙ্গে যায়। ভাস্কর না থাকলে জমে না। কিন্তু ভাস্করের সেই হেঁচকির অসুখ আজও সারেনি, বরং বেড়েছে, ইংল্যান্ডে ওদের ব্যাবসার ব্যাপার নিয়ে কিছু গণ্ডগোল চলছে। সে জন্য এ সময় ভাস্করকে টেনে আনা ঠিক হবে না। তা ছাড়া এক গাড়িতে পাঁচ জনের বেশি যাওয়া অসুবিধেজনক; অসীমের গাড়িটা হচ্ছে পেজো, তাতে পাঁচজনেই বেশ আঁটাআঁটি হয়। ভাস্কর থাকবে না বলে আমার মনটা খচখচ করলেও মেনে নিতেও হল। অবশ্য ইংল্যান্ডে ভাস্করের বাড়িতে একবার যেতে হবেই।

দু-একদিন প্যারিসে থেকে আবহাওয়া গায়ে সইয়ে নিতে হয়। প্যারিসের বাতাস অতি হালকা। আজকাল ইউরোপে পরিবেশ ও বাতাস দূষণের প্রশ্ন উঠেছে খুবই, কিন্তু আমরা কলকাতা থেকে গিয়ে তার কিছু টেরই পাই না। এই সব জায়গায় এলে টের পাওয়া যায়, কলকাতার হাওয়া ধোঁয়া ও ধুলোয় কতটা ভারী।

স্বাতী এর আগে একবার ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডা ঘুরে গেলেও কুমকুম দেশের বাইরে আগে কখনও আসেনি। বাংলার বাইরেও খুব বেশি ঘোরাঘুরি করেনি। প্রথম বিদেশ বলতেই একেবারে প্যারিস। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা নেই, কোনও কিছুতেই সে ঘাবড়ায় না। স্বাতীর থেকে সে অনেক বেশি স্মার্ট। স্বাতী পাক্কা তিন বছর ফরাসি শিখেছে, কিন্তু প্যারিসে এসে সে একটাও কথা বলতে পারে না, লজ্জায় তার মুখ ফোটে না, যদিও আমি অন্য লোকের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে গেলে স্বাতী আমার ব্যাকরণের ভুল ধরে। এদিকে কুমকুমের কোনও অসুবিধে নেই, সে ইংরিজি-বাংলা মিলিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে দেয়। দোকান থেকে একা একা গিয়ে জিনিস কিনে আনে। কুমকুমের ভাবখানা এই, ফরাসি সাহেবরা ফ্রেঞ্চ বলে তাতে কী হয়েছে, তা বলে কি আমাকেও ওদের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বলতে হবে? কেন, ওরা কী আমাদের দেশে গিয়ে বাংলা বলে? কিংবা, সাহেবদের দেশে পার্কগুলো খুব সুন্দর হবে, দোকানপাট খুব সাজানো-গোছানো হবে, এতেই বা অবাক হওয়ার কী আছে? এ-রকমই যে হওয়ার কথা, তা তো সবাই জানে। এর উলটো কিছু হলেই বরং অবাক হওয়ার ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, যদি দেখতাম, এখানকার রাস্তাও কলকাতার মতন ভাঙাচোরা আর নোংরা, তা হলে বলতাম, ম্যাগোঃ, এই নাকি তোমাদের প্যারিস।

কুমকুমের ব্যবহার দেখে আমার সুকুমার রায়ের কিছু কিছু চিঠির কথা মনে পড়ে। প্রথম বিলেতে গিয়ে সুকুমার রায় তাঁর বাবাকে ও মাকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন, যা অনেক কাল পরে ছাপা হয়েছে। সেকালে ইংল্যান্ড ছিল অনেক দূরের দেশ। জাহাজে তিন সপ্তাহের ধাক্কা। অথচ লন্ডন শহর সম্পর্কেও সুকুমার রায়ের কোনও বিস্ময়বোধ নেই, সবই যেন তাঁর জানা। বরং কোনও একটা দোকানে গিয়ে বিশেষ কিছু ব্লক বা ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম খোঁজ করেও পাওয়া যাচ্ছে না, বলে তিনি বেশ বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ তাঁর পরেও কত বঙ্গসন্তান লন্ডনে গিয়েই একেবারে গদোগদো হয়ে গেছে।

বাদল বসুকে যারা কলকাতায় দেখেছে, তারা বিদেশে দেখলে চট করে চিনতেই পারবে

না। কলকাতায় বাদলের প্রতিদিনের পোশাক ধুতির ওপর সাদা শার্ট। ক্যালকাটা ক্লাব কিংবা রাজভবনে নেমন্তন্ন থাকলেও বাদল বসু ধুতি-শার্ট আর চটি বদলাবে না। কিন্তু শীতের দেশে গিয়ে কোট-প্যান্ট পরতেই হয়। সাহেবি পোশাক পরলে অনেকের মেজাজটাও সাহেবি হয়ে যায়, বাদলের ক্ষেত্রে হয়ে যায় ঠিক তার উলটো। কলকাতায় ধুতি-শার্ট পরা যে বাদল বসুর এত হাঁকডাক ও ব্যক্তিত্বের দাপট, তারই গলার স্বরটা কেমন যেন চুপসে যায় কোট-প্যান্ট আর জুতো মোজা পরার পর। অবশ্য বিদেশেও বাড়ির মধ্যে ওইসব ধড়াচুড়ো ছেড়ে লুঙ্গিটা পরে কোমরে গিঁট দিতে না দিতেই আবার কণ্ঠস্বরের তেজ ফিরে আসে। মেদিনীপুরের ছেলে বাদল, প্যারিস হোক বা লন্ডনই হোক, লুঙ্গিটা না পরলে তার ঠিক জুত হয় না।

দু-একদিন প্যারিসের রাস্তায় সবাই মিলে বেড়াতে-বেড়াতে আমি লক্ষ করলাম, বাদলের বন্ধু শুভেন্দুদাকে সবাই যেন একটু একটু ভয় পায়। এমনকি অসীম পর্যন্ত। মাঝে মাঝে সকলের ওপরই দাদাগিরি করার স্বভাব অসীমের, সেও শুভেন্দুকে ধমকে কথা বলার সাহস পায় না। যদিও শুভেন্দু চৌধুরী খুবই সুদর্শন ও শান্ত ধরনের মানুষ। কখনও গলার আওয়াজ উঁচুতে ওঠে না, তবু তাকে সবাই এমন সমঝে চলার কারণ তার মুড। কখন কীসে তার মুড নষ্ট হয়ে যাবে তার কোনও ঠিক নেই, সেই জন্য সবাই সব সময় সতর্ক থাকে। মুড নষ্ট হয়ে গেলেই শুভেন্দু একেবারে গম্ভীর হয়ে যাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটাও কথা বলবে না। শুভেন্দু নিজে কখনও কারুকে সামান্য আঘাত দেয় না, কোনও আড্ডার পরিবেশ তার পছন্দ না হলে সেখান থেকে সে নিঃশব্দে সরে পড়ে। কখনও কোনও জায়গায় একসঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব হলে শুভেন্দু একবার যদি বলে সেখানে সে যাবে না, তা হলে কিছুতেই আর তাকে রাজি করানো যাবে না। কেন সে যাবে না, সে কারণও সে জানাবে না।

অসীম একলা বাড়িতে থাকলেও অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে, নিয়মিত অন্যদের খবরাখবর নেয়। সত্যিকারের একাকিত্ব ভোগ করে শুভেন্দু, স্বেচ্ছায়। আমার চেনাশুনো সমস্ত বাঙালিদের মধ্যে শুভেন্দুর মতন এমন নীরবতা উপভোগ করতে বা পালন করতে আর কারুকে দেখিনি। একেবারে অন্যরকম চরিত্রের মানুষ বলেই তাকে আমার বেশ পছন্দ হয়।

শুভেন্দু সিগারেট খায় খুব কম। কিন্তু কোনও সময়ে যদি চেনা কারুর কাছ থেকে সে একটা সিগারেট চায়, তা হলে বুঝতে হবে তার মেজাজ তখন ভালো আছে। সে হাসবে, কথা বলবে। কিছুক্ষণের জন্য যেন সে বাস্তব জগতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় তখন।

আমাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য শুভেন্দুকে কোনও প্রস্তাবই দেওয়া হল না। দিলেই হয়তো সে প্রত্যাখ্যান করবে, এই ভয়ে।

এক সন্ধেবেলা আমি হাঁটতে-হাঁটতে আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়েছি, স্বাতী আমার কাছে এসে বলল, এই, তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন? মার্গারিটের কথা মনে পড়ছে বুঝি?

আমি বললাম, তা তো মনে পড়বেই! পড়বে না?

স্বাতী বলল, এখন যদি হঠাৎ রাস্তায় মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে কেমন হয়?

আমি বললাম, তা হলে...তা হলে সবাই মিলে একসঙ্গে হইহই করা হত। মার্গারিট তোমাকে এমন সব ছোট ছোট ছবির গ্যালিরিতে নিয়ে যেত, যার সন্ধান অনেকেই জানে না।

স্বাতী বলল, মার্গারিটকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, এই যে রাস্তা দিয়ে অনেক মেয়ে যাচ্ছে, অনেকেই খুব সুন্দর, এদের মধ্যে মার্গারিটকে ঠিক কার মতন দেখতে ছিল বলো তো?

আমি বললাম, কারুর মতনই নয়। মার্গারিটকে তেমন একটা সুন্দরী বলা যায় না। তবে

সে অন্যরকম। এইসব সুন্দর-সুন্দর মেয়েদের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে না।

যুক্তি দিয়ে আমি বুঝি, হঠাৎ রাস্তায় মার্গারিটের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তার সেরকম স্বাভাবিক জীবন থাকলে সে কিছুতেই হঠাৎ আমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করত না। কিন্তু চোখ এই যুক্তি মানে না। মাঝে মাঝে কোনও কোনও মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি। ঠিক যেন মনে হয়, দূর থেকে মার্গারিট হেঁটে আসছে আমার দিকে। চেহারার মিল না থাকলেও ফরাসি মেয়েদের হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কিছুটা মিল খুঁজে পাই।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর স্বাতী বলল, তুমি বলেছিলে, প্রথমবার যখন তুমি ফরাসিদেশে এসেছিলে, তখন তোমার মনে হয়েছিল, এখানে সবাই কবি। তারপর সত্যি সত্যি কোনও ফরাসি কবির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি? এখানে এসে আমরা কি শুধু বাঙালিদের সঙ্গে মিশব আর বাঙালিদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাব? আমার খুব ইচ্ছে করে কোনও ফরাসির বাড়ি যেতে, দু-একজন কবি কিংবা শিল্পীকে দেখতে।

বেলজিয়ামের এক কাব্যসম্মেলনে একবার বেশ কিছু ফরাসি কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। অনেকে ঠিকানা ও নিজেদের কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছিল আমাকে। সে সব কিছুই আনিনি সঙ্গে। তবে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার নাম পিলিপ লামবিয়ার। প্যারিসে একটি 'মেইজোঁ দ্য পোয়েজি' অর্থাৎ 'কবিতা-ভবন' আছে, পিলিপ লামবিয়ার তার পরিচালক। সেখানে প্রচুর কবিতার বই ও পত্রপত্রিকা থাকে, মাঝে মাঝেই বসে একক কবিতা পাঠের আসর, অন্য সময় তরুণ-তরুণী কবিরা আসে আড্ডা দিতে। সেখানে যাওয়া যেতে পারে।

তারপর মনে পড়ল ভ্যারনার ল্যামবারসির কথা। এই ভ্যারনারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়, বেশ কিছু বছর আগে। নারায়ণ মুখার্জি এক সকালবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আমাদের ফ্ল্যাটে। ভ্যারনারের চেহারায় এমনই বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রথম দেখলে চমকে উঠতে হয়। তার মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখভরতি শুভ্র দাড়ি, অথচ চোখ ও মুখ তারুণ্যে উজ্জ্বল, তার বয়েস তখন চল্লিশেরও কম। আই সি সি আর-এর আমন্ত্রণে সে ভারত দর্শনে এসেছিল।

ভ্যারনার ফরাসি নয়, বেলজিয়ান। অতটুকু দেশ বেলজিয়াম, সেখানেও ভাষা সমস্যা আছে, ফ্লেমিশ ও ফরাসি ভাষাভাষীদের মধ্যে রেষারেষি ফুটে ওঠে কখনও কখনও। বেলজিয়ামে থেকে যারা ফরাসি ভাষায় লেখে, মূল ফরাসি সাহিত্যে স্থান পেতে হলে তাদের প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়। এরকম দু-চারজনই পেরেছেন শুধু। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মরিস মেটারলিংক। এককালে তাঁর দুটি নাটক 'মন্না ভান্না' আর 'নীল পাখি' বাংলাতেও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটকগুলি রচনা করার সময় মেটারলিংকের লেখার প্রভাবে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়েসে এক বছরের ছোট ছিলেন মেটারলিংক কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন দু'বছর আগে।

ফরাসি সাহিত্যে স্থান পাওয়ার জন্য মেটারলিংককে বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্সে বসবাস করতে হয়েছিল। ভ্যারনার ল্যামবারসিও তাঁর এই বিখ্যাত পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। শুধু দেশ নয়, নিজের স্ত্রী ও কন্যাকেও পরিত্যাগ করে সে প্যারিসে সংসার পেতেছে।

ভ্যারনার খুব নম্র ও মৃদুভাষী মানুষ। প্রতিটি কথাই চিন্তা করে বলে। তার কবিতাও খুব সূক্ষ্ম ধরনের। আগাগোড়া বিমূর্ত বলা যেতে পারে। ভ্যারনারের একটা সংকল্প শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সে একজন কবি, সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে এক লাইনও পদ্য লিখবে না।

অধিকাংশ কবিই গল্প-উপন্যাসে ছুঁতে চায় না। কিন্তু তারা সমালোচনা, প্রবন্ধ কিংবা ভ্রমণকাহিনি লেখে, সমসাময়িক লেখকদের খোঁচা মারা রম্য রচনা লিখতে ছাড়ে না। কবিদের গদ্য

সাধারণত ঔপন্যাসিকদের চেয়েও ভালো হয়। কিন্তু ভ্যারনার কোনও গদ্যই লিখবে না। পৃথিবীর সাত দেশ ঘুরেছে, তবু ভ্রমণকাহিনিও নয়! এ কথাটা শুনে হৃদয়ঙ্গম করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। আমাকে এতরকম গদ্য লিখতে হয়, অথচ এই একজন এক লাইনও গদ্য লিখবে না, কী সুখে আছে এই লোকটা।

প্যারিসে ভ্যারনারের সঙ্গে আমার আগে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। বেলজিয়াম ছেড়ে এসে প্রথম প্রথম সে বেশ অসুবিধেয় পড়েছিল। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ একটা প্রাসাদ-বাজার আছে, সেখানে একটা দোকানে সেলস্ ম্যানেজারের চাকরি নিতে হয়েছিল তাকে। আমাদের নারায়ণ মুখার্জিও তখন প্যারিসে। নারায়ণকে স্বাতী অনেকদিন ধরেই চেনে। এক পাড়ার ছেলে হিসেবে। আর কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক মহলে নারায়ণ ফরাসিবিদ হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সে সে তখন গবেষণা করছে, তার সূত্রেই আবার যোগাযোগ হয়েছিল ভ্যারনারের সঙ্গে।

সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেও কলকাতা সম্পর্কে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ জন্মে গেছে ভ্যারনারের। সে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে প্যাট্রিসিয়া নামে একটি তরুণী কবিকে, এবং হনিমুন করতে নববধূকে নিয়ে এল কলকাতায়। পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে কেউ কি কলকাতার গরমে, ধোঁয়ায়, ভিড়ে, গাড়ির হর্নের বিকট শব্দের মধ্যে মধুযামিনী যাপনের কথা ভাবতে পারে? সেবার ভ্যারনার সস্ত্রীক উঠেছিল আমাদের বাড়িতে। বলেছিল, জানো তো বিয়ের আগেই আমি প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে শর্ত করেছিলাম, কলকাতায় হনিমুন করতে যাব কিন্তু, রাজি তো?

প্যাট্রিসিয়ার মতন এমন নরম, লাজুক মেয়ে খুব কম দেখা যায়। সে কথা প্রায় বলেই না। শুধু হাসে। আমাদের বাড়িতে কত রকম অসুবিধে, বাথরুম-টাথরুম তো আর সাহেবদের মতন নয়, আর রান্নাও নিছক বাঙালি ধরনের, তবু কোনও কিছুতেই তার আপত্তি নেই। কোনও অভিযোগ নেই কলকাতা সম্পর্কে। সব কিছুই তার ভালো লাগছে।

ওদের নিয়ে একদিন গিয়েছিলাম শহর ছাড়িয়ে গঙ্গা দেখতে। ডায়মন্ড হারবার পার হয়ে চারউড পয়েন্টের কাছটা একেবারে ফাঁকা, নদীও অনেক চওড়া। সেখানে একটা নৌকো ভাড়া করে নেওয়া হল। মাঝগঙ্গায় এসে ভ্যারনার জিগ্যেস করল, এখানে সাঁতার কাটা যায় না?

আমরা কেউ সাঁতারের জন্য তৈরি হয়ে আসিনি। তা ছাড়া, মাঝিরা বলল, সমুদ্রের কাছাকাছি বলে এখানকার গঙ্গায় মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঙর দেখা যায়। সেই ভয়ে এখানকার মাঝনদীতে কেউ সাঁতার কাটতে নামে না।

ভ্যারনার সেই সতর্কবাণী গ্রাহ্য করল না। সে অনেকটা আপন মনে বলল, মানুষের জীবনটা কত সংক্ষিপ্ত, তার মধ্যেও কত সময় আমরা নষ্ট করি।

তারপর আবার বলল, এই নদী কী অপূর্ব। নদীতে অবগাহন না করলে নদীকে ঠিক উপভোগ করা যায় না।

স্ত্রীর দিকে ফিরে জিগ্যেস করল, নামব?

প্যাট্রিসিয়া সঙ্গে-সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

জুতো-জামা-প্যান্ট খুলে ফেলে, শুধু জাঙ্গিয়া পরে ভ্যারনার লাফ দিল মাঝগঙ্গায়।

আমার মনে পড়ল জামসেদপুরের কাছে সুবর্ণরেখা নদী দেখে অ্যালেন গিনসবার্গও ঠিক এই একথাই ব্যবহার করেছিল। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপর, দূরের পাহাড় অস্পষ্ট। অ্যালেন বলল, বাঃ। তারপর জামা-প্যান্ট খুলে জলে নেমে গেল।

ওদের নদী-দর্শন আর আমাদের নদী-দর্শন আলাদা। ওদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলিও শরীর-সাপেক্ষ।

ভ্যারনার ল্যামবারসির প্যারিসের বাড়িতে খেতে গেছি বার দু-এক। একবার বিজয়া মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও আরও কেউ কেউ সঙ্গে ছিল। সেবার ভ্যারনারকে ফোন করতেই

সে চলে এল। একদিন এক কাফেতে অনেকক্ষণ আড্ডা হল ও পরবর্তী রাতে নেমন্তন্ন করল আমাদের। প্যাট্রিসিয়া স্বাতীকে বিশেষ পছন্দ করে, স্বাতী এসেছে শুনে সে তার লাজুক স্বভাবেও উচ্ছ্বসিত।

খাঁটি ফরাসি সংসার নয়, বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ মিশ্র পরিবার। শুধু দু'জন। ওদের অ্যাপার্টমেন্টটি বেশ ছোট। প্যারিসের বুকে পুরোনো আমলের পাঁচতলা বাড়ি, কিন্তু লিফট নেই, সরু কাঠের সিঁড়ি। ভ্যারনার স্বাতীকে ও আমাকে ওদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার জন্য খুব পেড়াপিড়ি করেছিল, কিন্তু আমরা বুঝেছিলাম, তাতে ওদের খুবই কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। একখানা শোওয়ার ঘর ও একটি বসবার ঘর, তাও বেশ ক্ষুদে ক্ষুদে। প্যাট্রিসিয়া স্কুলে পড়ায়, ভ্যারনার তখন বেলজিয়ান সরকারের একটি চাকরি পেয়েছে। সুতরাং বোঝা যায়, প্যারিসের বাড়ি ভাড়া কী সাংঘাতিক। তবে, কবি-দম্পতির এমন ছোট্ট বাসাই মানায়। যেন বৃক্ষচূড়ে কপোত-কপোতী।

সেবার গেছি অসীম, স্বাতী ও আমি। নানারকম সুখাদ্য। প্যাট্রিসিয়া জানাল যে সে কিছুই রান্না করেনি, সবই বেঁধেছে ভ্যারনার। ভ্যারনার গদ্য লেখে না বটে, কিন্তু তার রান্নার শখ আছে। সে বলে, অনেকের যেমন বাগান করা কিংবা ফোটোগ্রাফির বাতিক থাকে, তেমনি তার শখ রান্না। সে রান্নাটাকেও শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে চায়।

অসীম এখন একটা রেস্তোরাঁ চালাচ্ছে, সুতরাং রান্না সম্পর্কেও মতামত দেওয়ার তার একটা অধিকার আছে। সেও স্বীকার করল যে শ্যাম্পেন দিয়ে পাখির মাংসের পদটি অত্যুত্তম।

ভ্যারনার সম্পর্কে এত কথা মনে পড়ার আর একটি কারণ আছে। মানুষের মধ্যে যে কত রহস্য তা আমি সেদিন একটি কথা শুনে নতুন করে অনুভব করেছিলাম। এখনও মানব প্রকৃতির অনেকটাই আমরা জানি না।

ভ্যারনারকে সেদিন প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে কলকাতা সম্পর্কে তার এত আকর্ষণের কারণ কী? কেন সে বারবার কলকাতায় যেতে চায়?

ভ্যারনার বলল, ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে এর প্রধান কারণ আমার মা। তিনি থাকেন বেলজিয়ামে, বেশ অসুস্থ। একবার আমি মায়ের শিয়রের পাশে বসে নানান দেশে বেড়াবার গল্প বলছি, বিভিন্ন শহরের নাম বলতে-বলতে যেই কালকাতার নাম বলেছি, মা অমনি মাথা উঁচু করে বললেন, ওই তো! ওই কলকাতাই তোর জায়গা।

আমরা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, তোমার মা কখনও কলকাতায় গিয়েছিলেন? কিংবা পিয়ের দ্য লাপিয়ের-এর বই পড়েছেন?

ভ্যারনার বলল, না। মা বিদেশে বিশেষ যাননি। ওই বইও পড়েননি। তবু মা বললেন, ওই কলকাতা থেকে তোর একটা বই বেরুবে। নিশ্চয়ই বেরুবে। তুই যখন মরবি, তখন কলকাতায় যাবি। মরার পক্ষে কলকাতাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা।

ভ্যারনারের মা কেন এই কথা বলেছিলেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

॥ ২৭ ॥

"যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না
এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে জাদু করতে পারে
চেয়ার আলমারির কাঠে সব ক'টি গ্রন্থি ধরে রাখে
যত বিহঙ্গের গান অরণ্যের বুকে আছে, তারও বেশি।
হঠাৎ টেবিল ল্যাম্প—মেয়েদের মতো তার গ্রীবার ভঙ্গিমা

মসৃণ দেওয়াল থেকে উঁকি দিতে পারে কোনও পড়ন্ত সন্ধ্যায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাঁক

ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছে তাজা পাঁউরুটির গন্ধ সে পারে জাগাতে..."
—রেনে গি কাদু

বেশ সকাল সকালই আমরা প্যারিস ছেড়ে রওনা দিলাম নর্মান্ডির পথে।

আবহাওয়া বেশ অনুকূল। এ সব দেশে মেঘলা আকাশ কেউ পছন্দ করে না, রোদ্দুর উঠলেই আনন্দ। রোদ আছে কিন্তু গরম নেই। আমাদের পৌঁছবার কোনও তাড়া নেই। এবারে আমাদের দলটির গঠনই আলাদা। সঙ্গে রয়েছে দুই নারী। শাড়ি পরা নারীরা এখনও এখানে কৌতূহলের বিষয়। কোনও হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢুকলে লোকে তাকাবেই। গাড়ির পেছনের সিটে কুমুকম ও স্বাতী এবং বাদল বসু। সামনের সিটে, অসীমের পাশে আমাকে ম্যাপ খুলে বসতে হয়েছে। ম্যাপ ছাড়া গাড়ি চালানো এ দেশে দুঃসাধ্য, এতরকম রাস্তা যে একটু অনমনস্ক হলেই ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা।

আমি অসীমের কাছে মাঝেসাঝে বকুনি খাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছি। এবারে ভাস্কর নেই, অসীম ও ভাস্করের মধ্যে ছদ্ম রেষারেষি ও কথার টক্কর চলবে না, ভাস্করের তুলনায় আমি অনেক মিনমিনে। বাদলকে করা হয়েছে ম্যানেজার ও কোষাধ্যক্ষ, আমরা কিছু কিছু চাঁদা ওর কাছে জমা দিয়েছি, যা কিছু খরচ বাদলের হাত দিয়েই হবে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে প্রকৃতি অনেক বেশি সুন্দর ছিল। জঙ্গল, পাহাড়, গিরিখাত ও ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জল খুবই দৃষ্টিনন্দন। সেই তুলনায় এই অঞ্চলের প্রকৃতি অনেক রুক্ষ। ধূধূ মাঠ, শ্লেট রঙের মাটি।

নর্মান্ডির নাম শুনলেই ভাইকিংদের কথা মনে পড়ে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় সেই সব জলদস্যু, যাদের পরাক্রমা এক সময় সারা ইউরোপ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ভাইকিংরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেনি, বাহুবল ও দুঃসাহসই ছিল তাদের ধর্ম, সেই জন্য তাদের বলা হত বারবেরিয়ান, হিদেন। রণতরী নিয়ে অকূলে ভেসে পড়ত তারা, তাদের উদ্দেশ্য সোনা ও নারী লুণ্ঠন।

সেই ভাইকিংদের একটি দল ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে এক সময় বসতি স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে। অনেক যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও তারা এই জায়গার দখল ছাড়েনি। পরে এই এলাকাটির নাম হয় নর্মান্ডি, সেই দুর্ধর্ষ জলদস্যুরা ক্রমে খ্রিস্টধর্ম বরণ করে নেয়, ফরাসি ভাষাও গ্রহণ করে এবং তাদের নাম হয় নর্মান।

এই নর্মানদের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়াম দা কংকারার সাগর পেরিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ড জয় করেছিলেন। নর্মান শাসন ছড়িয়ে পড়ে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং আয়ার্ল্যান্ডে। নর্মান শাসনে ব্রিটিশ জাতি সুসভ্য হয়। পরে অবশ্য ইংরেজরাও ফ্রান্স আক্রমণ ও দখল করেছে অনেকবার। এই নর্মান্ডিই ছিল রণক্ষেত্র এবং বহুবার হাত বদল হয়েছে।

ইতিহাসের সেইসব চিহ্ন এখন বিশেষ চোখে পড়ে না।

ঘণ্টা কয়েক চলার পরেই গাড়ির কী যেন একটা গণ্ডগোল শুরু হল। প্রত্যেকবারই বেড়াতে বেরোবার আগে অসীম তার গাড়ি ভালো করে দেখিয়ে-টেখিয়ে, সার্ভিস করে নেয়, তবু যন্ত্রপাতির কথা তো বলা যায় না। আমি গাড়ি বিষয়ে কিছু জানি না, গাড়িটা চলছে ঠিকই, কোথাও কিছু একটা শব্দ হচ্ছে, সেটা সারিয়ে না নিলে বেশি গোলমাল হতে পারে।

বাদলও একজন গাড়ির এক্সপার্ট, সে বলল, হ্যাঁ, একটা শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ওতে কোনও অসুবিধে হবে না, সে বলল, হ্যাঁ, একটা শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু ওতে কোনও অসুবিধে হবে না, রাত্তিরে যেখানে থাকব, সেখানে দেখিয়ে নিলেই হবে।

অসীম বলল, হ্যাঁ, তা ঠিক, পরে দেখালেও চলবে।

এই বলেই সে ধাঁ করে একটা পেট্রল পাম্পের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর খোঁজ করল মেকানিকের।

সেখানে কোনও মেকানিক নেই, তারা বলে দিল পাঁচ-দশ মাইল দূরের আর একটা কোনও পাম্পে যেতে। দ্বিতীয় পাম্পে গিয়ে জানা গেল, সেখানে অন্য দিন একজন মেকানিক থাকে বটে, কিন্তু আজ রবিবার বলে তার ছুটি। তারা আবার আর একটি জায়গার সন্ধান দিল।

এইরকমভাবে আমরা সাতখানা পেট্রল পাম্প ও গ্যারাজে ঢুঁ মারলাম, কিন্তু রবিবার দিন কিছুতেই মেকানিক পাওয়া যাবে না। রবিবার দিন কারুর সাংঘাতিক অসুখ হলেও ডাক্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

গাড়িখানার অসুখ বিষয়ে বাদল ও অসীমের সামান্য মতভেদ হতে লাগল। বাদলের মতে, এক্ষুনি গাড়িটার কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। আর মেকানিক পাওয়া যাচ্ছে না বলেই অসীমের আরও জেদ চেপে যাচ্ছে, আজ দেখাতেই হবে।

দু'জন মহিলার মতন, আমারও এ বিষয়ে কোনও মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। গাড়িখানা দিব্যি চলছে এটাই দেখতে পাচ্ছি। চলাই তো গাড়ির জীবনের লক্ষণ। যদিও সন্ত কবীর বলেছেন, গাড়ি মানে যার গেড়ে বসে থাকার কথা, কিন্তু বিস্ময় এই যে, 'চলতি কা নাম গাড়ি'।

প্রায় পঞ্চাশ মাইল এ গ্যারাজে সে গ্যারেজে ঘোরাঘুরি করার পর একটি বন্ধ কারখানার দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল যে কাছেই একজন মেকানিকের বাড়ি, সে রবিবারেও কাজ করে।

লোকটি নিশ্চয়ই খুবই দরিদ্র কিংবা বিদেশি!

খুঁজে বার করা হল তার বাড়ি। সে লোকটি কালি-ঝুলি মাখা ওভারঅল পরে ছিল। বাড়িতেই কাজ করছিল কিছু। আমার সন্দেহ সত্য, লোকটি ফরাসি নয়, খুব সম্ভবত ইতালিয়ান অথবা গ্রিক।

অসীমের প্রস্তাব শুনে সে প্রথমেই বলল, দেড়শো ফ্রাংক লাগবে।

তারপর গাড়ির সামনের ডালাটা তুলে সে এক মিনিট পর্যবেক্ষণ করল, কয়েকবার ফুঁ দিল, হাতের ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিল কী যেন। ডালাটা নামিয়ে দিয়ে চাঁটি মেরে বলল, ঠিক আছে!

পাঁচ মিনিটও সময় ব্যয় করেনি, তার জন্য দেড়শো ফ্রাংক!

বাদল আগেই তো আমি বলেছিলুম জাতীয় একটা হাসি দিতে যেতেই অসীম গম্ভীরভাবে বলল, গাড়িটা সত্যিই বেশি খারাপ হয়ে গেলে বুঝি আপনি খুশি হতেন?

আমি মনে মনে ভাবলাম, বাদল এই প্রথম অসীমের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে, প্রথম প্রথম কয়েকবার তো বকুনি খাবেই। ক্রমশ সে নিজেই বুঝে যাবে, কী করে উলটো প্যাঁচে অসীমকে টিট করতে হয়।

মেকানিকটিকে দেড়শো ফ্রাংক দেওয়া এই জন্য সার্থক যে এর পর শব্দটা থেমে গেল, অসীমের মনের খচখচানি ঘুচে গেল এবং বাকি রাস্তায় একবারও গাড়িটা কোনও গণ্ডগোল করল না।

ম্যাপে মনোযোগ দিয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে আমি অসীমকে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, আমরা কি ব্রিটানির দিকেও যাব? নর্মান্ডির পরেই তো ব্রিটানি দেখতে পাচ্ছি।

অসীম বলল, ব্রিটানি তো অনেক দূর হয়ে যাবে। সেখানে কেন যেতে চাও!

আমি বললাম, রেনে কাদু নামে একজনের একটা কবিতা খুব ভালো লেগেছিল। কবিতাটির নাম খুব সম্ভবত 'কবির ঘর'। রেনে কাদু ব্রিটানিতে থাকতেন। একবার তাহলে তাঁর বাড়িটা দেখে আসতাম।

অসীম জিগ্যেস করল, রেনে কাদু, খুব বড় কবি?

আমি বললাম, তেমন একটা বিখ্যাত নয়। কিন্তু ওঁর ঠান্ডা মতন কবিতা আর ওঁর জীবনটা বেশ লাগে। এ যুগে অধিকাংশ কবিই কোনও এক সময় শহরে চলে যায়, এখন তো শহরগুলোই সাহিত্যের কেন্দ্র। কিন্তু রেনে কাদু বরাবর গ্রামেই রয়ে গেলেন, বি এ পাশও করতে পারেননি, একটা ইস্কুলে মাস্টারি করতেন, আর নিরিবিলিতে কবিতা লিখতেন। এক সময় আমারও বাসনা ছিল, কোনও গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করব আর শুধু কবিতা লিখব। সারা জীবনে তিন চারখানা কবিতার বই বার করতে পারলেই যথেষ্ট।

অসীম হেসে বলল, সবার কি সব শখ মেটে। সময় পেলে ব্রিটানিতে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে তুমি রেনে কাদু'র বাড়িটা খুঁজে পাবে কি না খুব সন্দেহ আছে। ব্রিটানি তো বিরাট এলাকা।

আমি বললাম, নর্মান্ডি নামটার মধ্যেই যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধ। ব্রিটানির সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে। অনেক লেখায় পড়েছি।

অসীম বলল, ব্রিটানিতেও যুদ্ধ কম হয়নি। তবে, সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমর-অভিযান কোথায় হয়েছিল, তা তুমি জানো?

আমি বললাম, যারা একটু-আধটু ইতিহাস পড়েছে: তারা সবাই জানে। আচ্ছা, ব্রিটানিতে কি পল গগ্যাঁ থাকতেন এক সময়? তাহিতি দ্বীপে যখন পল গগ্যাঁ মৃত্যুশয্যায়, তখনও তার মনে পড়ত ব্রিটানির কথা! তিনি শেষ যে ছবিটা আঁকার চেষ্টা করেছিলেন সেটার নাম 'ব্রিটানির তুষার' না?

অসীম ভুরু কুঁচকে বলল, ব্রিটানির তুষার? না, তা তো হতে পারে না। ব্রিটানিতে কি বরফ পড়ে নাকি? না তো, তোমার ভুল হচ্ছে।

আমারও খটকা লাগল। নিশ্চয়ই আমার ভুল। কিন্তু কেন যেন 'ব্রিটানির তুষার' আমার মাথায় গেঁথে আছে। ভুলটা না ভাঙলেই বা ক্ষতি কী।

পেছন থেকে মহিলাদের একজন বলল, এখন একটু চা কিংবা কফি খাওয়ার জন্য থামলে হয় না?

গাড়িটা যাচ্ছে একটা ছোট্ট শহরের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি অনেক কাফে ও রেস্তোরাঁ। একই কফি রেস্তোরাঁয় খেলে দাম বেশি, কাফেতে সস্তা।

অসীম বলল, হ্যাঁ, একটা ভালো দোকান দেখে থামতে হবে।

অসীমের ভালো দোকান বলতে কী বোঝায়, তা আন্দাজ করা শিবের বাবারও অসাধ্য। বেশ ভালো ভালো দোকান পেরিয়ে যাচ্ছে, দেখতে সুন্দর দোকান, পার্কিং-এর জায়গা আছে এমন দোকান, সবই পার হয়ে গেল অসীম, শহর ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, একই রাস্তায় চক্কর মারল, তারপর সে এমন একটা জায়গায় থামল, যেখানকার বিশেষ নির্বাচনযোগ্যতা যে কী তা আমরা কেউ বুঝলাম না।

অসীম কিন্তু সস্তা খোঁজে না, তবে সে কী যে খোঁজে, তা কেউ জানে না। বড় রাস্তার ওপরের খুব বেশি সাজানো গোছানো দোকান তার পছন্দ নয়, আবার একেবারে নিরিবিলি জায়গাতেও সে থামতে চায় না। রোতিসেরি নামে দোকানে এক ধরনের ঝলসানো মুরগি পাওয়া যায় সে রকম একটা মুরগি দেখে স্বাতীর একবার খাবার সাধ হয়েছিল। অসীম বলেছিল, দাঁড়ান, আপনাকে খুব ভালো একটা জায়গায় ওই মুরগি খাওয়াব। তারপর পাঁচ ছ'দিন ধরে ফ্রান্সের অনেকখানি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি হল, ওইরকম রোতিসেরি কত পেরিয়ে গেল, কোনওটাই অসীমের পছন্দ নয়, স্বাতীর আর সেটা খাওয়াই হল না। আজও স্বাতী সেই মুরগির প্রসঙ্গ তুলে অসীমকে খোঁচা দেয়।

এই সব ছোটখাট জায়গার কাফেতে বেশ গরম গরম ক্রোয়াসঁ কিংবা প্যান কেক পাওয়া যায়। তার সঙ্গে কফি খুব জমে। চলন্ত গাড়িতে সিগারেট টানার উপায় নেই বলে এই সময়টা

আমরা আরাম করে সিগারেট ধরাই। যার যা ইচ্ছে মতন খাওয়া, দাম দেবে বাদল। প্রথম প্রথম পয়সা মেটাতে গিয়ে বাদল অস্বস্তিতে পড়ত। ফরাসি এক দুই যে জানে না, সে হঠাৎ টাকা দেওয়ার সময় দিজ উইথ কিংবা কাতর ভাঁ্যা শুনলে কী বুঝবে? কিন্তু বাদল চালাক ছেলে, কাফে-রেস্তোরাঁর কাউন্টারে কিংবা পেট্রল পাম্পের মেশিনের দিকে সে খর দৃষ্টি রাখে, টাকার অঙ্কটা সেখানে দেখে নেয় টপ করে।

আজ আর বেশি দূর যাওয়া যাবে না, আমিই প্রস্তাব তুললাম, এবার রাত্রিবাসের জন্য হোটেল ঠিক করা হোক। কারণ, জানি তো, সে জন্যও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় ব্যয় হবে। ভাস্কর নেই, কেই বা ভিটো দেবে অসীমের ওপর।

মাত্র গোটা দশেক হোটেল ঘোরার পর একটি হোটেল পছন্দ হল। চতুর্দিকে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, কিছুই দেখবার নেই। যাই হোক, একটা রাত্তিরের মোটে মামলা।

কিন্তু হোটেলটি যে খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা বোঝা গেল পরদিন সকালবেলা।

এসব হোটেলে এক রাতের অতিথিরা আসে বেশি। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমাদের ব্যস্ততা নেই, তা ছাড়া মহিলাদের স্নানপর্ব সারতে অনেক সময় লাগে। আমরা ব্রেকফাস্ট খাবার পর একটি ঘরে বসে গল্প করছি। এক বুড়ি আমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করেছে। কাউন্টারেও আর এক বৃদ্ধাকে দেখেছি।

কুমকুম বলল, ওই দুই বুড়ি দুই বোন।

বুড়িদের সঙ্গে তার একটাও কথা হয়নি, তবু কুমকুম বুঝল কী করে? বুড়িরা এক বর্ণ ইংরিজি জানে না, অসীমের মাধ্যম ছাড়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও কোনও উপায় নেই। কুমকুম বেশি কথা বলে না, কিন্তু সব কিছু লক্ষ করে। বুড়ি দু'জনের চেহারায়ও তেমন মিল নেই। তবু ওদের ভাবভঙ্গি দেখে কুমকুম ঠিকই আন্দাজ করেছে, অসীম বুড়িদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিল, তারা সত্যিই দু' বোন।

আরও একজন বৃদ্ধা আমাদের বিছানা-টিছানা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। সে-ও অন্য দু'জনের সহোদরা না হলেও কিছু একটা আত্মীয়। এই তিন বৃদ্ধার কারুরই বয়েস সত্তরের কম নয়। আর কোনও পুরুষ নেই, তিন বুড়ি এই হোটেল চালাচ্ছে।

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, পশ্চিমি দেশগুলির ভোগ্যপণ্যের বিপুল সমারোহের জন্যও নয়, সুন্দর সুন্দর বাড়ি আর চকচকে রাস্তার জন্যও নয়, এইসব দেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতা দেখলেই মনে হয়, আমাদের দেশ কত পিছিয়ে আছে। একটা গোটা হোটেল চালাবার জন্যও কোনও পুরুষের সাহায্য লাগে না, তিন বুড়িই যথেষ্ট। আর আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা আঁতুরঘর আর রান্নাঘর থেকে বেশি দূর যেতেই পারেননি।

শাড়ি পরা কুমকুম ও স্বাতীকে দেখে বুড়িরা খুবই কৌতূহলী, মাঝে মাঝে কলকল করে কত কী বলে যাচ্ছে, ওরা কিছুই বুঝছে না। তবে এরাও হাসছে, ওরাও হাসছে। হাসির মতন এমন সর্বজনবোধ্য ভাষা আর হয় না।

স্বাতী এক বৃদ্ধাকে একটি উপহার দিতে চাইল। একটা ব্রোচ, ওপরের দিকটা ছুরির আকারের। হোটেলের মালিক আর খদ্দেরের মধ্যে উপহার দেওয়ার সম্পর্ক হয় না সাধারণত। বৃদ্ধাটি খানিকটা প্রতিবাদের সুরে কী যেন বলতে লাগল অসীমকে। এই রে, বৃদ্ধা কিছু মনে করেছে নাকি?

অসীম বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বৃদ্ধা খুবই মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে কেউ যেমন রুমাল উপহার নেয় না, প্রেমিকাও প্রেমিককে রুমালের বিনিময়ে পয়সা দেয়, সে-রকম ওদেরও নিয়ম, কারুর কাছ থেকে বিনা পয়সায় ছুরি নিতে নেই। বুড়ি তার দাম দেবেই, স্বাতীও নেবে না। শেষ পর্যন্ত সেই বুড়ি পুরোনো আমলের একটা এক পয়সা খুঁজে বার করল কোথা থেকে।

শুধু তাই নয়, বৃদ্ধা আমাদের সবাইকেই উপহার দিল কয়েকটি ছোট ছোট ফ্রান্সের পতাকা।

গাড়িতে আমাদের মালপত্র তোলা হচ্ছে, আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দুই বৃদ্ধা। হঠাৎ মনে হতে পারে, আমরা যেন কোনও আত্মীয়ের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মাসি-পিসিরা। এদের মুখ সেইরকমই স্নেহময়।

বাদল বলল, বেশ বাড়ি-বাড়ির মতন লাগল, তাই না?

স্বাতী বলল, এখানে আর দু-একটা দিন থেকে গেলে হয় না?

অসীম হেসে বলল, এতই ভালো লেগে গেছে? কিন্তু শহরের মধ্যে একটা হোটেলে কাটাবার জন্য তো আমরা বেড়াতে বেরোইনি।

আগের বার দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে যাওয়ার পথে লাস্কোতে আমরা এক চাষির বাড়িতে উঠেছিলাম। সেবারে সকালবেলা সেখান থেকে আমাদের প্রায় বিতাড়িত হতে হয়েছিল। গাড়ি চালাতে শুরু করার পর আমি সেই গল্প শোনালাম অন্যদের। সেবারের তুলনায় এবারের অভিজ্ঞতা কত অন্যরকম।

আমাদের সেই হেনস্থার কাহিনি শুনে দুই মহিলা খুব হাসতে লাগল। যেন তারা বলতে চায়, বেশ হয়েছে। আমাদের না নিয়ে বেরিয়েছিলে, তাই তো ওইরকম অবস্থা!

॥ ২৮ ॥

“বৃ	তু	আ	শো	শো
ষ্টি	মি	র	নো	নো
	ও			
প		এ	এ	তো
ড়	বৃ	ই	ই	মা
ছে	ষ্টি			র
না	তে	দু'	বৃ	
রী	ঝ	পা	ষ্টি	অ
দে	রে	তো	পা	ভি
র	প	লা	ত	ত্বে
	ড়		য	র
ক	ছো	মে	খ	
ণ্ঠ		ঘে	ন	স
স্ব	আ	রা		ম
রে	মা		অ	স্ত
	র	বি	নু	
যে	জী	শ্ব	তা	পা
ন	ব	ম	প	র
	নে	য়	আ	পে
তা	র		র	ন
রা	ছো	কা	তা	ডি
	ট	ন	চ্ছি	কু
স	ছো	স	ল্য	লা

বা	ট	র্ব	কাঁ	রে
ই	বি	স্ব	দ	র
	ন্দু		ছে	
মৃ	ও	ন	পু	প
ত	লি	গ	রো	ত
	র	র	নো	ন”
এ	স	ও		
ম	ঙ্গে	লি	স·	
ন	অ	তে	ঙ্গী	
কি	পূ	ছ	তে	
	র্ব	ড়া	র	
স্মৃ	সা	চ্ছে		
তি	ক্ষা	হ্রে	ম	
তে	ৎ	ষা	ত	
ও	কা	ধ্ব	ন	
	রে	নি		

—গিয়ম আপোলিনেয়ার

বিকেলের আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম দোভিল। এই প্রথম সমুদ্রদর্শন হল। একটা সাদামাটা হোটেল ঠিক করে, মালপত্র রেখে, সময় নষ্ট না করে চলে এলাম বেলাভূমিতে।

মানচিত্রের কথা মনে রাখলে একে ঠিক সমুদ্র বলা যায় না। এ তো ইংলিশ চ্যানেল। কত নারী-পুরুষ সাঁতরে পার হয়েছে। এমনকি আমাদের দু-একজন বঙ্গ ললনাও সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। অবশ্য এখানে ইংলিশ চ্যানেল বেশ চওড়া। ক্যালে কিংবা ডানকার্কের কাছ ইংল্যান্ড ও ফরাসিদেশ খুব কাছাকাছি, সাঁতারুরা ওদিকেই পারাপার করে, যাত্রীবাহী জাহাজগুলোও চলে ডোভার আর ক্যালে'র মধ্যে। দোভিল-এ এই দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি, এখানে কোনও বন্দরও নেই।

মানচিত্রে যা-ই থাক, চোখের সামনে যে ঢেউসংকুল জলরাশির পরপার দেখা যায় না, তাই তো সমুদ্র। ইস্তানবুলে গিয়ে আমি বসফরাস প্রণালী প্রতিদিন দুবার করে পার হতাম, স্টিমারে কিংবা ব্রিজের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে, সেটাও তো সমুদ্র। এখানকার ইংলিশ চ্যানেলে চেয়ে বসফরাস অনেক সরু, তবু তার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। কিন্তু এখনকার সমুদ্র যেমন যেন রুক্ষ, জলের রং নীল নয়, কালচে ধরনের, বেলাভূমি মসৃণ বালুকাময় নয়, এবড়ো-খেবড়ো, পাথর ছড়ানো। এখন ভাঁটার সময়, জলরেখা অনেকটা দূরে। ওড়িশার চাঁদিপুরে যেমন সমুদ্রের ঢেউ এক একসময় পান্থনিবাসের দোরগোড়ায় এসে ছলাত ছলাত করে, আবার অন্য সময় এক দেড় মাইল দূরে সরে যায়, নানান চিহ্ন দেখে মনে হল এখানকার সমুদ্রের চরিত্রও সেরকম।

পৃথিবীর নানা জায়গাতেই আমার সমুদ্রদর্শন হয়েছে, ডুব দিয়েছি কয়েকটি মহাসাগরে, কিন্তু এই সামান্য ইংলিশ চ্যানেলের অখ্যাত একটা জায়গায় এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আর কোথাও দেখিনি। এত ঝিনুক। যেদিকে তাকাই শুধু ঝিনুক। আর এত পাখি!

সব সমুদ্রের পেটেই ঝিনুক থাকে। প্রতিটি ঢেউ তীরে এসে কিছু ঝিনুকের উপহার রেখে যায়। পুরীর সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে কে না ঝিনুক কুড়িয়েছে! বাচ্চারা কাঁড়ি-কাঁড়ি ঝিনুক জমায়, তারপর বাড়ি ফেরার সময় সেগুলো সঙ্গে আনতে চাইলে মা-বাবারা আর বোঝা বাড়াতে চায় না। ঝিনুকের মালা, ঝিনুকের তৈরি কত রকম খেলনা বিক্রি হয়। আন্দামানের এক নির্জন দ্বীপে আমি

ঝিনুকের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খও উঠে আসতে দেখেছি। সেসব ঝিনুকের কত বৈচিত্র্য, রং ও আকৃতির কী নিপুণ শিল্প!

তবু আগেকার দেখা কোনও ঝিনুক-সম্পদের সঙ্গেই এখানকার দৃশ্যের তুলনা চলে না। প্রত্যেকটি ঢেউয়ে এখানে যে ঝিনুক উঠে আসছে, তা সব একই রকম, দেখতেও সুন্দর নয়, ওপরটা কালো শ্যাওলার মতন, দু-ইঞ্চি, সাইজের। আমাদের দেশের অনেক পুকুরে এরকম ঝিনুক দেখা যায়। আমরা এই ঝিনুকের খোলার মাঝখানটা ফুটো করে ছুরি বানাতাম, সেই ছুরিতে কাঁচা আম ছুলতাম।

সেই আমাদের চেনা ঝিনুক এখানকার সমুদ্র থেকে উঠে আসছে হাজার হাজর লক্ষ লক্ষ। সংখ্যাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না, কোটি কোটি বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিকেই তাকাই ঝিনুক ছড়ানো। হাঁটতে গেলে ঝিনুকের ওপর দিয়েই হাঁটতে হবে।

অনেক সমুদ্রের ধারেই ধপধপে সাদা রঙের পাখিদের দেখা যায়। সি গাল! এখানে তাদের খাদ্য এত বেশি বলেই তাদের সংখ্যাও প্রচুর। হাজার হাজার পাখি উড়ছে কিংবা মাটিতে বসে ঝিনুক ঠোকরাচ্ছে। এরই মধ্যে কারুর পোষা একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর তেড়ে যাচ্ছে পাখিদের। দুর্দান্ত ধরনের স্বাস্থ্যবান সেই কুকুর প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু পাখি ধরা কি চাট্টিখানি কথা। পাখিগুলো যেন খেলছে কুকুরটাকে নিয়ে, তাদের ভয়ডর নেই, কুকুরটা একদম কাছে যাওয়া পর্যন্ত তারা চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ এক ঝাঁক পাখি ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়, ঘুরতে থাকে কুকুরটার মাথার ওপর। কুকুরটা আবার ছোটে অন্য একটা ঝাঁকের দিকে। ছুটতে ছুটতে কুকুরটা অনেক দূরে একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত চলে যায়। আসন্ন সন্ধ্যায় সূর্য একটু করে নামছে সমুদ্রের বুকে। অতি গাঢ় লাল সূর্য, হাজার হাজার শ্বেত বিহঙ্গ ও একটি ধূসর রঙের সারমেয়, সব মিলিয়ে এক মনোহরণ দৃশ্য।

এই ঝিনুক শুধু পাখিদের খাদ্য নয়, মানুষেরও। কাছাকাছি অঞ্চল থেকে অনেক লোক গাড়ি নিয়ে আসছে, গাড়ি থেকে নামছে পায়ে গাম বুট পরে, হাতে বালতি। যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেই পর্যন্ত চলে গিয়ে তারা বালতিতে ভরছে জ্যান্ত ঝিনুক। বিনা পয়সায় প্রোটিন। ফরাসিতে এই ঝিনুকগুলোকে বলে মুল (Moules), হোটেল-রেস্তোরাঁয় বেশ দামে বিক্রি হয়। হঠাৎ কখনও এই ঝিনুকের মধ্যে মুক্তোও পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্যই তো সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। তবে, এত লক্ষ লক্ষ ঝিনুকের মধ্যে কোনওটায় মুক্তো আছে কি না তা কে ভেঙে দেখবে! এখানকার অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁর লোকেরাও বালতি ভরে-ভরে ঝিনুক নিয়ে যাচ্ছে, কোনও খরচই নেই। এদিকের হোটেলে খুব পাখির মাংসের রোস্টও পাওয়া যায়। সেগুলো কি সিগাল? ছররা বন্দুক দিয়ে কয়েক ডজন সিগাল যখন তখন মারা যায়।

অসীম দু-তিন রকম ক্যামেরা এনেছে, ক্যামেরা বদলে বদলে ছবি তুলছে মন দিয়ে। ফটোগ্রাফিতে তার বিশেষ ঝোঁক। সে তার ছবি প্রতিযোগিতায় পাঠায়। অসীম যখন ছবি তোলে তখন বিশেষ কথা বলে না, যেন ধ্যানে মগ্ন থাকে। আমরা ঘুরছি একদিকে, অসীম অন্যদিকে, প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত, জল-কাদা ভেঙে ভেঙে সে চলে যাচ্ছে কিনার পর্যন্ত. উড়ন্ত পাখি ও শিকারি কুকুরের দৃশ্যটি সে অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে তুলল।

সাধারণত কোনও পুরোনো ভাঙা বাড়ি, মাঠের মধ্যে একলা গাছ, ঝুলন্ত মাকড়সা, ফড়িং-এর ওড়াউড়ি, এই সব দেখলেই অসীম তার ক্যামেরা বার করে চোখে লাগায়। বাদল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে, এই যে রায়দা, আপনার ক্যামেরায় বুঝি মানুষের ছবি ওঠে না? আমরা যে রয়েছি, একসঙ্গে ঘুরছি, এর কোনও ছবি তোলা যায় না?

অসীম ভুরু কুঁচকে বলে, ধ্যাত মশাই, আপনাদের চেহারায় ছবি তোলার কী আছে?

স্বাতী তখন বলে, আমরা দেখতে খারাপ, তাই অসীমবাবু পাত্তা দিচ্ছেন না।

অসীম তখন হাসতে শুরু করে। তবু কিন্তু ক্যামেরার লেন্স ফেরায় না আমাদের দিকে। আবার সে কুকুর কিংবা পাখি ধরতে যায়।

কখনও কখনও অবশ্য অসীমের দয়া হয়। আমাদের না জানিয়ে একটু দূর থেকে ক্যামেরা ফিরিয়ে ক্লিক ক্লিক করে। কাছে এসে বলে, দেখি, পাশাপাশি দাঁড়ান তো। এতই যখন ইচ্ছে, আপনাদের, একটা ছবি তুলে দিই।

যে-কোনও কারণেই হোক, সেই সব ছবি ঠিক প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত হয় না।

সন্ধের মুখে বৃষ্টি নামল। প্রথমে খুব গুঁড়িগুঁড়ি। যেন আমাদের ঘরে ফেরার সময় দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়, যাকে বলে বিদ্যুৎ-বজ্রপাত সহ বৃষ্টি, তার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ফেরার পথে আমরা কয়েকটা খড়ের চালের বাড়ি দেখলাম। ঠিক আমাদের গ্রামের গরিব মানুষদের বাড়ির মতন। অসীম জানাল, এদেশের অত্যন্ত বড়লোকরাই এরকম শখের খড়ের চাল দেওয়া বাড়ি বানায়। বাইরেটা যতই সামান্য দেখাক, ভেতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম তো রাখতেই হবে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। তখন আমার মনে পড়ল, আমেরিকার একটি শহরে আমি খাপরার চাল দেওয়া মাটির বাড়ি দেখেছিলাম। পুরুলিয়া কিংবা বিহারে যেরকম বাড়ি খুব দেখা যায়। সেগুলোও আসলে খুব শখের বাড়ি, খুবই ব্যয়বহুল। কী আজব শখ!

রাত্তিরে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমি প্রথমেই দাবি তুললাম, ঝিনুক খেতে হবে।

মেনিউ-তে ঝিনুকের নানারকম পদ আছে, তার মধ্যে ওয়াইন দিয়ে সেদ্ধ করা মূল পদটিই অসীম সুপারিশ করল। কিন্তু মুশকিল হল কুমকুমকে নিয়ে। সে খাবে না।

পশ্চিম জগতে বেড়াতে যাওয়ার আগে অনেকে প্রতিজ্ঞা করে, গোরুর মাংস আর মদ কিছুতেই ছোঁবে না। কিন্তু এই দুটি বস্তুই এড়ানো প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। কতরকম রান্নার মধ্যে যে ওয়াইন, শ্যাম্পেন কিংবা কনিয়াক থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। আইসক্রিম, কেক, চকোলেট, বিস্কুটের মধ্যেও থাকে। আর গোরুর মাংস যে কোথায় মিশে আছে, তাও ধরবার উপায় নেই। এমনকি অতি নিরীহ আলুভাজা, সেটাও ভাজা হতে পারে এমন লার্ড দিয়ে, যা বিশুদ্ধ গোরুর চর্বি। ঘি-ও যেমন গোরুর চর্বি, সেটা অবশ্য পাওয়া যায় জ্যান্ত গোরুর কাছ থেকে। অনেকে হ্যামবার্গার খায় এই ভেবে যে শুয়োরের মাংস হিন্দুর কাছে নিষিদ্ধ মাংস নয়, কিন্তু হ্যামবার্গারের সঙ্গে হ্যামের কোনও সম্পর্ক নেই। হ্যামবুর্গ শহরের নামে প্রচলিত এই খাদ্যটির মাঝখানে থাকে এক চাকা গোমাংস!

আমাদের শাস্ত্রকাররা অতি বাস্তববাদী ছিলেন, তাঁরা বলে গেছেন যস্মিন দেশে যদাচারঃ। কিংবা, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। একালে অনেকে এই সব শাস্ত্রবচন মানতে চায় না বলেই যত বিপত্তি।

কুমকুম ঝিনুক খাবে না বলে নিল এক বাটি সুপ। তার এক চামচ মুখে ঠেকিয়েই সে শিউরে উঠল। একটা কী রকম গন্ধ লাগছে! ওই সুপও তার মুখে রুচবে না। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথমবার আমেরিকা গিয়ে প্রথম এক দোকানের সুপে চুমুক দিয়ে আমারও এরকম গা গুলিয়ে উঠেছিল। কী রকম যেন একটা গন্ধ, একেবারে অচেনা, আমাদের স্বাদের সঙ্গে মেলে না। তারপর আস্তে-আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল, পরে আমি সেধে-সেধে বাটি বাটি সুপ খেতাম।

কুমকুম সুপও খাবে না, তা হলে কী খাবে? বাদলের মুখ কাঁচুমাচু। বউ কিছু না খেলে সে নিজে খায় কী করে?

কুমকুম অবশ্য ঘাবড়াবার পাত্রী নয়। চারপাশের সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করা তার স্বভাব। সে এর মধ্যেই দেখে নিয়েছে যে দূরের একটা টেবিলে একজন লোক একটা বেশ লম্বা মাছ ভাজা খাচ্ছে। সে বলল, আমিও তো মাছ খেতে পারি। শুধু মাছ হলেই চলবে। তার সঙ্গে রুটি মাখন খেয়ে নেব।

কুমকুমের জন্য অর্ডার দেওয়া হল ট্রাউট মাছ। সেই মাছের সঙ্গে ফাউ হিসেবে এলো খানিকটা ফুটফুটে সাদা ভাত। ব্যস, মাছ আর ভাত, বাঙালির আর কী চাই?

আমাদের জন্য ঝিনুক এল বেতের বাস্কেটে, বেশ কয়েক ডজন, যেন একটা ঝিনুকের পাহাড়। সেগুলো আস্তই রয়েছে, ছাড়িয়ে খেতে হবে। আরম্ভ করে দিলাম। ওয়াইনে জারিত হয়ে অপূর্ব স্বাদ।

অসীম একটা গল্প শোনাল। একজন আশাবাদী মানুষের গল্প। সেই লোকটি একটা দামি রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছে। চার-পাঁচ রকম ভালো ভালো ডিশের পর কয়েক ডজন এই ঝিনুকের অর্ডার দিল। খেল খুব তৃপ্তি করে। তারপর বেয়ারা বিল নিয়ে আসতেই সে এক গাল হেসে বলল, পয়সা তো নেই! তখন সেখানকার ম্যানেজার এসে বলল, এটা কী ব্যাপার, আপনার কাছে পয়সা নেই তবু আপনি এত টাকা দামের খাবারের অর্ডার দিলেন কেন? লোকটি বলল, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, এতগুলো ঝিনুক খেতে-খেতে একটা না একটার মধ্যে মুক্তো পেয়ে যাবেই। তখন সেই মুক্তো দিয়েই দাম শোধ হয়ে যাবে।

আমাদের টেবিলে অসীম, বাদল ও স্বাতী একসময় হাত গুটিয়ে নিলেও আমি ছাড়লাম না। একটার পর একটা ঝিনুক খেয়েই চলেছি। স্বাতী বারবার বলতে লাগল, আর খেও না, অসুখ করবে, তবু আমি কর্ণপাত করছি না। পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দিতে গায়ে লাগে, খেতেও ভালো লাগছে, তা ছাড়া সেই আশাবাদী লোকটার মতন মনে হচ্ছে, যদি শেষ ঝিনুকটার মধ্যে একটা মুক্তো জুটে যায়।

রাত্তির ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ। আমাদের রাত দশটার আগে খিদেই পায় না। কিন্তু এসব জায়গায় রাত দশটায় ঢুকলে কোনও রেস্তোরাঁয় খাবারই পাওয়া যাবে না। রাত্তিরের দিকে আরও একবার বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি।

হোটেলের তিনতলায় উঠে একঘরে সবাই বসে আড্ডা মারতে লাগলাম কিছুক্ষণ। হোটেলটি বেশ বড় হলেও অনেক ঘর খালি। নিজেদের গলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। চতুর্দিক শুনশান করছে এরই মধ্যে।

এক সময় জানলা খুলে বাইরের বৃষ্টি দেখতে গিয়ে হঠাৎ আমার অ্যাপোলিনেয়ারের বৃষ্টির কবিতা মনে পড়ল।

বুদ্ধদেব বসু একবার আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, আমার মুশকিল কী জানো, কোথাও বৃষ্টি দেখলে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের লাইন মনে পড়ে, রোদ্দুরের মাধুর্য দেখলে মনে পড়ে বোদলেয়ারের কবিতা, সমুদ্র দেখলে মনে পড়ে শেকসপিয়ারের লাইন, মেঘের গুরুগুরু শুনলে মনে পড়ে কালিদাস। প্রকৃতির যে-কোনও সৌন্দর্য দেখলেই আমার মুগ্ধতার মধ্যে পূর্ববর্তী বড় বড় কবিদের অনুভূতি এসে পড়ে।

আমার অবশ্য এরকম মনে হয় না। বুদ্ধদেব বসুর বিপুল পড়াশুনো ছিল, বিশ্বসাহিত্য তাঁর নখাগ্রে, সেই তুলনায় আমি নিছক এক গোষ্পদ, পড়াশুনো করিনি কিছুই। তবু যে অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতাটা হঠাৎ মনে পড়ল, তার কারণ, সমুদ্রের ধারে কোথাও একটা জোরালো ফ্লাড লাইট জ্বলছে, সেই আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আর অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতাটিও বৃষ্টির ধারার মতন। বৃষ্টির বর্ণনার জন্য নয়, চাক্ষুষ মিল।

অ্যাপোলিনেয়ার নানারকম আকারের কবিতা লিখেছেন, হৃৎপিণ্ডের মতন, মুকুটের মতন, ওভাল আয়নার মতন, গির্জার মতন, আকাশের তারার মতন। সেই কালে বরফির মতন, পিরামিডের মতন অক্ষর সাজিয়েও লিখেছেন কেউ কেউ। কবিতার একটা চাক্ষুষ আবেদনও আছে। এমনিতেই যে কবিতায় কখনও বড় লাইন, কখনও ছোট লাইন লেখা হয়, সেগুলো কেন বড় বা কেন ছোট, তার কোনও যুক্তি নেই। কবি তাঁর কবিতাটিকে যে-রকম ছবির মতন দেখতে চান, সেই রকমই

লেখেন। অনেক কবিই এই সব ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর। কারুর বড় লাইন যদি ছাপার সময় ভেঙে দেওয়া হয় কিংবা ছোট লাইন জুড়ে যায় অন্য লাইনের সঙ্গে তা হলে সেই কবি দারুণ চটে যান। পাঠক কিছুই ধরতে না পারলেও কবির মনে হয় কবিতাটার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোনও কোনও কবি ছাপার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে, কেউ আবার উদাসীন। বুদ্ধদেব বসু নিজের যে-কোনও লেখার প্রুফ দেখতেন তিন-চার বার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটা শব্দেরও সামান্য হেরফের হলে মহা ক্রুদ্ধ হতেন, আবার জীবনানন্দ দাশ লাইন ভাঙা নিয়ে আপত্তি জানাতেন না, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রুফ দেখার ধার ধারে না! জয় গোস্বামী তার একটি কবিতার সাতটি কমা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, একটি কমাও এদিক- ওদিক হলে যেন তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই কমার তদারকি করতে রানাঘাট থেকে পত্রিকার দফতরে ছুটে এসেছে অনেকবার।

আবার অনেক কবি দাঁড়ি-কমা-কোলন কিছুই ব্যবহার করেন না। কামিংস লাইনের শুরুতেও ইংরিজি বড় হাতের অক্ষর পর্যন্ত ব্যবহার করতেন না। আপোলিনেয়ারের 'আলকুল' নামে কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে আঁরি মারতিনো লিখেছিলেন, এই দুশো পৃষ্ঠার বইটিতে কেউ একটাও ফুলস্টপ তো দূরের কথা, একটা কমা পর্যন্ত খুঁজে পাবে না!

সেই সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, কবিতায় পাংকচুয়েশান একেবারে অপ্রয়োজনীয়, কবিতার ছন্দ এবং যেভাবে লাইনগুলো ভাঙা হয়, সেই তো আসল পাংকচুয়েশান। বৃষ্টি বা হৃৎপিণ্ড বা তারার আকৃতির কবিতা লেখার সমর্থনে আপোলিনেয়ার বলেছিলেন, এগুলো হচ্ছে ক্যালিগ্রাফ, মুক্ত ছন্দের কবিতা এবং ছাপার টাইপ সাজাবার যে নিখুঁত পর্যায়ে এসেছে তারই ভাবরূপ। অক্ষর, টাইপোগ্রাফির আয়ুর শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এরপর থেকে সিনেমা ও গ্রামোফোনই সব প্রকাশ মাধ্যম দখল করে নেবে। আপোলিনেয়ার এ কথা লিখেছিলেন ১৯১৮ সালে, তিনি টেলিভিশন ও ভি সি আর-এর যুগের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ছাপার অক্ষর এখনও দুর্দান্ত প্রতাপে রাজত্ব করছে।

আপোলিনেয়ার ছিলেন মার্গারিটের প্রিয় কবি। সে আমাকে জোর করে ওঁর কিছু কিছু ছোট কবিতা মুখস্থ করিয়েছিল। অনেক বছর কেটে গেছে, আমি মনে করার চেষ্টা করলাম তার কিছু এখনও মনে আছে কি না। বিসতেয়ার নামে এই কবির একটি বই আছে, যার সবকটি কবিতাই পশু-পাখি-পতঙ্গের নামে। প্রজাপতি বিষয়ক একটি কবিতায় এরকম একটি লাইন ছিল, পভর পোয়েত, ত্রাভাইয়োঁ। অর্থাৎ, শুটি পোকারা অনেক খাটাখাটনি করে যেমন একদিন প্রজাপতি হয়, তেমনি গরিব কবিরা, তোমরাও খাটো, খাটো, পরিশ্রম করো!

লাইনটা মনে পড়ামাত্র আমি যেন মার্গারিটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি কখনও বিছানায় একখানা বই নিয়ে শুয়ে আলস্য করলে মার্গারিট এসে বলত, এই, এখনও শুয়ে আছ। পভর পোয়েত ত্রাভাইয়োঁ! অনেককালে আগে, সেই আয়ওয়া শহরে, কোনও একদিন হয়তো বরফ পড়ছে, রাস্তাগুলো সাদা হয়ে গেছে, আমার একটু একটু মন খারাপ, আমি সারাদিন বাইরে বেরোইনি, রান্নাবান্নাও করিনি, জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তুষারপাতও দেখছি না, আমি তাকিয়ে আছি কলকাতার দিকে। মার্গারিট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস নিয়ে ফিরল, বাইরের পাপোশে একটুক্ষণ ধুপধাপ করে ঝেড়ে ফেলত পায়ের বরফ, তারপর দরজা খুলল চাবি দিয়ে। আমাকে দেখেই বুঝতে পারল, জিগ্যেস করল, কী হয়েছে, সুনীল, মন খারাপ? তারপরই ঝরঝর করে হেসে ফেলে বলল, তুমি প্রজাপতি হতে চাও না? পভর পোয়েত ত্রাভাইয়োঁ!

হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এলাম। বৃষ্টি খুব বেড়েছে, সেই সঙ্গে শনশন করছে ঝড়, লকলকে বিদ্যুতের শিখা চিরে দিচ্ছে আকাশ। এবার আমার অন্য একটি রাতের কথা মনে পড়ল। সেই রাতটাতেও এরকম প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত চলছিল। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন।

॥ ২৯ ॥

"থেমে গেছে সব শত্রু এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতনশব্দ শত্রুর মুখে শোনা
ভুলব না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিঃশ্বাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি ভুলব না..."
—লুই আরাগঁ

জাপানে অ্যাটম বোমা পড়ার আগে যে-ঘটনায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, তা হল নর্মান্ডি অভিযান। নাতসি বাহিনী তখন প্রায় গোটা ইউরোপ অধিকার করে বসে আছে, প্যারিসের বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে জার্মান সৈন্যরা আমোদ-প্রমোদের বন্যা ছোটাচ্ছে। সেই সময়ে বোঝা গিয়েছিল, সম্মিলিত মিত্র বাহিনী আকাশ-জল ও স্থলপথে জার্মানদের একেবারে মুখোমুখি সম্মুখ সমরে না নামলে যুদ্ধের নিষ্পত্তি হওয়ার কোনও আশা নেই, হিটলারের কবর থেকে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না।

ঠিক কোন জায়গাটা থেকে এই অভিযান শুরু হবে, তা নিয়ে মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনায়ক ও বড় বড় সেনাপতিদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল নর্মান্ডির উপকূলই প্রকৃষ্ট স্থান।

আমরা পাঁচজন এখন ঠিক সেই অঞ্চল দিয়েই ঘুরছি। এ যেন আর এক কুরুক্ষেত্র বা পানিপথ বা ওয়াটার্লু। এতগুলো বছর কেটে গেছে, তবু মুছে যায়নি সেই সাংঘাতিক যুদ্ধের চিহ্ন। সমুদ্রের কিনারা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে চোখে পড়ে ভূগর্ভের বাংকার, ভাঙা ট্যাংক, কামান, আধা ডুবন্ত জাহাজ। কত প্রাণ, কত নিযুত, অর্বুদ টাকা ধ্বংস হয়েছে এখানে অকারণে। হ্যাঁ, অকারণেই তো, নিছক কয়েকটা ক্ষমতা-উন্মাদের খেয়ালে। হিংসা ও মারণাস্ত্রের কী বিপুল বন্দোবস্ত, দেখতে-দেখতে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি অনুভব করি যে আমরা পরস্পর কোনও কথাই বলছি না।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফ্রান্সের ভূমিতে জার্মান সমর-সজ্জা। আগেই বলেছি যে, ক্যালে বন্দরের কাছে ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে সরু, সুতরাং ইংলন্ডের দিক থেকে ওইখানেই মিত্র ফৌজের সমুদ্র পার হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দু'পক্ষই সমান ধুরন্ধর। জার্মানরা ভাববে, শত্রু আসবে ক্যালের কাছে, এই জন্য মিত্র বাহিনী তাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বেছে নিল নর্মান্ডির উপকূল। আর জার্মানরা ভাবল, ওরা ভাববে আমরা ক্যালের কাছে অপেক্ষা করব, সুতরাং ওরা ক্যালের দিক দিয়ে কিছুতেই আসবে না। তাই জার্মানরা নর্মান্ডির তটে ওঁত পেতে রইল। শোনা যায়, এই বুদ্ধি স্বয়ং হিটলারের এবং তা সমর্থন করেছিলেন রোমেল।

এখানেই ঘটেছিল মানুষের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সমুদ্র অভিযান। মিত্র পক্ষে স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনী মিলিয়ে সৈন্য সংখ্যা মোট দশ লক্ষ, জলে ভেসেছিল চার হাজার জাহাজ। মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার, আর নাতসি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোমেল। এই রণ-দুর্মদ রোমেলকে সেনাপতি হিসেবে শত্রুপক্ষও সমীহ করে, আফ্রিকার ফ্রন্টে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'মরু শৃগাল'।

দু-পক্ষই প্রস্তুত। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের মে মাসেই যে-কোনওদিন চরম লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। দু-দিকের গুপ্তচররাই দারুণভাবে সক্রিয়। সঠিক দিনক্ষণটি জানা যুদ্ধের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

কথা ছিল, ব্রিটিশ বেতারে একদিন নানা অনুষ্ঠানের মাঝখানে পল ভেরলেইনের দু' লাইন

কবিতা পাঠ হবে, সেই মুহূর্তেই শুরু হবে অভিযান। এটাই কোড। এও যেন এক পরিহাস। এক দুর্বল, অসহায় কবি, প্রায় সারাজীবনই যাঁর কেটেছে দারিদ্র্যে, যিনি লিখে গেছেন প্রধানত প্রকৃতির কাব্য, এক বৃষ্টিমুখর শরতের দিন, জ্যোৎস্নাময় রাত, গাছ থেকে খসে পড়া একটা শুকনো পাতা, উদ্যান দিয়ে হেঁটে যাওয়া দুটি নারী-পুরুষ, এইসব সামান্য বিষয় থেকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন সৌন্দর্য, সেই কবির রচনা ব্যবহৃত হল এক প্রবল বিধ্বংসী যুদ্ধে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কবিতা ও ছবির কিছুটা ভূমিকা ছিল। ছবি নিয়ে কম কাড়াকাড়ি হয়নি। আগেকার যুদ্ধে বিজয়ীরা সোনা ও নারী লুণ্ঠন করত, এই যুদ্ধে প্রচুর ছবি লুঠ হয়েছে। জার্মান পক্ষে গোয়েরিং, গোয়েবলসের মতন যাদের ভুরুর সামান্য উত্তোলনে হাজার হাজার ইহুদির প্রাণ হরণ করা হয়েছে, তারাও ছবির সমঝদার ছিল। ফ্রান্স থেকে ট্রেন বোঝাই করে জার্মানিতে ছবি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং জাতীয় শিল্প রক্ষায় বদ্ধপরিকর ফরাসিদের সেই ট্রেনটাকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেওয়া, এমনকি রাতারাতি স্টেশনের নাম পালটে দেওয়া নিয়ে এক মর্মস্পর্শী কাহিনি আছে।

জার্মান সেনাপতিরা মানুষ খুন করতে দ্বিধাহীন, কত শহর-বন্দর বোমা মেরে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে, অথচ তারা ভালো ছবির মর্ম বুঝত, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যারা শিল্পকে ভালোবাসে, তারা কি ধ্বংসকেও ভালোবাসতে পারে? স্বয়ং হিটলারেরও ছবি আঁকার বাতিক ছিল। প্রথম যৌবনে হিটলার এক আর্ট স্কুলে ভরতি হতে গিয়েও সুযোগ পায়নি। সেই আর্টস্কুলের পরিচালক যদি অ্যাডলফ হিটলার নামে এক দুর্বল তরুণ শিল্পীকে শিক্ষার সুযোগ দিতেন, বলা যায় না, তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসটা বোধহয় অন্যরকম হত।

নর্মান্ডি অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন ওভারলর্ড। মাইলের পর মাইল ইস্পাত-কংক্রিটের দুর্ভেদ্য বাংকার বানিয়ে, সৈন্য সাজিয়ে রোমেল বসে ছিলেন অধীর প্রতীক্ষায়। গুপ্তচররা খবর আনল, জুনের পাঁচ তারিখে আক্রমণ হবেই, কিন্তু সেদিনটা খুব দুর্যোগপূর্ণ, ঝোড়ো বাতাসে সমুদ্রের ঢেউ উত্তাল, সেদিন কোনও জাহাজ দেখা গেল না। জানা গেল যে, পরের দিন আবহাওয়া আরও খারাপ হবে, ঝড়-বৃষ্টি এমন প্রবল হবে যে কিছু চোখে দেখা যাবে না। সুতরাং সেই আবহাওয়ায় নৌ-অভিযান অবাস্তব। জার্মান সেনানায়করা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। শোনা যায় যে, ৬ জুন কিছুতেই আক্রমণ হতে পারে না ভেবে রোমেল ফ্রন্ট ত্যাগ করেছিলেন। তিনি গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন প্যারিস, তাঁর বউয়ের জন্মদিনে উপহার দেওয়ার জন্য এক জোড়া জুতো কিনতে। সেই রাতে, সেই চরম দুর্যোগের মধ্যেই নর্মান্ডির উপকূলে ব্রিটিশ-আমেরিকান-কেনেডিয়ান-ফরাসি যৌথ ফৌজ নেমে পড়ল। শুরু হয়ে গেল লড়াই।

এই যুদ্ধে পরাজয়ের মূলে কারণ প্যানজার বিমান বাহিনী পাঠাতে হিটলারের দ্বিধা। নর্মান্ডি উপকূলে রোমেলের সেনাপতিত্বে জার্মান প্রতিরোধ শক্তি মোটেই দুর্বল ছিল না। কিন্তু হাতাহাতি যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই মিত্রপক্ষের বিমান বাহিনী অনেক দূরত্ব পর্যন্ত উড়ে গিয়ে জার্মানদের সাপ্লাই লাইন ছিন্ন করে দিল। পূর্ব পরিকল্পনা মতন ধ্বংস করে দেওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ সেতু, রেললাইন ও সড়ক। বিমান থেকে বোমা বর্ষণে স্বয়ং সেনাপতি রোমেল গাড়ি উলটে আহত হলেন।

আড়াই মাস পরে আইসেনহাওয়ারের বাহিনী মার্চ করে ঢুকল প্যারিস শহরে। জার্মান কবল থেকে প্যারিস মুক্ত হল পঁচিশে অগাস্ট। বিশ্ববিখ্যাত রূপসি এই নগরীতে কখনও বোমাবর্ষণ হয়নি, জার্মানরা এর কোনও ক্ষতি করেনি।

সেনাপতি রোমেলও এরপর বেশিদিন বাঁচেননি। বোমার আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেও তিনি জড়িয়ে পড়লেন এক হিটলার বিরোধী ষড়যন্ত্রে। জার্মানির কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ও কয়েকটি সেনানায়ক জার্মানপক্ষে যুদ্ধের অধোগতি দেখে হিটলারকে খুন করে বার্লিনে একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপনের সংকল্প নিয়েছিল গোপনে। কর্নেল স্টেফেনবার্গ ব্রিফকেসের মধ্যে একটা বোমা লুকিয়ে

নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন হিটলারের চেয়ারের তলায়। কিন্তু জার্মানির পাপের ভারা পূর্ণ হতে আরও কিছুদিন বাকি ছিল, আরও কিছুদিন হিটলারের উৎপাত সহ্য করা ছিল এই পৃথিবীর নিয়তি। বোমাটা ফাটল ঠিকই, তবু হিটলারের গায়ে আঁচড় লাগল না। যুদ্ধের সেই দুঃসময়েও হিটলার প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা করেনি, শত শত অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। রোমেলের প্রতি হিটলার সামান্য দয়া দেখিয়েছিল অবশ্য। রোমেলের বাড়িতে হিটলারের দু'জন দূত গিয়ে জানায় যে, রোমেল যদি স্বেচ্ছায় বিষ খেতে রাজি থাকেন তা হলে কেউ কিছু জানবে না। আর তা না হলে রোমেলকে গুলি করে মারা হবে, তার বউ-ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকের পরিবার হিসেবে নিক্ষেপ করা হবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। নিজের বাড়ির বাগানে গিয়ে রোমেল বিষ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

হিটলারের নাতসিবাহিনীর পতন হতে আর বেশি দিন লাগেনি। প্রকৃতপক্ষে জার্মানির পরাজয় সূচিত হয় এই নর্মান্ডি উপকূলেই।

ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এলাম আরোমাঁস নামে একটি জায়গায়। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা সংগ্রহশালা আছে। যুদ্ধের সময়কার বহু ছবি, বহু প্রতীক, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনিকদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র সাজানো, তবে বর্ণনায় শুধুই মিত্রপক্ষের জয়গাথা, রোমেল কিংবা অন্য কোনও জার্মান সেনানীর উল্লেখমাত্র নেই।

বাদল এক সময় বলল, যথেষ্ট যুদ্ধ হয়েছে ভাই, আর ভালো লাগছে না!

কুমকুম আর স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাল। সুদূর ইতিহাসের অনেক দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদ দেখলে আমাদের রোমাঞ্চ হয়, আমরা সাধ করে দেখতে যাই। যদিও সেই সব জায়গাতেও অনেক যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা চলেছে এক সময়। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বড়ই কাছাকাছি সময়ের, এর বীভৎসতা আমাদের স্মৃতিতে এখনও দগদগে হয়ে আছে। তা ছাড়া বিশাল কোনও দুর্গ কিংবা রাজপ্রাসাদের একটা দৃশ্যত মহিমা আছে, বাংকার, সুড়ঙ্গ, ভাঙা জেটি ও আধো-ডোবা জাহাজে তো নেই। বেশিক্ষণ এখানে ঘোরাঘুরি করতে ভালো লাগার কথা নয়।

সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, এবার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে আমরা যাব একটা পবিত্র স্থানে। সমুদ্র উপকূল ছেড়ে আমাদের গাড়ি ঘুরল স্থলভূমির দিকে। সাঁ লো, কুতাঁস, গ্রাঁভিল, অভরাঁস এই সব ছোট ছোট শহর পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম মঁ-সাঁ-মিশেল-এর কাছাকাছি। আবার সমুদ্রতীর।

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর মানে সন্ত মাইকেলের পাহাড়। সত্যি সেটা একটা পাহাড়, অনেক সময় স্থলভাগের সঙ্গে জুড়ে থাকে, আবার কোনও কোনও সময় সমুদ্র এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন সেটা হয়ে যায় সমুদ্রের মধ্যে একটা পাহাড়-দ্বীপ, এবং এই গোটা পাহাড়টাই একটা গির্জা। স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে বিশ্বের একটি বিস্ময়।

গাড়ি রাখতে হয় অনেকটা দূরে। মাঝখানের জায়গাটা সমুদ্র তার জিভ দিয়ে হঠাৎ কখন চেটে নেবে, তার কোনও ঠিক নেই। এমনও হয়েছে, সমুদ্রের স্রোতে বেশ কিছু গাড়ি ভেসে যাচ্ছে। গাড়ি পার্ক করতে অসীমকে বেশ হিমসিম খেতে হল। এটা শুধু দর্শনীয় স্থান নয়, তীর্থস্থান। প্রতিদিন বহু মানুষ আসে, তাই গাড়িতে গাড়িতে ধূল পরিমাণ।

এখন ভাটার সময়। জল সরে গেলেও পাহাড়ের সামনের মাটি ভিজে ভিজে। জুতো রেখে আসা হয়েছে গাড়িতে। প্রধান ফটক দিয়ে ঢোকার সময় অসীম বলল, অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিন্তু, পারবে তো।

অসীমের ধারণা আমরা যারা বিদেশে থাকি না, তারা অলস প্রকৃতর। ধারণাটা খুব একটা মিথ্যে নয়, আমরা আলস্য ভালোবাসি তো বটেই। আমাদের তুলনায় এদেশে যারা সচ্ছল অবস্থায় থাকে, তাদের যথেষ্ট খাটতে হয়। কিন্তু বেড়াতে বেরুলে আমরা অকুতোভয়। মহিলা দুটির খুবই উৎসাহ। পাহাড়ে ওঠার সময় মনে মনে ভাবি, ওঃ, নামবার সময় কী আরামই না লাগবে! এই চিন্তা করলেই ওঠার পরিশ্রম বা কষ্ট অনেকটা কমে যায়।

আমাদের দেশে পাহাড়ের মাথায় মন্দির তো আকছার। বিহারে প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়াতেই নৈবেদ্যর ওপর গুজিয়ার মতন একটা করে মন্দির থাকে। বহু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া ও পুণ্য অর্জন করা আমাদের তীর্থযাত্রীদের অবশ্যকর্তব্য। নেপালে আছে এরকম সিঁড়ি ভাঙা মন্দির। দক্ষিণ ভারতে আছে শ্রাবণবেলগোলা। কিন্তু আগে যা হয়েছে হয়েছে, গত এক হাজার বছরে আমাদের দেশে আর তেমন বিস্ময়কর, সুন্দর মন্দির তৈরি হয়েছে কই? পুণ্য অর্জনের প্রবল স্পৃহা না থাকলে হাজার-দু'হাজার সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের ওপর উঠে মন্দিরগুলো দেখলে মনে হয় পণ্ডশ্রম!

মঁ-সাঁ-মিশেল গড়া হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে। শুধু গির্জা হিসেবে নয়। দু-একবার দুর্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। রাজশক্তির সঙ্গে যাজকদের লড়াইয়ের সময় কোনও রাজা এটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারেননি। বহু শতাব্দী ধরে এটাকে সাজানো হয়েছে। যারা একেবারে চূড়ায় উঠতে পারবে না, তাদের জন্যও বিভিন্ন ধাপে দর্শনীয় রয়েছে অনেক কিছু। তীর্থের পুণ্য এবং প্রকৃতিদর্শন একসঙ্গে হতে পারে। প্রত্যেক ধাপেই গির্জার একটি অংশ, রঙিন চিত্রিত কাচের দেওয়াল, যিশু ও কুমারী মেরির অনেক রকমের মূর্তি। তীর্থ যাত্রীদের মন সাধারণত দ্রব অবস্থায় থাকে, তাদের যে-কোনও জিনিস গছিয়ে দেওয়া অনেক সহজ। এখানে নানান খাবারের দোকান ও সস্তার খেলনার দোকান রয়েছে। কিছু কিছু অভিনব বস্তুও পাওয়া যায়। কুমকুম বেছে বেছে একটা পাথরের পুতুল কিনে ফেলল, দিনে ও রাতে যেটার রং বদলে যায়। সে কিন্তু ঠকেনি, ছাতা মাথায় ইস্কুলযাত্রী বালকের সেই মূর্তিটি আজও রং বদলায়। স্বাতী ওর থেকেও ভালো কিছু কেনবার ইচ্ছেয় তখন কিনল না, শেষ পর্যন্ত আর কিছু কেনাই হল না।

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর এমন চমৎকার পরিবেশে আমাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটে গেল।

এখানে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে নানা জাতের মানুষ আসে। এরই মধ্যে এক দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা আমাদের দেখে খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর কাছে এসে বললেন, তোমরা ভারতীয়? কলকাতা থেকে এসেছ?

আমরাও অবাক। আমাদের চেহারায় ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট হলেও কী করে বোঝা গেল আমরা কলকাতা থেকে এসেছি?

আমরা সম্মতি জানাতেই মহিলাটি হাতের একটা বই তুলে দেখিয়ে ঝাঁজালো গলায় বললেন, আমি লাপিয়ের-এর লেখা 'দা সিটি অফ জয়' বইখানা পড়ছি। কলকাতা একটা গরিব আর ভিখিরিদের শহর। মাদার টেরিজা সেখানে গরিবদের সেবা করে চলেছেন, তোমরা তাঁকে সাহায্য না করে বিদেশে বেড়াতে এসেছ কেন?

মহিলা এমন জোরে জোরে বললেন যে, আশপাশের অনেকে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি কথা বলছেন ঝড়ের বেগে ফরাসি ভাষায়, তাই তাঁকে উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। নইলে বলার ছিল অনেক। এই লাপিয়ের-এর মতন সম্ভ্রান্তজাতের লেখকরা কলকাতাকে বিষয়বস্তু বেছে নেয়, এর দারিদ্র্য বিক্রি করার জন্য। ইদানীং দারিদ্র্যের বর্ণনা পড়ে ধনী শ্বেতাঙ্গরা মেসোকিস্টিক আনন্দ পায়। লাপিয়ের-এর বইখানা পড়লে মনে হয় কলকাতায় কুষ্ঠরোগী, রিক্সাওয়ালা ও শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাদের মধ্যমণি মাদার টেরিজা ছাড়া আর কিছু নেই। মাদার টেরিজা আমাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধেয়া, তিনি মূর্তিমতী করুণা, অনাথ-আতুরদের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর সংস্থাই একমাত্র কলকাতার দুঃস্থদের সেবা করছে, এমন যে একটা রটনা হয়েছে পৃথিবীতে, এরকম মিথ্যে আর হয় না। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি তুচ্ছ? বেশি দিন আগের কথা নয়, গত শতাব্দীতেই লন্ডনে বারবনিতার সংখ্যা ছিল আশি হাজার, রাজা চতুর্থ হেনরি যখন প্যারিস আক্রমণ করে তখন প্যারিসের এক লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভিখিরির সংখ্যাই ছিল তিরিশ হাজার। আজও নিউ ইয়র্ক শহরে ভিখিরি ও ভবঘুরের

সংখ্যা দিল্লির চেয়ে কম নয়। এরকম আরও অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা ওইসব দেশের এরকম শুধু খারাপ দিকটা তো কখনও দেখি না।

আমার ভাষায় না কুলোলেও অসীম এবার মুখ খুলল। অসীম আমাদের কাছে দেশের অনেক সমালোচনা করলেও অন্যদের মুখে দেশের নিন্দে শুনলে চটে ওঠে। কারুকে অপমান করতে গেলে তার মুখের চেহারা হয়ে যায় অত্যন্ত ভদ্র ও বিনীত। প্রতিটি শব্দ বলে মেপে মেপে। লম্বা শরীরটাকে সে আরও খানিকটা উন্নত করে মহিলার সামনে বলে দাঁড়িয়ে অসীম বলল, বঁ ঝুর মাদাম, আপনি ফরাসি দেশের কোন অঞ্চল থেকে আসছেন? আপনি কলকাতা সম্পর্কে একটা বই পড়ছেন, খুব ভালো কথা। আপনি কি ভারত বিষয়ে আর কোনও বই পড়েছেন? আপনি কি রোমাঁ রলাঁর নাম শুনেছেন?

ভদ্রমহিলার থতোমতো ভাব দেখেই বোঝা গেল, উনি সস্তা সাহিত্য ছাড়া কিছু পড়েন না।

অসীম আমাদের দেখিয়ে বলল, এঁদের মধ্যে একজন বাংলা ভাষার লেখক ও আর একজন খুব বড় প্রকাশক। আপনার কি ধারণা আছে, বাংলা ভাষায় কত লোক কথা বলে? ফরাসিদের অন্তত দ্বিগুণ। এঁদের তুলনায় ফরাসিদেশের অনেক সামান্য লেখক বা প্রকাশক যখন যেখানে খুশি যায়, তা হলে এঁরা আপনার দেশে আসতে পারবেন না কেন?

ভদ্রমহিলা অসীমের মুখে নির্ভেজাল ফরাসি শুনেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এই সব প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে তো-তো করতে করতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

যেন কিছুই হয়নি, এই ভঙ্গিতে অসীম বলল, চলো, এবার একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।

আমি ভাবলাম, ভাগ্যিস এই সময় ভাস্কর নেই। তা হলে ও নিশ্চয়ই মহিলাটিকে কাঁদিয়ে ছাড়ত। থাক, যতটুকু হয়েছে, তাই-ই যথেষ্ট।

॥ ৩০ ॥

"সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দুঃখিত ঘড়ি
রানি পরিশ্রম করছেন একই ইংরেজের সঙ্গে
আর মাছধরা শান্তির জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের অভিভাবক
ব্যঙ্গনাট্যের বীরপুরুষ, তার সঙ্গে মৃত্যুর বোকা হাঁস
কফির সাপের সঙ্গে এক চশমা পরা কারখানা
দড়ির খেলার শিকারির সঙ্গে এক বহুমুন্ডের নর্তকী
ফেনার সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এক অবসরপ্রাপ্ত তামাকের পাইপ
কালো পোশাকে সজ্জিত এক পেছন-নোংরা শিশুর সঙ্গে
একটি নিকার বোকার পরা ভদ্রলোক
ফাঁসিকাঠের গান লেখকের সঙ্গে একটি গায়ক পাখি
বিবেক সংগ্রাহকের সঙ্গে এক সিগারেটের টুকরোর পরিচালক
বাংলাদেশের একটি কচি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একটা
ধর্মীয় মঠের বাঘ..."

—জাক প্রেভের

ওপরের এই কবিতাটি প্রথমে পড়লে মনে হবে, উদ্ভট, অর্থহীন। কিন্তু যদি মনে করিয়ে দেওয়া যায় যে, কবিতাটির নাম শোভাযাত্রা, কোনও এক জায়গায় জড়ো হয়েছে অসংখ্য মানুষ,

বিচিত্র তাদের পোশাক ও চরিত্র, কবি সেগুলিই খানিকটা উলটে-পালটে দিয়েছেন, তা হলে বুঝতে আর খুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মূল ভাষায় অনেক রকম শব্দের খেলা থাকে, একই শব্দের প্রয়োগ অনুযায়ী অর্থ বদলে যায়, এসব অন্য ভাষায় আনা প্রায় অসম্ভব। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, 'চশমা পরা কারখানা'টা আবার কী বস্তু? কারখানার মূল শব্দটা হচ্ছে Moulin, মূল্যাঁ ইংরিজিতে যেমন 'মিল'। প্যারিসের বিখ্যাত নাইট ক্লাবের নাম মূল্যাঁ রুজ, তার কারণ ওই লাল রঙের বাড়িটিকে দেখতে একটা উইন্ড মিলের মতন। এই মূল্যাঁ শব্দটার আর একটা মানেও আছে। 'মূল্যাঁ আ পারোল' বললে বোঝায় কোনও বকবকানি মেয়ে। তা হলে চশমাটা আর বেমানান হয় না।

খুবই জনপ্রিয় এই কবি নানারকম ইয়ার্কি-ঠাট্টা ও সূক্ষ্ম বিদ্রূপের কবিতা লিখেছেন অনেক। তাঁর বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য হল পুরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ, অর্থাৎ যাদের হাতে সাধারণ মানুষ নিয়মিতভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছে। এইসব চরিত্রের উল্লেখ তাঁর অনেক কবিতায় আছে, এবং এই কবিতাটিতে রয়েছে একটি বাঙালি মেয়ের কথা। সে আবার সন্ন্যাসিনী!

মঁ-সাঁ-মিশেল-এর পাহাড়-গির্জা চূড়ায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে-উঠতে বহু রকমের মানুষ দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিল জাক প্রেভের-এর ওই কবিতাটির সঙ্গে এখানকার এই চরিত্রের মিছিলের যেন বেশ একটা মিল আছে। নানা জাতের মানুষের মধ্যে কোনও যুবতী বাঙালি সন্ন্যাসিনী নেই বটে, কিন্তু শাড়ি পরা দু'জন বঙ্গললনা তো রয়েছে! অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায়। আমি সাহেব বন্ধুদের মুখে শুনেছি, সেলাইবিহীন বারো হাত লম্বা একটা রঙিন কাপড় ভারতীয় মেয়েরা কী করে গায়ে জড়িয়ে রাখে, কখনও হঠাৎ খুলে পড়ে যায় না, এটা তাদের কাছে একটা বিস্ময়।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে এলাম একেবারে চূড়ায়। এখানে রয়েছে একটি গম্ভীর, সুন্দর মনাস্টারি। আর একটা নাম লা মারভেই, বা বিস্ময়। পবিত্র স্থানকে, তীর্থ স্থানকেও অতি মনোহরভাবে সাজিয়ে রাখার কৃতিত্ব খ্রিস্টানদেরই বেশি প্রাপ্য। অষ্টম শতাব্দীতে এক বিশপ সন্ত মাইকেলকে দৈব-দর্শনের পর এই মনাস্টারিটি বানিয়ে ছিলেন। তারপর এর অনেক রূপান্তর ঘটেছে অবশ্যই। ইংরেজ-ফরাসিদের শতবর্ষের যুদ্ধের সময় এটা খানিকটা দুর্গের কাজ করে। ফরাসি বিপ্লবের সময় যখন গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হচ্ছিল, তখন এই মঠটিও বড়ো দুরবস্থায় পড়েছিল। নেপোলিয়ান এমন চমৎকার জায়গাটাকে বানিয়ে ফেলেছিলেন একটা জেলখানা। মাত্র সওয়াশো বছর আগে ফরাসি সরকার এই জায়গাটিকে একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ফ্রান্সে যারা বেড়াতে যায়, তাদের কাছে মঁ-সাঁ-মিশেল অবশ্যদ্রষ্টব্য।

নানার ভাষার টুরিস্ট গাইডরা সব জায়গা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখায়। আমরা গাইড নিইনি, বিশাল বিশাল হলগুলি দেখছিলাম ঘুরে-ঘুরে। বাঙালিদের স্বভাব অনুযায়ী আমি আর বাদল একটু জোরে-জোরে কথা বলছিলাম, একজন এসে আমাদের ধমক দিয়ে গেল। বেশি আওয়াজ করলে এখানকার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে হয়। সন্ত মাইকেলের মূর্তি আমাদের দিকে শান্তভাবে চেয়ে আছেন।

একসময় আমরা এসে দাঁড়ালাম বাইরের পাঁচিলের কাছে। অনেক নীচে সমুদ্র। আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে-আস্তে বড় বড় ঢেউগুলি যেন অতিকায় প্রাণীর মতন ডাঙার দিকে এগোচ্ছে। সরে সরে যাচ্ছে বেলাভূমির পাখির ঝাঁক। এরকম উঁচু জায়গা থেকে আগে কখনও সমুদ্র দেখিনি। সব কিছুর মধ্যে যেন রয়ে গেছে এক কালাতীত মহিমা।

স্বাতী আর কুমকুম নামতে চায় না। তারা আরও অনেকক্ষণ থাকতে চায়। কিন্তু জল বাড়ছে, অসীমের ভয়, তার গাড়িটা না ডুবে যায়। নামার সময় হালকা শরীরে আমরা তরতরিয়ে নীচে চলে এলাম। এই দ্বীপেই সরু সরু রাস্তার দুপাশে কিছু হোটেল রয়েছে, তার কোনও একটাতে রাত্রি বাস করা যায় কি না, তার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, সবকটাই তীর্থযাত্রীতে ভরতি।

দ্বীপটি ছেড়ে যেতে যেতেও আমরা বরাবর পেছন ফিরে তাকাই। এক এক জায়গা থেকে এক এক রকম দেখায়। দেখে-দেখে আশ মেটে না।

দোভিল-এর কাছে ইংলিশ চ্যানেলের রূপ তেমন দৃষ্টিনন্দন ছিল না, এদিকে ক্রমশ নীল জলরাশির রূপ খুলছে, আমরা যাচ্ছি আটলান্টিকের দিকে।

পথে কাংকাল নামে এক একটা জায়গায় থামা হল। আবার ঝিনুক!

আমাদের দীঘার আগে জনপুট নামে একটা জায়গা দেখেছি, যেটাকে বলা যায় একটা মৎস্যবন্দর। সে রকম কাংকাল-কেও বলা যায় একটা ঝিনুক-বন্দর, এখানে অনেকেই ঝিনুক ধরার কারবার করে। এ ঝিনুকের চেহারা আবার অন্যরকম। সমুদ্র কোথায় যে কী ওগরাবে তার ঠিক নেই। আমরা ছোট-বড় সব কিছুকেই ঝিনুক বলি, কিন্তু সাহেবরা বিভিন্ন আকৃতির আলাদা-আলাদা নাম দিয়েছে। এ ঝিনুকের নাম ইংরিজিতে অয়েস্টার, ফরাসিতে উইত্র (Huitre), লম্বায় প্রায় এক বিঘৎ, ওপরটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মতন, ভেতরটা মহার্ঘ আয়নার মতন ঝকঝকে। এই ঝিনুকের খোলা অনেকে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে আর ভেতরের জিনিসটা বেশ মূল্যবান খাদ্য।

রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই, এই ঝিনুক কাঁচা খাওয়ার অতি উত্তম ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। জ্যান্ত ঝিনুক ধরে বড় বড় জালের খাঁচায় ভরে সেগুলিকে ডুবিয়ে রাখা হয় সমুদ্রের হাঁটুজলে। এ রকম খাঁচা দেখা যায় হাজার হাজার। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী জেলেনীরা সেগুলো বিক্রি করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আমরা কৌতূহলবশে জলের কিনারায় খাঁচার মধ্যে জিওল মাছের মতন পুরে রাখা জ্যান্ত ঝিনুক দেখতে গেলাম। তারপর আমারই প্রথম সাধ হল একটা চেখে দেখার।

স্বাতী চোখ বড় বড় করে বলল, এই তুমি জ্যান্ত ঝিনুক খাবে?

আমি বললাম, ঝিনুক তো চিংড়িমাছের মতনই এক ধরনের জলের পোকা। চিংড়ির গায়ে খোসা আছে, এদের খোলসটা আরও শক্ত এই যা। চিংড়ি মাছ আমরা সবাই আহ্লাদ করে খাই, ঝিনুক খেতে আপত্তির কী আছে?

স্বাতী বলল, চিংড়ি মাছ কি আমরা জ্যান্ত খাই নাকি?

আমি বললাম, অন্য লোকরা যখন জ্যান্ত খায়, তখন খুব একটা অখাদ্য হবে না নিশ্চয়ই। একটু মুখে দিয়ে টেস্ট করে দেখব, খারাপ লাগলে বাকিটা খাব না। আমার যে-কোনও নতুন খাবার পরীক্ষা করতে ভালো লাগে।

অসীম বলল, কী করে খেতে হবে বলে দিচ্ছি। ওই দ্যাখো একটা মেয়ে লেবু বিক্রি করছে। আগে কয়েকটা লেবু কিনে নাও। তারপর ঝিনুক কেনো। তবে বোধহয় একটা দেবে না। এক ডজন কিনতে হবে।

তা শুনেই বাকি সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, অ্যাঁ? এক ডজন? অত কে খাবে? শুধু শুধু পয়সা নষ্ট হবে।

বাদল আমাকে সমর্থন করে বলল, আহা ইচ্ছে হয়েছে যখন, খেয়ে দেখুক না! কতই বা লাগবে।

প্রকাশকের সমর্থন পেলে লেখকের আর ভয় কী! আমি বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম।

যে-মেয়েটি লেবু বিক্রি করছে, সে সবচেয়ে সুন্দরী। ঠিক যেন রূপকথার ফুলওয়ালি। আসলে সে রূপসি নয়, তার নাক-ঠোঁট ল্যাপা-পোঁছা যাকে বলে, কিন্তু মুখখানা অদ্ভুত সারল্যমাখা, মাথার চুল একটা গোলাপি রঙের স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা, গভীর বিস্ময়ে সে দেখছে আমাদের। সমুদ্রের ধারে তাকে খুব মানিয়ে গেছে।

ঢাকাই রাজভোগ সাইজের দু'খান পাতিলেবু কিনলাম চার টাকায়।

এবার গেলাম ঝিনুকের দর করতে। বিভিন্ন খাঁচায় বিভিন্ন সাইজের ঝিনুক। সবচেয়ে বড়গুলোর দামই বেশি। খাব যখন ঠিক করেছি, সবচেয়ে ভালোটাই খাব। এক ডজন ছত্রিশ টাকা।

অসীম বলল, দোকানে গিয়ে খেলে এর দশগুণ দাম পড়ত, এখানে জেলেদের কাছ থেকে কেনা বলেই অনেক সস্তা পড়ছে।

জেলেনি একটা ছুরি দিয়ে মাঝখানে চাড় দিয়ে ঝিনুকের মুখ খুলে দিল। ভেতরের প্রাণীটা নড়াচড়া করছে। তার ওপর কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ফেলতেই সেটা মরে যায়।

যেন খুব একটা নিষ্ঠুর কাজ করা হচ্ছে, এই ভঙ্গিতে স্বাতী বলল, ইস্!

আমি বললাম, জ্যান্ত কই মাছ যখন বঁটি দিয়ে কাটা হয়, তখন কি কেউ ইস্ বলে? মরা কই মাছ কেউ কেনে না কেন?

জেলেনি একটা কাঠের চামচও দিল। সেটা দিয়ে তুলে খানিকটা মুখে দিলাম। অন্যরা গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে, যেন আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। আমি বললাম, অপূর্ব! অপূব!

সত্যিই তাই। আসল ঝিনুকটির স্বাদ নোনতা, তার সঙ্গে লেবুর রস মিশেছে। টক নোনতার মিশ্রণ আমার সব সময় প্রিয়। লেবুর আচার, কাঁচা আম মাখা, নুন-তেঁতুল এগুলোর কথা মনে এলেই জিভে জল আসে। একটা শেষ করেই আমি বললাম, আর একটা দাও!

অসীম হাসছে। দু'দশকের বেশি এদেশে থেকে সে প্রায় ফরাসি বনে গেছে, সে তো জানেই এটা অতি উত্তম খাদ্য। আগে অন্যদের কিছু বলেনি। এবার সেও খেতে শুরু করল।

আমি বাদলকে জিগ্যেস করলাম, কী, চলবে না?

বাদল আমতা-আমতা করে একটা নিল বটে, মুখেও দিল, কিন্তু খুব যেন উপভোগ করল না।

স্বাতী ছোঁবেই না জানিয়ে দিয়েছে। কারণ খোলার ভেতরে জিনিসটাকে দেখতে হড়হড়ে, সিকনির মতন, দেখেই তার ঘেন্না লাগছে।

কুমকুমও খাবেই না ধরে রেখেছিলাম, তবু জিগ্যেস করলাম, তুমিও ভয় পাচ্ছ?

কুমকুম বলল, সে মোটেই ভয় পায় না। এত মানুষ খাচ্ছে যখন, তখন ভয় পাওয়ার কী আছে?

একটা ঝিনুক তুলে দেওয়া হল কুমকুমের হাতে। সে দিব্যি খেয়ে নিল। আর একটা নিতেও তার আপত্তি নেই।

আমি বললাম, এই, তুমি তা হলে আগের দিন ওই ঝিনুকগুলো খাওনি কেন?

কুমকুম হেসে বলল, ওগুলো যে ওয়াইন-মোয়াইন দিয়ে সেদ্ধ করা ছিল!

দেখতে দেখতে এক ডজন শেষ। আমি বললাম, লাগাও আরও এক ডজন!

তারপর আরও এক ডজন।

বাদল রণে ভঙ্গ দিয়েছে, কুমকুম, অসীম ও আমি চালিয়ে যাচ্ছি। ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়ার মতন, সমুদ্রের ধারে এই ঝিনুক খাওয়ার নেশা লেগে গেল আমার।

আমাদের খাওয়ার পর্ব চলছে, এমন সময় একটা টুরিস্ট বাস এসে থামল কাছেই। সামনের লেখা দেখে বোঝা যায় বাসটা আসছে ইতালি থেকে। বাস থেকে একদল নারী-পুরুষ নামল। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে তারা অবাক। ছুরির চাড় দিয়ে এক একটা ঝিনুক খোলা হচ্ছে, তাতে লেবুর রস মিশিয়ে চামচে দিয়ে সুরুত করে খেয়ে ফেলছি। ওদের কয়েকজন এগিয়ে এসে চোখ গোল গোল করে দেখল, তারপর একজন জিগ্যেস করল, তোমরা এসব কী করছ?

বোঝা গেল, ওরা যেখান থেকে এসেছে, ইতালির সেই সমুদ্রে এরকম অয়েস্টার বা উইত্র ওঠে না, ওরা ঝিনুক খেতে জানে না। কিংবা ওরা বোধহয় ভাবছে, শুধু ভারতীয়রাই এ রকম কাঁচা ঝিনুক খায়।

আমি একজনকে বললাম, খেয়ে দ্যাখো না, খুব ভালো!

এরপর মনে হল, ওই ইতালিয়ানদের দলেও একজন করে স্বাতী-কুমকুম-অসীম-বাদল-সুনীল

আছে। কোনও মেয়ে ঠোঁট উলটে ঘেন্না প্রকাশ করল, কেউ বলল, একটু চেখে দেখতে পারি, কেউ মতামতই প্রকাশ করল না, কেউ বেশি উৎসাহ দেখাল। প্রথমে একজন দুজন আরম্ভ করল। তারপর গুটি গুটি করে এগিয়ে এসে অন্য কয়েকজনও যোগ দিল, আমাদের দিকে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলল, ভালো! ভালো!

ইতালিয়ানদের সেখানে রেখে আমরা ফিরে এলাম গাড়িতে।

সন্ধে হয়ে এসেছে' পাতলা একটা চাদরের মতন অন্ধকার নেমে আসছে সমুদ্রের জলে। আকাশের এখানে-ওখানে রঙের ঝিলিক। এই নিরিবিলি ক্ষুদ্র বন্দরটিতে ক্রমশ শব্দ কমে যাচ্ছে। হোটেল পাওয়া যায় সর্বত্র, আমার ইচ্ছে হল এখানেই কোথাও থেকে যেতে। স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি এখানে থেকে বুঝি আরও ঝিনুক খেতে চাও? তা চলবে না।

অসীমও একেবারেই রাজি নয়। অন্তত আরও পাঁচ জায়গা গিয়ে অন্তত পনেরোটা হোটেল না দেখে সে সিদ্ধান্ত নেবে না। অসীমের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে এইটি উপরি পাওনা। থাকা হয় একটি হোটেলে, কিন্তু দেখা হয় অনেক।

সমুদ্রের ধারে ধারে পরপর ছোট ছোট শহর, তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা সাঁ মালো, সেখানে এমন একটি হোটেল পছন্দ হল, যেটি সমুদ্রের একেবারে গায়ে। হোটেলের একদিকের দরজা সমুদ্রের দিকে, অন্যদিকের দরজা শহরে। পাশাপাশি এত হোটেল দেখলে বোঝা যায়, এখানে খুবই টরিস্টের সমাগম হয়, কিন্তু এখন হালকা সময়।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে অসীমের ক্লান্তি ও অবসাদ আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমরা কেউ তাকে সাহায্য করতে পারব না, বাদল ভালো গাড়ি চালায় বটে কিন্তু রাস্তার ডান পাশ দিয়ে গাড়ি চালাবার অভ্যেস তার নেই, সেইজন্য অসীম ভরসা করে তার হাতে স্টিয়ারিং ছাড়বে না। অসীম অবশ্য এতখানি গাড়ি চালাবার পরেও বিরক্তি প্রকাশ করে না, স্নান-টান সেরে আবার ফিটফাট হয়ে আসে। আমাদের হোটেলে রান্নার ব্যবস্থা নেই, আমরা পায়ে হেঁটে রেস্তোরাঁ খুঁজতে বেরোই।

খুব সাজানো-গোছানো, বড় রেস্তোরাঁর বদলে ছোটখাটো কোনও জায়গাই আমাদের পছন্দ হয়। সাধারণত একজোড়া স্বামী-স্ত্রী এইরকম ছোট দোকান চালায়। তারাই রান্না করে, তারাই পরিবেশ করে এবং কাছে এসে গল্পগুজব করে। আমাদের দেশের বড়ো হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে সবাই বেশি গম্ভীর। বেয়ারা-স্টুয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাইকেই কেউ যেন হাসতে নিষেধ করে দিয়েছে, তাদের বিনয়ের মধ্যেও ভুরু-তোলা ভাব। আমরা যেখানে এলাম, সেই রেস্তোরাঁটা চালায় এক গ্রিক দম্পতি, তারা দুজনেই আমাদের টেবিলে শাড়ি পরা নারী দুটিকে দেখে নানা রকম গল্প জুড়ে দিল।

খাদ্যতালিকাটি দেখে-দেখে অসীম আমাদের বুঝিয়ে দেয় কোনটা কী ব্যাপার। কুমকুম তার নামের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে কুশকুশ নামে একটা খাবার খুব পছন্দ করে ফেলেছে। কুশকুশ পেলে সে আর কিছু খায় না। মধ্যপ্রাচ্যের এই খাবারটি ফ্রান্সে বেশ জনপ্রিয়। নানারকম সবজি-মেশানো ভাতের মতন একটা জিনিস, খুব সম্ভবত সুজির ভাত। বাদল আর আমি এক একদিন এক এক রকম মাছ বা মাংস রান্না অসীমের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ে দেখি। স্বাতী কিন্তু অসীমের নির্দেশ মানে না, সে নিজেরটা নিজেই বেছে নেয় তালিকা দেখে। অসীম সেটা বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে বলে, না না, ওটা আপনার ভালো লাগবে না। ওটা টিপিক্যাল একটা ফরাসি রান্না। চিজের গন্ধ লাগবে! স্বাতী তবু বলে, হ্যাঁ আমি এটাই নেব। গ্রিক মালিকানী স্বাতীর পছন্দের তারিফ করে বলে, মাদমোয়জেল খুব ভালো বেছেছেন, ওটাই সবচেয়ে ভালো, আমাদের ঘরের তৈরি চিজের রান্না। তার সঙ্গে মাইয়োনেজ।

অসীম তার ভুল ভাঙিয়ে বলে, উনি মাদমোয়াজেল নন, মাদাম, ওই যে ওই মহাশয়ের স্ত্রী।

গ্রিক মালিকানী খানিকটা অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর একটা বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে বলে, আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রীর রুচি অনেক উন্নত।

আমি মনে-মনে বললাম, তুমি তো জানো না, এই মেয়েটি আগের জন্মে ফরাসি মেয়ে ছিল!

নিছক খাওয়াদাওয়াই হয় না, এই সব রেস্তোরাঁর পরিবেশও মনে গেঁথে যায়।

এর পরেও আমরা হোটেলে না ফিরে বেড়াতে লাগলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে। বেলাভূমি থেকে কিনারার রাস্তাটা বেশ উঁচু। যত দূর চোখ যায় সমুদ্রের পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। মাঝে মাঝে সিঁড়ি নেমে এসেছে। এতখানি সমুদ্র-উপকূল বাঁধাতে কত খরচ লাগে! আমাদের দেশে কোথাও এরকম নেই। সমুদ্রের ঢেউ রাস্তার ধারে এসে ধাক্কা মারলেও ক্ষতি নেই, অত উঁচু পাথরের বাঁধ ভাঙবে না।

কিছুক্ষণ পর সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। বালির ওপর দিয়ে আমরা অনেকটা হেঁটে গিয়েছিলাম, জল ছিল বেশ দূরে, ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ঢেউ, আমরা এক এক জায়গায় বসি, আবার পিছিয়ে যাই। ক্রমে যেন ঢেউ তাড়া করতে লাগল। আমরা দৌড়োলাম, উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছলাত ছলাত শব্দ শুনে মনে হয়, ঢেউগুলো খেলাচ্ছলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। কিন্তু জল কতটা উঠতে পারে তা হিসেব করেই এরা পাথরের বাঁধ বানিয়েছে।

রাত্রি গাঢ় হলে জলের ওপর কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা কেটে যায়। তখন চোখে পড়ে সর্বাঙ্গ আলো-ঝলমল জাহাজ। প্রথম জাহাজটি দেখে অদ্ভুত উত্তেজনা হয়। ছেলেবেলায় সন্ধের আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজতাম। একটি, দুটি, তিনটি।

বম্বের সমুদ্রতীরে কিংবা ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গায় রাত্রির জাহাজ দুটি-একটি মাত্র। রাত্রির জাহাজের রূপই আলাদা, কেমন যেন অলীক মনে হয়। এখানে জাহাজ চলাচল অনেক বেশি। এক সময় বহু দূর বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে দশ-বারোটি এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকে। যেন জলধির বুকে হীরের গাছ।

সাঁ মালো-তে আমরা থেকে গেলাম দু-তিনদিন। এখানে দর্শনীয় স্থান তেমন নেই। সমুদ্রই বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখানে আসবার আগে উত্তর ফ্রান্সের সাঁ মালো নামে কোনও জায়গার নামও জানতাম না, দক্ষিণ ফ্রান্সের নিস, আন্তিব, কান-এর মতন এর কোনও খ্যাতি নেই, তবু শান্ত, নির্জন স্থানটির ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গেল। সারাদিন প্রায় কিছুই করি না। শুধু আড্ডা। নিরুপদ্রব আড্ডার মতন এমন ভালো জিনিস আর হয় না, মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

ফেরার পথে আমরা অন্য রাস্তা ধরলাম। মাঝখানে শারত্রের বিখ্যাত গির্জায় একবার উঁকি মেরে সোজা প্যারিস। শারত্রের গির্জার বর্ণনা দিলাম না, একবারের যাত্রায় মঁ-সাঁ-মিশেল-এর মতন একটিই যথেষ্ট।

॥ ৩১ ॥

"সব সুন্দরেরই থাকে শুধু
একটিই বসন্ত
এসো, আমরা সময়ের পদচিহ্নগুলিতে
পুঁতে দিই গোলাপ।"

—জেরার দ্য নারভাল

অনেক লোক যেমন স্ট্যাম্প জমায়, আমি তেমনি নদী জমাই। নদী আমাকে সব সময় টানে। জন্মেছি নদীমাতৃক দেশে, আমার জন্মস্থানের কাছে ছিল দুর্দান্ত আড়িয়েল খাঁ নদী। ছেলেবেলায় দেখেছি, বিশাল পদ্মানদীর চড়ায় কুমিরদের রোদ পোহাতে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মেঘনা নদীর ভয়ংকর সুন্দর রূপ একবার দেখলে জীবনে ভোলা যায় না। যেসব নদীর নাম বহুবার পড়েছি, সেগুলি দেখার জন্য মন ছটফট করে। কৃষ্ণা, কাবেরী, ঝিলম, ব্রহ্মপুত্র এই সব নদীগুলি প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। রবীন্দ্রনাথ রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠেছিলেন, আমি রূপনারায়ণ নদীর ধারে খোলা আকাশের নীচে অন্ধকার রাত্তিরে ঘুমিয়েছিলাম।

সব নদীই আলাদা, আবার একই নদীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ। হরিদ্বারের গঙ্গা, কাশীর গঙ্গা, কাকদ্বীপের গঙ্গা। সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ভলগা নদী দর্শনের পর মনে হয়েছিল, যাক, এতদিনে 'ভলগা থেকে গঙ্গা' দেখা হল! চিন ভ্রমণে গিয়ে ইয়াংসিকিয়াং নদী দেখার খুবই সাধ ছিল, শাংহাই শহর থেকে কিছুটা দূরে, কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল না। ইচ্ছেমতন ঘোরাঘুরির সুবিধে ছিল না, তাই সেই ক্ষোভ আজও রয়ে গেছে।

একবার যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে গিয়েছিলাম এক রাত্রির জন্য। বিমান কোম্পানি হোটেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, পরদিন সকালেই আবার অন্যত্র যাত্রার জন্য বিমান ধরতে হবে। সন্ধের পর হোটেলে পৌঁছেছি সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ, তারপর আর কিছু করবার নেই। অত তাড়াতাড়ি বিছানায় গড়াতে আমার ইচ্ছে করে না। বেলগ্রেডে কারুকে চিনি না, একটা ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বারও নেই। হোটেলটা শহর থেকে বেশ দূরে, ট্যাক্সি নিয়ে শহরে গেলেও রাত্তিরবেলায় আর তো কিছু দেখা হবে না, কিছু হোটেল-রেস্তোরাঁই খোলা থাকবে। তখন মনে হল, অন্য কিছু দ্রষ্টব্য না থাক, নদী তো আছে। এই শহরের পাশ দিয়ে গেছে ড্যানিয়ুব!

ম্যাপ দেখে নিয়ে আমি হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা চেনার দরকার নেই। নদী তো হারিয়ে যাবে না। সোজাসুজি প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে পাওয়া গেল ড্যানিয়ুব নদী, আবার সৌভাগ্যবশত কাছেই একটা সেতু। রাত প্রায় দশটা। কাছাকাছি কোনও মানুষজন নেই, দু-চারটে গাড়ি শুধু ছুটে যাচ্ছে তীব্র বেগে।

আমি সেতুর মাঝামাঝি দাঁড়ালাম। ইতিহাস-বিশ্রুত এই নদী কিন্তু তেমন চওড়া কিছু নয়। কত যুদ্ধ, কত মারামারি কাটাকাটি হয়েছে এই নদীর তীরে, বিশেষ করে বেলগ্রেডের এই অঞ্চলটায়, কিন্তু তখন সে সব কথা আমার মনে পড়েনি। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম এক অপূর্ব সঙ্গীত। আমার গায়ে ওভারকোট, দু-হাতে দস্তানা, কিন্তু কান দুটোতে ঝাপটা মারছিল শীতের বাতাস, খুব শীতেও আমি টুপি মাথায় দিতে পারি না। সেখানে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে লাগলাম এ ড্যানিয়ুব সঙ্গীতের মূর্ছনা। এক সময় পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে নদীর জলে ছুড়ে দিলাম। নদীকে কিছু উৎসর্গ করাই মুসাফিরদের নিয়ম।

রাত্রির অন্ধকারে ড্যানিয়ুব জলের রং বোঝা যায়নি।

বছর তিনেক আগে চেকোশ্লোভাকিয়াতে বাতিস্লাভা নামে একটা শহরে গিয়েছিলাম। কেমন যেন নির্জীব জায়গাটা, মানুষজনের মুখে বিরক্ত বিরক্ত ভাব। তখনও চেকোশ্লোভাকিয়ায় সরকার-বিরোধী প্রবল আন্দোলন শুরু হয়নি। কিন্তু লোকে প্রচণ্ড অসন্তোষ নিয়ে গুমরে-গুমরে উঠছে তা বোঝা যাচ্ছিল। গান-বাজনার জন্য এক সময় এই শহরের খুব খ্যাতি ছিল, বালক মোৎসার্ট এখানেই সম্রাটের সামনে পিয়ানো বাজিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সম্রাট জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কী উপহার চাও? বালক মোৎসার্ট তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, আমি রানিকে বিয়ে করতে চাই। সেই শহরে গান বাজনার কোনও অনুষ্ঠান শোনা হল না। একদিন রেস্তোরাঁয় একজন সঙ্গীতশিল্পী নিজে থেকেই আমাদের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে লাগল।

যাই হোক, সেখানে একদিন গাড়িতে যেতে যেতে শহরের বাইরে একটা নদী পেরুতে হল। আমি বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, আগে খেয়াল করিনি, ব্রিজের শেষ প্রান্তে এসে জিগ্যেস করলাম, এটা কী নদী?

আমাদের গাইড মেয়েটি জানাল, এটা ড্যানিয়ুব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, গাড়ি থামাও। আমি এখানে নামবো!

সরকারি আমন্ত্রণে সফর, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে গাড়ি থামানো যায় না। সব কিছু একেবারে মিনিট-মাপা সময়ে বাঁধা। তবু ড্যানিয়ুব নদীর ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছি, ভালো করে দেখব না?

অন্য কয়েকজন বলল, গাড়িতে বসেই তো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমি তাতেও রাজি হলাম না। গাড়ি থেকে নেমে, ব্রিজের তলা দিয়ে নেমে গেলাম জলের ধারে। এক আঁজলা জল তুলে ছোঁয়ালাম মাথায়।

এবার দিনের আলোয় দেখলাম, ড্যানিয়ুবের জলের রং নীল নয়। ঘোলাটে ধরনের। কাছাকাছি অনেক কারখানার নোংরা গাদ এসে পড়ছে এই নদীর জলে।

আজকাল নদীগুলো সব দেশেই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ড্যানিয়ুব নদীকে কি বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত ছিল না। এ যে পবিত্র নদী। স্বপ্নের নদী। ইয়োহান স্ট্রাউস এই নদীর নামে অমর সঙ্গীত রচনা করেছেন। নিশ্চয়ই স্ট্রাউসের আমলে এই নদীর জলের রং পরিষ্কার, ঝকঝকে নীল ছিল।

পৃথিবীর আর একটি পবিত্র নদী, আমার একটুর জন্য দেখা হয়নি।

আরব দেশের আম্মান শহরে একবার এক হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। বিমান বদলাবার কারণে। বাদল বসু ছিলেন সে যাত্রায়। ঘরে বসে ম্যাপ দেখে বুঝতে পারলাম, পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরেই জর্ডন নদী। এই নদীর বুকে দাঁড়িয়ে সেন্ট জন দা ব্যাপটিস্ট যিশুর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তাকে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই থেকে বিশ্বের সমস্ত খ্রিস্টানদের কাছে এই নদীর জল পবিত্র। প্রত্যেক গির্জায় এই জল রাখা থাকে। হিন্দুরা জন্ম থেকেই হিন্দু, কিন্তু খ্রিস্টান পরিবারের ছেলেমেয়েদের ব্যাপটিজম না হলে তারা খ্রিস্টান হয় না, নবজাত শিশুদের তাই গির্জায় নিয়ে গিয়ে মাথায় জর্ডন নদীর জলের ছিটে দিয়ে আনতে হয়।

কিন্তু অত কাছে গিয়েও জর্ডন নদী দেখা সম্ভব হল না, কারণ আমাদের ট্রানজিট ভিসা, এক রাতের বেশি থাকার উপায় নেই, হোটেলের বাইরেই যেতে দেয় না। জানি না, জর্ডন নদীর জলেও কলকারখানার নোংরা এসে মেশে কি না।

আম্মান বিমান বন্দরে দেখলাম, নানা আকৃতির শিশিতে জর্ডন নদীর জল বিক্রি হচ্ছে। এক সময় আমাদের দেশেও গঙ্গা জলের এরকম চাহিদা ছিল। সমস্ত পুজো-আচ্চায় গঙ্গা জলের প্রয়োজন হত। ভারতের গঙ্গাবর্জিত অঞ্চলগুলিতে বিক্রি হত গঙ্গা জল। কলকাতার আদি যুগে বৈষ্ণবচরণ শেঠ নামে এক ব্যবসায়ী শুধু গঙ্গা জল বিক্রি করেই দারুণ বড়লোক হয়েছিলেন। সিল করা কলশিতে তিনি ভারতের সর্বত্র খাঁটি গঙ্গা জল পাঠাতেন। আমাদের ছেলেবেলাতেও দেখেছি, পূর্ব বাংলা থেকে কেউ কলকাতায় এলে তাকে বলে দেওয়া হত, এক বোতল গঙ্গা জল এনো! এখন গঙ্গা জলের আর মহিমা নেই।

নদী বিখ্যাত হয় তার দু'তীরের সৌন্দর্যের জন্য। দু'পাশে পাহাড় থাকলে সে নদীর শোভা আরও খোলে। এমন নদী তো কম দেখিনি, কোনওটাই অন্যগুলির চেয়ে কম সুন্দর নয়। আমাদের উত্তরবঙ্গেও এমন অনেক চমৎকার নদী আছে। তিস্তা তো বটেই, তা ছাড়া ডায়না নামের নদীটিও আমার খুব পছন্দ।

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ রায়মঙ্গল নদীর বুকে একবার আমি ডিঙি নৌকোয় সারারাত কাটিয়েছিলাম।

পরে শুনেছিলাম, নৌকোডুবির চেয়েও ভয়ংকর ঝুঁকি ছিল ডাকাতের হাতে পড়ার। ওসব জায়গায় কেউ সন্ধের পর নৌকোয় যায় না, সীমান্ত পেরিয়ে ডাকাতরা এসে শুধু নৌকোটা লুঠ করার জন্যই মানুষ মেরে জলে ফেলে দেয়। আমি বৃষ্টি ভিজতে-ভিজতে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলাম। ওসব কথা আমার মনে পড়েনি, ডাকাতদেরও মনে পড়েনি আমার কথা। এখনও সুন্দরবন যাওয়ার পথে রায়মঙ্গল নদীটিকে দেখে সেই রাতটার কথা ভেবে মজা লাগে।

সাসকাচুয়ান নামটি আমার বড় প্রিয়। নামটার মধ্যে একটা ঝংকার আছে, যেমন উত্তর কাছাড়ের জাটিংগা নদীর নাম শুনলেই রোমাঞ্চ হয়। এই সাসকাচুয়ান নদীটি আমি দেখেছি এ কথা যেমন ঠিক, আবার দেখিনি, এমনও বলা যেতে পারে; কানাডার এই নদীটির তীরে আমি যখন দাঁড়াই, তখন প্রবল শীতকাল, পুরো নদীটি ধপধপে সাদা। সমস্ত জল জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে, তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায়, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করছে। জলের স্রোত থাকলে তবেই তো সেটা নদী, বদ্ধ জলাশয়কে তো আর নদী বলা যাবে না। তা হলে আমি কী দেখলাম?

আয়ওয়াতে থাকার সময় আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যেতে হত। খুবই ছোট নদী, কিন্তু বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল হয় না, ভরাভরাই থাকে সারা বছর, শীতের কয়েকটা মাস জমে শক্ত হয়ে যায়। অন্য সময় আয়ওয়া নদীর জলের রং কালো, কিন্তু বরফের রং কালো হয় না। এই একটাই নদী যাকে আমি কালো এবং সাদা, স্রোতস্বিনী এবং স্তব্ধ অবস্থায় দেখেছি। ওই ছোট নদীকেও কতরকমভাবে সাজাবার চেষ্টা। ওই একটা শহরেই নদীর ওপর অন্তত গোটা পাঁচেক সেতু, দু-ধারে নানারকম ফুলের কেয়ারি। মার্গারিট থাকত নদীর এপারে, আমি অন্য পাড়ে, নদী পেরিয়ে প্রতিদিন দেখা হত দুজনের। কখনও কখনও সেতু দিয়ে নদী পার না হয়ে আমি অ্যালেক নামে একটি ছেলের নৌকো ধার নিতাম। অ্যালেক ছবি আঁকত। ভাসমান নৌকোয় বসে ছবি আঁকা ছিল তার খেয়াল। আমি কোনওদিন রোয়িং শিখিনি, পূর্ব বাংলায় কৈশোরে বৈঠা দিয়ে ছোট ডিঙি নৌকো চালিয়েছি কয়েকবার। সেই স্মৃতির ওপর ভরসা করে একলা নৌকো চালাতাম, উলটে গেলেও বিপত্তির কিছু ছিল না। ওইটুকু নদী সাঁতরে পার হতে আর কতক্ষণ লাগে! মার্গারিট সাঁতার জানত না বলে নৌকোয় চাপতে ভয় পেত। তবু দু-একদিন তাকে জোর করে চাপিয়েছি। সেই টলটলে নৌকোয় বসে ভয়মাখা হাসিমুখে মার্গারিট মঁ দিউ, দিউ, ও লালা এই সব শব্দ করত। মার্গারিটের চোখে আমেরিকার চেয়ে ফরাসি দেশের সব কিছুই ভালো। সে বলত, দূর, এটা আবার একটা নদী নাকি? নদী দেখবে আমাদের দেশে গিয়ে, লোয়ার, শের, মাইয়েন...

অনেক বছর পর সেই আয়ওয়া নদীর প্রান্ত দিয়ে স্বাতীর সঙ্গে হেঁটেছি। অনেক কিছুই বদলে গেছে, কিন্তু নদীটার বিশেষ রূপান্তর হয়নি। সব নদীর মধ্যেই যেন একটা চিরন্তন ব্যাপার আছে। স্বাতীও সাঁতার জানে না, তবে সেবারে পরিচিত কারুর নৌকোও পাইনি। ফুলের সমারোহের মধ্য দিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াতাম অনেক রাত পর্যন্ত। যখন যেখানেই যাওয়ার দরকার হোক, অন্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে আমরা নদীকে দেখে যেতাম একবার।

শীতে জমে যাওয়া নদীর ওপর দিয়ে ভরসা করে কখনও হাঁটিনি অবশ্য। হঠাৎ বরফ ভেঙে ভেতরে ডুবে গিয়ে কেউ আর উঠতে পারেনি এরকম অ্যাকসিডেন্টের কথা শোনা যায় মাঝে মাঝে। তবু অকুতোভয় দু-চারটি ছেলেমেয়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে লাফালাফি করে, নাচে, বরফ খুঁড়ে জল বার করে।

বিশাল চওড়া নদী মিসিসিপি দেখে প্রথমবার বেশ হতাশ হয়েছিলাম। একটুও নদী নদী ভাব নেই। তীরের মাটি নেই, কাদা নেই, দু'দিকের পাড় বাঁধানো, দুপুরবেলাতেও কেউ সেখানে অলসভাবে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে না, কেউ স্নান করছে না। স্টিমার আর স্পিড বোটের ছড়াছড়ি, পাল তোলা নৌকো দেখা যায় না একটাও। নদীর সঙ্গে কূলের মানুষের একটা একাত্মতা থাকে, তবেই তো নদীর রূপ খোলে। স্টিমারে চেপে মিসিসিপির বুকে বেশ খানিকক্ষণ ঘুরেছি বটে, কিন্তু মনে তেমন

দাগ কাটেনি। এর চেয়ে পদ্মার রূপ অনেক সুন্দর। চিনের ক্যান্টন শহরের পাশে পার্ল নদী দেখে পদ্মার কথা মনে পড়েছে কয়েকবার। সেই পার্ল নদীর বুকেও অজস্র পাল তোলা নৌকো। শহর ছাড়িয়ে গাড়ির রাস্তায় গেছি অনেক দূর, হঠাৎ হঠাৎ পার্ল নদী কাছে এসে পড়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীটি দেখার সৌভাগ্য আমার আজও ঘটেনি। ছবিতে দেখেছি, সিনেমায় দেখেছি, কিন্তু সশরীরে, স্পর্শের দূরত্বের মধ্যে না দেখলে কি আর সাধ মেটে। দু'পাশে ভয়াল অরণ্য, তার মধ্য দিয়ে ছুটে যাওয়া গর্জমান নদী, আমি মাঝে মাঝে তাকে কল্পনায় দেখতে পাই।

জার্মানির রাইন নদীর জলও দূষিত, কিন্তু দু'দিকের ঢেউ খেলানো পাহাড়, অরণ্য ও টিলার ওপর ছোট ছোট পুরোনো দুর্গ, দৃশ্য হিসেবে বড় সুন্দর।

মিশরের যে নদীটির নাম নাইল, আমরা ছেলেবেলায় ভূগোলে সেটার নাম পড়েছি নীল নদ। কোনটা নদী আর কোনটা যে নদ, তা যে কে ঠিক করে দেয়, কে জানে! এমন সব চমৎকার চমৎকার নামই বা কারা রেখেছিল! আমাদের দেশের একটা ছোট্ট নদীর নাম চূর্ণী নদী, 'ছলো ছলো করে গ্রাম চূর্ণী নদী তীরে' এই লাইনটা আমি আপনমনে অকারণে বারবার আওড়াই শুধু ওই নামটার জন্য। কপোতাক্ষ নামটাও তো মাইকেল মধুসূদন রাখেননি! সাগরদাঁড়ি গ্রামে গিয়ে কপোতাক্ষ নদে নৌকোয় চেপে ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে হয়েছিল, মাইকেলের আগেও এখানে একজন বেশ বড় কবি ছিল, যিনি পায়রার চোখের সঙ্গে তুলনা দিয়ে এই নদীর নাম রেখেছিলেন। আগে এই নদ বা নদীটির কেমন রূপ ছিল তা জানি না, আমি যখন দেখেছি, তখন সেটা বেশ ছোট এবং জলের রং ঘোলাটে। তা হলে তো নামদাতার কল্পনাশক্তির আরও প্রশংসা করতে হয়!

ছেলেবেলায় স্মৃতি এমনই কাজ করে যে কায়রো শহরে গিয়ে আমি নদী দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাইল-এর বদলে নীল নদ বলে ফেলেছিলাম এবং তখনও আমার ধারণা, এই নদের জলের রং নীল। অবশ্যই তা নয় এবং একে নদ বলারও কোনও কারণ নেই। আমাদের দেশের বাইরে আর কোথাও নদীর লিঙ্গভেদ আছে এমন শুনিনি। খ্যাতির জন্যই নাইল-এর তীরে দাঁড়িয়ে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল, নইলে দৃশ্যত এমন কিছু সুন্দর নয়।

সমতলে নদীর জল সাধারণত নীল হয় না, স্বচ্ছও হয় না। নদীর জল ঝকঝক করে পাহাড়ে। পাহাড়ি নদী দেখেছি প্রচুর এবং প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে মনোহর। আসামের জাটিংগা নদীটি আমাকে একবার খুব প্রতারিত করেছে। অনেক বছর আগে, ছোট ট্রেনে চেপে দু'পাশের গাঢ় সবুজ অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে এই দুর্দান্ত নদীটিকে দেখে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিলাম। কী সাংঘাতিক তেজি প্রবাহ। মহানাগের ফণার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঢেউ, যেন হঠাৎ রেল লাইনকেও গ্রাস করে নেবে। তখন আমার ধারণা ছিল নদীটির নাম জাটিংগা নয়, ঝাটিংগা। জ আর ঝ-এর সামান্য তফাতেও ধ্বনিমাধুর্য অনেক বদলে যায়। এখন জাটিংগা নামটা অনেকটা পরিচিত, শুধু নদী নয়, এ নামে একটা জায়গাও আছে। বছরের কয়েকটি মাস সেখানে একটা রহস্যময় ব্যাপার চলে। রাত্তিরবেলা সেখানে আলো জ্বেলে রাখলেই ওপর থেকে ঝপাস ঝপাস করে বড় বড় পাখি এসে পড়ে। সেই পাখি অনেকেই ধরে-ধরে মেরে খায়, তাতেও পাখি আসা কমে না। শুধু ওই জায়গাটিতেই কেন আলো দেখলে অত বড় বড় পাখি আত্মহত্যা করতে আসে, তা এখনও একটা বিস্ময়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেই কৌতূহলীরা আসে 'জাটিংগা বার্ডস' নিয়ে গবেষণা করতে।

আমি যখন প্রথম দেখি তখন জাটিংগার এই পক্ষী-খ্যাতি ছিল না। নামটাও আমি জানতাম ঝাটিংগা। খেলনার মতন ছোট ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে ছিল হারাংগাজাও নামে একটা স্টেশনে। নিবিড় গভীর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ঝাটিংগা ও হারাংগাজাও এই নাম দুটি আমার মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করতে থাকে, ব্রহ্মার হাতের বীণার নাদের মতন। মনে হয় যেন আমি আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছি। এই নদী নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম এবং পরে অনেকের

কাছে ওই নদী বিষয়ে গল্প করেছি।

বছর দু-এক আগে হাইলাকান্দি গিয়েছিলাম এক সাহিত্যসভায়। স্বাতী ছিল সঙ্গে। ফেরার সময় স্বাতী বলল, এই দিকেই তো তোমার সেই ঝাটিংগা নদী, একবার দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল। ধস পড়ে লাইন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ছোট রেল বন্ধ হয়ে আছে, কিন্তু গাড়িতে যাওয়া যেতে পারে হাফলং পর্যন্ত, রাস্তা খুব খারাপ, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

শিলচর ছাড়িয়ে লামডিং-এর পথে এগোতে-এগোতে আমি ক্রমশই বিচলিত বোধ করলাম। কোথায় সেই দুর্ভেদ্য অরণ্য। এ তো দেখছি ছাড়া ছাড়া গাছ, অধিকাংশই পাতা ঝরা। আগেরবার দূর দূর টিলার ওপর জমাট জঙ্গল দেখে মনে হয়েছিল, ওখানে বুঝি কখনও মানুষের পা পড়েনি, এমনকি জরিপকার্যও হয়নি। এখন সে সব জঙ্গল প্রায় সাফ হয়ে গেছে। মানুষ কি পৃথিবী থেকে সমস্ত গাছ ঝাড়েবংশে নির্বংশ করবে ঠিক করেছে?

নদীটাই বা গেল কোথায়? মাঝে মাঝে আমি স্বাতীকে বলছি, এবার নদীটি দেখতে পাবে! স্বাতী আমার দিকে এমন কৌতুকের চোখে তাকাচ্ছে যেন এত কাল আমি সবাইকে গুল মেরেছি, কবিতাটাও বানিয়ে লিখেছি। সত্যিই সেই দুর্ধর্ষ, তেজি নদীটি একেবারে উধাও! এক সময় হারাংগাজাও স্টেশনটি পাওয়া গেল, আগের বার এটা ছিল খুবই নিরিবিলি, ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন। এখন বেশ লোকজন, দোকানপাট হয়েছে। যেন ম্যাজিকে অন্য রকম। কাছে সেই নদীর খাতটা রয়েছে বটে, জল নেই এক বিন্দু। অমন চমৎকার নদীটিকে কে খুন করল? আমার কষ্ট হতে লাগল রীতিমতন। পৃথিবীতে বহু জায়গাতেই নদীগুলোকে বাঁধ বেঁধে নির্জীব করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের গঙ্গা নদীও তো মুমূর্ষু, বাংলাদেশ এর থেকে যথেষ্ট জল পাচ্ছে না। কলকাতার কাছে মাঝগঙ্গায় লোকে হেঁটে বেড়ায়।

অবশ্য জাটিংগা নদী আমি প্রথবার দেখেছিলাম বর্ষাকালে, দ্বিতীয় বার শীতকালে। বর্ষায় অরণ্যের রূপ খোলে, নদীগুলিও স্বাস্থ্যবতী হয়। তা বলে কি বর্ষার পাহাড়ি নদী শীতকালে একেবারে মরে যায়? আর একবার বর্ষায় গিয়ে জাটিংগাকে দেখে আসতে হবে। শুনেছি আমাদের ছেলেবেলার রুদ্ররূপী আড়িয়েল খাঁ নদীরও এখন খুব করুণ অবস্থা।

ফ্রান্সে গিয়ে আমরা সাধারণত শুধু স্যেন নদীটাই দেখি। প্যারিস শহরের মাঝখানের নদীটির চেয়ে তার সেতুগুলির বৈচিত্র্যই আসল দর্শনীয়। শহরের উপকণ্ঠে একবার বিজ্ঞানী ভূপেশ দাসের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর বাড়ির কাছেই একটা ছোট্ট নদী আছে। একেবারে একরত্তি নদী, ইচ্ছে করলে জোরে লাফ দিয়ে পার হওয়া যায়, কিন্তু তার রীতিমতন স্রোত আছে, সেই স্রোতেরা কুলুকুলু ধ্বনি আছে। নদীটির নাম ইভেৎ। এত ছোট্ট নদী আমি কখনও দেখিনি, তার এত সুন্দর নাম। সেইজন্য তাকে ভোলা যায় না। ওই অঞ্চলে গেলেই নদীটা একবার দেখতে যাই।

ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত নদী বোধহয় লোয়ার। ইতিহাস ও ভূগোল, দু'দিক থেকেই এর অনেক গুরুত্ব। এই নদীর দু'ধারে প্রচুর দ্রষ্টব্য স্থান।

মাঝখানের দু'বছর আমি আর ফরাসি দেশে যাইনি। এর মধ্যে একবার বুলগেরিয়া-চেকোশ্লোভাকিয়া গিয়ে মনে হয়েছিল, টপ করে একবার প্যারিস ছুঁয়ে এলে হয়। প্রাগ শহর থেকে অসীম-ভাস্করকে ফোন করেও লোভ সংবরণ করতে হল। আগে থেকে ঠিক করা ছিল, সেবার আমি তুরস্কে যাব। সেখানে কোনও আমন্ত্রণ নেই, চেনাশুনো কারুর বাড়িতে থাকার জায়গাও পাওয়া যাবে না। তা হলেও ইস্তানবুল শহরটা একবার না দেখে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। পৃথিবীতে ইস্তানবুলই একমাত্র শহর, যার দুটো অংশ দুটো মহাদেশে। এশিয়া ও ইউরোপ। এককালে এরই নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল। তারও আগে এটাই ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার সূতিকাগার। এখানে জন্মেছিলেন মহাকবি হোমার। যিশুর মা ভার্জিন মেরির বাড়ি এখানে খুঁজে পাওয়া গেছে।

পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এরই কাছাকাছি ছিল ট্রয় নগরী।

ইস্তানবুলে নদী নেই। একদিকে কৃষ্ণসাগর, মর্মরসাগর। অন্য দিকে ভূমধ্যসাগর। কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে জুড়েছে বসফরাস প্রণালী, সেটাই গেছে শহরের মাঝখান দিয়ে। সি অফ মারমারা'র নাম বাংলায় কে মর্মরসাগর দিয়েছিল কে জানে, ভালোই দিয়েছিল। সস্তায় হোটেল ভাড়া করে ইস্তানবুলে আমি কয়েকটা দিন কাটালাম সম্পূর্ণ একা, এক একদিন কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। সেও এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পরের বছর আবার ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা ও লন্ডনে দু-একটি সভায় যোগদানের উপলক্ষ ঘটল। তা হলে তো মাঝখানের ফ্রান্সকে উপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। অসীমকে চিঠি লিখতেই অসীম জানাল ছুটি নিয়ে নিচ্ছি। এবার তা হলে লোয়ার নদীর উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করা যাবে, কী বলো?

শুরু হল আমাদের নতুন অভিযান।

॥ ৩২ ॥

"উঠে বসে, আমি আমার পর্দাগুলোর আড়াল থেকে
ধরলাম অলক্ষ্য প্রজাপতিটাকে, যেন জ্যোৎস্নালোক দিয়ে গড়া
অথবা এক বিন্দু শিশির
আমার আঙুলের বন্দিত্ব থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফটে
প্রজাপতিটা আমাকে দিয়ে গেল সুগন্ধের মুক্তিপণ।"

—আলোইসিউস বারত্রাঁ

প্যারিস থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথম লোয়ার নদীর দেখা পেলাম অরলিয়ঁ শহরের কাছে এসে। এই শহরটির নাম শুনলেই আমার মনে পড়ে সেই উনিশ বছরের মেয়েটির কথা, যাকে বহু লোকের সামনে একটি খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সেই যুবতীটি মানব সভ্যতার একটি বিস্ময়।

বাংলায় তার নাম লেখা হয় জোয়ান অফ আর্ক। কেন আমরা জোয়ান বলি কে জানে! ইংরিজিতে বলে জোন অব আর্ক, বার্নার্ড শ' তাকে নিয়ে যে নাটকটি লিখেছেন, তার নাম সেন্ট জোন। ফরাসিতে বলে জান দার্ক। বাংলায় জোয়ান কোথা থেকে এল? সে যাই হোক, এতকাল বাংলায় জোয়ান চলে আসছে, আমি তা বদলাতে চাই না। শেকসপিয়রকে এক সময় বাংলায় লেখা হত শেক্ষপীয়ার, যেমন ম্যাক্সমুলারকে লেখা হত মোক্ষমুলর, শুনতে বেশ ভালোই লাগত।

যে-সময় ফ্রান্স ছিল টুকরো টুকরো অঞ্চলে বিভক্ত, ইংরেজরা এদেশের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়ে নানা জায়গা হস্তগত করে নিয়েছে, যুদ্ধ চলছে সর্বক্ষণ, ফরাসি সামন্তরা কে কার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আর কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে তার ঠিক নেই, দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা এইসব ধারণাগুলো ঠিক মতন পরিস্ফুট হয়নি, সেইরকম সময় এক গ্রাম্য বালিকা কী করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক অপদার্থ রাজাকে উজ্জীবিত করল, সেনা বাহিনীর মধ্যে তীব্র আবেগের সঞ্চার করে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াইতে মাতিয়ে তুলল, তা শুধু দুর্বোধ্য নয়, আজও যেন ব্যাখ্যার অতীত মনে হয়। ডমরেমি গ্রাম থেকে যখন জান বা জোয়ান এসে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা হতে চাইল, তখন তার বয়েস ছিল আঠারো বছর। আগে কোনওদিন অস্ত্র ধরেনি, সে গ্রামে বসে শিখেছিল সুতো কাটা আর শেলাই-ফোঁড়াই। তবু যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার চিন্তা তার মাথায় এলো কী

করে? পৃথিবীতে আর কোথায়, কবে একটি আঠারো বছরের মেয়ে স্বেচ্ছায় এত বড় গুরুদায়িত্ব নিয়েছে? বিচারের সময় জোয়ান বলেছিল, সে ঈশ্বর-আদিষ্ট। ঈশ্বর সরাসরি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বটে, তবে ঈশ্বরের দূত, সন্ত মাইকেল, সন্ত ক্যাথরিন এবং সন্ত মার্গারিট তাকে প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁরা এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছেন। জোয়ান তাঁদের সশরীরে দেখেছে, স্পর্শ করেছে।

এ যুগে আমরা দেবদূতদের এরকম আগমনের কথা যুক্তি দিয়ে ঠিক মেনে নিতে পারি না। তা ছাড়া, ঈশ্বরের দূতরা ভালোবাসা, সেবা ও শান্তির বাণী নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু তাঁরা শুধু যুদ্ধের উত্তেজনা জোগাতে আসবেন কেন? রূপকথার কিংবা পৌরাণিক চরিত্র নয় জোয়ান, সে ইতিহাসের নায়িকা, মাত্র সাড়ে পাঁচশো বছর আগেকার ঘটনা, সমসাময়িক অনেক তথ্য এবং তার বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শেষ পর্যন্ত জোয়ান ধরা পড়েছিল বিশ্বাসঘাতক ফরাসিদেরই হাতে, বার্গান্ডির ডিউক তাকে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দেয়। ধুরন্ধর ইংরেজরা তাকে তৎক্ষণাৎ খুন না করে একটি বিচারের প্রহসন করে, যাতে সাধারণ মানুষের মন থেকে তার মহিমার ধারণাটা মুছে যায়। এবং বিচারের ভার দেয় কিছু তাঁবেদার বিশপের হাতে। সেইসব শিক্ষিত ধর্মযাজকরা এই গ্রাম্য বালিকাকে অদ্ভুত সব অভিযোগ এনে জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করবার চেষ্টা করলেও নির্ভীক জোয়ানের উত্তরগুলো ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরা। তবু প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল যে, জোয়ান মোটেই ঈশ্বর-প্রেরিতা নয়, সে মায়াবিনী, ডাকিনী, পিশাচসিদ্ধা। সে গির্জার কর্তৃত্ব মানে না, সে পুরুষের মতন পোশাক পরে। সে ব্যাভিচারিণী, অসতী।

কয়েকজন মহিলা, তাঁদের মধ্যে একজন অন্যতম বিচারকের স্ত্রী, জোয়ানের শরীর পরীক্ষা করে বলেছিলেন, সে সন্দেহাতীতভাবে কুমারী। যুদ্ধের সময় সে পুরুষদের মতন পোশাক পরেছে বটে, সে যুগে সেটাই ছিল চরম অপরাধ। আর কোনও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি, তবু তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল।

এই অরলির্অঁ শহরেই জোয়ান তার সামরিক দক্ষতার প্রথম প্রমাণ দেয়। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জোয়ান নৌকোয় চেপে লোয়ার নদী পার হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে ইংরেজদের। ফরাসি বাহিনীর কয়েকজন সেনাপতি এই গেঁয়ো মেয়েটির নেতৃত্ব মানতে চাননি, কিন্তু জোয়ান উদ্বুদ্ধ করে সাধারণ সৈন্যদের। যুদ্ধের মাঝখানে জোয়ান একবার সাংঘাতিকভাবে আহত হয়, শত্রুরা ধরেই নিয়েছিল যে ওই যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কুমারীটি মারাই গেছে। কিন্তু পরদিনই জোয়ান কাঁধের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে, পতাকা হাতে নিয়ে সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়াল পূর্ণ উদ্যম নিয়ে। তখনই অনেকে মনে করল, এই মেয়েটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। জোয়ানের নেতৃত্বেই ফরাসিবাহিনী ইংরেজদের কবল থেকে শহরটি উদ্ধার করে। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

আমার খুব ইচ্ছে এই ঐতিহাসিক শহরটি ভালোভাবে ঘুরে দেখার। অরলির্অঁ শহরটিকে ইংরেজরা বলে অরলিয়েন্স (orleans), তার থেকেই আমেরিকায় নিউ অরলিয়েন্স।

অসীম বলল, তুমি কল্পনায় যে শহরটির ছবি এঁকে রেখেছ, তাকে কিন্তু এখানে একদমই দেখতে পাবে না। জান দা'র্কের আমলের প্রায় কোনও চিহ্নই এখানে আর নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমার আঘাতে এই শহরটার অনেকখানিই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তারপর নতুন করে গড়া হয়েছে, এটা এখন আধুনিক শহর, ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। দেখবার বিশেষ কিছু নেই, থাকবার পক্ষেও ভালো নয়। আজ আমরা এর চেয়ে অনেক ভালো একটা জায়গায় রাত কাটাব ঠিক করেছি। তা ছাড়া, আমরা আবার এই পথ দিয়েই ফিরব। ফেরার সময় এখানে কিছুক্ষণ থেমে যাব না হয়।

শহরটির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এটাকে এখন একটা কেজো, ব্যস্ত জায়গা বলেই মনে হল। এক চৌমাথায় লাল আলোতে আমাদের গাড়ি থেমেছে, আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল একদল যুবতী। তাদের মধ্যে অন্তত তিন-চার জন জিনসের প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা। আজ বেশ গরম পড়েছে,

এই পোশাক অত্যন্ত স্বাভাবিক। অথচ এক সময় পুরুষদের মতন পোশাক পরেছিল বলে জোয়ান অফ আর্ককে মৃত্যুদণ্ড বরণ করত হয়েছিল।

এবার আমরা দলে চারজন। বাদল আর আমি একসঙ্গে এসেছি জার্মানি থেকে। খবর পেয়েই লন্ডন থেকে চলে এসেছে ভাস্কর। বছর তিনেক আগে ভাস্করের সেই যে হেঁচকির অসুখ হয়েছিল, তা আজও সারেনি। দিব্যি আমোদ-আহ্লাদ-মজায় আছে, হঠাৎ হেঁচকি আর ঢেকুঁরের মাঝামাঝি একটা ব্যাপার শুরু হল, আর কিছুতেই থামে না, শেষের দিকে কথা বলাই দারুণ অসুবিধেজনক হয়ে ওঠে। লন্ডনে ভাস্কর সবরকম চিকিৎসা করিয়েছে। তারপর একবার কলকাতায় এসে দু-তিন মাস থেকে হোমিওপ্যাথি-কবিরাজি কিছুই বাদ রাখেনি, কিন্তু এ রোগ সমস্ত চিকিৎসার অতীত। হেঁচকি কিংবা ঢেঁকুর, শুনতে সামান্য মনে হলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা যদি চলতে থাকে এবং দিনের পর দিন, তা হলে তা যে কত কষ্টকর তা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে। এই কারণে ভাস্করের শরীরও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু ভাস্করের আচরণ দেখে সে রকম কিছুই বোঝা যাবে না। আগের মতনই সে উত্তেজনাপ্রবণ, যে-কোনও সামান্য ব্যাপার থেকে মজা খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা আছে ভাস্করের। দা ফ্রেশ ইজ উইক বাট দা স্পিরিট ইজ হাই যাকে বলে।

চারজনে মিলে বেড়ানোই সবচেয়ে সুবিধাজনক। যুগ্ম সংখ্যায় খরচের সাশ্রয় হয়। হোটেলে দু'খানা ঘর নিলেই চলে, রেস্তোরাঁয় একটা টেবিল। অসীমের গাড়িটি চারজনের পক্ষেই আরামদায়ক। ভাস্কর আর বাদল পেছনে, আমি চালক মশাইয়ের সহকারী, আমার ওপর ম্যাপ দেখার ভার। চার-পাঁচখানা মানচিত্র নিয়ে আমি মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে যাই। এই সব দেশে কত ধরনের ম্যাপ যে পাওয়া যায় তার ঠিক নেই, ছোট ছোট অঞ্চলেরও বড় বড় ম্যাপ। পেট্রোল পাম্প, মুদির দোকানে ম্যাপ বিক্রি হয়। অবশ্য এতরকম রাস্তার গোলকধাঁধায় ম্যাপ ছাড়া গতিও নেই।

আমরা এগোতে লাগলাম লোয়ার নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। নদীটি নেহাত ছোট নয়। আবার বিশাল কিছুও নয়। অনেকটা বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশের নদীগুলোর মতন, পাথুরে তীর, নদীর মধ্যে মধ্যেও বড় বড় পাথরে চাঁই, কোথাও ছোটখাটো দ্বীপের মতন হয়ে গেছে, সেখানে নদীটি দ্বিধায়। এদিকে গভীর বন নেই, হালকা হালকা গাছ রয়েছে, পাইন ও উইলোজাতীয়। একটানা ফাঁকা নদীর ধার বেশিক্ষণ পাওয়া যায় না, দু-পাঁচ কিলোমিটার অন্তর অন্তর ছোট ছোট শহর। ইউরোপের এই সব ক্ষুদ্র শহরগুলি বড় নয়নাভিরাম, পরিষ্কার, ঝকঝকে, শান্ত অথচ আধুনিক সব সরঞ্জামই সুলভ।

বিকেল শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে আমরা লোয়ার নদীর ধার ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা নিলাম। এদিকটায় গাছপালা বেশি, ছায়া ছায়া পথ। সেই পথ যেখানে শেষ হল, সেখানে সামনের দৃশ্যটা দেখে মুখ দিয়ে একটিই শব্দ বেরিয়ে আসে, বাঃ!

লোয়ার নদীর দুই পারে অনেকগুলি শাতো রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বিখ্যাতটির নাম শামবর (Chambord)। শাতো কথাটার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই, ইংরিজিতে অনেক সময় কাসল বলা হলেও শাতো আসলে প্রাসাদ ও দুর্গের মাঝামাঝি, মূলত রাজা-রাজড়াদের বিলাস-ভবন, কিছুটা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও থাকে। বাংলা প্রতিশব্দের অভাবে একে শাতো (chateaux) বলাই ভালো।

অনেক সুন্দর জিনিসকেই একটা বিশেষ সময়ে, একটা বিশেষ মেজাজে দেখলে আরও সুন্দর দেখায়। সন্ধে হয়ে এসেছে, আলো এখন নরম। আকাশের একপ্রান্ত এখনও লাল। ঠিক এই রকম সময়েই শামবর আসা উচিত। একটা বাড়ি, যতই বিশাল হোক, মানুষের তৈরি বাড়িই তো বটে, তাও যে কত ছন্দোময়, কত সুসমঞ্জস হতে পারে, পাথর-কাঠ-লোহার অস্তিত্ব মুছে গিয়ে সব মিলিয়ে একটা শিল্প সৃষ্টির মতো মনে হয়, তা ঠিক সন্ধের আগে শামবর এলে বোঝা যায়।

বেশ কিছু বছর আগে ভাস্কর ও আমি এখানে এসেছিলাম অসীম ও ভূপেশ দাশের সঙ্গে। সেটি ছিল দুপুর বেলা, খুব গনগনে রোদ, প্রচুর লোকজনের ভিড়, তখন এই প্রাসাদটিকেই

এমন কিছু আহামরি মনে হয়নি। ভাস্কর সেবার বলেছিল, আমাকে বেশি সিঁড়ি ভেঙে এই সব দুর্গ-দুর্গ দেখতে বলবে না কেউ! গাদাগুচ্ছের হিস্ট্রিও শুনতে চাই না। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ার সময় প্রচুর হিস্ট্রি মুখস্থ করেছি, আর এই সব ফ্রেঞ্চদের হিস্ট্রি জানার কোনও দরকার নেই। আয়, সুনীল!

কাছেই ছিল একটা খুব প্রাচীন চেহারার ট্যাভার্ন। ভেতরটা অন্ধকার মতন, চেয়ার-টেবিলের বদলে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বেঞ্চ করা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের পিপেতে ওয়াইন। ভাস্কর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে, তারপর প্রচুর রেড ওয়াইন পান করা হয়েছিল।

এবারে ভাস্করেরও সেই ট্যাভার্নের কথা মনে পড়ল না, সে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বলল, সেই একই বাড়িটাকে এখন বড় সুন্দর লাগছে তো রে?

আমি কোনারকের মন্দির দেখেছি বেশ কয়েকবার। তার মধ্যে একবার গিয়েছিলাম গাড়িতে চেপে, পৌঁছেছিলাম এরকম সন্ধের সময়। তখন রেলওয়ে স্ট্রাইক চলছিল, তাই টুরিস্টের ভিড় ছিল না একেবারেই, সব মিলিয়ে পাঁচ-সাত জন মানুষ, কোনারকের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য এবং শিল্প-শৈলী সেবারই সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। রাত্রে থেকে গিয়েছিলাম পান্থনিবাসে, তাই সন্ধ্যায়, মাঝরাতে, ভোরবেলা বারবার দেখেছি।

এখানেও একটি হোটেল রয়েছে। শামবর-এর ভেতরে ঢুকে দেখার কোনও ব্যস্ততা নেই আমাদের, আমরা এখানে গেলাম থাকার জায়গা ঠিক করতে। এই দায়িত্ব অসীম ও ভাস্করের। ওরা হোটেলের ভেতরে চলে গেল, আমি আর বাদল বাতাসে নিশ্বাস নিতে-নিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কাছেই একটা ছোট্ট নদী, তার ওপারে জঙ্গল, এককালে রাজারা এই জঙ্গলে শিকার করতে আসতেন। এখনও প্রচুর হরিণ আছে, মাঝে মাঝে কিছু হরিণ হোটেলের কাছেও এসে পড়ে।

এক সময় ভাস্কর ফিরে এল উত্তেজিতভাবে। আমাকে বলল, একটা চুরুট দে তো!

আমি বললাম, কী হল? এত দেরি হচ্ছে কেন?

ভাস্কর বলল, ব্যাটারা পাত্তা দিচ্ছে না। বলছে ঘর খালি নেই। এমন চমৎকার জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয়? এখানেই দু-তিনদিন থেকে গেলে ভালো হয় না?

বাদল বলল, ভাস্করদা, ম্যানেজ করুন। জায়গাটা দারুণ!

আমারও তাই মত। যদিও এর চেয়েও ভালো জায়গা যে নেই তাই-ই বা কে বলতে পারে? অবশ্য রাত হয়ে গেছে, এখন আবার গাড়ি চালিয়ে হোটেল খুঁজতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা।

'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে যে চারজন যুবকের কথা আছে, ভাস্কর তাদের অন্যতম। আসলেতে ও ধূমপান করে না, কিন্তু ওর ব্যক্তিত্ব ফোটাবার জন্য হাতে একটা চুরুট দরকার হয়। অরণ্যের দিনরাত্রির সময় আমাদের ফরেস্ট ডাকবাংলোতে কোনও রিজার্ভেশন ছিল না। চৌকিদারকে ম্যানেজ করে থাকা হয়েছিল, হঠাৎ সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ডি এফ ও। সেবারে একটা আধপোড়া চুরুট মুখে দিয়ে ভাস্কর সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডি এফ ও সাহেবকে কাবু করে দিয়েছিল।

এবারেও ভাস্কর কিছুক্ষণ পর গর্ব-মেশানো হাসি নিয়ে ফিরে এল। একটা ব্যবস্থা হয়েছে। কী একটা কনফারেন্সের জন্য এই হোটেলের সব কটি ঘরই বুকড, সব অতিথিরা এখনও এসে পৌঁছয়নি, কাল থেকে কনফারেন্স শুরু। সন্ধে হয়ে গেছে, আজ আর কেউ আসবে না, বাকি অতিথিরা আসবে কাল সকালে, এটা ধরে নিয়ে আমাদের দু-খানা ঘর দেওয়া হচ্ছে আজ রাত্তিরের মতন। তবে হঠাৎ কোনও অতিথি এর পরেও এসে গেলে আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে, যদিও যে সম্ভাবনা খুবই কম।

অসীম অবশ্য বলল যে, সে-ই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজারকে রাজি করিয়েছে, ভাস্করের বেশি-বেশি কথায় সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছিল, এবং ভাস্কর যথারীতি এর প্রবল প্রতিবাদ করল, আমি আর বাদল এই কৃতিত্বটা ওদের দুজনকেই ভাগ করে দিলাম। খরচ বেশি না, হোটেলের ঘরগুলো খুবই

আরামদায়ক এবং পরিবেশের তো তুলনাই হয় না। আমাদের ঘরের একদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায় জ্যোৎস্নাধৌত শামবর শাতো, অন্য একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় কর্সো নদী।

একটুখানি ইতিহাস না বললে শামবর-এর মাহাত্ম্য ঠিক বোঝা যাবে না। এই শাতো'র সঙ্গে জড়িত আছে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম।

ফরাসিরা স্থাপত্যবিদ্যায় বেশ কাঁচা ছিল। মধ্য যুগে বিশাল, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণের খ্যাতি ছিল ইটালিয়ানদের। ফরাসিদেশের রাজা ও ভূম্যধিকারীরা ইটালিতে লড়াই করতে গিয়ে হেরেছে বটে, কিন্তু সেখানকার বিশাল মনোহর অট্টালিকাগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরেছে। তারপর নিজেদের জায়গায় তারা ইটালিয়ানদের অনুকরণে অট্টালিকা বানাতে চেয়েছে।

আগে এখানে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ। রাজারা শিকার করতে এসে সেখানে দু-এক রাত কাটাতেন। রাজা ফ্রাঁসোয়া প্রমিয়ে, অর্থাৎ প্রথম ফ্রাঁসোয়া নিয়মিত শিকার করতেন এখানে। তিনি পুরোনো দুর্গটা ভেঙে ফেলে এখানে একটা দর্শনীয় প্রাসাদ বানাবার পরিকল্পনা করলেন। আঁকা হল নানারকম নক্সা। ইতালিয়ান শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তখন ফরাসি সরকারের অতিথি, থাকেন কিছুটা দূরে। নক্সাগুলো তাঁকে দেখিয়ে তাঁর মতামত নেওয়া হয়েছিল। লিওনার্দো তো শুধু শিল্পী বা ভাস্কর বা কবি নন, তিনি আবিষ্কারক, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, নদী বিশেষজ্ঞ এবং আরও অনেক কিছু। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপারে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে এর জন্য তিনি দু'হাতে অর্থ ব্যয় করেছেন তো বটেই, এমনকি রাজকোষ যখন শূন্য, তখন যে-কোনও উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতেন. গির্জাগুলোর অর্থসম্পদের ওপর হানা দিতেন, প্রজাদের কাছ থেকে রুপো কেড়ে নিয়ে গলিয়ে ফেলতেন। একবার তাঁর দুই ছেলে বন্দি হয় স্পেনে, তাদের মুক্তিমূল্যস্বরূপ প্রচুর টাকা দিতে হয়, তবু তিনি এই প্রাসাদের খরচের ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি।

এই বিশেষ জায়গাটিই প্রথম ফ্রাঁসোয়ার পছন্দ, অথচ তাঁর শখ ছিল প্রাসাদটি হবে লোয়ার নদীর তীরে। তা কী করে সম্ভব? অসম্ভবই বা হবে কেন? নদীটাকে ঘুরিয়ে এনে এই প্রাসাদের পাশ দিয়ে বইয়ে দিলেই হয়। রাজা সেই অনুরোধ জানিয়েছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। লিওনার্দোর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়, এরকম নদীর প্রবাহ বদলাবার কাজ তিনি ইটালিতে করেছেন। কিন্তু অত বড় লোয়ার নদীকে এতখানি দূরে ঘুরিয়ে নেওয়ার বিপুল ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে রাজা আর সাহস পেলেন না। সেই স্বপ্নটি পরিত্যক্ত হলেও নদীর জেদ ছাড়লেন না রাজা। কাছাকাছি আর একটি ছোট নদী, কর্সো-কে টেনে আনা হল এই পর্যন্ত।

রাত্তিরের দিকে আমরা শাতো-টি একবার দেখতে গেলাম। পুরো টুরিস্ট সিজনে এখানে সন-এ-লুমিয়ে দেখানো হয়, শীতের ভয়ে অক্টোবর থেকে তা বন্ধ। এখন মধ্য অক্টোবর, কিন্তু এবারে একটুও শীত নেই। এদেশের ঋতুগুলির মতি-গতি বোঝা দায়। একবার অক্টোবর মাসে আমি তেমন গরম জামাকাপড় সঙ্গে না এনে ফ্রান্সে এসেছিলাম, শীতে হি হি করে কেঁপেছি। এবারে সঙ্গে রেইন কোট, ওভারকোট সব এনেছি, শীতের নামগন্ধ নেই, ভারী সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া।

সুরকি বিছানো রাস্তা দিয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতে-গাইতে আমরা শাতো-র ধার দিয়ে ঘুরলাম খানিকক্ষণ। অন্ধকার শাতোটির একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে।

ভাস্কর এক সময় জিগ্যেস করল, এটা কি ভার্সাই প্রাসাদের চেয়ে বড় নাকি রে।

অসীম বলল, বোধহয় বড়। দেখতে বেশি সুন্দর তো বটেই। এখানে ঘরের সংখ্যা চারশো চল্লিশ।

ভাস্কর বলল, অত ঘর, তার জন্য কত বাথরুম বানাতে হয়েছিল বলো তো!

অসীম এবার হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, এত বড় বাড়িতে কটা বাথরুম থাকতে পারে, বলো তো ভাস্কর?

আমি বললাম, এটা ভাস্কর আন্দাজ করতে পারবে না।

অসীম বলল, একখানা! এখানকার কেয়ারটেকারের জন্য। ফরাসিরা আবার বাথরুম ব্যবহার করতে জানত নাকি?

আমি ফরাসিদের স্নানের অভ্যেস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। মধ্যযুগের ফরাসিদের অত সাজ-পোশাকের বাহার, অত সৌন্দর্যচর্চার আড়ম্বর, অথচ তাদের শরীর যে কী পরিমাণ নোংরা থাকত, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। বহু মেয়ে সারাজীবনে একবারও স্নান করত না, অর্থাৎ সর্বাঙ্গে জলস্পর্শ বিনাই সেই সব সুন্দরী স্বর্গে চলে যেত। অনেক পুরুষ জীবনে একবার অন্তত স্নান করতে বাধ্য হত, কারণ সেনাবাহিনীতে ভরতি হওয়ার সময় তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে জলে চুবিয়ে শরীরটা পরীক্ষা করে দেখা হত। অভিজাত ফরাসিরাও সকালবেলার ছোট বাথরুম-বড় বাথরুম সেরে নিত ঘরের মধ্যেই বড় গামলাতে, আর সাধারণ লোক মাঠে-ঘাটে যেত।

সারা বছরই তো শীত থাকে না, কখনও কখনও বেশ গরম পড়ে এ দেশে। রীতিমতো ঘাম হয়। সারা বছরে একবারও স্নান না করলে সেই ঘামের গন্ধ তো শরীরেই থেকে যাওয়ার কথা। সেইজন্যই ফরাসিদেশে এতরকম পারফিউমের কদর। সুগন্ধ মেখে কি ঘামের গন্ধ চাপা দেওয়া যায়? আঁদ্রে জিদ এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'যৌন আবেদনে ঘামের গন্ধ'। ফরাসি মেয়েরা ঘামের গন্ধে উত্তেজিত হয়। কিছুকাল আগে পুরুষদের জন্য একটা পারফিউম বেরিয়েছিল, যেটা শুধু তীব্র ঘামের গন্ধ। এখন আর পুরুষদের শরীর ঘামাবার মতন সময় নেই, তাই পয়সা দিয়ে ঘামের গন্ধ কেনা!

বাদল বলল, ওরে বাবা, দিনের পর দিন এরা চান না করে থাকত কী করে? আমার তো মনে হয়, একটা দিনও চান না করলে আমি বাড়ি থেকে বেরুতেই পারব না।

ভাস্কর বলল, সেইজন্যই তো তুমি ফরাসি দেশে জন্মাওনি। জন্মেছ মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে, বাড়ির পাশেই পুকুর, যখন ইচ্ছে ঝুপ-ঝুপ করে ডুব দিয়ে আসতে পারতে।

বাদল বলল, এই সব ফরাসি সাহেব-মেমদের কথা যা শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস এ দেশে জন্মাইনি। আমাদের মেদিনীপুর অনেক ভালো।

ভাস্কর বলল, নিঃসন্দেহে ভালো। আমিও চান না করে একদম থাকতে পারি না। সুনীলটাকে দেখেছি, মাঝে মাঝে দু-একদিন চানটা কাট মারে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে অবশ্য ফরাসি অভ্যেসের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বর্ষার দিনে স্নান বাদ দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজি, কিংবা কোনও শীতের দিনে দুপুরবেলা জলস্পর্শ না করে রাত্তিরে বেশ গরম জলে স্নান করি। এতে বেশি আরাম। প্রত্যেক দিন এক ধারাবাঁধা সময়ে স্নান করে স্নানের ব্যাপারটাকে আমি নিছক একটা অভ্যেসে পরিণত করতে চাই না।

একটু থেমে আমি আবার বললাম, মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর মতন সুন্দরী জীবনে একবারও স্নান করেননি, এটা কি ভাবা যায়? কিন্তু অসীম, অনেক শিল্পী যে স্নানার্থিনী মহিলা এঁকেছেন? যুবতী মেয়েরা নগ্ন হয়ে নদী কিংবা ঝরনায় স্নান করছে, যেমন রেনোয়া'র ছবি আছে, কিংবা অ্যাংগ্রে'র সেই বিখ্যাত ছবি, মাথায় তোয়ালে জড়ানো, পেছন ফিরে বসা নারীটি...

অসীম বলল, ওগুলো অনেকটা নতুনত্ব, তাই ছবিতে এসেছে। তা ছাড়া তুমি যাদের কথা বললে, তাঁরা নাইনটিনথ সেঞ্চুরির শিল্পী, তখন একটু-একটু করে স্নানের ব্যাপারটা চালু হয়েছিল নিশ্চয়ই। এখন সবাই চান করে। রোজ না হলেও মাঝে-মাঝে। আগে অনেক বাড়িতে শুধু টয়লেট থাকত, এখন স্নানের জায়গাও তৈরি হয়। পাড়ায় পাড়ায় কত সুইমিং পুল।

আড্ডা মারতে মারতে আমরা ছোট্ট নদীটার ধারে গিয়ে বসলাম। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা রাতচরা পাখি। শামবর-এর কাছাকাছি কোনও জনবসতি নেই, বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে পরিবেশের বিশেষ বদল হয়নি, তাই অতীত এখানে পটভূমিকা হিসেবে রয়ে গেছে। এখানে রাজা রানিরা ঘুরে বেড়াত, এখানে যুদ্ধ হয়েছে, রাজতন্ত্রের বিদ্রোহীরা এসে লুটপাট করে গেছে,

অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষও থেকে গেছেন এখানে। এই নিস্তব্ধ রাতে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে তা অনুভব করা যায়। পিঠের দিকে কয়েকটা শতাব্দীর সেই পরিস্থিতির অনুভবটাই তো মূল্যবান।

॥ ৩৩ ॥

"সব সময় তোমাকে অবশ্যই মাতাল হতে হবে। সবকিছুই তো রয়েছে : এটাই একমাত্র প্রশ্ন। সময়ের বীভৎস বোঝা যাতে অনুভব করতে না হয়, যা তোমার কাঁধ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, নুইয়ে দিচ্ছে মাটির দিকে, তোমাকে মাতাল হতেই হবে, একটুও থামালে চলবে না।
কীসে মাতাল হবে, সুরা কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা তোমার পছন্দ। কিন্তু মাতাল হও।
এবং যদি কোনও সময়ে, কোনও প্রাসাদের সিঁড়িতে, কোনও খানা-খন্দের সবুজ ঘাসের মধ্যে, অথবা তোমার নিজেরই ঘরের নিরানন্দ নির্জনতায় তুমি জেগে ওঠো, তোমার নেশা যখন কমতে শুরু করেছে অথবা কেটেই গেছে, জিগ্যেস করো বাতাসকে, ঢেউ, নক্ষত্র, পাখি, ঘড়ি এমন সব কিছুকে, যারা ওড়ে, গুঞ্জন করে, গড়ায়, গান গায়, কথা বলে, তাদের জিগ্যেস করো, এখন কীসের সময়, তখন সেই বাতাস, ঢেউ, নক্ষত্র, পাখি, ঘড়ি তোমাকে উত্তর দেবে : 'এখন মাতাল হওয়ার সময়। সময়ের নিপীড়িত ক্রীতদাস হওয়ার বদলে মাতাল হও, একটুও না থেমে! সুরা, কবিতা অথবা উৎকর্ষ, যেটা তোমার পছন্দ।"

—শার্ল বোদলেয়ার

এবারের যাত্রায় আমরা বাদলের ওপর একটা ব্যাপারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। সকালের চা। বাদলের বুদ্ধিতে আমাদের সকালটা বেশ অলস বিলাসিতায় কাটে। এর আগের হোটেলগুলিতে চায়ের জন্য বেশ কষ্ট পেয়েছি। এইসব হোটেলে রুম সার্ভিস থাকে না। আমাদের বাঙালি অভ্যেসে দাঁত মাজার আগে চা চাই।

বাদল প্রত্যেক বছর ফ্রাংকফুর্টের বিশ্ব বইমেলায় আসে। থাকে কোনও প্রাইভেট গেস্ট হাউসে। একা থাকতে হয় বলে ঘরে বসে নিজের চা বানিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। সব জায়গাতেই সস্তায় ইমারসান হিটার পাওয়া যায়, প্লাগ পয়েন্টে লাগিয়ে যেটা জলে ডুবিয়ে রাখলে তিনি চার মিনিটে জল গরম হয়ে যায়। এক রকম বিশেষ কাচের গেলাসও পাওয়া যায়, ফুটন্ত জলেও যেটা ফাটে না। এ সব দেশের বাথরুমে কল খুললেই গরম জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা কখনও তেমন গরম হয় না, যাতে চা বানানো যায়। সুতরাং এই ব্যবস্থাই উত্তম। ঠিক মতন গরম জল

পেলে, চা-চিনি-কন্ডেন্সড মিল্ক তো কিনে রাখাই যায়। এবং নানারকম বিস্কুট, মাখন, জ্যাম-জেলি।

যেহেতু হোটেলের ঘরের মধ্যেই নিজস্ব চা বানাবার পরিকল্পনা এবং জিনিসপত্রগুলো বাদলের, তাই পুরো দায়িত্বটাই বাদলের। আমরা শুয়ে শুয়ে আলস্য করি, বাদল গেলাসের পর গেলাস চা বানিয়ে যায়। এ যাত্রায় কুমকুম বা স্বাতী নেই। কুমকুম উপস্থিত থাকলে তার স্বামীর এই অদ্ভুত করিৎকর্মা রূপটি দেখলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে যেত। অধিকাংশ বাঙালি পরিবারের কর্তারা বাড়িতে এক গেলাস জলও গড়িয়ে খায় না। অসীম বহুদিন এ দেশে আছে, তাই তার মধ্যে সাহেবি গুণ অনেকটা বর্তেছে, সবাই কাজ ভাগাভাগি করে করছে না দেখে সে আমাদের ধমকায় এবং বাদলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভাস্করও বিলেতে সিকি শতাব্দী কাটিয়ে দিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত সেবাপরায়ণা স্ত্রী তার স্বভাবটি বাঙালি করেই রেখেছে। অসীমের ধমক খেয়ে ভাস্কর বিস্কুটে মাখন-জ্যাম মাখাবার কাজটা নেয়। আমার জন্য আর কোনওই কাজ বাকি রইল না, সুতরাং গেলাসের পর গেলাস চা পান করাটাই আমার একমাত্র কাজ। আমাদের কাপ নেই, সুতরাং হোটেলের গেলাসেই চা তৈরি হয়। একেবারে শেষে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমি গেলাসগুলি ধুয়ে দি।

স্নান-টান করে ফিটফাট হয়ে আমরা বেরোলাম শামবর দুর্গ-প্রাসাদ দেখতে। ভেতরে ঢুকতে টিকিট কাটতে হয় এবং টিকিটের দাম বেশ গায়ে লাগবার মতন। ধরা যাক, মাথা পিছু তিরিশ টাকা। আমাদের দেশের তুলনায় খুবই বেশি। কিন্তু টিকিটের দাম এত বেশি রাখার একটা যুক্তি আছে। সেই টাকায় রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এত বড় একটা অট্টালিকার ভেতরটা একেবারে ঝকঝকে তকতকে। কোথাও একবিন্দু ময়লা নেই, কোনও দেওয়ালে দাগ নেই, কোনও জিনিসই ছেঁড়া ফাটা নয়। আমাদের দেশেও অনেক ভালো ভালো সৌধ বা সেতু তৈরি হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলোর যাচ্ছেতাই চেহারা হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণেশ্বরের কাছে বালি ব্রিজের কথা মনে পড়ছে। এক কালে এই সেতুটি ছিল অতি সুদর্শন, দূর দূর থেকে লোকে ওখানে বেড়াতে যেত, তখন ব্রিজের দু'ধারে টোল নেওয়া হত। এখন টোল বন্ধ হয়ে গেছে, ব্রিজটার দু'পাশের হাঁটাপথের অতি জরাজীর্ণ অবস্থা, বড় বড় গর্ত, যখন তখন মানুষের পা ভাঙতে পারে। টোল বন্ধ করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল। হাওড়া ব্রিজের গর্ত দিয়ে একটা লোক গঙ্গায় পড়ে মরেই গেল। বালিগঞ্জ স্টেশানের কাছে বিজন সেতুটি তৈরি হল এই সেদিন। এখন দেখলে মনে হয় মহেঞ্জোদারোর আমলে। মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ি হাজার দুয়ারির বয়েস মাত্র শ দেড়েক, কিন্তু এরই মধ্যে কী দৈন্য দশা। দর্শকদের কাছ থেকে বেশি করে দর্শনী নিয়ে কেন সেটাকে অবিকৃত রাখা যাবে না?

শামবর প্রাসাদপুরীর ভেতরের সবটা বর্ণনা দেওয়ার দরকার নেই। মোট চারশোটা ঘরের বর্ণনা লিখতে গেলে আমার তো বটেই, পাঠকদেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। অতগুলো ঘর সব আমরা দেখিওনি। রক্ষীদের ঘর, অস্ত্রশস্ত্রের ঘর, সভাকক্ষ, পাঠাগার, জলখাবারের ঘর, দুপুরের খাবারের ঘর, বিকেলের হালকা খাবারের ঘর, রাত্তিরের ভোজশালা, এ ছাড়া অমুক রাজা আর অমুক রানির শয়ন কক্ষ, নানাভাবে সাজানো হলেও শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে লাগে। এত বড় বাড়িতে রাজা-রানিদের খুব হাঁটতে হত বটে!

একটা ঘরের নাম দেখা গেল, ভারত কক্ষ। কেন যে ভারতের নাম সে ঘরের সঙ্গে যুক্ত তা বোঝা গেল না। তবে দেওয়ালের কারুকার্যের সঙ্গে ভারতীয় কন্থার কাজের মিল আছে খানিকটা। ভারত সম্পর্কে ফরাসি দেশে নানা রকম ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। যে কালো কালিকে আমরা বলি চাইনিজ ইংক, তাকে ওরা বলে ভারতীয় কালি। এক ধরনের লণ্ঠনকে ওরা বলে 'বাংলা-আলো', সেরকম লণ্ঠন বাংলাদেশে কোথাও নেই। মালার্মের কবিতায় 'বেঙ্গালি' নামে যে পাখির উল্লেখ আছে, সে পাখিটা কী পাখি কে জানে! ভারতের সমস্ত অধিবাসীদের তারা আজও বলে হিন্দু, তারা কি মুসলমানের অস্তিত্ব জানে না?

এই অট্টালিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য এর এক জোড়া সিঁড়ি। এত বড় বাড়িতে মোট সতেরোটা

সিঁড়ি আছে, তার মধ্যে দু'খানা সিঁড়ি অতি অভিনব। মুখোমুখি এই সিঁড়ি। কিন্তু এমনই অপূর্ব কৌশলে তৈরি যে, একটা দিয়ে উঠতে শুরু করলে বোঝাই যায় না যে পাশ দিয়ে আর একটা সিঁড়ি উঠেছে, এবং অন্য সিঁড়ির লোকদেরও দেখা যাবে না। কোনও এক সময় এই প্রাসাদের মালিক হয়েছিল অরলিয়েন্সের সামন্ত গাসতোঁ। লোকটা সুবিধের ছিল না, অনেক ষড়যন্ত্র-টন্ত্র করেছে জীবনে, কিন্তু পিতা হিসেবে সে ছিল খুব স্নেহপ্রবণ। সেই গাসতোঁ এই যুগ্ম সিঁড়িতে তার ছোট মেয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত।

সেই ছোট মেয়েটির পরে নাম হয়েছিল 'লা গ্রাঁদ মাদমোয়াজেল'। এই প্রাসাদের সঙ্গে তার প্রণয়কাহিনিও জড়িত। লোজুন-এর ডিউক যখন এখানে বেড়াতে আসে, তাকে দেখে সেই যুবতী মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাকে সে নিজের মনের কথা জানাতে পারেনি। এক দিন সে সেই রূপবান তরুণ ডিউককে এই সিঁড়ি দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বড় আয়নার ওপর নিঃশ্বাস ফেলে-ফেলে যে বাষ্পচ্ছায়া হয়, তার ওপর আঙুল দিয়ে সে ডিউকের নাম লিখে দেয়।

এই প্রাসাদটি ছিল রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া'র স্বপ্ন। ফরাসি দেশে তাঁর অনেক কীর্তি এখনও জাজ্জ্বল্যমান হয়ে আছে। কিন্তু কিছু একটা গভীর দুঃখ ছিল তাঁর মনে। এই বিশাল ব্যয়বহুল হর্ম্যটির অনেকখানিই নির্মিত হয়েছিল তাঁর সময়ে, তবু তিনি থাকতেন একটি সাধারণ ঘরে। সেই ঘরের একটা জানলার কাচে তিনি এক দিন আপনমনে লিখেছিলেন, 'নারী যখন তখন বদলায়। যে ব্যক্তি কোনও নারীকে বিশ্বাস করে, সে নির্বোধ!'

হাত বদল হতে-হতে এই অট্টালিকাটি এক সময় রাজা চতুর্দশ লুই-এর অধিকারে আসে। প্যারিস ছেড়ে রাজা চতুর্দশ লুই প্রায়ই এই শামবর-এ থাকতে আসতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত ও নাট্যপ্রেমী। এখানে তিনি নাট্য দল ডাকতেন। একবার এসেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের তাঁর দল নিয়ে।

মলিয়ের-এর নাম শুনলেই অধিকাংশ পাঠকের মনে পড়ে একটিই ছবি, এই সেই নাট্যকার ও অভিনেতা, যিনি নিজের লেখা নাটকে একটি অসুস্থ ব্যক্তির ভূমিকায় অভিনয় করতে-করতে হঠাৎ সত্যিকারের অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং সে রাত্রেই মারা যান। কিন্তু এটাই মলিয়ের-এর প্রতিভা সম্পর্কে শেষ কথা নয়। বরং বলা যায়, এটা একটা অতিরঞ্জিত গুজব। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মলিয়ের-এর স্বাস্থ্য আগেই ভেঙে পড়েছিল, তবু তিনি মঞ্চে নেমেছিলেন। হঠাৎ মঞ্চের মধ্যে পড়ে যেতে দেখে দর্শকরা মনে করে তিনি বুঝি অভিনয়ের ঘোরের মধ্যে মঞ্চের মায়াকে বাস্তব করে ফেলেছেন। বস্তুত মলিয়ের-এর প্রতিভা ছিল এর চেয়ে অনেক বড়। তিনি আধুনিক ট্র্যাজি-কমেডির জনক। চার্লি চ্যাপলিনের পূর্বপুরুষ।

সঠিক অর্থে মলিয়ের নাট্যকার ছিলেন না। অর্থাৎ সাহিত্যের একটি অঙ্গ যে নাটক, সে রকম নাটক রচনার দিকে তাঁর কখনও মন ছিল না। তিনি ছিলেন এক থিয়েটার কোম্পানির ম্যানেজার। নিজের দলের প্রয়োজনে তিনি অন্যদের নাটক যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নিজেও তাড়াহুড়ো করে অনেক প্রহসন, ব্যঙ্গ-নাটক, রচনা করেছেন। আমাদের দেশে গিরিশ ঘোষ যেমন নাটক লিখেছেন। চার্লি চ্যাপলিন যেমন নিজের ফিল্মের গল্পগুলি তৈরি করেছেন। জীবদ্দশায় মলিয়ের তার কিছু কিছু নাটক যে ছাপিয়েছিলেন, তাও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নয়। তাঁর নাটক অন্য দল বিনা অনুমতিতে অভিনয় করত, তাঁকে স্বীকৃতিও দিত না। তাই মলিয়ের নাটক ছাপিয়ে নিজের নামটা দেগে দিতেন।

এক সার্থক আসবাবপত্র ব্যবসায়ীর ছেলে মলিয়ের অল্প বয়েস থেকেই ঝুঁকেছিলেন মঞ্চে অভিনয়ের দিকে। বাবার ব্যবসায়ে গেলেন না, লেখাপড়া শেষ করার পর বাড়ি ছেড়ে চলে এসে যোগ দিলেন এক থিয়েটারের দলে। মাদলেইন বেজার নামে এক অভিনেত্রীর সহযোগিতায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চালাতে লাগলেন নিয়মিত নাটকের অভিনয়। কিন্তু প্যারিস শহরে তখন আরও দুটি

থিয়েটার বেশ চালু (১৬৪৪ সাল, কলকাতা শহরের তখনও জন্ম হয়নি), মলিয়েরে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারলেন না, ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লেন, সে জন্য তাঁকে জেল খাটতেও হল।

জেল থেকে বেরিয়ে আবার নাটুকে দল গড়লেন মলিয়ের, এবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভিনয় করতে লাগলেন, তাতে খরচ উঠে যেত, অনেকটা আমাদের যাত্রা দলের মতন। মোট ১৩ বছর এইভাবে মফস্বলে কাটিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন মলিয়ের, তিনি এখন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও দক্ষ ম্যানেজার। আবার ফিরে এলেন প্যারিসে। বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবিত্ত মহলে মলিয়েরের প্রথম পরিচিত হলেন রাজার নেকনজরে আসার পর। লুভ্‌র প্রাসাদের রক্ষীদের হলঘরটিতে একটা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে মলিয়ের রাজা ও সভাসদদের সমক্ষে দুটি নাটক দেখালেন। দ্বিতীয়টি তাঁর নিজের রচনা, সেটির নাম 'প্রেমিক ডাক্তার'। এই নাটকটি গ্রাম্য দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, শহুরে সমাজও বেশ পছন্দ করল।

এরপর থেকে বড় বড় জমিদারদের বাড়িতে মলিয়ের ডাক পেতে লাগলেন। প্যারিসে হল ভাড়া করে নিয়ে নিয়মিত নাটকও চলল। নিছক রঙ্গ কৌতুকের নাটক লিখতে-লিখতে মলিয়ের হঠাৎ একটা নাটকে রক্ষণশীলদের বেশ একটা ধাক্কা দিয়ে বসলেন। এই নাটকের নাম 'লে' কল দে ফাম' (বউদের ইস্কুল), সমাজের শিরোমণিরা এই নাটক দেখে গেল গেল রব তুলে দিল। অনেকে স্বীকার করল, এই নাট্যকার একটি 'কমিক জিনিয়াস' বটে, কিন্তু কোনও সামাজিক প্রথাকেই এই লোকটা শ্রদ্ধেয় বলে মনে করে না।

মলিয়ের দমলেন না, নতুন নতুন নাটকে দর্শকদের কাঁপাতে লাগলেন। চোদ্দ বছরে মলিয়ের পঁচানব্বুইটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন, তার মধ্যে একত্রিশটা তাঁর নিজের রচনা। একটা সিজনেই তিনি নাটক লিখেছিলেন ছ'খানা।

তাড়াহুড়ো করে, দর্শকদের মেজাজ-মর্জি বুঝে নাটক লিখতেন মলিয়ের, সে জন্য অনেকগুলি ঠিক জমেনি, মঞ্চসফল হয়নি। কোনওটা একবার মঞ্চস্থ করার পর দর্শকরা ঠিক নিচ্ছে না দেখে আবার খোল নলচে বদলে ফেলতেন। তিনি তো শুধু নাট্যকার ও অভিনেতা নন, তিনি দলের ম্যানেজার, খরচ চালাবার চিন্তা তাঁকে করতে হত সব সময়। তবু এরই মধ্যে মলিয়ের-এর কয়েকটি নাটক কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে। মলিয়ের ঠিক বাস্তবকে অনুকরণ করতেন না, শুধু সমসাময়িক জীবনকে ফুটিয়ে তুলতেন না, নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও তাঁর উপজীব্য ছিল না, এইসব কিছুকে মেলাবার পরেও তিনি পরাবাস্তবতার দিকে চলে যেতেন। মঞ্চে মৃত্যুদৃশ্যে অভিনয় করতে-করতে তাঁর সত্যিকারের মৃত্যু যেন একটা রূপক।

মলিয়ের-এর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটকের নাম 'তারতুফ্'। এই নাটকের জন্যও তাঁকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। মলিয়ের সমালোচকদের উত্তর দিতেন নাটক লিখে। 'বউদের ইস্কুল' নাটকটি নিয়ে যখন আপত্তির ঝড় ওঠে, তখন তিনি মঞ্চে নামিয়েছিলেন 'বউদের ইস্কুল সম্পর্কে সমালোচনা'। এই নাটকে তিনি একাই অভিনেতা, একা তিনি তাঁর সমালোচকদর উদ্দেশ্যে তর্জনী দেখিয়েছেন।

এই সমালোচকদের প্রসঙ্গেই মলিয়ের সম্পর্কে এতখানি ভূমিকা করতে হল।

শামবর প্রাসাদে রাজা চতুর্দশ লুই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মলিয়ের-এর দলকে। নতুন নাটক দেখাতে হবে। এখানে এসে কয়েকদিনের মধ্যে মলিয়ের একটা নাটক লিখে ফেললেন। দ্রুত রিহার্সাল দিয়ে সেটা মঞ্চস্থ করা হল। রাজা, রানি ও পারিষদরা সবাই উপস্থিত। নাটকের প্রথম দু-অঙ্ক হয়ে গেল, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে হাসির হিল্লোল উঠছে না। রাজা হাসছেন না, তাই অন্য কেউও হাসবে না। মহা মুশকিল। মলিয়ের-এর দলের সঙ্গীত পরিচালকের নাম লালি। সে হঠাৎ একটা কাণ্ড করল। নাটক চলছে, এর মধ্যে সে এক লাফ দিয়ে পড়ল গান-বাজনার যন্ত্রগুলোর ওপরে, সবগুলো ঝন ঝনাৎ করে উঠল এক সঙ্গে। তার-ফার ছিঁড়ে লালি চিৎপটাং। রাজা হো-হো করে হেসে উঠলেন,

তারপর থেকেই জমে গেল নাটক।

কয়েকদিন সেই নাটকটি চলার পর রাজা হুকুম দিলেন আর একটা নতুন নাটক লিখতে। এটার নাম 'বুর্জোয়া ভদ্রলোক'। এক দল সুযোগসন্ধানী লোক নানারকম কায়দা কানুন ও তোষামোদ করে সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে কীভাবে ওপর মহলে ওঠে, তাই নিয়ে কাহিনি। এ কাহিনি চিরকালীন, আজকের দিনেও সত্য। কিন্তু প্রথম দিন অভিনয়ের বিরাট ব্যর্থতা। রাজা চতুর্দশ লুই আগাগোড়া ঠোঁটে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন, তাঁর মুখে কোনও ভাব-বৈকল্য দেখা গেল না, সুতরাং অন্য কেউ হাসল না। হাসির নাটকে শ্মশানের স্তব্ধতা। চতুর্দশ লুইয়ের মেজাজ মর্জির এমনিতেই ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তিনি কখন হাসবেন, কখন মুখখানা গোমড়া করে থাকবেন, তা কেউ জানে না। মলিয়ের অন্যত্র বলেছিলেন, ফ্রান্সের বড়লোকদের মুখে কৌতুকের হাসি ফোটানো অতি শক্ত কাজ।

নাটকের শেষে উপস্থিত সমালোচকরা ছি ছি করতে লাগল। কেউ কেউ বলতে লাগল, মলিয়ের-এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, নাটক দানা বাঁধছে না, সংলাপে ধার নেই, অভিনয়ও বাজে।

মলিয়ের তবু আর একদিন অভিনয়ের অনুমতি চাইলেন।

দ্বিতীয় দিনে প্রায় শুরু থেকেই রাজা বেশ ফুরফুরে মেজাজে, মাঝে মাঝে হেসে উঠছেন, বাঃ বাঃ করছেন। আর বাকি দর্শকরাও হাসিতে ফেটে পড়ছে, মুহুর্মুহু হাততালি দিচ্ছে। যবনিকা পতনের পর আগের দিনের সমালোচকরাই মলিয়েরকে ঘিরে ধরে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, অহো, কী অপূর্ব নাটক! কী চমৎকার সংলাপ। কী দুর্দান্ত অভিনয়!

এখনকার দিনেও সমালোচনার এই ধারা বিশেষ পালটেছে কি? এখন আর রাজতন্ত্র নেই, তবু অধিকাংশ সমালোচকের সামনেই একজন অনুপস্থিত রাজা বসে আছে, এমন মনে হয় না?

যে-হলঘরটিতে মলিয়ের তাঁর নাটক দুটির অভিনয় করেছিলেন, সেখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। যে-সময়ে মলিয়ের এখানে চতুর্দশ লুইয়ের সামনে অভিনয় করেছিলেন সেই সময়ে আমাদের দিল্লিতেও লালকেল্লা গমগম করছে, শাজাহান-ঔরঙ্গজেবের আমল, মোগল-সাম্রাজ্য গৌরবের চূড়ায়। কিন্তু দিল্লির বাদশাহদের নাট্যপ্রীতির কোনও খবর পাওয়া যায় না। দিল্লিতে পেশাদারি নাটকের নিয়মিত অভিনয়ও হত না, মলিয়ের-এর মতো নাট্যকারও জন্মায়নি।

একটু তাড়াহুড়ো করেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হল, কারণ হোটেলের ঘর ছাড়তে হবে। এমন সুন্দর পরিবেশের হোটেলটি ছাড়তে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু উপায় নেই। লোয়ার উপত্যকায় প্রায় বারোমাসই দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। সুতরাং এর পরে কোনও ভালো হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে না কি না তার ঠিক নেই। আমরা তো দামি হোটেলে থাকতে পারব না, আমাদের সস্তাও চাই, পরিবেশটাও মনোরম হওয়া দরকার।

এই হোটেলের রিসেপশানিস্ট মহিলাটি আমাদের প্রতি সদয় হয়ে দূর-দূরান্তের অনেকগুলি হোটেলে ফোন করে খবর নিল, অনেক জায়গাতেই ঘর খালি নেই। শেভার্নি নামের একটা জায়গায় একটি মাঝারি হোটেলে দুটি ঘর পাওয়া যেতে পারে। চলো শেভার্নি!

অনেক ঘুরে ঘুরে, দু-একবার রাস্তা হারিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত শেভার্নির সেই হোটেলে পৌঁছে বেশ নিরাশ হলাম। কাছাকাছি নদী নেই, জঙ্গল নেই, শহরের ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে একটা পুরোনো আমলের হোটেল। ঘর ভাড়া বেশ বেশি, অথচ ঘরগুলো স্যাঁতসেঁতে, দিনের বেলাতেও রোদ আসে না,। যে ঘরে দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়, সে ঘর আমার কিছুতেই পছন্দ হয় না। কিন্তু উপায় নেই, রাতটা তো কাটাতে হবে।

বিকেলের চা বানাতে গিয়ে দেখা গেল ইমারশান হিটারের প্লাগটা প্লাগ-পয়েন্টে ঢুকছে না। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার। প্লাগ পয়েন্টগুলো পৃথিবীর সব দেশে একই মাপের, শুধু এখানে আলাদা। শেষ পর্যন্ত অসীম তার-টার বার করে কিছু একটা কায়দায় বাদলের ডিপার্টমেন্ট চালু করে দিল।

এই হোটেল থেকেই হাঁটা পথের দূরত্বে একটা শাতো রয়েছে। পুরো জায়গাটা উঁচু দেওয়াল

দিয়ে ঘেরা। চা খাবার পর অসীম বলল, চলো বেড়াতে-বেড়াতে গিয়ে শাতোটা দেখে আসি!

আমি সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, না, ওটা দেখব না।

অসীম হাসতে-হাসতে বলল, কী ব্যাপার, তোমার এই জায়গাটা এমনই অপছন্দ হয়েছে যে এখানকার কোনও কিছুই দেখবে না?

আমি বললাম, শুধু সেজন্য নয়। আজ শামবর-এর মতন অসাধারণ শাতো দেখে এসেছি, আজ আর কিছু দেখব না। এক দিনে দুটো সহ্য হবে না। কোনও ভালো জিনিস যেমন এক সঙ্গে বেশি খেতে নেই, তেমনি ভালো ভালো জিনিসও খুব বেশিক্ষণ দেখা ঠিক নয়। কোনও কবিতার বই আমি প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত এক টানা পড়ি না, কয়েকটা কবিতা পড়ে রেখে দিই, তাতে মর্মে ঠিক মতন ঢোকে। এক সঙ্গে দু'জন কবির দু-খানা আলাদা বই পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। লুভর মিউজিয়ামে গিয়ে এক দিনে সব কিছু দেখার চেষ্টা করলে আসলে কিছুই দেখা হয় না। আমি শুধু একটা অংশ দেখে বেরিয়ে আসি।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সমর্থন করে বলল না, না, আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না। রাজা-ফাজাদের বাড়ি তো সব প্রায় এক রকমই থাকে। আজ আসল ভালোটা দেখে এসেছি, তাতেই পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে!

অসীম বাদলের দিকে তাকাতেই বাদল বলল, আমাকে যদি এখন যেতে বলেন, রাজি আছি। আর যদি না যাওয়া হয়, তাতেও আপত্তি নেই। মোজা-টোজা খুলে ফেলেছি, বেরুতে গেলে আবার পরতে হবে।

অর্থাৎ অসীম আধখানা ভোটে হেরে গেল। বিদ্রূপের সুরে বলল, যত সব কুঁড়ের দল।

লোয়ার নদী এবং তার শাখাপ্রাশাখার তীরে তীরে কত যে সুরম্য হর্ম্য রয়েছে তার ঠিক নেই। পৃথিবীর আর কোনও নদীর অববাহিকায় এমনটি নেই। উল্লেখযোগ্য শাতো'র সংখ্যাই যাট-বাষট্টি। এ ছাড়া ছোট ছোট আরও অনেক। আমরা বেছে বেছে সাত-আটটির বেশি দেখব না ঠিক করে ফেলেছি। যেহেতু এখানেও প্রচুর টুরিস্ট আসে, তাই কেউ কেউ এখানে শাতো নিয়ে ব্যবসাও শুরু করেছে। পুরোনো আমলের একটা জমিদার বাড়ি কিনে সারিয়ে-টারিয়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে দর্শনীয় করে তোলে। বাড়ির একটা অংশে নিজেরা থাকে, অন্য অংশটায় টিকিট কেটে দর্শকরা আসে। সঙ্গে রেস্তোরাঁ ও স্যুভেনিরের দোকান। মন্দ লাভ হয় না।

মাঝারি আকারের শাতো'র সঙ্গে তুলনা দেওয়ার মতন একটা বাড়ি আমি কলকাতার কাছেই দেখেছি। বারাসাত থেকে বসিরহাটের দিকে যেতে যেতে দেগঙ্গা, স্বরূপনগর ছাড়াবার পর রাস্তার বাঁ দিকে একটা প্রাসাদ দেখে চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন একটা ফরাসি শাতো সেখানে বসানো। সেটা কোন জমিদারের বাড়ি ছিল আমি জানি না, নিশ্চিত কোনও বিদেশি নক্সায় তৈরি। সামনে দুই গম্বুজওয়ালা সিংহদ্বার, ভেতরে উদ্যান ও দীঘি, তারপর একটি সুসমঞ্জস অট্টালিকা। শুনেছি, সেখানে এখন একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনাথ আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এমন একটা সুন্দর বাড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল কি? এই প্রাসাদটিকে মেরামত ও পরিষ্কার করে, কিছু ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজালে পর্যটকদের একটা আকর্ষণীয় কেন্দ্র হতে পারত। আমাদের পর্যটন দফতরের এই সব দিকে নজর পড়ে না কেন?

কুচবিহারের রাজবাড়িটা তো আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেল। অল্প বয়েসে কুচবিহারে বেড়াতে গিয়ে দূর থেকে রূপকথার রাজবাড়ির মতন ওই অট্টালিকাটিকে দেখে মুগ্ধ হতাম। এখন সেখানকার ঝাড়লণ্ঠন, ছবি, চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত লুঠপাট হয়ে গেছে, জানলা-দরজাগুলোও খুলে নিয়ে গেছে চোরেরা। সেটা একটা ভুতুড়ে বাড়ির মতন দেখায়। পাশের চত্বরটিতে বাস ডিপো।

আমাদের পশ্চিম বাংলায় ঐতিহাসিক দুর্গ কিংবা প্রাসাদ বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রায় বিশেষ কিছুই

নেই। অনতি অতীতের চিহ্নগুলিও যদি আমরা নষ্ট হতে দিই, তা হলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কী রেখে যাব?

॥ ৩৪ ॥

"একদিন এই পৃথিবী আর কিছুই থাকবে না
শুধু এক অন্ধ অবস্থান, যেখানে শুধু
বিভ্রান্ত দিন আর রাত্রি ঘোরে
বিশাল আকাশের নীচে যেখানে ছিল অ্যান্ডিজ পর্বতমালা
সেখানে একটি পাহাড়ও নেই, এমনকি একটা গিরিখাতও না

পৃথিবীর সমস্ত প্রাসাদ ও বাড়িগুলির মধ্যে
শুধু টিকে থাকবে একটি মাত্র [illegible]
এবং সেই বিশ্বের মানবজাতির মানচিত্রে
শুধু একটি বিষাদ, যার মাথায় আচ্ছাদন নেই।
ভূতপূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরের চিহ্ন থাকবে
বাতাসের সামান্য লবণাক্ত স্বাদে
একটা মায়াময় উড়ন্ত মাছ জানবে না
সমুদ্র কেমন দেখতে ছিল।

১৯০৫ সালের এক কুপে'তে বসে
(চারটে চাকা আছে, কিন্তু রাস্তা নেই)
অতীত কালের তিনটি যুবতী কন্যা,
তখনও রয়ে গেছে, কিন্তু শরীর নেই, শুধু বাষ্প,
জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকবে বাইরে
আর ভাববে, প্যারিস বেশি দূর নয়
তারা প্রশ্বাসে নেবে বাতাসের দুর্গন্ধ
যাতে গলা বন্ধ হয়ে আসে।

একদা যেখানে অরণ্য ছিল, সেখানে ভেসে উঠবে
একটা পাখির গান, কেউ তাকে
দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না, শুনতেও পাবে না
শুধু ঈশ্বর শুনবেন মন দিয়ে, এবং বলবেন :
আরে, এ যে একটা বউ কথা কও।"

—জুল সুপরভই

আজকাল বায়ুদূষণ, প্রকৃতির সর্বনাশ ও পৃথিবীর সম্ভাব্য ধ্বংসের কথা নিয়ে খুব আলোচনা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে দিকে-দিকে আলোচনা চলছে, আমেরিকা থেকে জাপানে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পশ্চিম বাংলায়। এই বিষয়েই একজন কবি বেদনাময় গাথা রচনা করে গেছেন

কতকাল, যখন এ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের কোনও চেতনাই জাগেনি।

জুল সুপরভই-এর জন্ম সুদূর উরুগুয়ে'তে মন্টভিডিও শহরে। ঝুল বারান্দার ঝুল আর জুল-জুল করে তাকানোর জুল মিশিয়ে যা হয়, সেইরকম তাঁর নামের উচ্চারণ। আমাদের বাংলায়, জ আর ঝ-এর মাঝামাঝি কোনও অক্ষর নেই। বুদ্ধদেব বসু বরিস পাস্টেরনাকের 'ডক্তর জিভাগো' কিংবা 'ডক্টর ঝিভাগো' উপন্যাসের অনুবাদের সময় মাঝামাঝি একটা অক্ষর তৈরি করিয়েছিলেন, 'ঝ'-এর তলায় ফুটকি, কিন্তু প্রেসওয়ালারা সেটি আর চালাতে চাইলেন না।

অল্প বয়েসেই বাবা-মা মারা যাওয়ায় জুল সুপরভই চলে আসেন ফ্রান্সে। পরবর্তীকালে আবার ফিরে যান দক্ষিণ আমেরিকায়। ফরাসিদের ভাষা সম্পর্কে এমনই গর্ব যে স্বদেশ থেকে বহু দূরে থাকলেও মাতৃভাষার চর্চা করতে ভোলে না। সে তো আমি মার্গারিটকেই দেখেছি, আমেরিকায় থাকলেও সে ফরাসি কবিতাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকত। জুল সুপরভই-এর স্বাস্থ্য বরাবরই রুগ্ণ, তবু তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং ছটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এই কবিতাটি পড়লে মনে হয়, তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল, তাঁর সন্তানরা কি সুস্থ পৃথিবীর নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে?

চমৎকার এক সকালবেলা গাড়ি করে যাচ্ছি আমরা, ঝকঝকে দিন, চারদিকে সুমহান প্রকৃতি। হঠাৎ এই কবিতাটি আমার মনে জাগে। এই সুন্দর পৃথিবীটাকে মানুষই ধ্বংস করে দেবে? মানুষের আরামের জন্যই তৈরি হয়েছে কলকারখানা, সেখানে উৎপন্ন হয়েছে মোটর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশানার, এই সব বিলাসদ্রব্যগুলো আসলে মানুষকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এদের বিষবাষ্পে ভবিষ্যতের বাতাস দারুণ বিষাক্ত হয়ে যাবে। পরমাণু অস্ত্রগুলোর বিস্ফোরণে যে-কোনও দিন চুরমার হয়ে যেতে পারে মানুষের গড়া সভ্যতা। এত কাব্য, এত সঙ্গীত, এত শিল্প, এত ভালোবাসা, ব্যর্থ হয়ে যাবে সব কিছু। এই কবি লিখেছেন, মানুষের সব ঘর বাড়ি চূর্ণ হয়ে যাবে। শুধু থাকবে একটি মাত্র বারান্দা। একটি বিদেশী পাখির গান ভাসবে হাওয়ায়, তা শোনার জন্য কেউ থাকবে না। শুধু ঈশ্বর শুনে চিনতে পারবেন।

জুল সুপরভই-এর মধ্যে কথা ভাবতে ভাবতে আর একজন কবির কথা মনে পড়ে। তার নামও জুল। জুল লাফর্গ। নামের মিল তো আছে বটেই, তা ছাড়াও এই ফরাসি কবিরও জন্ম হয়েছিল উরুগুয়ে'তে, মন্টভিডিও শহরে। বিস্ময়কর এই কবি, বেঁচেছিলেন মাত্র সাতাশ বছর। এঁর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আমার খুব প্রিয়। "খুব সংক্ষেপে আমি নিজেকে দিয়ে দিতে চাইছিলাম এই বলে যে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি', তখনই এই যন্ত্রণাময় উপলব্ধি হল, আসলে তো আমি আমার নিজের অধিকারী নই।"

দশটি ভাইবোনের অন্যতম, এই জুল লাফর্গ মাত্র সাতাশ বছর বয়েসের মধ্যেই অনেক রকম কাণ্ড করে গেছেন। ফরাসি ভাষায় কবিতা লিখেছেন সমস্ত রকম প্রথা ভেঙে, যেগুলি আজও আগ্রহের সঙ্গে লোক পড়ে; ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীরা যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তখন লাফর্গ ছিলেন তাঁদের প্রবল সমর্থক, তাঁর কবিতাতেও শিল্পের ওই ধারাটির যেন ছায়া পড়েছে। জার্মান ভাষা শিখেছিলেন বিশেষ করে জার্মান দর্শন গভীরভাবে জানার জন্য, জার্মানিতে গিয়ে পাঁচ বছর সম্রাজ্ঞী অগাস্টাকে বই পড়ে শুনিয়েছেন। এদিকে শরীরে বাসা বেঁধেছিল তখনকার দুরারোগ্য টি বি রোগ। মাত্র সাতাশ বছরের জীবনে, অসুস্থ শরীর নিয়ে এত সব কাজ কী করে সম্ভব? ফরাসি দেশে অতি অল্প বয়েসেই যেন প্রতিভার স্ফুরণ হয়। জোয়ান অব আর্ক উনিশ বছরের মধ্যেই ইতিহাসে এতখানি স্থান করে নিয়েছেন। আঠারো বছর বয়েসে র‍্যাঁবো যে কবিতা লিখেছে, তা নিয়ে পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও গবেষণা হয়। কর্সিকা দ্বীপের এক নির্যাতিত পরিবারের সন্তান নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফরাসি দেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান হয়ে উঠেছিলেন নিতান্ত তরুণ বয়েসেই।

ভাস্কর আমাকে জিগ্যেস করল, কবি বোদলেয়ার কতদিন বেঁচে ছিলেন রে?

আমি বললুম, খুব বেশি না। ছেচল্লিশ বছর, তাও শেষের দিকের কয়েকটা বছর খুবই খারাপ

অবস্থা ছিল।

ভাস্কর আবার বলল, তুই সেই আগেরবার বলেছিলি, বোদলেয়ার একই দিনে মাকে সাতখানা চিঠি লিখেছিলেন, চিঠি লেখার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড! এই বোদলেয়ারেরই একখানা কবিতার বই নিয়ে মামলা হয়েছিল না? বইটার নাম মনে আছে, 'লেস ফ্লাওয়ারস দু ম্যাল'!

অসীম গম্ভীরভাবে সংশোধন করে দিল, 'লে ফ্লর দু মাল'।

ভাস্কর বলল, ওই একই হল। তোমাদের ফরাসিতে যে কখন লে, লা কিংবা লু হবে তা বুঝতে মাথা ফেটে যায়।

আমি হাসতে লাগলাম। লু-টা ভাস্করের আবিষ্কার।

বাদলও হাসিতে যোগ দিল, সে ফরাসি ভাষা সম্পর্কে ভাস্করের এই ধরনের স্পর্ধিত মন্তব্যে বেশ মজা পায়। বাদলও এক বিন্দু ফরাসি জানে না। যদিও দোকান-টোকানে ঢুকে সে বেশ কাজ চালিয়ে দেয়। আমার আবার অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী! যেটুকু শিখেছিলাম তাও চর্চার অভাবে প্রায় ভুলে মেরে দিয়েছি, তবু মাঝে মাঝে বিদ্যে ফলাতে যাই।

অসীম বলল, না-জানাটা দোষের কিছু নয়। শুধু শুধু ভুল বলবে কেন? ইংরিজিতে বলো। বোদলেয়ারের ওই কবিতার বইটার নাম ইংরিজিতে 'দা ফ্লাওয়ার্স অফ ইভ্‌ল'। বাংলায় কে যেন অনুবাদ করেছিলেন, 'অশিব পুষ্প', সেটাও মোটামুটি ঠিক আছে।

ভাস্কর জিগ্যেস করল, মামলাটার কী হয়েছিল?

অসীম বলেছিল, হেরে গিয়েছিল। তারপর, বোদলেয়ার ক্ষমা চেয়েছিল। আর কী হবে! কবিরা বড় বড় কথা বলে, অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট, অ্যান্টি গভর্নমেন্ট আরও কত কী। কিন্তু চাপে পড়লেই হাঁটু মুড়ে বসে হাত জোড় করে। কী সুনীল, তাই না?

অসীম কবিতা পড়তে ভালোবাসে, কবিতার বই কেনে, অনেক আধুনিক বাঙালি কবিদের বইও রেখেছে নিজের সংগ্রহে, কবিদের সম্পর্কে তার দুর্বলতা আছে, তবু মাঝে মাঝে খোঁচা মারতে ছাড়ে না। এর প্রতিক্রিয়াটা দেখে সে আনন্দ পায়। নিরীহ কবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ।

আমি অসীমের স্বভাব জানি বলেই মিটিমিটি হেসে বললাম, বোদলেয়ার তো ক্ষমা চাননি, দয়া চেয়েছিলেন।

বাদল ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, দুটোর মধ্যে তফাত কী হল?

আমি বললাম, বোদলেয়ারের বই নিষিদ্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন এক বিচারক। আর বোদলেয়ার দয়া ভিক্ষা করেছিলেন এক রমণীর কাছে। একজন কবি এক নারীর কাছে দয়া তো চাইতেই পারে। সব কবিরাই তো মেয়েদের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

এবার অসীমও হাসতে লাগল। সে ব্যাপারটা জানে, আমার কথার মারপ্যাঁচ সে ধরতে পেরেছে।

ভাস্কর বলল, হেঁয়ালি করিস না। কার কাছে দয়া চেয়েছিল? মেয়েটা কে?

বোদলেয়ারের 'লে ফ্লর দু মাল' কাব্যগ্রন্থটি যখন ছাপা হয় তখন কবির বয়েস ছাব্বিশ। কবি হিসেবে তেমন বিখ্যাত নন যতটা পরিচিত এডগার অ্যালান পো'র রচনার অনুবাদক হিসেবে।

কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর তরুণ সাহিত্যিক ও পরিচিত মহলে খুব আলোড়ন হয় ও অনেক প্রশংসা পায়, কিন্তু বড়-বড় পত্র-পত্রিকায় সাংঘাতিক নিন্দে বেরুতে থাকে। 'ল্য ফিগারো'র মতন প্রভাবশালী পত্রিকায় তীব্র আক্রমণ করা হল। অন্য একটা পত্রিকায় লেখা হল যে কবিতাগুলো এমনই জঘন্য যে দু-এক লাইন উদ্ধৃতিও দেওয়া যায় না। বোদলেয়ারের নামে অভিযোগ : ধর্মীয় অবমাননা এবং অশ্লীলতা।

সেই সময়ে ফ্লবেয়ার-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম বোভারি' নিয়েও অশ্লীলতার অভিযোগে

মামলা উঠেছিল। কিন্তু লেখকের পক্ষের এক দুর্ধর্ষ উকিলের সওয়ালে বিচারক কোনও সাজা দিতে পারেননি। বোদলেয়ারের বইটি নিয়ে যখন প্রচুর নিন্দা-মন্দ বেরুতে লাগল এবং যথাসময়ে বইটি আদালতে অভিযুক্ত হল, তখন বোদলেয়ার বেশ খুশিই হয়েছিলেন। বড় বড় কাগজের খুব কড়া সমালোচনাও তো এক ধরনের প্রচার, আদালতে মামলা উঠলে বহু লোকে কবির নাম জেনে যাবে। বোদলেয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আদালতে মামলা শেষ পর্যন্ত টিকবে না, 'মাদাম বোভারি'র মতন তাঁর 'অশিব পুষ্প'ও ছাড়া পেয়ে যাবে।

যে বছর আমাদের দেশে সিপাহি বিদ্রোহ হয়, সেই বছরে ১৫ অগাস্ট প্যারিসে বোদলেয়ারের নামে মামলা ওঠে। সেটা ছিল একটা ছুটির দিন, প্রচুর অল্প বয়েসি কবি-লেখক ও ছাত্ররা এসে আদালতে ভিড় করেছিল, মেয়েরাও ছিল অনেকে। সবাই ভেবেছিল, অশ্লীলতার মামলা, নিশ্চয়ই প্রচুর রসালো কথাবার্তা শোনা যাবে। বোদলেয়ারের ওই কবিতার বইটি ছাপা হয়েছিল এক হাজার কপি, প্রথম বাঁধানো হয়েছিল মাত্র একশো, দাম দু ফ্রাংক, তখনকার পক্ষে বেশ বেশি দাম। অর্থাৎ কিছু সমালোচক ও বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বইটি তখনও বিশেষ কেউ পড়েনি।

দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর বোদলেয়ার হেরে গেলেন।

ধর্মীয় অবমাননার দায়ে বোদলেয়ারের কারাদণ্ড হতে পারত। কিন্তু বিচারক সে দায় থেকে বোদলেয়ারকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি রায় দিলেন যে ওই বইয়ের ছ'টি কবিতা অত্যন্ত অশ্লীল, জনসাধারণের পাঠের অযোগ্য! সম্পূর্ণ বইটাকে বাজেয়াপ্ত করা হল না, কিন্তু ওই ছ'খানা কবিতা বাদ দিয়ে আবার ছাপতে হবে। এই অশ্লীল কবিতাগুলি লেখা ও প্রকাশ করার জন্য বোদলেয়ারের জরিমানা হল তিনশো ফ্রাংক, আর প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জরিমানা একশো ফ্রাংক করে।

তৎকালীন উত্তপ্ত নীতিবাগিশ আবহাওয়ায় বেশ লঘুদণ্ডই বলতে হবে।

বিচারের পর প্রথম কিছুদিন বোদলেয়ার উত্তেজিতভাবে বলে বেড়াতে লাগলেন, আমি আদালতের রায় মানি না। আমার বই ওইভাবেই বিক্রি হবে, গোপনে গোপনে, তারপর যা হয় হোক দেখা যাবে! আমি যা লিখেছি, বেশ করেছি।

কিন্তু কবির এই সাহসের আড়ম্বর চুপসে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। প্রকাশক তাঁর কথা মানল না। তাঁর বইয়ের ওই ছ-খানা কবিতার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিক্রি হতে লাগল। নিজের কাব্যগ্রন্থের সেই দশা দেখে কবি শিউরে উঠতেন। বইটা ছাপার জন্য কত যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, তিনি, ছাপার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে ছিলেন, প্রুফ দেখেছেন পাঁচ মাস ধরে, টাইপ ফেস, কাগজ, বাঁধাই সব দিকে ছিল তাঁর মনোযোগ, সেই বইয়ের এমন ছিন্নভিন্ন অবস্থা। প্রকাশকের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে তাঁর আর কোনও বই ছাপার আশাই থাকবে না।

এবার কয়েকজন শুভার্থীর পরামর্শে বোদলেয়ার এক দয়ার আবেদন করলেন ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী ইউজেনি'র কাছে। অতি কাতর ও আবেগপূর্ণ সেই আবেদনপত্রের ভাষা।

সম্রাজ্ঞী ইউজেনি সে আবেদন একেবারে উপেক্ষা করেননি। জরিমানার তিনশো ফ্রাংক কমিয়ে পঞ্চাশ ফ্রাংক করে দিলেন। ছ'টি কবিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েই গেল। সেই নিষেধাজ্ঞা তার পরেও প্রায় একশো বছর ধরে জারি ছিল।

সংক্ষেপে আমি এই কাহিনি শোনাবার পর ভাস্কর মন্তব্য করল, কি কিপ্যুস ছিল রে ওই রানিটা! আর মাত্র ওই পঞ্চাশ ফ্রাংক কমাতে পারল না?

কাল রাত্তিরে ভাস্কর হেঁচকিতে বেশ কষ্ট পেয়েছে। হোটেলের ঘরে আমাদের আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল, ভাস্কর নিজেই গল্প জমাচ্ছিল, হঠাৎ শুরু হয়ে গেল হেঁচকি। তারপর আর থামেই না। আমি লক্ষ করছিলাম, ঘুমের মধ্যেও ও কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

আজ সকাল থেকে ভাস্কর বেশ ভালো আছে। মেজাজ বেশ প্রসন্ন। আমরা হোটেলটা ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ঠিক হয়েছে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধেবেলা নতুন হোটেল খোঁজা যাবে। গাড়ি

চলেছে লোয়ার নদীর ধার ঘেঁষে।

ভাস্কর কিছু একটা দুষ্টুমির জন্য উশখুশ করছে মাঝে মাঝে। এক সময় সে বলল, অসীম, গাড়িটা থামাও না একবার। অনেকক্ষণ সাহিত্য আলোচনা হয়েছে, গলা শুকিয়ে গেছে। এক বোতল পেরনো কেনা যাক। ফরাসি দেশের এই একটা ব্যাপার বেশ ভালো, সকালবেলা অনেকে খানিকটা পেরনো খেয়ে নেয়। দু'ঢোক পেরনো খেলে শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

পেরনো একরকম মৌরির সুরা। এমনিতে স্বচ্ছ রঙের, কিন্তু তাতে জল মেশালেই দুধের মতন সাদা হয়ে যায়।

অসীম ধমক দিয়ে বলল, সকালবেলাতেই মদের চিন্তা। কাল শরীর খারাপ হয়েছিল, মনে নেই? এখন হবে না।

ভাস্করও সমান মেজাজ দেখিয়ে বলল, তুমি কি আমার গার্জেন নাকি? আমার ইচ্ছে হয়েছে খাব। তুমি গাড়ি থামাবে কি না।

অসীম বলল, ছেলেমানুষি কোরো না ভাস্কর, এখনও দোকান খোলেনি।

আমি আর বাদল নিরপেক্ষ, নীরব শ্রোতা। আমরা দুজনেই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ভাস্করের স্বাধীনতা আছে মৌরির সুরা পানের ইচ্ছে প্রকাশ করার, আর অসীমেরও স্বাধীনতা আছে তাতে বাধা দেওয়ার। আসলে এটা ওদের ছদ্ম ঝগড়া। ভাস্কর যদি বলত, আজ সকালে আমি কিছুতেই পেরনো খাব না, তাহলে অসীম একটা বোতল জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

ভাস্কর মাঝে মাঝে বলতে লাগল, ওঃ, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। খানিকটা রেড ওয়াইনও যদি অন্তত পাওয়া যেত।

আর অসীম শহরের দিক সম্পূর্ণ এড়িয়ে গাড়ি চালাতে-চালাতে বলতে লাগল, দোকান খোলেনি, দোকান খোলেনি। জল খাও!

আমি জানলা দিয়ে নদী দেখতে লাগলাম।

এক সময় মনে হল, এখানকার দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের দেশের তফাতটা কী? আমেরিকাতেও আমার এরকম মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। ওদের শহরগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের শহরগুলোর ঠিক তুলনা চলে না। কিন্তু শহরের বাইরের ফাঁকা জায়গায়, প্রকৃতির মধ্যে খুব একটা অমিল নেই। ডি এল রায়ের সেই লাইন, বিলেত দেশটাও মাটির, নয়কো সোনা রুপো, খুব খাঁটি সত্যি। লোয়ার নদী আমাদের দেশের যে-কোনও মাঝারি আকারের নদীর মতনই, একদিকে ফসলের খেত, আর এক পারে রাস্তা। দু'পাশে তেমন গাছপালা নেই, তাই বাংলা বলে মনে হয় না, কিন্তু বিহারের কোনও কোনও জায়গা হতে পারে অনায়াসে, বিশেষত নদীর মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই দেখে আরও মনে হয়।

এই গাড়িটা বিহারের কোনও নদীর ধার দিয়েই যাচ্ছে, এমন মনে করা যেতে পারত, কিন্তু রাস্তাটা দেখলেই মনে হয়, এটা ভারতবর্ষ হতে পারে না। এদেশে সারা দেশজোড়া অসংখ্য মসৃণ রাস্তা। কোনও একটা জায়গারও ট্রাফিক বাতি ভাঙাচোরা কিংবা অকেজো নয়। সব সময় অসংখ্য গাড়ি চলছে, গাড়ির সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু যে রাস্তাগুলো ভাঙে না, তার কারণ সারা বছর জুড়েই রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। এরকম রাস্তার অবস্থায় পৌঁছতে আমাদের দেশের আরও কত বছর লাগবে?

আরও একটা লক্ষণীয় বিষয়, ফ্রান্সের ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েও আমি এ পর্যন্ত একটাও জরাজীর্ণ, জোড়াতাপ্পি দেওয়া কিংবা খুব গরিবের বাড়ি দেখতে পাইনি। দেশের সাধারণ অবস্থা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে কোনও লোকই হতদরিদ্র নয়। বড় বড় শহরে, এমনকি প্যারিসেও গরিবদের ব্যারাক আছে, নেশাখোর, ভবঘুরে, ভিখিরি আছে, কিন্তু গ্রামে সেরকম কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রামের এই উন্নতি দেখেই দেশের অর্থনীতির জোরটা টের পাওয়া যায়।

কোনও বাড়িই অসুন্দর নয়, এটাও একটা সামগ্রিক রুচির ব্যাপার।

প্রকৃতির দিক থেকে ওসব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বিশেষ তফাত নেই, মানুষের ব্যবস্থাপনারই প্রবল ব্যবধান!

ছোটখাটো পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যেতে-যেতে ভাস্কর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, থামো, থামো।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কয়েকটি গুহা। এই জায়গাটা আমাদের চেনা, কয়েক বছর আগে আরেকবার এসেছিলাম। এই গুহাগুলিতে রয়েছে ওয়াইনের ডিপো। এখানে পাইকারি হারে ব্যারেল ব্যারেল লাল কিংবা সাদা ওয়াইন বিক্রি হয়। যে-কেউ ঢুকলেই ওরা চেখে দেখবার জন্য একটা-দুটো বোতল খুলে দেয়, সঙ্গে সসেজ আলুভাজা। চেখে দেখবার পর পছন্দ না হলে চলে যাও অন্য দোকানে। পয়সা লাগবে না। আগেরবার এসে আমরা কয়েকটা দোকান ঘুরে-ঘুরে বেশ খানিকটা করে বিনা পয়সার ওয়াইন চেখেছিলাম, পরে অসীম চক্ষুলজ্জায় কয়েক বোতল কিনেছিল।

এবার অসীমকে থামতেই হল, কিন্তু একটা গুহার ভেতরে ঢুকে মনে হল, এই কয়েক বছরেই পরিবেশ বদলে গেছে। আগেরবার দোকানের মালিক-মালিকানীরা আগ্রহ করে ডেকে বসিয়ে নতুন ওয়াইন দিয়েছিল দু-তিন রকম। এখন জায়গাটা টুরিস্ট-অধ্যুষিত। আর টুরিস্টদের মধ্যে আমেরিকানদেরও বেশি আদর। তারা কিছুই বিনা পয়সায় নিতে জানে না। এক গেলাস ওয়াইন চেখেই কয়েক ডলার ফেলে দেয়। টুরিস্টরা অনেকেই রসিক হয় না বলে নিকৃষ্ট জাতীয় ওয়াইনও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভাস্কর এতক্ষণ তৃষ্ণায় ছটফট করছিল, খুব উৎসাহ নিয়ে এখানে ঢুকল, তারপর এক গেলাস রেড ওয়াইন নিয়ে খানিকটা চুমুক দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল। মুখ ভিরকুট্টি করে বলল, থার্ড ক্লাস! এত বাজে ওয়াইন মানুষে খেতে পারে।

যতই তৃষ্ণা থাক, ভাস্কর বনেদিয়ানা ছাড়বে না, উন্নতমানের জিনিস ছাড়া তার জিভে রুচবে না। আমরা তবু খানিকটা করে খেলাম, তেমন খারাপ লাগল না, ভাস্কর দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ৩৫ ॥

"এসো তবে আমরা ভালোবাসি, এসো ভালোবাসি
ধাবমান প্রহরকে উপভোগ করি দ্রুত
মানুষের কোনও বন্দর নেই
সময়ের কোনও তটরেখা নেই
শুধু বয়ে চলে, আমরাও পার হয়ে যাই।"

—আলফঁস দ্য লামারতিন

পৃথিবীর নানান দেশে এ পর্যন্ত আমি যত দেখেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণযোগ্য হচ্ছে শনন্‌সো (Chenonceau) প্রাসাদ। যদি কেউ বলে, নদীর ওপর বাড়ি, তাহলে মনে হবে কোনও নদীর খুব ধার ঘেঁষে বাড়ি, ছায়া পড়ে নদীর জলে। শনন্‌সো তো নয়। এই প্রাসাদটির স্থাপত্য-পরিকল্পনাই অতি অভিনব। সামনের দরজাটি নদীর এক পারে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলে দেখা যায় নদীর অন্য পারে পৌঁছে গেছি। এবং এ বাড়ির তলা দিয়ে নৌকো, স্টিমার, গাদাবোট দিব্যি পার হয়ে যায়।

নদীটি অবশ্য লোয়ার নয়। তারই এক শাখা নদী, নাম শের। বাংলা মতে এটা একটা পুরুষ নদী। এর নামের অর্থ প্রিয়। নারী হলে নাম হতো শেরি। মাঝারি আকারের ছিমছাম, শান্ত নদীটি বেশ মনোরম।

দুপুরের একটু আগে আমরা পৌঁছলাম এই নদীতীরে। নদীর এক দিকে সুসজ্জিত উদ্যান, বড় বেশি সুসজ্জিত, আমার এই ধরনের বাগান পছন্দ হয় না, বরং নদীর ওপারের এলোমেলো গ্রাম্য প্রকৃতি দেখলে চোখ জুড়োয়। শননসো প্রাসাদটিকে দূর থেকে, ডান পাশ ও বাঁ পাশ থেকে এবং কাছাকাছি গিয়ে আলাদা আলাদা রকমের দেখায়।

অন্যান্য প্রাসাদের সঙ্গে এই প্রাসাদটির আর একটি পার্থক্য এই যে এটির নির্মাণ, পরিবর্ধন ও অঙ্গসজ্জার সঙ্গে বেশ কয়েকজন মহিলার নাম জড়িত। স্থপতি ও মিস্তিরিরা অবশ্যই পুরুষ ছিল, তবু প্রাসাদটি যেন কয়েকটি নারীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

এর ইতিহাস প্রায় পাঁচ সাতশো বছরের। আগে ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দীতে নর্মান্ডির এক ট্যাক্স কালেক্টর সেই দুর্গ এবং তার সংলগ্ন জমিদারিটি কিনে নেয়। তার স্ত্রী ক্যাথরিনের প্রখর সৌন্দর্যবোধ ছিল, তার নির্দেশেই পুরোনো দুর্গটি ভেঙে সেখানে তৈরি হয় এক নতুন হর্ম্য, তখন ইতালির রেনেশাঁস-এর প্রভাব পড়েছে ফ্রান্সে, এর নির্মাণ-পরিকল্পনাও ইতালিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা। ক্যাথরিন মনের আনন্দে বাড়িটি সাজাচ্ছিল, স্বামীর কাছ থেকে যখন-তখন দাবি করত অঢেল টাকা, সেই টাকা যে কোথা থেকে আসছে তার খবর রাখত না। সুন্দরী স্ত্রীর বিলাস-বাসনা পূরণ করতে গিয়ে ট্যাক্স কালেক্টরটি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, এক সময় ধরাও পড়ে গেল। রাজকোষ তঞ্চকতার দায়ে জড়িয়ে পড়ার পর এই প্রাসাদ ও জমিদারি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হল। কিনে নিলেন রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া। ক্যাথরিনের মনের অবস্থা তখন কীরকম হয়েছিল ইতিহাস তা লিখে রাখেনি।

রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া শামবর প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন, সুরম্য ভবনের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল, লোয়ার নদীর দু'পারের অনেকগুলি শাতো'র সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তিনি শননসো রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাঁর বংশধর দ্বিতীয় আঁরি (অথবা হেনরি) এটা দান করলেন তাঁর রক্ষিতা দিয়ান দ্য পোয়াতিয়ের-কে। রাজার রক্ষিতা, সুতরাং টাকার অভাব নেই, দিয়ান এই বাড়িটাকে বাড়াতে লাগলেন ইচ্ছেমতন, তাঁর আমলেই বাড়ির এক পাশ থেকে সেতু তৈরি হল নদীর ওপরে। রাজকোষের অবস্থা তখন তেমন ভালো ছিল না, তাই রাজা দ্বিতীয় আঁরি তাঁর রক্ষিতার মনোরঞ্জনের জন্য নতুন নতুন কর বসাতে লাগলেন, তার মধ্যে গির্জার ঘণ্টার মতন সব ধরনের ঘণ্টার ওপরও কর। সেকালের প্রখ্যাত লেখক রাবেলে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'এ রাজ্যের সব কটা ঘণ্টা রাজা তাঁর ঘোটকীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন।' দিয়ানের ছিল খুব গাছপালার শখ, বহু জায়গা থেকে গাছ এনে তিনি সাজিয়েছেন উদ্যানটি।

রাজামশাই মারা যেতেই তাঁর বৈধ পত্নী ক্যাথরিন মেদিচি তাঁর চক্ষুশূল ওই রক্ষিতাটিকে বিদায় করে দিলেন শননসো প্রাসাদ থেকে। ক্যাথরিন দ্য মেদিচি অতি দুঁদে মহিলা ছিলেন, তাঁর সমস্ত কীর্তিকাহিনী লিখতে গেলে সাত কাণ্ড হয়ে যাবে, সে দিকে আর যাচ্ছি না। এক দিকে যেমন তিনি প্রাসাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে মন দিলেন, তেমনি তাঁর আমলেই এখানে হয়েছে আড়ম্বর, বিলাসিতা ও বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত। আগে যে সেতুটি তৈরি হয়েছিল, ক্যাথরিন দ্য মেদিচি সেটিকে বানালেন দোতলা, ওপরের তলায় হল দুশো বাট ফিট লম্বা এক গ্যালারি, এবারেই প্রাসাদটি নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে বিস্তৃত হল। মাঝে মাঝে বিশিষ্ট অতিথিরা এলে এখানে সারা রাত ধরে নাচ-গান, হইহল্লা, সুরার স্রোতে অবগাহন এবং ব্যভিচার চলত। যে-বার মেরি স্টুয়ার্ট এসেছিলেন, সেবার এক হাজার নারী-পুরুষকে বিভিন্ন পোশাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। বিখ্যাত কবি রঁসার-কে দিয়ে তিনি সেই উপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়েছিলেন।

এই প্রাসাদের তলা দিয়ে যে নদী বইছে, তার স্রোতের মতন সময়ও বয়ে যায়। ক্যাথরিন দ্য মেদিচির বিলাস-বৈভবের দিনও ফুরিয়ে গেল এক সময়। তাঁর ছেলে রাজা তৃতীয় আঁরি খুন হলেন হঠাৎ, তিনিও আর বেশিদিন বাঁচলেন না, প্রাসাদটি দিয়ে গেলেন তাঁর বিধবা পুত্রবধূ লুইসকে।

হঠাৎ যেন এখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিধবা হলেই যে রানিরা সব ভোগ বাসনা মুছে, ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যান তা তো নয়, অনেকেই বিলাসিতা ও লাম্পট্য চালিয়ে যান আরও অনেক গুণ, কিন্তু লুইস এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁর স্বভাব তাঁর শাশুড়ির ঠিক উলটো। তিনি সমস্ত উৎসব আড়ম্বর বন্ধ করে দিলেন। ফরাসি রাজ পরিবারের শোকের পোশাক সাদা, রানি লুইস এর পর বাকি জীবন শ্বেত বসন ছাড়া আর কিছুই পরেননি। স্থানীয় লোকের কাছে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'শ্বেতবসনা রানি'। তাঁর ঘরে ঝুলত কালো রঙের পরদা, তাঁর বিছানা, চেয়ার-টেবিল, সমস্ত আসবাব কালো ভেলভেট দিয়ে মোড়া। অবিকল সেই ঘরটিতে সেই শোকসন্তপ্তা রমণীর চিহ্ন রয়ে গেছে। জীবনের অবশিষ্ট এগারো বছর তিনি নির্জনে শুধু প্রার্থনা, সেলাই ও বই পড়ে কাটিয়েছেন।

হাত ঘুরতে-ঘুরতে এই শাতোটি চলে আসে মাদাম দুপ্যাঁ নামে আর এক মহিলার হাতে। বিলাস-ব্যভিচারের দিকে এই রমণীর ঝোঁক ছিল না, এঁর রুচি ছিল শিল্প সাহিত্যে। মাদাম দুপ্যাঁ এখানে একটি সাঁলো পরিচালনা করতেন। এই সাঁলো নামে ব্যাপারটি আমাদের দেশে অজ্ঞাত। ফরাসি দেশের কোনও কোনও অভিজাত পরিবারের মহিলা নিজের বাড়িতে কবি, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের নিয়মিত আড্ডার ব্যবস্থা করতেন। সেখানে আমন্ত্রিতদের খাদ্য, পানীয় ও সব রকম আতিথ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। শিল্প সাহিত্য নিয়ে নানারকম তর্ক-বিতর্ক ও হাস্য-পরিহাস হত, সেই বিদগ্ধজনদের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন গৃহস্বামিনী। অনেক দুঃস্থ শিল্পী-কবি এই সব রমণীদের কাছে উপকৃত হয়েছেন, কেউ কেউ সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। আমাদের দেশে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন ছিল, রাজা-রাজড়ারা অনেকেই সভাপতি রাখতেন, গত শতাব্দীর বড়লোকেরা মোসাহেব পুষতেন, কিন্তু কোনও মহিলা নিজের বাড়িতে শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে আড্ডার আসর বসিয়েছেন, এমন শোনা যায়নি।

মাদাম দুপ্যাঁ এখানে তাঁর ছেলের জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে যিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। জাঁ জাঁক রুসো! এখানে বসেই রুসো তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ও একটি উপন্যাস লেখেন। রুসো তাঁর আত্মজীবনী 'কনফেসানস্'-এও শননসো'র দিনগুলির উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ওই চমৎকার জায়গাটিতে আমাদের খুব ভালো সময় কেটেছিল। খাওয়াদাওয়া হতে দারুণ। খেয়েদেয়ে আমি পাদরিদের মতন মোটা হয়ে গিয়েছিলাম।'

মাদাম দুপ্যাঁ আর যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভলতের, আমরা যাঁকে বলি ভলতেয়ার। রুসো এবং ভলতেয়ার একই সঙ্গে ওই সাঁলোতে উপস্থিত ছিলেন কি না তা আমি অনেক বই খোঁজাখুঁজি করেও জানতে পারিনি। তা হলে, ওঁদের দু'জনের কথোপকথন নিশ্চিত খুব আকর্ষণীয় হত। এঁরা ছিলেন পরস্পরের ঘোর শত্রু!

বিখ্যাত শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত কিংবা নিছক ঈর্ষাপ্রসূত ঝগড়া অনেক সময় অন্যদের কাছে মজার লাগে। ফরাসি দেশে ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের আগে দুই প্রধান শিল্পী ছিলেন অ্যাংগ্রে (Ingre) এবং দেলাক্রোয়া (Delacroix), দুজনেই পেয়েছিলেন সার্থকতা এবং রাজকীয় সম্মান। প্যারিস শহরেই দুজনে ছিলেন, অনেক সভা-সমিতিতে ওঁদের দেখাও হয়েছে কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না। রুসো আর ভলতেয়ারের ঝগড়ার সঙ্গে তুলনা করা যায় আমাদের দেশের বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরের। একই সময়ের এঁরা দুই মহীরুহ, দুজনেই শ্রদ্ধেয়, অথচ এঁদের মধ্যে মিল হয়নি। শুধু মতপার্থক্য নয়, ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়েছে, বঙ্কিম প্রকারান্তরে বিদ্যাসাগরকে মূর্খ বলেছেন।

বঙ্কিম ছিলেন রুসোর ভক্ত। ভলতেয়ার আমাদের দেশের কারুকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন কি না জানি না। ফরাসি বিপ্লবের আগে রুসো এবং ভলতেয়ার দুজনেই শুধু লেখক হিসেবেই নয়, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব; দুজনেই রাজরোষে পড়েছিলেন, দুজনেই

সাধারণ মানুষের মুক্তিসন্ধানী। দিদ্রো'র নেতৃত্বে 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দুজনেই কোনও এক সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন, দুজনেই পরে দূরে সরে যান। রুসো এক সময় ছিলেন ক্যালভিনিস্ট, পরে তিনি আত্মার অনিশ্চয়তা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসে ফিরে যান। রুসোর মতে, নাস্তিকতা বড়লোকদের বিলাসিতা। গরিব লোকদের নানানরকম ধর্মীয় উপকথা এবং ধর্মসঙ্গীত অবলম্বন করে বাঁচতে হয়। ভলতেয়ার ধর্ম জিনিসটাকে ঘৃণা করতেন, ধর্মের নামে নানাবিধ ব্যবসায়ের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, তবে তিনি ঈশ্বরকে মানতেন, যিনি সমস্ত ধর্মের ঊর্ধ্বে, যিনি পৃথিবীর জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ঈশ্বর। গির্জার সঙ্গে বহুবার ঝগড়া করলেও জীবনের একেবারে শেষ বছরে ভলতেয়ার পাদরিদের কাছে প্রথাগত ধর্মাচরণের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। না হলে মৃত্যুর পর কোনও কবরখানায় তাঁর স্থান হবে না, তাঁর শরীরটা ফেলে দেওয়া হবে ভাগাড়ে, এই চিন্তায় ভলতেয়ার বিচলিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ভলতেয়ার ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটা ছোট্ট ঘোষণাপত্র রেখে যান। তাতে লিখেছিলেন :

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রেখে, বন্ধুদের ভালোবেসে, শত্রুদের ঘৃণা না করে, কুসংস্কারের প্রতি বিরাগ নিয়ে আমি মারা যাচ্ছি।

রুসো ও ভলতেয়ারের এরকম অনেক মিল থাকলেও তাঁরা পরস্পরকে সহ্য করতে পারতেন না। রুসো নামে আরও দু'জন লোকের ওপর ভলতেয়ার আগে থেকেই রেগে ছিলেন। জাঁ জাক রুসো যে আলাদা, তৃতীয় একজন রুসো, তা জানার পরেও ভলতেয়ার ওঁর রচনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হননি। রুসো ভলতেয়ারকে তাঁর লেখা "মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত প্রস্তাব" বইটি পাঠান মতামতের জন্য। উত্তরে ভলতেয়ারের চিঠিখানা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছিলেন,

মহাশয়, মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে আপনার নতুন বইটি আমি পেয়েছি। আমাদের জানোয়ার বানাবার জন্য এতটা ধীশক্তি কেউ আর কখনও ব্যয় করেননি, এবং আপনার পুস্তকটি পড়লে চার পায়ে হাঁটার ইচ্ছে জাগে। তবে কি না, ষাট বছরেরও অধিককাল ধরে অভ্যেসটা না থাকায় আমার পক্ষে তা ফের শুরু করা দুর্ভাগ্যক্রমে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে যারা আপনার এবং আমার চেয়ে যোগ্য, তাদের প্রতি এই পদ্ধতিতে হাঁটার ভার দিচ্ছি।...

(ফরাসি ভাষাবিদ শ্রী পুষ্কর দাশগুপ্ত ভলতেয়ার সম্পর্কে একটি মূল্যবান বই রচনা করেছেন। 'ভলতের জাদিগ ও অন্যান্য উপাখ্যান' থেকে এই চিঠির অনুবাদ গ্রহণ করেছি আমি।)

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে জানি। তবে এই দুই লেখক সম্পর্কে আর একটুখানি বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। ভলতেয়ার এবং রুসো এই দুজনেরই সমাধি হয় আলাদা আলাদা দুটি গ্রামে। ফরাসি বিপ্লবের পর বিশেষ সম্মান জানাবার জন্য এঁদের দুজনেরই হাড়গোড় তুলে এনে প্যারিস শহরের বিশিষ্ট সমাধিভবন পঁতেয়োঁ-তে (Panthcon) সুদৃশ্য শবাধারে রাখা হয়। গুজব আছে, রাত্তিরের দিকে পঁতেয়োঁ-তে ঢুকলে এখনও এঁদের ঝগড়া শোনা যায়।

শননসো প্রাসাদটি নদীর ওপর বিস্তৃত হলেও খুব বিশাল নয়। সবগুলি ঘর ঘুরে দেখতে ক্লান্তি আসে না। বিশেষত এখানে কিছু ভালো ছবি আছে। অন্যান্য শাতোগুলোতে বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি প্রায় দেখাই যায় না। আগে যা ছিল, তাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্যারিসে। একটু নামকরা শিল্পীদের ছবিরই এখন অসম্ভব দাম। এখানে দেখা গেল ভ্যান লু'র 'তিন রমণী', একটি ঘরের সিলিং অঙ্কিত করেছেন রুবেনস। এক একটা ঘরের জায়গা দিয়ে দেখা যায় নদী। খুব জাঁকজমকপূর্ণ ঘরগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ বাইরের নিরাভরণ প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরালে চোখের বেশ আরাম হয়।

শুধু দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখাই নয়, একটা জায়গায় কিছুক্ষণ অলসভাবে কাটালে তবে তার সৌন্দর্য ঠিকমতন হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শননসো প্রাসাদের বাইরেও আমরা শুয়ে বসে কাটালাম কিছুক্ষণ। কিছু খাবার কিনে খাওয়া হল মাঠে বসে। তারপর আমরা বেরুলাম হোটেল খুঁজতে।

প্রায় দু'ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে অসীম যে হোটেলটি পছন্দ করল, সেটাই যে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হোটেলটি বেশ অগোছালো অবস্থায় রয়েছে, সম্ভবত মালিক বদল হয়েছে কিছুদিন আগে, বাগানটিতে চূড়ান্ত অযত্নের ছাপ। খাট-বিছানাও ঠিকঠাক নেই বলে মালিকানি প্রথম আমাদের থাকতে দিতে রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু আমরা এক প্রকার জোর করেই নিলাম। তার কারণ, হোটেলটির অবস্থান অতি চমৎকার জায়গায়। বড় রাস্তার খুব কাছেই একটা টিলার ওপরে হোটেল, রাস্তার ওপরেই লোয়ার নদী। ঘরে শুয়ে দেখা যায়। কাছাকাছি অন্য বাড়ি নেই বলে খুব নিরিবিলি। মনে হয় যেন হোটেল নয়, নদীর ধারে এক বাংলো। ভাড়াও বেশ সস্তা, আমরা এরপর এখানেই তিন চারদিন থেকে যাব ঠিক করলাম।

একসঙ্গে বেড়াতে বেরুলে দলের সবার মধ্যে একটা মিল দরকার। একজন কেউ বাতিকগ্রস্ত হলেই অনেক আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। কারুর যদি খাদ্যের ব্যাপারে খুঁতখুঁতুনি থাকে, কেউ যদি হাঁটতে রাজি না হয়, কারুর যদি জিনিসপত্র কেনার বাতিক থাকে, তাহলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমাদের এই দলটির চারজনের চরিত্র একেবারে আলাদা, প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত বেশ উগ্র, তবু আমরা একটা নিখুঁত টিম। ভ্রমণের ব্যাপারে একজন কোনও ইচ্ছে প্রকাশ করলেই অন্য তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়। ভাস্কর যদি একদিন বেশি হাঁটাহাঁটি করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তা হলে আমরা ধরেই নিই যে পরের দিন ও দ্বিগুণ উৎসাহ দেখাবে। চলন্ত গাড়িতে যেতে-যেতে বাদল যদি একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, আমরা ওই বাড়িটা দেখতে যাব না? অসীম সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গাড়ি ঘোরায়। অসীম হোটেল খোঁজার জন্য বহু সময় ব্যয় করলেও আমরা জেনে গেছি, শেষ পর্যন্ত ওর পছন্দটা অতীব প্রশংসার যোগ্য হবেই।

হোটেলটায় জিনিসপত্র রাখার পর ভাস্কর জিগ্যেস করল, এখানে কাছাকাছি দেখার মতন সবচেয়ে ভালো জিনিস কী আছে রে?

আমি অসীমের দিকে তাকিয়ে বললাম, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বাড়ি, তাই না?

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলল, চল, এক্ষুনি সেটা দেখে আসি।

বাদল জিগ্যেস করল, তা হলে জুতো খুলব না তো?

অসীম বলল, লিওনার্দোর বাড়ি দেখতে অনেকটা সময় লাগবে, ভাস্কর। এখন সন্ধে হয়ে এসেছে। কাল সকালে যাওয়াই ভালো। কাছেই আমবোয়াজ শহর, চলো সেই শহরে গিয়ে এমনি কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই। সবসময় যে নামকরা কিছু দেখতেই হবে তার কি মানে আছে?

ভাস্কর তাতেই রাজি, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জলি গুড আইডিয়া। চলো।

আমবোয়াজ শহরের প্রান্তে এসে গাড়িটা রাখা হল নদীর ধারে। তারপর আমরা হাঁটতে লাগলাম। সন্ধে হয়ে এসেছে, ম্লান আলো ছড়িয়ে আছে নদীর ওপরে। এখানে নদীর ধারে মানুষজনকে হাওয়া খেতে দেখা যায় না। দু-এক জোড়া নারী-পুরুষ হাঁটছে হাত-ধরাধরি করে।

নদীপ্রান্ত ছেড়ে আমরা ঢুকে পড়লাম শহরে। আমবোয়াজ আর কী শহর, জনসংখ্যা অতি নগণ্য, আমাদের একটা বড় গ্রামেও এর চেয়ে বেশি লোক থাকে। তবু এখানকার সব পথঘাট বাঁধানো, দু ধারে অজস্র দোকান। কাফে-রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্য সব দোকানই ছ'টার পর বন্ধ হয়ে যায়, কাচের ভেতর দিয়ে দোকানগুলো দেখতে দেখতে হাঁটতেই ভালো লাগে।

কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হয়, এই রাস্তা দিয়ে একদিন লিওনার্দো দা ভিঞ্চিও নিশ্চয়ই হেঁটেছিলেন।

॥ ৩৬ ॥

"আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি
তোমার বাস্তবতা হারিয়ে ফেলেছ
এখনও কি সময় আছে তোমার জীবন্ত শরীর স্পর্শ করার
এবং যে ওষ্ঠ থেকে আমার অতি প্রিয় স্বর জন্ম নেয় সেখানে চুম্বন দেওয়ার?...
আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি যে হয়তো
আমার পক্ষে আর জাগাই সম্ভব হবে না
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোই, আমার শরীর সব রকম জীবন ও ভালোবাসার জন্য উন্মুক্ত...
আমি তোমার ভুরু ছুঁতে পারি, ওষ্ঠ ছুঁতে পারি এত কম...
আমি তোমাকে এত বেশি স্বপ্ন দেখেছি, হেঁটেছি, কথা বলেছি।
শুয়েছি তোমার ছায়ার সঙ্গে..."

—রোবেয়ার দেনো

মার্গারিটের কাছ থেকে আমি কত দূরে সরে এসেছি! আমার বয়েস বেড়েছে কিন্তু মার্গারিটের বয়েস একটুও বাড়েনি। শেষবার যখন আমি মার্গারিটকে ওর্লি বিমানবন্দরের বারান্দায় দেখি, তখন তার বয়েস সাতাশ, মাথা ভরতি না-আঁচড়ানো ঈষৎ লালচে রঙের চুল, ঠোঁটে মাখেনি রং, আঁকেনি ভুরু, মুখে কোনওরকম প্রসাধনের চিহ্ন নেই, একটা গোলাপি রঙের স্কার্ট পরা। মার্গারিটের সেই মূর্তিটাই আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে। আমার প্যারিস ছাড়ার ফ্লাইট ছিল ভোরবেলা। সেবারে বিদায় নেওয়ার সময় আমরা হাসাহাসি করব, কোনওরকম বিচ্ছেদের কথা তুলব না, পরস্পরের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। মালপত্র চেক-ইন করিয়ে আমরা দুজনেই মজার মজার গল্প মনে করে বলছিলাম আর হাসছিলাম খুব, মার্গারিট তার প্রিয় কবি আপোলিনেয়ারের কাব্যগ্রন্থ 'বিসতেয়ার' থেকে ছোট ছোট কৌতুক-কবিতা শোনাচ্ছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে আমরা কেউই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। মার্গারিট কান্নায় ভেঙে পড়ে রেলিং টপকে নেমে আসার চেষ্টা করছিল নীচে, দুজন বিমানকর্মী তার হাত ধরে টেনে রাখল। আমি তখন বিমানের সিঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকছি, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ওই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ, পেছনের অন্য যাত্রীরা ঠেলছে আমাকে। তখন আর আমার ফেরার কোনও উপায় নেই।

মার্গারিটের সেই কান্না-ভেজানো মুখ, যেন জঙ্গলের কোনও গাছের না-ছেঁড়া, শিশির মাখানো শুভ্র মুখ।

আমার ঠিক পরেই যাঁরা আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, শঙ্খ ঘোষ এবং জ্যোতির্ময় দত্ত, এঁদের দুজনের সঙ্গেই মার্গারিটের যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এঁরাও মার্গারিটের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানেন না। পল এঙ্গেল আমাকে নরম করে বলেছিলেন, কারা যেন ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে...। হয়তে জোর করতেও হয়নি, সরল বিশ্বাসেই মার্গারিট তাদের গাড়িতে উঠেছিল। সব মানুষকেই সে বড় বেশি বিশ্বাস করত, কালো মানুষদের প্রতি তার একাত্মবোধ ছিল। পৃথিবীতে যত রকম অপরাধ আছে, তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে কোনও অনিচ্ছুক নারীর প্রতি কোনও পুরুষের নিছক গায়ের জোরে যৌন অত্যাচার! ইস্, কত কষ্ট পেয়েছিল মেয়েটা।

কাল রাত্রে আমার একেবারেই ঘুম হয়নি। শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ বাদেই হঠাৎ পেট আর বুক জ্বলতে শুরু করে। সাধারণ জ্বলুনি নয়, যেন একটা দাবানল ছুটে বেড়াচ্ছে শরীরের অভ্যন্তরে। ভাস্করের কাছে নানা রকম অ্যান্টাসিড থাকে। ওকে না জাগিয়ে ওর ব্যাগ খুলে দুটো ট্যাবলেট খেয়ে

লাগাম। তাতে একটুও কমল না। ডিনারের সময় কোনও রকম একটা খাবার আমার সহ্য হয়নি? ফুড পয়জনিং? অন্য তিনজনের কিছু হয়নি কেন, তারা তো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। রাত্তিরে কোনও রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে আমরা প্রত্যেকে একই খাবার খাই না, যে-যার পছন্দমতন ডিস নিই, আমি নিয়েছিলাম খরগোশের মাংস, শুধু সেটা বিষাক্ত ছিল?

খাবারের ব্যাপারে আমার কোনও বাছ-বিচার নেই, নতুন নতুন খাদ্যও পরীক্ষা করে দেখতে বেশ ভালো লাগে। ব্যাঙ, বাদুড় ও জেব্রার মাংস চেখে দেখেছি, চিনে গিয়ে নানা রকম অচেনা খাবার মধ্যে সাপের মাংসও খেয়ে থাকতে পারি। সব কিছুই তো দিব্যি হজম হয়ে যায়। তা হলে আজ কী হল? আগুনের জ্বালাটা ক্রমশ বাড়ছে, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে! বিছানায় শুয়ে থাকতে পারছি না, ছটফট করছি ঘরের মধ্যে। আরও দুবার অ্যান্টাসিড খেয়েও কোনও সুফল পাওয়া গেল না। এটা কি তবে আকস্মিক আলসার? কোনও কোনও লোকের হঠাৎ অ্যাপেনডিক্স ফেটে মৃত্যু হয়। ফুড পয়েজনিং-এও তো মারা যায় কেউ কেউ। আমার সারা শরীর একবার কেঁপে উঠল।

রিল্‌কে বলেছেন, পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের পর যে মানুষের মাঝে মাঝে মৃত্যু চিন্তা আসে না, তার কোনও বোধশক্তিই নেই। মৃত্যুভয় এক ধরনের বিলাসিতাও বটে, যা চূড়ান্ত কল্পনার লোকে নিয়ে যায়। আসল মৃত্যু যখন আসে, তখন এ সব বিলাসিতার সুযোগ পাওয় যায় কি না কে জানে!

আমার মৃত্যুভয় কখনওই পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হয় না। তারপর হাসি পায়। অত কষ্টের মধ্যেও আমার মনে হল ফ্রান্সের এক ক্ষুদ্র শহরে, হোটেল ঘরের মধ্যে আচমকা মৃত্যুর মতন নাটকীয় ঘটনা মোটেই আমার পছন্দ নয়। বন্ধুরা তা হলে মহাবিপদে পড়ে যাবে। একসঙ্গে বেড়াতে এসে এটা হবে আমার বিশ্বাসঘাতকতা। মরে না গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তো ওদের খুবই বিব্রত করা হবে! ওসব চলবে না।

যাই হোক, শেষ রাত্তিরের দিকে আমার পর পর দুবার বমি হল। একেবারে বেসিন ভেসে যাওয়ার উপক্রম। ঋষি অগস্ত্যের মতন আমি যেন এক সমুদ্র বমন করলাম। তাতেই নিভে গেল আগুন। বেরিয়ে গেল খাদ্যের বিষ। এরপর প্রচুর ঠান্ডা জল খেয়ে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ধুয়ে ফেললাম, চমৎকার শান্তি হল, কিন্তু আর ঘুম এল না। ভোরের আলো ফোটার পর আমি গায়ে একটা শাল জড়িয়ে চলে এলাম হোটেলের সামনের চত্বরটায়। একটু নীচেই হাইওয়ে, তার ওপাশে লোয়ার নদী। চতুর্দিকের নির্মল নীরবতার মধ্যে নদীটি একমাত্র জেগে আছে।

মৃত্যুর অনুভূতির সময় পর পর দ্রুত প্রিয়জনের কথা মনে আসে, মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, কলকাতা, অসমাপ্ত লেখা, বন্ধু-বান্ধব, রবিবার দুপুরের আড্ডা। সব কিছুতেই মায়া জড়ানো। এখন শরীরটা অনেকটা হালকা ও সুস্থ লাগছে, এখন আবার মনে হচ্ছে, যথেষ্ট দিন তো বাঁচা হয়েছে, যিশুখ্রিস্ট, শেলি, কিটস, মোপাসাঁ, মাইকেল মধুসূদন, স্বামী বিবেকানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত আমার চেয়ে কম বয়েসে মারা গেছেন, আমি মরে গেলেও ক্ষতি কিছু ছিল না। বেশ এই লোয়ার নদীর তীরে আমাকে কবর দেওয়া হত, একদিন সেই কবরের মাটির ওপর গজিয়ে উঠত নাম-না জানা গাছ। আবার বিলাসিতা।

আমরা অনেকেই বেঁচে আছি, শুধু মার্গারিট নেই। অথচ তার হারিয়ে যাওয়া একেবারেই উচিত ছিল না।

এবারের ভ্রমণে এসে বন্ধুদের কাছে আর মার্গারিটের কথা উল্লেখ করি না। ওরা বাড়াবাড়ি মনে করতে পারে। শুধু একবার, গাড়িতে আসার সময় এবারেও পোয়াতিয়ে'র পাশ দিয়ে এসেছিলাম, সেখানে একটা রাস্তায় লুদাঁ গ্রামের দিকে তীর আঁকা ছিল। মার্গারিটের জন্মস্থান। আমি মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলাম, অসীম, একবার লুদাঁ ঘুরে গেলে হয় না। অসীম ধমক দিয়ে বলেছিল, আবার? একবার তো গিয়েছিলে? সেখানে কী দেখতে পাবে? শুধু শুধু ঝামেলা করার কী দরকার?

অসীম ঠিকই বলেছে। শুধু শুধু লুর্দ গ্রামে গিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া মার্গারিট সম্পর্কে আমার যা অনুভূতি, অন্যদের তো তা হতে পারে না। এখানে ঘুরতে-ঘুরতে মার্গারিটের কথা আমার বারবার মনে পড়বেই। টুকরো টুকরো ইতিহাস, ছবি, কবিতা, ভাস্কর্য, এই সবের সঙ্গেই মার্গারিটের অনুষঙ্গ জড়ানো। মার্গারিটের সঙ্গে কবে, কোথায় এই সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তার কিছুই আমি ভুলিনি। আজ আমরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শেষ জীবনের বাড়িটি দেখতে যাব। লিয়োনার্দোর আঁকা বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসা ছবিটি আমি প্রথমবার দেখি মার্গারিটের সঙ্গে। প্রথম প্রথম মার্গারিট আমাকে ওই ছবিটা দেখতে দিত না। নরম ধমক দিয়ে বলত, না, ওটা তোমায় দেখতে হবে না, সব টুরিস্টরা ওটা দেখার জন্য ছোটে, এমন কিছু দেখার মতন নয় ছবিটা। তার চেয়ে আরও কত ভালো ভালো ছবি আছে, দেখা হয় না...।

আমরা প্রায়ই যেতাম লুভ্‌র মিউজিয়ামে। দুটো তিনটে ঘর বেছে নিয়ে সেখানকার সব ছবি দেখতাম মন দিয়ে। মার্গারিট পুরো শিল্পের ইতিহাস আমাকে টুকরো টুকরো ভাবে বুঝিয়ে দিত। ইটালিয়ান শিল্পীদের অনেক ছবি দেখার পর মার্গারিট বলেছিল, এবার আমরা মোনালিসাকে একবার দেখতে পারি। প্যারিস ছাড়ার শেষ দিনটায় লুভ্‌র মিউজিয়ামে দুজনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হল মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তা হলে কি মোনালিসা দেখা হবে না? দুজনে মিলে ছুটতে ছুটতে, অন্যদের হতচকিত করে, একটার পর একটা কক্ষ পার হয়ে আমরা মোনালিসার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, ও এই। মার্গারিট হাসিতে ভেঙে পড়েছিল। এত বিখ্যাত ছবিটি প্রথম দর্শনে হতাশ হতেই হয়।

সকলের ঘুম ভাঙবার পর বাদলের তৈরি চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমবোয়াজ-এর দুর্গ-প্রাসাদটি এমন কিছু দেখবার মতন নয়। এককালে খুবই বিশাল ছিল, এর সঙ্গে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাসও জড়িত, কিন্তু এখন বলতে গেলে একটি ভগ্নস্তূপ। দু'দিকের প্রাচীর ও প্রাসাদের সামান্য কিছু অংশ কোনওক্রমে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

একেই তো এই অবস্থা তার ওপরে আবার গাইডের উৎপাত। প্রত্যেক শাতো-তেই ঢুকতে পয়সা লাগে, এখানে ভেতরে এসে জানা গেল যে রাজা-রানিদের ঘরগুলো দেখবার জন্য গাইড নিতে হবে, না হলে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ আবার পয়সা খরচ। একজন গাইড আমাদের পাশে এসে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। রাজা-রানিদের ঘর আমরা অন্য জায়গায় যথেষ্ট দেখেছি, আর না দেখলেও চলবে। সর্বসম্মতিক্রমে গাইডটিকে বিদায় করে দেওয়া হল। আমার নিজেরাই দুর্গের মধ্যে ঘুরতে লাগলাম। এত উঁচু থেকে লোয়ার নদীর একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শুধু সেইটা দেখাই তো যথেষ্ট।

প্রাচীরের পাশ দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে চোখে পড়ল একটা প্রাচীন ভাঙা গির্জা। সেখানে রয়েছে লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির একটি আবক্ষ মূর্তি। তার নীচেই ওই মহান শিল্পীর মরদেহ সমাহিত।

আমবোয়াজের ভেতরের বাগানটি এখনও খুবই সুদৃশ্য। হাজার রকম ফুলের সমারোহ। এখানকার বাগানের খ্যাতি কয়েক শতাব্দী ধরে। রাজা অষ্টম শার্ল এই বাগান বানিয়েছিলেন। তিনি ইতালিতে গিয়ে সেখানকার বাগান দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, বলেছিলেন, আহা, যদি একটি আদম ও ইভ থাকত, তা হলেই এ যে স্বর্গোদ্যান হয়ে যেত। ইতালিয়ানদের অনুকরণেই তিনি এখানে বাগান শুরু করেন। এই শাতো-টির জাঁকজমক শুরু হয় তাঁর আমলেই। অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁর এখানেই মৃত্যু হয়েছিল। একদিন রানির সঙ্গে তিনি এখানকার চত্বরে টেনিস খেলা দেখতে আসছিলেন। একটা নীচু দরজা পার হওয়ার সময় মাথায় গুঁতো খান খুব জোরে। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি বলে তিনি এগিয়ে গেলেন, খেলা দেখতে দেখতে হাসি-গল্প করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল খেলার মাঠের পাশেই একটা ছোট্ট ঘরে, খড়ের বিছানায়। লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটতে লাগল বটে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি যে রাজা কতটা

অসুস্থ। ফ্রান্সের রাজা অষ্টম শার্ল বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন সেখানেই।

এই অঞ্চলের অনেকগুলি শাতোর সঙ্গেই রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া'র নাম সংযুক্ত। ফরাসি দেশের ইতিহাসেও যেমন তাঁর বিশিষ্ট স্থান, তেমনি এই রকম বিশাল বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ ও পরিবর্ধনে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রাসাদে থাকতেন। প্রথম ফ্রাঁসোয়া যখন তরুণ যুবক ও যুবরাজ, সেই সময় তিনি আমবোয়াজ-এ এসে প্রাসাদটি আরও সুসজ্জিত করেন। যুদ্ধবিদ্যা, নাচ-গান এবং আমোদ-প্রমোদ সব দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল এবং তাঁর শিল্প-রুচিও খুব উন্নত। এই প্রথম ফ্রাঁসোয়া'ই ইতালি থেকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে সসম্মানে এখানে নিয়ে আসেন। রনেশাঁস আমলের সেই পুরোধা শিল্পীকে তিনি একটি অতি উত্তম বাড়ি দিয়েছিলেন, ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন প্রচুর টাকা মাসোহারার। লিওনার্দো এখানে নিজস্ব কাজ বা লেখাপড়া যা খুশি করবেন, শর্ত শুধু একটাই, মাঝে মাঝে রাজা এই শিল্পীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার সময় চাইবেন।

ফ্লরেন্স তখন পশ্চিমি শিল্পের রাজধানী। সেই নগর ছেড়ে লিওনার্দো এই আমবোয়াজ-এর মতন এক অখ্যাত জায়গায় আসতে রাজি হলেন কেন, তা অবশ্য জানা যায় না। হয়তো শেষ জীবনটা নিরিবিলিতে কাটাবারই ইচ্ছে ছিল তাঁর। এখানে তিনি বেঁচে ছিলেন চার বছর। নদী-নালা ও স্থাপত্য বিষয়ে রাজাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৫১৯ সালের ২ মে, ৬৭ বছর বয়েসে লিওনার্দোর মৃত্যু হয়। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া লিওনার্দোর এমনই ভক্ত ছিলেন যে এই শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁর আর এখানে মন টেকেনি, তিনিও আমবোয়াজ ছেড়ে চলে যান। পরে এখানে এসেছেন পম্পাডুর।

রনেশাঁস বা রেনেশাঁস শব্দটি ফরাসি হলেও সকলেই জানেন যে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ইতালিতে। ইতালিয়ান ভাষায় একে বলে রিনাসেনৎসা বা পুনরুত্থান। এখান থেকেই পশ্চিমি সভ্যতায় মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিককালের শুরু। আমাদের প্রাচ্যে এই মধ্যযুগ আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে, আমরা আধুনিককালে উপনীত হয়েছি আরও অনেক পরে।

ইতালির কবি পেত্রার্ক-কে অনেকেই এখন মনে রেখেছেন তাঁর পত্নী লরার উদ্দেশ্যে রচিত সনেটগুলির জন্য, কিন্তু এই পেত্রার্ক-ই বলতে গেলে প্রথম রনেশাঁসের মূল সূত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে পেত্রার্ক বললেন যে, প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী যে মধ্যযুগ, তা প্রায় একটা অন্ধকার যুগ, এর আগেকার যে গৌরবময় ক্লাসিকাল যুগ, তার কথা আমরা ভুলে গেছি। ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক সুনীতির পুনরুদ্ধার করতে হবে, এবং শুধু সেগুলির অনুকরণ নয় তাদের উৎকর্ষের বিশ্লেষণ করে এগোতে হবে সামনে, নইলে একালের বর্বরতার অবসান হবে না। তরুণ সমাজকে তিনি ডাকলেন 'বিস্মরণের ঘুম' ভেঙে জাগতে। এই সময় এক নতুন মানবতাবাদেরও জন্ম হল, এতদিন ইউরোপে পাপবোধ এবং ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রবল ছিল (আমাদের নিয়তিবাদের মতন), এই সময় থেকে একটা চেতনা জাগ্রত হল যে মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা এবং কর্মফলের প্রভু। মৃত্যুর পরে আত্মাকে রক্ষা করার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ জীবনের চিন্তায় মগ্ন হল। এই চিন্তার প্রতিফলন হল শিল্পে, সাহিত্যে।

বহু শত বর্ষ ধরে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ইতালি ছেড়ে চলে গিয়েছিল কনস্টান্টিনোপল। বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা বাসা বেঁধেছিলেন সেখানে। মধ্যযুগের সায়াহ্নে সেই কনস্টান্টিনোপলের গৌরবও প্রায় অস্তমিত, তরুণ তুর্কিরা সেখানে বারবার হানা দিচ্ছে, রোমান সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে সেখানে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন। তাই দেখে বড় গ্রিক পণ্ডিত-দার্শনিকরা চলে এলেন রোমে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ইতালি আবার উন্নত হয়ে উঠল। খ্রিস্টান জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপের আধিপত্য খর্ব হল অনেকটা, ভ্যাটিকানের ওই সর্বোচ্চ পদের জন্য দুই পোপ সাধারণ স্বার্থসম্পন্ন মানুষের মতন এমন লড়ালড়ি শুরু করে দিল যে, ঈশ্বরের এই প্রতিনিধি সম্পর্কে অনেকের ভক্তিশ্রদ্ধা

চলে গেল। বিজ্ঞানেও এল নতুন আলো। এতদিন ধরে পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়েই শুধু আলোচনা করতেন এবং বই লিখতেন, এখন শুরু হল হাতে-কলমে পরীক্ষা, জন্ম হল আধুনিক বিজ্ঞানের। কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন মহাকাশ। এই প্রথম শ্বেতাঙ্গ জাতি জানল যে, সূর্য আকাশ জুড়ে চলাফেরা করছে না, পৃথিবীটাই তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

মানবতাবাদের আন্দোলন ছড়িয়ে গেল অন্যান্য দেশেও। দুর্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ড ও পোর্তুগিজ নাবিকেরা অকূলে জাহাজ ভাসিয়ে ঘুরে গেল আফ্রিকা, ছুঁয়ে গেল ভারত। পৃথিবীর নতুন নতুন অংশ যেমন আবিষ্কৃত হল, তেমনি আবিষ্কৃত হতে লাগল মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা। হল্যান্ডে ইরাসমুস হলেন মুক্তচিন্তার প্রবক্তা। জার্মানিতে শিল্পী ডুরের-এর সৃষ্টিতে ফুটে উঠল এই নবজাগরণের চেতনা। ফ্রান্সে তখনও বড় শিল্পী বিশেষ কেউ ছিল না, কিন্তু মনতেইন্ ও রাবেলে'র রচনায় দেবতাদের ছাড়িয়ে মানুষই প্রধান হয়ে উঠল। ইংরেজরা তখনও ছবি আঁকতে শেখেইনি বলতে গেলে, গান-বাজনায় তাদের অবদান শূন্য, কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই তারা বিশ্বকে দিল এক বিস্ময়কর উপহার, উইলিয়াম শেকসপিয়র!

ইতালিতে তখন এক অভূতপূর্ব শিল্পী-সমাবেশ ঘটেছে। ফ্লরেন্স শহরেই এক সময় ধানাঢ্য মেদিচি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একসঙ্গে ছবি আঁকা ও ভাস্কর্যে নিমগ্ন থেকেছেন মিকেলাঞ্জেলো, বত্তিচেল্লি এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতন বিরাট প্রতিভাবান শিল্পীরা। আর একজন শিল্পী, যিনি শিল্পের ইতিহাসের একটি স্তম্ভস্বরূপ, সেই রাফায়েল তখনও অতি তরুণ।

রনেশাঁস আমলের এই সব শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য হল, এঁরা শুধু ছবি আঁকেননি কিংবা মূর্তি বানাননি। এঁরা সমসাময়িক কালের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানেও এঁদের ছিল সমান যোগ্যতায় বিচরণ। মিকেলাঞ্জেলো ভ্যাটিকানের সিস্তিন চ্যাপেলে যে চিত্রমালা রচনা করে গেছেন, সেটাই তাঁর অমরত্বের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এক সময় আঁকা ও মূর্তিগড়া ছেড়ে তিনি যুদ্ধনীতি নির্ধারণে মন দিয়েছিলেন এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন। সত্তর বছর বয়েসে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাঁর কিছু কিছু সনেট আজও বিখ্যাত। শিল্পী রাফায়েল ছিলেন এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক, দলবল নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে তিনি প্রাচীনকালের প্রচুর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন।

রনেশাঁস-চরিত্রের প্রতিভূ বলা যায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চিকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি নিঃসন্দেহে মোনালিসা। এর প্রিন্ট দেখেনি, শিক্ষিত সমাজে এমন মানুষ বিরল। তাঁর 'দা লাস্ট সাপার' প্রায় একই রকম স্মরণীয়। কিন্তু এই ছবি দুটির খ্যাতি তাঁর অন্যান্য কীর্তিকে অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। তাঁর কালে তিনি ছিলেন প্রধান স্থাপত্যবিদ ও নদী-বিশেষজ্ঞ; কবিতা লিখেছেন এবং সঙ্গীত রচনা করেছেন; মনুষ্য শরীর সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল সেকালের অনেক চিকিৎসকের চেয়েও বেশি। এবং শিল্পী হিসেবে তিনি বেশি বড় ছিলেন, না বিজ্ঞানী হিসেবে, সে সম্পর্কে তর্ক তোলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, বৈজ্ঞানিক, বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। অনেকের মতে, তিনি তাঁর যোগ্য সময়ের চারশো বছর আগে জন্মে গেছেন! অত কাল আগে, যখন মানুষ আকাশে ওড়ার কথা চিন্তাই করেনি, তিনি তখন হেলিকপ্টারের নিখুঁত ডিজাইন করে ফেলেছিলেন।

আমবোয়াজ প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে আমরা এগোলাম লিওনার্দোর বাড়ির দিকে। পুরোনো শহরের পাথর বাঁধানো সরু-পথ, সবটা গাড়ি যায় না। উঁচুনীচু রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। কোনও এক সময় লিওনার্দোর বাড়ি থেকে একটা ভূগর্ভ সুড়ঙ্গ ছিল রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত, প্রবীণ শিল্পী সেই পথে যেতেন তরুণ রাজার সঙ্গে দেখা করতে, রাজাও গোপনে আসতেন শিল্পীর কাছে।

এক সময় বাড়িটার মস্ত বড় কাঠের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। বাড়িটির নাম 'ল্য ক্লো-লুসে'। এই ধরনের বাড়িকে বলে ম্যানর হাউজ, এর সংলগ্ন রয়েছে একটা চ্যাপেল। এক সময়

রাজা-রানিরাও এই বাড়িতে থেকেছেন। প্রাচীন বাড়িটি প্রায় অবিকৃত রয়েছে, এটাই এর বৈশিষ্ট্য, এর মধ্যে পা দিলেই চারশো বছর আগেকার হাওয়া যেন এখনও গায়ে লাগে।

একটাই মুশকিল, প্রচুর লোকজনের ভিড়। নিরিবিলিতে এই সব জায়গা ঘুরে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু উপায় তো নেই। অবশ্য এখানে কেউ চ্যাঁচামেচি করে না। সারিবদ্ধভাবে সবাই নিঃশব্দে এগোয়।

রোম থেকে এখানে আসবার সময় খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে লিওনার্দো যেসব মালপত্র এনেছিলেন, তার মধ্যে ছিল তাঁর প্রিয় তিনটি ছবির ক্যানভাস। তার একটি হচ্ছে মোনালিসা। এখানে এসে বাড়িটি নিজের মতন করে সাজিয়েছিলেন। খেতে ভালো বাসতেন। তাই রান্নাঘরটি বেশ বিরাট। তাঁর বিছানাটি রাজা-রাজড়াদের যোগ্য। রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই শিল্পীকে যে খুবই খাতির করতেন, তার প্রমাণ আছে অনেক। যে ঘরে লিওনার্দো শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, সেটি রাখা আছে হুবহু অবস্থায়। শিল্পী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন রাজা তাঁর শিয়রের পাশে এসে বসেছিলেন।

বিভিন্ন ঘরের দেওয়ালে যেসব ছবি, তার অধিকাংশই কপি, আসলগুলি অন্যত্র চালান হয়ে গেছে। একটি ছবি দেখে আমার চোখ আটকে গেল। এক নারী, তার মুখখানা অবিকল মোনালিসার মতন, কিন্তু সমগ্র মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া! আসল মোনালিসার ছবির হাসিটিই সুপ্রসিদ্ধ। ওই মহিলার মুখে হাসিটি ফুটিয়ে রাখার জন্য লিওনার্দো চেয়েছিলেন যাতে ওর মেজাজ সব সময় প্রসন্ন থাকে। মহিলাকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকার সময় পেছন থেকে নানা রকম সঙ্গীতের ঝঙ্কার আসার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে লিওনার্দো এক দুঃখী মোনালিসার ছবি আঁকার কথাও ভেবেছিলেন? এ ছবিটির কথা আমি আগে কোথাও পড়িনি।

নীচের তলায় একটি ঘরে সাজিয়ে রাখা রয়েছে লিওনার্দো আবিষ্কৃত এবং পরিকল্পিত নানারকমের যন্ত্রপাতি। লিওনার্দো কিছু মডেল বানিয়েছিলেন, কিছু কিছু নিখুঁত স্কেচ করে গিয়েছিলেন, সেই সব দেখে IBM কোম্পানি সবগুলির নতুন করে মডেল বানিয়ে দিয়েছে। সে সব দেখলে সত্যি তাজ্জব হতে হয়। পেট্রোলিয়াম কিংবা বিদ্যুৎ আবিষ্কারের কয়েকশো বছর আগে এই সব যন্ত্রের আকার-প্রকারের চিন্তা একজন মানুষের মাথায় এসেছিল কী করে?

মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে, আর্মার্ড ট্যাংক, প্লেন, হেলিকপ্টার, প্যারাসুট, ট্রিপল ফায়ার মেশিনগান, হাইড্রলিক টারবাইন, ক্যাটাপল্ট , অনেক রকমের কামান এবং বিভিন্ন ধরনের সেতু। আমাদের মধ্যে অসীমই একমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্র, সে উৎসাহের সঙ্গে জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগল। ভাস্কর এক সময় বলল, ওফ্! একটা লোক এক জীবনে এত কিছু করেছে, আর পারা যাচ্ছে না!

আমি বাদলকে বললাম, ম্যানেজার সাহেব, খিদে পেয়ে গেছে। এখন কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলে হয় না?

বাদল বলল, খিদে তো আমারও পেয়েছে খুব, মুখ ফুটে বলছিলুম না।

আগের রাত্রে পেট-জ্বালার জন্য ভয়ে আমি সকালে ব্রেকফাস্টে কিছুই খাইনি। এখন খিদে পাওয়ায় মনে হল, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। এত কিছু দেখে আমাদের মন ভরে গেছে, এবার পেটের জন্য কিছু চাই।

বাইরে বাগানের উজ্জ্বল আলোয় এসে লিওনার্দোর রচনার তিনটি লাইন মনে পড়ল। 'আলোর দিকে তাকাও, ভোগ করো এর রূপ। চক্ষু বোজো এবং আবার দ্যাখো। প্রথমেই তুমি যা দেখেছিলে তা আর নেই, এর পর তুমি যা দেখবে, তা এখনও হয়ে ওঠেনি।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া রাস্তার ধারে এক মাঠে বসে সেরে নিয়ে আমরা আবার চলিষ্ণু হলাম পরবর্তী অভিযানে। পরের দুটো দিন আমরা আরও বেশি কয়েকটি শাতো দেখলাম, যেমন ব্লোয়া, এঁজে-ল্য-রিদো, শিনো, আঁজে, শোমোঁ-সুর লোয়ার, তুর; একটুখানি দেখে বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে গেলাম

তালমি, সোমুর, পিথিভিয়ের, ল্য মান, বোজেন্‌সি প্রভৃতি স্বল্পখ্যাত জায়গাগুলি। সবগুলির বর্ণনা দেওয়ার কোনও মানে হয় না। এর মধ্যে ব্লোয়া এবং অঁজে বেশ বিরাট, ইতিহাস ও শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু ততদিনে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অঁজে-তে ট্যাপেস্ট্রির দারুণ সংগ্রহ রয়েছে। বড় বড় কার্পেটের ওপর ফুটিয়ে তোলা ধারাবাহিক চিত্র। সেগুলি মূল্যবান ঠিকই কিন্তু ট্যাপেস্ট্রি দেখে আমি বিশেষ সুখ পাই না। একঘেয়ে লাগে।

ছোট ছোট শহরগুলির শুধু শাতো নয়, ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্য নানারকম মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালাও থাকে। ওয়াইন মিউজিয়াম, প্রায় সর্বত্র, তা ছাড়া আর কত রকমের যে সংগ্রহশালা। যেমন মাশরুম মিউজিয়াম, রেল মিউজিয়াম, সমরাস্ত্রের মিউজিয়াম, পোশাক মিউজিয়াম ইত্যাদি। আমরা সময় বাঁচাবার জন্য দুটো একটা দেখি মাত্র।

একটা জায়গায় বেশ মজা হয়েছিল, সেটা বলে প্রসঙ্গটা শেষ করি।

একটা দুপুর আমরা কাটালাম শিনোঁ (Chinon) শহরে। মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্র শহর, এক সময় পুরোটাই প্রাচীর ঘেরা ছিল, এখনও সেই প্রাচীর কিছু কিছু রয়ে গেছে। লোয়ার নদীর এক শাখা নদী ভিয়েন, তার তীরেই দুর্গ ও অনেক পুরোনো বাড়ি, অদূরেই গভীর জঙ্গল। ভারী সুন্দর জায়গাটি। এক কালে এই নগর ও দুর্গ ইংরেজ রাজাদের অধীনে ছিল।

শাতোটি দেখতে বেশি সময় লাগল না। কিন্তু এখানকার একটি মিউজিয়াম দেখব বলে আগেই ভেবে রেখেছিলাম। সেটার নাম পুরোনো শিনোঁ এবং রিভার ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম। কথিত আছে, ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরির পুত্র রিচার্ড দা লায়নহার্ট এখানে যুদ্ধ করতে-করতে মারা যান এবং ওই বাড়িটিতে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। ছোটবেলা থেকে ইতিহাসে সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের কাহিনি পড়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি, ইনি ক্রুশেড লড়তে গিয়েছিলেন, শেরউডের জঙ্গলে দস্যু রবিনহুডের দলবলের মাঝখানে ইনি হঠাৎ এসে উপস্থি হয়েছিলেন। 'দা লায়ন ইন উইন্টার' নামে একটা দুর্দান্ত নাটকও আছে। সেই বীরকেশরীর সমাধিটা একবার দেখব না।

অনেক ঘুরে ঘুরেও সেই মিউজিয়ামটির সন্ধান পাওয়া গেল না। অসীম রাস্তার নানা ধরনের লোকজন, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে ডেকে জিগ্যেস করে, কেউ কিছু বলতে পারে না। কেউ যেন ওই মিউজিয়ামের নামই শোনেনি। অনেকেই বলল, এখানে একটা বিখ্যাত ওয়াইন মিউজিয়াম আছে বটে, কিন্তু ওইরকম ইতিহাসের কিছু মিউজিয়াম আছে বুঝি।

আশ্চর্য দেশ। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা পর্যন্ত ওয়াইন মিউজিয়ামের খবর রাখে, অথচ একটা ঐতিহাসিক মিউজিয়ামের কথা জানে না?

শিনোঁ অঞ্চলের ওয়াইন অবশ্য বিখ্যাত। প্রতি বছর এখানে মদের উৎসব হয়। প্রখ্যাত লেখক রাবেলে'র শহর এই শিনোঁ। গারগানতুয়া ও পান্তাগ্রুয়েল নামে দুই ভালো মানুষ দৈত্যের কাহিনি লিখেছিলেন তিনি। গারগানতুয়া জন্মের পরেই ড্রিংক, ড্রিংক বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। এখানে পাহাড়ের গুহায় বড় বড় ওয়াইনের বোতল সাজানো থাকে। সে যাই হোক, ওয়াইন মিউজিয়াম দেখার কোনও আগ্রহ আমাদের নেই।

ইতিহাসের মিউজিয়ামটা কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমার বন্ধুদেরও সন্দেহ দেখা দিল। ভাস্কর বলল, কী রে, তুই ঠিক জানিস তো ওরকম কিছু আছে এখানে?

আমার তখন জেদ চেপে গেছে। ওটা দেখতেই হবে। বললাম, আমার কাছে ঠিকানা লেখা আছে, পায়ে হেঁটে খুঁজে দেখব।

গাড়িটা পার্ক করা হল শহরের মাঝখানে। তারপর আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ সরু সরু রাস্তা, অনেকটা কাশীর গলির মতন। খোলা দরজা দিয়ে অনেক বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত দেখা যায়। ঠেলাগাড়িতে বিক্রি হচ্ছে খাবার।

পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত, প্রায় আটশো বছরের পুরোনো অট্টালিকাটির সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের নৈরাশ্যের নিঃশ্বাস ফেলতে হল। দরজা বন্ধ। বাইরে প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। আজ ছুটিছাটার দিন নয়, তবু বন্ধ কেন? একজন দারোয়ান শ্রেণির লোকের কাছ থেকে জানা গেল যে মিউজিয়ামের কিউরেটর হঠাৎ ছুটি নিয়ে গ্রামের গাড়িতে চলে গেছে বলে দরজা খোলা যাচ্ছে না। চাবি তার কাছে।

একজন কিউরেটর ছুটি নিয়েছে বলে সরকারি মিউজিয়ামের দরজা খুলবে না? এরকম ব্যাপার তো শুধু আমাদের দেশেই হয় বলে জানতাম। আমাদের দেশের কোনও কিছুর সঙ্গে সাহেবদের দেশের কোনও কিছুর পুরোপুরি মিল দেখলে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা কিংবা ভারতের নিন্দে করে যারা বই লেখে, তাদের ঘাড় ধরে এনে এই ঘটনাটা দেখাতে পারলে আরও মজা হত।

মিউজিয়ামটির বাইরেই একটা ট্যাবলেটে লেখা আছে, রিচার্ড দা লায়নহার্টের এখানে মৃত্যু হয়েছিল ১১৯৯ সালে।

॥ ৩৭ ॥

"অ্যালবাট্রস, সমুদ্রের বিশাল বিহঙ্গ, যেন অলস
ভ্রমণ-সঙ্গী, জাহাজের পিছু পিছু ওড়ে
গভীর থেকে গভীরে যায় জাহাজ, তারাও সঙ্গে সঙ্গে
যায়
নাবিকেরা এক একসময় তাদের বন্দি করে
খেলাচ্ছলে।

ডেকের ওপর তাদের নামিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
নীল আকাশের রাজা, এই পাখিরা বিভ্রান্ত, এবং
লজ্জা মাখা মুখে
তাদের মস্ত বড় দুটি শাদা ডানা ছড়িয়ে দেয় দু'পাশে
যেন করুণভাবে ঝুলতে থাকা দুটি দাঁড়

কিছুক্ষণ আগেই যে ছিল দুর্দান্ত সুন্দর, এখন সে
কেমন
দুর্বল আর জোবড়া-জোবড়া, সেই উড়ন্ত পর্যটককে
এখন দেখাচ্ছে কী কুৎসিত আর কিম্ভূত
একজন খোঁচাচ্ছে তার চঞ্চু, অন্য কেউ খুঁড়িয়ে
খুঁড়িয়ে নকল করছে তাকে।

কবিও ঠিক যেন এই মেঘের যুবরাজের মতন
ঝড়ের সঙ্গে অনবরত ঘোরে, তিরন্দাজদের উপহাস
করে

নির্বাসিত হয়ে আসে পৃথিবীতে, চতুর্দিকে
ধিক্কার-বিদ্রুপ
প্রকাণ্ড দুটি ছড়ানো ডানার জন্য সে হাঁটতে পারে না।"
—শার্ল বোদলেয়ার

আড্ডা আমাদের বাঙালি জীবনের একটা অঙ্গ, ফরাসিরাও কম আড্ডা মারে না। আমাদের আড্ডা যেখানে-সেখানে জমতে পারে। ওদের আড্ডা বসে কাফে রেস্তোরাঁয় এবং ওদের অধিকাংশ কাফে-রেস্তোরাঁ পানশালাও বটে। কোনও কোনও আড্ডা পরে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়ে যায়।

সেই রকমই একটা আড্ডা ছিল প্যারিসের কাফে গেরবোয়া-তে, গত শতাব্দীতে। আভিনু দ্য ক্লিশি'র ওপরে এই কাফেটি বেশ প্রশস্ত। এখানকার আড্ডাটির বিশেষত্ব এই যে এখানে প্রথম শিল্পীদের সঙ্গে কবি ও লেখকদের মিলন ঘটে। এই কাফের আড্ডাধারীদের মধ্যে দুজন, ফরাসি দেশে তো বটেই, এমনকি বিশ্বেরও আধুনিক শিল্প ও কাব্যের প্রধান পথিকৃৎ। এদুয়ার মানে এবং শার্ল বোদলেয়ার। দুজনেই সমকালে দারুণ নিন্দিত।

এদুয়ার মানে এই আড্ডার মধ্যমণি। অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পীদের সঙ্গে মানের একটা বিরাট তফাত এই যে, তাঁকে কখনও দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, স্বভাবে বুর্জোয়া, ভালো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন, ভালো খাবার ও পানীয়, ভালো রেস্তোরাঁ, নারীদের সঙ্গ, নাচ-গান পছন্দ করতেন। গোড়ার দিকে ছবি আঁকার ব্যাপারে বাবার আপত্তি থাকলেও মায়ের প্রশ্রয়ে পরে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। নিজস্ব স্টুডিওতে নিশ্চিন্তে ছবি আঁকতে পারতেন। শিল্পের জগতে কোনও বিপ্লব ঘটাতেও চাননি মানে, ভেবেছিলেন ভদ্দরলোকদের মতন প্রথাসম্মত ছবি আঁকবেন, ভালো জায়গায় প্রদর্শনী হবে, লোকে প্রশংসা করবে, কিনবে, তিনি স্বাভাবিকভাবে খ্যাতি অর্জন করবেন। কিন্তু বাস্তবে হয়েছিল এর ঠিক বিপরীত। বাহ্যত যিনি বুর্জোয়া এবং বিলাসী তাঁর ভেতরের এক সাংঘাতিক প্রতিভা যেন জোর করে তাঁকে দিয়ে যুগান্তকারী সব ছবি আঁকাচ্ছিল কোনও কোনও সমালোচক বলেছেন, মানে যেন একই অঙ্গে ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড।

বোদলেয়ার শুধু কবি নন, তিনি তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ শিল্প সমালোচক এবং এখনও সমালোচকদের কাছে আদর্শস্বরূপ। যখন আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীকে বড় বড় সমালোচকরা তুলোধনা করছেন, গালাগালির চোটে ভূত ভাগাচ্ছেন, পত্র-পত্রিকায় তাঁদের নিয়ে শুধু ঠাট্টাবিদ্রূপ চলছে, সেই সময় বোদলেয়ার জোরালোভাবে সমর্থন করছেন এই নতুন শিল্প আন্দোলনকে। মানের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে বোদলেয়ারের নিজেরও খানিকটা উপকার হয়েছিল, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, অর্থকষ্ট, কাব্যগ্রন্থ নিয়ে মামলায় হেরে যাওয়া, ফরাসি আকাদেমির সদস্য হওয়ার চেষ্টাও করেও ব্যর্থ হওয়া, এই সব মিলিয়ে বোদলেয়ার নৈরাশ্যে ভুগছিলেন, আত্মহত্যার ইচ্ছে জাগত মাঝে মাঝে। কিন্তু তীব্র জীবনবোধসম্পন্ন মানের সঙ্গে মিশে তিনি কিছুদিনের জন্য সঞ্জীবিত হয়েছেন, মানে যখন ক্যানভাস-তুলি নিয়ে আঁকতে যেতেন মাঝে মাঝে, তখন বোদলেয়ারও তাঁর সঙ্গে যেতেন। 'তুইলারির বাগানে কনসার্ট' নামে মানের যে একখানা বড় ছবি আছে, সেই ছবিতে অনেক মানুষের মধ্যে বোদলেয়ারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া বোদলেয়ারের একটা চমৎকার এচিং করেছিলেন মানে।

এমিল জোলা তখনও বড় উপন্যাসগুলি লিখতে শুরু করেননি, খবরের কাগজে ফিচার লিখে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি ওই আড্ডার নিয়মিত সদস্য। সুযোগ পেলেই তিনি পত্র-পত্রিকায় শিল্পী বন্ধুদের পক্ষে সমর্থন করে লিখতেন। লেখকদের মধ্যে আরও আসতেন এডমন্দ দুরান্তি, পরে তাঁর খুব খ্যাতি হয়েছিল, সে সময় তিনি ছিলেন বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি, অধিকাংশ সময়েই বসে থাকতেন চুপ করে। ঠোঁটে পাইপ কিন্তু জ্বালাবার কথা মনে থাকত না। তা হলেও তিনি এই শিল্পী গোষ্ঠী নিয়ে প্রথম একটি পুস্তিকা রচনা করেন, "নতুন শিল্পী" নামে। জাকারি আসত্রুক নামে আর একজন

মাঝারি কবি একদিন মানের 'অলিমপিয়া' ছবিটি দেখে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা বানিয়ে ফেলেছিলেন।

এই আড্ডার একেবারে শেষের দিকে কয়েকবার এসেছেন আর এক প্রখ্যাত কবি, স্তেপান মালার্মে।

শিল্পীদের মধ্যে আসতেন পিসারো, রেনোয়া, ক্লদ মোনে। মানে আর মোনে, প্রায় একইরকম নাম, গোড়ার দিকে অনেকে গুলিয়ে ফেলত। পরে দুজনেই আলাদা ধরনের শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হন, এবং দু'জনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

মোনেকে অসম্ভব দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে একসময়। খেতে-না-পাওয়ার স্তরেও নেমে আসতে হয়েছিল। মোনের মিস্ট্রেস (পরে স্ত্রী) কামিল যখন একটি সন্তানের জন্ম দেয়, মোনে তখন বাধ্য হয়ে একা মফস্বলে পিসির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, খবর পেয়ে পুত্রমুখ দর্শন করার জন্য প্যারিসে আসার ট্রেনভাড়াও তাঁর জোটেনি। এই দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করতে হল এই জন্যে যে, এখন মোনের একটি ছবি পঞ্চাশ লাখ টাকায় বিক্রি হলেও বেশ সস্তা বলতে হবে। মোনে অবশ্য দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন, ছিয়াশি বছরের জীবনে তিনি তিন হাজারেরও বেশি ক্যানভাসে ছবি রেখে গেছেন। মোনে সম্পর্কে সেজান বলেছিলেন, 'ওর তো শুধু চোখ—কিন্তু কী অসাধারণ চোখ।'

এঁদের তুলনায় বয়েসে কিছুটা ছোট হলেও সেজান আসতেন এই আড্ডায়। আসতেন সিসলে, এদগার দেগা, আমেরিকান শিল্পী হুইশলার। এবং নাদার। নাদার ঠিক লেখকও নন, শিল্পীও নন, এক আধুনিক রূপকথার নায়ক। তাঁর উপস্থিতি একটা ঝড়ের মতন, অসাধারণ তাঁর প্রাণশক্তি। শিল্পী, লেখক সবারই তিনি প্রিয়। বোদলেয়ার এই নাদার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলি ইত্যাদি রয়েছে এই মানুষটার। বোদলেয়ার এঁকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছেন, মানে উৎসর্গ করেছেন ছবি। জুল ভার্ন তাঁর 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' নামে বইতে একটি চরিত্র গড়েছেন নাদার-এর আদলে, তার নাম আরদাঁ (Nadar ওলটালে অনেকটা Ardan হয়ে যায়)। নাদার কার্টুনিস্ট, সাংবাদিক, আবিষ্কারক। দু-একটা উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এসবের চেয়েও বড় পরিচয় তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানস্পৃহা, প্রায়ই বেলুনে চেপে আকাশে উড়তেন। এবং তিনি সেকালের সবচেয়ে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার।

আড্ডাধারীদের বিচিত্র পোশাক, বিভিন্ন ধরনের মেজাজ। কামিল পিসারোকেও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে বহু বছর কাটাতে হয়েছে, তবু বরাবরই তিনি শান্ত, ধীরস্থির। সমসাময়িক শিল্পীদের নিয়ে একসঙ্গে চলার চেষ্টা তিনি করে গেছেন সারাজীবন। ভাইয়ের মতন, বন্ধুর মতন অন্যদের পরামর্শ দিয়েছেন, নিজের দুঃসময়েও অন্য বিপদাপন্ন শিল্পীদের আশ্রয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে যিনি হয়ে ওঠেন আর এক শিল্প আন্দোলনের নেতা, সেই পল সেজানকে একসময় পিসারো নিজের পাশে বসিয়ে আঁকায় সাহায্য করেছেন। যদিও দুজনের চরিত্রের একটুও মিল ছিল না। তরুণ বয়েসে সেজান ছিলেন অতিশয় দুর্মুখ, যেমন ছিলেন দেগা। নিষ্ঠুর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করায় এঁদের জুড়ি ছিল না। দেগা একবার এক সমালোচক সম্পর্কে বলেছিলেন, (সেই সমালোচকটি জাতে ফরাসি হলেও জন্ম হয়েছিল জার্মানিতে) 'ওই লোকটা জার্মানি থেকে গাছে গাছে লাফিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।' পল সেজান অন্যদের সঙ্গে কটু-কাটব্য করলেও সমীহ করতেন এদুয়ার মানে-কে। নোংরা, ছেঁড়া ঝুলিঝুলি পোশাক, চুল আঁচড়ানো নেই। সেই অবস্থায় কাফেতে এসে অন্যদের সঙ্গে হাত ঝাঁকুনি দিতে-দিতে এগোলেও তিনি শৌখিনবাবু এদুয়ার মানের সামনে থমকে দাঁড়াতেন। তারপর বলতেন, 'মঁসিউ মানে, আমি আপনার সঙ্গে করমর্দন করব না। কারণ আমি সাতদিন স্নান করিনি।'

এই আড্ডায় কোনও মহিলা শিল্পী ছিল না। কারণ, তখনও ভদ্রঘরের মেয়েদের কাফে-রেস্তোরাঁয় আড্ডায় যোগ দেওয়াটা চালু হয়নি। নচেৎ, এঁদের অনেকের বান্ধবী অতীব রূপসী বার্থ মরিসো, যাঁকে মডেল করে মানে বেশ কয়েকটি ছবি এঁকেছেন, এবং যিনি নিজেও ছিলেন প্রতিভাময়ী শিল্পী, তিনি নিজের যোগ্যতাতেই এখানে স্থান করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি থাকতেন আড়ালে।

এই নারীবর্জিত আড্ডায় নিশ্চিত সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করতেন অগুস্ত রেনোয়া। নারী-চিন্তায় বিভোর এই শিল্পী প্রকৃতির মধ্যেও নারীকে দেখতে পেতেন। রেনোয়া একবার বলেছিলেন, "ঈশ্বর যদি নারীদের সৃষ্টি না করতেন, তা হলে বোধহয় আমি শিল্পীই হতাম না।"

কাফে গেরবোয়ার টেবিলগুলো শ্বেত পাথরের, তার ওপর সবসময় ওয়াইন ও বিয়ারের ফেনা। সবাই গুটি গুটি এখানে এসে জমায়েত হতেন বিকেল পাঁচটায়, এঁরা অনেকেই উন্মুক্ত স্থানে ছবি আঁকতেন বলে রোদ পড়ে গেলে ক্যানভাস গুটিয়ে ফেলতেন, অন্যান্য দু-একটা দিন কারুর বাদ পড়েও গেলেও বেস্পতিবার দিনটায় সবার আসা চাই-ই, আড্ডা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। পয়সা ফুরিয়ে গেলে কাফে ছেড়ে সবাই চলে যেত কাছেই এদুয়ার মানের স্টুডিয়োতে। বন্ধুদের খাদ্য ও সুরা দিয়ে আপ্যায়ন করতে মানের কখনও কার্পণ্য ছিল না।

আড্ডার কোনও নির্দিষ্ট বিষয় থাকে না, শিল্পী এবং লেখকরা যে সবসময় শিল্প কিংবা সাহিত্য নিয়েই কথা বলবেন তার কোনও মানে নেই, পরচর্চা, কেচ্ছা-কাহিনি থেকে রাজনীতি, অনেক কিছুই চলে আসতে পারে। ফরাসি দেশের রাজনীতিও তখন বেশ সরগরম। ফরাসি বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলেও গণতন্ত্রের ধারণা অনেকের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে, এদিকে তখন তৃতীয় নেপোলিয়ান সিংহাসনে বসে রাজতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে।

কিন্তু একটা বিষয় আড্ডার মধ্যে প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসে। রিয়েলিজম্ বা বাস্তববাদ। এই শব্দটিই তখন সদ্য তৈরি হয়েছে, এই ধারণাটি বেশ কিছুদিন ধরে শিল্পী-সাহিত্যিকদের পীড়িত করছে। রনেশাঁসের সময় সকলের দৃষ্টি ফিরে গিয়েছিল ক্লাসিকাল যুগের দিকে। তারপরেও তো আবার কয়েকশো বছর কেটে গেল। এখন শিল্পীদের মনে হচ্ছে, সমসাময়িক কালকে বাদ দিলে শিল্প হয় না। চোখের সামনে যা দেখছি, তার থেকে চোখ ফিরিয়ে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে থাকাটা একঘেয়েমির পর্যায়ে এসে গেছে। সৌন্দর্যনির্মাণই শিল্পের শেষ কথা, কিন্তু আধুনিক জীবন, বাস্তব জীবনে কি সৌন্দর্য নেই?

কিন্তু কোন পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তোলা হবে সেই বাস্তব? সেটা খুঁজে পাওয়াই তো শক্ত। বাস্তব মানে কি হুবহু বাস্তব? আমরা চোখের সামনে যা দেখি, সবসময় কি তার সামগ্রিক গভীরতা দেখতে পাই? সাহিত্য, শিল্প কি শুধু আয়না? কিংবা সেই আয়নার প্রতিফলনের ওপর একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়াই কি বাস্তবতা? অনেকেই তখন বলতে লাগলেন, চাক্ষুষ দৃশ্যই আসল সত্য, তার বাইরে আর কিছু শিল্প হতে পারে না। পরিদের আর আঁকা যাবে না। কারণ, পরিদের কেউ দেখতে পায় না। কুরবে নামে একজন শিল্পী যেমন জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'শিল্প হচ্ছে একটা বস্তুগত ভাষা, যার শব্দগুলি দৃশ্যমান জিনিস।' অনেকে সেইভাবেই আঁকতে লাগলেন। কবিতা থেকে রোমান্টিক যুগের অবসান হয়ে গেল, গদ্যও হয়ে উঠল সামসাময়িক।

বোদলেয়ার এবং মানে এই দুজনেই শিল্পে সমসাময়িকতার প্রভাব থাকা উচিত এটা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শিল্প মানেই বাস্তবের প্রতিচ্ছবি, এটা মেনে নিতে পারেননি। নতুন শিল্পরীতি ঠিক কী হবে, সে বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া সেই সময় সহজ ছিল না। বোদলেয়ার বলেছিলেন, 'পুরোনো ধারা বাতিল হয়ে গেছে, নতুন ধারার এখনও সৃষ্টি হয়নি।'

সত্যিকারের অভিযাত্রীরা আগামী বছরেই আমাদের সেই দুর্লভ আনন্দের স্বাদ দিক, যাতে আমরা নবীনকে স্বাগত জানাতে পারি।

হুবহু বাস্তবতার সমর্থকরা যখন দলে বেশ ভারী, সেই সময়েই আর একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

১৮৩৯ সালে এল জে এম ডাগের নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ এক গোপন খবর জানিয়ে দিলেন। সিলভার নাইট্রেট মাখানো তামার পাতের ওপর সূর্যের আলো নিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে তিনি যে কোনও জিনিসের ছবি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কালি, কলম, রং দিয়ে আঁকা নয়,

তবু ছবি। এ যেন ম্যাজিক। তামার পাতের ওপর যে-কোনও জিনিস, যে-কোনও মানুষের প্রতিচ্ছায়া স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসটার নাম প্রথম দিক ছিল ডাগেরোটাইপ, কিছুদিনের মধ্যেই তা ফোটোগ্রাফি নামে পরিচিত হয়। এই আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয়, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসেও একটা বিস্ফোরণের মতন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বিস্ময়ের মধ্যে ফোটোগ্রাফি যে অন্যতম প্রধান তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শিল্পের ইতিহাসেও এর গুরুত্ব অসাধারণ। যারা বাস্তবতার দাবি তুলেছিল তাদের তখন অনায়াসে বলা যেতে পারত, এবার নাও, কত হুবহু বাস্তব চাও। ফোটোগ্রাফ মিথ্যে বলে না। চোখের সামনে যা দেখছ, তা সবই ফুটে উঠছে। তা হলে রং-তুলি নিয়ে আঁকবেটা কী? যাঁরা শুধু পোর্ট্রেট এঁকে দুচার পয়সা রোজগার করত তাদের ভাত মারা যাওয়ার উপক্রম হল। সাধারণ মানুষ ফোটোগ্রাফির অভিনবত্বই লুফে নিল।

প্রথম যুগে কেউ কেউ অবশ্য ফোটোগ্রাফিকে 'প্রকৃতির ওপর জোচ্চুরি' বলে আখ্যা দিয়েছে। আবার অনেক শিল্পীও ফোটোগ্রাফির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। কাফে গেরবোয়ার অন্যতম আড্ডাধারী যে নাদার, সে যেমন সাহসী অ্যাডভেঞ্চারার, তেমনই ভালো ফোটোগ্রাফার, বেলুনে চড়ে সে আকাশ থেকে প্যারিস শহরের ছবি তুলেছে, এরকম দৃশ্য কেউ আগে দেখেনি, তাই নাদারের অত খাতির ছিল। এই নতুন জিনিসটার প্রতি কৌতূহল রইল বটে, কিন্তু অনেক শিল্পী ও কবি নিছক বাস্তবতার দায়িত্ব ফোটোগ্রাফির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বর্ণনার বদলে এল প্রতীক ও রূপকল্প, দর্পণের ছবির বদলে এল বিমূর্ত রূপ। সাহিত্য-শিল্পে ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে গেল বলা যায়।

সাধারণ মানুষ প্রথমেই এই সম্পূর্ণ দিক বদল মেনে নিতে পারবে না, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা বিশেষজ্ঞ, যাঁরা সমাজের হর্তাকর্তা, ওঁরাও দারুণ খেপে উঠলেন, তাঁদের মনে হল, এ যেন শিল্প-সাহিত্যের ব্যভিচার। যে ছবি সুন্দর, নিখুঁত করে আঁকা নয়, তা কী করে শিল্প হবে? যে কবিতা পড়া মাত্র বোঝা যায় না, তা আবার কী কবিতা? মানে এবং বোদলেয়ারকে এই নব্য রীতির ধ্বজাধারী হিসেবে প্রচুর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে।

মানের থেকে বয়েসে বেশ কিছু বড় ছিলেন বোদলেয়ার, ওঁদের বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়েসে সিফিলিস রোগে, অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় বোদলেয়ার মারা যান।

প্রথাসিদ্ধ ধারায়, নিশ্চিন্তে ভালোমানুষের মতন ছবি আঁকবেন ভেবেছিলেন মানে। কিন্তু ভেতরের কোনও রহস্যময় তাড়নায় তিনি একত্রিশ বছর বয়েসে এঁকে ফেললেন, 'ঘাসের ওপর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া'র মতন ছবি। সে ছবি তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করল, অজস্র নিন্দা-মন্দ গালাগাল বর্ষিত হল তাঁর ওপর। কিন্তু শিল্পকলার নতুন ইতিহাসও যে শুরু হল সেই সময় থেকে, তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। বোদলেয়ারের কাব্যগ্রন্থ 'অশিব পুষ্প' এবং মানের পূর্বোক্ত ছবি এবং 'অলিমপিয়া' তুল্যমূল্য বলা যায়। মানে বেঁচেছিলেন একান্ন বছর, ততদিনে তাঁর অনুজ ও অনুগামী শিল্পীরা ইমপ্রেশানিস্ট ছবির আন্দোলন অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, জীবদ্দশায় কিছুটা সমাদর পেয়ে গেছেন এদুয়ার মানে। কিন্তু বোদলেয়ার যে কবিতায় একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন, তাঁকে দিয়েই আধুনিক কবিতার শুরু, সেটা বোদলেয়ার জেনে বা বুঝে যেতে পারলেন না।

কাফে গেরবোয়া'র আড্ডা ভেঙে যায় ১৮৭০ সালের যুদ্ধের সময়। বিসমার্কের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান। আসল নেপোলিয়ানের ভাইয়ের এই ছেলেটির যুদ্ধ-কৃতিত্বের তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই এক লক্ষ সৈন্যসমেত তৃতীয় নেপোলিয়ান বন্দি হলেন। প্রাশিয়ান সৈন্য ফ্রান্সের একটার পর একটা জেলা দখল করে ঘিরে রাখল প্যারিস। হোটেল-রেস্তোরাঁ সব তো বন্ধ হয়ে গেল বটেই, সাধারণ মানুষেরও খাদ্য জোটে না। শিল্পী-সাহিত্যিকরা কেউ কেউ রেজিটান্স বাহিনীতে যোগ দিল। কেউ কেউ প্যারিস ছেড়ে পালাল। মানে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর লেফটেনান্ট হলেন, মা ও স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বাইরে। নাদারের বেলুনে

চিঠি পাঠাতেন। একটা চিঠিতে মাকে লিখলেন, "এখন আমরা ঘোড়ার মাংস খাচ্ছি। গাধার মাংস তো রাজপুত্রদের খাদ্য।" ভিক্টর হুগো তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "এখন আমরা যা খাচ্ছি, তা বোধহয় ঘোড়ার মাংসও নয়। হয়তো কুকুরের মাংস। কিংবা ইঁদুরের মাংস নাকি? মাঝে মাঝে আমার পেট ব্যথা হচ্ছে। আমরা কী খাচ্ছি না নিজেরাই জানি না।...চিড়িয়াখানার একটা হাতিকে মারা হয়েছে। সে কাঁদছিল। ওকেও খাওয়া হবে!"

যুদ্ধ, আত্মসমর্পণ, আবার গৃহযুদ্ধ, প্রচুর রক্তপাতের পর প্যারিস অনেকটা শান্ত হল প্রায় দু'বছর পর। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সকলেই ফিরে এল বটে; কিন্তু সেই আড্ডা আর জোড়া লাগল না।

শিল্পী কবি লেখকদের এরকম এক জায়গায় খোলামেলা মেলামেশার, পরস্পর ভাব-বিনিময়, তর্কাতর্কি ও সমমর্মিতায় শিল্প ও সাহিত্য একই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্য পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে, একটা পেছনে পড়ে থাকলে অন্যটাও বেশি দূর এগোতে পারে না।

এই রকম আড্ডার কথা অবশ্য আর বিশেষ শোনা যায় না।

ফোটোগ্রাফি জনপ্রিয় হতে লাগল দিন দিন। বাস্তবতা ও বিমূর্ততার লড়াই চলতেই থাকল। একদল ধরে রইল যে বাস্তবের প্রতিচ্ছবিকে শিল্প-সাহিত্যে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। আর একদল লেখক-শিল্পী বাস্তবের কোনো রকম অনুকরণকেই শিল্প বলতে রাজি নয়। চাক্ষুষ দৃশ্যের চেয়ে অবচেতনের অনুভূতিই তাঁদের কাছে মুখ্য।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিল্প-সাহিত্য আধুনিকতার এই যে আধুনিক রূপচিন্তা তারও অনেক বিবর্তন ঘটে যায়। নিখুঁত শিল্প সুন্দর শিল্প এবং ফোটোগ্রাফির বাস্তবতা থেকে সরতে-সরতে শিল্পসৃষ্টি এত বেশি বিমূর্ততায় চলে যায় যে তা চূড়ান্ত দুর্বোধ্যতায় পৌঁছে যায়। ছবির মধ্যে কোনও কাহিনি থাকবে না, চরিত্র থাকবে না, এই নীতি মানতে-মানতে ছবি হয়ে যায় একটা আয়তনের মধ্যে কিছু রঙের ছোপ। বিশেষ এক শ্রেণির শিল্পবোদ্ধা ছাড়া সেসব ছবির রস গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত হয়ে গেল। ছবিটা উলটো না সোজা করে টাঙানো, সেটাই হয়ে গেল একটা ধাঁধা।

ফ্রান্সের যাঁরা সমাজতান্ত্রিক, যাঁরা বাস্তবতার দর্শনে বিশ্বাসী, তাঁরা এক সময় উচ্চ গলায় বলেছিলেন, এত কাল ছবি আঁকা হত দেবতা এবং রাজা-রাজড়ার জন্য। কিন্তু এখন সময় এসেছে, শিল্প হবে সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিমূর্ত চিত্রকলার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগ কোথায়, এসব ছবিকে কিছু মুষ্টিমেয় শিল্পবোদ্ধা সার্টিফিকেট দেয় আর রাজা-রাজড়াদের বদলে বর্তমানের ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণি সেগুলি কিনে জমা করে রাখে। অন্যদিকে বাস্তববাদীতের মতবাদ আঁকড়ে রইলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের নীতি-নির্ধারকেরা। সেখানে এর নাম হল সোসালিস্ট রিয়েলিজম, যার মধ্যে আবার বিমূর্ততার কোনও স্থানই নেই, কল্পনার খেলা নিষিদ্ধ। সেখানেও বাস্তবতার নামে যেসব রাশি রাশি ছবি আঁকা হতে লাগল, তা গতানুগতিকতারই নামান্তর! তার দু-চারখানা দেখার পরেই মনে হয়, এর বদলে রঙিন ফটোগ্রাফই বা মন্দ কী!

সাহিত্যেও আধুনিকতার বিবর্তন এল অন্যভাবে।

বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান এই সব কিছুর ওপরেই আধিপত্য করেছে সাহিত্য। হঠাৎ বিজ্ঞান অনেক কদম এগিয়ে এল। তাত্ত্বিক আলোচনা ছেড়ে বিজ্ঞান যেই হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হল, অমনি সে ফুলে ফেঁপে বিশাল আকার ধারণ করল। তখন আর তার সাহিত্যকে তোয়াক্কা করার দরকার নেই। এই সময় ভলতেয়ার একটা দারুণ উক্তি করেছিলেন, যা আজও প্রণিধানযোগ্য। "I love Physics so long it did not try to take precedence over poetry, now that it is crushing all the arts, I no longer wish to regard it as anything but a tyrant."

এখন মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের যা ভূমিকা, সেই তুলনায় সাহিত্য-শিল্প কিছুই না। তবে এখনও বিজ্ঞানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষকে আটকে রাখার ক্ষমতা রাখে ধর্ম কিংবা ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই যে সে চেষ্টা প্রবলভাবে চলছে, তা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীর লেখকসমাজ ধর্মকে পরিহার করেছে মোটামুটি একশো বছর আগে থেকে। অনেকের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু ধর্মকে অবলম্বন করে এখন আর সাহিত্য রচিত হয় না। পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করার অন্য কোনও অস্ত্রও হাতে না পেয়ে সাহিত্য খানিকটা অসহায় হয়ে পড়ল। ছাপাখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যতখানি সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা ছিল, তা হয়নি। শিক্ষিতের হার অনেক বেড়ে গেল বটে, তারা ছাপার অক্ষর পড়ে, কিন্তু অনেকেই সাহিত্য পড়ে না।

শ'দুয়েক বছর আগেও কবিতার স্থান ছিল সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। হঠাৎ গদ্য হুড়মুড়িয়ে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করতে থাকে। সাহিত্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ এসে যায়। আধুনিক মননে কবিতা হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, বেশি লোক পড়বে না জেনে গিয়ে অল্প সংখ্যক রসিকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে লাগল কবিরা। বিমূর্ত চিত্রকলার মতনই, কবিতাও হয়ে উঠল ধ্বনিসর্বস্ব, আকারে ছোট হতে লাগল। পৌঁছে গেল দুর্বোধ্যতার চরম সীমায়, মোটামুটি শিক্ষিত পাঠকও কবিতার প্রতি বিমুখ হল। গদ্য এতটা ঝুঁকি নিল না। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায় মেনে নিলেন গদ্য লেখকরা, গল্প উপন্যাস নিল অনেকটাই মনোরঞ্জনের ভূমিকা। দু-চারজন ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন, যাঁরা গদ্যভাষা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন কবিতারই মতন। কিন্তু অধিকাংশ গদ্য লেখকই বাস্তবধর্মী বর্ণনা, ন্যারেটিভ স্টাইলের সঙ্গে কখনও-সখনও পরাবাস্তব ও কল্পনার উদ্দামতা মিলিয়ে পাঠকদের নিজেদের জীবন ও আকাঙ্ক্ষার ছবিই দেখাতে চাইলেন। কবিতার এরকম কোণঠাসা অবস্থা দেখে টি এস এলিয়ট যদিও বললেন, কবিতাও এক ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট, সুপিরিয়র এন্টারটেইনমেন্ট, কিন্তু সে কথায় অনেকেই কান দেয়নি। অতিশয় ব্যক্তিগত কবিতা, পাঠকরা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু যায় আসে না, এরকম মনোভাব নিয়ে লিখে যেতে লাগলেন কবিরা। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুরোপুরি বিমূর্ত চিত্রকলা দেখে লোকে যেমন বলতে শুরু করল, উলটো-সোজা বোঝা যায় না, তেমনি কবিতা সম্পর্কেও অনেকে বলাবলি শুরু করল, ডান দিক থেকে বা বাঁ দিকে থেকে পড়লেও তো একই রকম অবোধ্য। তবে ধনী শ্রেণির মধ্যে যেহেতু ছবি সংগ্রহ করা ফ্যাশানের অন্তর্গত হয়ে গেছে বা ইদানীং গুপ্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য, তাই বিমূর্ত শিল্পেরও গ্রাহকদের অভাব হল না। তিন ফুট বাই দু ফুট একটা ক্যানভাসের ওপর একজন শিল্পী না খেয়ে না দেয়ে কিছু রং দিয়ে যে একখানা ছবি এঁকেছেন, শিল্পবোদ্ধাদের সার্টিফিকেট থাকলে সেই ছবির দাম এখনও হেসে-খেলে কয়েক কোটি টাকা। সেই তুলনায় কবিরা কারুর পৃষ্ঠপোষকতাও পায়নি, জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে।

এখন অবশ্য আবার একটা পরিবর্তনের পালা এসেছে। ছবি এবং কবিতা দুটোই দুর্বোধ্যতা থেকে সরে আসছে আস্তে আস্তে। সে আলোচনায় আর আমি যেতে চাই না।

আমার মতে, গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত ফরাসি দেশে যেসব ছবি আঁকা হয়েছে, সেসব কবিতা রচিত হয়েছে, তা এখনও বিশ্বসেরা। আমি সেই সব শিল্পীদেরই কিছু কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি, সেই সময়কার কবিদের রচনার অংশবিশেষ অনুবাদ করে দিয়েছি। খুব সাম্প্রতিক কালের শিল্প সাহিত্যের কথা বলতে পারিনি। কারণ, বিশেষ কিছু জানি না।

এক সময় বিশ্বের শিল্পের কেন্দ্রভূমি ছিল ফ্রান্স, নানা দেশ থেকে শিল্পীরা গিয়ে সেখানে জড়ো হত, এখন সেই কেন্দ্রটা সরে গেছে। এখন নিউ ইয়র্কে শত শত আর্ট গ্যালারি, সেখানে কারুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলে ভাগ্য খুলে যায়। তরুণ, গরিব শিল্পীরাও কোনওক্রমে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে

যাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে জীবনযাত্রার খরচও প্যারিসের চেয়ে অনেক কম। ফরাসি কবিতাও আর তেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ইভ বনফোয়ার পর কোনও বড় কবির সন্ধান আমি পাইনি। বিজ্ঞানের দাপটে পশ্চিমি দেশগুলিতে কবিতা এখন ম্রিয়মাণ। যত ধনী দেশ, তত কবিতার প্রতি অনীহা। ও সব দেশে কবিতা পাঠের আসরে দুশো আড়াইশো এলেই মনে করা হত যথেষ্ট। ডেনমার্কের একজন প্রধান কবি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কবিতার বই দুশো কপি বিক্রি হওয়া মানে বিরাট সার্থকতা, যদিও সে দেশে শতকরা একশোজনই শিক্ষিত। কবিতা বুঝি এখন শুধু গরিবদের খাদ্য। ভারত ও বাংলাদেশে কবিতা নিয়ে আজও মাতামাতি দেখে সাহেবরা অবাক হয়।

অতি আকস্মিকভাবে আমার প্রথমবার বিদেশযাত্রা ঘটে গিয়েছিল। প্রায় সেইরকমই আকস্মিকভাবে মার্গারিট ম্যাতিউ নামে একটি শিল্পসাহিত্য পাগলিনী ফরাসি যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। তার সঙ্গেই আমি প্রথম ফরাসি দেশে যাই। সে আমাকে ইমপ্রেশানিস্ট ও এক্সপ্রেশানিস্ট শিল্পীদের ছবিগুলি চিনিয়েছিল, সে তার প্রিয় কবিদের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলত। সেই সব ছবি, সেই সব কবিতা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। সেগুলিই আজও আমার সবচেয়ে প্রিয়।

তারপরেও আমি বেশ কয়েকবার ফরাসি দেশে গেছি, কোনওবারই কোনও সরকারি বা বেসরকারি আমন্ত্রণে নয়, কোনও পূর্ব নির্ধারিত কারণেও নয়। হঠাৎ হঠাৎ। অন্য কোনও দেশে আচমকা নেমন্তন্ন পেয়ে গেছি, তখনই মনে হয়েছে ফরাসি দেশ ছুঁয়ে যাব না কেন? সেখানে অসীম রায় রয়েছে, একবার কোনওক্রমে পৌঁছে গেলে আর কোনও চিন্তা নেই।

মার্গারিট বেঁচে থাকলে এতদিনে তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক হত, তা জানি না। তবে ফরাসি দেশের মাটিতে পা দিলেই আমি যেন শুনতে পাই তার যৌবনময় কণ্ঠস্বর। তার উচ্ছ্বলিত হাসির শব্দ, তার চোখ দিয়েই এখনও অনেক কিছু দেখি।

অসীম আমাদের বিদায় দিতে আসে এয়ারপোর্টে। ভাস্কর চলে যায় লন্ডনে। আমি আর বাদল ভারতমুখী বিমানের দিকে এগোই। প্রত্যেকবারই আমার মনে হয়, এবারই শেষ, আর কি আসা হবে এদেশে? তবু মনে মনে বলি, আবার দেখা হবে। আবার দেখা হবে!

কয়েক মাস পরেই অসীম চিঠি লেখে, আবার কবে আসছ এদিকে? ভাস্কর লেখে, কী রে, আবার একটা বেড়াবার প্ল্যান করে ফ্যাল। প্রতি বছর পুজোর আগে বাদল তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে যায় ফ্রাংকফুর্টের বিশ্ব বইমেলায়। আমার যাওয়া হয় না, আমি যাই তখন সাঁওতাল পরগনায় কিংবা ওড়িশার জঙ্গলে। আবার পরের বছরই হয়তো আচমকা একটা ডাক আসে সুইডেনে যাওয়ার। অমনি রক্ত চলকে ওঠে। হ্যাঁ, সুইডেন অদেখা দেশ, সেখানে যেতে ভালো লাগবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু তা বলে আকাশপথ কিছুটা বাঁকিয়ে ফরাসি দেশে কি থাকব না কয়েকটা দিন?

সেখানে গেলেই পাই বন্ধুদের সাহচর্যের উত্তাপ, জেগে ওঠে প্রথম যৌবনের স্মৃতি, চারপাশে টের পাই এককালের মহান শিল্পী-কবিদের পরিমণ্ডল। তাই তৃপ্তি হয় না, বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

সেবারের সেই বিপদ-কাহিনি

ওঃ, সেবার কী বিপদেই পড়েছিলাম। বিদেশবিভুঁইয়ে জেলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল! পাঠকদের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখার জন্য সে-ঘটনা পরে বলব। আগে কবিতার আসরের কথা।

গত আশির দশকে বিশ্বের নানান দেশে ভারত-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। আমেরিকা, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, (তখনও দুই জার্মানির মিলন হয়নি) সুইডেন ইত্যাদি অনেক দেশেই ভারত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। গান-বাজনা, নাচ, শিল্পকলার প্রতিনিধি দলকে যেমন পাঠানো হয়েছে তেমন সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দলও সেইসব উৎসবে স্থান পেয়েছে।

এই প্রতিনিধি-দলে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে কবিরাই বেশি সৌভাগ্যবান। গল্প-উপন্যাস লেখকরা কিছুটা বঞ্চিত।

কবিরা পাঁচ-সাত মিনিট মাত্র সময় নিয়ে দু-তিনটে কবিতা পড়ে দিতে পারেন। ঔপন্যাসিকরা তো আর উপন্যাস পড়তে পারবেন না। এমনকি একটা ছোটগল্প পাঠ করতেও অন্তত তিরিশ-চল্লিশ মিনিট তো লাগবেই। কজনকে সে সুযোগ দেওয়া যায়? যতদূর জানি, শুধু জার্মানিতেই একটি গদ্য লেখকের দল পাঠানো হয়েছিল।

আমার সুবিধে এই, আমি কবি কিংবা গদ্য লেখক, যে-কোনও দলেই ভিড়ে যেতে পারি।

সেবারে যাওয়া হল, পাশাপাশি দুটো দেশে। চেকোস্লোভাকিয়া আর বুলগেরিয়া। এখন চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙে চেক আর স্লোভাকিয়া নামে দুটো দেশ হয়ে গেছে। আগে দেশটা ভাঙেনি। তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগের লক্ষণ আমাদের চোখে পড়েছে।

প্রথমে আমরা গেলাম বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহরে।

বুলগেরিয়া ছোট দেশ, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ কম বলে আমরা ওদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। সোফিয়া নামটি ভূগোল বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখেছি, কেউ সেখানে ভ্রমণেও গেছে বলে শুনিনি।

বুলগেরিয়া একটি গরিব দেশ, মাংসের দোকানের সামনে বিরাট লাইন চোখে পড়ে। অর্থাৎ সপ্তাহে প্রতিদিন সেখানে মাংস পাওয়া যায় না। আর লম্বা লাইনের শেষের দিকে যারা দাঁড়ায়, তাদের নিরাশ হতে হয়।

কিন্তু সোফিয়া শহরটি দৃশ্যত খুব সুন্দর। খুবই সবুজ, মনে হয় যেন গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি শহর।

আমরা দলে ছ'জন, তার মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় কবি অরুণ কোলাতকার। ইনি ইংরেজি ও মারাঠি দু-ভাষাতেই লিখতেন, সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। হিন্দি কবি মঙ্গেশ দেবরানও ছিলেন। আর তিনজন গুজরাতি, মালায়ালম ও কন্নড় ভাষার। সবার নাম মনে নেই। সেই সময়কার কাগজপত্র হারিয়ে ফেলেছি।

আর বুলগেরিয়ার কবিদের নামও হারিয়ে গেছে সেইসব কাগজপত্রের সঙ্গে।

তবে ওঁদের মধ্যে যিনি প্রধান কবি, তিনি দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রীও বটে। তিনি আমার নাম

শুনে প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, আপনি ব্রাহ্মণ?

আমি চমকে উঠলাম। গঙ্গোপাধ্যায় উচ্চারণ করতেই বিদেশিদের দাঁত ভেঙে যায়। গাঙ্গুলি বরং সহজ, কিন্তু কোথাও গাঙ্গুলি ব্যবহার করি না। আমরাও তো বিদেশিদের কত শক্ত নাম শিখে নিই।

তাঁকে জিগ্যেস করলাম, আপনি কী করে বুঝলেন?

তিনি বললেন, বাঃ গঙ্গা প্লাস উপাধ্যায়। উপাধ্যায় মানে শিক্ষক। একসময় ভারতের ব্রাহ্মণরাই তো শিক্ষক হতেন, তাই না? আমার নিশ্চয়ই গঙ্গা তীরবর্তী কোনও অঞ্চলে বাস।

ইনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন। সেই তুলনায় আমি বুলগেরিয়া সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

এই দেশটি বেশ কয়েক শতাব্দী তুরস্কের অধীনে ছিল। সেইজন্য অনেক বাড়িঘরে, ভাষা, জীবনযাত্রায় এবং রান্নায় তুরস্কের প্রভাব থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বেশ কিছু তুরস্কের মানুষ এখনও এদেশে থেকে গেছে।

কিন্তু কথাবার্তায় বোঝা যায় একালের বুলগেরিয়ানরা তুর্কিদের একেবারে পছন্দ করে না। এককালে আমাদের যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল। তবে অনেক হোটেল-রেস্তোরাঁতেই টার্কিশ রান্নার নানান পদ পাওয়া যায়। আমাদের চোখে সেগুলি খুব সুস্বাদু লাগে। কারণ মোগলাই রান্না কিংবা উত্তর ভারতীয় রান্নার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে।

বুলগেরিয়া থেকে আমরা এলাম চেকোস্লোভাকিয়ায়।

এখানেই বেশিদিনের প্রোগ্রাম। কয়েকটি শহরে যাওয়ার কথা।

আগেই বলেছি, চেক ও স্লোভাকিয়া তখন একসঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু ঠিক যেন সুয়োরানি ও দুয়োরানি। এরই মাঝখানে বোহেমিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। বোহেমিয়ান শব্দটি এখনও টিকে আছে, কিন্তু ওই নামের রাজ্যটি এখন অবলুপ্ত।

দুদিকেই গিয়েই আমরা দুরকম ক্ষোভের কথা শুনেছি।

চেক অংশের বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং রাশিয়ার দাদাগিরি সহ্য করতে পারছে না। এক বছরের মধ্যেই সেখানে সমাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

আর স্লোভাকিয়ার বিদ্বজ্জনের অভিযোগ, সমস্তরকম সুযোগসুবিধা চেকরা নিয়ে নেয়। স্লোভাকরা বঞ্চিত, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মতো ব্যাপার। আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অনেক জিনিসই পাওয়া যায় না। একজন বেহালাবাদক আমাকে প্রায় কান্নাভরা গলায় বলেছিল, তোমাদের দেশে গেলে আমাকে আশ্রয় দেবে? আমার আর একমুহূর্তও এখানে থাকতে ভালো লাগে না।

এর কোনও উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

চেক সাহিত্য খুবই উন্নত। বাংলা ভাষারও চর্চা হয়। কয়েকজন বাংলা সাহিত্য নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছেন। অনুবাদও করেন প্রচুর। আমার একটা ছোটগল্পের বইয়ের অনুবাদ সংকলন আগেই বেরিয়েছে এখান থেকে।

প্রাগ শহর (স্থানীয় উচ্চারণ প্রাহা) বেশ অভিজাত ধরনের। কিছু-কিছু বাড়িঘর অত্যন্ত দর্শনীয়। আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ফ্রানৎস কাফকার বাড়ি। অকালমৃত এই তরুণ লেখককে আমরা যৌবন বয়েসে মাথায় তুলে রাখতাম।

কাফকা প্রাগের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু চেক ভাষার লেখক ছিলেন না। তাঁর সাহিত্য জার্মান ভাষায় রচিত। প্রথমত ইহুদি, তা ছাড়া এই দেশে থেকেও লেখেন অন্য ভাষায়। তাই তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিকভাবে কাফকাই এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক। তাঁর বাড়ি দেখতে বহু ট্যুরিস্ট যায়। কিন্তু কয়েকজন তরুণ লেখকের মুখে শুনলাম কাফকার রচনা এদেশে নিষিদ্ধ।

প্রকাশকদের এক আলোচনাচক্রে আমি ফস করে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কাফকার বই নিষিদ্ধ করেছেন ঠিক কী কারণে?

ওঁদের সভাপতি বিস্ময়ের ভান করে বললেন, নিষিদ্ধ নয় তো!

আমি আবার বললাম, আমি দোকান থেকে কাফকার বইগুলো কিনতে পারি?

ওঁরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে বললেন, এখন কিনতে পারবেন না। আউট অফ প্রিন্ট!

আমি নাছোড়বান্দা। পরের প্রশ্ন : কতদিন ধরে আউট অফ প্রিন্ট রয়েছে?

এবারেও উত্তর, বেশ কিছুদিন ধরে। প্রায় কুড়ি বছর।

আমি হেসে ফেললাম।

তখন ওখানে সব প্রকাশনাই সরকার-নিয়ন্ত্রিত। কুড়ি বছর আউট অফ প্রিন্ট রাখা তো নিষিদ্ধ করারই সমান। কেন যে এরকম বোকামি করা হত ওইসব রাষ্ট্রে! নিষিদ্ধ করে কি কোনও বইকে আটকানো যায়?

পরে আমি দেখেছি, নদীর ধারে ঘাসের ওপর শুয়ে ছাত্রছাত্রীরা কাফকার বইয়ের জেরক্স কপি পড়ছে অনেকে মিলে, আগ্রহের সঙ্গে। মিলান কুন্দেরার বইও পাওয়া যেত না দোকানে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় আমাদের কাব্যসভা বাতিল হয়ে গেল। সরকারি প্রতিনিধিদের অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো হয়, একদিন থাকে সাহিত্যের জন্য। নির্দিষ্ট দিনটিতে সকালবেলা হঠাৎ জানিয়ে দেওয়া হল, কবিতা পাঠ আর হবে না, কারণ সেদিন কিছু একটা ছুটির দিন পড়েছে। কেউ আসবে না।

সরকারি ছুটির দিন বলে কেউ সাহিত্যসভায় আসবে না, এরকম আগে শুনিনি।

ওঁদের সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা অস্থির ভাব। আমাদের আতিথ্য দেওয়ার মধ্যেও কেমন যেন একটা দায়সারা ভাব।

তখন বুঝিনি, এর কারণ ছিল, আসন্ন ঝড়ের জন্য অধিকাংশ মানুষের উদ্‌বেগ। রাষ্ট্রব্যবস্থা পালটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁদের মতে বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে।

এবার সেই বিপদের কথা।

আমি আগেও কয়েকবার দেখেছি, সরকারি প্রতিনিধি হয়ে যাঁরা বিদেশে যান, তাঁরা নির্দিষ্ট কর্মসূচির পরেই দেশে ফিরে আসেন। নিজের উদ্যোগে আর কোথাও যান না।

আমি সবসময়, পাশের দু-একটা দেশ দেখে আসতে চাই। বিমানভাড়া তো অতিরিক্ত লাগে না। অন্য খরচ কোনওক্রমে কুলিয়ে যায়।

এবারেও আমি ঠিক করে এসেছিলাম, সরকারি খরচে তো বুলগেরিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দেখা হয়ে যাবেই, এই সুযোগে একবার ইস্তানবুল ঘুরে আসতে চাই।

ইস্তানবুল যার আগেকার নাম কনস্টান্টিনোপল, একটি বিস্ময়কর শহর। ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে যেন এক সোনার খনি। পৃথিবীতে এই একমাত্র শহর, যার অর্ধেকটা ইউরোপে, অর্ধেকটা এশিয়ায়। একই শহর দুই মহাদেশে ভাগ করা। এ-শহর যিশুর আমলের চেয়েও প্রাচীন।

ইস্তানবুল ঘোরার জন্য আমি আলাদা টিকিটের ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলাম। অন্যান্য প্রনিনিধিরা সবাই দিল্লি ফিরে আসবেন, তাঁদের ফ্লাইট দুপুর একটায়, আর আমার প্লেন ভোর ছ'টায়।

সুতরাং অন্যদের কাছ থেকে আমি আগের রাত্রেই বিদায় নিয়ে ভোরবেলা কারুকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একা, একটা ট্যাক্সি করে।

যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমি মালপত্র বুক করে নিলাম। তারপর লাইনে দাঁড়িয়ে পৌঁছোলাম কাস্টমস আর ইমিগ্রেশান কাউন্টারে। সেখানকার অফিসার আমার পাসপোর্টটা উলটেপালটে অনেকক্ষণ ধরে ভুরু কুঁচকিয়ে দেখলেন আর বারবার তাকাতে লাগলেন আমার মুখের দিকে।

তারপর পাসপোর্টে আমার ছবির পাতাটা খুলে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইজ দিস ইয়োর পাসপোর্ট?

জীবনে অত বিস্মিত বোধহয় হইনি আগে। দড়াম করে কেউ যেন আমার বুকে একটা ঘুসি মারল।

পাসপোর্টের ছবিটি আমার নয়! হিন্দি লেখকটির।

অফিসারটি নরম গলায় বললেন, নকল পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরা কতটা বেআইনি জানো তো? এক্ষুনি সিকিউরিটির লোক ডেকে তোমাকে অ্যারেস্ট করা উচিত। তারপর জেল তো হবেই।

আমি চরম উজবুকের মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অফিসারটি আবার বললেন, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলেও কোনও লাভ হবে না। তুমি এই ছবি নিয়ে ইস্তানবুলে ঢুকতে পারবে না। এমনকি তুমি নিজের দেশে গেলেও অন্যের পাসপোর্ট সঙ্গে রাখার জন্য তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে। এখানেও প্লেনে ওঠার আগে তোমার এই বিপদ হতে পারে।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

সহৃদয় অফিসারটি বললেন, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বুঝতে পারছি। আমি একটা কাজ করতে পারি। তোমার ফ্লাইটটা ছাড়তে এখনও পঞ্চাশ মিনিট সময় আছে। এর মধ্যে যদি তোমার নিজের পাসপোর্ট জোগাড় করে আনতে পারো, দ্যাখো! তা ছাড়া তো আর কোনও উপায় নেই!

সেখান থেকে সরে এসে আমি একটুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলাম। হোটেল থেকে ট্যাক্সিতে আসতে ফাঁকা রাস্তায় আমার সময় লেগেছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সুতরাং এখান থেকে আবার ট্যাক্সিতে গিয়ে ফিরে আসার সময় নেই।

আমার মালপত্র জমা পড়ে গেছে, তা চলে যাবে ইস্তানবুলে।

এই ফ্লাইটটা মিস করলে আমি আবার কোনও ফ্লাইট পাব কি না জানি না।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় আমার ভিসা সেদিনই শেষ। যদি এখানে আরও দু-একদিন থেকে যেতেও হয়, ভিসা ছাড়া থাকব কী করে? সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সেদিন রবিবার। সব সরকারি অফিস বন্ধ। ভারতীয় দূতাবাস থেকেও কোনও সাহায্য পাওয়ার উপায় নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আর কাকে বলে?

মরিয়া হয়ে হোটেলে ফোন করলাম। কোনও লাভ হল না। এত সকালে কাউন্টারে একটিমাত্র লোক থাকে। সে একবর্ণ ইংরেজি বোঝে না। আমার উত্তেজিত অভিযোগের সে কোনও গুরুত্বই দিল না। ফোন কেটে দিল।

আমার এরকম ভুল হল কেন? আমি এত দেশে ঘুরে বেড়াই, পাসপোর্ট নিয়ে এমন গণ্ডগোল তো আগে কখনও হয়নি।

আসলে দোষটি হোটেলের এবং আমারও।

সেসময় সোস্যালিস্ট দেশগুলি পাসপোর্টে ছাপ মেরে ভিসা নিত না। অন্য একটি ছবি সমেত কাগজই ছিল ভিসা। দেশ ছাড়ার সময় সেটা নিয়ে নিত। আর সব হোটেলেই পাসপোর্ট জমা রাখতে হত। পশ্চিমি দেশগুলোতে এসব ঝঞ্ঝাট নেই।

এই হোটেলের লোকটা আমার ভিসার কাগজটা অন্য একজনের পাসপোর্টে গুঁজে রেখেছে।

এটা ওদের দোষ। আর আমিও ভিসার কাগজে আমার ছবিটা দেখেই তাড়াহুড়োর মধ্যে পাসপোর্টটা নিয়ে এসেছি। পাসপোর্টটা খুলে পরীক্ষা করে আনা হয়নি।

দ্রুত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, আর কিছু করা সম্ভব নয়। চেকোশ্লোভাকিয়া দেশেই আমাকে কতদিন কাটাতে হবে কে জানে। এদিকে 'দেশ' পত্রিকার জন্য পুজো সংখ্যার উপন্যাসের অর্ধেক রয়েছে আমার লাগেজে।

হঠাৎ অলৌকিক কিছু ঘটার মতন আমার সামনে যেন একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখতে পেলাম এক মহিলাকে।

এর নাম ব্লাঙ্কা। কয়েকদিন ধরে এই ব্লাঙ্কা ছিল আমাদের গাইড। কাল সন্ধের পর তার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সে এয়ারপোর্টে এসেছে অন্য দেশের ডেলিগেটদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

সত্যি কথা বলতে কী, এই ব্লাঙ্কাকে নিয়ে এই ক'দিন আমরা আড়ালে অনেক হাসিঠাট্টা করেছি। অরুণ কোলাতকার কপাল চাপড়ে বলেছিল, এই আমাদের গাইড? হায় রে! এ যেন খ্যাংড়া কাঠির ওপর আলুর দম।

মেমদের মধ্যে এরকম অসুন্দর আগে কখনও দেখিনি। এত রোগা যেন বাতাসে উড়ে যাবে। বুক নেই, নারীসুলভ লালিত্য কিছুই নেই। একটুও হাসে না। এই কাজ করতে গিয়ে সে খুব কম মাইনে পায়, তা-ও একবার জানিয়েছিল।

এখন তাকেই আমার মনে হল দেবদূতী।

দৌড়ে তার কাছে গিয়ে হুড়হুড় করে আমার বিপদের কথা জানালাম।

ব্লাঙ্কা সব শুনে বলল, তুমিও দোষ করেছ। হোটেলও দোষ করেছে। এখন আমি সব দোষ হোটেলের ওপরই চাপাচ্ছি। বেআইনি কাজের জন্য ওদের শাস্তির ভয় দেখাতে হবে।

একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে ব্লাঙ্কা খুব ধমকের সুরে উচ্চকণ্ঠে কত কী যেন বলল ওদের।

তারপর বেরিয়ে এসে বলল, ওদের বলেছি পাসপোর্টটা পাঠিয়ে দিতে। ওদের নিজস্ব গাড়ির ড্রাইভার এখনও আসেনি। একটা ট্যাক্সিতে পাঠাবে। সে-ভাড়াও ওরাই দেবে। তুমি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করো। আরও চল্লিশ মিনিট সময় আছে, আশা করি পেয়ে যাবে।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিতে গেলে, সে বলল, দাঁড়াও, দ্যাখো আগে ঠিকঠাক পাও কি না। ওদের বলেছি এক মিনিটও দেরি করবে না। কিন্তু সবাই আজকাল কাজে ফাঁকি দেয়। আমার নতুন অতিথিরা এক্ষুনি নামবে। আমি সেখানে যাচ্ছি। তুমি যদি ঠিক সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট না পাও, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ফিরে এসে দেখব। তখন কী করা যায়।

দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। সে কী অধীর প্রতীক্ষা! কোনও প্রেমিকার অপেক্ষাতেও কখনও এত ব্যাকুল হয়েছি কি?

ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে চিনবে কী করে?

একটার পর একটা ট্যাক্সি আসছে, আমি হাঁ করে দেখছি। ক্রমশ জায়গাটা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে।

একসময় দেখি, দূরে একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার জানলা দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে আছে। সেই হাতে একটা পাসপোর্ট। আমি তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে অন্য পাসপোর্ট আর দশটা ডলার গুঁজে দিলাম তার হাতে।

ব্লাঙ্কা কাছাকাছি কোথাও নেই। আর মাত্র সাত মিনিট বাকি। ব্লাঙ্কাকে আর ধন্যবাদ জানানো হল না। দৌড়োলাম ইমিগ্রেশান কাউন্টারের দিকে।

তারপর ইস্তানবুলে গিয়ে কী হল, সে তো অন্য গল্প।

না-বোঝার আনন্দ? সেটাই সম্ভব!

ইংল্যান্ডে ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কবিসম্মেলনে যোগ দিইনি বটে, তবে বিভিন্ন সময়ে, নানান অঞ্চলে প্রকাশ্যে কবিতা পাঠ করতে হয়েছে।

প্রথমবারের কথাই আগে বলি।

আমার বাল্যবন্ধু এবং আবাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্ত বহু বছর ধরে লন্ডনবাসী। আমি ইউরোপের কোথাও গেলেই ভাস্কর চলে আসত আমার কাছে। প্রথমদিকে, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে। পরের দিকে ভাস্কর চাকরি ছেড়ে নিজেই একটা কারখানার মালিক হয়েছিল, সুতরাং ছুটি নিতে হত নিজের কাছ থেকেই।

সেইরকমই একবার বার্লিন ফেস্টিভালে যোগ দিতে গেছি, ভাস্কর লন্ডন থেকে উড়ে এসে হাজির। তারপর গোটা সপ্তাহ রয়ে গেল আমাদের সঙ্গে। সব সেমিনারে, কবিতা পাঠে ভাস্কর উপস্থিত থাকত। কিন্তু অংশগ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল না।

অন্য লোকেরা কৌতূহলী হয়ে আমাকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করত, ইনি কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন?

ভাস্কর কখনও তা শুনতে পেয়ে বলত, আমি সুনীলের বন্ধু। এসেছি আড্ডা মারতে!

অন্য দেশের লেখকরা এ-উত্তর শুনে হতচকিত হয়ে যেত। বন্ধুর সঙ্গে শুধু আড্ডা মারার জন্য পয়সা খরচ করে কেউ এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে আসে, এটা ওয়েস্টার্ন কালচারে একেবারে অভিনব, অবিশ্বাস্যই বলা যেতে পারে। নিজের কাজ ফেলে রেখে আড্ডা, তার মানেই এরা বোঝে না।

লন্ডন শহরে আমি অনেকবার গেছি, কিন্তু লন্ডনের বদলে প্যারিসই তখন আমাদের আড্ডার কেন্দ্রস্থল। প্যারিস শহরের আলাদা আকর্ষণ তো আছেই। তা ছাড়া আমাদের বন্ধু অসীম রায় একখানা আস্ত বাড়িতে একা থাকে। সে বিয়েটিয়ে করেনি। ব্যাচেলারের বাড়িতে আড্ডা-হল্লোড়ই বেশি জমে। এমনিতে অলস প্রকৃতির ভাস্কর, প্যারিসে এসে অপূর্ব মাংস রান্না করার ভেল্কি দেখায়।

সেরকমই একবার প্যারিসে গুলতানি করছি, লন্ডন থেকে পূর্ব-পরিচিত এক যুবক একদিন টেলিফোনে অনুরোধ জানাল, লন্ডনে দুর্গাপুজোর সময় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাকে কবিতা পাঠ করতে হবে।

লন্ডন তো ভাস্করের জমিদারি, সুতরাং এ-ব্যাপারে ভাস্করের মতামত নিতে যেতেই ভাস্কর মুখ বিকৃত করে বলল, বাদ দে! বাদ দে!

অর্থাৎ এখানকার আড্ডার মৌজ ছেড়ে অন্য কোথাও কবিতা পড়ার জন্য যাওয়ার কোনও মানে হয় না!

কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা। সে প্রতিদিন ফোনে জ্বালাতন করতে লাগল। একদিন ভাস্কর নিজেই ফোন ধরার পর ছেলেটি এমন কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, ভাস্কর আর তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। আমার হয়ে ভাস্করই কথা দিয়ে দিল।

তখন ঠিক হল, অসীমকেও নিয়ে আমরা সদলবলেই লন্ডনে যাব। সেখানে ওই অনুষ্ঠানের

দিনটা কাটিয়েই আমরা চলে যাবে স্কটল্যান্ডের দিকে বেড়াতে। স্কটল্যান্ডের প্রকৃতি বড়ই মনোহর। প্যারিস থেকে লন্ডনে উড়ে যেতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় লাগে।

লন্ডনের বেলসাইজ পার্কেই হয় সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো। দূর-দূর থেকে বহু বাঙালির সমাগম হয় এখানে। এই উপলক্ষে মেয়েদের শাড়ি ও পোশাকের বাহার দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

দুর্গাপুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানেই এখানকার পাড়ার জলসার মতন। নাচ, গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা সবই আছে। তার মধ্যে আমার কবিতা পাঠ একেবারেই অবান্তর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েই বুঝতে পারলাম, ভুল করেছি।

কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তখন একবার তো মঞ্চে উপস্থিত হতেই হবে। পাদপ্রদীপের আলোয় এসেই মনে হল, এখানে আমার কবিতা শোনার জন্য কারুরই আগ্রহ নেই। সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। অনেকের সঙ্গেই অনেকের অনেকদিন পর দেখা, সুতরাং কে নতুন বাড়ি কিনেছে, কে গাড়ি বদল করেছে, কার বিয়ে হল, নতুন শাড়ি ও গয়না কেনা হল কোথা থেকে, এইসব আলোচনাই বেশি জরুরি। তার মধ্যে রয়েছে বাচ্চাদের চেল্লামেল্লি।

বাঙালিদের এই এক অদ্ভুত স্বভাব। যখন তারা সাহেবদের কোনও অনুষ্ঠানে যায়, তখন কেউ গোলমাল করা তো দূরে থাক, একটি কথাও বলে না। ঠিক সময় উপস্থিত হয়, বাচ্চাদের বাড়িতে রেখে আসে। কিন্তু নিজেদের অনুষ্ঠানে সময়ের মা-বাপ নেই, অনুষ্ঠান চলাকালীন অনবরত কথা চালাচালি হয়, আর বাচ্চারা তো আছেই।

ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আমি একগুচ্ছ কাব্য পাঠ করব। কিন্তু আমি ঠিক করলাম, একটি মাত্র কবিতা কোনওক্রমে শেষ করেই পালাতে হবে। তা ছাড়া, আমার মনে-মনে একটা সংকল্প আছে, যে-কোনও জায়গায়, একটি কবিতা পড়ার পর দর্শক-শ্রোতাদের মধ্য থেকে যদি অনুরোধ না আসে, তাহলে আমি দ্বিতীয় কবিতা পড়ি না।

এখানে কবিতাটি পড়া শুরু করার পরই টের পেলাম, কেউই শুনছে না। সুতরাং তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য লাইন বাদ দিতে লাগলাম মাঝে মাঝে। দেড় মিনিটের মধ্যেই মঞ্চ থেকে আমার বিদায়।

এরকম একটি বাজে ঘটনা উল্লেখ করার কারণ, আমার জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা, এর থেকে আমি বিশেষ এক শিক্ষা পেয়েছি।

বাইরে এসে দাঁড়াবার পর অসীম ব্যঙ্গ করে বলল, সুনীল, এই জায়গায় এসে তোমার মানসম্মান খোয়ানোর কোনও দরকার ছিল? আজ সকালেই আমরা স্কটল্যান্ডের দিকে চলে যেতে পারতাম।

ভাস্করও রেগে গিয়ে বলল, ভেবেছিলুম, সুনীলকে প্যারিস থেকে এখানে ডেকে আনানোর ভাড়া চাইব না। এখন শালাদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকা তো আদায় করবই, অনেক টাকা ফি চাইব!

অসীম বলল, তুমি চাইলেই দিচ্ছে আর কি।

এইসময় একটি অচেনা যুবক কাছে এসে লাজুক গলায় আমাকে বলল, একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন—

আমি বললাম, বলো—

সে বলল, আপনি 'সত্যবদ্ধ অভিমান' কবিতাটি থেকে মোট সাতটা লাইন বাদ দিলেন কেন? তাতে কি কবিতাটির ক্ষতি হয়নি?

আমি স্তম্ভিত। আমার ফাঁকিবাজি এই যুবকটি যে শুধু ধরতে পেরেছে তাই-ই নয়, ঠিক ক'টা লাইন বাদ দিয়েছি তাও সে বুঝেছে। আমি ওকে ঠকিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে। মফস্‌সলে অভিনয়

করতে গেলে যখন বোঝা যায়, দর্শকরা অনেকেই অশিক্ষিত, উচ্চাঙ্গের ভাব কিছুই বুঝবে না, তখন অনেক দলই দায়সারা অভিনয়ে করে চলে যায়। গিরিশবাবু তাঁর দলের লোকদের বলেছিলেন, সবসময় মনে রাখবে, দর্শকরা যেমনই হোক, তাদের মধ্যে অন্তত একজন আছে, যে প্রকৃত বোদ্ধা, শুধু তার কথা ভেবে, তার সম্মানে মনপ্রাণ দিয়ে অভিনয় করবে।

আর একবার কবিতা পাঠ করেছিলাম বাংলাদেশিদের এক সম্মেলনে।

লন্ডনে কিংবা ইংল্যান্ডের নানান জায়গায় বাংলাদেশিরা নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের তেমন কোনও উদ্যোগ নেই। এরা দুর্গাপুজো করে, রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্রও আছে, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশিদের এক সংগঠন শুধু যে বাংলাদেশ থেকেই লেখক-শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়, তাই-ই নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কারুকে-কারুকে অতিথি করে আনে। সেবারে আমন্ত্রিত, শামসুর রাহমান আর আমি।

লন্ডনে গেলে আমি ভাস্করের বাড়িতে থাকব, এটাই অবধারিত। এয়ারপোর্ট থেকে ভাস্কর আমাকে নিয়ে এসেছে, একটু পরেই দুটি বাংলাদেশি যুবক এসে হাজির।

তারা দৃঢ়ভাবে দাবি করল, এবারে আমি তাদের আমন্ত্রণে এসেছি, সুতরাং তাদের আতিথ্যেই আমাকে থাকতে হবে, সম্মেলনের তিন দিন অন্তত। ভাস্কর কিছুতেই রাজি নয়, ওরা'ও ছাড়বে না। শেষপর্যন্ত আমি ভাস্করকে বললাম, তিনটে দিন ওদের সঙ্গে থেকে আসি, তারপর তো এখানে ফিরে আসবই।

ভাস্কর বেশ রেগে গিয়েছিল, পরে অবশ্য ওই বাংলাদেশি যুবকদের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়ে যায়। ওরাও ভাস্করের ভক্ত হয়ে পড়ে।

আমাকে নিয়ে ওরা তুলল এক ডাক্তারের বিশাল বাড়িতে। অত্যন্ত ধনী ডাক্তারটি আবার একজন কবিও, তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও আছে। খুব সহৃদয় মানুষ, অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার, শুধু তাঁর একটাই দোষ, যখন-তখন নিজের লম্বা-লম্বা কবিতা শোনাতে শুরু করেন।

ব্যস্ত ডাক্তারটি খুব ধর্মপ্রাণও বটে, নিয়ম করে সারাদিনে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়েন। একজন চুপি চুপি আমাকে জানাল, এ-বাড়িতে আমার আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হবে না, বরং বাড়াবাড়িই হবে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ। ধূপমানও চলবে না।

আমাকে একটা আলাদা ঘর দেওয়া হল। সেখানে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে মদ্যপান করা যেত, তবু আমি ঠিক করলাম, এই তিনদিন সুরাবর্জিত হয়েই থাকব। দেখা যাক, পারি কি না।

তবে, সুরার চেয়েও তামাকের নেশা বেশি প্রবল। তাই বাথরুমে ঢুকে মাঝে মাঝে সিগারেটে কয়েক টান না দিয়ে পারিনি।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করা যায়। কয়েক বছর পর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এই একই বাংলাদেশিদের সংগঠনের আমন্ত্রণে লন্ডনে গিয়েছিল। শীর্ষেন্দুকেও এই একই ডাক্তারের বাড়িতে থাকতে হয়।

আমি ঘোর নাস্তিক আর শীর্ষেন্দু নিষ্ঠাবান ধার্মিক। ওর একটু ছোঁয়াছুঁয়িরও ব্যাপার আছে। আমি গোরুখোর, কোনওরকম মাংসেই আপত্তি নেই, আর শীর্ষেন্দু মাছ-মাংস স্পর্শই করে না। সেই বয়স্ক ডাক্তারবাবুটিও নিষ্ঠাবান মুসলমান, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা আছে, যেমনটি ছিল এককালের পূর্ববঙ্গে। শুনেছি, শীর্ষেন্দুর সম্মানে, ওর রান্নাবান্নার জন্য তিনি বাড়িতে এক পৈতেওয়ালা বামুন আমদানি করেছিলেন!

আমাকে অবশ্য তিনদিনই সুরাবর্জিত হয়ে কাটাতে হয়নি। দুদিন দিব্যি কাটিয়ে দিলাম, এমন আত্মশ্লাঘাও বোধ করছিলাম যে মদ্যপান না করে আমি যেন এক বিরাট সংযমের পরিচয় দিচ্ছি। তৃতীয় দিনে সন্ধেবেলা আমার অনুজ বন্ধু ফারুক হায়দার ফোন করল।

ফারুক খুব বড় চাকরি করে, দিলদরিয়া, সে একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, বাংলা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা বলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে। টেলিফোনে আমার কুশল সংবাদ নিতে-নিতে ফারুক জিগ্যেস করল, ওখানে ড্রিংক করছেন কী করে? ডাক্তারসাহেবের তো নানারকম শুচিবাই আছে।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, ড্রিংক করছি না। তাতে ভালোই আছি।

ফারুক আঁতকে উঠে বলল, একফোঁটাও খাননি? এ ভারী অন্যায়। অতিথি হচ্ছে নারায়ণ, তার সবরকম সেবা করা উচিত। ডাক্তারসাহেব তার বাড়ির নিয়ম আপনার ওপর খাটাবে কেন? আমি এখুনি মদ নিয়ে আসছি।

আমি বললাম, আরে না, না। আমার লাগবে না। সত্যিই কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। কালকে তো চলেই যাব।

ফারুক শুনল না। আধঘণ্টার মধ্যে চলে এল, সঙ্গে দুটি স্কচের বোতল।

তা-ও আমার ঘরের নিভৃতিতে নয়, প্রশস্ত বসবার জায়গায় এসে ফারুক ঘোষণা করল, কই গেলাস দিন। ডাক্তারসাহেব, আপনি সুনীলদাকে মদ্যপান করতে নিষেধ করেছেন কেন?

ডাক্তারসাহেব আকাশ থেকে পড়ে বললেন, আমি বারণ করেছি? কখ্খনো না। আমি জানব কী করে যে উনি ড্রিংক করেন? তাহলে আমি নিজেই বোতল আনিয়ে দিতাম।

ফারুক দুটি গেলাসে সুরা ঢেলে বলল, আর-একটা গেলাস, আপনিও আজ থেকে শুরু করবেন নাকি?

ডাক্তারসাহেব হাতজোড় করে বললেন, ওইটি পারব না। তোমরা খাও যত ইচ্ছে, আমি এর ঘ্রাণ থেকেও একটু দূরে থাকতে চাই।

ফারুক ও-বাড়ির নিয়ম ভঙ্গ করেই খুশি। আমরা শুধু একবার গেলাস খালি করেই বেরিয়ে পড়লাম।

এদের সম্মেলনটি হয়েছিল ইস্ট লন্ডনের একটি বড় সভাকক্ষে এবং তা উপচে পড়েছিল শ্রোতার সংখ্যায়। কয়েকটা গান ও ছোটখাটো বক্তৃতাও হয়েছিল বটে, কিন্তু কবিতা পাঠই প্রধান। ডাক্তারসাহেব প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তিনি একাই কবিতা পড়লেন আধঘণ্টা।

শামসুর রাহমান প্রথম দিন আসতে পারেননি। তাঁর ফ্লাইট পৌঁছোয় পরের দিন। উদ্‌বোধনের দিন আমাকে কবিতা পাঠ করতে হয়েছিল, গুনে-গুনে মোট এগারোটি। প্রথম দুটি আমার নির্বাচিত, তারপর শ্রোতাদের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে লাগল। একসঙ্গে তিন-চারজনও চিৎকার করে বলতে লাগল কোনও একটি কবিতার নাম। এরকম শ্রোতা পেলে কার না পড়তে ভালো লাগে!

এগারোটিও পরেও অনুরোধ এসেছিল, তখন আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেমে পড়েছি মঞ্চ থেকে।

এবারে আমার একেবারে প্রথমবার ইংল্যান্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

সে অনেককাল আগের কথা। তখন ভাস্করও লন্ডনে যায়নি। ওখানে আমার পরিচিত কেউই প্রায় ছিল না।

সেবার আমি গিয়েছিলাম ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে। তখন কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে ইংল্যান্ড থেকে কোনও কবি বা লেখক আসতেন ভারতে, আর এদেশ থেকেও কোনও কবি-লেখকদের আমন্ত্রণ জানানো হত ইংল্যান্ডে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, আমেরিকা থেকে ফেরার পথে আমাকে দশ দিনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের আতিথ্য নিতে হবে। উত্তম হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, খাদ্য-পানীয় এবং ঘোরাঘুরি সবকিছুর দায়িত্ব সরকারের।

সে-যাত্রায় টি এস এলিয়টের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উনি তখন ফেভার অ্যান্ড ফেভার নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কবি স্টিফেন স্পেন্ডারও একদিন দেখা করতে এসেছিলেন আমার হোটেলে। যতদূর মনে হয়, এসব কথা আমি অন্য কোথাও লিখেছি, তাই পুনরুক্তি

করছি না।

অন্য একটি অভিজ্ঞতার কথা এখনও অলিখিত আছে। সরকারি পয়সায় লন্ডনের কয়েকটি থিয়েটার ও দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার পরেও আমাকে বাইরে পাঠানো হয়েছিল কয়েক জায়গায়।

তার মধ্যে অবশ্যই একটি স্থান, শেকসপিয়রের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড অন আভন। আমার সঙ্গে সবসময়ই একজন-না-একজন গাইড থাকে। গাইডের বদলে বলা হয় কমপানিয়ান।

স্ট্রাটফোর্ডে বাস থেকে নামার পরেই আমাকে অভ্যর্থনা জানাল একজন রমণী। সে আগামী তিন দিন আমার সঙ্গে থাকবে। তার নাম মার্থা। আমার বয়েস তখন ঠিক তিরিশ, মার্থাও সেই বয়েসিই হবে, একটু বড়ও হতে পারে। খাঁটি ব্রিটিশ।

আমেরিকার চেয়ে ইংল্যান্ডে আমি সবসময় কেমন যেন অশ্বস্তি বোধ করতাম। আমেরিকানদের স্বভাবটা অনেকটা খোলামেলা হয়, সেই তুলনায় ইংরেজরা অনেক ফর্মাল। এখানে এসে কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হয়নি, শুধু ইংরেজদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে হচ্ছে। আমি পরাধীন ভারতের সন্তান, তাই ইংরেজরা ছিল আমাদের চোখে রাজার জাত। যদিও আমরা ইংরেজি কাব্য-সাহিত্য পড়েই পশ্চিমি সভ্যতার স্বাদ পেয়েছি, তবু শাসক ইংরেজদের সম্পর্কে মনের মধ্যে কিছুটা বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। আরও কয়েক বছর আগে জন্মালে আমি নির্ঘাত বিনয়-বাদল-দীনেশের সহযোগী হতাম। আমি প্রথমবার যখন ইংল্যান্ডে যাই, তখন স্বাধীনতার পর মাত্র সতেরো বছর কেটেছে, কিন্তু পরাধীন আমলের স্মৃতি কিছুটা রয়ে গেছে।

স্ট্রাটফোর্ডের মার্থাই আমার সেই অস্বস্তির ভাব কাটিয়ে দিল।

তার ব্যবহারের মধ্যে ব্রিটিশরাজের কোনও গন্ধ নেই। খুবই সরল, সাবলীল ব্যবহার। দুজনেই সমবয়েসি, তাই তাড়াতাড়ি ভাব জমে উঠল। আমি তখন অববাহিত, মার্থাও কথায়-কথায় জানাল, সে বিয়ে করেনি। সেইসময়, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এসব দেশে পুরুষের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল, তাই অনেক মেয়েকেই অবিবাহিত থাকতে হত। যাই হোক, মার্থা আর আমার মধ্যে একটু প্রেম-প্রেম ভাব এসে পড়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। একমাত্র নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেই জাতিভেদ এসে উঁকি মারে না।

এখন সুট-টাই পরার বাধ্যবাধকতা অনেক শিথিল হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও হিপিরা আসেনি, তাই ইংল্যান্ডে বাড়ি থেকে বেরুতে হলেই পুরোদস্তুর পোশাক পরতে হত। আমি গলায় টাই বেঁধে কখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম না, বিশেষত গরমের সময়। এখন তো যতবারই বিদেশে যাই, টাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়েছি। তখন গলায় টাই বাঁধতেই হত।

সেপ্টেম্বর মাস, একটু-একটু গরম, মার্থাই একদিন আমাকে বলল, তুমি বারবার টাইয়ের গিঁট নাড়াচাড়া করছ, টাইটা খুলেই রাখো না!

একটি ব্রিটিশ মেয়ের কাছ থেকে এরকম কথা শোনা খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল।

এবার আসল ঘটনাটা বলা যাক।

সেসময় স্ট্রাটফোর্ডে শেকসপিয়ার ফেস্টিভাল চলছে। বিভিন্ন দল এসে অভিনয় করছে নানান নাটকের। আমি একদিন ম্যাকবেথ আর-একদিন ওথেলো দেখে নিলাম। বিশ্ববিখ্যাত শেকসপিরিয়ান অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ারকে দেখার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

ওথেলো দেখে বেরিয়ে আসছি, থিয়েটার হলের বাইরে একটা জটলা চোখে পড়ল। একজন চিৎকার করে কিছু বলছে, তাকে গোল করে ঘিরে শুনছে অনেকে।

কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারলাম।

আসলে ওখানে চলছে কবিতা পাঠ। পথসভার মতন পথ-কবিতা। এক-একজন দুটো তিনটে কবিতা পড়ে সরে যাচ্ছে, আর-একজন আসছে। সবই ইংরেজিতে, একটি তরুণী মেয়ে পাঠ করল ফরাসি কবিতা। ক্রমে আরও জমে উঠল ভিড়।

একসময় উদ্যোক্তাদের একজন শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আপনাদের মধ্যে কোনও কবি আছেন? থাকলে, ইচ্ছে করলে এখানে কবিতা পড়তে পারেন।

আমি কিছু বুঝবার আগেই মার্থা চেঁচিয়ে বলল, এখানে একজন কবি আছেন, ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন।

অমনি কয়েকজন আমার দিকে ফিরে বলল, আমরা ইন্ডিয়ান কবিতা শুনতে চাই।

মার্থা আমাকে প্রায় ঠেলেই পাঠাল মাঝখানে।

আমি দারুণ বিব্রত হয়ে বললাম, আমি কী কবিতা পড়ব? আমার কাছে কোনও ইংরেজি কবিতা নেই।

তখন কয়েকজন বলল, ইংরেজি না হোক, তুমি ইন্ডিয়ান কবিতাই শোনাও।

আমি বললাম, ইন্ডিয়ান কবিতা বলে কিছু হয় না। ইন্ডিয়ার অনেক ভাষা। আমি লিখি বাংলা ভাষায়। তা তো তোমরা কেউ বুঝবে না।

তবুও অনেকে বলল, বাংলাই শোনাও!

আমার যে নিজের কবিতাও মনে থাকে না। মুখস্থ বলব কী করে? একবার ভাবলাম রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতা বলে দেব। তারপর মনে পড়ল আমার নিজের একটি মাত্র কবিতা মুখস্থ হয়ে গেছে। তা-ও অন্যদের মুখে শুনে শুনে, 'কেউ কথা রাখেনি।' অনেকেই আবৃত্তি করে, আমাকে বাধ্য হয়ে শুনতে হয়।

চেঁচিয়ে বলে দিলাম সেটাই।

তারপর কী বিপুল হাততালি। কান ফেটে যাওয়ার জোগাড়।

একটি শব্দও কেউ বোঝেনি, তবু এত হাততালি কেন? ভদ্রতা কিংবা না-বোঝার আনন্দ? সেটাই সম্ভব!

কী হল, সে তো অন্য গল্প।

বাংলা কবিতা ও অ্যালেন গিন্‌সবার্গ

পূর্ণদাস বাউলের একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল কোনও একটি বাংলা সংবাদপত্রে। তাতে সে তার সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের কথা বর্ণনা করতে-করতে এক জায়গায় বলেছে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো শিগগিরই আমেরিকা যাচ্ছেন। লেখাটা পড়তে-পড়তে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি আমেরিকায় যাচ্ছি, অথচ নিজেই তো জানি না? কেউ আসলে কিছুই জানায়নি, কোনও চিঠিও আসেনি।

শান্তিনিকেতনে পূর্ণদাস বাউলের সঙ্গে দেখা হল সপ্তাহখানেক বাদেই। তাকে জিগ্যেস করলাম, পূর্ণ, কী ব্যাপার? আমি আমেরিকা যাচ্ছি, তোমাকে কে বলল?

পূর্ণদাস খুবই বিখ্যাত এবং সম্মাননীয় গায়ক। কিন্তু আমার চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট বলে তাকে আমি নাম ধরে তুমি বলেই ডাকি।

পূর্ণদাস বলল, হ্যাঁ দাদা, আমি যে অ্যালেন গিন্‌সবার্গের কাছে শুনে এলাম, আপনি ওদেশে যাচ্ছেন। ওখানে কবিতা পাঠ করবেন।

পূর্ণদাস আমেরিকার অনেক গায়কের সঙ্গেই খুব পরিচিত এবং সেই যোগাযোগ প্রথম করিয়ে দিয়েছিল অ্যালেন গিন্‌সবার্গই। পূর্ণদাসের প্রথম বিদেশযাত্রার কাহিনি অনেকটা রূপকথারই মতন।

অ্যালেন গিন্‌সবার্গ তার সঙ্গী পিটার অরলভস্কিকে নিয়ে প্রায় বছরখানেক কাটিয়ে গেছে ভারতে। সেসময়ে বাউল গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। তখন পূর্ণদাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, পূর্ণদাস সেই সময়ে বয়েসে বেশ তরুণ।

অ্যালেন নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর আমেরিকান গায়কদের এক বিশাল সমাবেশ হয় আপস্টেট নিউ ইয়র্কে। সে জায়গাটার নাম উডস্টক। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। অত গায়ক একসঙ্গে আর কোথাও জড়ো হয়নি, আর কোনও হলঘরে নয়। তিন দিন ধরে গানের উৎসব খোলা প্রান্তরে, অনেকটা মুক্তমেলার মতন। শ্রোতারা এসেছিল আমেরিকায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তারা সারারাত আকাশের নীচে শুয়ে থেকেছে। এখনও অনেকে উডস্টকের সেই মহাসমাবেশের স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত হয়।

তখন আমেরিকার তরুণ গায়কদের রাজা ছিলেন বব ডিলান। তাঁর জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী। সেই বব ডিলানই ছিলেন উডস্টকের প্রধান সংগঠক। তিনি অ্যালেন গিন্‌সবার্গের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অ্যালেনকে কথায়-কথায় বলেছিলেন, পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে দু-একজন গায়ক আনাতে পারলে বেশ হত।

অ্যালেন তাঁকে জানাল বাউল গানের অভিনবত্বের কথা। সেই গানের খুবই জোরালো ও সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী পূর্ণদাস বাউল।

তখন আমেরিকান ভিসার এত কড়াকড়ি ছিল না। এক বেলাতেই ভিসা পাওয়া যেত। পূর্ণদাস এর আগে প্লেনেই চাপেনি, তার পক্ষে কলকাতা থেকে বিভিন্ন প্লেন বদল করে উডস্টকে পৌঁছনো খুবই অসুবিধেজনক হত। তাই বব ডিলান পূর্ণদাসের জন্য তাঁর নিজস্ব জেট বিমান পাঠিয়ে দিলেন দমদমে। ভাবা যায়, একজনমাত্র যাত্রীর জন্য আস্ত একটা অতবড়ো বিমান! অনেক রাজা-মহারাজের ভাগ্যেও এটা ঘটে না। সেই সম্মান পেলেন এক বাউল!

সেই গান-সম্মেলনে পূর্ণদাসের পায়ে ঘুঙুর আর হাতে দোতারা নিয়ে গান, আর 'ভোলা মন' বলে দীর্ঘ তান অনেকেরই খুব পছন্দ হয়েছিল। তারপর থেকে সে আমেরিকায় গেছে অনেকবার। অন্যান্য বাউলদেরও বিদেশযাত্রার পথ খুলে যায়। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে প্রতিদিন গান গায় যে কার্তিক দাস, সে-ও বিলেত-আমেরিকা ঘুরে এসেছে।

আমার সঙ্গে অ্যালেন গিন্‌সবার্গের বন্ধুত্ব অনেকদিনের। প্রথমবার যখন সে আসে ভারতে, তার সঙ্গে দিনের পর দিন আড্ডা দিয়েছি, ঘুরেছিও অনেক জায়গায়। আমাদের বাড়িতেও এসেছে সে আর পিটার। আমিও প্রথমবার ওদেশে গিয়ে প্রায় মাসখানেক থেকেছি ওদের অ্যাপার্টমেন্ট বা আখড়ায়। অ্যালেন দ্বিতীয়বার একাই এসেছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়। তখনও পূর্ব পাকিস্তানে চলছে অমানুবিক অত্যাচার, প্রায় এক কোটি শরণার্থী চলে এসেছে ভারতে, দুর্বিষহ অনিশ্চিত জীবন কাটাচ্ছে। দমদম থেকে বনগাঁ পর্যন্ত যশোহর রোডের দুধারে অস্থায়ী চালাঘরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে, রোগ-ভোগে মরছেও অনেকে পোকামাকড়ের মতন। তার ওপর সেপ্টেম্বর মাসে হল বন্যা, যশোহর রোডের অনেকটা অংশ হয়ে গেল নদী, সেবারে আমি যশোহর রোডের ওপর দিয়ে সত্যি করে নৌকোয় চেপে বনগাঁয় গেছি। অ্যালেনও আমার সঙ্গে যশোহর রোড ধরে নৌকায় করে শরণার্থীদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিল। বব ডিলান এবং অন্যান্য অনেক শিল্পী মিলেই পাঠিয়েছিলেন তাকে। তারপর তাঁরা সংগীত অনুষ্ঠান করে কয়েক কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন রেফিউজিদের সাহায্যের জন্যে।

অ্যালেন তার সেবারের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিল অবিস্মরণীয় কবিতা, 'সেপ্টেম্বর অন যশোহর রোড'। সেই কবিতার এক জায়গায় সুনীল নামে এক কবির কথাও আছে। কবিতাটিতে

অ্যালেন নিজের সুর দিয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে শুনিয়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে। সে গানের ক্যাসেটও বেরিয়ে বিক্রি হয়েছে প্রচুর।

অ্যালেন যতই ব্যস্ত থাক, তাকে চিঠি লিখলেই সে উত্তর দেয়। আমারই চিঠি-আলস্য আছে। তাই অনেকদিন যোগাযোগ নেই। ওর সঙ্গে শেষবার হঠাৎ দেখা হয়েছিল যুগোস্লাভিয়ায়। পূর্ণদাস বাউলের মুখে ওই খবর শুনেও আমি অ্যালেনকে চিঠি লিখিনি সংকোচবশত। যদি সেটা নিছক কথার কথা বা গুজব হয়, তাহলে আমার দিক থেকে আগ বাড়িয়ে চিঠি লেখা হ্যাংলামির মতন দেখাবে। অ্যালেনের দিক থেকেও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কয়েকদিন পর ভোপালের ভারত ভবনের পক্ষ থেকে অশোক বাজপেয়ী একটা আমন্ত্রণপত্র পাঠাল। তখন ভারত ভবনের খুব রমরমা। প্রায়ই ডাক পাই নানা উপলক্ষে। এবারের উপলক্ষ কবি-সম্মেলন।

পৌঁছে দেখি, সম্মেলনটি খুব বড় আকারের নয়, চোদ্দো-পনেরোজন কবি। সন্ধের পর অশোক বাজপেয়ী আমার হোটেলের ঘরে এসে বলল, তোমার সঙ্গে আলাদা কথা আছে। আগামী মাসে আমেরিকায় ভারত উৎসব হবে। তুমি কিছু শুনেছ কি? দেশ থেকে কয়েকটি গানের দল, নাচের দল, থিয়েটার, ছবির প্রদর্শনী যাবে। আমি কবির দল নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করেছি। মোট ছজন কবিকে পাঠাতে রাজি হয়েছে ভারত সরকার। কিন্তু এই ছজনের নাম বাছাই করা কী শক্ত কাজ বলো তো! এত কবি! অবশ্য তোমার নাম আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই কবিতাপাঠের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছেন অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। তিনি বলে দিয়েছেন, আর যেই আসুক বা না আসুক, সুনীলকে আনতেই হবে!

আমি প্রথমটা অবাক হলাম। অ্যালেন শুধু আমার নাম বলেছে কেন? শক্তির সঙ্গেও অ্যালেনের খুব বন্ধুত্ব। আমার চেয়েও শক্তি অ্যালেনের সঙ্গে বেশি ঘোরাঘুরি করেছে। আমি তো পুরোপুরি ছন্নছাড়া হতে পারি না, আমাকে অনেক কাজ করতে হয়।

আমি অশোককে বললাম, তুমি বরং আমার বদলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যাও। আমি তো দুবার গেছি ওদেশে, শক্তি কখনও যায়নি। শক্তিও বেড়াতে ভালোবাসে, ওর অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

অশোক বলল, শক্তি সম্পর্কেও গিন্‌সবার্গের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। ওঁর প্রবল আপত্তি আছে। উনি বলেছেন, শক্তিকে কে সামলাবে? শক্তি নেশার ঝোঁকে মাঝে-মাঝে অনেকরকম পাগলামি করে। আমেরিকায় মদ্যপানের বাড়াবাড়ি একেবারেই চলে না এখন। কারুকে এরকম দেখলে লোকে হাসে বা বিরক্ত হয়।

আমি অশোককে তবু বললাম, আমি শক্তিকে বোঝাব, যাতে ওদেশে গিয়ে বাড়াবাড়ি না করে। ইচ্ছে করলে ও পারবে।

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না, গিন্‌সবার্গ শক্তির ব্যাপারে একেবারে না বলে দিয়েছে, আমিও ওর দায়িত্ব নিতে পারব না।

শক্তিকে পাঠাবার খুবই ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত যে ছ'জন কবি মনোনীত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কন্নড় ভাষার কবি আদিগা, বয়েসে বেশ প্রবীণ এবং সদ্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া হিন্দির প্রখ্যাত কবি কেদারনাথ সিং, অশোক বাজপেয়ী নিজে, আর একজন গুজরাতি ও একজন তামিল।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে একটা বিপত্তি ঘটল।

দিল্লি থেকে পুরো দলটির একসঙ্গে যাত্রা করার কথা, দিল্লিতে পৌঁছে শুনলাম, কোনও কারণে প্রোগ্রাম বদলে গেছে, সবাই যাবে দুদিন পরে, আমাকে ঠিক সময়ে জানানো হয়নি। আমার আর টিকিট বদলাবার উপায় নেই। আমাকে যেতে হবে সেদিনই।

তখনও ই-মেলের যুগ আসেনি। টেলিফোনও এখনকার মতো মসৃণ নয়। আমি যে আগেই যাচ্ছি, সে-খবর আমেরিকায় ঠিকঠাক জানানো যাবে কি না তা বলা যায় না। তবু আমাকে যেতেই হবে।

যাকে বলে দুর্গা বলে ঝুলে পড়া, সেইভাবে আমি চেপে বসলাম প্লেনে। একা।

সর্বক্ষণ মনে-মনে চিন্তা রইল, নিউ ইয়র্কে যদি কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে না আসে, তাহলে আমি যাব কোথায়? কোথায় উঠব তা-ও জানি না।

এর আগে দুবার গেছি আমেরিকায়। দুবারই আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। সেখানকার ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো, আগে থেকে আমার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করা ছিল। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে কখনও আসিনি, কোনও কবিতা পাঠের জন্যও আগে আমন্ত্রণ পাইনি।

একা-একা নিউইয়র্ক পৌঁছবার পর কী হবে, এই চিন্তাতেই খাদ্যে পানীয়ে কিছু স্বাদ পাচ্ছিলাম না। যদিও গিয়ে একবারে জলে পড়ব না জানি। এয়ারপোর্টে যদি কেউ না আসে, তাহলে কোনও একটা ছোটখাটো হোটেলে উঠতে হবে। নিউ ইয়র্ক শহরের যে অংশটার নাম ম্যানহাট্‌ন, সেটা মোটামুটি আমার চেনা। লোয়ার ইস্ট সাইডের দিকে কিছু সস্তার হোটেল আছে। ট্রেনে চলে যাওয়া যেতে পারে।

নিউ ইয়র্ক শহরের কাছাকাছি আমার কয়েকজন চেনা মানুষও আছে। কিন্তু তাদের কারুরই ফোন নাম্বার কিংবা ঠিকানা আনিনি তাড়াহুড়োতে। আমার স্বভাব তেমন গোছালো নয়। অনেকে সঙ্গে একটা ছোট্ট, ব্যক্তিগত ফোনের নোটবুক রাখে। আমার বাড়িতেই তখন টেলিফোন ছিল না। তাই ফোনের খাতাও রাখা হত না।

যাই হোক, পৌঁছলাম তো নিউ ইয়র্ক শহরে। এয়ারপোর্টে কেউ নিতে আসবে না। এটা ভাবলেই মনটা কীরকম দমে যায়। এখন সুটকেস বয়ে-বয়ে হোটেল খুঁজতে হবে।

ইমেগ্রেশান কাস্টমস পার হয়ে বাইরে আসতেই একটা বিরাট চিৎকার শুনতে পেলাম, সুনীলদা! সুনীলদা!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়েও কারুকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকেই কেউ ডাকছে?

আবার শুনলাম, সুনীলদা, এই যে এদিকে, এদিকে।

দেখি যে ওপর দিক থেকে একজন প্রবলবেগে হাত নাড়ছে। সেই চিৎকার শুনে শুধু আমি নয়, আরও বহু লোক তাকিয়ে রইল তার দিকে।

নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্টে ওরকম বাংলায় চিৎকার করে কথা বলার সাধ্য শুধু একজনেরই আছে। তার নাম ধ্রুবনারায়ণ কুণ্ডু। যে বর্ধমানের ইটাচুনার জমিদার বংশের ছেলে, বহুদিন আমেরিকা-প্রবাসী। যেমনই তার সুঠাম স্বাস্থ্য, তেমনই সে দুঃসাহসী।

ধ্রুব কী করে যেন খবর পেয়ে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, অ্যালেন গিন্‌সবার্গের সেক্রেটারি বব রোর্সেনাথাল ও আরও দুজনও আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য এসেছে, আমার বুক থেকে বেরিয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস।

দামি পাড়ায় হোটেলের ঘরও ঠিক আছে আমার জন্য। সেখানে পৌঁছে যে বিশ্রাম নেব তার উপায় নেই। দলে দলে নারী-পুরুষ আসছে দেখা করার জন্য। তার মধ্যেই একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

তিনজন যুবক এল একসঙ্গে। তিনজনই প্রায় একবয়েসি! সুন্দর চেহারা। নাম জিগ্যেস করতেই তারা হাসতে হাসতে বলল, আমরা তিনজনই গৌতম!

সত্যিই তাই। পরে তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। এক গৌতমের একটি পোশাকি নামও আছে, কল্যাণ। সেই কল্যাণ রায় নিজেও একজন কবি ও গল্পলেখক, ওখানকার এক কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক, সে আমার 'গরম ভাত' গল্পের ইংরেজি নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছে, আর

আমার অনেক কবিতার অনুবাদ করেছে। তার আর একটি পরিচয়, বর্তমানে তার স্ত্রী আমাদের বিখ্যাত অভিনেত্রী ও পরিচালিকা অপর্ণা সেন। অন্যজন গৌতম দত্ত, সে এখন বাংলা ভাষায় অন্যতম অলোচিত কবি, কৃত্তিবাসের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ, আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের একটি অনুবাদ সংকলনে আমি তার সঙ্গী। এই গৌতমও নাট্যকার ও অভিনেতা, আমার 'প্রথম আলো' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে আমেরিকার সাত-আটটি শহরে ঘুরে-ঘুরে তা মঞ্চস্থ করে প্রায় একটি ঐতিহাসিক কাণ্ডই করে ফেলেছে বলা যায়। তৃতীয় গৌতম চট্টোপাধ্যায় এখন থাকে অস্ট্রেলিয়ায়, তার সঙ্গে যোগাযোগ কম।

যাই হোক, এবার অনেক পরের ঘটনা। প্রথম যখন দেখা করতে আসে তখন তিনজনই বেশ তরুণ, উৎসাহে টগবগ করছে। আমার কবিতা শুনতে ওরা বস্টন পর্যন্ত চলে এসেছিল।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছিলাম বিকেলবেলা, রাত সাড়ে দশটায় আমার হোটেল-ঘরে এল গিন্‌সবার্গ সদলবলে। সেই দলের মধ্যে রয়েছে আর এক প্রখ্যাত কবি গ্রেগরি করসো আর পিটার অরলভস্কি। এরা সবাই আমার পূর্ব পরিচিত। আড্ডা শেষ হল ভোর পাঁচটায়। এইসব কবিদের কাছে দিন ও রাত্তিরের হিসেব অন্যরকম। গ্রেগরি করসোকে আমি কোনও রাত্রেই ঘুমোতে দেখিনি। অ্যালেনও নিশাচর।

আড্ডার ফাঁকেই অ্যালেন জানাল আমাদের সফরসূচি।

আমেরিকার মোট সাতটি শহরে আমাদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা। গোটা উত্তর আমেরিকা ঘুরে-ঘুরে বলা যায়। এ-প্রান্তে যেমন নিউ ইয়র্ক অন্য প্রান্তে লস এঞ্জেলিস। আবার আর একদিকে নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো। এত বিস্তৃতভাবে ভারতীয় কবিতা পাঠের ব্যাপার আগে কখনও হয়নি। এর মধ্যে দুটি জায়গা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্ট, আর বস্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যালেনের খ্যাতি এবং প্রভাবেই এসব জায়গায় অনুষ্ঠানের ব্যস্থা করা সম্ভব হয়েছিল নিশ্চিত। সেসময় অ্যালেন গিন্‌সবার্গ আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি এবং বিচিত্র বর্ণময় তার জীবন। সে সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখেছি বিস্তৃতভাবে। শুধু আমেরিকায় নয়। সারাবিশ্বেই সে প্রখ্যাত, বিশেষ করে স্প্যানিশভাষী কবিদের মধ্যে দেখেছি, কেউ-কেউ অ্যালেনের কবিতা গড়গড় করে মুখস্থ বলে। নোবেল পুরস্কারের জন্য তার নাম একাধিকবার প্রস্তাবিত হলেও তা বাতিল হয়েছে, কবিতা নয়, অন্য কারণে।

অ্যালেন হিপি আন্দোলনেরও গুরু। কলকাতায় সে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াত। আমাদের বাড়িতেও কয়েকবার এসেছে। স্বাতীর সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। তাই স্বাতী অ্যালেনের জন্য একটা পাজামা ও পাঞ্জাবি পাঠিয়েছিল উপহার হিসেবে। সে-দুটো দিতেই অ্যালেন বেশ বিরক্তভাবে বলে উঠল, এসব আবার এনেছ কেন? না, না, এখন আর আমি হিপি নই, এরকম পোশাক পরি না। এখন আমি সুট পরি, টাই-ও পরি, বয়েস হয়েছে তো।

আমি বললাম, স্বাতী তো সেসব বোঝেনি। পাঠিয়েছে, ফেরত নিয়ে যাব? বাইরে না হয় না-ই পরলে, ঘরের মধ্যে, রাত্তিরে শোওয়ার সময়, স্লিপিং সুট হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

ভারতীয় কবিদের উৎসব, আগত কবিরা প্রত্যেকেই পড়বেন নিজের-নিজের ভাষায়, ইংরেজি অনুবাদ অন্য কেউ পাঠ করে দেবে। আমাদের দেশের মতন, ওদেশে পেশাদার আবৃত্তিকার নেই। কবিদের বিকল্প হিসেবে থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পাঠের দায়িত্ব নেয়। অন্যদের বেলায় সেরকমই ঠিক হল। শুধু আমার কবিতা সম্পর্কে অ্যালেন প্রস্তাব দিল, ও নিজেই পাঠ করবে।

আমার কাছে এ-প্রস্তাব প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কোনও বিখ্যাত কবিই অন্য কারুর কবিতা পাঠ করেন না। বিশেষত জীবিত অন্য কারুর। আমি নিজে থেকে অ্যালেনকে এ-অনুরোধ কিছুতেই জানাতাম না। এমনকি এ-কথাও ওকে বলেছিলাম, তুমি কেন পড়বে, অন্য যে-কেউ পড়ে দিলেই তো পারে।

অ্যালেনের একটা বিখ্যাত নিঃশব্দ হাসি আছে। অনেক সময় কোনও কথার উত্তরে ও শুধু ওই হাসিটা দেয়। সেরকম হেসে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

এর আগে 'সিটি লাইট' পত্রিকায় আমাদের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের কবিতা ছাপা হয়েছিল। অ্যালেনই তার অনুবাদ সংশোধন করে দিয়েছিল। এবারেও আমি যে-কয়েকটি কবিতার অনুবাদ নিয়ে গেছি, অ্যালেন তা কিছু কিছু অদলবদল করে নিল।

প্রথম অনুষ্ঠান মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্ট-এর চত্বরে। এটি একটি বিশ্ববিখ্যাত স্থান। আধুনিক চিত্রকলার একটি তীর্থস্থানও বলা যেতে পারে। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দেখি অ্যালেনের গায়ে সুটের বদলে সেই পাঞ্জাবি। একটু-একটু শীত আছে। তবু কোট পরেনি। লাল ডোরাকাটা পাঞ্জাবি পরে আছে। আমাদের দেখে লাজুকভাবে বলল, স্বাতী শখ করে পাঠিয়েছে, রংটা ভালো।

আমেরিকায় যে-কোনও ফ্যাশান বা হুজুগ ঘন-ঘন বদলায়। হিপি আন্দোলন ঠিক হুজুগ নয়, তার মধ্যে ছিল প্রতিবাদ। সে-আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফল এখনও টের পাওয়া যায়। পোশাকের ব্যাপারে কড়াকড়ি অনেক কমেছে। অনেকেই এখন টাই পরে যায় না। কিন্তু ছেঁড়া জামা কিংবা খালি গা কিংবা খালি পায়ে উদ্ভট কিছুই করে না কেউ। অ্যালেনের গায়ে পাঞ্জাবি, অন্যরকমই দেখাচ্ছিল।

কবিসম্মেলনের বর্ণনা দিতে গেলে অন্যদের কবিতাগুলির উদ্ধৃতি দিতে হয়। কিন্তু সেসব কবিতা তো এখন আমার হাতের কাছে নেই। সেদিন আমার কবিতা যদি বেশি হাততালি পেয়ে থাকে, তার কারণ আমার কবিতার গুণাগুণ নয়, আসল কারণ, ইংরেজি ভাষ্য পাঠ করেছে অ্যালেন গিন্সবার্গের মতন কবি! আমেরিকান শ্রোতাদের কাছে এই ব্যাপারটাই তো অভিনব।

এর পরের কাব্যপাঠ হয়েছিল সেন্ট্রাল পার্কের খোলা জায়গায়। যারা নিউ ইয়র্ক গেছে, তারা জানে, ওই শহরের মধ্যে এই সেন্ট্রাল পার্ক আমাদের কলকাতা ময়দানের চতুর্গুণ তো হবেই। এখানে অনেকেই বেড়াতে আসে। এই অনুষ্ঠানে কারুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবু ভিড় হয়েছিল যথেষ্ট। অবশ্য, আমার চেনা বাঙালিরাও ছিল সবাই। তিন গৌতম, ধ্রুব, আলোলিকা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, আর প্রীতি সেনগুপ্ত নামে এক গুজরাতি লেখিকা, যে বাঙালিকে বিয়ে করে অতি সত্বর বাংলাভাষা দারুণ শিখে নিয়েছে। এই প্রীতির সঙ্গে পরে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তা এখনও রয়েছে।

অশোক বাজপেয়ী আমাকে দুঃখ করে পরে বলেছিল, আমেরিকার সব শহরেই দেখেছি, প্রচুর বাঙালি কবিতা শুনতে আসে। সুন্দর-সুন্দর চেহারার মেয়েরা এসে তোমাকে খাতির করে। আমাদের হিন্দিভাষীরা তেমন আসে না, আমাকে কেউ খাতির করে ডেকে নিয়ে যায় না!

এর পর আমরা যে বিভিন্ন শহরে ঘুরেছি তার বিবরণ দিতে গেলে ভ্রমণকাহিনি হয়ে যাবে।

প্রথম উদ্‌বোধনের দিনে অ্যালেন গিন্সবার্গ আমার সম্পর্কে তথা বাংলা কবিতা সম্পর্কে যা বলেছিল, পরবর্তীকালে প্রথম গৌতম অর্থাৎ কল্যাণ রায় 'সিটি অব মেমোরিজ' নামে আমার কবিতার যে ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করে, তার ভূমিকায় অ্যালেন প্রায় সেই কথাগুলোই লিখেছিল। তার কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি, তাতেই বোঝা যাবে বাংলা কবিতা সম্পর্কে সে কতটা ওয়াকিবহাল ছিল।

The great poet of the tongue Tagore is sung better than recifed of translated and everyone feels nostalgic for Rabindranath songs...

One poet now dead, killed in 1954 on Rashbehari Avenue run over by a tram car, Jibanananda Das, did introduce what for India would be "the modern spirit"—bitterness self doubt, sex, street diction, personal confession, frankness, Calcutta beggars etc.—into Bengali letters.

The Poet Sunil Ganguly (the longer version of his name in formal Brahmin Style-Sunil Gangopadhyay) is an old friend of myself since we met back in Calcutta in 1962. Sunil Ganguly is an excellent poet in Bengali and a good drinking companion.

(His) poems are interesting in that they do reveal a temper that is XX Century International, i.e., the revolt of the personal. Warsaw, Moscow, San Francisco, Calcutta, the discovery of felling........

বাংলা কবিতাকে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছিল এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি।

আফ্রিকায় কবিসম্মেলন হয়?

এত দেশ ঘুরছি, কিন্তু আফ্রিকায় আর যাওয়া হচ্ছে না কিছুতেই।

আমি কোনও-একটা দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলে নিজের উদ্যোগে কিংবা জমানো পয়সায় পাশের দু-একটা দেশ দেখে আসি। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে গিয়েছিলাম টার্কিতে।

কিন্তু আফ্রিকার কোনও দেশ থেকে কেউ নেমন্তন্ন করে না। ভারত সরকারও আফ্রিকার কোনও দেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল পাঠায় না। কেন পাঠায় না কে জানে। অন্তত আমি সেরকম খবর কখনও শুনিনি।

সুতরাং গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাই আমার অ-দেখা থেকে যাচ্ছিল। আর সেজন্য একটা অস্বস্তি জমছিল মনের মধ্যে। নিজে পুরো টিকিট কেটে অত দূর দেশে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। ওসব দেশে হোটেলের খরচও খুব বেশি। খুব বড়-বড় দু-চারটি হোটেল আছে, আর সবই খুব সস্তার, মাঝারি ধরনের হোটেল নেই। খুব সস্তার হোটেল নিরাপদ নয় বলে শুনেছি। টাকা পয়সা তো বটেই, জামা-কাপড়, এমনকি জুতো পর্যন্ত চুরি হয়ে যায়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ এসে গেল।

বম্বে এয়ারপোর্টে দেখা হয়ে গেল তন্ময় দত্তের সঙ্গে। তন্ময় আমার কৃত্তিবাসের গোড়ার দিকের সময়কার বন্ধু। তখন সে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। যেমন দুর্দান্ত ছাত্র, তেমনই ভালো কবিতা লেখে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সখ্য বেশি ছিল। ওদের দুজনকে সবসময় একসঙ্গে দেখা যেত, কবি হিসেবেও শক্তি-তন্ময় নাম দুটি একত্রে উচ্চারিত হত।

তারপর কোনও এক কারণে, তন্ময় কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দেয়। শোনা যায়, তার কবিতার বইয়ের একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, সেই অভিমানেই তন্ময় বিদায় নেয় কবিতার জগৎ থেকে। এই কারণটা সত্যি কি না জানি না। পরবর্তীকালে তন্ময় নিজেও তা অস্বীকার করেছে, যদিও অকস্মাৎ কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়ার কারণ সে জানায়নি। অনেক বছর বাদে, সে 'তরুণ দত্ত' ছদ্মনামে 'দেশ' পত্রিকায় অনেকগুলি ধারালো, বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ লিখেছিল।

তন্ময়ের কোনও কবিতার বই আর বেরোয়নি। হারিয়ে গেছে সেইসব কবিতা। একেবারে হারায়নি। 'কৃত্তিবাস'-এর প্রুফ আমি নিজেই দেখতাম বলে অন্যদের অনেক কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তন্ময়ের একটা কবিতার নাম 'শিল্পী', তার কয়েক লাইন :

কাঁধেতে ফুলের ছাতা, শিল্পী চলে একা একা পথ দিয়ে
মুখ হয়তো দেখা যাবে অবিমৃষ্যকারী ভবিষ্যতে,
ততদিনে মুখ না; আপাতত ফুলের ছাতাই
শিল্পীর অদ্ভুত মুণ্ড...
রমণী লোভায়ও যদি, কৃশ লোভ শিল্প গড়ে গেলে
চরিতার্থ হয় কিছু? নাকি নিম্নে বীজের ভাণ্ডার
প্রকৃতি যা দিয়ে দেহে পাঠিয়েছে সংসারে, দুয়ারে
যাবে না অক্ষয় রাখা?...

কবিতার জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তন্ময় আবার কলেজীয় পড়াশোনায় মন দেয়, দুর্দান্ত রেজাল্ট করে। তন্ময়ের ছোট্টোখাট্টো চেহারা, কিন্তু সে একটার পর একটা বিশাল চাকরি ধরে আর ছাড়ে। হঠাৎ হঠাৎ এখানে-সেখানে দেখা হয়, তখনই শুনি ও পুরোনো চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি ধরেছে, কখনও দুর্গাপুরে, কখনও কোরিয়ায়, কখনও হয়তো পুনেয় কিংবা সিঙ্গাপুরে।

বোম্বেতে দেখা হওয়ার পর তন্ময় বলল, ও এখন চাকরি করছে আফ্রিকার কেনিয়ায়।

শুনেই আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে জিগ্যেস করলাম, তোমার ওখানে যদি যাই, আমাকে থাকার জায়গা দেবে?

তন্ময় একগাল হেসে বলল, আমাকে দিয়েছে একখানা আস্ত বাড়ি। তাতে পাঁচখানা বেডরুম। অত ঘর নিয়ে আমি কী করব? তাই বেশ কয়েকটা ঘরের দরজাই খোলা হয় না। তুমি এসে থাকো না, যতদিন খুশি। আমার বাবুর্চি রান্না করে দেয়, খাওয়া-দাওয়ারও অসুবিধে নেই। আমার কোম্পানির গাড়ি দিয়ে দেব, ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াবে।

কোন সহজ উপায়ে যাওয়া যায়, তা-ও বাতলে দিল তন্ময়।

এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট আছে কেনিয়ার নাইরোবি শহরে। ভাড়া বেশি নয়। কেনিয়া যাওয়ার জন্য ভারতীয়দের ভিসা লাগে না। সুতরাং যে-কোনওদিন যাওয়া যেতে পারে।

তন্ময় ওর ঠিকানা ও ফোন নাম্বার লেখা কার্ড দিয়ে বলল, চলে এসো, শিগগিরি চলে এসো। আমি একা একা থাকি...

সুযোগ যখন আসে, তখন যেন পরপর লাইন দিয়ে আসে।

কলকাতায় ফিরেই কয়েকদিন বাদে খবর পেলাম, অমল লাহিড়িও এখন থাকে ওই নাইরোবি শহরেই। অমল ও তার স্ত্রী মঞ্জু আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, দুজনেই বহু আড্ডার সঙ্গী। অমল নিজে লেখে না বটে, কিন্তু এককালে কমলকুমার মজুমদারের চ্যালা ছিল।

অর্থাৎ দুখানা থাকার জায়গা।

তারপর আরও একটা সুযোগ।

ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। সরকারি দলকে সবসময় এয়ার ইন্ডিয়াতেই যেতে হয়। এই যাত্রায় ফেরার পথে আমার রুটটা কিছু বেঁকিয়ে নাইরোবিতে নেমে পড়তে পারি। তাহলে আমার আর প্লেন ভাড়াও লাগবে না। চমৎকার। এবার তাহলে আফ্রিকাতে যাচ্ছিই।

ফ্রাঙ্কফুর্ট ঘুরে চলে এলাম লন্ডন। যথারীতি ভাস্কর দত্তের বাড়িতে উঠেছি। এখান থেকেই নাইরোবির ফ্লাইট ধরতে হবে। সব ঠিকঠাক। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত।

পরদিন সকালবেলা খবর কাগজ পড়তে-পড়তে দেখি, সেইদিন থেকেই কেনিয়ায় ভারতীয়দেরও ভিসা নিয়ে ঢুকতে হবে, নইলে যাওয়া যাবে না।

ভিসা আনতে হয় দেশ থেকে। আমি আনিনি। সে-প্রশ্নও ছিল না। এককালে জার্মান কিংবা ইংল্যান্ড, সুইডেন, কানাডা এইসব দেশে ভারতীয়দের ভিসা লাগত না। আমি বিনা ভিসাতেই কয়েকটি

দেশে গেছি, এয়ারপোর্টে গিয়ে চাইলেই ভিসা দিয়ে দিত। ক্রমে ক্রমে সব দেশই ভারতীয়দের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করছে।

পরশুদিন আমার যাওয়ার টিকিট কনফার্মড। এর মধ্যে ভিসা পাওয়ার কোনও উপায় নেই। প্লেনের তারিখ বদলালে পরবর্তী সিট কতদিনে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। সুতরাং যাত্রা বাতিল করতে হবে। খবর দিতে হবে তন্ময় আর অমলকে।

চা খাওয়া শেষ করে ভাস্কর বলল, চল তো একবার কেনিয়ার হাইকমিশন অফিসটা দেখে আসি।

ভাস্করের গাড়িতে অনেক ঠিকানা খুঁজে সেখানে পৌঁছে একেবারে চক্ষুস্থির। সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য।

হঠাৎ এই ঘোষণায় অনেক লোকই বিপদে পড়েছে। অনেক সাহেবটাহেবকেও ব্যাবসার কারণে কেনিয়ায় যেতে হয়। সকলেরই যাওয়া আটকে গেছে।

লোকমুখে শোনা গেল, সাত দিনের আগে ভিসা পাওয়ার কোনও আশা নেই।

আমি ভাস্করকে বললাম, চল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমি সাত দিন লন্ডনে বসে থাকতে পারব না। তারপর প্লেনের টিকিট।

ভাস্কর সহজে নিরাশ হয় না। সে অদম্য আশাবাদী। বলল, আগে তো একটা ভিসা ফর্ম জোগাড় করা যাক, তারপর প্লেনের টিকিটের খোঁজ নেওয়া যাবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাইনে দাঁড়ালাম।

একটি কোকিল রঙের ছিপছিপে তরুণী বসে আছে কাউন্টারে। নাম লিখে-লিখে ফর্ম বিলি করছে। যথাসময়ে আমি তার সামনে পৌঁছে নামটি বলতেই সে থমকে গিয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

তারপর বলল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রাইটার?

আমি, যাকে বলে, স্তম্ভিত! নাম শুনে চিনতে পেরেছে? আমার খ্যাতি আফ্রিকাতেও পৌঁছে গেছে? অসম্ভব। নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে!

এবার মেয়েটি বাংলায় এবং বাঙাল ভাষায় বলল, আমি আপনার অনেক লেখা পড়ছি! আপনি ভিতরে আসেন। ভিতরে আসেন।

মেয়েটি বাংলাদেশি। অনেক দূতাবাসেই এরকম বাইরের ছেলেমেয়ে চাকরি করে।

বাংলাদেশের একটি মেয়ে আমার নাম জানতেই পারে। কিন্তু আমার লেখা যে আফ্রিকার পাঠিকাদের কাছে পৌঁছয়নি, সেটাই স্বাভাবিক। তবু চমক লেগেছিল বেশ।

সেই মেয়েটি দু-ঘণ্টার মধ্যে আমার ভিসার ব্যবস্থা করে দিল।

নাইরোবিতে পৌঁছে আমি ভাগাভাগি করে কখনও তন্ময়ের কাছে, কখনও অমল-মঞ্জুরও বাড়িতে থেকেছি। অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই ভ্রমণকাহিনি অনেক লম্বা করে লেখা যায়। কিন্তু আমার তো লেখার কথা কবি সম্মেলনের বিবরণ।

কোনও কবি সম্মেলনে তো এখানে আসিনি। এসব জায়গায় কোনও কবি সম্মেলন হয় কি না, তা-ও জানি না।

আমার কেনিয়ায় আসার মূল উদ্দেশ্য মাসাইমারা নামে বিশ্ববিখ্যাত জঙ্গল একবার নিজের চোখে দেখা। গাড়িতে অনেক দূরের পথ, নাইরোবি থেকে ছোট প্লেনে যাওয়া যায়। আমার ইচ্ছে ছিল, তন্ময় কিংবা অমলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তন্ময়ের ছুটি নেওয়ার উপায় নেই, অফিসে খুব কাজ। তা ছাড়া তন্ময়ের বোধহয় বেড়াবার খুব শখও নেই, অফিস থেকে ফিরে হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে গান শোনে।

অমল নাইরোবির মধ্যে এবং আশেপাশে আমাকে নিয়ে অনেক ঘুরেছে। আফ্রিকা সম্পর্কে

অমলের চেয়েও মঞ্জুর জ্ঞান বেশি। নাইরোবি ছেড়ে দু-তিন দিনের জন্য বাইরে যাওয়া অমলের পক্ষে সম্ভব নয়। একটা কাগজ-কারখানার পুরো দায়িত্ব ওর ওপর। ওদের একটি ছেলে আছে, বেশ ছোট তখন, মঞ্জুকে তার দেখাশোনা করতে হয়।

সুতরাং মাসাইমারা জঙ্গল কিলিমাঞ্জারো পাহাড়, এসব আমি একাই ঘুরতে গিয়েছিলাম। সে-অভিজ্ঞতার কথাও এখানে লিখছি না।

কেনিয়ায় লোকে সিংহ দেখতে যায়। আমি যে কত সিংহ দেখেছি, তার ঠিক নেই। কোথাও সিংহ দেখেছি, মাত্র কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরত্বে। নাইরোবি শহরটি উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওখানে বলে, মানুষরা থাকে খাঁচার মধ্যে, আর জন্তু-জানোয়াররা বাইরে।

একবার দুটো সিংহ এসে এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে বসে ছিল। তিন দিন সব বিমান চলাচল বন্ধ।

আমি সিংহ দেখেছি প্রথম দিনই। একটা সিংহী একটা হরিণকে তাড়া করে ধরল। মেরে তার পেটের মাংস খেতে লাগল। হরিণটা তখনও ডাকছে...এসব সাজানো ব্যাপার নয় কিন্তু। আফ্রিকায় কিছু সাজানোর দরকার হয় না, রাস্তায় জেব্রা ঘুরে বেড়ায় গাধার পালের মতন। গাড়ি চলতে-চলতে একজায়গায় থেমে যায়, জিরাফের দল রাস্তা পার হচ্ছে। ভারতীয় হাতির চেয়ে অনেক বড় পাহাড়ের মতন হাতি, আসল চিতা বাঘ, জল থেকে উঠে আসা জলহস্তী, এর আর শেষ নেই।

একদিন গিয়েছিলাম এখানকার টেম্পল বারে। হুইস্কির সঙ্গে চাট হিসেবে দিয়েছিল জেব্রা আর ওয়াইল্ড বিস্টের মাংস ভাজা। এই ওয়াইল্ড বিস্ট সম্পর্কে লিখতে গেলেও কয়েকপাতা হয়ে যাবে। কিন্তু এটা তো ভ্রমণকাহিনি লেখার জায়গা নয়।

হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত একটা কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত হয়েছিলাম ঠিকই।

বিদেশে গেলে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয় না। যদি দৈবাৎ সেখানে কোনও বাঙালি অফিসার থাকে, তাহলে অন্য কথা। বাঙালি কেউ না থাকলে পাত্তাই দেয় না। আমরা নামেই ভারতীয়, কিন্তু বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা পরিচয় এখনও প্রকট। আসল আত্মীয়তা হয় ভাষার মাধ্যমে। অনেক প্রবাসী বাঙালি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত। তাঁরা কিন্তু বাংলা ভালো জানেন না, কোনওক্রমে বাংলায় কথা বলতে পারলেও অক্ষরজ্ঞান নেই। বাংলা পড়েন না বলেই আমাকে সেই ধরনের বাঙালিরা তেমন একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।

বরং ওই ভাষার সূত্রেই বাংলাদেশ দূতাবাসের কেউ-না-কেউ আমার খোঁজ করেন, বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুঁটকি কিংবা ইলিশ মাছ খাওয়ান। মনে আছে, যেবার মালয়েশিয়া যাই, কোনও একটা প্রয়োজনে আমাকে ভারতীয় দূতাবাসে যেতে হয়েছিল, সেখানে আমাকে অকারণে বসিয়ে রাখা হয়েছিল দুঘণ্টা, তারপরেও কাজটা হয়নি। অথচ ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের যিনি প্রধান, সেই মাহবুব আলম আমার প্রত্যেকদিন খোঁজখবর নিতেন। এই মাহবুব আলম ছিলেন একসময় কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে খুবই বিদগ্ধ ব্যক্তি, শুধু আমার সঙ্গে নয়, কলকাতার বহু লেখক-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মালয়েশিয়াতে তিনি আমাকে প্রায়ই নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। একদিন সকালবেলা তাঁর ড্রাইভার আমার হোটেলে এসে একটা বড় প্যাকেট উপহার দিল। সঙ্গে একটা চিরকুট। তাতে লেখা, এ-দেশে হুইস্কির খুব দাম। নিজের পয়সায় কিনবেন না।

মালয়েশিয়াতে অবশ্য শেষের দিকে হোটেল ছেড়ে উঠেছিলাম মুস্তাফা কামাল ওয়াহিদের বাড়িতে। সে জন্মসূত্রে বাংলাদেশি, পরে কানাডার নাগরিক। কামাল অবশ্য বাংলাদেশি কিংবা ক্যানেডিয়ান নয়, সে বিশ্বনাগরিক। আমরা জন্মসূত্রে কিংবা অন্য কারণে যে যে-দেশেরই নাগরিক হই না কেন, বিশ্বনাগরিকত্বও তো আমাদের জন্মগত অধিকার। সেকথা অনেকেই মনে রাখি না।

কেনিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের এক অফিসার সুলতান আহমেদ কী করে যেন আমার সন্ধান

জেনে গেলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন মনোযোগী পাঠক এবং নিজেও কবিতা লেখেন। তাঁর স্ত্রী নাজনিনও খুব রুচিশীল মহিলা। নিজে যেমন রূপসী, তেমনই তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দুবার সে বাড়িতে আমার আমন্ত্রণ হল, অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা।

তার ওপরেও সুলতান আহমেদ বলে রাখলেন, ফর্মালি দাওয়াত দিতে হবে কেন, যে-কোনও সন্ধেবেলা আপনি চলে আসবেন।

ওঁর উদ্যোগেই একটা কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা হল।

আফ্রিকার যে-কোনও দেশেই বহু উপজাতি, বহু রকমের ভাষা। সোয়াহিলি ভাষার সূত্রে অনেককে জোড়ার চেষ্টা হয়েছিল, তা খুব একটা সফল হয়নি। তবে সোয়াহিলি ভাষাতেও বেশ কিছু সাহিত্য রচিত হয়, শিক্ষিতরা সবাই অবশ্য লেখেন ইংরেজিতে।

আমরা অবশ্য বেন ওকোরির মতন দু-একজন লেখক ছাড়া অন্যান্য আফ্রিকান লেখকদের হিসেব খবর রাখি না। আমেরিকায় কালো মানুষদের কবিতা পড়ি, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কবি ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আফ্রিকান সাহিত্য আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলা যায়। আফ্রিকান লেখকরাও কি ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহী? নাকি তারাও শুধু তাকিয়ে থাকে ইউরোপ-আমেরিকার দিকে।

কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল সুলতান আহমেদেরই এক সহকর্মীর বাড়িতে, সেটি পরিসরে অনেক বড়, একটা হলঘরও আছে। আমন্ত্রিত কবির সংখ্যা এগারোজন। তন্ময়কেও দলে টানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে কবিতা থেকে দূরে থাকার সঙ্কল্পে অটুট। বাংলাদেশি কবিও আছেন দুজন, বাকিরা স্থানীয়। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ খ্যাতিমান, ইংরেজিতে তিনখানা কাব্যগ্রন্থ আছে।

প্রথমে ঠিক ছিল, সব কবিরাই যে-যার নিজের ভাষাতে পড়বেন। তাতে বাংলা কবিতাই শুধু বোধগম্য হবে, কারণ, শ্রোতারা অধিকাংশই বাঙালি। অন্য যাঁদের কবিতা ইংরেজিতে লেখা, সেগুলি মোটামুটি আমরা বুঝলেও তাঁরা তো আমাদের লেখা কিছুই বুঝবেন না। সুতরাং ঠিক হল, সকলের কবিতারই ইংরেজি ভাষ্য থাকবে, সেই ইংরেজি পাঠ করে শোনাবেন আর-একজন।

সেদিন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ঝিরঝিরিয়ে। ভালোই জমেছিল কবিতা পাঠের আসর। নাইরোবির আবহাওয়া বেশ সুন্দর, সারা বছরে কখনও তীব্র গ্রীষ্ম নেই, তীব্র শীতও নেই। সেইজন্যই সাহেবদের বেশ পছন্দ ছিল জায়গাটা। বৃষ্টি পড়লে একটা সোয়েটার গায়ে দিতে হয়। আমি সোয়েটার নিয়ে যাইনি। ঠান্ডাটা বেশ উপভোগই করছিলাম।

এই দূতাবাস সম্পর্কে একটা কথা আগে বলিনি।

সুলতান আহমেদের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর অন্য সহকর্মীরাও খুব আন্তরিক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শুনেছিলাম, শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারী সেনা অফিসাররা অনেকে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বাইরের বিভিন্ন দূতাবাসে ছদ্মনামে আশ্রয় নিয়ে আছে। মেজর ডালিমের সেখানে থাকার খুবই সম্ভাবনা। সত্যি না মিথ্যে জানি না, গুজবও হতে পারে। কিন্তু আমি দূতাবাসের বিভিন্ন কর্মীর আচরণ চোরা নজরে খুঁটিয়ে লক্ষ করতাম। এদের মধ্যে কেউ অন্যতম নৃশংস খুনি? কারুকেই সেরকম মনে হয়নি কি! সেই কবিতা পাঠের আসরে সবাই উপস্থিত, মন দিয়ে শুনেছেন কবিতা। খুনিরাও হয়তো সাময়িকভাবে কবিতায় বশ হয়।

অনেকদিন আগেকার কথা, সেসব কবির নাম মনে নেই, কবিতাগুলিও সংগ্রহ করে রাখিনি। মনে আছে, আফ্রিকার এক দেশে বৃষ্টিমাখা সন্ধ্যায় কবিতার মদির আবহাওয়া আর বিভিন্ন কবির আত্মীয়তা এবং একটি চমক।

আমরা আফ্রিকান কবিতার ধার ধারি না, কিন্তু ওখানকার একজন কবি নিজের কবিতা পাঠ করার পর বললেন, তোমাদের দেশের একজন কবির কবিতা আমার খুব প্রিয়। সেই কবির একটা কবিতা শোনাতে পারি?

সেই প্রবীণ কবিটি ইংরেজিতে পড়লেন, Where the mind is without fear / And the head is upright...

অর্থাৎ 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির...'

আজও আমাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র আন্তর্জাতিক!

তুষারপাতের মধ্যে সেদিনের সেই কবিতা পাঠ

শ্রীমতী নূপুর লাহিড়ি এক আশ্চর্য মহিলা। এরকম জীবনীশক্তিতে ভরপুর, তেজি, কোমল, নানা গুণের অধিকারিণী রমণী আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। সিকি শতাব্দীরও বেশি বিদেশবাসিনী হয়েও প্রাক্তন স্বদেশ, বিশেষত কলকাতা শহর সম্পর্কে টান তাঁর একটুও কমেনি।

এরকম অবশ্য আরও অনেক বাঙালিই আছেন দেশান্তরে যাঁরা মাঝে-মাঝেই তাঁদের বাল্য-কৈশোরের লীলাভূমি সম্পর্কে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন, ফিরে আসেন বছরে অন্তত একবার। সাধারণত পশ্চিমি দেশের শীতের প্রাবল্যের কারণে আমাদের এখানকার মৃদু ঠান্ডাই অনেকের পছন্দ। শীতকালে যাঁরা দলে দলে এখানে চলে আসেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে শীতের পাখি।

কিন্তু এই স্মৃতিকাতরতা বা নস্টালজিয়া অনেকটাই ব্যক্তিগত। বিদেশে যাঁরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছেন, তার সুফল জন্মভূমিতে বিশেষ টের পাওয়া যায় না। কেউ কেউ অবশ্য গ্রামের স্কুলের সংস্কারের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন, কেউ কেউ হয়তো গরিব আত্মীয়স্বজনকে কিছু ছিটেফোঁটাও দিয়ে থাকেন। মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গরিব পরিবারের ছেলে মণি ভৌমিক আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক হিসেবে বেশ কয়েকটি পেটেন্ট নিয়েছেন, বিপুল অর্থেরও অধিকারী হয়েছেন, তিনি এখন মেধাবী, গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য এখানে প্রতি বৎসর অনেকগুলি স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করেছেন, এরকম দৃষ্টান্তও আছে। অমর্ত্য সেনের প্রাচী প্রতিষ্ঠানের কথাও সবাই জানেন। তবু এগুলিকেও ব্যতিক্রমই বলা যায়। অনেকে কিছুই করেন না।

আবার এ কথাও ঠিক, বিদেশে অবস্থানকারীদের সকলকেই টাকার গাছ ধরে নিয়ে আমাদের স্থানীয় অনেক আসল না নকল প্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্যের জন্য ঝুলোঝুলি করে তাঁদের বিরক্তির উৎপাদন করেন। কে আসল, কে নকল তা ঠিক করতে না পেরে প্রবাসীরা সকলের থেকেই রক্ষা করেন দূরত্ব।

নূপুর লাহিড়ির দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই আলাদা।

প্রথমদিকে প্রথম কিছু বছর নূপুর ব্যস্ত নিজের যোগ্যতা অর্জন এবং ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা নিয়ে।

এদেশ থেকে ডাক্তারি পাস করে গিয়েছিলেন নূপুর, বিয়েও হয় এক বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে। জন্ম হল দুটি সন্তানের, বাচ্চা বয়েসে তাদের লালন-পালনের ভার নিয়েও নূপুর নিজের চিকিৎসকের কাজ ছাড়েননি।

ক্রমে সেই ছেলে দুটি সাবালক হল। ওদেশে তারপর আর ছেলেরা বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে না।

একজন হল ডাক্তার, অন্যজন গেল গান-বাজনা ও অভিনয়ের দিকে। দুজনেই সার্থক। এখানে

আর-একটি বিস্ময়ের কথাও জানানো দরকার। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জননী হলেও নূপুরের কিন্তু বয়স বাড়ল না। সে যে শুধু পূর্ণ যুবতী তাই-ই নয়। সে সদাচঞ্চলা।

পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নূপুর একদিন তার স্বামীর কাছ থেকে চাইল স্বাধীনতা। সে তার জীবনকে অন্যভাবে পল্লবিত করতে আগ্রহী। কিশোরী নূপুর গান শিখেছিল, একটু-আধটু লেখার চর্চাও ছিল, মাঝখানে বহু বছর সেসব ভুলে থাকতে হয়েছে। এবার সে আবার শিল্প-সংস্কৃতির দিকে ফিরে যেতে চায়।

বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেল স্বামীর সঙ্গে। চিকিৎসক হিসেবে তার কিছুটা প্রতিষ্ঠা ছিলই। তাতে সে আরও মনোযোগ দিয়ে গড়ে তুলল প্রতিপত্তি। কিনল একটা অট্টালিকাসম গৃহ, তার বেসমেন্টেই শ-খানেক মানুষ সমবেত হতে পারে নানান উৎসবে।

কলকাতায় নূপুরদের বাড়িতে ছিল সাহিত্য ও গানবাজনার পরিবেশ। তার বাবা একজন বিশিষ্ট লেখক, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভ্রমণসাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন আছে। একসময় ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর 'শংকর-নর্মদা'। তাঁর 'খাজুরাহো চান্দেল্ল স্মৃতি' নামে একটি গ্রন্থ আমার বিশেষ প্রিয়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও ছিল। একদিন বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়েও ছিলেন। নূপুরকে অবশ্য তখন দেখিনি।

সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে নূপুর বিদেশে স্বাধীন জীবনযাত্রা শুরু করার পর মন দিল সংস্কৃতিচর্চায়। গানবাজনা তো শুরু করলই; নিজে গান লিখে সুরও দিল। তার প্রথমদিকের সেরকম একটি গান বিবাহ প্রথারই বিরুদ্ধে : 'ভালো যদি বাসো সখী, সিঁদুর পরো না!'

নিজের বাড়িতে নূপুর স্থাপন করল একটা লাইব্রেরি। তাতে বাংলা বই ছাড়াও রইল নানান ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ। তার উদ্দেশ্য, শুধু বাঙালিরা নয় উৎসাহী আমেরিকানরাও যাতে সেই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকায় গেলেন এই মেয়ের কাছে। বাবা সেখানে বসে লিখবেন, তাই নূপুর একটি সুদৃশ্য ঘরে টেবিল চেয়ার পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু নির্মলচন্দ্র অকস্মাৎ সেখানে শেষ নিশ্বাস খরচ করে ফেলেন। বাবার স্মৃতিতেই নূপুরের সেই লাইব্রেরি। নূপুর লেখালেখিও শুরু করে নতুনভাবে। তার কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকায় এবং 'কৃত্তিবাস' ত্রৈমাসিকে।

নূপুর আর-একটি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা নিয়ে ফেলে।

এদেশ থেকে যেসব গায়ক-গায়িকা, নাট্যদল বা লেখক-লেখিকারা মাঝে-মাঝে আমন্ত্রিত হয়ে ওদেশে যান, তাঁদের দর্শক-শ্রোতা অধিকাংশই বাঙালি। সাহেব-মেম প্রায় থাকেই না বলতে গেলে। নেহাত বিবাহসূত্রে ছাড়া অর্থাৎ কারুর মেম-বউ বা সাহেব-স্বামী। সে বেচারিরা ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকে, ভাষার ব্যবধানের জন্য।

নূপুর ঠিক করল, পশ্চিমবাংলা থেকে এক-একটি সাংস্কৃতিক দল সে নিয়ে যাবে ওদেশে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং অনুষ্ঠান এমনভাবে সাজাবে যাতে ইংরেজিভাষীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ সে বাঙালির সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে চায় ওদেশে। এ কথা তো সত্যি, ওদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই প্রজন্মের আমেরিকানরা ভুলে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামও।

এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'বেঙ্গল ফাউন্ডেশান'। পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় সবই নূপুরেরই। তার উদ্‌বোধন উপলক্ষে কলকাতা থেকে যাবে প্রায় দশজনের একটি দল, কিছুটা নাটক, আবৃত্তি গান, কবিতা পাঠ সব মিলিয়ে। সে নির্বাচন করল অধিকাংশ তরুণ শিল্পীদের, তবে দলটির নেতৃত্ব দেবে ততটা তরুণ নয় এমন একজন। কিংবা বলা যায় মনে-মনে তরুণ হলেও চেহারা বা বয়েসে আর তরুণ নয়, অর্থাৎ আমি।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে হিসেবে নয়, সে-পরিচয় আমি অনেক পরে জেনেছি, এমনিই

এক ব্যক্তিত্বময়ী, আকর্ষনীয়া রমণী হিসেবে নূপুর একদিন কলকাতায় আমার বাড়িতে আসে আলাপ-পরিচয় করার জন্য। প্রথম আলাপের পরই তার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। চিকিৎসক হিসেবে সে মনস্তত্ত্ববিদ, সুতরাং চিকিৎসার কারণে তার শরণাপন্ন এখনও হতে হয়নি আমাকে, কিন্তু তার সঙ্গে থেকেছি অনেক গান-বাজনার আসরে। এদেশে আর ওদেশেও।

বেঙ্গল ফাউন্ডেশান প্রতিষ্ঠার চিন্তায় একেবারে মেতে উঠল নূপুর। নামি চিকিৎসক। সুতরাং ব্যস্ততা তো থাকবেই। একটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তা ছাড়া নিজস্ব চেম্বারও আছে। এর বাইরে সময় পেলেই সে গান গায়, ছবি আঁকে, লেখে, আড্ডা দেয়, পুরুষদের সঙ্গে কড়া জাতীয় পানীয় গ্রহণে সঙ্গ দিতেও তার আপত্তি নেই। এবং মাত্র দু-ঘণ্টার নোটিশে সে কুড়িজন অতিথিকেও নানা জাতীয় সুখাদ্য নিজে রান্না করে খাওয়াতে পারে।

আসন্ন বেঙ্গল ফাউন্ডেশানের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান সার্থক করার জন্য তাকে সাহায্য করতেও এগিয়ে এল অনেকে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তার এক বন্ধুর কথা, সে জন্ম-জার্মান কিন্তু এখন আমেরিকাবাসী, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, মধ্যবয়েসি এই মানুষটি অতি মধুরভাষী এবং কতরকম গুণের যে অধিকারী তা বলে শেষ করা যায় না। বাঁশি, পিয়ানো ইত্যাদি কুড়ি-পঁচিশরকমের বাজনা সে বাজাতে পারে সাবলীলভাবে, ছবি আঁকা ও কম্পিউটার গ্রাফিকসে সে দক্ষ, তার নাম এন্ডর। এই নামটিতেই বৈশিষ্ট্য আছে। ইংরেজি করলে হয় অ্যান্ড অর, বাংলায় এবং অথবা। এই নামটিতেই যেন প্রতিফলিত তার জীবনদর্শন। এবং আর অথবা, এই নিয়েই তো মানুষের জীবন।

বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখে নিয়েছে এন্ডর, মূল বাংলায় বইটই না দেখে গেয়ে যায়। আমেরিকানদের বাংলা কালচারে দীক্ষিত করার যে ব্রত নিয়েছে নূপুর, তার প্রথম সার্থক নিদর্শন এই এন্ডর। পায়ের ওপর পা দিয়ে সে যখন বাঁশি বাজায়, তাকে মনে হয় ফরসা কেষ্টঠাকুরটি।

এ ছাড়া রয়েছেন মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্ত। নতুন প্রজন্মের পাঠকরা সম্ভবত জানেন না যে মীনাক্ষী বুদ্ধদেব বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা, তার লেখার হাতটিও চমৎকার। জ্যোতির্ময় দত্ত আমেরিকায় যাওয়ার আগে অনেকবার ঝড় তুলেছে বাংলা সাহিত্যে। লিখেছে সম্পূর্ণ আলাদা স্বাদের কবিতা, লিখেছে নাটক, অসাধারণ ভ্রমণকাহিনি (তার 'অতল পাথরের সাগর যাত্রা' নামে একটি লেখা আমার মতে বাংলা গদ্যের একটি অসাধারণ নিদর্শন), প্রচুর প্রবন্ধ এবং সম্পাদনা করেছে একদা বিখ্যাত 'কলকাতা' পত্রিকা। কবি বিনয় মজুমদার সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে জ্যোতিই তাকে প্রথমে নিয়ে আসে উৎসাহী পাঠকদের গোচরে। আমেরিকায় গিয়ে জ্যোতি ইংরেজি সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ায় বাংলা সাহিত্যের খুবই ক্ষতি হয়েছে।

গৌতম দত্তের কথা অন্য একটি লেখায় উল্লেখ করেছি। ওদেশে সকলকেই নিজের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। জীবিকার জন্য যে কাজ তারপরে আর অন্য অকাজের জন্য উৎসাহ থাকে না অনেকেরই। তবু কারুর কারুর মাথায় পোকা থাকে। তাদের উৎসাহও অদম্য। তারা নিজেকে নানা দিকে ছড়িয়ে না দিয়ে পারে না। আমার সৌভাগ্যবশত এইসব মানুষদের সঙ্গেই আমার সৌহার্দ হয়।

গৌতম দত্ত অনেকদিন মেতেছিল থিয়েটার নিয়ে, এখন তাকে টেনেছে কবিতার চুম্বক। অবশ্য থিয়েটারও সে ছাড়েনি। এখন আমি যে-সময়কার কথা লিখছি (১৯৯৭ সাল) তার কয়েক বছর পর গৌতম যে একটি বাংলা নাটক আমেরিকায় সাতটি শহরে অভিনয়ের বিশাল উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সে-সম্পর্কে আমার কিছু লেখা শিষ্টাচারসম্মত নয়, হয়তো অন্য কেউ পরে লিখবে। সত্যিই বাংলা নাটক নিয়ে অমন কাণ্ড দূর বিদেশে আগে কখনও ঘটেনি।

করবী এবং অধ্যাপক মণি নাগও নূপুরের কর্মকাণ্ডের উৎসাহ দেন। রয়েছেন এরকম আরও বেশ কয়েকজন। ধ্রুব কুণ্ডু, যার কথা আগে লিখেছি, সে-ও প্রায় সর্বক্ষণ সাহায্য করেছে।

এদিকে কলকাতায় আমন্ত্রিতদের মধ্যে সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। এরা প্রায় কেউই আগে আমেরিকায় যায়নি। সকলেই অতিরিক্ত শীতবস্ত্র কিনে ফেলেছে। প্রত্যেকের টিকিটের ব্যবস্থা করেছে নূপুর, ওখানকার আতিথ্যের তো প্রশ্নই ওঠে না।

যাত্রার দিন খুব এগিয়ে এসেছে, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাত! আমেরিকান উপদূতাবাস সকলেরই ভিসা প্রত্যাখ্যান করেছে।

এই ভিসা পাওয়া অনেকটা লটারির মতন। কখন যে ওঁদের কী মর্জি হয়, তা বলা মুশকিল। বিশেষত অল্পবয়েসি যুবক-যুবতিদের সম্পর্কে ওঁদের ঘোর সন্দেহ, একবার গেলে বুঝি আর ফিরবে না। অবিবাহিত কিংবা বেকাররাও এই সন্দেহ তালিকাভুক্ত। আর যারা মস্ত শিল্পী, তাদের ব্যাপারেও ওখানকার শিল্পীদের ইউনিয়নের অনুমতি লাগে। সে অনেক ঝামেলা।

মোট কথা, অনেক চেষ্টা করেও অন্যদের মিলল না ভিসা।

বাকি রইলাম, সবে ধন নীলমণি, আমি !

আমাদের ছাত্র বয়েসে জ্যোতি ভট্টাচার্য নামে একজন ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েও আগুনঝরানো বক্তৃতা দিতেন। ওয়ার্কার্স পার্টি নামে একটি দলও খুলেছিলেন, কিছুদিনের জন্য সেই দলের নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন প্রথম যুক্তফ্রন্টে। তাঁর সম্পর্কে বলা হত, ওই দলের নেতা আছে কিন্তু কর্মী নেই একজনও!

আমারও সেই অবস্থা! বেঙ্গল ফাউন্ডেশানের উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য একটি দলের নেতা হিসেবে আমার আমেরিকায় যাওয়ার কথা, কিন্তু আমাকে বিমানে চাপতে হল একা, দলের আর কেউ নেই। স্বাতীও সঙ্গে এল না কারণ, সেই বছরেরই গোড়ায় একসঙ্গে বিদেশে গিয়েছিলাম, এই সময়ে স্বাতী কোনও ব্যাপারে ব্যস্ত।

খুব সম্ভবত আমাকে একা দেখে নূপুর নিরাশ হয়েছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে।

বেঙ্গল ফাউন্ডেশানের প্রতিষ্ঠা উৎসবের অবশ্য কোনও ত্রুটি রাখেনি নূপুর। অনেকগুলি প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে আছে। নিছক বাঙালিদের অনুষ্ঠান নয়। বাংলা সংস্কৃতিনির্ভর আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া আছে তাতে। কিছু আমেরিকান ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাঙালি ছেলেমেয়েরা মিলে কোরাসে গেয়েছে বাংলা গান, ছোট ছোট স্ক্রিপ্ট, আবৃত্তি এবং চমৎকার মিশ্র নাচ।

আমার জন্য নির্ধারিত ছিল উদ্‌বোধন করা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ। কিন্তু কবিতা পাঠ ছাড়া কি কোনও বাংলা অনুষ্ঠান হতে পারে। শেষ দিনে আমাকে পড়তে হল অনেকগুলি কবিতা।

নূপুর থাকে নিউ জার্সির প্রিন্সটন শহরে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত। আইনস্টাইন শেষের অনেকগুলি বছর এখানেই যুক্ত ছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি হলে অনুষ্ঠান।

দুপুর থেকেই বইছিল ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া। বিকেলের দিকে শুরু হল ঝিরঝিরি তুষারপাত। বাড়ির জানলায় বসে প্রথম দিনের এই তুষারপাত দেখতে বেশ ভালোই লাগে, গাছের ডালাপালায় জুঁই ফুলের মতন জমতে থাকে শ্বেত বিন্দু, কিন্তু এসময় নেহাত প্রয়োজন ছাড়া বেরুতে ইচ্ছে করে না। তাহলে আজ অনুষ্ঠান দেখতে শুনতে ক'জন আসবে?

গুটি-গুটি আসতে লাগল কিছু মানুষ। এসব দেশে বৃষ্টির মতন তুষারপাতের সময় ছাতা মাথায় কেউ রাস্তা দিয়ে আসে না, সকলেই আসে গাড়িতে। গাড়ি জমতে লাগল ক্রমে ক্রমে। শেষ পর্যন্ত হল পুরোপুরি ভরতি হল না বটে, কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি আসন পূর্ণ হল। তার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনীর সংখ্যাও কম নয়।

বলাই বাহুল্য, আমার কবিতা পাঠ সবচেয়ে শেষে। অন্যান্য অনুষ্ঠান ছাড়াও কাছাকাছি আরও কয়েকজনের কবিতা পাঠও ছিল। দু-একবার সিগারেট টানার জন্য আমাকে বাইরে আসতেই হয়। বাইরে হু-হু হাওয়ায় শীতে একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দেয়।

একবার ধ্রুব কুণ্ডু কাছে এসে বলল, সুনীলদা, এত ঠান্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে কবিতা পড়বেন

কী করে? গা-গরম করা দরকার। আসুন আমার সঙ্গে।

গাড়ি খানিকটা দূরে রাখতে হয়। দৌড়ে গেলাম সেদিকে। গাড়ির মধ্যে উঠে বসলে আর শীত লাগে না। ধ্রুবর গাড়িতে অতি উৎকৃষ্ট স্কচ এবং ব্র্যান্ডির ব্যবস্থা থাকে।

ধ্রুব বলল, বাকি যারা আসেনি, তাদেরও সবার হয়ে আপনাকে পড়তে হবে। ভালো করে চাঙ্গা হয়ে নিন।

কয়েক চুমুকেই শরীর বেশ তপ্ত হয়ে গেল এবং পাঠের সময় গলা একেবারে পরিষ্কার।

বেশ কয়েকটা কবিতা পড়েছিলাম। একজন কারুর অনুরোধে একেবারে শেষকালে পড়তে হল, 'নীরা হারিয়ে যেও না', খানিকটা দীর্ঘ কবিতা, তাই সেটা পড়তে আমার সংকোচ হচ্ছিল, তবু পড়তেই হল।

তারপরেই সাঙ্গ হল সভা।

বেরিয়ে আসছি, ভবানী মুখোপাধ্যায়, যে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, আবার ভালো গান গায়, সে বলল, সুনীলদা, নীরার শেষ কবিতাটার শেষ লাইনে যে 'অমৃত খুকি' লিখেছেন, ওইটার জন্যই কবিতাটা...

কবিতা পাঠের শেষে কোনও কোনও জায়গায় কোনও একজনের এরকম একটা উক্তি বহুকাল মনে থাকে।

যে কবিসম্মেলনে মঞ্চে ওঠাই হল না

বেলজিয়ামে লিয়েজ নামে একটি বেশ ছোট্ট শহর আছে। এই শহরের তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, একসময় ছিল কয়লাখনির শহর, এখন আর কয়লা তোলা হয় না, সেই খনিকেই সুন্দর করে সাজিয়েগুছিয়ে দ্রষ্টব্য স্থান করে রাখা হয়েছে।

আর যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খুঁটিনাটি ইতিহাস জানে, তাদের মনে পড়বে এই লিয়েজ শহরে সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল, তা নিয়ে কয়েকটা ফিলমও তোলা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য সে-যুদ্ধের সামান্য চিহ্নও নেই, কোনও ধ্বংসের স্মৃতিও নেই, পুরো শহরটাই রূপকথার ছবির মতন। বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এইসব ছোট ছোট দেশ, পুরো জনসংখ্যা আমাদের একটা শহরের চেয়েও কম। যেমন, গোটা নরওয়ের লোকসংখ্যা শুধু উত্তর কলকাতার সমান। কিন্তু এরা প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি রাস্তা খুব চমৎকার করে সাজিয়ে রাখে। এদের মতন সৌন্দর্যবোধ আমাদের নেই, কিংবা রুচি থাকলেও জনসংখ্যার চাপে সামর্থ্য নেই।

লিয়েজের মতন একটা ছোট শহরেও প্রতি দু-বছর অন্তর এক বিরাট আকারের কবিসম্মেলন হয়। এরা বলে বিশ্ব কবিসম্মেলন, কিন্তু পশ্চিমি বিশ্বের কবিরাই গরিষ্ঠসংখ্যক প্রতিনিধি।

একবার ভারত থেকে শুধু আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার অবশ্য একটা কারণ আছে।

এর আগেই একজন বেলজিয়ান কবির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল কলকাতায়। তার নাম ভ্যারনাম ল্যামবারসি। সে এসেছিল ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এদেশ সফরে। আই সি সি আর-এর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস) লোকেরা তাকে নিয়ে এসেছিল আমার বাড়িতে।

এরকম তো মাঝে-মাঝেই কিছু গণমান্য লোক আসে, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ শুকনো ভদ্রতার কথা হয়, তারপর তাদের নামও ভুলে যাই।

ভ্যারনার ল্যামবারসির ক্ষেত্রেও হয়তো সেইরকমই হত। কিন্তু সে ফিরে গিয়ে একটা চিঠি লিখল। সেই সঙ্গে আমার বাড়ির কয়েকটি ছবি। আমার চিঠি লেখার ব্যাপারে আলস্য আছে। তবু ভদ্রতা করে তাকে আমি একটা উত্তর দিয়েছিলাম। কিছুদিন পর সে আবার একটা চিঠিতে জানাল যে সে নতুন বিয়ে করেছে (দ্বিতীয় বিয়ে) এবং নবোঢ়া পত্নীকে নিয়ে হনিমুন করতে চায় ভারতে এসে, তা-ও আর কোনও শহরে নয়, কলকাতায়। সে কোনও হোটেলেও থাকতে চায় না, আতিথ্য নিতে চায় কোনও বাঙালির বাড়িতে। আমার বাড়িতে কি সে আসতে পারে?

চিঠিটা পেয়ে প্রথমে বেশ বিব্রত বোধ করেছিলাম। এমনি অতিথি আর সাহেব-মেম অতিথিতে যে অনেক তফাত। আমরা ডাল-ভাত মাছের ঝোল খাই, তা তো ওদের রুচবে না। ওরা কী খায়, তা জানি, কারণ আমি অনেকদিন সাহেবদের দেশে কাটিয়ে এসেছি। কিন্তু মুশকিল হল ওরা যেমন পাউরুটি খায়, এদেশে তেমন পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের লম্বা-লম্বা লাঠির মতন রুটি, যাকে বলে বাগেত্, তা আমাদের দেশে হয় না। আর বুখেজার-এর আকারের ক্রেয়ার্স-ও খুব দুর্লভ। ওদের মতন স্বাদই পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমাদের বাথরুম ওদের পছন্দ হবে কি না কিংবা নববিবাহিত দম্পতির জন্য কুসুমকোমল শয্যাই-বা কোথায় পাব। কিন্তু বাড়ির মধ্যে সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারিণী তো গৃহকর্ত্রী! আপত্তি করল না। বলল, আসতে চায় আসুক, বাঙালি বাড়িতে কী সুবিধে-অসুবিধে তা-ও বুঝে দেখুক।

যথাসময়ে এল দুজন। থেকে গেল সপ্তাহখানেক। এরকম আশ্চর্য অতিথি অতি দুর্লভ। কোনও ব্যাপারেই অভিযোগ নেই, কখনও মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফোটে না, আমাদের সঙ্গে বসে ডাল-ভাত-মুরগির ঝোল সোনা মুখ করে খেয়ে নেয় আর সব কিছুরই প্রশংসা করে। আমি একদিন মাত্র ওদের নিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গাসাগরের কাছে হারউড পয়েন্ট দেখাতে, বাকি দিনগুলি এরা নিজেরাই কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় চষে বেরিয়েছে। নিমতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে কাটিয়েছে পুরো একটি বেলা।

প্যাট্রিসিয়া, নববধূটি ভারী মিষ্টি চেহারার এক তরুণী, কথা বলে খুব কম, সবসময় ঠোঁটে লেগে আছে হাসি। এমন লাজুক মেমসাহেবও কদাচিৎ দেখা যায়। ভ্যারনারের চেহারাও বিশেষ দর্শনীয়, তার মাথার সব চুল ও মুখভরতি দাড়ি একেবারে সাদা অথচ সে মোটেই বৃদ্ধ নয়। সুগঠিত চেহারার যুবক। কবিতা লেখা ছাড়া আর তার দুটি শখ হচ্ছে, তলোয়ার খেলা ও রান্না করা। পরে প্যারিসে আমি তার হাতের রান্না খেয়েছি। রেড ওয়াইন দিয়ে ছোট ছোট পাখির মাংসের রান্নার স্বাদ কখনও ভোলা যাবে না।

কবি হিসেবে সে এক হিসেবে সারা বিশ্বে অনন্য। সে প্রতিজ্ঞা করছে, জীবনে কখনও এক লাইনও গদ্য লিখবে না, গল্প-উপন্যাস তো দূরের কথা। ভ্রমণকাহিনি বা গ্রন্থ সমালোচনাও না (শুধু চিঠিপত্র ছাড়া)। কবিতাও লেখে সে খুব কম, এবং খুবই দুর্বোধ্য তার কবিতা। তার একটি ছোট কাব্যগ্রন্থ আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি যুগ্মভাবে অকাল প্রয়াত মঞ্জুষ দাশগুপ্তর সঙ্গে, সে কিছুটা ফরাসি ভাষা জানত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত সেই বইটির নাম, 'এখনও হৃদয় গর্জমান'। এমনই কঠিন কবিতা যে অনুবাদ করতে আমরা হিমশিম খেয়ে গেছি।

ভ্যারনার আমারও একটি কবিতার বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেছে ফরাসি ভাষায়। আমাদের এখানকার ফরাসিবিদ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় একসময় প্যারিসে ছিল, তার সহায়তায়।

ভ্যারনার জাতে বেলজিয়ান, থাকে ফরাসি দেশে, লেখে ফরাসি ভাষায়, সে মূল ফরাসি সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়ার স্বীকৃতি চায়। ফরাসিরা এ স্বীকৃতি সহজে দিতে চায় না।

এই ভ্যারনারই আমার নাম সুপারিশ করেছিল লিয়েজ-এর কবিসম্মেলন উদ্যোক্তাদের কাছে। প্রথমে আমি গেলাম লন্ডনে, সেখানে থাকত আমার বাল্যবন্ধু ভাস্কর দত্ত। ইউরোপের যে-

কোনও দেশে গেলেই ভাস্করের সঙ্গে একবার আমাকে দেখা করতে হবেই। লন্ডনে গিয়ে ভাস্করকে জিগ্যেস করলাম, কী রে, আমার সঙ্গে বেলজিয়াম যাবি নাকি?

ওদেশে চাকরি কিংবা কাজ থেকে ছুটি পাওয়া সহজ নয়। অনেক আগে থেকে ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের মতন, আজ আকাশটা চমৎকার মেঘলা আজ আর অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া ওদেশে সম্ভব নয়। কিন্তু ভাস্কর বরাবরই সব ব্যাপারে ব্যতিক্রম। আমরা যখন-তখন লন্ডনে ওর বাড়িতে উপস্থিত হলে, ভাস্কর কোনও সকালে সুট-টাই পরে তৈরি হয়েও বলে ফেলে, দূর, আজ আর যাব না। গুলি মারো অফিস। আজ সারাদিন আড্ডা হবে!

ভাস্কর রাজি হয়ে গিয়ে প্লেনের টিকিট কাটার উদ্যোগ নিল।

কিন্তু ওখানে ভাস্কর থাকবে কোথায়? অন্য হোটেলে থাকলে তো আড্ডা জমবে না!

আমি ওর বাড়ি থেকেই ফোন করলাম লিয়েজ সম্মেলনের সম্পাদককে। জিগ্যেস করলাম, তোমরা কি আমাকে ডাবল বেডরুমের ঘরে থাকতে দেবে? তাহলে আমি আমার এক বন্ধুকে কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

লোকটি হাসতে-হাসতে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাবল বেডরুমেরই ব্যবস্থা করব। তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে আনতে চাইতে আমরা আপত্তি করতাম না। আর তুমি যদি হোমোসেকসুয়াল হও, আর তোমার পুরুষ সঙ্গীকে আনতে চাও, তাতেও আমাদের আপত্তি নেই!

এটা রসিকতা। তবে, ওদেশে যদি দুজন পুরুষ এক খাটে রাত্রি কাটায়, তাহলে ধরেই নেওয়া হবে, তারা সমকামী। প্রকাশ্য রাস্তায় কোনও পুরুষ যদি তার বন্ধুর কাঁধে হাত রাখে, সেটাও সমকামিতার চিহ্ন।

লিয়েজে পৌঁছে দেখলাম, প্রায় দেড়শোর মতন পুরুষ-নারী কবি উপস্থিত, তাদের প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ, আমাদের মতন কালো বা খয়েরি রঙের ছাত্র ছ-সাতজন। কিন্তু কবিদের গায়ের রঙের তফাতে কী আসে যায়! কিন্তু ভাষার তফাত হয়ে গেলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় অনেকখানি।

বেলজিয়ামে দুটি সরকারি ভাষা, ফ্রেঞ্চ আর ফ্লেমিশ। তার মধ্যে ফরাসি ভাষাভাষীরই বেশি প্রাধান্য। এই সম্মেলনে যত কবিদের আহ্বান করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখে। কানাডার ফরাসিভাষী অঞ্চল থেকেই কবিরা এসেছে, ইংরেজি ভাষার কবিরা আসেনি। ফরাসিরা যথেষ্ট স্নব, তারা ইংরেজি জানলেও প্রকাশ্যে কিছুতেই ইংরেজিতে কথা বলবে না। অনেকে সত্যিই ইংরেজি জানে না।

এখানে ঘোষণাটোসনাও হচ্ছে প্রায় সবই ফরাসি ভাষায়। আমরা হাবার মতন কিছু না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি।

ক্রমশ ফরাসি ও ইংরেজিভাষীদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি ভাগ হয়ে গেল। আমাদের দলটি খুবই সংখ্যালঘু। কিন্তু তাদের মধ্যে আমি পেয়ে গেলাম আমার কয়েকজন পূর্ব-পরিচিত বন্ধুবান্ধবীকে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিল আয়ওয়া শহরে। কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে অন্য কবিসম্মেলনে। যেমন পোলান্ডের ক্রিস্তফ, হাঙ্গেরির আনা, নরওয়ের ক্রিস্টিন। ইন্দোনেশিয়া ও জাপানের দুজন কবিও ইংরেজি জানে। ইন্দোনেশিয়ার কবিটির আবার এক জার্মান বান্ধবী এসেছে, সে-ও ইংরেজি জানে।

এরপর চলল, আমাদের দলটির অফুরন্ত আড্ডা ও খাওয়া-দাওয়া।

খাওয়াদাওয়ার বেশি বর্ণনা দিয়ে পাঠকদের জিভে জল আনতে চাই না। সকালে, দুপুরে ও রাত্রে, তিনবেলাই বুফে পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ-তিরিশ পদের অতি সুখাদ্য সাজানো থাকে। যার যত ইচ্ছে খাও। বেলজিয়ামের আইসক্রিম ও চকোলেট বিশ্ববিখ্যাত, অনেক বড়-বড় দোকানে শুধুই তিরিশ-চল্লিশ রকমের আইসক্রিম ও চকোলেট কেক বিক্রি হয়। আর এখানকার বিখ্যাত রাক্স নামের কড়া মদ। আর লাল-সাদা ওয়াইন তো আছেই। কোনও ব্যাপারেই উদ্যোক্তাদের কার্পণ্য নেই। আতিথেয়তার সব খরচ দিচ্ছে এই শহরের পৌরসভা।

ইংরেজি দলটির আড্ডা প্রায় সবসময়েই জমে ওঠে আমাদের ঘরে। তার একটি কারণ, ভাস্করের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। ভাস্কর যেখানেই যায়, আড্ডার কেন্দ্রমণি হয়ে পড়ে। ইয়ার্কি-ঠাট্টায় তার জুড়ি নেই।

দু-একজন আমাকে চুপি-চুপি ভাস্করের পরিচয় জিগ্যেস করেছিল। আমন্ত্রিত কবিদের তালিকায় তার নাম নেই। তবে সে কে? আমি বলেছিলাম, ও কবিতা লেখে না, কিন্তু কবিতার মস্ত বড় সমঝদার, আর খুব নামকরা সমালোচক। শুধু আড্ডার লোভে একজন নিজের কাজকর্ম ছেড়ে চলে এসেছে, এটা ওদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

আমাদের আড্ডার আর-একটি আকর্ষণ, হাঙ্গেরির আনা। এর মধ্যে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে যে এখানে সে-ই সবচেয়ে রূপসি। ভারী সরল আর স্নিগ্ধ তার ব্যবহার। সে বিয়ে করেছে, তার থেকে দ্বিগুণ বয়েসি এক কবিকে, সে নিজেও কবিতা লেখে। তাকে দেখেও এই আড্ডায় অনেকে আসে।

আড্ডার বিবরণ তো লিখে বোঝানো যায় না। এই আড্ডা থেকেই অনেক কবির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়। ছোট-ছোট কথাতেই বোঝা যায় তাদের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

মূল কবিসম্মেলন কীরকম?

সকাল, দুপুর ও সন্ধে পর্যন্ত একই প্রেক্ষাগারে কবিতা পাঠ। টানা তিন দিন। প্রথম দিন দুটি পর্যায়ের কবিতা পাঠ শুনতে গিয়ে বিরক্তি ধরে গেল। গোড়ার দিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শুধু ফরাসি ভাষায় কবিদের, একেবারে শেষে কয়েকজন কবি রীতিমতন ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। ইংরেজি ভাষার কবিদের তাহলে ডাকা হয়েছে কেন?

ব্যাপারস্যাপার দেখে শুনে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, মঞ্চে আর উঠবই না। এরকম ফাঁকা হলে কবিতা পড়া, না-পড়া সমান। দ্বিতীয়দিন একজন কর্মকর্তা আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কোন অধিবেশনে পড়তে চাও? আমি অম্লানবদনে বলে দিলাম, আমার তো পড়া হয়ে গেছে। তিনি খুশিমনে বললেন, ও!

চমৎকার শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখে, খানাপিনা ও আড্ডার সময় নতুন-নতুন বন্ধু সংগ্রহ করেই আমার এবারের যাত্রা সার্থক হল।

তা-বলে কবিতা পড়া কি হয়নি?

প্রতি রাতেই, আমার ঘরের আড্ডায়, শেষের দিকে ভাস্করের তাড়নায় প্রত্যেককেই একটি-দুটি কবিতা পড়তে হয়েছে। শ্রোতার সংখ্যা কম, কিন্তু আন্তরিকতা একশো ভাগ। রাত্রি একটা-দেড়টা বেজে যায়, তবু কবিতা পড়া থামে না।

সেখানে আরও একটি চমৎকার ব্যাপার হয়েছিল।

একজন কেউ কোনও এক বিখ্যাত কবির একটি কবিতা পাঠ করে শোনাবে। অন্যরা সে কবিতার নিজস্ব ব্যাখা করবে। একই কবিতার চার-পাঁচরকম ব্যাখ্যাও পাওয়া গিয়েছিল। এই খেলাটা জমেছিল খুব।

আমি পড়েছিলাম অ্যালেন গিন্‌সবার্গের এই কবিতা :

Because I ley my
head on pillows,
Because I weep in the
tombed studio
Because my heart
sinks below my navel
Because I have an old airy belly

ed with soft
sighing, and
remembered breast
Sobs—or
a hands touch makes
tender—
Because I get scared
Because I raise my
voice singing to
my beloved self—
Because I do loved thee
my darling, my
other, my living
bride.....

কোনও এক দেশে কবিরা প্রায় বিলুপ্ত প্রজাতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে দুদিন ব্যাপী যে বিশাল কবিসম্মেলন হয়েছিল, তার স্মৃতি ধরে রাখার মতন খুব বেশি মানুষ এখন বেঁচে নেই। সিনেট হল নামে সেই অপূর্ব স্থাপত্যটিকেও জলজ্যান্ত অবস্থায় খুন করা হয়েছিল কিছু মূঢ়দের পরিকল্পনায়। সিনেট হলের সেই নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার ধারাবাহিক ফোটোগ্রাফ তুলে রেখেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী, তা নিয়ে একটা পাতলা বইও প্রকাশিত হয়েছিল, সেই বইটিও এখন পাওয়া যায় না কিংবা অতি দুর্লভ।

অবশ্য সিনেট হলের কবিসম্মেলনের বর্ণনা কেউ-কেউ লিখে গেছেন আত্মচরিতে, যেখানে মৃত্যুর আগে জীবনানন্দ দাশ শেষবার পড়েছিলেন অনেকগুলি কবিতা। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছিলেন তার টাটকা বিবরণ।

ভারতবর্ষের মধ্যে আমার দেখা সবচেয়ে বড় এবং স্মরণীয় কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল নগরের ভারত ভবনে।

আগে ভারত ভবন বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

সংস্কৃতির দিক থেকে মধ্যপ্রদেশের তেমন কিছু খ্যাতি নেই। এই রাজ্যটিতে পাঁচমিশেলি মানুষদের সমাবেশ। একসময় ছিল ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং বলাই বাহুল্য, তারা খুবই গরিব, শোষিত এবং অবহেলিত। স্বাধীনতার পর ভারতের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষিত লোকজন মধ্যপ্রদেশে গিয়ে জড়ো হয়েছে। তাদেরই হাতে ক্ষমতা। হিন্দিভাষীদেরই প্রতাপ বেশি, কিন্তু পাঞ্জাব, কেরালা, এমনকি বাংলা মুলুক থেকেও অনেকে গিয়ে সেখানে বসতি গেড়েছে। টাকার খেলা আর ক্ষমতা নিয়ে ছিনিমিনিই সেখানে বেশি চলে।

এ-হেন মধ্যপ্রদেশে গড়ে উঠেছিল বিস্ময়কর এক ভারত ভবন, যার তুলনীয় কিছু ভূ-ভারতে

আর কোথাও নেই। একটি মস্ত বড়ো হ্রদের তীরে অপূর্ব সেই নির্মাণ, ভোপাল শহর থেকে একটু বাইরে, অথচ শহরের সুযোগ-সুবিধা সবই আছে। এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটিতে বলা যায় পূর্ণাঙ্গ শিল্পের সবক'টি শাখারই চর্চা এবং প্রসারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা, সংগীত, নাটক ইত্যাদির আলাদা বিভাগ। বিভিন্ন বিষয়ে সারাদেশের সেরা বিদগ্ধজন এবং শিল্পীরা সেখানে অনুজদের জন্য শ্রম দিতে আসতেন বিনা পয়সায় নয়, যথেষ্ট ভালো পারিতোষিক পেতেন। তাঁদের থাকারও সুবন্দোবস্ত ছিল।

এই ভারত ভবন স্থাপনের সিংহভাগ কৃতিত্ব পেতে পারেন অশোক বাজপেয়ী। ইনি হিন্দিভাষী কবি এবং একজন রাজপুরুষ, আই. এ. এস., তখন মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি দফতরের সচিব। শোনা যায়, একবার রাজ্যের বাজেট তৈরি করার সময় অশোক বাজপেয়ী মুখ্যমন্ত্রীকে (তখন অর্জুন সিংহ) অনুনয়-বিনয় করে বলেছিল, স্যার, রাজ্যের কালচারের জন্য এক পারসেন্ট দিতে পারেন না? মাত্র এক পারসেন্ট? অর্জুন সিংহ নাকি মাত্র এক পারসেন্ট শুনে অবহেলার সঙ্গে বলেছিলেন, ঠিক হ্যায়, লে লেও।

শুনতে শতকরা একভাগ অতি সামান্য মনে হলেও রাজ্যের বাজেটে তো তা অনেক টাকা। ধরা যাক, রাজ্যের বার্ষিক বাজেট যদি হয় তিন হাজার কোটি টাকা, তার এক পারসেন্ট তো তিরিশ কোটি টাকা। সেই যাটের দশকে তিরিশ কোটি টাকা দিয়ে প্রায় তাজমহল বানিয়ে ফেলা যেত।

হয়তো এটা গল্পই, ব্যাপারটা অত সহজ নয়, তবু অশোক বাজপেয়ীর কিছু একটা কেরামতি ছিলই এবং টাকার অঙ্কটা অত বেশি নয়।

অশোক আমাদের বন্ধুমানুষ। একসময় ভারত ভবনের পরিচালনা কমিটিতে সে আমাদের কয়েকজনকেও যুক্ত করে নিয়েছিল। তার দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করতেই হয়। কোনওকিছু গড়ে তোলার ব্যাপারে তার উদ্দীপনা অসাধারণ, এত বড় কর্মযজ্ঞটি সে সামলেছে হাসিমুখে। আর দ্বিতীয় গুণটি হল, হিন্দি ভাষার লেখক হলেও সে খাঁটি অর্থে ভারতীয়, এই ভারত ভবনটিকে সে পুরোপুরি সর্বভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ হিন্দিভাষী রাজ্য, এখানে উগ্র হিন্দিবাদী লোকের অভাব নেই। কিন্তু অশোক সবক'টি স্বীকৃত ভারতীয় ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছে। সব ভাষার লেখক ও শিল্পীদের সে নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেছে ভোপালে, উঁচু ক্লাসের ট্রেন ভাড়া, প্রয়োজনে প্লেন ভাড়াও দিয়েছে, আতিথ্যে কোনও কার্পণ্য করেনি। ভারতের কোন ভাষায় কোন কবি নতুন কিছু লিখছে, তার ঠিকঠাক খোঁজ রাখত অশোক। এই উদারতাই অশোকের কাল হল শেষপর্যন্ত। তাকে বদলি করে দেওয়া হয় দিল্লিতে। একবার মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় হিন্দিওয়ালারা ভারত ভবন দখল করে নেয়। এখন সেটি গোল্লায় গেছে শুনেছি।

ভারতের তিন-চারটি ভাষা নিয়ে কবিসম্মেলন হত মাঝে-মাঝে। তারপর বছরে একবার সর্বভারতীয় কবিসম্মেলন। একবার সে ব্যবস্থা করল সর্বএশিয়া কবিসম্মেলনের। সেবারের সম্মেলনের সার্থকতা দেখে অশোকের মনে এল আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এক রাত্তিরে হোটেলের ঘরে আড্ডা দিতে দিতে অশোক বলল, এবারে একটা বিশ্ব কবিসম্মেলন করলে কেমন হয় বলো তো? আমাদের দেশে এরকম কখনও হয়নি।

আমরা বললাম সত্যি-সত্যি বিশ্ব কবিসম্মেলন তো অনেক খরচের ব্যাপার। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে কবিদের আনাতে পারবে?

অশোক বলল, সেব্যবস্থা হয়ে যাবে। এয়ার ইন্ডিয়াকে বলব কিছু টিকিট স্পনসর করতে, কিছু টাকা আমরা দেব, হোটেলগুলোকেও বলব স্পনসর করতে, সাহেবদের জন্য এ-সুযোগ দিতে অনেকেই রাজি হবে।

সে তক্ষুনি বসে গেল কবিদের নামের তালিকা তৈরি করে ফেলতে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল খ্যাতিমান যে-কবির দুর্বলতা আছে ভারত সম্পর্কে, তারই সাহায্য

নিতে হবে আগে। অশোক আমাকে বলল, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ তো তোমার বন্ধু, তুমি তাকে ফোন করো এখান থেকেই।

কয়েকবারের চেষ্টায় পাওয়া গেল অ্যালেনকে। সে তো পরিকল্পনা শুনে খুব খুশি। সে বলল, সে এবারে এসে মাস দু-এক থাকবে। শুধু কবিতা পড়ে চলে যাবে না।

পৃথিবীর প্রধান ভাষায় বিশিষ্ট কবিদের কাছে সে ব্যক্তিগত অনুরোধের চিঠিও পাঠাবে। আমাদের দেবে সেই চিঠির প্রতিলিপি।

তখনও কম্পিউটার আর ই-মেলের যুগ আসেনি। চিঠিপত্র ডাকেই আসে। অ্যালেনের অনেক চিঠি এসেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে নিজে আসতে পারেনি, সেই সময় হঠাৎ তার আলসারের ব্যথা শুরু হয়েছিল।

তবে এসেছিলেন অনেক একনামে চিনে ফেলার মতন কবি। মাথাভরতি সাদা চুল নিয়ে স্টিফেন স্পেন্ডার, সিলভিয়া প্লাথের প্রাক্তন স্বামী এবং পোয়েট লরিয়েট টম হিউজেস। নিকানোর পারা। বিখ্যাতদের মধ্যে আরও কে কে ছিলেন, আমি সব নাম মনে করতে পারছি না। শুধু রাশিয়ার, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, সাড়াজাগানো কবি ভজনেসেনস্কি আসতে পারেননি, ভিসার কিছু গণ্ডগোলের জন্য, সেজন্য তাঁর আপশোশের শেষ ছিল না, পরে যুগোস্লাভিয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তিনি আমার কাছে একথা উল্লেখ করেছিলেন।

নাম বিশ্ব কবিসম্মেলন, পৃথিবীর সব দেশ না হলেও বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন প্রায় ষাটজন কবি। এ ছাড়া, ভারতীয় ভাষার কবিরা তো আছেনই। তিন দিনের সম্মেলন, তবু প্রত্যেক কবিকে সুযোগ দেওয়ার সময় সংকট হয়। অধিকাংশ জায়গায় শেষের দিকে অনুরোধ করা হয়, মাত্র একটি কবিতা পড়ুন! সময় ছিল দু-মিনিট। এরই মধ্যে কেউ রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' সাইজের কবিতা পড়তে শুরু করলে প্রায় কেড়ে নেওয়া হত তার হাত থেকে কবিতা। সবাইকে সুযোগ দিতে-দিতে মধ্যরাত্রি এসে যায়। তখন দর্শকদের মধ্যে থাকে শুধু ঘুমজড়ানো চোখের মহিলা, খুব সম্ভবত বাকি কবিদের স্ত্রী।

অশোকের ব্যবস্থাপনায় কোনও ত্রুটি নেই। বিদেশ থেকে আগত প্রত্যেক কবির জন্য আছে একজন ভলান্টিয়ার, যাতে সেইসব অতিথিদের আহার-বিহারের কোনও অসুবিধে না হয়। এবং বিদেশি কবিরা তিন-চারটি করে কবিতা পড়ার সুযোগ পাবেন অন্তত দুদিন। অর্থাৎ শুধু একবার মঞ্চে উঠে কোনওক্রমে একটা বা দুটো কবিতা পড়ে দিলেই সম্পর্ক শেষ না হয়! কিন্তু তাহলে এতগুলি কবিকে সুযোগ দেওয়া হবে কী করে? আট-দশ দিন ধরে তো কবিসম্মেলন চলতে পারে না? (কোনও কোনও দেশে তা-ও চলে, সেকথা পরে)।

অশোক আমাকে প্রস্তুতি কমিটিতে জিগ্যেস করেছিল, কিছু-কিছু ভারতীয় কবিকে বাদ দিতেই হবে। অথচ, যেসব কবিদের বাদ দেওয়া যায়, তারা প্রত্যেকেই চটে যাবেন। এটাই কবিদের ধর্ম। কী করা যায় বলো তো? যেমন ধরো, বাংলা থেকে সুভাষদা, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি, তুমি, এঁদের কারুকেই বাদ দেওয়া যায় না, অথচ বাংলা থেকে চারজনকে নিলে অন্য ভাষার কবিরাও বলবে...

আমি বলেছিলাম, আমাকে বাদ দাও। শক্তিকেও না-পড়তে রাজি করাতে পারি। অন্য ভাষাতেও...

শেষ পর্যন্ত একটা চমৎকার ফরমুলা বার করা গেল।

সব ভারতীয় ভাষারই প্রধান কবিদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁদের দেওয়া হবে যাতায়াত ভাড়া, থাকবে হোটেলের ব্যবস্থা, বিদেশি অতিথিদের মতনই তাঁদেরই সমান মর্যাদা, কিন্তু তাঁরা মঞ্চে কবিতা পড়বেন না। বিদেশি কবিদের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডা দেবেন। যেখানে কবিতা পাঠও হতে পারে। যতদূর মনে পড়ে, এই ব্যবস্থায় কেউই আপত্তি করেননি।

কবিসম্মেলনে কে কীরকম কবিতা পাঠ করেছিলেন, সে বর্ণনা একটু বোরিং হতে বাধ্য।

কবিদের আড্ডাই আসলে এইসব কবিসম্মেলনের প্রধান পাওয়া।

ফিনল্যান্ডের এক কবি আমাকে একটি চমকপ্রদ কথা বলেছিলেন।

একমাত্র তাঁকেই যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণপত্র পেয়েই তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি পৃথিবীর যেখানে খুশি যেতে পারেন, ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তাঁর দেশের সরকার বিমানভাড়া দিয়ে দেন।

দীর্ঘকায়, সুপুরুষ সেই কবিটি আমাকে জানিয়েছিলেন, কবিতা লেখেন বলে তাঁকে আর জীবিকার চিন্তা করতে হয় না। তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, গাড়ি তো থাকবেই, খাওয়া পরার কোনও চিন্তা নেই, ভ্রমণেরও অগাধ সুযোগ।

আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তোমাদের কবিদের বুঝি কবিতার বই খুব বিক্রি হয়?

সে বলেছিল, মাথা খারাপ নাকি? কবিতার বই বেরুলে পঞ্চাশ-একশো কপি কাটে কিনা সন্দেহ। কে কবিতা পড়বে? কারুর দায় পড়েনি।

তাহলে তোমার জীবনযাপনের এত খরচ কে দেয়।

সরকার। সব সরকার দেয়!

কেন, সরকার এত কিছু দেয় কেন?

কারণ। কবিরা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এনডেঞ্জারড্ স্পেসিজ। প্রায় কেউই আর কবিতা লিখতে চান না। কবিতার কথা শুনলে লোকে হাসে। কিন্তু একটা দেশে আর একজনও কবি থাকবে না, এ কি হয়? তাই সরকার আমাদের খুব আদর করে। নেপোলিয়নের কথা শোনোনি? একবার কে যেন নেপোলিয়নকে বলেছিল, ফরাসি দেশে কবির সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে। তাই শুনে নেপোলিয়ন খুব ব্যস্তবাগীশের মতন বললেন, তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে কিছু কবি তৈরি করো।

এরপর খুব হাসিহাসি হল বটে, কিন্তু আমি মনে-মনে ভাবলুম, এই ছেলেটি কলকাতায় গেলেই বুঝতে পারত, বাংলার কবিরা এখনও মোটেই বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বরং উলটোটাই ঠিক।

বাংলাদেশে বারবার

মাদারিপুরের এক গ্রামে জন্ম, কিন্তু বাল্যকালে আমি ঢাকা দেখিনি, এমনকি একবারও পদ্মা নদী পার হইনি।

অবিভক্ত বাংলায় খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া এইসব জেলার মানুষদের সঙ্গে কলকাতা শহরের যোগাযোগই ছিল বেশি। কারণ এদিকে ছিল রেল-যোগাযোগ। আমি প্রথম ঢাকা শহর স্বচক্ষে দেখি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, সেই ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই।

গিয়েছিলাম গাড়িতে, প্রখ্যাত লেখক মনোজ বসু এবং তাঁর দুই ছেলে মনীষী ও ময়ূখ আমাকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন, তখনও রাস্তার অনেক অংশ যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং বেশ কয়েকটি সেতুর মাজা ভাঙা।

প্রথমে উঠেছিলাম কবি জসীমউদ্দীনের বাড়িতে। তিনি মনোজ বসুর বন্ধু ছিলেন, তাঁর মস্ত

বড় বাড়ি, সেখানে তিনি আমাকেও আশ্রয় দিয়ে ধন্য করেছিলেন। অত বড় একজন কবি! আমরা ছাত্র বয়েসে টেক্সট বইতেই যাঁর কবিতা পড়েছি তাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়াই তো বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার, তার ওপর তাঁরই বাড়িতে শয্যা ও আহার গ্রহণ যেন অকল্পনীয়!

প্রথম দিন ঢাকা শহরে বেড়াতে বেরিয়ে রমনার মাঠে এক জায়গায় একটা জমায়েত দেখে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জনতার পেছনে। সেখানে কবিতা পাঠ চলছে, তরুণ কবিরা বিনা মাইক্রোফোনে উচ্চকণ্ঠে কবিতা শোনাচ্ছে। ক্রমে তাদের দু-চার জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল।

অর্থাৎ, স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা কবিতা সংসর্গিত।

এর পরের বছর ঢাকায় যাই একুশে ফেব্রুয়ারির এক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে। তারপর আরও অনেকবার একুশে ফেব্রুয়ারির নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছি ঢাকায়। কিন্তু প্রথমবারের অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়।

যদিও বাংলাভাষার আন্দোলনে শহিদদের প্রাণদানের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি চিহ্নিত এবং এখন রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে দিনটিকে পৃথিবীর সব দেশের মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু ওই দিনটির বাংলা তারিখ আমরা অনেকেই জানি না। এবং বাংলাদেশেও দিনটি উৎসবে-আবেগে পালিত হয় ইংরেজি মতে। অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি রাত বারোটার পর থেকে।

সেবার কোথায় উঠেছিলাম মনে নেই। ওখানকার বন্ধুরা আমাকে ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ঠিক রাত বারোটায় নিয়ে গেল শহিদ বেদিতে মালা দিতে। সে-স্থানটি তখন দিনের আলোর মতন আলোকময়, সাদাশাড়ি পরা অনেক মেয়ে আলপনা দিচ্ছে রাজপথে। কিছুদিন আগেও ঢাকা শহরে মেয়েদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত ছিল, অত রাতে মেয়েদের রাস্তায় বেরুনোর তো প্রশ্নই ছিল না, তখন যেন সব বাঁধ ভেঙে গেছে।

সারারাত ধরে পথে-পথে দেখেছি মিছিল, সেইসব মিছিলে ধ্বনিত হচ্ছে গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি।' আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত এই গানটি যে এত জনপ্রিয় হবে, তা হয়তো তিনি নিজেও ভাবতে পারেননি। ইতিহাসের এমনই নির্মম পরিহাস, এই গানের রচয়িতা একসময় দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, তারপর বহু বছর ধরে তিনি প্রবাসী। বাংলাদেশের সমস্ত উত্থান-পতনের খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে, বহুদূর থেকেও তাঁর মন পড়ে থাকে বাংলাদেশে, কিন্তু আপন দেশে তাঁর ফিরে আসার বোধহয় উপায় নেই।

আগের দিন রাত বারোটা থেকে পরদিন মধ্যরাত পর্যন্ত টানা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলে উৎসব, এবং তার প্রধান উপজীব্য কবিতা ও গান। গরম-গরম বক্তৃতাও কোথাও-কোথাও থাকে বটে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে যায় কবিতা। এত লক্ষ-লক্ষ মানুষ কি কবিতা নিয়ে মেতে থাকতে পারে? নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

মাঝখানের অনেকগুলি বছর পূর্ব বাংলা—তথা পূর্ব পাকিস্তান—তথা বাংলাদেশের কবি ও লেখকবৃন্দের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার লেখক-কবিদের অপরিচয়ের দূরত্ব ছিল অনেকখানি। পশ্চিমবাংলার কিছু-কিছু জনপ্রিয় বই ওদিকে জাল সংস্করণে বিক্রি হত, কিন্তু ওদিককার লেখকদের রচনা পশ্চিমবাংলায় প্রায় পাওয়াই যেত না। হঠাৎ উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ থেকে হঠাৎ যেন সব অবরোধ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল। পশ্চিমাবংলার বহু পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের নানাবিধ রচনা। নতুন বা পুনর্মুদ্রণ। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ওদিক থেকে অনেক লেখক-সাংবাদিক প্রাণ বাঁচিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। তখন ব্যক্তিগত যোগাযোগ হল অনেকের সঙ্গে।

শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদের কিছু-কিছু কবিতা আগেই ছাপা হত ওদিককার পত্র-পত্রিকায়, বিশেষত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' এবং 'কৃত্তিবাস'-এ। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যায় সেই ১৯৫৫ সালে, সম্পাদকীয়তে আমি লিখেছিলাম, এই পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম

উদ্দেশ্য হবে পূর্ববঙ্গীয় কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। দেশভাগ হয়ে গেলেও আমরা সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে চাই না। সেই আদর্শ পুরোপুরি রক্ষা করতে না পারলেও এই পত্রিকায় আমরা কিছু-কিছু পূর্ববঙ্গীয় কবিদের রচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি।

সেই যুদ্ধের বছরে আল মাহমুদ এসেছিলেন কলকাতায়, শামসুর রাহমান আসেননি। কোনওক্রমে ওদিকেই আত্মগোপন করেছিলেন, কবিতা পাঠিয়েছিলেন, যার নাম 'বন্দী শিবির থেকে'। মজার ব্যাপার এই যে, ওখানকার অন্যতম তরুণ কবি বেলাল চৌধুরী কলকাতায় এসে আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন এইসব যুদ্ধের ডামাডোলের অনেক আগে থেকেই। এমনকি '৬৫ সালে যে একটি মূর্খের যুদ্ধ হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে, যখন যে-যাকে পারছে স্পাই বলে দেগে দিচ্ছে, এমনকি পরম শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলিও এই আঁচ পেয়েছিলেন, তখনও কিন্তু বেলাল নিঃশঙ্ক চিত্তে, অম্লানবদনে আমাদের সঙ্গে নানান অভিযানে অংশ নিয়েছে।

একাত্তরে যাঁরা কলকাতায় এসে পড়েন, বেলালের সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। আল মাহমুদ ছাড়াও শহীদ কাদরীকে সেই প্রথম দেখি। আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরী কয়েকদিন থেকেছিল আমার বাড়িতে। আড্ডা জমেছিল তুমুল। পাকিস্তানি আমলে যে কৃত্রিম দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা ঘুচে যেতে মোটেই সময় লাগেনি। যেন নাড়ির টান ছিলই। একই ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে বিভেদ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে বারবার, বহু দেশের ইতিহাসে, সবক'টিই বিফল হয়েছে। তবু তার থেকে শিক্ষা নেয় না স্বৈরতন্ত্রীরা।

কল্লোল যুগে কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতন পশ্চিমবঙ্গীয় লেখকরা আড্ডার টানে প্রায়ই চলে যেতেন ঢাকায়, যেন তাঁরই পুনরাবৃত্ত শুরু হল। তবে সেই আমলে লেখকরা অনেকেই তখন নেই। নজরুলকে জাতীয় কবি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হল ঢাকায়, কিন্তু কোনটা কলকাতা আর কোনটা ঢাকা, তা আলাদা করে চেনবার মতন বোধ আর তার তখন ছিল না। কল্লোল যুগের প্রখ্যাত ত্রয়ী, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার-বুদ্ধদেব কেন জানি না ঢাকায় যাওয়ার জন্য কোনও ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন না। বুদ্ধদেব বসু তাঁর ঢাকার জীবন নিয়ে কত স্মরণীয় লেখা রেখে গেছেন, কিন্তু পাকিস্তানি আমলের পর নতুন ঢাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর কোনও আগ্রহ দেখিনি। হয়তো তাঁর কৈশোর-যৌবনের ছবি তিনি ভাঙতে চাননি। প্রবোধকুমার সান্যাল 'হাসু-বানু' নামের একটি উপন্যাস লিখে ঢাকার অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, তিনিও যাননি বোধহয়। অন্নদাশঙ্কর রায় গিয়েছেন কয়েকবার, তিনি একসময় ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, বাংলাদেশের অনেক প্রবীণ সরকারি অফিসার তাঁকে দেখে স্যার সম্বোধন করে স্যালুট দিতেন, আমি দেখেছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গিয়েছেন কয়েকবার, তরুণতর আমরা যেতাম ঘন-ঘন। ওদিক থেকেও শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ যোগ দিতে আসতেন বিভিন্ন কবিতা পাঠের আসরে। আমাদের সৌমিত্র মিত্র ব্যবস্থাপনায় এইসব কবি শান্তিনিকেতন ও কুচবিহারে গিয়েও কবিতা পাঠ করেছেন। এসময় সৌমিত্রদের আবৃত্তিলোকের এক অনুষ্ঠান চলছিল শিশির মঞ্চে, আমি ছিলাম সেদিন কাব্যপাঠের পরিচালক, পূর্বনির্ধারিত তালিকার বাইরেও একজন কবিকে পাঠ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। সে একজন সদ্য তরুণী, অতি লাজুক এক কবি, তার নাম তসলিমা নাসরিন।

আমাদের এখানকার কবিতা পাঠের আসরগুলির একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে। নির্বাচিত কয়েকজন কবি, বড়জোর আড়াই তিন ঘণ্টার আসর। প্রথমদিকে শ্রোতার সংখ্যা যথেষ্ট হলেও শেষের দিকে কমতে শুরু করে। কিন্তু বাংলাদেশে কবিতা পাঠের আসর অন্য একটি মাত্রা পেতে শুরু করে।

এক-একটি দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেহারা অনুযায়ী কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকও পৃথকভাবে গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেমন কবিতার বিষয়বস্তুতে সমাজ বাস্তবতার প্রতি ঝোঁক প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কিংবা ধর্মীয় জোরজবরদস্তির দেশের কবিতা হয়

প্রতিবাদমূলক। আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট বৈষম্য, তাই এখানকার কবিতায় কোনও-না-কোনওভাবে তার প্রতিফলন ঘটেই। আবার সেইসঙ্গে ভাষার সূক্ষ্মতার সাধনাও চলতে থাকে নিরন্তরভাবে। প্রেমের কবিতাও কবিরা কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের কিছু পর থেকেই নানারকম রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, পরবর্তীকালেও সরকার বদলের ব্যাপারে ছাত্ররা বারবার উত্তাল হয়েছে, অনেক নেতাকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে। কবিরাও, বারবার নিয়েছেন সক্রিয় ভূমিকা। মঞ্চ থেকে কবিদের কণ্ঠ থেকে সমবেতভাবে ধ্বনিত হয়েছে যে প্রতিবাদের ধ্বনি, তার শক্তি কোনও সরকারপক্ষই উপেক্ষা করতে পারেনি। জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন করে বাংলাদেশে যে কবিসম্মেলনের আয়োজন হয় প্রতি বৎসর তা অনেকটাই বিরোধী আন্দোলনের মতন, তার পরিসরও বিশাল।

সেরকম কবিসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে আমি প্রতিবারই বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। এত কবি? এমন হাজার-হাজার শ্রোতা? কোনও হলের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিশাল প্যান্ডেল বাঁধা হয় রাজপথের ধারে। মঞ্চ এতবড় যে, তাতে অনায়াসেই বসতে পারে একসঙ্গে তিরিশ-চল্লিশজন। মঞ্চ থেকে প্যান্ডেলের শেষ পর্যন্ত যেন দেখাই যায় না।

সারা দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা ধরে কবিতা পাঠ, তবু শ্রোতার সংখ্যার বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। বিভিন্ন জেলা থেকে কবিরাই আসে না, অনেক শ্রোতাও আসে। আবার পথচলতি মানুষও কবিতা শুনতে দাঁড়িয়ে যায়। আমি একবার দেখেছি একজন সাইকেল রিকশাচালক তার পেশা থামিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা শুনছে। কোনও সওয়ারি এগিয়ে গেলেও সে নিতে চাইছে না। সত্যিই কি তার এতখানি কবিতা প্রীতি? সব কবিতা বুঝছে? রিকশাচালক হলেই যে কবিতা বুঝবে না, তা নয়। হতেও পারে। আবার এমনও হতে পারে, কিছু-কিছু কবিতায় দেশের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ সেটাই তার প্রাণ স্পর্শ করছে!

আমেরিকা কিংবা ইউরোপের অনেক দেশে কোনও কবিতা পাঠের আসরে দুশো-আড়াইশো শ্রোতা পাওয়া গেলেই মনে হয়, তাই যথেষ্ট। পঞ্চাশ-ষাটজন শ্রোতা থাকলেও কবিরা হতাশ হন না। একবার প্যারিসের কবিতা ভবনে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখি, শ্রোতার অভাবে অনুষ্ঠান শুরুই করা যাচ্ছে না। বারো-চোদ্দোজন লোক বসে আছে। সেখানকার পরিচালক খানিকটা লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বললেন, এখন তো মনোরম গ্রীষ্মকাল, অনেকেই বাইরে বেড়াতে চলে যায়। তাই আজ এত কম। অন্য সময় শ'দেড়েক তো আসেই।

একটু পরে তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, তোমাদের দেশে কবিতা শুনতে অনেক লোক আসে, তাই না?

আমি বললাম, আমাদের দেশে এখনও বেশ কিছু লোক কবিতা শোনে ঠিকই। তবে, তুমি একবার ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরে যেও, সেখানকার কবিসম্মেলন দেখলে নিশ্চিত তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

অবশ্য তখনও আমি দক্ষিণ আমেরিকার কলমবিয়ায় যাইনি!

বাংলা বর্জিত বিশ্ব কবিসম্মেলন

সেটা ছিল সত্যিকারের একটি বিশ্ব কবিসম্মেলন। সম্ভবত, ভারতে প্রথম। কিন্তু সেখানে বাংলার কোনও স্থান ছিল না। তার জন্য অবশ্য আমি মোটেই দায়ী নই, যদিও আমি উপস্থিত ছিলাম সেখানে।

১৯৮৯-এ ভোপালে একটি কবিসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেবারের সেই কবিসম্মেলনের নাম ছিল 'অন্তর্ভারতী', ভারতের সংবিধান স্বীকৃত সবকটি ভাষায় কয়েকজন করে কবি আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন, শোনা গিয়েছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিভিন্ন কণ্ঠস্বর।

সেবারই অশোক বাজপেয়ী একদিন কথায়-কথায় বলেছিল, দ্যাখো না, এরপরে এখানে সারা এশিয়া কবিসম্মেলনের ব্যবস্থা করব, তার পরের বছর বিশ্ব কবিসম্মেলন।

তখন ঠিক বিশ্বাস করিনি, মনে হয়েছিল ওটা অশোকের স্বপ্ন। যদিও অশোক ঠিক স্বপ্নবিলাসী ধরনের নয়, কাজের মানুষ, খাটতে পারে প্রচুর এবং সে বড় করে চিন্তা করে। অনেকের জীবনবৃত্তটাই ছোট হয়, এই যুবকটির আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। সত্যিই পরের বছর ভারত ভবনে সারা এশিয়ার কবিসম্মেলন হয়েছিল, এবং তারপরে বিশ্ব কবিসম্মেলনের মতন একটা বিরাট ব্যাপার অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হল।

অশোক বাজপেয়ীকে অনেকদিন ধরে চিনি। প্রথম যেবার দেখা হয়, তখনও ভারত ভবন তার স্বপ্নে ছিল না। সাহিত্য আকাদেমির একটি সেমিনার হয়েছিল, 'সমাজের নীচের তলার মানুষের কবিতা' এই বিষয়ে, মধ্যপ্রদেশ সরকার সাহিত্য আকাদেমিকে ভোপালে জায়গা দিয়েছিল সেই সেমিনারের জন্য। অশোক বাজপেয়ী একজন আই এ এস অফিসার, মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি দফতরের সচিব, সে-ই প্রধান ব্যবস্থাপক। অশোক নিজেও একজন কবি ও প্রাবন্ধিক, হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখে, কিন্তু উদ্যমী পুরুষ হলেও সে কবি হিসেবে লাজুক, তার আয়োজিত কবি সম্মেলনগুলিতে সে নিজের কবিতা কখনও পাঠ করে না, কবি হিসেবে নিজেকে জাহির করার কোনও চেষ্টা কখনও দেখিনি।

কিন্তু সে কবিতা ভালোবাসে, কবিতাপাগল বলা যায়। অন্য কবিদের সে কীভাবে সাহায্য করে, তার একটা উদাহরণ দিই। সব রাজ্য সরকারের মতন মধ্যপ্রদেশ সরকারও প্রতিবছর বই কেনার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে অনেক টাকার অনুদান দেয়। যেহেতু কবিতার বই কম বিক্রি হয়, লাইব্রেরিগুলো তো কিনতেই চায় না, সেইজন্য মধ্যপ্রদেশ সরকার শর্ত করে দিয়েছে যে অনুদানের টাকায় কেনা বইগুলির মধ্যে অন্তত কুড়ি পারসেন্ট কবিতার বই রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, সরকারের কাছে অর্থ আদায় করার আগে প্রকাশকদের প্রমাণ দাখিল করতে হবে যে, তাঁরা কবিদের প্রাপ্য রয়ালটি চুকিয়ে দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের কবিদের এখন প্রকাশক পাওয়ার সমস্যা নেই এবং কবিতা লিখে তাঁরা কিছু টাকাও পান।

ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারেরই একটি সংস্কৃতি দফতর আছে, এবং একজন করে আই এ এস অফিসার তার সেক্রেটারি। কিন্তু আর কোনও রাজ্য সরকারের কালচারাল সেক্রেটারির বিশেষ

কোনও ক্রিয়াকলাপের পরিচয় আমরা পেয়েছি কি? সকলেই চাকরির কর্তব্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের এই সরকারি অফিসারটি ওপর দুটির বিভাগের দায়িত্ব (সংস্কৃতি ও পর্যটন), তারপরেও অন্য অনেককিছু করার জন্য তার অদম্য উৎসাহ। সেই উদ্যম থেকেই ভারত ভবনের প্রতিষ্ঠা।

গল্প শুনেছি, মধ্যপ্রদেশের এই আই এ এস অফিসারটি বছরদশেক আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে বিনীতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, স্যার, এ-রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের মাত্র এক পারসেন্টও কি সংস্কৃতির জন্য খরচ করা যায় না?

রাজনৈতিক নেতারা সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করলে ভোট আদায়ের তো কোনও অসুবিধা নেই। তবু মাত্র এক পারসেন্ট শুনলে মনে হয় সে টাকাটা কিছুই না। দুর্বল মুহূর্তে সেই মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, হাঁ, হাঁ, মিল যায়গা। মধ্যপ্রদেশে বার্ষিক বাজেট কত তা আমি জানি না, ধরা যাক, যদি পাঁচশো কোটি টাকা হয়, তবে তার এক পার্সেন্টি পাঁচ কোটি, সে-ও অনেক টাকা। সেইভাবে ভারত ভবনের শুরু।

এখন ভোপালের বড় হ্রদটির গায়ে ভারত ভবন শিল্প সংস্কৃতির এক বিশাল কেন্দ্র, যে বাড়িটি স্থাপত্যকলার দিক দিয়েও একটা চমৎকার নিদর্শন। এখানে নাট্যচর্চা, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এবং কাব্যসাহিত্য নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান ও ওয়ার্কশপ হয়। এই ভবনটি যখন তৈরি হচ্ছিল, তখন এখানকার চিত্রকলা বিভাগের পরিচালক স্বামীনাথন পরীক্ষামূলকভাবে কুলি-কামিনদের হাতে রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে বলতেন মাঝে-মাঝে। এক আদিবাসী রমণী, মাথায় করে ইঁট বওয়া যার কাজ, তার আঁকা ছবি দেখে বিশেষজ্ঞরা হতবাক। সেই রমণীটি এখন নামকরা শিল্পী।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই কেন্দ্রটির নাম ভোপাল ভবন কিংবা মধ্যপ্রদেশ ভবন নয়, এখানে সারাভারতের শিল্পী-গায়ক-লেখকদের ডেকে আনা হয়। আর কোনও রাজ্যে এমন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আমাদের পশ্চিমবাংলায় সরকার যেমন বাঙালি লেখক-শিল্পীদের প্রতি বছর নানান পুরস্কার দেন, সেইরকম প্রত্যেক রাজ্যেই এখন স্থানীয় লেখক-শিল্পীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। অন্য রাজ্যের লেখক শিল্পীদের কেউই কিছু দেন না। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ সরকার সঙ্গীত, অভিনয়, কবিতার জগতের বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের প্রতিবছর দেড় লক্ষ টাকার এক একটি পুরস্কার দেন, সেই পুরস্কার প্রাপকেরা যে-কোনও রাজ্যের অধিবাসী হতে পারেন। যেমন বাঙালিদের মধ্যে থেকে শম্ভু মিত্র এবং সুভায মুখোপাধ্যায় এই পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা বাঙালিরা প্রাদেশিকতাকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু আমাদের এখানে এরকম কোনও ব্যবস্থা নেই।

ভারত ভবন এখন থেকে মধ্যপ্রদেশের সরকারি সংস্থা নয়। একটি পৃথক ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত, অর্থাৎ মন্ত্রিসভা অদলবদলের ওপর এর ভাগ্য নির্ভর করে না। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই সংস্থা একটি বার্ষিক অনুদান পায়, কখনও-কখনও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও কিছু পাওয়া যায়। যেমন, এই বিশ্ব কবিসম্মেলনের সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর শতবার্ষিকী উৎসব যুক্ত করা হয়েছে। নেহরু কবিতাপ্রেমিক ছিলেন, এই যোগাযোগ অসংগত নয়, সেইজন্য নেহরু শতবার্ষিকী কমিটিও কিছু সাহায্য করেছেন।

যেহেতু এতবড় কর্মকাণ্ডটি চলছে অনেকটাই অশোক বাজপেয়ীর নিরলস উদ্যমে, সেহেতু তাঁর অনেক শত্রু ও নিন্দুক যে থাকবেই, তা বলাই বাহুল্য। পরনিন্দা তো আমাদের ন্যাশনাল পাস্টাইম। যারা নিজেরা কিছু করে না, তারাই অন্য কারুকে কিছু করতে দেখলেই তারস্বরে নিন্দে শুরু করে দেয়। ভারত ভবনের কাজেকর্মে হয়তো কিছু-কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে। আমি ওঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নই, মাঝে-মাঝে অতিথি হয়ে যাই। গিয়ে দেখেছি, এরকম প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে আর একটিও নেই, সারাভারতের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নাটক নিয়ে এখানে যতখানি কাজ হচ্ছে তার সিকি ভাগও কোথাও হয় না। তবু কেউ-কেউ যেন ভারত ভবনটাকে সমূলে উৎপাটিত করে লেকের জলে ফেলে দিতে পারলেই খুশি হন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা অনুপস্থিত ॥

ভোপাল যাওয়ার পথে দিল্লি এয়ারপোর্টে ওড়িশার কবি সৌভাগ্য মিশ্রর সঙ্গে দেখা। সৌভাগ্যের মুখেই শুনলাম, ওঁদের সাতজনের একটি দলকে ভোপাল সম্মেলনে যোগ দিতে পাঠাচ্ছেন ওড়িশা সরকার। ওঁরা সরকারি প্রতিনিধি। পরে জানা গেল, নেহরু শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে এই বিশ্ব কবিসম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারত ভবনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। রাজ্য সরকার গাড়ি ভাড়া দেবেন, ভোপালে আতিথ্যের ভার ভারত ভবনের। ভারতের অনেক রাজ্য থেকেই প্রতিনিধিদল গেছে, অসম থেকে ওড়িশা থেকেও গেছে, পশ্চিমবঙ্গ বাদ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই অনুরোধপত্রের উত্তরই দেননি।

আমাকে অশোক বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য। এর সঙ্গে সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই। গাড়িভাড়া, আতিথ্য ভারত ভবনই দেবে।

সেই বিশ্ব কবিসম্মেলনের সাত দিনের অনুষ্ঠানে বিদেশি কবিদের প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক, সেইজন্যই ভারতীয় কবিদের অংশগ্রহণ সীমিত করতে হয়েছে, সব ভাষার কবিদের রাখা যায়নি, সাত দিনের জন্য মোট সাতজন। তার মধ্যে অবশ্য বাংলার একজন ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আর কয়েকজন এর আগে ভারত ভবনের নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, সুতরাং এবারে শঙ্খ ঘোষকে নির্বাচন করা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শঙ্খ ঘোষ খুবই লাজুক প্রকৃতির এবং নিভৃতচারী ধরনের মানুষ, ইদানীং তাঁকে কোনও কাব্যপাঠের আসরে দেখাই যায় না। ভোপালের সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি প্রথমে সম্মত হয়েছিলেন, অনুষ্ঠানসূচিতে তাঁর নাম উঠে গিয়েছিল কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আর গেলেন না।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও কোনও কবি আসেননি কিংবা আসতে পারেননি। অতএব, এই বিশ্ব কবিসম্মেলনে একটিও বাংলা শব্দ উচ্চারিত হল না।

॥ আমার আকর্ষণ ॥

কবিতা পাঠ্য না শ্রাব্য, এই নিয়ে বির্তক আজও শেষ হয়নি। আমি এর মধ্যে কোনও একটি মতে স্থিরবিশ্বাসী নই; একা-একা ছাপা বই থেকে কবিতা পাঠ করে আমি বেশি আনন্দ পাই তা ঠিক, আবার কখনও-কখনও সঠিক, সুকণ্ঠ আবৃত্তি শুনতেও আমার ভালো লাগে। কবিদের স্বকণ্ঠে শোনা আমার সহ্য হয় না। মানুষের মস্তিষ্ক নাকি খুব ভালো জিনিস পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি নিতে পারে না।

আমার আরও কয়েকটি আকর্ষণ ছিল। বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের কাছাকাছি যাওয়া কিংবা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার ব্যাপারে আমার কিছুটা সংকোচ আছে। এবারে আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে পাঁচ-সাতজন যখন-তখন নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারেন, তাঁদের সঙ্গে আগে থেকে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা করে নেওয়ার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। তবে, ওই তালিকায় আমার কয়েকজন পূর্ব পরিচিত বন্ধুস্থানীয়ও ছিলেন। যেমন অ্যালেন গিন্‌সবার্গের সঙ্গে বহুদিনের চেনা। তিন বছর আগে অ্যালেনের মধ্যস্থতাতেই ভজনেসেনস্কির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যুগোস্লাভিয়ায়, স্বরপিয়া নামে একটা ছোট শহরের এক কাফেতে বসে আড্ডা মারার লোভ ছিল। লেওপোলড সেঙঘরের দুটি কবিতা আমি অনুবাদ করেছিলাম অনেককাল আগে। একজন কালো মানুষের পক্ষে ফরাসি সাহিত্যে স্থান দখল করে নেওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই প্রবীণ কবিকে একবার স্বচক্ষে দেখার বাসনা

ছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! এঁরা কেউই শেষ পর্যন্ত এসে উঠতে পারেননি। অ্যালেন গিন্‌সবার্গ অসুস্থ, ভজনেসেনস্কির বদলে ইয়েফতুশেংকো আসবেন বলেও এলেন না, আর সেগুঘর যে কেন আসতে পারলেন না, তা জানাও গেল না।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেতে-পেতে প্রায় সব কবিই বুড়ো হয়ে যান। এইসব মহাসম্মেলনে বেছে-বেছে সেইসব খ্যাতিমান বৃদ্ধদেরই ডাকা হয়। কিন্তু যোগদানের ইচ্ছে থাকলেও অনেকে গেঁটে বাত কিম্বা বুকের অসুখের জন্য দূর দেশে পাড়ি দিতে ভরসা পান না। ভাস্কো পোপা আসতে পারেননি তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে, বাড়িতে আর দেখাশোনা করার কেউ নেই।

আবার এসেছেনও অনেকে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ বৃদ্ধ। যেমন স্টিফেন স্পেন্ডার, যিনি আশি বছরে পা দিয়েছেন, এসেছেন নিকারাগুয়ার আর্নেস্তো কার্ডিনাল, ফুরফুরে সাদা চুল ও দাড়িতে তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছিল।

উৎসবের শুরুতেই তো সকলে এসে সমবেত হননি, সুতরাং উৎসব চলতে-চলতে প্রতিদিনই বেশ একটা কৌতূহলময় রোমাঞ্চ ছিল, আজ কে-কে এসে পৌঁছবেন, কে আটকে গেছেন সিঙ্গাপুরে কিম্বা ভিয়েনায়, ঠিকমতন ফ্লাইট কানেকশান পাচ্ছেন না, কিংবা কেউ দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে খবর পাঠিয়েছেন, এসে গেছি, এসে গেছি, ভারতের মাটিতে পা দিয়েছি। সকাল-বিকেল এইরকম বুলেটিন শোনা যাচ্ছিল।

আমার আর একটা ইচ্ছে ছিল, নিজেকে যাচাই করা। নিছক শ্রোতা হিসেবে কোনও সভাসমিতি কিম্বা কাব্যপাঠের আসরে যোগদানের অভ্যেস আমার নষ্ট হয়ে গেছে। গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে নানা কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবেই যোগ দিয়েছি। এবারে শুধু শ্রোতা হতে আমার কেমন লাগবে। অংশগ্রহণকারী এবং শ্রোতা যেন দুটো আলাদা শ্রেণি, এবারে শুধু শ্রোতা হয়ে আমি কি কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগব? বিদেশি অতিথিদের কেউ যদি জিগ্যেস করে, তুমিও কবিতা লেখো নাকি? তখন কি আমার বুকটা জ্বালা করে উঠবে? দেখাই যাক না, এই অভিজ্ঞতাটাই-বা কীরকম। মাঝে-মাঝে হঠাৎ কোথাও অপমানিত বোধ করলে শরীরটা চাঙ্গা লাগে। নিজের সঙ্গে অনেকক্ষণ সংলাপ চলে।

অন্যান্য বারের ভারত ভবনের আমন্ত্রণে কবিতা পাঠ করতে এসে জাহানুমা হোটেলে থেকেছি। এবারে ওই হোটেলটি অংশগ্রহণকারী কবিদের জন্য নির্দিষ্ট। সেটাই স্বাভাবিক। আমি উঠেছিলাম একটা মজার হোটেলে, সেটির নাম হোটেল পঞ্চানন, তাতে মাত্র পাঁচখানি ঘর। অবশ্য ব্যবস্থা বেশ ভালোই। আমার রাস্তায় ধারের ধাবায় রাত কাটানোর অভ্যেস আছে, সেই তুলনায় পঞ্চাননকে পাঁচতারা বলা যায়, তা ছাড়া তাদের ডাইনিং রুমটি এই শহরে বেশ জনপ্রিয়। তবু, বন্ধুস্থানীয় প্রখ্যাত হিন্দি কবি রঘুবীর সহায় যখন প্রশ্ন করেন, সুনীলবাবু, আপনি কত নম্বর ঘরে আছেন, আড্ডা দিতে যাব, আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমি জাহানুমা হোটেলে নেই, ওখানে আপনার মতন পারটিসিপেন্টরাই শুধু থাকছেন এবার। কথাটা বলার পরই আমার একটু খটকা লাগল। আমার কণ্ঠস্বর কি একটু উচ্চ হয়ে গিয়েছিল, কিছু কি ক্ষোভ ফুটে উঠেছিল? ছিঃ, আমি এত সাধারণ? কোনও বিশেষ হোটেলে থাকা-না-থাকা নিয়ে কী আসে যায়? ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে করেই তো এতটা কাল কেটে গেল। বিদেশের দারুণ দামি কোনও হোটেল কিংবা ক্যানিং-এর সাত টাকা ভাড়ার হোটেলের মধ্যে তো কখনও কোনও তফাত করিনি। নিজেকে খুব বকে দিলাম কিছুক্ষণ।

আর একদিন মহারাষ্ট্রের অংশগ্রহণকারী কবি অরুণ কোলাতকার বলল, আরে ইয়ার, শঙ্খদা তো আসছেন না, তাঁর বদলে তুমি পড়বে কবিতা নাকি? আমি বললাম, না, না, না, সে প্রশ্নই ওঠে না। চুপ করো, এ কথা আর বোলো না।

চট করে সেখান থেকে সরে গেলাম বটে, কিন্তু মনটাও খচখচ করতে লাগল। নিজের ব্যবহার নিজেই বুঝতে পারছি না। অরুণ কোলাতকারের একটি নিরীহ প্রশ্নের এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া কেন

হল আমার? খুব সহজভাবে হেসে বলা উচিত ছিল, না ভাই, পড়ছি না। কোথাও কবিতা পড়া কিংবা না-পড়াকে আমি এতখানি গুরুত্ব দিই? খেলাচ্ছলে কবিতা লিখি, লেখার মতনই তো কবিতা থেকে দূরে সরেও থাকতে পারি? আমার বন্ধুরা কেউ-কেউ কবিতা পাঠ করছে, সেখানে আমি পড়ছি না, এই নিয়ে ক্ষুব্ধ হয় তো মাঝারি ধরনের লোকেরা। আমি নিজেকে এর থেকে উঁচুতে মনে করতাম, সেটা কি ভুল? নিজের গালে চড় মারলুম গোটা কতক? অন্যের অলক্ষ্যে নিজের পশ্চাতে ক্যাঁত করে লাথিও কষালাম একখানা।

আমার অবশ্য একটু সুবিধে আছে। আমি ইচ্ছে করলেই পরিচয়, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বদল করতে পারি। আমি হয়ে গেলাম সাতাশ বছর বয়েসি নীললোহিত এবং নীললোহিত কবিতা লেখেন না। নীললোহিত অনায়াসেই উৎসুক শ্রোতা এবং ভিড়ের পেছনের দিকে দাঁড়ানো নীরব দর্শক হতে পারে। আমার এই ভূমিকাবদল আমি বেশ উপভোগ করেছি।

ভারত ভবনে অন্যান্য কবিসম্মেলনে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার যেসব প্রতিষ্ঠিত কবিরা আগে অংশগ্রহণ করে গেছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই অশোক বাজপেয়ী এই সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আতিথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে, কিন্তু অতিমাত্রায় আত্মসচেতন সেইসব কবিরা প্রায় কেউই আসেননি। অন্যতম ব্যতিক্রম হিসেবে চোখে পড়ল কেদারনাথ সিংকে, এই নিরহংকার মানুষটি হিন্দিতে উৎকৃষ্ট কবিতা লেখেন। এবং গিয়েছিলেন নবনীতা দেবসেনও, নবনীতা অবশ্য কিছুটা অংশগ্রহণকারিণীও বটে, তিনি দুজন বিদেশি কবির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে দিয়েছেন। বাংলা থেকে সুবোধ সরকার এবং মল্লিকা সেনগুপ্তও অনেককিছুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছে।

॥ প্রস্তুতি এবং শুভারম্ভ ॥

ছটি মহাদেশ থেকে বিভিন্ন মেজাজের এবং বিভিন্ন কারণে খ্যাতিমান প্রায় চল্লিশজন কবিকে সংগ্রহ করা একটা বিশাল দায়িত্বের ব্যাপার। আমার ধারণা, পৃথিবীর কোথাও কবিতা নিয়ে এতবড়ো কর্মকাণ্ড আগে হয়নি। কিন্তু ভারত ভবনের ব্যবস্থাপনার কোথাও ভারতীয় শৈথিল্য চোখে পড়েনি। আয়োজন প্রায় নিখুঁত। নিমন্ত্রিত কবিদের যাতায়াত ও আহার-বিহার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তো বটেই, তার আগেকার প্রস্তুতিও বিস্ময়কর।

আগমনেচ্ছু সমস্ত কবিদের কবিতার অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ইংরেজিতে এবং অন্তত একটা করে হিন্দিতে। প্রস্তুত করা হয়েছিল বেশ কয়েকটি কাব্য সংকলন, ইংরেজিতে 'বাগর্থ', হিন্দিতে 'পুনর্বসু'। অনেকগুলি কবিতার পোস্টার, প্রসিদ্ধ শিল্পীদের ছবি সমেত কবিতাফোলিও এবং এক-একটি কবিতা নিয়ে এক-একটি কার্ড। প্রত্যেক কবির পৃথক ছবি। কবিতা নিয়ে এত এলাহি কাণ্ড পৃথিবীতে আর কোথাও হয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।

অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা এই উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। বাংলায় তেমন কিছু হয়নি। তবে, সুবোধ সরকার সম্পাদিত 'ভাষানগর' পত্রিকাটির নতুন সংখ্যা আমন্ত্রিত কবিদের কবিতার অনুবাদে সমৃদ্ধ। ভারত ভবনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই 'ভাষানগর' বাংলায় একটি নতুন ধরনের সুসম্পাদিত পত্রিকা হয়েছিল।

উদ্‌বোধনের দিন কিছু বক্তৃতা থাকবেই। যেমন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, ভারত সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা পুপুল জয়কার এবং অন্য কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দেরি করে পৌঁছেছি বলে আমাকে সেইসব বক্তৃতা শুনতে হয়নি। তবে ব্যবস্থাপনার ওই বিশেষত্বের তারিফ করতেই হয়, সব বক্তৃতা প্রথম দিন এক বেলাতেই সেরে নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী সাড়ে ছ-দিনে আর বক্তৃতার নামগন্ধ ছিল

না। অশোক বাজপেয়ীর উদ্‌বোধনী বক্তব্যটি আমি পরে পড়ে নিয়েছি। ওই একটি রচনায় অশোক কবিতা বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছেন। তাই সেটি বেশ কোটেশনকণ্টকিত। প্রায় সব দেশের কবিদের কিছু-কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে অশোক বোধহয় কবিদের খুশি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কবিরা কি এত সহজে খুশি হয়? এমন অনেক কবি আছে, যারা অন্য কবিদের কবিতা বিষয়ে মতামত শুনে অবজ্ঞায় ঠোঁট ওলটায়।

॥ আপত্তি, স্লোগান ॥

ভারত ভবনের এইসব উদ্যমের সমালোচনা ও বিরোধিতা, দেশের অন্যত্র তো আছেই, ভোপালেও কম নেই। এর আগে রাস্তায় বিরোধী মিছিলও বেরিয়েছে, অত্যধিক হিন্দিপ্রেমীদের চ্যাঁচামেচিও শোনা গেছে অনেকবার। মধ্যপ্রদেশ একটি হিন্দিভাষী রাজ্য, এখানে হিন্দি কবি-লেখকদের প্রাধান্য থাকা উচিত এবং সব অনুষ্ঠান অবশ্যই হিন্দিতে পরিচালনা করতে হবে, এরকম দাবি আছে এক শ্রেণির মধ্যে।

এর মধ্যে একদিন জব্বলপুর থেকে আগত একদল ছাত্র আমাকে টেনে নিয়ে গেল চায়ের দোকানে। বারবার তারা বলতে লাগল, ভারতে এতবড়ো একটা কবিসম্মেলন হচ্ছে, এখানকার ঘোষণা এবং পাঠ ভারতীয় ভাষায় কেন হবে না বলুন? জাপানে কি জাপানি ছাড়া অন্য ভাষায় হয়? রাশিয়ায় হলে কি ইংরেজিতে সবকিছু চলত?

আমি মিনমিন করে বললুম, ইংরেজিও তো ভারতের রাষ্ট্রভাষা।

যুবকরা জোর দিয়ে বলল, তা হোক। কিন্তু ইংরেজিটা আপনার কিংবা আমার ভাষা নয়। এখানে যারা শুনতে এসেছে, তাদের প্রায় কারুরই মাতৃভাষা নয়। হিন্দির বদলে সব অনুষ্ঠান বাংলায় পরিচালিত হলেও আমাদের আপত্তি ছিল না, সেটাও আমাদের দেশজ ভাষা।

আমি বললুম এটা ঠিক কথা নয় ভাই। বাংলায় হলে তোমরা কেউ কিছু বুঝতে পারতে না। সবকিছু আবার হিন্দিতে, তারপর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হত। সেভাবে কোনও কবিসম্মেলন চলে না। যদি সবকিছু মালায়ালাম ভাষায় প্রচারিত হত, তাহলে আমিও কিছুই বুঝতুম না। আমার হিন্দিতে আপত্তি নেই, কারণ খানিকটা তবু বুঝি, কিন্তু হিন্দি হলে যে দক্ষিণ ভারতীয়রা একবর্ণ বোঝে না। সমস্যা অতি জটিল, ভারতের অবস্থা তো জাপান কিংবা রাশিয়ার মতন নয়, তাই ইংরেজিতেই কাজ চালাতে হয়। তবু তর্ক চলে। এই তর্কের শেষ নেই।

হিন্দিপ্রেমীদের খুশি করবার জন্য অশোক বাজপেয়ী তাঁর প্রতিবারের বক্তব্যের প্রথম কিছুটা অংশ হিন্দিতে বলেছেন। সমস্ত কবিদেরই একটি করে কবিতার হিন্দি অনুবাদ পাঠ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে একই কবিতা শুনতে হয়েছে তিনবার, (বিরক্তিকর ব্যাপার।), তবু হিন্দিপ্রেমীরা খুশি নয়। হিন্দি ইংরেজির এই লড়াইয়ে আমি মাথা গলাতে চাই না।

দেশে এত দারিদ্র্য, এখনও কত লোক খেতে পায় না, তা সত্ত্বেও এত খরচ করে কবিসম্মেলনের ব্যবস্থা করা কেন? এই শুনে স্টিফেন স্পেন্ডার মন্তব্য করেছিলেন হ্যাঁ, গরিব তো এখন সারা পৃথিবীতেই আছে। গরিবদের জন্যই যদি সব টাকা খরচ করতে হত, তাহলে তো মানুষের সভ্যতাই এগোত না। রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদ দেখলে স্বয়ং যিশুও হয়তো বলতেন, এই বিশাল আড়ম্বরের কী দরকার, ওটা ভেঙে ফ্যালো! কিন্তু তাহলে ভ্যাটিকানের অমর শিল্পকীর্তি থেকেও পৃথিবী বঞ্চিত হত। অবশ্য জানি না, কোনটা ঠিক।

দারিদ্র্য এখন শুধু গরিবদের ব্যাপার নয়, দারিদ্র্য এখন ক্ষমতালোভীদের রাজনৈতিক অস্ত্র। যে যখন পারছে গরিবদের জন্য কেঁদে ভাসাচ্ছে, তারা নিজেরা ক্ষমতা পেলেই নাকি সব দারিদ্র্য

দূর করে দেবে! ক্ষমতার হাতবদল হচ্ছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু গরিবরা গরিবই থেকে যাচ্ছে কিংবা আরও গরিব হচ্ছে। যারা নিজেরা কোনও স্বার্থত্যাগ করে না, যারা নিজেদের জীবনযাত্রার ধরন বিন্দুমাত্র বদলায় না, তারাও যখন-তখন হাত মুঠো করে দারিদ্র্য, দারিদ্র্য বলে চ্যাঁচায়।

দেশের শতকরা বাটভাগ মানুষ এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে। কোটি-কোটি মানুষ এখনও একবেলাও খেতে পায় না। এইসব ক্ষুধার্তদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করাই তো এখন একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলে এই গরিব দেশে জেট বিমান থাকার দরকার নেই, অতবড়ো রাষ্ট্রপতি ভবন থাকার দরকার নেই, গ্রামকে বঞ্চিত করে শহরে বিদ্যুৎ কিংবা বৈদ্যুতিক ট্রেনের দরকার নেই। কংগ্রেসি কিংবা অকংগ্রেসি কোনও মন্ত্রীর জন্যেই একখানা করে গাড়ি দেওয়ার দরকার নেই, একজন রাজ্যপালকে বিদায় জানাবার আগে হোটেলে এলাহি খানাপিনার দরকার নেই। এসব থেকে যেটুকু টাকা বাঁচে, সেটুকুই তো দরিদ্রদের দেওয়া যায়। কে বলে সেইসব কথা?

আজকাল ছোটখাটো রাজনৈতিক দলগুলিরও বার্ষিক সম্মেলন হয় বিরাট আকারে। সেইসব মচ্ছবে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়, তার চেয়ে অনেক কম টাকা খরচ হয়েছে এই বিশ্ব কবিসম্মেলনে। রাজনৈতিক সম্মেলনগুলিতে মিতব্যয়িতার প্রশ্ন তুলতেও এখন আর সাহস পায় না কেউ। আদর্শ-ফাদর্শ সব চুলোয় গেছে, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি আমাদের বিবেকও খেয়ে ফেলেছে। তাহলে এইসব রাজনৈতিক সম্মেলনই চলতে থাকুক, কবিসম্মেলন, চিত্রপ্রদর্শনী সব বন্ধ থাক।

ভোপালে সেই ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও আমাদের মনে রয়ে গেছে। অতবড়ো একটা ট্র্যাজিক ঘটনা যেখানে ঘটে গেছে, সেখানেই আবার কবিতা নিয়ে মাতামাতি কি সংগত? এ-প্রশ্ন আমারও মনে খচখচ করে। ভোপাল শহর ঘুরলে কিন্তু সেই বীভৎস ট্র্যাজেডির কোনও চিহ্ন এখন চোখে পড়ে না। জীবন চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সেখানে আর সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু যারা নিহত হয়েছে, সেইসব পরিবারের লোকজন এখনও কিছুই পায়নি, যারা আহত হয়েছিল তারা এখনও ধুঁকছে, অতবড়ো একটা অন্যায়ের কিছুই প্রতিকার হয়নি এখনও। আমেরিকার জোচ্চোর ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ী কোম্পানি আর ভারত সরকারের অসৎ প্রতিনিধিরা মিলে এখনও গোঁজামিলের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি বিচারকরাও এই উপলক্ষ্যে প্রচুর টাকা খাচ্ছে বলে শোনা যায়। কবিসম্মেলনটা বন্ধ রাখলে কি এসবের কিছু সুরাহা হত?

কবিতা লিখে দেশ বদলানো যায় না, সরকারকে শায়েস্তা করা যায় না, সাম্রাজ্যবাদীদের জব্দ করা যায় না, অত বড়-বড় বোঝা কবিতার ঘাড়ে চাপানো ঠিকও নয়। কবিরা শুধু নৈতিক প্রতিবাদ জানাতে পারে। বুলেট, বোমা, বিষবাষ্প দিয়ে যতই মানুষকে মারা হোক, কবিরা তবু বলে যাবে, মানুষ অপরাজেয়।

ভোপালে অনেক কবিই তাঁদের কবিতায় কিংবা বক্তব্যে সেই ট্র্যাজেডি স্মরণ করে ধিক্কার জানিয়েছেন। তার মূল্যও কম নয়।

॥ কাব্য ও কবিতা ব্যবচ্ছেদ ॥

সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যেসব কবিরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ধার্য হয়েছে মাত্র এক ঘণ্টা। আমি আবার যুগোস্লাভিয়ায় একটা আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে আতিথ্য ছিল পাঁচ দিনের, কিন্তু কবিতা পড়ার সময় পেয়েছিলাম, তিনটি শহর মিলিয়ে একুশ মিনিট। এইসব বৃহৎ সম্মেলনে মূল মঞ্চের বাইরে ছোট ছোট আড্ডাতেই কবিতার সৌরভ পাওয়া যায় বেশি করে। ভোপালেও সেইরকম অনেক আড্ডা ছিল, সুতরাং মূল মঞ্চে এক ঘণ্টা সময় যথেষ্টই মনে হয়। এই এক ঘণ্টার মধ্যে অর্ধেক সময় কবিতাপাঠ, তারপর প্রশ্নোত্তর।

চার হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হচ্ছে, তবু আজও কবিতার কোনও সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায়নি। সংজ্ঞা দেওয়া যায় না বলেই বোধহয় কবিতা এখনও আকর্ষণীয়। এটা এখনও অনেকে বোঝে না বলেই হয়তো তারা কবিতার চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে চায়, এই কবিতাটা কেন লেখা হয়েছিল, কিংবা কবির কোনও কমিটমেন্ট আছে কি না, এইসব প্রশ্ন তোলে। আরও কত সব অদ্ভুত প্রশ্ন। এক ধরনের অধ্যাপক আছে, যারা বস্তাপচা কাব্যতত্ত্ব বিকট ধরনের ইংরেজিতে সব জায়গায় তুলবেই। কেউ-কেউ প্রশ্ন করতে উঠে দাঁড়ায় শুধু নিজেকে জাহির করবার জন্য।

কবিদের প্রতিক্রিয়াও হয় বিচিত্র। কেউ চালাক-চালাক কথা বলে পাশ কাটিয়ে যান। কেউ মজার কথা বলে হাস্যরোল তুলে প্রশ্নকারীকে নাজেহাল করেন, কেউ রেগে যান, কেউ চুপ করে থাকেন। যেমন অরুণ কোলাতকার চুপ করেছিলেন, দু- একবার মাথা নেড়ে বলেছেন আমি ওসব জানি না।

উর্দু কবি আখতারুল ইমাম বেশ রেগে গিয়েছিলেন, যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ভারত এবং পাকিস্তান, এই দুই দেশের মধ্যে উর্দু কবিতা কোথায় বেশি ভালো। 'কবির সম্মান' পুরস্কার প্রাপক পাঞ্জাবের বর্ষীয়ান কবিকে যখন প্রশ্ন করা হল খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে, তিনি ক্রুদ্ধ বেদনার সঙ্গে বললেন, তুমি যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের না হও, তাহলে তুমি তাদের মনোভাব কিছুতেই বুঝতে পারবে না।

আর্জেন্টিনার কবি রবার্টো হুয়ারেজ কবিদের কমিটমেন্টের প্রশ্ন শুনে তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন, কবিরা দেবদূত নয়। কবিদের বাজার করতে হয়, জামা-কাপড় কাচতে হয়, চাকরি করতে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেলতে হয়। যারা খুব চোখা-চোখা প্রশ্ন করছিল, তাদের দিকে কয়েকজন কবি এমনভাবে তাকিয়ে থাকছিলেন, যেন জীবনানন্দের সেই লাইনটি বলতে চান, 'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা।'

ঠিক কবিতা সম্পর্কে নয়, তার আশপাশের কিছু বিষয় নিয়ে কথাবার্তা তবু আকর্ষণীয়। যেমন, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রসিদ্ধ কবি মিরোস্লাভ হোলুব মজা করেছিলেন খুব, তিনি ইংরেজি মোটামুটি ভালো জানেন, এই সুবিধে নিলেন। হোলুব পেশায় একজন বৈজ্ঞানিক (ইমমিউনোলজিস্ট)। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি বিজ্ঞান ছেড়ে শুধু কবিতা লেখেন না কেন? যুক্তিবাদী বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে কবিতা রচনার কোনও বিরোধ নেই? তিনি বললেন, একটা কাজ না থাকলে খাব কী? কবিতার বই বুঝি কোনও দেশে লক্ষ-লক্ষ বিক্রি হয়? যুক্তির সঙ্গে কি কবিতার বিরোধ আছে? যে-কোনও কবিকেই দিনের অধিকাংশ সময় অ-কবি থাকতে হয়, ট্রেন ধরার জন্য লাইনে দাঁড়ানো, দুধের দোকানে লাইন, বউ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা, প্রতিবেশীর সঙ্গে তর্ক, অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে রেষারেষি, এইসব সময় কেউ কবি থাকে না।

ডেনমার্কের কবি হেনরিক নরডব্রান্ডটকে যখন প্রশ্ন করা হল, ডেনমার্কে কবিতার অবস্থা কীরকম, তিনি পরিহাসের সঙ্গে বলেন, ডেনমার্কে শিক্ষার মান খুব উঁচু, সেখানকার লোকেরা তত বেশি বোকা হচ্ছে। তারা সাহিত্য পড়তে চায় না, কবিতা তো পড়েই না, টিভি দেখে! আমার কবিতার বই বড়োজোর দুশো কপি বিক্রি হয়। (এই কবি ডেনমার্ক ছেড়ে এখন স্পেনে থাকেন, যদিও তাঁর সব খরচখরচা বহন করে ডেনিশ সরকার।)

ফরাসি কবি পিয়ের ওস্তার সুসুয়েকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, ফরাসি দেশের কবিসম্মেলনের তুলনায় ভারতে এসে এই সম্মলনে কবিতা পড়তে তাঁর কেমন লাগছে, তিনি ভুরু কপালে তুলে বললেন, ফরাসি দেশে তো কবিতা পড়তে কেউই ডাকেই না। কে সেখানে কবিতা শুনবে? ফরাসিরা সবসময় খুব ব্যস্ত।

নিকারাগুয়ার আর্নেস্তো কার্দিনালকে একজন প্রশ্ন করল, আপনি পাদরি হয়ে প্রেমের কবিতা লিখলেন কী করে। তিনি শুভ্র দাড়ি নাড়িয়ে বললেন, আমি বুঝি একসময় যুবক ছিলুম না? আমারও

যে অনেক মেয়ে-বন্ধু ছিল, তা বুঝি বিশ্বাস হয় না?

কবিদের অবস্থা এখন ইংল্যান্ডে কীরকম, এই প্রশ্নের উত্তরে স্টিফেন স্পেন্ডার বললেন, টিউব ট্রেনে আমার কোনও সহযাত্রীকে যদি আমি বলি যে আমি কবিতা লিখি, তাহলে সে ভাববে আমি নির্ঘাত পাগল! শুধু ইংল্যান্ড কেন, পশ্চিমি দেশগুলিতে এখন বেশিরভাগ লোকেরই ধারণা, পাগলটাগলরাই কবিতা লেখে।

কবিতা ও রাজনীতির প্রশ্নে তিনি বললেন, ইংল্যান্ডে বসে এখন রাজনৈতিক কবিতা লেখা অসম্ভব। অবস্থা এমনই জটিল। তবে আমি যদি চিলিতে থাকতাম, তাহলে রাজনৈতিক কবিতাই লিখতাম। সেখানে শাসকপক্ষকে সোজাসুজি ঘৃণা করা যায়। ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক কবিতা লিখলেও কেউ কর্ণপাত করবে না, অবস্থা কিছুই বদলাবে না।

একটু থেমে বললেন, ভারতে জওহরলাল নেহরু হয়তো কোনও কবিতা পড়ে বিচলিত হতে পারতেন, কিন্তু মার্গারেট থ্যাচার কবিতা-টবিতার ধার ধারেন না।

॥ প্রাপ্তি ॥

এই আন্তর্জাতিক কবিদের সমাবেশে কয়েকটা দিন কাটালে উপলব্ধি হয়, পৃথিবীর সব দেশেই কবিতার আঙ্গিক প্রায় একইরকম। বিদেশে কোনও প্রখ্যাত কবির রচনা শুনলেও মনে হয় অভিনব কিছু একটা শুনছি কিংবা বাংলায় এ-পর্যন্ত এরকম লেখা হয়নি। কিছু কবিতা ভালো লাগে, কিছু কবিতা অন্যমনস্ক করে দেয়। কবিতা পাঠের ভঙ্গিও খুব পরিচিত, ডেনমার্কের হেনরিয়ে আর আমাদের নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একই রকমভাবে কবিতা পড়েন। রমাকান্ত রথের সুন্দর প্রেমের কবিতাগুলির সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই টার্কিস এক কবির প্রেমের কবিতার। ব্যতিক্রম দু-একটা আছে। আমাদের মালয়ালম ভাষার কবি কবিতা হাতে নিয়ে গান করতে থাকেন কিংবা ইন্দোনেশিয়ার কবি এমন অগ্নিবর্ষী ভাষায় চিৎকার করতে থাকেন যে মনে হয় মনুমেন্টের তলায় নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন।

এই উৎসবে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন আর্নেস্তোকার্দিনাল। নিকারাগুয়ার সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতা, এই ছোট দেশটি আমেরিকান সরকারের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে যেরকম সাহসের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে, তাতে আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করে। মানুষটিও চমৎকার, ছোটখাট চেহারা, ধপধপে সাদা দাড়ি ও চুল, মাথায় আবার পুরুতদের গোল টুপি, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলেন, মধুর ব্যবহার, সকলের সঙ্গেই ভাব জমে গিয়েছিল। তিনি মার্কসবাদী বলে তাঁকে কার্ডিনালগিরি থেকে বরখাস্ত করেছেন পোপ, তবু তিনি সেই পোশাকে থাকেন এবং নিকারাগুয়ার গির্জার কার্ডিনাল হয়ে আছেন। এ ছাড়া তিনি নিকারাগুয়ার সংস্কৃতিমন্ত্রী।

তিনি প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট প্রেমের কবিতা পড়লেন, চতুর বাক্যবন্ধের জন্য সেগুলি বেশ উপভোগ্য। কিন্তু তাঁর পরের কবিতাগুলি শুনে শুধু আমি নয়, সকলেই হতাশ। সেগুলো নিছক গালমন্দ আর চ্যাঁচামেচি, যেন সরকারি প্রচারপুস্তিকাগুলি তিনি কাব্য নাম দিয়ে উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। শুনতে-শুনতে আমার আপশোশের সঙ্গে মনে হল, এই ব্যক্তিটিকে নিকারাগুয়ার মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা ঠিক হয়নি, তাহলে হয়তো তিনি ভালো কবিতা লিখে যেতেন।

আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি হাঙ্গারির কবি ফেরেনস জুহাজস-এর দীর্ঘ কবিতাটি শুনে। এঁর কবিতাটির নাম 'দ্য বয় চেঞ্জ ইন টু আ স্টাগ ক্রাইজ আউট অ্যাট দ্য গেট অব সিক্রেটস।' প্রথমেই তিনি বললেন, মাত্র সাত দিন আগে তাঁর মা মারা গেছেন, তবু তিনি ভারতের টানে এসেছেন। তাঁর কবিতাটিও মা ও সন্তান বিষয়ক। মা ডাকছেন তাঁর ছেলেকে ফিরে আসার জন্য, ছেলেও ফিরতে চায়, কিন্তু ফিরতে পারছে না। বলাই বাহুল্য, কবিতাটি এই মাতা-পুত্রের বিষয়কে ছাড়িয়ে

পৃথিবী ও মানুষ, আদিমতা ও সভ্যতা, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে চলে গেছে। মহৎ গভীরতার সঙ্গে মাঝে-মাঝে অতি সাধারণ কথার মিশ্রণ কবিতাটিকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

ফরাসি কবি পিয়ের ওস্তার সুসুয়ে-ও একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন, সেটি মূলত প্রকৃতি বর্ণনা, মাঝে-মাঝে একটু ক্লান্তিকর। তিনি বললেন, তিনি সারাজীবন ধরে একটিই কবিতা লিখে যাচ্ছেন (কোন কবি তা না লেখে?)।

অন্যরা প্রায় সবাই ছোট ছোট কবিতা পাঠ করেছেন অনেকগুলি। শ্রোতা দর্শকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সমাদর পেয়েছেন চেকোস্লাভিয়ার মিরোস্লাভ হোলুব। অনুবাদের মাধ্যমে ইনি আগে থেকেই ভারতে পরিচিত, তা ছাড়া এঁর কবিতাগুলি সহজবোধ্য, কিছু কাহিনির আভাস থাকে, কৌতুক থাকে। পশ্চিমি কবিতায় আজকাল কৌতুক থাকবেই, আমাদের বাঙালি কবিরা অনেকে এটা এখনও বোঝেন না। হোলুবের একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপের কবিতার নাম, 'ব্রিফ রিফ্লেকশন অন আ ফেনস'। পৃথিবীর সর্বত্র এখন বেড়া ও সীমানা নিয়ে ঝগড়া। এই কবি লিখেছেন :

A Fence

begings nowhere
ends nowhere

and

seperates the place where it is
from the place where it isn't...

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পূর্ব ইউরোপের কবিদের রচনা একেবারেই প্রচারধর্মী নয়। ব্যক্তিগত আলাপচারিতে এঁরা নিজেদের সরকারের এবং বিগ ব্রাদারের দিব্যি সমালোচনা করেন। হোলুব একদিন জানালে যে এতদিন বাদে নাকি চেকোস্লাভিয়া থেকে ফ্রানৎসা কাফকা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

অনেক বিখ্যাত কবি বেশ হতাশ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। আগে যাঁদের নাম শুনিনি, সেইরকম দু-একজন কবির একটি-দুটি লাইন বিদ্যুৎ স্পর্শের মতন চমকিত করে, সেই লাইনগুলি মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, তখন মনে হয় এখন অন্য আর কিছু না শুনলেও চলে। মাঝে-মাঝে কফি পানের বিরতিতে চলে যাই হ্রদের প্রান্তের চত্বরে...মনে হয় পরের অনুষ্ঠানটি না শুনলেই বা ক্ষতি কী?

একটি প্রেমের কবিতা শুনে মনটা হঠাৎ নির্মল হয়ে গেল। কবিতাটি এইরকম :

No I can no longer use you
as a rose in my love poems;
You're much, too large, much too beautiful
and much, too much yourself...

তখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, একটা ঠান্ডা রঙিন আলো এসে পড়েছে হ্রদে, নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে তিনটি সাদা বক, আকাশ ঝুঁকে এসেছে অনেক নীচে, পেছন দিকে নারী-পুরুষদের অস্পষ্ট কোলাহল, আমি আরও এগিয়ে যাই জলের দিকে, আমার মাথায় ঘুরতে থাকে একটি অর্ধস্ফুট নিজস্ব কবিতার লাইন। আমি হারিয়ে যাই কিছুক্ষণের জন্য।

বলাই বাহুল্য, এই বিশ্ব কবিতা সম্মেলন প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। হায়। ভারত ভবনের সেই গৌরব আর নেই। অশোক বদলি হয়ে যায় দিল্লিতে। তারপর অবসর গ্রহণ করেছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক ডামাডোলে ভারত ভবনের সেই গৌরব অস্ত গেছে। এখন সেখানে কবিতার কোনও স্থান নেই!

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন

অটলবিহারী বাজপেয়ী কেন যে আমার দিকে রাগ-রাগ চোখে তাকালেন, তা আমি বুঝতেই পারলাম না।

স্থান : ন্যু ইয়র্ক। সাল ২০০৩, শরৎকাল। উপলক্ষ, এক পাঁচমিশেলি লেখক কবিসম্মেলন।

কারুর মাথায় এই পরিকল্পনা এসেছিল যে ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিমূলক লেখকদের সঙ্গে আমেরিকায় যেসব ভারতীয়রা লেখালিখি করেন (যাঁদের বলে ডায়াসপোরা) তাঁদের নিয়ে একটা সাহিত্যমেলা করতে হবে। বিশাল আয়োজন, তার খরচ দেবে কে?

ন্যু ইয়র্কে আতিথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। আর প্লেন ভাড়ার জন্য আবেদন জানানো হয় এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে। আরও কেউ-কেউ সাহায্য করেছিলেন।

সাহিত্য অকাদেমির পদাধিকারবলে আমাদের এই ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের কোনও অসুবিধে নেই। আমাদের প্লেন ভাড়া অকাদেমিই দেয়।

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, বিশাল আয়োজন বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি ব্যাপার। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে প্রচুর বক্তৃতা, আলোচনা ও রচনা পাঠের ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাষায়, কোথাও-কোথাও কোনও শ্রোতাই নেই।

যাই হোক, শেষ দিনের কবিসম্মেলনের কথা বলি।

সেসময় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তিনিও ন্যু ইয়র্কে এসেছেন রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিতে। তাঁকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, কবি হিসেবে।

যথারীতি তিনি এলেন প্রায় এক ঘণ্টা দেরি করে। সেটাই তো রীতি। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্‌বোধন করবেন, তাই একঘণ্টা অনুষ্ঠান শুরু না করে গুঞ্জন চলল।

বাজপেয়ীজি এসে পৌঁছবার পরে সিকিউরিটির হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এইসব ব্যাপার থেকে আমি সবসময় দূরে থাকতে চাই। কিন্তু এসে পড়েছি, বসে থাকতেই হবে।

বাজপেয়ীজি প্রথমে আসন গ্রহণ করলেন, মঞ্চে নয়, মঞ্চের পেছনে। তিনি সব লেখকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। প্রায় তিরিশজন লেখক-লেখিকা, সকলের সঙ্গে আলাপ করবেন কী করে, তাঁর সময়ই-বা কোথায়? তখন ঠিক হল, সবাই লাইন করে দাঁড়াবে, তিনি একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করবেন। আমি ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য লাইনে দাঁড়াতে চাই না। সরে পড়বার উপক্রম করেছিলাম, কিন্তু আমাদের সাহিত্য অকাদেমির সভাপতির অনুরোধে দাঁড়াতেই হল।

অটলবিহারী এক-একজন লেখকের নাম জেনে করমর্দন ও দু-একটি মিষ্টালাপ করছেন। যখন আমার নাম ঘোষণা করা হল, তিনি যেন কিছুটা চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন, দৃষ্টিতে খানিকটা রাগ-রাগ ভাব, কোনও কথা বললেন না। আমিও করমর্দনের জন্য হাত না বাড়িয়েই চলে এলাম।

কেন তিনি ওরকমভাবে তাকালেন? আমাকে চেনা তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিশ্চয়ই আমার কোনও লেখা পড়েননি। বাংলা পড়তে পারেন কি না, তা-ও জানি না। হিন্দি-ইংরেজিতে আমার কিছু-কিছু বইয়ের অনুবাদ আছে, তাও পড়ার সময় না পাওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে?

একবার তিনি কলকাতায় কিছু লেখক-লেখিকাকে চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সেখানে যাইনি, যেতে ইচ্ছে করেনি। সেই প্রত্যাখ্যান তিনি মনে রেখেছেন? বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর-একবার, কলকাতা ঢাকা সরাসরি বাস যখন চালু হয়, তখন প্রথম দিনের বাসে একদল শিল্পী-লেখকদের পাঠানো হয় ঢাকায়। সেই দলে আমার নাম সুপারিশ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। দিল্লি থেকে কেটে দেওয়া হয় আমার নাম। তা নিয়ে অবশ্য জলঘোলা হয়। খবরের কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নাকি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ও-ব্যাপারে আপত্তি জানান। বাস-যাত্রার দেড়দিন আগে দিল্লির পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে আমাকে জানানো হয় যে, ওই প্রতিনিধিদলে আমার ঠাঁই হয়েছে। তখন আমার খেলার পালা। আমি উত্তর দিলাম, এভাবে শেষ মুহূর্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি মোটেই রাজি নই। আমি ঢাকায় এমনিতে প্রায়ই যাই, ওভাবে যেতে আমার বয়ে গেছে।

সেই ঘটনাটি প্রধানমন্ত্রী মনে রেখেছেন? তাঁর এত স্মৃতিশক্তি? বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাই হোক, এত লেখকদের মধ্যে শুধু আমার প্রতিই কেন তিনি রাগত দৃষ্টিপাত করলেন, তা একটা ধাঁধাই রয়ে গেল।

এর পরের কবিতা পাঠের সময় কমে গেল অনেক। সাধারণত যা হয়। প্রথম দিকের কেউ-কেউ লম্বা কবিতা পড়েন, শেষের দিকের কবিদের ছোট করতে অনুরোধ জানানো হয়, একেবারে শেষের কয়েকজনকে বলা হয়, দু-মিনিট। অর্থাৎ ভারত থেকে বিমানে চেপে ন্যু ইয়র্ক গিয়ে কবিতা পাঠের জন্য মাত্র দু-মিনিট বরাদ্দ। আমি অবহেলার সঙ্গে ঠিক চার লাইনের একটি কবিতা পড়েছিলাম, তাতে উদ্যোক্তারাও অবাক হয়েছিলেন।

সেই সভায় অটলবিহারী একটি লিখিত বক্তৃতা এবং তিনটি কবিতা পাঠ করেন। শেষের কবিতাটি জনসাধারণের অনুরোধে। সেটি নাকি খুব জনপ্রিয় গানও হয়েছে। আমি হিন্দি তেমন বুঝি না। আমার পাশে-বসা প্রখ্যাত লেখক কমলেশ্বরকে জিগ্যেস করেছিলাম, কবিতা হিসেবে অটলবিহারী বাজপেয়ীর রচনার মান কেমন?

তিনি একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, ক্লাস এইটের ছাত্রের রচনার মতন!

এবার আসল কবিসম্মেলনের কথা।

সেইসময়েই কানাডার রাজধানী অটোয়াতে একটি 'আন্তর্জাতিক' কবিসম্মেলন চলছিল। অনেক জায়গাতেই কবিসম্মেলনকে এরকম 'আন্তর্জাতিক' কিংবা 'বিশ্ব কবিসম্মেলন' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তার মধ্যে কারচুপি আছে। মাত্র পাঁচ-সাতটা দেশের কবিরাই সেখানে উপস্থিত থাকেন। অনেক জায়গায় এরা কবিদের গাড়ি ভাড়াও (অর্থাৎ বিমানের টিকিট) দেয় না, নিজেদের পয়সায় যেতে অনুরোধ করে। কানাডার এই কবিসম্মেলনটিও প্রায় সেই অবস্থা। আমি নিজের টাকা খরচ করে এ-অবধি কোনও কবিসম্মেলন বা সাহিত্যসভায় যাইনি, সেরকম আগ্রহও আমার নেই। আমি ওইসময় নিউ ইয়র্কে থাকছি জেনে অটোয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমাকে আগে থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিল। ন্যু ইয়র্ক থেকে অটোয়ার ভাড়া বেশি নয়, ওটুকু তারা দিয়ে দেবে। তাই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।

আসলে সে-যাত্রায় অটোয়া যাওয়ার ইচ্ছে এমনিতেই ছিল। স্বাতী আমার সঙ্গে এসেছে। অটোয়াতে ঠিক ওর পরের বোন জয়তী থাকে, তার সঙ্গে সে তো দেখা করতে যাবেই। আমারও ওই শ্যালিকার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা ছিল।

অটোয়ায় নেমে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। জয়তী এসেছে আমাদের নিতে, কবিসম্মেলনের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত। আমি আর স্বাতী থাকব জয়তীর কাছে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিসম্মেলনের প্রতিনিধিটি বললেন, তা তো হবে না, আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাদের হোটেলে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে অন্য কবিরা আছেন। সেখানেই একসঙ্গে থাকবেন আপনারা, সেটাই

আমাদের রীতি।

অনেক আলাপ-আলোচনার পরও প্রতিনিধিটি জেদ ধরে রইলেন। জয়তীরও দাবি, তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবেই, সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত একটা ভাগাভাগির ব্যবস্থা হল।

স্বাতী যাবে তার বোনের বাড়িতে, আমি যাব হোটেলে। এই ব্যবস্থায় আমি উপকৃতই হয়েছিলাম, নইলে অনেককিছুই আমার অজানা থেকে যেত।

এরকম হোটেলে আমি আগে থাকিনি। এ-হোটেলে কোনও ঘর নেই, সব সুইট। অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টের মতন। দুখানা শয়নকক্ষ, একটি বসবার ঘর, একটি খাবারঘর, রান্নাঘর ও দুটো বাথরুম। সবই সুসজ্জিত। এমনকি রান্নাঘরের চা-দুধ নানারকম বিস্কিট (ওদেশে বলে কুকি) রয়েছে। এতবড়ো ফ্ল্যাটে আমি একা। নিশ্চয়ই খুব দামি। যারা প্লেন ভাড়া দিতে পারে না, তারা এত দামি হোটেলের ব্যবস্থা করে কীভাবে? হয়তো কেউ স্পনসর করেছে।

এই হোটেলের দশতলার একটি সুইটে কবিতা উৎসবের কার্যালয়। সেখানে সব কবিরা জমায়েত হন। সেখানে রয়েছে নানাবিধ রাশি-রাশি খাদ্য এবং প্রচুর বিয়ার ও লাল মদ। লেখক-লেখিকারা সেখানে আড্ডা দেন এবং পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন।

প্রথমেই নতুন কারুর সঙ্গে সহজভাবে ভাব জমাবার ক্ষমতা আমার নেই। একপাশে বসে পাত্র হাতে নিয়ে অন্যদের কথা শুনি। ইংরেজি ভাষার কবি ছাড়াও রয়েছেন কিছু স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান ভাষার কবি, এঁরা সকলেই আমেরিকাপ্রবাসী, একজন শুধু এসেছেন ফরাসি দেশ থেকে। এই হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক'। অনেক পোস্টারে আমার নাম ঘোষণা করে বলা আছে, ভারতের প্রতিনিধি কবি। আমার ভাষার কোনও উল্লেখ নেই।

প্রথম সন্ধ্যায় কারুর সঙ্গে আলাপ না করে শুধু শুনে গেলাম। দ্বিতীয় দিন কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ভারী কোমল চেহারার এক যুবতীকে বললাম, তুমি স্প্যানিশ ভাষায় কবিতা লেখো, তা শুনেছি। আমি বাংলা ভাষায় লিখি।

মেয়েটি অবাক চোখে চেয়ে বলল, বাংলা।

তুমি বাংলা ভাষার নাম শোনোনি?

সে দুদিকে মাথা নাড়ল।

আমি বললাম। আমি স্প্যানিশ ভাষায় কিছু কবি-লেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিত। যেমন, লোরকা, নেরুদা, ওনামুনো। হিমেনেথের একটি কবিতা আমার এত প্রিয় যে মুখস্থ :

—ওখানে কেউ না। জল।—কেউ না।
জল কি কেউ না?—ওখানে
কেউ না। ফুল।—ওখানে কেউ না?
তবু ফুল কি কেউ না?
—ওখানে কেউ না। হাওয়া।—কেউ না?
হাওয়া কি কেউ না?—কেউ
না। মায়া।—ওখানে কেউ না? আর
মায়া কি কেউ না?

কবিতাটি আবৃত্তি করার পর জিগ্যেস করলাম, আর তুমি বাংলা ভাষার নামই শোনোনি? তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ?

মেয়েটি অপরাধীর মতন মুখ করে বলল, না শুনিনি। আমাকে মাপ করো। আমি ইংরেজি খুব কম জানি।

সেখানে উপস্থিত প্রায় দশ-বারোজন নারী ও পুরুষ কবি, বিভিন্ন বয়েসি। আমি জনে-জনে

ওই একটি প্রশ্ন করতে লাগলাম।

তাজ্জব ব্যাপার। কেউই বাংলাভাষা কিংবা রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নন।

একজন প্রবীণ কবি শুধু বললেন, তিনি শুনেছেন, বাংলাদেশ নামে একটা দেশ আছে, সেখানকার ভাষা কি বাংলা? আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটা তিনি অনেক বয়েসে কোনও সূত্রে শুনেছেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা কিছুই পড়েননি।

আমি কি একদল মূর্খের মধ্যে এসে পড়লাম। নাকি অন্যান্য ভাষার কবিদের কাছে বাংলা ও রবীন্দ্রনাথের এখন এই অবস্থা?

কবিসম্মেলন টানা দশ দিনের। শুধু সন্ধেবেলা দু-এক ঘণ্টা। প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচজন করে কবি, প্রত্যেকের কবিতা পাঠের জন্য বরাদ্দ সময় কুড়ি মিনিট। জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি হলে এই আসর বসে, শ্রোতা-দর্শক শ-খানেকের বেশি নয়। তাদের হাতে ওয়াইন বা বিয়ারের গেলাস থাকতেও পারে। তাতে কোনও বাধা নেই।

আমি ঠিক করলাম, এখানে আমার কবিতা পাঠ করা এমন কিছু প্রয়োজনীয় নয়। আমার জন্য নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিটই ব্যয় করলাম বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিষয়ে। সবাইকে জানিয়ে দিলাম। বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে পঞ্চম, ফরাসি-জার্মান-রাশিয়ানের থেকে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষায় অত্যন্ত উন্নত সাহিত্য রচিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, তাদের বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না।

অনুষ্ঠান শেষে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। অটোয়ায় কয়েকজন বাঙালি এসেছেন, টরেন্টো থেকে সস্ত্রীক অশোক চক্রবর্তী এসেছেন আমার কবিতা শুনতে ও আড্ডা দিতে। এর সঙ্গে একজন মধ্যবয়স্কা শ্বেতাঙ্গিনী এসে বললেন, আপনাকে কি একটু বিরক্তি করতে পারি? আমি এখানকার লাইব্রেরিয়ান। আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই। এই গ্রন্থাগার ভবনটি যখন তৈরি হয়, তখন বড় হলঘরটির দেওয়ালে, অনেক উঁচুতে বিশ্বের কয়েকজন বিখ্যাত কবি-লেখকের মূর্তির মুরাল তৈরি করা হয়েছিল, তার মধ্যে একজনকে এখন কেউ চিনতে পারে না। তলায় নাম লেখা নেই, কেউ সঠিক বলতে পারে না, কে ইনি। আপনি একটু দেখবেন? যদি আপনি চিনতে পারেন—

তাঁর সঙ্গে গেলাম সেই হলঘরে। অনেক উঁচুতে কয়েকজন লেখকের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি।

দান্তে, শেকসপিয়র, টলস্টয়ের পাশে...আর কে? আমাদের রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ব-সাহিত্যিকদের মধ্যে এখনও তাঁর স্থান রয়েছে এখানে।

রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। উজ্জ্বল চক্ষু, মুখে স্নিগ্ধ হাস্য।

মন থেকে সব ক্ষোভ দূর হয়ে গেল।

জাপানে কাব্যপাঠ ও রফিক আজাদের গোঁফ

বোধহয় নাম দেওয়া হয়েছিল নিপ্পন-বাংলা বান্ধব সমিতি বা এই ধরনের কিছু। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, আমার সঠিক মনে নেই। মনে না থাকার একটা কারণ, সমিতিটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে বলা যায়।

সেই সমিতির প্রথম অনুষ্ঠান হয় জাপানে। সাহিত্যবাসর ও কবিতাপাঠ। জাপানের প্রখ্যাত রবীন্দ্রপ্রেমী কাজুও আজুমা এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কাজুও আজুমা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও কলকাতা-শান্তিনিকেতনে বিশেষ পরিচিত, প্রায়ই আসেন এবং প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই শান্তিনিকেতনে নিপ্পন ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ডাক পেয়েই আমি এক পায়ে খাড়া। কারণ আমি আগে কখনও জাপানে যাইনি। চিন ঘুরে এসেছি। কিন্তু জাপান না দেখলে যে জীবনই অসমাপ্ত হয়ে যায়।

ব্যবস্থাটি অনাড়ম্বর ও সংক্ষিপ্ত। কলকাতা থেকে আশিস সান্যাল, সে একজন উদ্যোক্তা এবং আমি, আর ঢাকা থেকে হায়াৎ মামুদ ও রফিক আজাদ। কোনও হোটেলের ব্যবস্থা নেই, আমাদের আশ্রয় হয়েছে এক-একজনের বাড়িতে, তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশি।

টোকিওতে পৌঁছেই শুনেছিলাম, ওদেশে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির সংখ্যা মোটে দুশো, আর বাংলাদেশিদের সংখ্যা দশ হাজার। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা সবাই কাজকর্মে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত আর বাংলাদেশিরা যে-কোনও কাজ করতেই প্রস্তুত। পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালি, এমনকি বেকার ছেলেরাও জীবিকার সন্ধানে অন্য দেশে পাড়ি দিতে চায় না। যারা যায়, তারা আগে থেকে সবকিছু ঠিকঠাক করে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির ব্যবস্থা কিংবা চাকরির নিয়োগপত্র পেলেই তবে যায়। আর সেই তুলনায় বাংলাদেশের ছেলেরা অনেক বেশি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়েও অন্য দেশে চলে যায়, এমনকী নিয়মমাফিক সব কাগজপত্র না নিয়েও কোনও কোনও দেশের সীমান্ত পেরিয়ে গোপনে ঢুকে পড়ে।

টোকিও'র পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা অনেকে মিলে আমাদের এক দুপুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভালো-ভালো খাদ্য পানীয় পরিবেশন করেছিলেন। বাকি কয়েকদিন আমাদের কেটেছে বাংলাদেশীয় সাহচর্যে।

আমার আশ্রয়দাতার নাম ফারুক। সে একটি ছোট কারখানার ফোরম্যান। জাপানে যে বিখ্যাত সব মোটরগাড়ির কোম্পানি আছে, তারা বিরাট কারখানা না বানিয়ে ছোটখাটো অনেক যন্ত্রাংশ অনেক ছোট ছোট কারখানা থেকে গড়িয়ে নেয়। সেইজন্য পাড়ায় নানা এরকম ছোট কারখানা আছে। ফারুকের কারখানাটাও তার বাড়ির খুব কাছেই। এইসব কারখানার মালিকরা তাদের পঞ্চাশটি কর্মীর ব্যক্তিগত জীবনের নাড়িনক্ষত্রও জানে। তার একটা মজার উদাহরণ দেখেছিলাম পরে।

ফারুক ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন যুবক। সে তার যোগ্যতার জোরে সাধারণ কর্মী থেকে ফোরম্যান হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স নিয়ে জাপানি ভাষা শিখেছে। ওদেশে স্থানীয় ভাষা না শিখলে কিছুই করা যায় না। ইংরেজির ব্যবহার যৎসামান্য। জাপানে বহু ভ্রমণকারী যায়। কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য কোনও ইংরেজি গাইড বুক অতি দুর্লভ। আমি খোঁজ করেও পাইনি। জাপান সরকার নাকি পর্যটকদের আকর্ষণ করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। আসে তো আসুক, না এলেও ক্ষতি

নেই, এরকম মনোভাব।

ফারুক বলেছে, তার মাসিক উপার্জন, টাকার হিসেবে এক লক্ষ। তার থেকে সে প্রতি মাসে দেশে পাঠায় পঞ্চাশ হাজার, আর বাকি পঞ্চাশ হাজার নিজের খরচে লাগে। এইরকমভাবে টাকা জমালে চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ঢাকা শহরে একটা তিন-চারতলা বাড়ি কেনা যায়। ফারুক কিনেও ফেলেছে বোধহয়।

ফারুকের অ্যাপার্টমেন্টটির অবশ্যই বর্ণনা করা দরকার। এত ছোট অ্যাপার্টমেন্ট আমি জন্মে দেখিনি। জাপানে জনসংখ্যার তুলনায় বাসযোগ্য ভূমি খুবই কম। অনেক ধনী ব্যক্তিও খুব ছোট বাড়িতে থাকে। ফারুকের একটিমাত্র ঘর, তারই মধ্যে এত ছোট বাথরুম যে নড়াচড়া করাও যায় না। ঘরের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থা। আর ঘরটিকে কাঠের পাটাতন দিয়ে দেড়তলা করা হয়েছে। একটা ন্যাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। ওপরটাও একদিক একেবারে খোলা। অন্ধকারে একটু নড়াচড়া করতে গেলেই ধপাস করে নীচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ওই খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় যে কোনওদিন পা পিছলে পড়ে যেতে হতে পারে। বিশেষত মদটদ খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরার পর। আমাকে ওই ওপরের জায়গাটিতে শুতে দেওয়া হয়েছিল খাতির করে। কিন্তু আমি যে একদিনও পড়ে যাইনি, সেটা একটা মিরাক্ল বলা যেতে পারে।

টোকিও একটা বিরাট, ছড়ানো শহর। এক সময় পৃথিবীর এক নম্বর শহর ছিল, এখন জনসংখ্যার নিরিখে সে স্থান নিয়ে নিয়েছে মেক্সিকো সিটি। সে শহরের ধারে কাছে আর কেউ নেই। রফিক আজাদ থাকে আমার কাছাকাছি, এই পাড়াটির নাম ছাইতামা। প্রথম-প্রথম মনে রাখার জন্য আমি বলতাম ছাই আর তামা।

রফিক আর আমি একসঙ্গে রাস্তায় বেরুলে সবাই রফিকের দিকে ফিরে-ফিরে তাকায়। আমার চেহারায় দর্শনীয় কিছু নেই, খানিকটা স্থূলকায়, সেরকম তো ওদেশেও অনেকেই। প্রথম-প্রথম বোঝা যায়নি, রফিক কেন বিশেষ দ্রষ্টব্য। পরে বোঝা গেল, তাঁর গোঁফটি অসাধারণ, শুধু পুরুষ্ট নয়, দু'দিকে ঘুরে গেছে, অনেকটা চেঙ্গিস খানের মতন।

টোকিওর ভূগর্ভস্থ মেট্রো ট্রেনের বিভিন্ন শাখা চালায় তিন-চারটি কোম্পানি। সুতরাং পরিসেবার উন্নতির জন্য আছে প্রতিযোগিতা। আর সময় রক্ষার ব্যাপারটা বিস্ময়কর। ছ'টা সতেরোয় একটা ট্রেন আসবে তো আধ মিনিটও এদিক-ওদিক হবে না। ট্রেনের যাত্রীরা কোনও কথা বলে না। এক-একটা স্টেশন থেকে মানুষ উঠেই বসে পড়ে। কোনও বই বা পত্রপত্রিকা খুলে রাখে চোখের সামনে। যারা বসবার জায়গা পায় না, তারাও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বই পড়ে। ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে এত বই পড়ুয়া আমি প্যারিস-নিউইয়র্কেও দেখিনি। কলকাতায় তো নয়ই। যদিও আমাদের ছেলেবেলায় দেখতাম, কলকাতা থেকে দূরপাল্লার যাত্রীরা প্রায় সবাই বই বা শারদীয় সংখ্যা কিনে নিয়ে উঠতেন। এখন আর তো দেখি না। এখন বড়জোর খবরের কাগজ আর রাজনীতিচর্চা।

ইংরেজি-বাংলা আমরা পড়ি বাঁ দিক থেকে ডানদিকে। উর্দু লেখা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। আমাদের মতে যেটা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা, উর্দুতে সেটাই প্রথম পাতা। আর জাপানি ভাষা চেনা হয় ওপর থেকে নীচে। চিনে ভাষারই সংক্ষিপ্ত রূপ জাপানি লিপিমালা। তাও প্রায় দেড় হাজার অক্ষর এবং চিনেরই মতন ছবি-অক্ষর।

চিনে গিয়ে দেখেছি, সেখানে কবিসম্মেলনের চল নেই। প্রকাশ্যে কবিরা কবিতা পাঠ করে না। কবিতার বই নিভৃতে পাঠ করাই শ্রেয়। রাশিয়ায় আবার এর উলটো। সেখানে অনেক কারখানাতে কবিতা পাঠের আসর বসে। জাপানও অনেকটা চিনের অনুসারী। আমাদের অনুষ্ঠানে কয়েকজন জাপানি কবিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরাও কবিতা পাঠের ব্যাপারে প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখানে প্রধান উদ্যোক্তা বাংলাদেশিরা, সুতরাং অনেকক্ষণ কাব্যপাঠ তো থাকবেই। গল্প-উপন্যাস লেখকদের এই এক দুর্ভাগ্য, তাঁরা এমন সব সমাবেশে আমন্ত্রণ পান না। আমিও যে

গল্প-উপন্যাস লিখে থাকি, তা এইসব অনুষ্ঠানে এসে গোপন করে যাই। যেন, গদ্য লেখা একটা গর্হিত অপরাধ।

অনুষ্ঠানের জন্য একটি হল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সরকার কিংবা বড় ধরনের কোনও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। জাপানে সব কিছুই ব্যয়বহুল, টাকাপয়সার অনটন তো ছিলই, অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন কাজুও আজুমা সান (সান মানে মহাশয়) এবং বাকিটা বাংলাদেশি ছেলেরা। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা এবং কবিতা পাঠ হল জাপানি ভাষায় এবং বাংলায়, ইংরেজির নামগন্ধ নেই। জাপানের এক প্রখ্যাত লেখিকা কবিতা পাঠ করলেন দাপটের সঙ্গে, তার একবর্ণও বুঝলাম না অবশ্য। আমাদের কবিতাও ওঁদের কাছে তথৈবচ। শুধু ধ্বনিমাধুর্য কি তেমন উপভোগ করা যায় বেশিক্ষণ? দক্ষিণ আমরিকাতেও ইংরেজি একবারেই চলে না। তবে সেখানে অন্য ভাষার কবিরা আমন্ত্রিত হলে তাঁদের আগে থেকেই স্প্যানিশ কিংবা পোর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়ে রাখা হয়। এখানে সেরকম কোনও ব্যবস্থা করা যায়নি। অবশ্য এই অনুষ্ঠানে বাংলাভাষী দর্শকও বেশি। যে কয়েকজন জাপানি দর্শক ছিলেন, তাঁরাও এতক্ষণ ধরে বাংলো কবিতা পাঠ শুনতে-শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠে যাননি। এতে ফুটে ওঠে জাতিগত পরিচয়। জার্মানির একটি শহরেও দেখেছি, দীর্ঘক্ষণের ভারতীয় অনুষ্ঠানে হলঘর পূর্ণ ছিল, কোনও দর্শকই বেরিয়ে যাননি বাইরে। অনুষ্ঠানের মধ্যপথে চলে যাওয়াটা ওসব দেশের অসভ্যতা বলে গণ্য হয়। আমরা ওসব শিখিনি। আমরা নিজের কবিতা পাঠ শেষ হলেই, একটুক্ষণ উশখুশ করে চলে যাই বাইরে। অন্যদের কবিতা শোনার তোয়াক্কা করি না।

অবশ্য জাপান ছাড়া আর কোনও দেশে কবিতা পাঠ করলে পর গলাধাক্কাও খেতে হয়নি। এখানে সব কিছু চলে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়। অনুষ্ঠান শেষ করে হল ছাড়তে হবে ঠিক ন'টার সময়। আমাদের অনুষ্ঠানগুলি তো শুরু হয় ঢিলেঢালাভাবে। ঠিক সময়ে শুরু হয় না, ঠিক সময়ে শেষও হয় না। দুটো কবিতা পড়ার কথা থাকলে কেউ-কেউ পড়ে পাঁচটি কবিতা, কেউ-বা আর একটি ছোট্ট কবিতা বলে শোনায় একটি পাঁচ পাতার লম্বা কবিতা।

এখানে ন'টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে কারুর কবিতা পাঠের মধ্যপথেই কয়েকটি আলো নিভে গেল, হাজার অনুরোধেও আর এক মিনিটও সময় বাড়ানো হবে না। হল ছাড়তেই হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও গট-গট করে বেরিয়ে যাওয়া আমাদের অভ্যেস নেই, গুচ্ছ গুচ্ছভাবে নানারকম বিশ্রম্ভালাপ চলে। হলে গার্ডরা তাদের নিজস্ব ভাষায় চেঁচিয়ে বলতে লাগল, এক্ষুনি হল খালি করে দাও। গেট বন্ধ হয়ে যাবে, আমরা তো তাদের ভাষা বুঝছি না, সুতরাং আমাদের শ্লথ গতি। তখন সেইসব গার্ডরা আমাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বার করে দিতে লাগল। এতে প্রতিবাদ করার কিছু নেই, যে দেশে যেমন আচার, তা তো মানতেই হবে।

টোকিও শহরে দ্রষ্টব্য স্থান প্রচুর। নবাগতদের পক্ষে সব জায়গায় চিনে-চিনে যাওয়া সম্ভব নয়। ভাষার অসুবিধে তো আছেই। কাজুও আজুমা মহাশয়ের স্ত্রী একদিন বহু সময় ধরে খুব যত্ন করে আমাকে অনেকগুলি জায়গায় নিয়ে গেলেন। শহরের মাঝখানেই বিশাল সিন্টো মন্দির। প্রচুর গাছপালায় ঘেরা, তার মধ্য দিয়ে অনেকখানি হাঁটতে হয়, সেই প্রৌঢ়া মহিলার হাঁটাতেও কোনও ক্লান্তি নেই। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে।

আমি অবশ্য রেনকোজি মন্দিরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত ভস্মাধার দেখার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কারুর ছাইটাই দেখে সময় নষ্ট করতে যাব কেন? মস্কোতে গিয়ে আমি লেলিনের শবাধারও দেখিনি। যদিও ঘোরাঘুরি করেছি ক্রেমলিনের আশেপাশে।

জাপানে ধর্ম সম্বন্ধে একটা মজার ব্যাপার আছে। জনগণনার সময় ধর্ম বিশ্বাস উল্লেখ করারও একটা জায়গা আছে। বৌদ্ধ, সিন্টো ও খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসীদের সংখ্যা যোগ করে দেখা গেল, যোগফল জাপানের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। তা কী করে হয়? এর অর্থ, অধিকাংশ জাপানিই ধর্ম ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দেন না, অনেক লোকেই লিখে দিয়েছে তারা বৌদ্ধধর্মেও বিশ্বাস করে,

আবার সিন্টো ধর্মেও কিংবা খ্রিস্ট ধর্মে!

সেই সময়ে আমার 'প্রথম আলো' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল 'দেশ' পত্রিকায়। তার একটি সংখ্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারের একটি উক্তিতে কালীমূর্তিকে বলা হয়েছিল 'সাঁওতালি মাগী'। এতে সাঁওতালি এবং হিন্দুদের অনেকে আমার ওপর খুব চটেছিল। যদিও উক্তিটি আমার নয়, মহেন্দ্রলাল সরকারের এই উক্তি ছাপা হয়েছিল একশো বছর আগে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে হেসেছিলেন। একটি সিনেমার পত্রিকার মলাটে আমাকে নিয়ে এই বিতর্কটার কথা ছিল। একটি বাংলাদেশিদের আড্ডায় সেই পত্রিকাটি পড়েছিল, একজন সেটা এগিয়ে আমাকে জিগ্যেস করল, সুনীলদা, এটা আপনি লিখলেন, এখন আপনাকে যদি কেউ মারধোর করে? আমি বলেছিলাম, এই যে প্রশ্নটা করলে, এরকম প্রশ্ন ওঠে বলেই আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটে দেশ জাপানের তুলনায় এত পিছিয়ে আছে।

জাপান সম্পর্কে আর একটি কাহিনিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দেশ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। পরমাণু বোমারও আঘাত সহ্য করেছে এই দেশ। চরম অপমানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার কয়েক বছরের মধ্যেই সব কিছু আবার নতুনভাবে গড়ে ওঠে, জাপান হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ। এটা কী করে হল? যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থের অভাব যেমন ছিল, তেমন ছিল লোকজনেরও অভাব। সেই সময় জাপানের সম্রাট জীবিত নাগরিকদের কাছে আবেদন জানালেন। জীবিকার জন্য যার যা কাজ আছে, তা তো তারা করবেই, তা ছাড়াও দেশের জন্য অন্তত দু'ঘণ্টা শ্রমদান করতে হবে বিনা পারিশ্রমিকে। অর্থাৎ অফিস থেকে ফেরার পর সবাই আরও দু'ঘণ্টা রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণের কাজে সাহায্য করবে। জাপানের সম্রাটকে সবাই বিশেষ মান্য করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরাজিত জাপানবাহিনী যখন আত্মসমর্পণের জন্য কয়েকটি শর্ত দেয়, তার সব কটিই অগ্রাহ্য করে বিজয়ী বাহিনী। তখন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাঁচুমাচুভাবে বলেছিলেন, অন্তত একটা শর্ত থাকুক, আমাদের সম্রাটকে যেন কোনওভাবেই অপমানিত করা না হয়।

সম্রাটের সেই আবেদন শুনে দেশের প্রতিটি নাগরিক বিনামূল্যে শ্রমদান করতে লাগল প্রতিদিন। সবকিছু নতুনভাবে গড়ে উঠল খুব দ্রুত। দু'বছর বাদে জাপানের সম্রাট আবার বিবৃতি দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন যে আর শ্রমদান করার দরকার নেই। তখন বহু লোক বলল, না, না, আমাদের দু'ঘণ্টা অতিরিক্ত পরিশ্রম করা অভ্যেস হয়ে গেছে। আমাদের টাকাপয়সা চাই না, আমরা এখনও ওই দু'ঘণ্টা শ্রমদান চালিয়ে যেতে চাই।

আশ্চর্যের ব্যাপার এত পরিশ্রমী হয়েও জাপানিরা জুয়াখেলাতেও খুব উৎসাহী। জুয়াখেলা এখানে আইনসম্মত, প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে জুয়ার আড্ডা, যা একটি হলঘরের মতন। এখানে জুয়াকে বলে পাচিংকো। সম্ভবত অত পরিশ্রম করে বলেই এই জুয়াখেলাটা তাদের অবসর বিলাস রিলাক্সেশন। সম্ভবত এইজন্যেই টোকিও শহরে খুনের ঘটনা পৃথিবীর অন্য শহরের তুলনায় সবচেয়ে কম, ধর্ষণের ঘটনা প্রায় ঘটেই না বলতে গেলে। রাত তিনটের সময় কোনও ভদ্রঘরের মহিলাকে আমি একলা-একলা হেঁটে যেতে দেখেছি, কেউ তার হাত ধরে টানাটানি করার সাহস পাবে না। এখানে বড়-বড় থানার বদলে আছে অসংখ্য ছোট ছোট থানা, প্রত্যেক পাড়ায়, বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে, খানিকটা আড়ালে। কেউ সাহায্য চেয়ে চিৎকার করলে দু'মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে।

বাংলাদেশিরা অনেকেই জুয়া খেলতে চায়। ফারুক যে বলেছিল, প্রতি মাসে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখে নিজের জন্য, তার অনেকটাই যায় জুয়ায়। ওরা খেলে থাকে এই আশায়-আশায় যে একবার 'জ্যাকপট' মারতে পারলে পেয়ে যাবে কয়েক কোটি টাকা, তখনই ফিরে যেতে পারবে দেশে।

আমারও বেশ জুয়াখেলার ঝোঁক আছে, ওদের সঙ্গে খেলতে গেছি কয়েকবার। হেরেছি প্রত্যেকবার। পৃথিবীর অনেক দেশেই আমি জুয়া খেলতে গিয়ে শুধুই হেরেছি। তাতে আমার উল্লসিত হওয়ার একটা কারণ আছে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, প্রেমের ক্ষেত্রে যে ভাগ্যবান, জুয়াতে তার ভাগ্য খোলে না।

আমাকে নিয়ে শহরের বাইরে বেড়াতে যাবে বলে ফারুককে দু'দিন ছুটি নিতে হবে। ওদেশে যখন তখন ছুটি নেওয়া চলে না। তাই ফারুক টেলিফোনে তার মালিককে জানাল, তার হঠাৎ জ্বর এসেছে, সে কারখানায় যেতে পারবে না। মালিক তাকে বলে দিল, কালকের মধ্যে জ্বর না কমলে কোন ওষুধ খেতে হবে, কোন ডাক্তার দেখাতে হবে। শুধু তাই-ই নয়, ঘণ্টাদুয়েক পরে মালিকের প্রৌঢ় স্ত্রী ফারুকের ফ্ল্যাটে এসে হাজির! সে মিথ্যে কথা বলেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নয়। বাবা-মা কাছে নেই, বিয়েও করেনি, একা একটি বিদেশি ছেলে, বেশি জ্বর হলে কে তাকে খাবার দেবে, কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, তাই মহিলাটি এসেছেন তাকে কিছুটা সেবা ও সাহায্য করতে। মালিকপক্ষের এরকম মানবিকতা বোধ খুবই দুর্লভ না?

ফারুক প্রথমে অসুখের ভাব করে মটকা মেরে শুয়ে ছিল, ভদ্রমহিলার আন্তরিকতা দেখে উঠে বসে বলল, সত্যি কথা বলছি, আমার এই দাদা এসেছেন ভারত থেকে, তাঁকে কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই, চাই অন্তত দুটো দিন...। ভদ্রমহিলা এতেও ক্ষুব্ধ না হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, ভারত থেকে তোমার অতিথি এসেছেন, তাঁকে আমাদের দেশটা তো দেখানোই উচিত। অবশ্যই ফুজি পাহাড়ে নিয়ে যাবে, আর একটা লেকে...।

পরদিন সকালে আমরা বেরুবার তোড়জোড় করছি। রফিক ও আরও কয়েকজন আসেনি বলে গড়িমসি চলছে, তার মধ্যে সেই ভদ্রমহিলার ফোন। তিনি ফারুককে বললেন, তোমরা এখনও বেরোওনি? পূর্বাভাসে বলেছে, বেলার দিকে খুব বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে খুব। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো, আর সাবধানে গাড়ি চালিয়ো। বেলা পড়লে ট্রাফিক জ্যামও বাড়বে। দেখো, তোমার অতিথির যেন কোনও অসুবিধে না হয়!

সত্যি জাপান এক আশ্চর্য দেশ!

রফিক আর আমি একসঙ্গেই ঘোরাঘুরি করি। একদিন সকালে রফিককে দেখে আমি হতবাক। প্রায় চিনতেই পারি না। 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা!' রফিকের সেই চেঙ্গিসি গোঁফ অদৃশ্য!

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে রফিক লাজুকভাবে বলল, কাল রাত দুটোর সময় হঠাৎ ক্ষুর নিয়ে দিলাম গোঁফটা কেটে। রাস্তায় বেরুলেই লোকে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর দেখি কি এখানে আর একটা মানুষেরও গোঁফ থাকে না। তারপর একজন বলল, জাপানের একমাত্র সম্রাটই গোঁফ রাখতে পারে। তাই অন্য কেউ রাখে না গোঁফ! দূর ছাই, আমিও সেইজন্য...।

গোঁফবিহীন রফিকের ব্যক্তিত্বও যেন কমে গেল খানিকটা। গলার আওয়াজও খানিকটা মিনমিনে। দেশে ফিরে গেলে এই অবস্থায় ওকে ওর বউও চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ! যাই হোক, পরবর্তীকালে ঢাকায় গিয়ে দেখেছি, রফিকের সেই বিখ্যাত গোঁফ আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে।

আমার হিরোসিমা-নাগাসাকি দেখে আসার ইচ্ছে ছিল। জাপানে ট্রেনভাড়া অসম্ভব বেশি আর সেখানে চেনাশুনো কেউ নেই। এইসব কারণে পুরো দেশটার অনেকখানি সেবার দেখা হয়নি।

ওখানে আমি কাজুও আজুমা মহাশয়ের সঙ্গে এমন একটা ব্যবহার করেছিলাম, যার জন্য তিনি আমার ওপর খুব ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন তো বটেই, পরবর্তীকালেও কলকাতায় দেখা হলে আর আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন না। ব্যবহারটি অন্যায় ঠিকই, কিন্তু আমি জেনেশুনেই সেটি ঘটিয়েছি। কাজুও আজুমা একদিন আমাকে তাঁর বাড়িতে দ্বিপ্রহরের আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওদেশে কারুর বাড়িতে আমন্ত্রণ পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং সেই আমন্ত্রণ পেয়েও

অনুপস্থিত হওয়া অত্যন্ত অভদ্রতা। আমি জাপানি শিষ্টতার নীতি লঙ্ঘন করেছি। নিশ্চয়ই খুব ভালো-ভালো খাবার খাওয়াতেন, তবু আমি যাইনি, তার কারণ, তিনি আমার পাশে রফিক আজাদকে দেখেও তাকে নেমন্তন্ন করেননি। নির্দিষ্ট দিনে তিনি দু-বার আমাকে টেলিফোন করেছিলেন, আমি শরীর খারাপ, পেট খারাপ, এইসব মিথ্যে অজুহাত দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, আমারও তো একটা ভারতীয় রীতি আছে। রফিককে ডাকেননি, আমি ওকে ফেলে রেখে একা যাই কী করে? কোনও প্রলোভনেই বন্ধুকে ত্যাগ করা উচিত নয়, এটা আমাদের শিষ্টতার অঙ্গ।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

সে একটা সময় ছিল যখন কলকাতায় বহু বিদেশি বিমান সংস্থা যাওয়া-আসা করত। আমি নিজে প্রথমবার বিদেশে যাই প্যান-অ্যাম কোম্পানির বিমানে, সে কোম্পানিই এখন উঠে গেছে, তার বদলে আর কোনও আমেরিকান বিমান কলকাতার মাটি ছোঁয় না বহুদিন। আরও অনেক দেশের বিমান কলকাতার সংস্রব এড়িয়ে চলে। কিন্তু গত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কলকাতা বিমান বন্দরের যেমন ছিল রমরমা, তেমনই ছিল কলকাতা শহরের সুনাম ও আকর্ষণ। অবশ্য ষাটের দশক থেকেই সেই সুনামে একটু একটু চিড় ধরতে শুরু করে। কিন্তু তা টের পেতে আরও কিছুটা সময় লেগেছিল।

সেই সময় বহু বিদেশিরও আগমন ঘটত এই শহরে নানা প্রয়োজনে, বহু বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসত কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আসতেন বহু পণ্ডিত ও গবেষক এবং অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকা। নকশাল আন্দোলনের সময় যখন-তখন বন্‌ধ, লক-আউট, ট্রামে বাসে আগুন, বোমাবাজি, রাস্তায়-ঘাটে খুনোখুনির অবস্থা যখন চরমে ওঠে তখন থেকেই বড় বড় বিমান কোম্পানিগুলি কলকাতাকে পরিত্যাগ করতে শুরু করে। বিদেশিদের আগমনেও ভাটা পড়ে। এখনকার কলকাতায় মাসের পর মাস নিরুত্তাপ ও রাজনৈতিক সংঘর্ষবিহীন অবস্থা দেখে সেই সময়কার উত্তাল দিনগুলির কথা কল্পনা করাই শক্ত। কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় আমাদের হাঁটতে হত শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের মতন দু'হাত উঁচু করে। অর্থাৎ রাস্তার পাশের অপেক্ষমান পুলিশদের দেখাতে হত যে আমাদের হাতে বোমা-পিস্তল কিছু নেই।

বিদেশি প্রবাহ যখন অব্যাহত ছিল, সেই সময় ইংরেজি ভাষা-ভাষী জগতে তৎকালীন সাড়াজাগানো কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এসে পড়লেন কলকাতায়। তিনি যেমন বিখ্যাত, তেমনই কুখ্যাত। তাঁর 'হাউল' নামের কাব্যগ্রন্থটি নাকি একমাসে বিক্রি হয়েছিল দশ লক্ষ কপি, ইংরেজি ভাষারও কোনও কবিতার বইয়ের এমন জনপ্রিয়তা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অ্যালেন গিন্‌সবার্গ সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছু কথা জানতে পারি বুদ্ধদেব বসুর একটি রচনা থেকে। সে রচনাটির নাম 'বিট বংশ ও গ্রিনিচ গ্রাম'। তখন আমেরিকায় কবি-শিল্পীরা একটা আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার নাম বিট, এই আন্দোলনকারীদের বলা হত বিটনিক। এই আন্দোলনেরই পরবর্তী ব্যাপক রূপ হচ্ছে হিপি। এখনকার অনেকে হয়তো হিপি নামটি মনে রেখেছে, বিটদের কথা জানে না। হিপি আন্দোলন সারা পৃথিবীতেই সাড়া ফেলে দিয়েছিল। আমেরিকায় মাঝে-মাঝে এই সব হুজুগ ওঠে, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। হিপিদের পরবর্তী রূপকে বলা হত ফ্লাওয়ার চিলড্রেন, তারপর তারাও মিলিয়ে যায়।

বিট আন্দোলন শুধু সীমাবদ্ধ ছিল কবি-লেখক-শিল্পীদের মধ্যে, হিপিদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা, সব ধরনের তরুণ। হিপিদের নিয়ে অনেক ঠাট্টা-ইয়ার্কি, অবজ্ঞা প্রদর্শন হয়েছে বটে, কিন্তু এরা আমেরিকার সমাজে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। এরা পোশাক-পরিচ্ছদের কৃত্রিম নিয়ম থেকে শুরু করে সমাজের অনেকরকম কৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছিল এবং এরা ছিল

ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী। আর বিটদের ছিল একটা নিজস্ব জীবনদর্শন। কবিতা লিখতে গেলে বা শিল্পচর্চা করতে গেলে কোনওরকম প্রতিষ্ঠানের দাসত্ব করা চলবে না, জীবিকা অর্জনের জন্য সময় নষ্ট করা চলবে না, কবিতা লেখা বা শিল্পচর্চাই চব্বিশ ঘণ্টার কাজ। অর্থাৎ ইস্কুলমাস্টারি কিংবা প্রাইভেট টিউশানি করাও নিষিদ্ধ। সেজন্য জামা-জুতো, খাওয়া-দাওয়ার খরচ কমিয়ে ফেলতে হবে যথাসম্ভব। ছেঁড়া জামা, খালি গা-তেও কিছু যায় আসে না। একেবারে অভুক্ত অবস্থায় এসে পড়লে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কবিতা পড়তে-পড়তে ভিক্ষে করাও ভালো। অর্থাৎ প্রায় সাধু-ফকিরদের মতন জীবনযাপন। অবশ্য ওসব দেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে-মাঝে কবিদের কাব্যপাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং ভালো দক্ষিণা দেয়। আমাদের দেশে সে রীতি নেই।

অ্যালেন গিন্সবার্গ ও তার বন্ধুবান্ধবরা এভাবেই জীবনযাপন করত। তা ছাড়াও অ্যালেনের ছিল অতীন্দ্রিয় জীবনদর্শনের প্রতি ঝোঁক। সেইজন্যই তার অতিরিক্ত টান ছিল ভারতবর্ষের প্রতি। আমেরিকায় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা করে সেই ষাটের দশকের গোড়ায় অ্যালেন বলেছিল, প্লেনের ভাড়া জোগাড় করতে পারব না, তবু আমি একদিন হেঁটে-হেঁটে হলেও ভারতে যাবই যাব, কলকাতায় আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

সত্যিই সে একদিন হাজির হল, তার সঙ্গী পিটার অরলভস্কিকে নিয়ে। পুরোপুরি হেঁটে আসা তো সম্ভব নয়। আটলান্টিক পার হতে হয়েছে জাহাজে, তারপর মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির দেশগুলি কখনও পদব্রজে, কখনও হিচ হাইকিং করে এসেছে। কলকাতায় পৌঁছে সে তরুণ কবিদের খোঁজ করতে-করতে পেয়ে যায় কৃত্তিবাসের দলবলকে। তারপর আমাদের এমনই বন্ধুত্ব হল যে প্রায় প্রতিদিনই দেখা না হলে চলবে না।

সেই প্রথম একজন বিদেশি ও বিশ্ববিখ্যাত কবির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। তার আগে সাহেব মেম তো অনেক দেখেছি, কবি-অধ্যাপক পল এঙ্গেল এবং অসম্ভব ধনী এক মহিলা কবি রুথ স্টেফানের সঙ্গেও আমাদের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, কিন্তু অ্যালেন গিন্সবার্গ এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। মুখভরতি দাড়ি, ছেঁড়া-ময়লা পোশাক এবং পায়ে রবারের চটি, অথচ উচ্চশিক্ষিত, এরকম আমেরিকান সাহেব কলকাতা শহরে আগে দেখিনি।

অ্যালেনরা এসে প্রথমে উঠেছিল বাগরি মার্কেটের কাছে আমজাদিয়া হোটেলে। সে অতি নীচু স্তরের শস্তা হোটেল, খুবই অপরিচ্ছন্ন, তেলচিটচিটে বিছানা। আমেরিকানরা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে খুবই পিটপিটে হয়। একদিন আমি ওই হোটেলের বাথরুম দেখে স্তম্ভিত। অমন নোংরা, কুৎসিত বাথরুমে পা দিয়ে আমাদেরই বমি উঠে আসে। জলের মগটি শ্যাওলা ধরা ও ফুটো। সেই বাথরুমই ওরা দুজনে অম্লানবদনে ব্যবহার করছে। এ যেন শরীরকে কষ্ট দেওয়ার এক সাধনা।

দিনের পর দিন অ্যালেন গিন্সবার্গের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে তার জ্ঞানের পরিধি এবং কবিত্ববোধের সন্ধান পেয়ে আমাদের জীবনদর্শনও অনেকটা পালটে যায়। বেশিরভাগ দিনই আমাদের আড্ডা জমত গঙ্গার ধারে, নিমতলা শ্মশানে। অ্যালেনের কাছেই আমাদের গাঁজা খাওয়ার দীক্ষা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীরা হাজার-হাজার বছর ধরে গাঁজার ধোঁয়ার সঙ্গে চিত্তকে জাগ্রত করার সাধনা করে আসছে, আর আমাদের কিনা সেই গাঁজা খাওয়া শিখতে হল এক সাহেবের কাছে। এদেশের মধ্যবিত্তরা মনে করত গাঁজা খাওয়া ছোটলোকদের ব্যাপার! হিপিদের প্রভাবে পরবর্তীকালে এদেশের উচ্চবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গাঁজার নেশা চালু হয়। এক বিখ্যাত অধ্যাপক ঘোষণা করেছিলেন, মদ, বিড়ি, সিগারেট এমনকি চা-কফির চেয়েও গাঁজা কম ক্ষতিকর, বরং মনকে সূক্ষ্ম করে। লেখক অলডাস হাক্সলিও এই মত সমর্থন করেছেন তাঁর 'ডোরস অফ পারসেপশন' গ্রন্থে।

অ্যালেন ও পিটারের সঙ্গে আমাদের এই মেলামেশা অনেকেই পছন্দ করেনি। তখন বামপন্থী আবহাওয়া খুব উত্তপ্ত। অ্যালেনদের প্রধান দোষ, তারা আমেরিকান। আমেরিকার প্রতি অনেকেরই

তীব্র ঘৃণা। রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকার ভূমিকা নিশ্চিত সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষকে একই মানদণ্ডে বিচার করাও মূর্খতা। অ্যালেন একজন কবি, কবিদের নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। তা ছাড়া, অ্যালেন তার বিভিন্ন লেখায় রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকাকে যে কত তীব্র আক্রমণ করেছে, তাও জানে না কট্টর বামপন্থীরা।

এই সময় জামশেদপুর থেকে এক সাহিত্য সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ করা হল। খুবই বিরাট আয়োজন। উদ্যোক্তারা আমাদের মতন একঝাঁক তরুণ কবিদের নামে চিঠি দিলেন, যাওয়া হবে রেলের কামরা সংরক্ষণ করে।

সেই সময় আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল, অ্যালেন ও পিটারকেও সঙ্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে সেই ইচ্ছের কথা জানাতেই সেও খুব উৎসাহিত। কিন্তু অ্যালেনরা কি যেতে রাজি হবে? আমাদের সঙ্গে সহজভাবে মিশলেও সে তো পৃথিবীতে অন্যতম অগ্রগণ্য কবি। বিনা আমন্ত্রণে কি সে কোনও সাহিত্যসভায় যেতে পারে?

অ্যালেন কিন্তু প্রস্তাবটি শোনামাত্র সম্মত হয়ে গেল। কলকাতার বাইরে কোথাও ঘোরা হবে। একটা বাংলো কবিসম্মেলনও দেখা হবে। ট্রেনের কামরায় হইহই করতে করতে আমরা পৌঁছে গেলাম জামশেদপুর।

একটা কথা মনে পড়েনি, জামশেদপুরের টাটা কোম্পানির বাঙালিদের মধ্যেও তখন উত্তপ্ত বামপন্থী আবহাওয়া!

আমাদের সঙ্গে দুজন সাহেবকে দেখে, তারা আমেরিকান জেনে উদ্যোক্তাদের মুখ ভার হয়ে গেল।

তখন কমল চক্রবর্তী ও কৌরবের দলবল খুবই ছোট। সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের নেত্রী ছিলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়। এ নামে একজন গায়িকা আছেন, কিন্তু জামশেদপুরের পূরবী ছিলেন একসময় কলকাতার নামকরা ছাত্রী এবং ওখানকার ডাক্তার বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। পূরবী ছিলেন যেমন রূপসি, তেমনি বিদুষী, অত্যন্ত তেজস্বিনী এবং সেই কট্টর বামপন্থী। ওখানকার তরুণরাও পূরবীকে খুব মান্য করত।

পরবর্তীকালে পূরবীর সঙ্গে আমার সুন্দর বন্ধুত্ব হলেও সেইসময়ে পূরবী আমাদের কৃত্তিবাসের দলটিকে অপছন্দ করতেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে আমরা অশ্লীল কবিতা লিখি। আর আমেরিকানরা তাঁর দু'চক্ষের বিষ।

সেই সম্মেলনে কয়েকজন গল্পকার ও নাট্যকার থাকলেও কবিদেরই ছিল প্রাধান্য। কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে তুমুল কোলাহল হত। উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন, আমরা কে, কী কবিতা পড়ব, তা আগে থেকে দেখাতে হবে। অর্থাৎ আমরা যাতে কোনও অশ্লীল কবিতা পড়ে না ফেলি। কিন্তু এই শর্তে আমরা রাজি হব কেন? আমাদের তীব্র আপত্তিতে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। পূরবী জ্বালাময়ী ভাষণে আক্রমণ করলেন আমাদের। আমরাও তীব্র ভাষায় উত্তর দিতে ছাড়িনি। এর মধ্যে আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় মত্ত অবস্থায় হাজির হয়ে পরিস্থিতি সরগরম করে দিল। পূরবী অবশ্য কিছুদিন পরে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, আসলে তিনি আমাদের কবিতা পছন্দই করেন।

যাই হোক, উদ্যোক্তারা প্রথম থেকেই গোঁ ধরে রইলেন। অ্যালেন গিন্‌সবার্গকে কিছুতেই ওই সম্মেলনে কবিতা পড়তে ডাকা হবে না। প্রথমত তিনি অনিমন্ত্রিত, দ্বিতীয়ত তাঁর গায়ের চামড়ার রং সাদা এবং জন্মেছেন আমেরিকায়। আমাদের প্রবল দাবিও উপেক্ষিত হল। তখন আমরা কয়েকজন ধুত্তোর ছাই বলে সেই সাহিত্য সম্মেলন দ্বিতীয় দিনেই বর্জন করে চলে গেলাম চাইবাসার দিকে। আর কোনও কবিসম্মেলনে এরকম ঝগড়াঝাঁটির মুখে পড়তে হয়নি আমাদের।

ওখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, টাটা কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। তিনি কিছুদিন আগেই আমেরিকা থেকে ফিরেছেন, তাই অ্যালেনের খ্যাতির খবর

জানতেন। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় যাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কবিতা পাঠ করবার জন্য ঝুলোঝুলি করে, তিনি জামশেদপুরে অবাঞ্ছিত এবং উপেক্ষিত।

সেই ভদ্রলোকের বাড়ির ঘরোয়া আসরে আমাদের সঙ্গে অ্যালেনও কয়েকটি কবিতা পড়ল। তার মধ্যে আমেরিকা বিষয়ক একটি কবিতার কয়েকটি লাইন এরকম :

America, when will we end the human war?
Go fuck yourself with your atom bomb

নিজের দেশ সম্পর্কে এমন কঠোর কথা ক'জন কবি সাহস করে বলতে পারে?

এই কবিতাটির মধ্যেই স্বীকারোক্তি আছে, অ্যালেনের মা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা, অ্যালেন নিজের সম্পর্কেও বলেছে :

America I used to a Communist when I was a kid I am not sorry...
you should have seen me reading Marx...

হায়, জামশেদপুরের উদ্যোক্তারা এই সব কিছুই জানতে পারল না।

এরপর আমরা গেলাম সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বেড়াতে। অন্ধকার, বালির ওপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ অ্যালেন তার ভরাট সুরেলা গলায় বলে উঠল :

Black magician, Come home.

কেন জানি না, এই লাইনটা সারাজীবন আমার মর্মে গেঁথে আছে।

বাংলাদেশের বেলাভূমিতে কবিতা পাঠ

কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে যে সরাসরি বিমানব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে, তা আমার জানা ছিল না। এর আগে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি অঞ্চলে বেড়াতে গেছি ঢাকা থেকে গাড়ি-পথে। খুব সুন্দর রাস্তা। খানিকটা নাকি চিন আর খানিকটা ভারত সরকার বানিয়ে দিয়েছে। ওরকম ভালো রাস্তা তখন পশ্চিমবঙ্গে একটাও ছিল না। এখন কিছু-কিছু হয়েছে অবশ্য।

সেবারে চট্টগ্রামে একটি নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ এল। উদ্যোক্তারা পাঠিয়ে দিলেন দুটি টিকিট। বিমানে উঠে বসে বেল্ট বাঁধতে না বাঁধতেই যেন ভস করে পৌঁছে গেলাম চট্টগ্রামে। বেশ মজার অনুভূতি। অবিভক্ত বাংলায় চট্টগ্রাম ছিল বেশ সুদূর শহর, সেখান থেকে কলকাতায় আসতে লেগে যেত দু-তিনদিন। চট্টগ্রামের মানুষদেরও মনে হত আধা-বিদেশি, তাদের ভাষা ও কথার টান অনেকটাই ছিল দুর্বোধ্য। শুধু দুর্বোধ্য নয়, কিছু কিছু শব্দ বেশ ভয়াবহ। যেমন মাথার বালিশকে বলে গর্দাইন্যা। গর্দান একটা ফারসি শব্দ, যার অর্থ ঘাড়। যেখানে ঘাড় রাখা হয় সেটা গর্দাইন্যা, ঠিকই আছে। কিন্তু আমরা অন্য ভাষায় গর্দানকে কঠিন শাস্তির অনুষঙ্গেই ব্যবহার করি। কলকাতার এক বাবু নাকি চট্টগ্রামে গিয়ে এক বাড়ির আশ্রয়দাতাকে রাত্তিরবেলা বলেছিলেন, একটা বালিশ দাও তো। আশ্রয়দাতা তাঁর ভৃত্যকে যখন বললেন গর্দাইন্যাটা ফালাইয়া দে তো, তা শুনে বাবু আঁতকে উঠেছিলেন।

আমার মনে-মনে একটা আশঙ্কা ছিল, চট্টগ্রামে গিয়ে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারব তো?

এ আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। আজকাল এদিককার বাঁকুড়া শহরের মানুষও যেমন বলে না বাঁকড়ো ভাষা তেমনি চাটগাঁয়ের রাস্তা-ঘাটেও শোনাই যায় না সেই চাটগাঁইয়া ভাষা। শিক্ষিত সাধারণ মানুষ কথা বলে রেডিয়ো-টিভি'র ভাষায়, যা দুই বাংলাতেই প্রায় এক। বাড়ির মধ্যে অনেকে নিশ্চয়ই স্থানীয় ভাষায় কথা চালায়। ছোটবেলায় দেখেছি, আমার কাঠ-বাঙাল মামারা (আমি বাঙাল হলেও ঠিক কাঠ-বাঙাল নই, দুতিন বছর থেকেই আমি কলকাতায় থাকতে শুরু করেছি) বাড়িতে নিজেদের মধ্যে পুরো ফরিদপুরি ভাষায় কথা বললেও হঠাৎ কোনও বাইরের লোক এলেই মুহূর্তের মধ্যে সুর বদলে ফেলে খাঁটি ক্যালকেশিয়ান ভাষায় কথা শুরু করতেন। আমি না-ঘরকা না-ঘাটকা। কলকাতার বন্ধুদের কাছে আমি ছিলাম বাঙাল, আবার ছুটির সময় ফরিদপুরে গেলে সেখানকার ছেলেরা আমাকে বলত ঘটি। আমি আজও বাঙাল ভাষায় কথা বলতে পারি, কিন্তু সুরটা ঠিক হয় না। কিছু-কিছু শব্দও রপ্ত করতে পারিনি। যেমন কোনও পূর্ববঙ্গীয় বন্ধু যখন বলত, একটা গর্ত ফাল দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন বুঝতাম না 'লাফ' কী করে 'ফাল' হয়ে গেল? পরে বুঝেছি, 'হ্রদ' ও উলটে 'দহ' হয়ে গেছে, ব্যাকরণে একে অপিনিহিত না কী যেন বলে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় দহ থাকলেও ফাল কথাটা পরিচিত নয় একেবারেই।

চট্টগ্রাম অপূর্ব সুন্দর শহর। নদী, সমুদ্র ও পাহাড় মিলিয়ে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলায় এরকম কোনও শহর নেই, এখানে সমুদ্র থেকে পাহাড় অনেক দূরে, তবে দক্ষিণের বিশাখাপত্তনম বা ভাইজাগ-এর সঙ্গে এর মিল আছে।

মূল অনুষ্ঠানটি ঠিক কবিসম্মেলন নয়, কিন্তু বাংলাদেশের সব অনুষ্ঠানেই তো কবিতা পাঠ একেবারে অবধারিত। নানাজনের কবিতা পাঠের মধ্যে একজন আবৃত্তিকারের কণ্ঠে শামসুর রাহমানের কবিতা যেন নতুন করে ভালো লাগল :

মানুষের হাটে হেঁটে যেতে যেতে
কবি বললেন, আমাকে বাতলে দিন
কবন্ধ এই কপট সমাজে
শিল্পের কাছে তার কতটুকু ঋণ?

কথামালা তার ঢেউয়ের মতই
পাথুরে দেওয়ালে ভীষণ আছড়ে পড়ে
বেলা অবেলায় খঞ্জের মতো
মাথা নীচু করে কবি ফিরে যান ঘরে।

কিন্তু কোথায় এমন আঁধারে
নান্দনিক সে কবির বাড়ির পথ?...

আমার স্মৃতিশক্তি ভালো নয়। তবু কখনও-কখনও কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি হঠাৎ মুগ্ধতায় মনে গেঁথে যায়। এই কবিতাটি আছে সম্ভবত 'স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার' কাব্যগ্রন্থে। সম্ভবত বলছি এই জন্য যে সেই বইটি এখন আমার হাতের কাছে নেই। স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে কিছু ভুল হয়ে গেল না তো? (শ্যামসুর, এই রচনাটি যদি দৈবাৎ তোমার চোখে পড়ে, এবং দ্যাখো যে তোমার কবিতার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আমি দু-একটি শব্দ ভুল করে ফেলেছি, তা হলে নিজগুণে মার্জনা করে দিও ভাই।)

ওই সভাতেই হাসান রাজার একটি গানও আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল :

আমিই মূল নাগর রে
আসিয়াছি খেউড় খেলিতে ভব সাগরে রে।
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব শংকরী
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি।
আমি মূল, আমি কূল, আমি সর্ব ঠাঁই
আমি বিনে এ সংসারে অন্য কিছু নাই...

এই গানের মধ্যে রয়েছে এক স্পর্ধিত আমিত্ব, যা রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে।' কিম্বা 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে'। অবশ্য 'সো অহং' বা আমিই সে তত্ত্বও বহু প্রাচীন। ওই গানটি শুনতে-শুনতে হাসান রাজার জীবনী নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আমার মনে জেগে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাসান রাজার ব্যক্তিগত পরিচয় কখনও হয়নি বোধহয়। সেরকম কোনও তথ্য নেই। যদিও পরিচয় হতে পারত। হাসান রাজা রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র সাত বছরের বড়, তিনি বেঁচে ছিলেন ১৯২২ সাল পর্যন্ত। অবশ্য তাঁর পরিচিতি তখনও সীমাবদ্ধ ছিল সিলেটের একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে। তাঁর গানের সংগ্রহ হাসান উদাস ছাপা হয়েছিল ১৯১৪ সালে। সে বই যে রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি, তার প্রমাণ আছে।

যতদূর জানা যায়, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত নামে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের একটি ছাত্র তার কলেজ ম্যাগাজিনে হাসান রাজার গান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখে। হাসান-ভক্ত এই ছেলেটির সাধ হয়েছিল হাসানের গান রবীন্দ্রনাথের গোচরে আনার। সে উদ্দেশ্যে সে চলে এসেছিল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে দেখা করেন এবং তার কথা শুনে হাসানের আটটি গান পড়ে দেখেন। তিনি বলেছিলেন, মাত্র এই কটি গানে ঠিক সিলেটের কবিটির পরিচয় বোঝা যাচ্ছে না, আরও কিছু লেখা চাই। সিলেটে ফিরে এসে প্রভাতচন্দ্র তার সংগ্রহ থেকে ৭৮টি গান পাঠিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে। সেসব পড়েই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন হাসান রাজার জীবন-ভাষ্য। এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি যে ১৯৩১ সালে অক্সফোর্ডের বিখ্যাত হিউবার্ট লেকচারে হাসানের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন যে "It is a village poet of East Bengal who preaches in a song the philosphical doctrine that universe has its reality in its relation to the person." তারপর থেকেই হাসান রাজা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ জন্মায়।

হাসান রাজা সম্পর্কে আমার সেই পরিকল্পিত জীবনী-উপন্যাস অবশ্য আজও শুরু করতে পারিনি। আমার অক্ষমতা। নিশ্চয়ই অন্য কেউ লিখবে।

চিটাগাঙ থেকে যাওয়া হল কক্সবাজার। বেলাভূমি শহর। আগেও এসেছি। তা শুধু ভ্রমণকারী হিসেবে। এবারে সঙ্গে অনেক বন্ধুমানুষ, বেলাল চৌধুরী, 'অন্যদিন' পত্রিকার সম্পাদক মাজহার এবং জুটেছিল বিশ্ববাউণ্ডুলে কামাল। সমুদ্রে স্পিডবোটে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে বেশ দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল। যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি ছিল, পরে বুঝেছি। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে মোচার খোলার মতন দুলছিল ছোট্ট স্পিডবোট, যে-কোনও মুহূর্তে উলটে যেতে পারত। আমরা তো তবু সাঁতার জানি, স্বাতী তাও জানে না। অথচ ওরই উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই অঞ্চলটি ঝড়প্রবণ, কতবার বিধ্বংসী ঝড়ে কত মানুষের প্রাণ গেছে, নষ্ট হয়েছে বহু বাড়িঘর। সে যাত্রায় দেখেছিলাম, এক-একটা নির্জন দ্বীপে বেমানানভাবে এক-একটি শক্তপোক্ত কয়েক তলার পাকা বাড়ি। শুনলাম, ওগুলি বানিয়ে দিয়েছে বিদেশিরা, ঝড়ের সময় বিপন্ন মানুষদের আশ্রয়ের জন্য। ওই স্টার্ম-শেলটারগুলি দেখে কিশোরপাঠ্য কাকাবাবুর একটি অভিযান-কাহিনি লেখার চিন্তা

আমার মাথায় আসে।

কক্সবাজারে আমরা উঠেছিলাম একটা হোটেলে। কী করে যেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট খবর পেয়ে গেলেন, আমাদের নিয়ে এলেন সরকারি বাংলোয়। এবং মাত্র একদিনের নোটিশে আয়োজন করে ফেললেন এক কবিসম্মেলনের। ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় একজন কবিতাপ্রেমিক। নিজেও লেখেন বোধহয়। তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশে ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, বিচারপতি, এরকম অনেকেই কবি। শুধু বোধহয় দুঁদে রাজনীতিবিদরাই কবিতার ধার ধারেন না। আহা, ওঁরাও যদি কবিতা লিখতেন, তা হলে দেশের হাওয়া হয়তো কিছুটা নরম হত।

একদিনের নোটিশেই কুড়ি-পঁচিশজন কবি এসে পড়ল কবিতা পড়তে। এমনিতে মনে হয়, এটা পর্যটক আর ব্যাবসাবাণিজ্যের শহর। তবু স্থানীয় মানুষদের মধ্যেও এত কবি! অনেকেরই ছাপা কবিতার বইও আছে। কে কেমন লিখেছে সেটা বড়ো কথা নয়, যারা কবিতা লিখতে চায়, যারা কাগজ-কলম নিয়ে নিভৃতে কবিতার ধ্যানে বসে, তাদের সবাইকেই আমার আত্মীয় মনে হয়।

অন্ধকার নদীই প্রধান শ্রোতা

একসময় যুগোস্লাভিয়া নাকে একটি দেশ ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের সময় এ দেশটা কয়েক টুকরো হয়ে যায়।

ম্যাসিডোনিয়া নাম শুনলেই আমাদের আলেকজান্দার-এর কথা মনে পড়ে। সেই ম্যাসিডোনিয়ার একটি অংশ তখন যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে। প্রায় আমাদেরই মতন গরিব দেশ, কোনও কোনও ব্যাপারে বেশ গরিব, আবার কোনও কোনও ব্যাপারে নিয়মশৃঙ্খলা অনেক ভালো। গরিব সাহেব দেখতে হলে তখন এইরকম কয়েকটি দেশে যেতে হত, যেখানে তাদের মাংস জোটে না, দুধ ছাড়া শুধু বরফের গুঁড়োর ওপর সিরাপ ছড়িয়ে আইসক্রিম হিসেবে চুষে চুষে খায়।

এইসব গরিব দেশের মানুষগুলো কিন্তু কবিতা ভালোবাসে খুব। রুমানিয়ায় আমি নতুন কবিতার বই লোকদের লাইন দিয়ে কিনতে দেখেছি। প্রকাশের প্রথম দিনেই।

ম্যাসিডোনিয়ার সেই অংশে প্রতি দু-বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হত বিশ্ব কবিসম্মেলন। আমাদের হলদিয়া কিংবা ঢাকার বিশ্ব কবিসম্মেলনের মতো নয়, সত্যি-সত্যি পৃথিবীর বহু দেশ থেকে প্রধান কবিরা তাতে যোগ দিতেন। আমি যে বছর যাই, সেবারে দুজন অন্তত বিশ্ববিখ্যাত কবি, আমেরিকা ও রাশিয়া থেকে অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এবং আন্দ্রেই ভজ্‌নেসনস্কি এসেছিলেন।

জাগ্রেব নামে একটা ছোট্ট শহরে সেই কবিসম্মেলনের কেন্দ্র। শতাধিক কবি এসেছেন, থাকার ব্যবস্থা একটা ব্যারাকের মতন মস্ত বাড়িতে। ব্যবস্থা খারাপ নয়, প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর, সৌখিনতা কিছু নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য খুবই খারাপ। কুপন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা দেখিয়ে একটা ক্যান্টিনে বাঁধাধরা খাবার খেতে হয়, অধিকাংশ খাবারই বিস্বাদ, মুখে দেওয়া যায় না। কিন্তু নিজে আলাদা পয়সা দিলে অন্য খাবার আসে। এই তুলনায় হলদিয়া সারা ভারত কবিতা উৎসবের খাদ্য অনবদ্য।

ভারত থেকে আমি একলা হলেও বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন দুজন কবি। তাঁদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা যায়। অ্যালেন গিন্‌সবার্গ আমার পুরোনো বন্ধু, তখন নানান জায়গায় দাবি তোলা

হয়েছে, তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক। শোনা যাচ্ছিল যে বারবার পুরস্কার কমিটিতে তার নাম প্রস্তাবিত হলেও তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে একটি কারণে, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ প্রকাশ্যভাবে সমকামী। নোবেল কমিটি নাকি এসব নৈতিক বিচারও করে।

অ্যালেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ভজ্‌নেসেনস্কির। তিনজনেই আড্ডা দিতাম বেশিরভাগ সময়। ইয়েফতুশেংকো আর ভজ্‌নেসেনস্কি, এই একজোড়া কিশোর কবি ষাটের দশকে রাশিয়ায় হঠাৎ খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পরে ইয়েফতুশেংকো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, ভজনেসেনস্কি একজন প্রধান কবি হিসেবে গণ্য। ভজ্‌নেসেনস্কি আমাকে বলল, তার খুব ভারতে আসার ইচ্ছে। কিন্তু কেউ নেমন্তন্ন করে না।

বিদেশের এই ধরনের কবিসম্মেলনে আড্ডাটাই তো প্রধান। সেই টানেই যাওয়া। এবং পারিপার্শ্বিক কিছু ঘুরেটুরে দেখা। দিনেরবেলা ওগরিদ নামে একটা হ্রদে নৌকোবিলাস হল। সেই হ্রদেরই মাঝখানে ভাসমান বল দিয়ে দিয়ে অন্য দেশের সীমারেখা টানা। ওপাশের দেশটি আলবেনিয়া। তখন সে দেশ ছিল অতি উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট, এখন ধর্মীয় মৌলবাদী! মানুষ কী বিচিত্র!

এই ম্যাসিডোনিয়ার কবিসম্মেলনের মঞ্চটি একেবারে অভিনব। এরকম আর কোনও দেশে দেখিনি।

শহরের প্রায় মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটি খরস্রোতা নদী। বেশি চওড়া নয়। ধরা যাক আমাদের রেড রোডের থেকেও একটু ছোট। জল খুব স্বচ্ছ। দিনেরবেলা একটা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখেছি, ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ ছুটে যাচ্ছে। এখনকার বাংলাদেশ যখন পূর্ববঙ্গে ছিল, তখন সেখানকার নদীগুলি মাছের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সেখানেও আমি কখনও কোনও নদীতে এরকম হাজার-হাজার মাছের ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দেখিনি। মাঝে-মাঝে এরকম দেখা যায় বটে ডিসকভারি চ্যানেলে, তাও সমুদ্রে।

সেই সেতুটিই কবিতা পাঠের মঞ্চ।

পরপর কয়েকদিনই কবিসম্মেলন শুরু হয় রাত সাড়ে আটটার পর। সারাদিন ভ্রমণ ও সেমিনার ইত্যাদি। ওদের ওখানে নাকি রাত্তির ছাড়া কবিতা পাঠ জমে না।

সেতুটাকে নানারকম রঙিন কাপড়ে মুড়ে বানানো হয়েছে মঞ্চ। জ্বালানো হয়েছে বড় বড় বাতি। দর্শক বা শ্রোতাদের বসবার জায়গার কোনও ব্যবস্থা নেই। নদীর দু'পারে চমৎকার কার্পেটের মতন ঘাস। সবাই এসে বসেছে সেই ঘাসের ওপর। সঙ্গে বিয়ারের বোতল কিম্বা লাল-সাদা ওয়াইনের (ওসব দেশে হুইস্কি অতি দুর্লভ ও দুর্মূল্য) এবং সসেজ ও আলুভাজা। কেউ বসেছে তার সঙ্গিনীর কোলে মাথা রেখে, কেউ অন্যের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে।

যখন কোনও কবির কবিতা পাঠ করার কথা, তখন সেই মঞ্চে আর কেউ থাকবে না। ঘোষণাটোষণা সব আড়াল থেকে। একটা সেতু তো স্টেজ হিসেবে বেশ বড়ই। তার ঠিক মাঝখানে একজন মাত্র মানুষ। তিনি কবি, তিনি অনন্য।

আমি আমার পাঠের সময়ে দেখি, সামনে কোনও মানুষ নেই, শুধু চলমান নদী, তার জল চিকচিক করছে। দুই তীরের শ্রোতাদের স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। অস্পষ্ট রেখাচিত্রের মতো। কেউ কোনও কথাবার্তা বলা বা শব্দ করছে না।

সুতরাং মনে হল, আমি যেন আকাশের নীচে একা দাঁড়িয়ে শুধু এই নদীকেই কবিতা শোনাচ্ছি। কেমন যেন মদির অনুভব।

শেষ হবার পর হাততালির শব্দে সেই ঘোর ভেঙে যায়।

প্যারিসে কবিতার আসর

পৃথিবীতে স্বদেশের বাইরে আমি সবচেয়ে বেশি গেছি ফরাসি দেশে। কতবার? তা আর গোনাগুনতি নেই। অন্তত কুড়িবার তো হবেই।

প্রথমবার গিয়েছিলাম, বহু বছর আগে, সেই উনিশশো চৌষট্টি সালে। তার আগের বছরেও অবশ্য প্যারিস বিমানবন্দরে কাটিয়েছিলাম কয়েক ঘণ্টা, শহরের মধ্যে ঢুকিনি। বিমানবন্দরে বসেই বহু কবিতা, গল্প-উপন্যাস ও শিল্পীদের জীবনীতে পড়া ফরাসি দেশকে জানলা দিয়ে দেখার মতন দেখেছিলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। যদিও পৃথিবীর সব এয়ারপোর্টই প্রায় একই রকম দেখতে, তা দেখে সে দেশের কিছুই বোঝা যায় না।

পরের বছরে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে প্যারিসে ঘুরে ছিলাম আমার ফরাসি বান্ধবী মার্গারিটের সঙ্গে। ফরাসি ভাষা না জেনে সে দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ালে বাঁশবনে ডোম কানার মতন অবস্থা হয়, সেখানে কোনও বাঙালিবন্ধু থাকলে তবু খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়। সেবারে ছিলাম প্রায় একমাস, একজনও বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। একজন খাঁটি ফরাসি মেয়ে আমার সঙ্গিনী ও পথপ্রদর্শিকা ছিল বলে, সে দেশটি জানতে ও বুঝতে আমার অনেক সুবিধে হয়েছিল, খানিকটা উঁকি মারার সুযোগও হয়েছিল ফরাসি সমাজের অন্দরমহলে।

এ বিষয়ে আমি আগে বিস্তারিতভাবে লিখেছি বলে এখন আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। এরপর মার্গারিট অকস্মাৎ আমার জীবন থেকে, এবং পৃথিবী থেকেও হারিয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম, ও দেশে আর কখনও আমার পা দেওয়ার সুযোগ হবে না। হয়তো আর বিদেশও যাওয়া হবে না।

অনেক বছর বাদে, উনিশশো একাশি সালে আনন্দবাজার অফিসে একজন লম্বা মতন অচেনা যুবক এসে দাঁড়াল আমার টেবিলের সামনে। তার নাম অসীমকুমার রায়, পরিচয় দিয়ে বলল, সে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, থাকে প্যারিসে। অনেকদিন প্রবাসী হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার টান আছে। সে শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করতে আসেনি, এসেছে লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে, আনন্দবাজার তখন ছিল লেখকদের ডিপো।

অসীমের ভাষা কাঠ-কাঠ ধরনের, দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে থাকে। কিন্তু তার বক্তব্য স্বার্থহীন। তার ধারণা, বাঙালি লেখকদের ঘরকুনো হয়ে বসে না থেকে, বাইরে বেরুনো উচিত। শুধু নিজের দেশ নয়, বিদেশেও চেনা দরকার। অন্যদেশের লেখকেরা কত ঘোরাঘুরি করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। আমাদের কোনও বন্ধুবান্ধব যদি ফরাসি দেশ দেখতে চায়, তা হলে প্যারিস শহরে ওর একটা বাড়ি আছে। সেখানে আতিথ্য দিতে পারে। এই আমন্ত্রণের কথা শুনে আমাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে পূর্ণেন্দু পত্রী সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু তত উৎসাহ দেখাইনি। যদিও প্যারিসের মতন শহরে থাকার জায়গা পাওয়াই খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, হোটেল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু প্লেন ভাড়ার টাকা কে দেবে? সে টাকা আমার নেই। তা ছাড়া প্যারিস আমার দেখা আছে ভালো করে।

আশ্চর্য ব্যাপার। পরের বছরই আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি আমন্ত্রণ

পেলাম। স্বাতীও সঙ্গে যেতে পারবে। স্বাতীর কিন্তু আমেরিকার চেয়েও ফরাসি দেশ দেখার আগ্রহ অনেক বেশি, ও ফরাসি ভাষা শিক্ষার ক্লাস করেছে কয়েক বছর, ফরাসি কালচারের ভক্ত। আমেরিকায় যাওয়ার পথে ফরাসি দেশে ব্রেক জার্নি করে যাওয়া যায়, যেতে অতিরিক্ত খরচ লাগে না, আর থাকার জায়গার জন্য তো আমন্ত্রণ আছেই।

সেবারে প্যারিসে গিয়ে অসীম রায়ের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর তার সঙ্গে সারাজীবন বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর থেকে আমি যে-কোনও দেশেই যাই, মাঝে মাঝে বা ফেরার পথে টুপ করে একবার নেমে পড়ি প্যারিসে। মস্কো যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম, তার সঙ্গে ফ্রান্সের কোনও সম্পর্কই নেই, তবে চলে গেলাম প্যারিসের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। এসব কাহিনিও আমি 'ছবির দেশে, কবিতার দেশে' বইতে লিখে ফেলেছি।

সে বইতে অবশ্য ফরাসি দেশে শেষ কবিসম্মেলনে কথা লিখিনি।

কয়েকবার প্যারিসে যাওয়ার পথেই সেখানকার বাঙালিদের কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। বাঙালিরা সংখ্যায় কম, কিন্তু ঘন নিবদ্ধ একটি গোষ্ঠী আছে। যেমন অসীমের বিশেষ বন্ধু ভূপেশ দাশ, পেশায় বিজ্ঞানী, কিন্তু প্রচুর বাংলা কবিতা মুখস্থ, এখনকার বাংলা সাহিত্যও নিয়মিত পাঠ করে। প্রখ্যাত শিল্পী শক্তি বর্মন, তবু বাংলা সাহিত্যের পাঠক। ইউরোপের কর্তাব্যক্তি বিকাশ সান্যাল এবং তাঁর স্ত্রী প্রীতি সান্যাল, দু'জনেই বাঙালি লেখকদের খাতির-যত্ন করেন, প্রীতি সান্যাল তো এখন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা ও ভ্রমণের বই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম দশ-পনেরো বছর ফরাসি দেশে গেছি বারবার, কিন্তু কোনওবার ফরাসি সরকার বা কোনও সংস্থার আমন্ত্রণে নয়, গেছি বন্ধুদের জন্যে। সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিকের প্রতি মুগ্ধতা তো আছেই।

প্রথম একবার আমন্ত্রণ পেলাম, দক্ষিণ ফ্রান্সের এক শহরের মেয়রের কাছ থেকে। উপলক্ষ্যটি বিচিত্র। সেই শহরের মেয়র ও তাঁর পত্নী, বিশেষত মেয়র-গিন্নিই সত্যজিৎ রায়ের দারুণ ভক্ত। ওঁদের উদ্যোগে সেই শহরে সত্যজিৎ রায়ের একটি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বিজয়া রায়, সস্ত্রীক সপুত্র সন্দীপ রায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এবং যেহেতু সত্যজিতের অধিকাংশ চলচ্চিত্র বাংলা ভাষায়, তাই কয়েকজন বাঙালি লেখক ও কবিকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী ও আমাকে। এর মধ্যে আমার দাবি একটু বেশিই ছিল, কারণ সত্যজিৎ রায় আমারও দুটি উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপ দিয়েছিলেন।

সেখানে খুব আদর-যত্ন, খাওয়া-দাওয়াই বেশি হয়েছে, এবং বেড়ানো। বক্তৃতা যৎসামান্য।

প্যারিস শহরে ফিরে আসার পর কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য দিয়েছিলেন ফরাসি সরকার। সেই প্রথম স্বাতী ও আমি প্যারিসের হোটেলের ছিলাম, সরকারি পয়সায়। মোটেই ভালো লাগেনি। বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে পালিয়েছিলাম দু'দিন পরে।

ততদিনে আমি জেনে গেছি, এককালের কবিদের তীর্থস্থান ফরাসি দেশে এখন কবিতার কদর খুব কমে গেছে। তরুণ কবিদের কবিতার বই ছাপা খুব শক্ত ব্যাপার, আমাদের দেশের মতন। প্রকাশক হাসতে-হাসতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তরুণ কবিদের বই পয়সা নিয়ে ছাপা হলেও কীভাবে তাদের ঠকানো হয়। সেভাবে ঠকে গিয়েও এখনও অনেকে কবিতা লেখে। কবিরা অদম্য।

প্যারিসে একটি কবিতা-ভবন আছে। তার নাম মেইজো দ্য পোয়েজি। তার পরিচালক ফিলিপ শ্যামবেয়ারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার ডাকে একদিন গিয়েছিলাম সেখানে। দেখলাম, কবিতা-ভবনটির বেশ দুর্দশা। কোনওক্রমে টিমটিম করে চলেছে। কবিতা পাঠের আসরে পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি শ্রোতা পাওয়া যায় না। এরকমভাবে চললে কবিতা ভবনটির দ্বার শিগগিরই রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেই টিমটিমে অবস্থার কোনও উন্নতি হয়েছে কি না জানি না।

ইউনেস্কোর বিকাশ সান্যাল একসময় ভারত ভবনের (মেইজোঁ দ ল্যান্ড) পরিচালক হলেন। তিনি ইউনেস্কোরও উপদেষ্টা রইলেন, আবার ভারত ভবনেরও দেখাশুনো করতে হয়। ভারত ভবনে

বিশিষ্ট গবেষক ও অতিথিদের থাকার জন্য অনেকগুলি ঘর আছে, এবং আছে একটি মাঝারি আকারের সভাঘর। এই সভাঘরে মাঝে-মাঝে গানবাজনা, বক্তৃতা, কবিতা পাঠের আয়োজন হয়। বলাই বাহুল্য, এই কবিতা পাঠের ব্যবস্থা শ্রীমতী প্রীতি সান্যালের আগ্রহাতিশয্যে। বিকাশের আদি নিবাস ময়মনসিংহ-এ, কিছুদিন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, তারপর বহুকাল প্যারিসবাসী। আর প্রীতি সান্যাল বহরমপুরের মেয়ে, স্বদেশে পড়েছেন কিছুদিন, এখন ফরাসি দেশে স্থায়ী হয়ে সেখানকার ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রেখেছেন নিবিড়ভাবে। এই দম্পতিকে ওখানকার বাঙালিরা, অবাঙালি ও অনেক ফরাসিও রাজযোটক হিসেবে গণ্য করে। প্রীতি ওদেশে চাকরি নেননি, কিন্তু নিছক গৃহবধূ হয়েও বসে থাকেননি। স্বামীর সঙ্গে প্রীতি এই পৃথিবীর কত যে দেশভ্রমণ করেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। আমি মাঝে-মাঝে নিজেকে বিশ্বভ্রমণকারী হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসি। কিন্তু প্রীতি আমার চেয়েও অনেক বেশি দেশ ঘুরেছেন। এমন এমন সব ছোটখাট দেশও, যেসব জায়গায় আমার পদার্পণ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। প্রীতি শুধু দেশ দেখেন না, সেসব দেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করারও সহজাত ক্ষমতা আছে তাঁর। তার পরিচয় আছে প্রীতির বিভিন্ন কবিতা ও ভ্রমণ রচনায়।

প্রীতি-বিকাশের আমন্ত্রণে আমি প্যারিসের ভারত ভবনের কবিতা পাঠের আসরে অংশ নিয়েছি দুবার। প্রথমবার উপস্থিত ছিলাম শামসুর রাহমান আর আমি। শামসুর রাহমান অন্যান্য দেশ ঘুরে দেখলেও প্যারিসে আগে কখনও আসেননি, স্বভাবতই প্যারিস দেখার খুব শখ ছিল। তাঁকে আনিয়েছিল বাংলাদেশিরা, তিনি এসে উঠেছিলেন আহরামের বাড়িতে। আমরা যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসে পশ্চিমবঙ্গে বসতি নিয়েছি, আহরামও তেমনি পশ্চিমবাংলায় লেখাপড়া করে তারপর চলে যায় বাংলাদেশ। সুতরাং আমাদের দুজনের বেশ মিল আছে। আহরাম চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। বাংলাদেশের তথ্যচিত্র তৈরি করেছে। আহরাম ও তার স্ত্রী দুজনেই খুব অতিথিবৎসল।

সেবারে প্যারিসে পৌঁছেই শামসুর রাহমান খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিকেলে আহরামের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কবিতাপাঠের দিনও সবাই শামসুর-এর স্বাস্থ্যবিষয়ে খুব উদ্‌বিগ্ন ছিল। পরে অবশ্য শামসুর অনেকটা সামলে নিয়ে নিরাপদেই ফিরেছিলেন।

এবারে (২০০৫) আমাদের বিদেশযাত্রার আগেই প্রীতি সান্যাল ফোন করে জানিয়েছিল যে প্যারিসে একটি কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। তবে শুধু বাংলা কবিতা নয়, ফরাসি কবিও থাকবেন দুজন। তাঁদের কবিতা অনুবাদ করা হবে বাংলায়। আর বাংলা কবিতা ফরাসিতে।

আমি আগে কখনও অস্ট্রিয়া যাইনি। স্বাতী বলেছিল, একবার অন্তত ভিয়েনা শহর না দেখলে এবং সেখানে গিয়ে কনসার্ট না শুনলে ওর জীবনটাই বৃথা। সুতরাং শিকাগো ও ভ্যাঙ্কুবারে দুটি আমন্ত্রণ রক্ষা করার আগে প্যারিসে নেমে ভিয়েনা যেতেই হবে। প্যারিসে আর কোনও সঙ্গী পাওয়া গেল না। সুতরাং আমরা দুজনেই উড়ে চলে গেলাম। ভিয়েনায় গিয়ে স্বাতীর অনেকটাই আশা মিটল, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহের বাড়িতে একটি দিন কাটিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত পাওনা।

ফেরার পরের দিনই প্যারিসে ভারত ভবনে সেই কবিতা পাঠের আসর। বিকাশের ব্যবস্থাপনা নিখুঁত। আর প্রীতি খানিকটা ছটফটে স্বভাবের হলেও তাকে খাটতে হয়েছে অনেক। নির্বাচিত শ্রোতাদের ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানানো থেকে শুরু করে ফরাসি কবিতার বাংলা অনুবাদ প্রস্তুত রাখা পর্যন্ত। মঞ্চসজ্জা ও জলখাবারের ব্যবস্থা এবং আসরের শেষ কবি ও ঘনিষ্ঠজনদের পানাহারের বন্দোবস্ত নিজেদের কোয়ার্টারে। এইসব কাজে প্রীতিকে সহায়তা করেছে দুই তরুণ-তরুণী। ছেলেটির নাম ধৃতব্রত ভট্টাচার্য। তার ডাকনাম তাতো। সে নামেই সে বেশি পরিচিত। সে এখনও পড়াশোনা করছে, ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্য তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও তার প্রবল উৎসাহ। মেয়েটির নাম সুমনা সিন্‌হা, তাকে কলকাতাতেই আগে আলিয়াঁস ফ্রাসেজের ছাত্রী হিসাবে দেখেছি। বাচ্চা বয়স থেকেই তার স্বপ্ন ছিল ফরাসি দেশে যাবেই যাবে। সেই তীব্র আকাঙক্ষার সঙ্গে যোগ্যতা অর্জন করে সে পৌঁছে

গেছে প্যারিসে। শুধু তাই নয়, এখন সে ফরাসি ভাষার অন্যতম প্রধান কবি লিওনেল রে-র স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান প্রায় চল্লিশ বছর, তা একটুও বিসদৃশ মনে হয় না।

এই কবিতা পাঠের আসরে কবি মাত্র চারজন। আমাদের কলকাতায় কিংবা বাংলাদেশে যেমন এক সন্ধ্যায় তিরিশ-চল্লিশ জন কবির কবিতা পাঠের ব্যবস্থা থাকে, অন্য কোনও দেশে সে প্রথা নেই। একসঙ্গে অতজন কবির নানা ধরনের কবিতা শুনলে অনেক কিছুই মর্ম স্পর্শ করে না। অন্যান্য দেশে এক আসরে বড়োজোর পাঁচ-ছ'জনের কবিতা পাঠ হয়।

এখানে চারজনের মধ্যে দুজন ফরাসি। লিওনেল রে এবং জিনো বিয়ানু। দ্বিতীয়জনও সুখ্যাত। আর বাংলা কবিতার হয়ে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আমি। বিপ্লবী বাঘাযতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্র দীর্ঘকাল ফ্রান্সবাসী, প্রচুর বাংলা কবিতার অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশ করেছেন, নিজেও দু'ভাষাতে কবিতা রচনা করেন।

শ্রোতারা সুনির্বাচিত। শিক্ষিত-সংস্কৃতিমনা এইসব মানুষ শুধু কবিতা শুনতেই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ফরাসিও আছেন। এইরকম সংবেদনশীল শ্রোতাদের সামনে কবিতা পাঠ করার সময় গলার আওয়াজটা ভালো হয়। অনুষ্ঠানের শেষে বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী আমার সঙ্গে আলাপ করতে এল, তারা সবাই বাংলাদেশি, কবিতার টানে এসেছে অনেক দূরদূরান্ত থেকে।

একবার বাংলা কবিতা, তারপর তার ফরাসি অনুবাদ, আর ফরাসি কবিতার পর বাংলা অনুবাদ পাঠ করা হল বেশ সুষ্ঠুভাবে। অনুবাদগুলি পাঠ করলেন প্রীতি সান্যাল, ধৃতব্রত, সুমনা এবং আরও দু-একজন। আমার পক্ষে খুব শ্লাঘার বিষয় এই যে জিনো বিয়ানু (Zeno Bianu) তাঁর নিজের কবিতার পর আমার একটি কবিতার ফরাসি অনুবাদও পড়ে শোনালেন। কোনও একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি কি অন্য কারুর কবিতা পাঠ করতে চান? এই মানুষটি অতি ভদ্র। আর পৃথ্বীন্দ্রও আমার একটি নারী-বিষয়ক কবিতা অনুবাদ করেছেন। সেটা তিনি নিজেই পাঠ করলেন। আর কোনও কারণে নয়, ওই চারজনের মধ্যে আমিই একমাত্র বহিরাগত বলে বোধহয় খাতির পেলাম একটু বেশি। তাই অনুষ্ঠানের শেষ দিকে কয়েকজনের অনুরোধে আমাকে কয়েকটা বেশি বাংলা কবিতা পড়তে হল।

লিওনেল রে (Lionel Ray) গঁকুর পুরস্কার ও আরও বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবীণ কবি, তিনি গত বইমেলায় কলকাতাতেও এসেছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। তাঁর একটি কবিতার সামান্য নিদর্শন সুমনার অনুবাদে :

এই আমি আমি নই
নামগোত্রহীন রাতে এই মুখোস
এই স্বর যা বেড়ে ওঠে নদীর মতো
এই পা যেলাও আমার নয়।
ন্যুন পাথর বাতাসের এই
দেশে আমরা একা
কথোপকথনের এই বিশাল ভস্মস্তূপে
এই ঘূর্ণি আয়নায়।
তুমি কে তুমি যে-ই হও
আমার রাস্তা জুড়ে এই মৃতদেহ
রক্ত আর ছায়ায় কী এই জিনিস
যা স্পন্দ্যমান যা স্থির,

তুমি বেঁচে আছ তোমার থেকে দূরে
কী এই মুখাবয়ব, অনুপস্থিত
এই অপরিচিত যাকে তুমি বয়ে চলো
আর যে দাঁড় টানে প্রতিকূল স্রোতে...

জিনো বিয়ানু বয়েসে অপেক্ষাকৃত তরুণ। লিওনেল রে যেমন এ একেবারেই ইংরেজি বলতে পারেন না। আগের প্রজন্মের ফরাসিরা ইংরেজি জানলেও ইচ্ছে করে বলতে চাইতেন না, তেমন হতে পারে, সেই তুলনায় জিনো বিয়ানু ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দ। তাঁর একটি অংশ, প্রীতি ও ধৃতব্রতের যুগ্ম অনুবাদে :

হ্যাঁ
সে বলেছিল
হয়তো হতাশা নেই
অথবা
মৃত্যু শুধু অনুপ্রভা
শূন্য স্থান
অন্য নিঃশ্বাসে

বলছিল
ক্ষিপ্র গতিতে ছোটো
পৃথিবীর ভস্মতলে
মুহূর্তের আলপথ ধরে
যেখানে শব্দ উৎসারিত

পালাও
এক অনুপলে
কেন্দ্র পরিধিতে
আরও বলেছিল
সবই ঝুলন্ত
জন্ম আর পতনের মধ্যে
নৈঃশব্দ্য আঁকো
জাদুমন্ত্রের কুঠুরিতে
খোঁজো
খুঁজে ফেরো
কেন না ঈশ্বর
আর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন না...

অনেক দেশের বড়-বড় কাব্যসভার তুলনায় প্যারিসের এই কবিতা পাঠের আসর অনেক বেশি আন্তরিক ও স্মরণীয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশে কবিতা

আমার বাড়িতে একটা কমপিউটার আছে বটে, কিন্তু তার সামনে আমার প্রায় বসাই হয় না। যদিও এই আশ্চর্য যন্ত্রটি বিষয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই।

কমপিউটারের মধ্যে রয়েছে এক বিশাল আশ্চর্য জগৎ, যার নাম ইন্টারনেট। এই অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার কে বা কারা এর মধ্যে জমা করে রাখে? কিছুদিন আগে লিলিথ নামে বাইবেল-পূর্ব এক রমণী বিষয়ে কিছু তথ্য জানার দরকার হয়েছিল। কয়েক বছর আগে হলে লাইব্রেরিতে গিয়ে কত বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হত। এখন ঘরে বসে, কমপিউটারকে জিজ্ঞেস করতেই ফরফর করে পাতার পরে পাতা তথ্য বেরিয়ে এল। কটা লোকই বা লিলিথ সম্পর্কে আগ্রহী? তবু কে এত তথ্য জুগিয়ে রাখে?

আমার মুশকিল এই, সকালবেলা একবার লেখার টেবিলে বসলে আর উঠে গিয়ে কমপিউটারের টেবিলে বসা হয় না। আর একবার কমপিউটারের টেবিলে প্রথমেই বসলে আর উঠে আসা যায় না লেখার টেবিলে। আমার দুর্ভাগ্য এই, আমাকে সারাবছর প্রায় প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু লিখতে হয়। তাই কমপিউটার উপেক্ষিত থাকে।

কিন্তু এখন অধিকাংশ চিঠিও তো আসে ই-মেইলে। ডাকে চিঠি আসা অনেক কমে গেছে। স্বাতী মাঝে-মাঝে কমপিউটারে বসে ই-মেইল চেক করে। কিংবা আমার বাড়িতে কমপিউটার জানা বর্ণালি রায় নামে একটি মেয়ে মাঝে-মাঝে আসে। সে আবার 'যাপন চিত্র' নামে একটি উচ্চাঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। তাকে বলি, আমার ই-মেইলগুলো খুলে দেখে দাও তো।

এ বছর অগস্ট মাসে, বর্ণালি আমার বাড়ির কম্পিউটারে বসে বলল, সুনীলদা, নিউজিল্যান্ড থেকে আপনার একটা কবিসম্মেলনের আমন্ত্রণ এসেছে। বেশ বড় চিঠি।

রন রিডেল (Ron Riddell) নামে একজন লিখেছে, গত বছর থেকে নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন শহরে একটি আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলন শুরু হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্বে সেখানে আমার আমন্ত্রণ।

কী করে এই ভদ্রলোক আমার ই-মেইল ঠিকানা জানলেন?

পরবর্তী চিঠিতেই সেটা পরিষ্কার হল।

চার বছর আগে আমি গিয়েছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়াতে মাদলেইন শহরে একটি আন্তর্জাতিক কাব্য উৎসবে যোগ দিতে। মাদলেইন ছোট শহর, কিন্তু সেখানকার কাব্য উৎসবটি সত্যিকারের আন্তর্জাতিক এবং আমি এত বিশাল আয়োজনের কবিতাকেন্দ্রিক উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি। অন্তত আশিটি দেশের শতাধিক কবি এসেছিলেন সেখানে, উৎসব চলেছিল বারো দিন ধরে। সে উৎসবের কথা অন্য কোনও সময়ে লেখা যাবে।

সেই উৎসবে রন রিডেলও এসেছিলেন নিউজিল্যান্ড থেকে এবং তিনি আমাকে মনে রেখেছেন। এখানে আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি কিন্তু তাঁকে মনে রাখতে পারিনি। সেখানকার অনেকেই পরে আমাকে বৈদ্যুতিন চিঠিপত্র লিখেছে, উত্তর দেওয়া হয়নি আমার। গদ্য লেখা যে আমার সময় অনেকটা খেয়ে নেয়।

আমি রন রিডেল-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম দুটি কারণে। যে-দেশ দেখিনি, সে-দেশে যাওয়ার যে-কোনও সুযোগ পেলেই আমি লাফিয়ে উঠি। ইহজীবনে পৃথিবীর বহু দেশই ঘুরে এসেছি বটে, তবু এখনও বলতে ইচ্ছে হয়, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!

কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করে এসেছি খুব ভালোভাবে। কিন্তু তখন নিউজিল্যান্ড যাওয়া হয়নি। এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।

দ্বিতীয় কারণ, সময়টা আমার পক্ষে খুবই সুবিধেজনক।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার মাসগুলিতে শারদীয় সংখ্যার গল্প-উপন্যাস লিখতে-লিখতে একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। মাথার মধ্যে শুধু গজগজ করে গদ্য, অন্য কিছুই তখন উপভোগ করা যায় না। টানতে হয় প্রায় শরৎকাল পর্যন্ত। তার মধ্যে বিদেশ যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। দু-একবার এইরকম সময়েও যেতে হয়েছে, তখন দেখেছি, গদ্যময় মস্তিষ্কে ভ্রমণ কিংবা কাব্য কোনওটাই ঠিক উপভোগ করা যায় না।

দেশ পত্রিকায় উপন্যাস জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পরেও যে চরম শেষ তারিখ, নিউজিল্যান্ডের কবিতা উৎসব শুরু হবে তার ঠিক তিনদিন পরে। অর্থাৎ এটা যেন অনেক পরিশ্রমের পর একটা বিশেষ পুরস্কার। মুক্ত মনে উপভোগ করার মতন ছুটি।

কলকাতা থেকে আকাশপথে লন্ডন যেতে লাগে সাড়ে দশ ঘণ্টা, নিউজিল্যান্ড তার থেকেও দূরে। সিঙ্গাপুর যেতে চার ঘণ্টা, তারপর সেখান থেকে আবার সাড়ে ন'ঘণ্টা। মাঝখানে সিঙ্গাপুরে অপেক্ষা করতে হয় অনেক ঘণ্টা, অর্থাৎ প্রায় দেড় দিন লেগে যায়।

নিউজিল্যান্ডের নাম শুনলেই সবাই বলে, দেশটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, প্রকৃতির দিক থেকে সুন্দর তো বটেই, ছোট ছোট পাহাড়, প্রচুর গাছপালা আর চারদিকে সমুদ্র। এরকম সুন্দর জায়গা পৃথিবীর অন্যত্রও আছে। আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য এই, গোটা দেশটাই এরকম। কোথাও রুক্ষতা নেই।

নিউজিল্যান্ডের অন্য বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষগুলি ভারী ভদ্র ও খোলামেলা, গোটা দেশে আমি একজনকেও কখনও কর্কশ ব্যবহার করতে দেখিনি। শুধু আমার সঙ্গে নয়, পথেঘাটেও শুনিনি। একটা দেশকে চেনা যায়, সেখানকার ট্যাক্সিচালকদের ব্যবহারে। নিউজিল্যান্ডের ট্যাক্সিচালকরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একটা হোটেলে। এইসব ধনী দেশে পুরোনো আমলের হোটেলগুলিকে পুরোনো চেহারাতেই রেখে দেওয়া হয়, ভেতরের ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। তবু হোটেলটি আমার পছন্দ হল না, কারণ, কোথাও সিগারেট খাওয়ার উপায় নেই এমনকি নিজের ঘরে বসে লুকিয়েও খাওয়া যাবে না। স্মোক অ্যালার্ম দেওয়া আছে। আর দরজার গায়ে লেখা আছে, তোমার যদি খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে করে ঘরের মধ্যে, টানো। তাহলে তোমার এই ঘরের দেওয়ালের আবার রং করা, বিছানায় চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি বদল করার খরচ দিতে হবে। দেখেই আক্কেল গুড়ুম। সে খরচ কত কে জানে। সিঙ্গাপুরে বিমানবন্দরের মধ্যেই একটা হোটেলে রাত কাটাতে হয়েছিল, সে ঘরে সরাসরি লেখা আছে, ধূমপানের জরিমানা চার হাজার ডলার!

নিউজিল্যান্ডের এই কাব্য-উৎসবটি সবেমাত্র শুরু হয়েছে এক বছর আগে। এইরকম বৃহৎ কর্মকাণ্ড চালাবার মতন পাকা অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। প্রধান পরিচালক রন রিডেল নিজে একজন কবি তো বটেই, খানিকটা আলাভোলা স্বভাবের। দীর্ঘকায় মানুষটির প্রসন্ন মুখখানি দেখলেই বোঝা যায়, এইসব মানুষ যতটা ভাবুক প্রকৃতির, ততটা সংগঠক নয় এবং সেই কারণেই প্রথম থেকে তার সঙ্গে আমার ভাব জমে যায়। সারে টোরেস নামে মহিলাটি তার স্ত্রী না জীবনসঙ্গিনী, তা ঠিক বোঝা গেল না, একসঙ্গে থাকে কিন্তু মহিলাটি তার পদবি বদলায়নি। প্রথম দেখা হতেই সারে এমনভাবে আমাকে সুনীল বলে ডেকে উঠল, যেন আমার সঙ্গে কতদিনের চেনা। কলম্বিয়াতে এর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, অথচ আমার মনে ছিল না এর মুখ।

সারে বরং অনেকটা গোছানো স্বভাবের, সব ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব তার। এই কাব্য-উৎসবে কোনও সরকারি কিংবা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেই, এই দুজনই উদ্যোগ নিয়ে কয়েকটি স্পনসর জোগাড় করেছে, সাহায্য করছে কিছু তরুণ কবি। নিউজিল্যান্ড প্রধানত খেলাধুলোর জন্যই বিখ্যাত, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যও উৎপাদন করে, তবু কিছু অত্যুৎসাহী কাব্যপ্রেমীও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা দেশে। স্বভাবে বাঙালি কবিদের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই, কোথাও প্রত্যেককে দুটি করে কবিতা পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানালেও কয়েকজন চক্ষুলজ্জা বর্জন করে চার-পাঁচটা পড়ে যায়। কেউ-কেউ, আর একটা ছোট কবিতার কথা বলে তিন-চার পাতার কবিতা শোনাতে ছাড়ে না।

কবিতা পাঠের আসর হয় কোনও বড় জায়গায় নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে, কোনও লাইব্রেরিতে বা মিউজিয়ামে বা ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে। এক-একটি অনুষ্ঠানে বড়জোর সাত-আটজন কবি, মোট সময় একঘণ্টা-সোয়া ঘণ্টা। দীর্ঘক্ষণ ধরে কবিতা পাঠের রেওয়াজ এসব দেশে থাকে না, শ্রোতাদেরও সময় নেই। কোনও অনুষ্ঠানেই শ্রোতার সংখ্যা একশো-দেড়শোর বেশি নয়। একটি গ্রন্থাগারে শ্রোতার সংখ্যা ছিল বড়জোর তিরিশজন, অধিকাংশ রমণী, তবে তাদের গভীর মনোযোগ, আগ্রহ ও কৌতূহল টের পাওয়া যায়।

এখানে বলে নেওয়া ভালো, এ দেশে অনেকেই বাংলা ভাষার অস্তিত্বের কথাই জানে না। উপস্থিত কবিদের তালিকায় আমার নামের পাশে লেখা ছিল হিন্দি কবি। আমি পৌঁছে প্রথমেই আপত্তি জানাতে ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিল, ওদের ধারণা ভারতের সব কবিই হিন্দি কবি! সুতরাং প্রত্যেকটি আসরে কবিতা পাঠের আগে আমাকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হত। অনেকেই রবীন্দ্রনাথেরও নাম জানে না, যে দু-চারজন জানে, তাদেরও ধারণা, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতেই লিখেছেন। কেউ-কেউ ঠাকুর উচ্চারণ করে টাগোরে।

বিভিন্ন সময়ে কবিদের সঙ্গে আড্ডা দিতে-দিতে আমাকে সচেতন হতেই হল দুটি ব্যাপারে। এই দুটি ব্যাপারে আমি অন্য সব কবিদের চেয়ে আলাদা। প্রথমত গায়ের রং। আমন্ত্রিত আর সব কবিরাই শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গিনী। আফ্রিকা বা এশিয়ার কোনও দেশ থেকে আর কেউ আসেনি। কালো বা শ্যামলা রঙের আমিই একমাত্র। আর, আমি তো তরুণ কবিটি নই, সকলের চেয়ে আমার বয়েস বেশি। আমার বয়েসি কবিরা বোধহয় হুট করে একা-একা দূর বিদেশে যায় না।

সব কবির কথা তো বলা যাবে না, দু'জন কবির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে একটি সুইডিশ কবির রচনা। তার বয়েস উনচল্লিশ, এখনও তরুণীই বলা যায়, লাজুক ও স্বল্পভাষিণী, কিন্তু তার কবিতা খুবই তেজি। তেজি মানে ঝাঁজালো নয়, বাস্তব ও পরাবাস্তবতার মিশ্রণে দুঃসাহসিনী। তার নাম কেরিন বেলসান, সে উপন্যাস লিখেও নাম করেছে। তার কবিতার কয়েকটি লাইন :

She is your window now : perhaps you can see heaven
Through that window
Perhaps you are flying—
I wish for nothing higher
You kiss my madness once more
Then go to her :
I stand here naked with the shallow stones...

অন্য কবিটি এসেছেন এস্টোনিয়া থেকে। ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ এস্টোনিয়া, সে দেশ সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এই কবি বেশ দীর্ঘকায়, মুখভরতি দাড়ি গোঁফ, ইংরেজি বলে

খুব আস্তে-আস্তে, প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল আমার চেয়েও বয়েসে অনেক বড়, কিন্তু আলাপ করার পর জানতে পারলাম, আসলে তিনি ছ'বছরের ছোট, কিন্তু বুড়োর মতন দেখায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে জানেন অনেক কিছুই, উপনিষদ ও কালিদাসের কাব্য মুখস্থ বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথও পড়েছেন।

এঁর কবিতা বেশ লম্বা-লম্বা। তবে এঁর একটি কবিতায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা খুব কৌতূহল-উদ্দীপক।

I lived among selqups in Western Siberia 1964-1965. It was a wild place. There was 1500km to the nearest railway station and 900 km to the nearest road.

Local people had seen a car on the cinema screen only. At winter there was quite often –35 to –45 by Celsius. On the coldest day it was –55. Local selqups were hunters and fishers.

Fresh warm blood of reindeers mixed with spiritus vini was the favourite drink. Several species of fish were eaten raw.

I collected selqupian folklore on the tapes.

এই কবির সঙ্গে আমার বেশ ভাব জমে গিয়েছিল।

আমি পৃথিবীর যে-দেশেই যাই, দু-চারজন বাঙালির সঙ্গে ঠিক দেখা হয়ে যায়। পশ্চিমবাংলার বাঙালি না হলেও বাংলাদেশি থাকবেই। তাদের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তাও খুব বেশি, আমাকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে যায়, বিরিয়ানি খাওয়াবেই।

এই নিউজিল্যান্ডই একমাত্র দ্বিতীয় দেশ, যেখানে একজনও বাঙালির দেখা পাইনি। কিছু বাঙালি অবশ্যই আছে, কেউ খবর পায়নি।

টানা ন'দিন আমি একটাও বাংলা কথা বলিনি।

না, বলেছি দু-চারটি কথা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব গোপন কথা।

কাফে মেট্রোতে কবিতাপাঠ

ঠিক ন'টার সময় হাজির হলুম কাফে মেট্রোতে। ওখানে অনেকে কবিতা পড়বে। কাফে মেট্রো অনেকটা আমাদের কলকাতায় সুতৃপ্তি বা বসন্ত কেবিনের মতো, আয়তনে একটু বড়। নড়বড়ে চেয়ার টেবিল, মিটমিটে আলো, কফি ছাড়া অন্য কোনও পানীয় পাওয়া যায় না। রাস্তার থেকে কয়েক সিঁড়ি নেমে নীচু ঘর। যে দিন কবিতা পড়া থাকে সেদিন আগে থেকেই তরুণ কবি বা ভাবী-কবির দল টেবিল দখল করে থাকে। দু-একজন নিরীহ পথচারী—শুধু কফি খাবার জন্যই যে এখানে কখনও ঢুকে পড়ে না তা নয়, কিন্তু ওসব কবিতা শোনার পর একজনকে আমি দাম না দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছি। কাফের মালিক নিশ্চিত খুবই কবিতা অনুরাগী—যেহেতু এসব সহ্য করেন, এবং আর্থিক লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। একটি অল্প বয়সি মেয়ে কফি সার্ভ করে, নিঃশব্দে টেবিলে ঘুরে যায় সে, মুখে কোনও বিকার নেই। একটি কবিতা ওই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য

করেই পড়া হল বুঝতে পারলুম—কিন্তু মেয়েটির তবু কোনও হৃদয় দৌর্বল্য ঘটল বলে মনে হল না। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আইরিন, কবিতাটা তোমাকে নিয়েই লেখা হয়েছে, বুঝতে পারছ?' মেয়েটি কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে চোখ না তুলে বললে, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কবিতাটা ভালো হয়নি।'

আমেরিকায় কাফে রেস্টুরেন্টে কবিতা পড়ার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয় সানফ্রান্সিসকো শহরে। তারপর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন নিউইয়র্কই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। গ্রিনিচ ভিলেজ—যেটা নিউইয়র্কের কবি-শিল্পীদের পাড়া, অর্থাৎ প্যারিসের যেটা এক কালের মমার্ত, লন্ডনের কিছুটা সোহো স্কোয়ার, কলকাতার কলেজ স্ট্রিট—সেখানে অনেক কাফে বা বারে কবিতা পড়া হয় নিয়মিত, জ্যাজ বা মেয়েদের নাচের মতোই—শুধু কবিতা শোনার জন্যই অনেক ভ্রমণার্থী টিকিট কেটে ঢোকে। তবে সে সব জায়গায় কবিতা পড়া হয় অনেকটা ফ্যাশানের সঙ্গে, কিছুটা প্রতিষ্ঠিত বা কিছুটা অতি বাজে কবিরা পড়েন। টাকা পান সেজন্য। একমাত্র কাফে মেট্রোতেই টিকিট কেটে ঢুকতে হয় না, এককাপ কফি নিয়ে চেয়ার দখল করে বসতে পারলেই হল—ওখানেই সত্যিকারের উৎসাহী তরুণ কবিরা কবিতা পড়েন। একজন মোটামুটি পরিচালনা করে, কোন কবি পড়বেন—তার নাম ঘোষণা করে দু-চার লাইনে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দেয়। এক একজনের পড়া শেষ হলে কিছুটা গুঞ্জন, কথাবার্তা,—তারপরই, কাফের মধ্যে একটা পুরোনো পিয়ানো আছে, তার সবগুলো রিডে চাপ দিলে ঘং করে একটা গম্ভীর শব্দ হয়, সব চুপ, আবার একজনের নাম ঘোষণা হল। অনাহূত, রবাহূত হয়েও কেউ-কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমি একটা কবিতা পড়ব। সেও সুযোগ পায়। আমাকেও একদিন কবিতা পড়ার জন্য খুব পেড়াপেড়ি করা হয়েছিল। অগত্যা আমি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা পড়েছিলাম। প্রথমে খাঁটি বাংলায়।

কবিতা পড়ার বর্ণনা দিয়ে অবশ্য লাভ নেই। কবিদের ব্যবহার সব দেশেই সমান। কেউ অহংকারী গলায় পড়তে-পড়তে 'রাজ্য জয় করছি'—এই ভঙ্গিতে ঘন-ঘন তাকায় মেয়েদের দিকে। কেউ লাজুক গলায় মিনমিনে সুরে পড়ে। কেউ বা ভাব-গম্ভীর, উদাত্ত ভঙ্গিতে পড়ে একটা অতি ওঁচা গদ্য। কেউ বা একটা পড়ার নাম করে পাঁচ-ছ'টা না পড়ে ছাড়ে না। কেউ-কেউ 'আমায় কেন আগে পড়তে দেওয়া হল না'—এই বলে খোনা গলায় খুঁত-খুঁত করে! অবিকল বাংলাদেশের মতো। দু-একটা ভালো কবিতা, বাকি অনেক ভেজাল। কিন্তু এক সন্ধেবেলা—অন্তত একটি ভালো কবিতা শুনতে পাওয়াও কম নয়। এর মধ্যে নিগ্রো কবিরাও আছে। একজন নিগ্রো কবির একটি লাইন মনে আছে : আমেরিকা, মাই সুইট মাদার ল্যান্ড অব শ্লেভারি।

আসর ভাঙে রাত বারোটা একটায়। গলা ভেজাবার জন্য এক এক দল যায় তখন এক এক বারে, সেখানে হই-হল্লোড়, তর্কাতর্কি, আড্ডা, অশ্লীল গল্পের কমপিটিশন—ইত্যাদির পর বাড়ি ফিরতে রাত তিনটে-চারটে। আমার বরাবরই একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। এই সব ছেলেমেয়েগুলো বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরছে দিনরাত, এদের চলে কী করে, এরা টাকা পায় কোথায়। ও সব পদ্য-টদ্য লেখার জন্য তো এক পয়সাও পায় না, জানি। আমার পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, সেদিন সেই মদের দোকানে, মেয়েটি সে সন্ধেবেলা কবিতা পড়েছিল। ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটি, বয়েস কুড়ি-চব্বিশ, গায়ের রং কর্কশ লালচে নয়...বরং যেন গৌর, সোনালি চুল। নাম লিন্ডা। লিন্ডাকে জিগ্যেস করলুম, তুমি কোথায় থাক? আঙুল দিয়ে ওপাশের একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলল, আমি ওদের সঙ্গে থাকি।

—বিয়ে করেছ?

—না।

এসব প্রশ্ন ইউরোপ-আমেরিকায় করা খুবই অভদ্রতা হয়তো, কিন্তু এসব ছেলেমেয়েরা কোনও রীতিনীতি মানে না। এদের জিগ্যেস করা যায়, জানি। এদের মধ্যে একজন আমাকে একবার দুম

করে প্রশ্ন করেছিল, আমি কখনও সুইসাইড করার চেষ্টা করেছি কি না। ছেলেটিকে নিরাশ করে আমি উত্তর দিয়েছিলুম, না।

যাই হোক, আমি লিন্ডাকে জিগ্যেস করলুম, পল কি কোনও চাকরি-টাকরি করে?

—না, না, ও কবিতা লেখে। চাকরি করলে ওর অসুবিধে হয়।

—ও, আচ্ছা, তাই নাকি। ঢোক গিলে আমাকে বলতে হল। তবুও ওখানে না থেমে মেয়েটিকে আবার জিগ্যেস করলুম, কবিতা লেখা সত্ত্বেও, তোমাদের দুবেলা কিছু খাবার খেতে হয়, আশা করি। কোথা থেকে পাও? তুমি চাকরি-টাকরি করো?

লিন্ডা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বললে, না। তবে মাঝে-মাঝে কিছু উপার্জন হয়।

—কী করে? আশা করি কিছু মনে করছ না।

—না, না। খুব শক্ত। আমি মাঝে-মাঝে মডেলের কাজ করি। তাতে যা পাই, চলে যায়। আগে আর্টিস্টদের মডেল হতাম, কিন্তু ওটা বড় কষ্টকর, একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকতে খুব বিরক্ত লাগে। তা ছাড়া ওরা পয়সা কম দেয়। এখন ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে কাজ করি। খুব কম সময়ে হয়ে যায়। পয়সাও ভালো।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কী সরল ওর মুখ। আর একটা প্রশ্ন বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কিন্তু আর জিগ্যেস করতে ভরসা হচ্ছে না। অথচ এদের ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা বা লজ্জা নেই। শেষকালে বললুম, তোমার ওসব ফটোগ্রাফি কাগজে ছাপা হয়?

—হ্যাঁ, হয়। তবে ফ্যাশান ম্যাগাজিনের ছবি নয়। নতুন পোশাকের ডিজাইন দিয়ে মডেলের ছবি—তা নয় কিন্তু। আমার কোমরটা, এই দ্যাখো, তেমন সরু নয়, সেইজন্য ফ্যাশান ম্যাগাজিনে আমার ছবি তোলে জামাকাপড় সব খুলে,—

—তোমার একটুও লজ্জা করে না।

—না। তবে, আমার মা-বাবা যদি দেখতে পান—তবে ওঁদের লজ্জা হবে—তাই আমি মুখের ওপর চুলগুলো ফেলে মুখটা ঢেকে দিই প্রায়। অনেক সময় ওই অবস্থায় আমি কবিতার লাইন ভাবি। কাল একটা লিখেছি...

কবিতার জন্য এ কী জীবন-মরণ পণ এদের। কিন্তু তবু বড় দুঃখ হয় ভেবে, কবিতার জন্য জীবন-মরণ পণ করাও কিছু নয়। আত্মদান করলেও অনেকের কবিতা হয় না। অন্তত ওই পল বলে ছোকরার যে জীবনে এক লাইনও কবিতা হবে না, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

আর একটি ছেলের কাছে জানলুম—সে একটা হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। দিনের বেলা সেই হোটেলেই চাকরের কাজ করে। কেউ-কেউ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরির ক্যাটালগ তৈরির কাজ করে মাঝে-মাঝে। দু-একটা আছে বোকা অহংকারী। অশ্লীল নামে একটি পত্রিকা বার করে একটি ছেলে—সেও কোনও কাজকম্ম করে না। জিগ্যেস করলুম, কাগজ চালাবার পয়সা পায় কোথা থেকে। ভুরু উলটে উত্তর দিল, জুটে যায়। সত্যিই জুটে যায় এদিক-সেদিক থেকে। অল্প আয়াসে। তাই কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার নাম করে বাউন্ডুলে সেজে থাকে কত ছেলেমেয়ে—তাদের মধ্যে ক'জন সত্যিকারের শিল্পী বাছতে গেলে গ্রিনিচ গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম রাত তিনটেয় আকাশের নীচে। তখনও দোকনগুলি আলোয় ঝলমল। ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের মিশ্রিত দুর্বোধ্য শব্দ। শোঁ শোঁ করে দু-একবার আসে সমুদ্রের বাতাস। পাথরের মূর্তির মতো এখানে-ওখানে পুলিশ। মনের মধ্যে সামান্য একটা গ্লানির সুতো যেন টের পাচ্ছি। আজ সন্ধেবেলায় অমন উত্তেজিত কবিতার আসরের পর—এদের সবার সঙ্গে আমি টাকাপয়সার আলোচনা করতে গেলুম কেন?

একজন কবির সঙ্গে আরেকজন কবি কী নিয়ে কথা বলে? ক্রিয়েটিভ প্রসেস নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না, করা যায় না, অসম্ভব। তাও দুজনের ভাষা যদি আলাদা হয়। ভাষা ছাড়া কবিতার

আর কী আছে? আর কিছু নেই, নইলে বাংলা ভাষা এমন দাসত্বের শিকল কেন পরিয়েছে আমার গলায়। তা ছাড়া ওদের কাছ থেকে আমার শেখার কিছুই নেই। আমারও কিছু নেই ওদের শেখাবার। শুধু কথা আসে জীবন সম্বন্ধে, জীবনকে টেনে বাঁচিয়ে রাখা শুধু। তোমাদের অনেকেরই কবিতা অতি অখাদ্য, একেবারেই ভালো লাগেনি আমার—তবু, কফির দোকানে ওই কবিতা পাঠ, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, গৌরব ও লাজুকতা, সারা সন্ধে ও রাত্রি কবিতার কথায় ভরে রইল, 'শিল্পের জন্য ইহজীবনে কিছু আত্মত্যাগ' করেছ তোমরা, সেজন্য, তোমাদের মনে হল এক পরিবারের লোক।

উঠেছিলুম শহরের ঠিক হৃৎপিণ্ডের কাছে, প্লাজা হোটেলে। নিউ ইয়র্কের সেরা হোটেলগুলির একটা। আমাদের হিসেবে প্রায় নব্বই টাকা শুধু ঘর ভাড়া—বলা বাহুল্য, আমি একজনের অতিথি। চৌরঙ্গির সামনের ময়দানের মতো, বিশাল সেন্ট্রাল পার্কের গায়ে এই হোটেল, এলাহি কাণ্ড, প্রাণপনে পুরোনো বনেদিভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ঝাড়লণ্ঠনে, এমনকি সামনে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কালো বা তামাটে রঙের লোক নেই বলে একটু অস্বস্তি লাগল—সেইজন্যই লিফটম্যান বা ম্যানেজারের 'গুডমর্নিং স্যার' শুনে গম্ভীরভাবে কাঁধ ঝাঁকাতুম। প্রথম দিন দেখি একটি চটপটে চেহারার ছেলে, আমি যখন ঢুকতে যাচ্ছি দ্রুত বেরোচ্ছে, চোখে কালো রোদ-চশমা, ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল, দারোয়ান বেহারারা দরজা খুলে তটস্থ। ছেলেটিকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগল, বিশেষত ওর দৌড়োবার ভঙ্গি। পরে মনে পড়ল, ওর নাম পল নিউম্যান, অনেক ছবিতে দেখেছি, হলিউডের উত্তমকুমার। আর একদিন ওই হোটেলের লবিতেই দেখি একজন কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক সপারিষদ দাঁড়িয়ে, চিনতে দেরি হয়নি, স্যার অ্যালেন গিনেস। তার আগের দিনই তাঁকে দেখেছি ব্রডওয়েের স্টেজে 'ডিলান' নাটকে, ক্ষুব্ধ, মদ্যপ, তরুণ, আত্মহন্তারক ডিলান টমাসের ভূমিকায়। কয়েকদিন পর আরেক কাণ্ড। বিকেলের দিকে বেরুতে যাচ্ছি, গেটের সামনে কী ভিড়, চেঁচামেচি, পুলিশ—ভয় পেয়ে আমি ভেতরে ফিরে এলুম, আমার পনেরো তলার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারলুম নীচে। হাজার-হাজার রিনরিনে গলার টিনএজার মেয়ে রং-বেরঙের স্কার্ট দুলিয়ে রইরই করছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমসিম। একটু পরে এক লিমুসিন গাড়ি থেকে চারটে রুক্ষ চুলওয়ালা ছোড়া নামল, আর অমনি পুলিশের কর্ডন ভেঙে ছুটে এল মেয়েরা। ছোকরা চারটের বয়স কুড়ি বাইশের মধ্যে, ছড়ো কুড়ো মাথা, চুল পড়েছে কপাল পর্যন্ত, নিরীহ বদমাশের মতো তাকাচ্ছে হেসে-হেসে। বুঝলুম, এরা বিট্‌লস, অতি সাম্প্রতিক সামাজিক গুজব, ক্রেজ, এলভিস্ প্রিসলির চতুর্গুণ অবতার, উত্তেজনা। গ্রেট ব্রিটেন থেকে আমদানি, স্টেজের ওপর নেচে-কুঁদে, গান গেয়ে লক্ষ-লক্ষ ডলার উপায় করছে। কাগজে-কাগজে এদের ছবি এখন।

আমি কবি পল এঙ্গেলের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক বেড়াতে এসেছি। আয়ওয়ার লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক কবি পল এঙ্গেল আমাকে এ শহরের বহু প্রখ্যাত লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বিস্ময়, আনন্দ, উপভোগ—এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছি। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে আমি

অন্য লোক হয়ে গেছি, অন্য জগতে, এক-এক সময় আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পল এঙ্গেলের ব্যবহার চির সুহৃদের মতন আন্তরিক, তবু কয়েকদিন পর অকৃতজ্ঞের মতন আমি এঙ্গেলকে বললুম, দ্যাখো এখানে এই হইহল্লার মধ্যে আমার থাকা হবে না। আমার অসুবিধে হচ্ছে।

'অসুবিধে হচ্ছে?' ও আমার কথা ঠিক বুঝতে পারল না।

আমি বললুম, 'আমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত, বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার, আমি বেকার—আমার কি এসব আরাম বেশিদিন সহ্য হয়? আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না।'

'এটা কোনও যুক্তি হল না। ঘুম হচ্ছে না কেন?'

'যে বিছানায় দিনের দুবার চাদর পালটানো হয়, সে বিছানা শুয়ে সত্যিই আমার ঘুম হয় না।'

'এদিকে এসো জানলার কাছে। দ্যাখো।' ও আমাকে বলল। জানলা দিয়ে দেখলুম, যতদূর চোখ যায় হর্ম্যের সারি, আদিগন্ত জুঁইফুলের মতো হালকা বরফ পড়ছে, নীচে, সেন্ট্রাল পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ছেলে-মেয়েরা স্কেটিং করছে অবিরাম, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু এমন দৃশ্য বহুবার বহু ছবিতে দেখেছি।

'এরকম দৃশ্য তুমি আর কোথায় পাবে?'

আমি মনে-মনে ভাবলুম, কিন্তু এখানে থাকলে আমার শুধু দৃশ্যই দেখা হবে, নিউইয়র্ক দেখা হবে না।

ওঃ, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, সে কথা বলা হয়নি। প্রথম দিন এসেই সন্ধেবেলা ও কাজ সেরে রেখেছিলুম। কী হতাশ হয়েছিলুম প্রথমটায়। লজ্জার কথা কী বলি, গোড়াতে খুঁজেই পাইনি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। লোককে জিগ্যেস করতেও পারিনি, অত বড় বাড়ি যা নাকি তিনশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হারিয়ে গেছে বললে সবাই নিশ্চিত হাসবে। অন্তত গোটা দশেক বাড়িকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বলে ভুল করেছিলুম, শেষে অতিকষ্টে ম্যাপ দেখে খুঁজে পেলুম। না, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতা একেবারে গুজব না, একশো দুই তলা ঠিকই, আমি নিজে চড়ে দেখেছি। কিন্তু আশে পাশে আরও অনেক সত্তর-আশি তলা বাড়ি থাকলে, ওর মহিমা ঠিক বোঝা যায় না। এ বাড়িটা যে সত্যি-সত্যি উঁচু তা বুঝতে পারা যায় বহু দূর থেকে কিংবা খুব কাছ থেকে।

তেমনি নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজ। প্রথম দিন-দশেক এঙ্গেল সাহেবের সঙ্গে আমি হোমরা-চোমরাদের বাড়িতে খুব ডিনার খেলুম, রকফেলার পরিবার, অ্যাডলাই স্টিভেনসানের সহকর্মিনী, 'লাইফ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর, ওমুক তেল কোম্পানির মালিক ইত্যাদি—খাস খানদানী ব্যবস্থার ত্রুটি নেই, সাত-আট কোর্স ডিনার, নানারকম ওয়াইন, ইংরেজ বাটলার—আমি অকুতোভয় ছিলুম, বাঁধা ধরা ব্যবহার, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গড়ে পাঁচ রকমের বেশি প্রশ্ন হবে না জানতুম, মেয়েরা কেউ মুখে সিগারেট তুললে আগ বাড়িয়ে ফটাস করে দেশলাই কাঠি জ্বালতে ভুল হয়নি। মাঝে-মাঝে মুখ লুকিয়ে হাসতুম একা। দিনের বেলা আমি কোথায় খাই যদি জানতে পারত এরা! দিনের বেলায় খাওয়া আমার নিজের খরচে, তখন খুঁজে-খুঁজে যত রাজ্যের শস্তা জায়গায় যেখানে টিপস্ দিতে হয় না, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘোঁত-ঘোঁত করে স্যান্ডউইচ কিংবা হ্যামবার্গার গেলা যায়।

তবে সব পার্টির সেরা অ্যাস্টর হোটেলের পার্টি। কবিতার ওপর ধনী আমেরিকানদের আজকাল বড় দরদ। সব জায়গাতেই খাওয়ার পর এ নিয়ে কিছু না কিছু আলাপ করা দস্তুর। 'পোয়েট্রি সোসাইটি অব আমেরিকা' নামের প্রতিষ্ঠান দেখে কে বলবে পৃথিবীতে কবিতার দুর্দিন। প্রচুর ধনী বুড়ো বুড়ি, কলেজের মাস্টার, রিটায়ার্ড কবি আছেন এ প্রতিষ্ঠানে। এদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অ্যাস্টর হোটেলে ডিনার, এবারের উৎসব বেশি জমজমাট, বেশি খুশি—কারণ, সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান

এক মিলিয়ান ডলার চাঁদা পেয়েছে। বিশাল হলঘরে সবাই খেতে বসেছে, টেবিলে সবাইকার নাম লেখা কার্ড আছে আগে থেকে, নিজের নাম খুঁজে নিয়ে আমিও বসলুম, প্রায় হাজার খানেক নারী পুরুষ। সমিতির সভ্যদের জন্যও এ উৎসবে আলাদা পঁচাত্তর টাকা টিকিট, কিন্তু এঙ্গেল সাহেব আমার জন্য নেমন্তন্ন জোগাড় করে দিয়েছিলেন বলে, আমার ফ্রি। প্রধান অতিথি স্টিফেন স্পেন্ডার—আমার নামও সভাপতি ভারতবর্ষের কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বলে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন। সেই ঘোষণা শুনে আমার আশেপাশের দু-চারজন চোখ গোল-গোল করে আমার দিকে তাকাতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, ওটা অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ, বুঝলেন। কবিতার পত্রিকা মানে শ'পাঁচেক কপি ছাপা হয়। যত লোক কেনে তার বেশি বিলি হয়। ভারতবর্ষ তো দূরে থাক, কলকাতাতেও আমাকে খুব কম লোক চেনে, মহাশয় মহাশয়াগণ।—এখান আজ এক রাত্রে কবিতার নামে যত টাকা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে কলকাতার তাবৎ কবিদের সংবৎসরের খোরাক জুটে যায়।' শুনলুম কোথাকার এক ডাচেস, নিঃসন্তানা, মরার সময় এই সোসাইটিকে এক মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত টাকার কিছুটা তাঁর পোষা বেড়ালের নামে, কিছুটা কবিদের জন্য। এক মিলিয়ান ডলার, অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখ টাকা। বুঝলুম, নোবেল প্রাইজে আজকাল এদেশে বিশেষ কোনও খবর হয় না কেন। নোবেল প্রাইজ, কী আর, লাখ-দুয়েক টাকা মাত্র। আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাম তো অনেকে শোনেইনি, অনেকে নোবেল প্রাইজের নাম শুনেছে কি না সন্দেহ।

মাথার সমস্ত চুল সাদা, স্টিফেন স্পেণ্ডার ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসে হ্যান্ডসেক করে বললেন, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, কলকাতায় আলাপ হয়েছিল।'—একেবারে ডাহা গুল, স্পেন্ডার সাহেব বার-দুয়েক কলকাতায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমি নগণ্য ব্যক্তি, আমার সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি। যাই হোক, ওটা হজম করে, আমিও এক প্রশ্ন দিলুম, বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সেই অসুখটা এখন কেমন আছে?'

থতোমতো খেয়ে স্পেন্ডার সাহেব বললেন, 'ভালো, ভালো খুব ভালো, একেবারে সেরে গেছে, থ্যাংকিউ, যামিনী রায়ের কী খবর?'

আমি এমনভাবে যামিনী রায়ের বৃত্তান্ত শোনালুম যেন কলকাতায় থাকতে ওঁর সঙ্গে আমার দু-বেলা দেখা হত। সলোমন নামে এক পুরোনো কবি বললেন, 'আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুব ভালো জানি, টেগোর আর তরু দত্তর সব লেখা পড়েছি।' বললুম, 'ক্ষমা করবেন, টেগোরের সব লেখা আপনার পক্ষে পড়া অসম্ভব, আমার পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। আর তরু দত্ত বাঙালি সাহিত্যিক নয়—এ মেয়েটি বাংলা দেশে জন্মে ইংরেজি ও ফরাসিতে কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্য নয়। আপনি জীবনানন্দ দাশ পড়ার চেষ্টা করুন। না, না জীবনান্ত নয়, জীবনানন্দ। অবশ্য, ওঁর বেশি লেখা অনুবাদ হয়নি।'

আর একজন কবি, নাম ভুলে গেছি, বললেন, 'বাংলা সাহিত্য মানে কী? তোমাদের রাষ্ট্রভাষা তো হিন্দি, বাংলা তো একটা ডায়ালেক্ট।'

আমি বললুম, 'অপানার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু পরে আপনার সঙ্গে আলাদা দেখা করে এ সম্বন্ধে বলতে পারি। এখানে এতবড় জায়গায় ঠিক সুবিধে হবে না, আমি বক্তৃতা করতে পারি না; বিশেষত বেশিক্ষণ ইংরেজিতে বড়-বড় বাক্য আমি একেবারেই ম্যানেজ করতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি বলার পরই আমার জল তেষ্টা পায়, কান কটকট করে, বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস আওয়াজ হয়।' (কান কটকটের ইংরেজি জানি না বলে ওটা আমি ভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়েছিলুম।)

ওই পোয়েট্রি সোসাইটির পার্টিতে যাই হোক, নানারকম উত্তম উত্তম খাবার ছিল। পানীয়, বক্তৃতা, গান এবং আবৃত্তি হল, অনেক কবি অনেক উপহার পেল, কিন্তু কবিতার কোনও ব্যাপার ছিল না। ওই পার্টিতে আমি এক কাণ্ড করেছিলুম। খাবার টেবিলে সাধারণত আমি আদবকায়দার

ধার ধারি না, যা স্বাভাবিক মনে হয়, তাই করি। কিন্তু সেদিন ওরকম কেতাদুরস্ত আবহাওয়ায় আমি কীরকম ট্যালা হয়ে গেলুম, ভাবলুম সব ঠিক-ঠিক করতে হবে। আমার পাশের চেয়ারে বসেছিলেন এক রূপসি ভদ্রমহিলা, সবুজ সান্ধ্য পোশাক পরা, নামও মিসেস গ্রিন, আমার সঙ্গে হেসে-হেসে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া আলোচনা করছিলেন, আমি আদব-কায়দায় ওকে হুবহু নকল করতে লাগলুম। কখন ন্যাপকিন কোলে রাখতে হবে, কোন হাতে ছুরি কাঁটা, বিনা শব্দে সুপে চুমুক, আইসক্রিমের চামচ ও কফির চামচে পার্থক্য, কোন হাত দিয়ে স্যালাড খেতে হবে—আমি আড়চোখে দেখে-দেখে কপি করে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, টেবিলের বাকি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কী ব্যাপার বুঝতে পারি না, আমি আড়ষ্ট হয়ে কলার ঠিক করি, বো সোজা করি, জামা প্যান্টের বোতাম ঠিক আছে কি না দেখি, তবু ফিকফিক হাসি থামে না। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলুম, আমার পাশের ভদ্রমহিলা ন্যাটা, ওঁর দেখাদেখি এতক্ষণ আমিও বাঁ-হাতে ছুরি ধরেছিলুম!

এমনিভাবে হাওয়ায় শিমুল ফুলের মতো আমি ভাসতে লাগলুম নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজে। কিছুই ছুঁতে পারিনি। পার্টি থেকে পার্টি, ট্রাম লাইনের মতো কথাবার্তা, আকাশ ছোঁয়া হোটেল। মাঝে-মাঝে দিনের বেলা একা পথে-পথে ঘুরতুম। কোনও দিন পথ ভুল করে হারিয়ে যাইনি। হঠাৎ কোথাও পথের মধ্যে থেমে তাকিয়ে থাকতুম ওই বিশাল শহরের দিকে। সত্যিই বিশাল। ভারতবর্ষে একমাত্র কলকাতার সঙ্গে মিল আছে। সাবর্ণ রায়চোধুরীরা ইংরেজদের কাছে কলকাতা সমেত তিনটে গ্রাম বেচে দিয়েছিল মাত্র তেরোশো টাকায়, এই ম্যানহাটান দ্বীপও রেড ইন্ডিয়ানরা ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করেছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে। আজ এই শহর শুধু বাণিজ্য নয়, শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্র। পৃথিবীর নানান দেশের লেখক শিল্পী জমা হচ্ছে এখানে। অসংখ্য আর্ট গ্যালারিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি। পৃথিবীর সব দেশের বাছাই করা সিনেমা দেখা যাবে এখানে। থিয়েটার, যে-কোনও বই, যে-কোনও খাবার, যে-কোনও পোশাক, যে-কোনও জাতের মানুষ। কলকাতার মতই জীবন্ত এই শহর—মাটির তলায় ট্রেন ও আকাশ ছোঁওয়া বাড়ির সারি সত্ত্বেও, তবু আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ঠিক এ শহরের প্রাণ ছুঁতে পারছি না।

একদিন হোটেলে ফিরে এঙ্গেল সাহেবকে বললুম, 'আমি চললুম এখান থেকে, গ্রিনউইচ ভিলেজে শস্তা থাকায় জায়গা পেয়েছি।'

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে বিদায়।

নাম ভিলেজ, আসলে গ্রিনউইচ ভিলেজ নিউ ইয়র্কের একটি পাড়া; আমাদের কলেজ স্ট্রিট পাড়ার মতো। নিউ ইয়র্ক কলেজ ও আশেপাশে বই-এর দোকান, ছোট-ছোট বাড়ি ও রেস্তোঁরা, যত রাজ্যের লেখক শিল্পী অভিনেতা গাইয়েদের আড্ডা। একটা ছোট্ট হোটেলের এক চিলতে ঘরে উঠলুম, নিজের ইচ্ছে মতো পাঞ্জাবির দোকানে কষা-মাংস কিংবা চিনে হোটেলে ভাত মাছের ঝোল খাই। মাঝে-মাঝে টেলিফোন করে এক আমেরিকান কবি বন্ধুকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়, সে এখানে বিষম বিখ্যাত, যে-কোনও পার্টিতে তার নাম করেছি সবাই চিনেছে ও কিছুটা আঁতকে উঠেছে। কিন্তু যেখানেই ফোন করি, শুনি, সে কাল এখানে ছিল, আজ কোথায় জানি না। দু-তিনদিন ঘুরলুম একা ওয়াল স্ট্রিট পেরিয়ে, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির চক্ষু-সীমায়। আমার হোটেলের ঠিক উলটোদিকে একটা বড় বই-এর দোকান, সেখানে ঘুরঘুর করি, একদিন সাহস করে কাউন্টারে জিগ্যেস করলুম, অ্যালেন গিনস্‌বার্গ কোথায় থাকে বলতে পারেন? লোকটা আমার দিকে মুখ তুলে বলল, আপনার নাম সুনীল সামথিং? ইন্ডিয়া থেকে? এই যে একটা চিঠি আপনার নামে। দোকানের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যান, ডান দিকে সিঁড়ি, দোতলায় অ্যালেন গিনস্‌বার্গকে পাবেন।

বুক পর্যন্ত দাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, ঠিক কলকাতায় যেমন দেখেছিলাম। তখন দুপুর একটা, সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে অ্যালেন। বলল, 'আমিও তোমাকে খুঁজছিলাম, আমার থাকার জায়গার ঠিক

নেই, এক একদিন এক-এক জায়গায় থাকি। এই বই-এর দোকানের মালিক এখানে কয়েকদিন থাকতে দিয়েছে। চলো, ওপরে যাই রান্নাঘরে। বিলায়েত খান আর ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের রেকর্ড আছে, শুনবে?'

এতদিন পর ভারতীয় রাগসঙ্গীত শুনতে পেয়ে, যাকে বলে বুক জুড়িয়ে গেল। রাগসঙ্গীত যে আমি এত ভালোবাসি আগে কখনও বুঝতে পারিনি। অনেক কনফারেন্সে শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি, এখানে রেকর্ডগুলো বারবার শুনতে লাগলুম। অ্যালেন ভাত আর মুরগির মাংস রেঁধেছিল আগের দিন, সেইগুলো গরম করে দুজনে খেলুম। সেই সঙ্গে চমৎকার জমানো দই। অ্যালেনের গায়ে পুরোনো রং-জ্বলা খাঁকি কর্ডের কোট ও প্যান্ট। জিগ্যেস করলুম, 'ওগুলো কোথায় পেলে, কলকাতায় তো ছিল না?' শুনলুম, ওর এক বন্ধু শিগগির মারা গেছে, তার বিধবা পুরোনো জামা-কাপড়গুলো দিয়ে দিয়েছে অ্যালেনকে। আমি কোথায় উঠেছি, আমাকে জিগ্যেস করল। প্লাজা হোটেল শুনে আঁতকে উঠল, বলল, 'আমি জন্মেছি এখানে, তিরিশ বছরের বেশি আছি নিউইয়র্কে, আজ পর্যন্ত ওসব জায়গায় ঢোকার সুযোগ পাইনি। আর তুমি। নিউ ইয়র্কে আর কী কী দেখলে বলো।' আমি আরম্ভ করলুম, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম, ইনস্টিটিউট অব মর্ডান আর্ট, ওয়াল স্ট্রিটের স্টক এক্সচেঞ্জ নামক চিড়িয়াখানা, নদীর তলায় লিঙ্কন টানেল, নিগ্রোপাড়া হার্লেম, ইউ এন বিল্ডিং। স্ট্যাচু অব লিবার্টি? হ্যাঁ। রকফেলার সেন্টার? হ্যাঁ। কোন কোন লোকের সঙ্গে দেখা হল? লিস্টি দিলাম। যেসব লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছি, তাদের নাম শুনে ওর চোখ গোল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ছেলেমানুষের মতো বললে, 'ওখানে কী সব কথাবার্তা হয় বলো তো শুনি, কখনও জানতে পারি না, কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে হয়।' নানারকম গল্পের পর অ্যালেন বলল, 'ট্যুরিস্টরা যা দেখে তুমি সবই দেখছ, এমনকি তার চেয়ে অনেক বেশি, ওসব জায়গায় সবাই ঢোকার সুযোগ পায় না। তুমি দেখেছ উঁচু সমাজের নিউ ইয়র্ক। চলো, তোমাকে আর একরকম নিউ ইয়র্ক দেখাই। কলকাতায় আমি তো ট্যুরিস্টের মতো ঘুরিনি, আমি দেখেছি চিৎপুর, চিনেবাজার, পোস্তা এসবও। চলো, তোমাকে নিউ ইয়র্কের ওসব জায়গা দেখাই।'

খানিকটা বাদে ওর বন্ধু পিটার এল। তিনজনে রাস্তায় বেরুলুম। সারাদিন ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। গ্রিনউইচ ভিলেজের রাস্তায় নানা রকম লোক, এখানকার পোশাক তেমন ধোপদুরস্ত নয়, অনেক মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল—অবেণীবদ্ধ, ছেলেদের পোশাক রং-বেরং, গলায় টাই নেই—এরা শিল্পী, তাই বেশবাসে এদের ভিন্ন হওয়ার দাবি আছে। বরফে ঢাকা নির্জন ওয়াশিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে আসছিলুম। অ্যালেন বলল, 'এই পার্ক দেখে কার কবিতা মনে পড়ে বলো তো?' বললুম, 'পল ভের্লেনের, কলোক্ সাঁন্তিম তাল।' শীতের নির্জন পার্ক চর্তুদিকে ছড়ানো তুষার। দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র পার হল।—আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকাতেই আমি বললুম, 'না না, ভয় পাওয়ার দরকার নেই, ভের্লেনের এই একটিমাত্র কবিতাই আমি জানি।'

পিটার সারা আমেরিকায় একমাত্র লোক যে বরফের ওপর দিয়ে মোজা ছাড়া শুধু হাওয়াই চটি (কলকাতায় কেনা) পরে হাঁটতে পারে। লোকে বলে, ওটা একটা বেড়াল, শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই। আমি জিগ্যেস করলুম, 'সত্যি তোমার শীত করে না পিটার?' ও বলল, 'সুনীল, তোমার মনে আছে, কলকাতায় যখন তোমাকে জিগ্যেস করেছিলুম, জুন মাসের গরমে পিচের রাস্তায় রিকশাওয়ালারা খালি পায়ে হাঁটে কী করে? তুমি বলেছিলে, 'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

অমন বিচিত্র পোশাক গ্রিনউইচ ভিলেজের, তবু ওদের দুজনের অতবড় দাড়ি ও এলেমেলো বেমানান জামা-কাপড় দেখে এখানেও লোকে হাসে, যেমন কলকাতায় হাসত। পাড়ার মোড়ে বসা ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওরে পাগলারা, ভোর হয়ে গেছে, এখনও দাড়ি কামাবার কথা মনে নেই তোদের?' অথবা, 'ওরে, তোদের গালে এ কীসের জঙ্গল রে?' অ্যালেন কোনও উত্তর দেয় না,

কিন্তু পিটার মাঝে-মাঝে হেসে জবাব দেয়, 'পয়সা নেই ভাই, তাই কামাতে পারিনি।' অথবা 'আমি ইন্ডিয়ান সাধু।' এরপর যে কটা বাংলা-হিন্দি শব্দ জানে এক নিশ্বাসে বলে দেয়, 'নমস্কার, সব ঠিক হ্যায়, দাম কিতনা, আচ্ছা, আমি বালো আছি, সারেগামা পাধানিসা।'

যত হাঁটতে লাগলুম ততই জাঁকজমক বিরল হয়ে এল। অথচ সেটাও নিউ ইয়র্ক। ম্যানহাটন দ্বীপ। ও দিকটাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড। রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা, এখানে সেখানে জল-কাদা জমেছে। ছেঁড়া জামাপরা লোক, পোর্টোরিকান, নিগ্রো, ইহুদি অঞ্চল। এই প্রথম দেখলুম দোকানে কাটা মাংস ঝুলছে। মোড়ে-মোড়ে জটলা করছে বেকার ছেলের দল। এবং অবিশ্বাস্য হলেও, মাঝে-মাঝে সাদা চামড়ার ভিখিরি, মেয়ে ও পুরুষ। যতবার ভিখিরিদের পয়সা দিচ্ছি, অ্যালেন ও পিটার হাসছে। বলছে, 'তুমি ইন্ডিয়ান হয়েও আমেরিকানদের ভিক্ষে দিয়ে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছ, না?' ঠেলাগাড়িতে শস্তা মালপত্র সাজিয়ে ফিরিওয়ালা হাকছে লে-লে বাবু ছ'আনা। কোথায় গেল সব সুপার মার্কেট।

আমরা যাচ্ছিলুম অ্যালেন ও পিটারের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। ভাড়া নিয়ে নিজেরাই ঘর রং করছে, দরজা জানলা সারাচ্ছে। একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ঢুকলুম, ছ'তলা বাড়ি কিন্তু লিফট নেই, নড়বড়ে রেলিং, নোংরা সিঁড়ি, দেওয়ালে অসভ্য কথা লেখা, আমাদের উত্তর কলকাতার যাচ্ছেতাই ভাড়া বাড়িগুলোর তুলনায় কোনও অংশে ভালো নয়। শেষ পর্যন্ত ওদের ঘর দেখে আমি হতাশ হয়ে প্রায় মাটিতে বসে পড়লুম। অ্যালেন বলল, 'তুমি ছ'মাস আমেরিকায় থেকে সত্যি আমেরিকান হয়ে গেছ। কলকাতায় অনেকের বাড়ি কি আমি দেখিনি? এর চেয়ে ভালো নয়।'

'যদিও এ কথা ঠিক' অ্যালেন বলল, 'আমেরিকায় ঠিক না খেয়ে লোকে মরে না। বেকার ভাতা ইত্যাদি আছে। অপর্যাপ্ত সম্পদের দেশে একটু চেষ্টা করলেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়! কিন্তু গরিব আর বড়লোকদের মাঝখানের তফাত ভয়ংকর বেশি। তা ছাড়া স্লামে থাকা যাদের স্বভাব, তারা চিরকাল স্লামেই থাকবে—স্লাম বা অট্টালিকা কোথায় বেশি সুখ, কে জানে? আমার মতো যারা, তারা চাকরি বাকরি করে সময় নষ্ট করতে চায় না, সমস্ত জীবনটাই শিল্পের জন্য ব্যয় করতে চায়, তাই তাদের দারিদ্র্য। কিন্তু শুধু কবিতা লিখে বেঁচে থাকা তোমাদের দেশে অসম্ভব। এখানে সেটা অসম্ভব না। লেখা থেকে যদি আমার বেশি টাকা আয় হয়, আমিও ভালো বাড়িতে উঠে যাব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে থাকতে আমারও ইচ্ছে হয়।'

সন্ধে হয়ে আসার পর আবার আমরা বেরুলুম। তুমি সাবওয়ে চেপেছ একবারও? আমি জিজ্ঞাসিত হলুম। (সাবওয়ে অর্থাৎ মাটির তলার ট্রেন, প্যারিসে যার নাম মেট্রো, লন্ডনে টিউব), সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম পাতালে—দুপাশে প্ল্যাটফর্ম ঝকঝক করছে নিওন আলোয়, কোথাও হাওয়ার কষ্ট নেই, আশ্চর্য 'কলকাতায় এমন ট্রেন নেই কেন?' অ্যালেন জিজ্ঞাসা করল, তৎক্ষণাৎ পিটার জুড়ে দিল, 'তা হলে কী চমৎকার শোওয়ার জায়গা হত ভিখিরি কিংবা রিফিউজিদের।'

ট্রেনের অনেক লোক অবাক হয়ে দেখছিল ওই বিচিত্র যুগল মূর্তিকে, অনেকে হাসাহাসি করছিল। অ্যালেন গুনগুন করে ভৈরবীর সুর ভাঁজছিল, পিটারের মাথায় কাশ্মীর লাল টুপি। একজন বুড়ো ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'আহা, দেখে মনে হয় যেন বাইবেলের যুগ থেকে উঠে এসেছে।' অ্যালেন বলল, 'সকলেই সেখান থেকে।' আমি মজা করার জন্য জিগ্যেস করলুম, 'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে, আমি কোথা থেকে এসেছি?' আমাকে অবাক করে ভদ্রলোক বললেন, 'মহাভারতের যুগ থেকে।' আলাপ হল, শুনলুম, গাড়ির এককোণে পুরোনো ওভারকোট পরে বসে থাকা ওই বৃদ্ধ যুদ্ধের আগে জাপানে আমেরিকান সহকারী রাষ্ট্রদূত ছিলেন কিছুদিনের জন্য।

পাতাল ফুঁড়ে আবার উঠলুম মর্ত্যে। বরফপড়া তখনও থামেনি। রাত্রের গ্রিনউইচ ভিলেজ

গাতাকারের জাগ্রত! এখানে ওখানে জ্যাজ ও নানারকম বিদেশি (এদের ভাষায় এক্সটিক) গান বাজনার আওয়াজ। আমরা গুনগুন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাইছিলুম, খানিকটা পরে অ্যালেন বেশ গলা ছেড়ে গাইতে লাগল, নির্ভুল সুর, উচ্চারণ খানিকটা হিন্দি ঘেঁষা।

গ্রিনউইচ ভিলেজ এখন টুরিস্টদের ভিড়ে ভরে গেছে। নিউ ইয়র্কের অবশ্যদ্রষ্টব্য জায়গার গাইডবুকে এখন গ্রিনউইচ ভিলেজেরও নাম। দেশ-বিদেশের লোক এখানে আসে কবি-শিল্পীদের পাগলামি দেখতে। তাই বহু নকল শিল্পীতে এখানকার কাফে রেস্তোরাঁ ভরে গেছে। আসল লেখকরা এখন এখান থেকে সরে যাচ্ছে। ওই বারে ডিলান টমাস তার আত্মহত্যার শেষ মদ্যপান করেছিল। এই পন শপে এফ স্কট ফিটজেরাল্ড তার জামা কাপড় বাঁধা দিয়েছিল। কামিংস থাকত ওই বাড়িতে, এইখানে হেমিংওয়ে আড্ডা দিত—এসব দেখতে-দেখতে যাচ্ছি। হঠাৎ এক বিশ্ববিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে, অ্যালেনকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে, আলাপ হল, স্যালভাডার ডালি। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে, লাল রঙের কোট গায়ে, মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে দ্বিতীয় প্রিয় শিল্পীকে চাক্ষুস দেখে খানিকটা হতাশ হলুম, না দেখলেই ভালো হত। পৃথিবীতে যারা টাকা তৈরি করে—স্যালভাডার ডালি এখন তাদের কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করেছেন।

'বিনে পয়সায় কফি খাবে সুনীল?' পিটার জিগ্যেস করল। ওখানে গোপনে অবাধ গাঁজা, মেরুয়ানা, মেস্কালিন, হাসিস ইত্যাদি মাদক নেশার অবাধ প্রচলন। শিল্পীদের সেসব অভ্যাস ছাড়ানোর জন্য স্যালভেসান আর্মি ফ্রি কফি এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে। পিটার বলল, 'চলো, আগে আমরা ফ্রি কফি খেয়ে আসি, তারপর গাঁজা খাব।'

কাফে রেস্তোরাঁগুলো ভিড়ে ভরা। জায়গা পাওয়া যায় না। খুঁজে-খুঁজে গেলুম আসল জায়গাগুলোতে। ছোট-ছোট দোকান, নড়বড়ে কাঠের চেয়ার, ছেলেমেয়েরা এক কাপ কফি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে, মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ চেঁচিয়ে কবিতা পড়ছে, ছোটখাটো পত্রিকা বিলি হচ্ছে—হাত বদল হচ্ছে, এ ওর মুখ থেকে কাড়াকাড়ি করছে সিগারেট—অবিকল আমাদের কলকাতার কলেজস্ট্রিটের আবহাওয়া। খালি তফাত, এদের মধ্যে অনেক সুন্দরী বালিকা আছে। আমাদের কলকাতায় সুন্দরী মেয়েদের আর কবিতায় কোনও উৎসাহ নেই, আমি ফিসফিস করে একজনকে বললুম।

যেখানেই যাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন, কৌতূহল, আন্তরিক জিজ্ঞাসা এখানে—উঁচু সমাজের মতো ধরা বাঁধা নয়। আমি আগামী বছর যাচ্ছি ভারতবর্ষে, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, কেউ বলল, জীবনে যখনই পারি, অন্তত হেঁটেও যাব ভারতবর্ষে।

কলকাতায় আমরা বিটনিকদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, তার অধিকাংশই ভুল। যারা বিটনিক হিসেবে সেজে আছে, তাদের অধিকাংশই এখন বাজে লেখক, শৌখিন, অভিনেতা, প্রচার-কার্তিকেয়। আসল লেখক ও শিল্পীরা লুকিয়ে আছে প্রায় চারদিকে, দারিদ্র্যে ও পীড়নে, প্রাণপনে লড়ছে সামাজিক অসমীচীনতার বিরুদ্ধে, সেনসরের অপবিচারের বিরুদ্ধে। দেখা হল, জ্যাক কেরুয়াকের সঙ্গে, নেশায় আচ্ছন্ন ও যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ। গ্রেগরি করসো—পারিবারিক সুখ ও শান্তির জন্য উন্মুখ। নিগ্রো কবি লে রয় জোন্স, সাদা কালোর নির্বোধ লড়াই নিয়ে হাসছে। গেলুম আধুনিক শিল্পীদের কাছে, ছোট্ট অন্ধকার ঘরে তিন চার জনে ঠাসাঠাসি করে থাকে, দেওয়াল ভরতি বিশাল-বিশাল ক্যানভাস, কবে খ্যাতি আসবে, এমনকি কোনওদিন কোনও একজিবিশানের সুযোগ পাবে কি না পরোয়া নেই, দুঃসাহসী রং নিয়ে খেলছে, খাদ্য শুধু ভাত, নুন আর সেদ্ধ মাংস।

হলিউডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে একদল। 'আমেরিকার ছবিতে সেক্স আর কস্টিউম ছাড়া আমাদের কিছু নেই, ছি-ছি।' নিজেরা কো-অপারেটিভ করে ফিল্ম তুলছে তারা। নানান রাস্তা, গলি ও সিঁড়ি পেরিয়ে হঠাৎ কোনও ঘরে ঢুকে, প্রোজেক্টের মেশিন, ছড়ানো ফিল্ম, ফ্ল্যাশ লাইট, বাজনা—

মনে হয় কোনও অন্য রাজ্যে এলুম। ওই একই ঘর—স্টুডিও, অফিস, শোওয়ার জায়গা। 'আমরা সাহিত্য, শিল্প এবং ফিল্মকে এক পর্যায়ে আনতে চেষ্টা করছি, কবিরা এখানে কাহিনি লিখছে, শিল্পীরা শিখছে ক্যামেরা, আমরা সবাই চোখ ব্যবহার করছি।'

তুমি যোগ জানো?—না। তুমি প্রাণায়াম জানো?—না। তুমি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গেয়ে শোনাবে?—জানি না। তুমি আমাদের কিছুটা বেদান্ত বোঝাবে?—না, আমি নিজেই ভালো করে বুঝিনি। অন্য অনেক জায়গায় কিছুটা জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমরা খাঁটি লোক, তোমাদের সঙ্গে চালাকি করব না। আমিও খাঁটি লোক।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেই সব জ্বলন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলুম। বাজে, ড্যাজাল ও চালিয়াৎদের চিনে নিতে দেরি হল না। 'তুমি কেন হোটেলে আছ, আমাদের সঙ্গে এসে থাকো।' একজন তরুণ কবি বলল আমাকে, তৎক্ষণাৎ হোটেল থেকে স্যুটকেশ নিয়ে গেলুম তার বাড়িতে। ছাদের চিলেকোঠা দুটি, ভাঙা, অন্ধকার, মাথার ওপর অ্যাসবেসটাসের ছাউনি। একটা ঘর একটা পত্রিকার অফিস, সে ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে শোয়। বাকি ঘরের খাটে দুজনে শুল, আমি ও অ্যালেন ও পিটার মাটিতে কম্বল বিছিয়ে। মাঝে মাঝে একটা ভাঙা জানলা দিয়ে হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে—তাড়াতাড়ি উঠে সেটায় সোয়েটার কিংবা কম্ফর্টার দিয়ে গর্ত বোজানো হতে লাগল। 'কী সুনীল, অসুবিধে হবে না তো?' অ্যালেন জিগ্যেস করল।

আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আমি বললুম, 'কলকাতায় আমার নিজের থাকার বাড়িটাও অবিকল এই রকম।'

ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ

॥ ১ ॥

বার্লিনের ভাঙা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আমার বারবার একটাই প্রশ্ন মনে হচ্ছিল, এত কষ্ট করে যে দেওয়াল ভাঙা হচ্ছে, সেই কঠিন, হিংস্র দেওয়াল আদৌ কেন গাঁথা হয়েছিল? লোহা ও কংক্রিট মিশিয়ে এমনই সুদৃঢ়ভাবে গড়া হয়েছিল এই প্রাচীর, যেন তা শত-শত বৎসর দুর্ভেদ্য হয়ে থাকবে। সেই দেওয়ালের অদূরে পরপর গম্বুজ, তার ওপরে চব্বিশ ঘণ্টা মারাত্মক অস্ত্র হাতে প্রহরীরা। দুই দেশের সীমান্তের দেওয়াল নয়, একটা শহরের মাঝখান দিয়ে মাইলের পর মাইল দেওয়াল, যার দু-দিকে একই জাতির মানুষ, এক ভাষা, এক খাদ্যরুচি, এক রকম পরিচ্ছদ, একই শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তবু দেওয়াল গেঁথে তাদের পৃথক রাখার চেষ্টা। যারা দেওয়াল গেঁথেছিল, তারা কি জানত না, কঠোর নিষেধ মানুষ বেশি করে ভাঙতে চায়, যে-কোনও বাধা উল্লঙ্ঘন করার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত।

দেওয়াল দিয়ে ভাগ করা হল দুই জার্মানিকে। একদিকে সমাজতন্ত্র, অন্যদিকে ধনতন্ত্র। সমাজতন্ত্রী নেতাদের কাছে ধনতন্ত্র অতি কুৎসিত, দুর্গন্ধময়। নিছক ভোগ্যপণ্যের আড়ম্বর দেখিয়ে চোখ ধাঁধানো। ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতি সমাজতন্ত্রের দিকে, মানুষের সুখ, স্বপ্ন, শান্তি সেই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। বেশ তো, মানুষকে তা বোঝালে মানুষ নিজের ভালো নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু কেউ যদি না বুঝতে চায়, তা হলে কি তার ঘাড় ধরে, হাত-পায়ে শিকল বেঁধে কিংবা বুকের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে বোঝাতে হবে? কেউ যদি পূর্ব ছেড়ে পশ্চিমে যেতে চায়, তাকে গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে দিতে হবে? নিজের বাসস্থান নির্বাচনের স্বাধীনতাও মানুষের থাকবে না।

দেওয়াল গাঁথার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিশ্চিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ, যাঁরা নেতৃত্ব পদের অধিকারী, দেশের আপামর জনসাধারণের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, দেশের সব মানুষের মঙ্গলের দায়িত্ব তাঁদের হাতে। সেই মঙ্গল জোর করে মানুষের গলায় গিলিয়ে দিতেও তাঁদের আপত্তি নেই।

সব দেওয়ালেরই কোথাও না কোথাও একটা ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র ক্রমশ বড় হয়। দেওয়ালের ওপাশে কী আছে, তা জানার জন্য মানুষের কৌতূহল ছটফট করে। ১৯৬১ সালে এই দেওয়াল তোলার পর পুরো একটা প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। তবু তো পূর্ব দিকের সেই মঙ্গলের প্রচার মানুষ মানল না। সমস্ত দমননীতি ব্যর্থ করে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হুড়মুড় করে এদিকে চলে এল। মানুষের গড়া দেওয়াল মানুষই ভাঙল।

বাল্যকালে পাঠ্যবইতে রুসো'র একটি উদ্ধৃতি পড়েছিলাম, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।' এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও তীব্রভাবে মানুষের ইতিহাস বুঝি আর ব্যক্ত করা যায় না। মানুষ মানুষেরই কাছে পরাধীন। মানুষ তৈরি করেছে বিচার ব্যবস্থা, কিন্তু মানুষই মানুষের প্রতি সবচেয়ে অবিচার করে। মানুষের মেধায় এত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্ত্রের নির্মাণ, তার প্রয়োগ শুধু মানুষকেই ধ্বংস করার জন্য। জীবজগতে সবাই স্বার্থপর, তবু মানুষ ভালোবাসা শব্দটি নিয়ে গর্ব করে, অথচ মানুষের ইতিহাস হত্যালীলায় ক্লেদাক্ত। এককভাবে কিছু-কিছু মানুষ শুভ্র, সুন্দর, উদার

হতে পারে, কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে মানুষের নিষ্ঠুরতা হিংস্রতম পশুর চেয়েও সাংঘাতিক। একটি সিংহের সঙ্গে অন্য সিংহের যতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাক, কেউ কারুকে হত্যা করে না, এমনকি একটা পিঁপড়েও স্বজাতীয় অন্য পিঁপড়েকে মারে না। বাঘ যখন হরিণ শিকার করে তখন অন্য কোনও বাঘ তাতে জোর করে ভাগ বসাতে আসে না, কিন্তু সুসভ্য হিসেবে চিহ্নিত যে মানুষ, সে-ই শুধু অন্য মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়।

মানুষের তথাকথিত সভ্যতার বয়েস বড়জোর আট ন' হাজার বছর। মানুষ ছাড়া আর সমস্ত প্রাণীকেই প্রতিদিন খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। যাযাবর মানবজাতি যেদিন থেকে শস্য উৎপাদন ও খাদ্য সংগ্রহ করতে শিখল, সেই দিন থেকেই ঘর বাঁধার প্রশ্ন এল। খাদ্যচিন্তার সমাধান হতেই এল অন্য চিন্তা। কিছু মানুষকে ফসল উৎপাদন ও পশুপালনে নিযুক্ত রেখে বাকি মানুষেরা তা ভোগ করার অধিকার আদায় করে নিতে লাগল। খাদ্য উৎপাদনের জন্য যাদের শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় না, তারাই গড়ে তুলল গ্রাম, নগর, রাজ্য। একের ওপর অনের প্রভুত্ব, সবচেয়ে যে শক্তিশালী, সে দলপতি কিংবা রাজা। টোটেমগুলির বদলে দেব-দেবী, সর্বোপরি এক অলীক, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। নানারকম ভয়ের কাহিনি প্রচার করে আদায় করা হল ভক্তি। রাজারা নিজেদের আসন অটুট রাখার জন্য রটিয়ে দিল যে তারা ঈশ্বর নির্বাচিত। এই সভ্যতার উন্মেষ থেকে এতকাল পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রই চলে আসছে। গ্রিসের মতন কোনও কোনও জায়গায় গণতন্ত্র নিয়ে সামান্য পরীক্ষা হয়েছে বটে, কিন্তু সেখান থেকেই উঠে এসেছে আবার কোনও স্বৈরাচারী। সাধারণ মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনও দিনই কোনও মূল্য ছিল না, শাসক শক্তির সামান্য অঙ্গুলি হেলনের ওপর তার উত্থান-পতন নির্ভরশীল।

মাত্র দুশো বছর আগে, ফরাসি বিপ্লবের পরই বোঝা গিয়েছিল রাজতন্ত্রের শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। সে বিপ্লব সার্থক হয়নি, নেপোলিয়ান জনগণের মাথার ওপর আবার একটা সিংহাসন চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অসংগঠিত, নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানেও যে রাজার মাথার মুকুট বালির মতন ঝুরঝুরে হয়ে যেতে পারে, সেনাবাহিনীর এক অংশ ঘুরিয়ে নিতে পারে বন্দুকের মুখ, তা একবার প্রমাণিত হতেই ধরে নেওয়া গেল যে বিশ্বের রাজা-রানিদের আর পুতুল হয়ে যেতে বেশি দেরি নেই।

অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ায় ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। গোটা প্রাচ্য দেশে ও আফ্রিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা স্থাপন করতে লাগল উপনিবেশ, এইসব ঘুমন্ত অঞ্চল থেকে তারা লুণ্ঠন করতে লাগল বিপুল সম্পদ। কিন্তু ইউরোপের চিন্তাবিদরা বুঝে গিয়েছিলেন যে এরকম একতরফা শোষণের অবসান হতে বাধ্য অচিরকালের মধ্যেই। অ্যাডলফ তিয়ের এবং ফ্রাঁসোয়া গিজো'র মতন ফরাসি ঐতিহাসিকরা শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিসংগ্রামের কথা লিখলেন। সব সমাজেই মোটামুটি দুটি শ্রেণি আছে, শোষক ও শোষিত, এবং এদের মধ্যে সংগ্রাম বাধবেই। কার্ল মার্কস এঁদের থেকেই শ্রেণিবিভাজনের চিন্তাটা গ্রহণ করে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণি লোপ করাই সমাজ বিবর্তনের প্রধান পথ।

উপনিবেশগুলির মধ্যে আমেরিকা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং রাজশক্তিকে পরাজিত করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেখানে শ্রেণিসংগ্রাম হল না বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। জনসাধারণের নির্বাচিত সরকার। এই ব্যবস্থাটা টিকে যাওয়ায় গণতন্ত্রের ধারণাটা দারুণ জনপ্রিয়তা পেল, একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

তবু প্রশ্ন ওঠে, গণতন্ত্রে সত্যিই কি দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয়? ভোটের মাধ্যমে যাঁদের প্রতিনিধি করে পাঠানো হয় কেন্দ্রে, তাঁরা কি সত্যিই ভোটদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করেন? এক একটা দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও হালচাল তো রাজা-রাজড়াদেরই মতন। তাঁরা সশস্ত্র প্রহরী পরিবৃত হয়ে থাকেন প্রাসাদে। অন্য দেশে গেলে তাদের জন্য পাতা হয় লাল কার্পেট, কামান গর্জনের বাজে খরচ হয়। (একমাত্র ব্যতিক্রম

হো চি মিন, যিনি থাকতেন অতি সাধারণ এক গৃহে, অন্যদেশে এসে লাল কার্পেট সরিয়ে নিতে বলেছিলেন।) একজন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে জনসাধারণের মতামত না নিয়েই অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারেন। গণতন্ত্রে কেউ-কেউ বিশাল ধনী হয়, বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায়, তা রোধ করার কোনও পথ নেই। বলা হয় যে, গণতন্ত্রের একটা রক্ষাকবচ আছে, মন্ত্রীমণ্ডলী যতদিন খুশি গদি আঁকড়ে থাকতে পারে না, পাঁচ বছর পরে তাদের সরিয়ে ফেলা যায়। তাদেরও মনে-মনে সেই চিন্তা থাকে বলে তারা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক ফাঁক আছে। দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষেরই ভোটাধিকার আছে, ভোট বাক্সে তারা সেই অধিকার প্রয়োগ করে, গরিষ্ঠ সংখ্যক ভোটদাতার ইচ্ছে অনুযায়ী সরকার গঠিত হয়, এই নীতি কাগজে-কলমে সত্য, বাস্তবে সত্য নয়। টাকা খরচ করে ভোট কেনা যায়, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে প্রকৃত ভোটদাতাদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়। আমেরিকা একটি গণতান্ত্রিক দেশ বটে, কিন্তু কোটিপতি ছাড়া কেউ সে দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এবং কোটিপতিরা অন্য কোটিপতিদের স্বার্থ আগে দেখবে, এ আর এমন নতুন কথা কী? আর আমাদের মতন দেশে শতকরা ষাটজন মানুষ নিরক্ষর ও দরিদ্র, তারা জানেও না রাজধানীর অবস্থান কোথায়। অনেককাল আগে জর্জ বার্নার্ড শ গণতন্ত্রের ছিদ্রের কথা বলেছিলেন এই ভাবে, একটি কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা যদি হয় দশ জন, আর সেখানে যদি প্রার্থী থাকে চারজন, তাদের মধ্যে কেউ পেল একটি ভোট, কেউ পেল দুটি, কেউ পেল তিনটি, আর যে চারটি পেল সে নির্বাচিত হয়ে গেল, যদিও ছ-জন মানুষই তাকে চায়নি। এটা তিনি বলেছিলেন ইংল্যান্ডের কথা ভেবে, এখন অবস্থাটা অনেক বদলেছে। আমাদের মতন দেশে, এখন দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভোটযুদ্ধে অবতরণ করলেও টাকা ও লাঠির খেলা অবশ্যম্ভাবী। আবার কোনও-কোনও দেশে ভোটদাতা ভয়ের চোটে বাড়ির বাইরে পা-ই দেয় না, অথচ ভোট-বাক্স ভরে যায়।

মার্কস-এর শ্রেণিহীন সমাজের আদর্শ নিয়ে লেনিন যখন রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটালেন তখন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল সেদিকে। ফরাসী দেশে কমিউন ব্যর্থ হলেও কমিউনিজম শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ফরাসি বিপ্লব সে দেশে সার্থক না হলেও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ কিছুটা অন্যভাবে রূপায়িত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনেকেরই মনে হল, মনুষ্যসমাজের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পরবর্তী অবধারিত ধাপ এই সমাজতন্ত্র। কেউ অন্যের শ্রম নিয়ে মুনাফা করবে না, ব্যক্তি স্বার্থ মুছে যাবে, উৎপন্ন ফসল ও দ্রব্যের সম বণ্টন হবে, সকলেই সমান শিক্ষা, আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুযোগ পাবে। এর চেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা আর কী হতে পারে। এত যুগ-যুগান্তর পর সত্যিই মানুষের মুক্তির একটা উপায় দেখা গেল। এ যে স্বপ্নের সার্থকতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছড়িয়ে গেল পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলি দেশে। তারপর চিনে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আতঙ্কিত হয়ে উঠল, সমাজতন্ত্রের এই অগ্রগতি রোধ করার জন্য তারা বানাতে লাগল সাংঘাতিক সব অস্ত্রশস্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়নও চুপ করে বসে রইল না, শুরু হল কুৎসিত এক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। অস্ত্রের পাহাড় জমতে-জমতে এমন একটা অবস্থা হল যে দু-পক্ষই ইচ্ছে করলে পরস্পরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। প্রকৃত যুদ্ধ হল না, চলতে লাগল ঠান্ডা যুদ্ধ, তার জন্য খরচ হতে লাগল হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা। মানুষের ইতিহাসে বিনা যুদ্ধে এমন অর্থব্যয়ের মূর্খামি আর কখনও ঘটেনি।

এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন ও মার্কিন দেশের কর্ণধারদের প্রায়ই মোলাকাত হয়, তাঁরা হেসে-হেসে করমর্দন করেন। পারস্পরিক আক্রমণের আর কোনও প্রশ্নই যেন এখন নেই। তবু কি তাঁদের মনে হয় না, মাঝখানের এতগুলি বছরের রেষারেষিতে তাঁরা মনুষ্য সমাজকে কতটা পিছিয়ে দিলেন? মানুষের কত সম্পদের অপচয় হয়েছে ব্যর্থ অস্ত্রে?

মাঝখানের এতগুলি বছর।

॥ ২ ॥

হিটলারের আত্মহত্যা কিংবা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঠিক সতেরো দিন পর জার্মানি বিনা-শর্তে আত্মসমর্পণ করে মিত্রশক্তি বাহিনীর কাছে। জার্মান জাতি সারা পৃথিবীতে প্রভুত্ব করবে, এই স্বপ্নে তাদের মাতিয়ে তুলেছিল হিটলার। কিন্তু পরাজয়ের পর জার্মান রাষ্ট্রের অস্তিত্বই মুছে গেল। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশটাকে ভাগাভাগি করে নিজেদের দখলে রাখল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিত্র শক্তির কেউ আর কারু মিত্র নয়, তাদের মধ্যে মতভেদ প্রকট।

চার বছর বাদে, আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্সের অধিকৃত অংশে প্রতিষ্ঠিত হল একটি নতুন রাষ্ট্র, ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি, রাজধানী হল বন। তার এক মাসের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলীকৃত অংশে জন্ম নিল জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, রাজধানী হল দ্বিখণ্ডিত বার্লিন শহরের একটি অংশে। বার্লিনের অপর অংশে পশ্চিমি ত্রিশক্তির সৈন্যবাহিনী বসে রইল তাঁবু গেড়ে। একই সংস্কৃতি ও ভাষার উত্তরাধিকারী জার্মানরা দু'ভাগ হয়ে গেল পরের ইচ্ছায়।

১৯৫২ সালে স্টালিন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন বটে যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার শর্ত আরোপ করে দুই জার্মানিকে এক করা যেতে পারে, কিন্তু আমেরিকা তাতে রাজি হল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য পশ্চিম জার্মানিতে তাদের একটি ঘাঁটির খুবই প্রয়োজন, কেন-না, এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন একবার আচমকা বার্লিন ব্লকেড করে পশ্চিম বার্লিনের সৈন্য ও সাধারণ মানুষদের না খাইয়ে রাখার উপক্রম করেছিল, তখন বিমানে খাদ্য সরবরাহ করতে হয়েছিল দিনের পর দিন।

এক জাতি দু-ভাগ হয়ে গেল, দুটি আলাদা রাষ্ট্র। ভারতবর্ষও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল প্রভুদের ইচ্ছেয়, কিন্তু তার মূলে ছিল অন্তঃকলহ। আমাদের দেশের নেতা বা জনপ্রতিনিধিরা এক যোগে গলা মিলিয়ে বলতে পারেননি যে, না, আমরা দেশ-বিভাগ মানব না। হিটলারের পাপে জার্মানি তখন অপরাধবোধে নতশির। তাদের কিছুই বলার মতন মুখ ছিল না।

পশ্চিম জার্মানি হল। পশ্চিমি শক্তির তল্পিবাহক, পূর্ব জার্মানি গ্রহণ করল সমাজতন্ত্র। পশ্চিম জার্মানিকে প্রথম কয়েক বছর নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল উদ্বাস্তু সমস্যা। পোল্যান্ড এবং কাছাকাছি অন্যান্য দেশে যত জার্মান ছিল, তারা বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। ভাগাভাগির পর পূর্ব জার্মানি থেকেও দলে-দলে লোক চলে আসতে শুরু করল পশ্চিমে। অবশ্য এই সব উদ্বাস্তুরা দেশ গড়ার কাজে সাহায্যও করেছে। এরা প্রায় সকলেই দক্ষ শ্রমিক বা প্রযুক্তিবিদ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে যখন সক্ষম পুরুষ মানুষেরই প্রচণ্ড অভাব, তখন এইসব সুশিক্ষিত কর্মীরা দেশের বোঝার বদলে সম্পদ হিসেবেই গণ্য হল। প্রায় একটি ধ্বংসস্তূপ থেকে কীভাবে আবার জার্মানরা দেশটাকে গড়ে তুলল, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। আমরা অবহেলা ও ঔদাসীন্যে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে কলকাতা শহরটার অবস্থা কত যে খারাপ হয়ে গেছে, তা আমরা গ্রাহ্যও করি না। ফ্রাংকফুর্ট শহরটা যুদ্ধের সময় নব্বইভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেই ছবি আমি দেখেছি, আজ সেই আধুনিক শহরটি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শুধু জার্মানি নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ইত্যাদি দেশের অনেক শহরেরই পুনর্জন্ম হয়েছে।

পাশাপাশি বর্ধিত হতে লাগল একই জার্মান জাতির দুটি দেশ। এটা এমন কিছু অভিনব ঘটনা নয়। ইতিহাসের বিচারে মাত্র সেদিন, অর্থাৎ একশো কুড়ি বছর আগেও জার্মানি ছিল টুকরো-টুকরো কতকগুলি রাজ্য, ফ্রান্স ইংল্যান্ডের তুলনায় কোনও শক্তি হিসেবে গণ্যই হত না। মধ্য ইউরোপের তাঁবেদার ছিল তখন অস্ট্রিয়া। ভিয়েনার নির্দেশে জার্মান সামন্তরা ওঠা-বসা করত। প্রাসিয়ার প্রধানমন্ত্রী অটো ফন বিসমার্ক-এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেই জার্মান জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধে। বিসমার্ক ছিলেন প্যারিসে প্রাসিয়ার রাষ্ট্রদূত, তাঁকে ডেকে এনে যখন প্রধানমন্ত্রী করা হয়, তখন অনেকে চমকে

উঠেছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়াকে পর্যুদস্ত করার পর বিসমার্ক জার্মান জাতিকে সংঘবদ্ধ করে যে সামরিক শক্তি গড়ে তোলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, পরবর্তীকালে হিটলারের অভ্যুত্থান ও আর একটি বিশ্বযুদ্ধ। চূড়ান্ত পরাজয়ের পর বিজয়ী সম্মিলিত বাহিনী জার্মানিকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন করে দিতে চেয়েছিল, তার ফলে জার্মানি যে আবার টুকরো-টুকরো হয়ে যায়নি, তাই-ই যথেষ্ট, মাত্র দুটি ভাগে বিভক্ত হল।

একদিকে ধনতন্ত্র, অন্যদিকে সমাজতন্ত্র। একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিযোগিতা, বাজারি অর্থনীতি, লোভ, হিংসা, ভোগ্যপণ্যের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন, উৎপাদনভিত্তিক শ্রম, পুনরুত্থিত জাতীয়তাবাদ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, আত্মহত্যা ও যৌন অধিকারের চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা। অন্যদিকে মুনাফা ও পুঁজিবাদের বিলোপ, সমস্ত কল-কারখানার রাষ্ট্রীয়করণ, কৃষি ব্যবস্থায় সমবায়। প্রতিটি মানুষের শ্রম শুধু নিজের স্বার্থে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য, তার বিনিময়ে রাষ্ট্র প্রতিটি মানুষকে দেবে জীবিকা ও বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমান সুযোগ। পশ্চিমের মানুষ ছন্নছাড়া, সবসময় দৌড়চ্ছে, তবু নিঃসঙ্গ। পূর্বের মানুষ সংঘবদ্ধ ও সমাজের অংশ, ব্যক্তি স্বাধীনতার চেয়েও সমাজ-বাস্তবতা তার কাছে বড়।

পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের ব্যবস্থা নিশ্চিত অনেক বেশি সমর্থনযোগ্য, ইতিহাসের এক ধাপ অগ্রবর্তী, আমাদের মতন গরিব দেশের চক্ষে স্বপ্নের মতন। পশ্চিম জার্মানি ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পশ্চিমি শক্তির পক্ষচ্ছায়া পেয়েছে। পূর্ব জার্মানিও অসহায় নয়, শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অভিভাবক। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি তার আত্মীয়। তা ছাড়াও পৃথিবীর অনেক ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দেশের বহু সংখ্যক মানুষ এই সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। এখন এই দুই জার্মানি কে কতখানি এগোতে পারে, তা রুদ্ধশ্বাসে পর্যবেক্ষণ করা ছিল গত চল্লিশ বছরের ইতিহাসে একটি প্রধান বিষয়।

পশ্চিম জার্মানি গোড়ার দিকে কিছু সুযোগ পেয়েছে। আমেরিকার কাছ থেকে মার্শাল প্ল্যানে সাহায্য পেয়েছে চার বিলিয়ান ডলার, ওদিকে পূর্ব জার্মানি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিয়েছে দশ বিলিয়ান ডলার। পশ্চিম পেয়েছে অনেক দক্ষ কর্মী, পূর্বকে অনেক কলকারখানা নতুন করে গড়তে হয়েছে। পশ্চিম বিদেশিদেরও সাহায্য নিয়েছে যথেচ্ছভাবে। এমনকি আরব দেশ, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের অনেকেও সেখানে কাজ পায়, সেই তুলনায় পূর্বে বিদেশিদের সংখ্যা নগণ্য। পূর্ব জার্মানিকে কয়েক বছরের মধ্যেই শ্রমিক অসন্তোষের মুখে পড়তে হয়েছিল, তা দমন করার জন্য সোভিয়েত সৈন্য ডাকতে হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য তারপর যুদ্ধঋণ মকুব করে দেয় এবং পূর্ব জার্মানির অর্থনীতি আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র পূর্ব জার্মানির ওপরে একেবারে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়ও নয়। একটু ইতিহাস ঘাঁটলেই জানা যায় যে স্যাক্সনি এবং থুরিঙ্গিয়া অনেককাল আগে থেকেই সমাজতন্ত্রীবাদীদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। পূর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাক্তন প্রাসিয়া এক সময় রাশিয়ার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবে বার্লিনের বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। স্পার্টাকাশ লিগ কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বসূরি। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ব জার্মানিতে বিকশিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

একটা মজার ব্যাপার এই যে, জার্মানি ভেঙে দুটি আলাদা রাষ্ট্র হলেও পশ্চিম জার্মানি এই বাস্তবতাকে কোনওদিনই স্বীকার করতে চায়নি। পশ্চিমের সংবিধানে পূর্বের পৃথক অস্তিত্বটাকে মানাই হয়নি, সেখানে অখণ্ড জার্মান রাষ্ট্রের ধারণাটাকেই আঁকড়ে রাখা হয়েছিল। সারা পৃথিবী জানে যে জার্মানি নামে দুটি দেশ, শুধু পশ্চিম জার্মানিই যেন তা জানে না। পূর্ব জার্মানি যাতে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি না পায় তার জন্য পশ্চিম জার্মানি অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, একে-একে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিও জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিককে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে এবং ৭৩ সালে জি ডি আর রাষ্ট্রসংঘেও স্থান পায়।

দুই জার্মানি ও বার্লিনের মাঝখান দিয়ে কাঁটা তার ও শক্ত দেওয়াল গাঁথা হয়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে একই ঐতিহ্যের দুই শরিক এগোতে থাকে। কে কতটা এগোল, তা সঠিকভাবে বোঝা শক্ত ছিল। ষাটের দশকে ধ্বংস স্তূপ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পশ্চিম জার্মানি অর্থনৈতিক উন্নতির যেন ম্যাজিক দেখাল। ধনতান্ত্রিক দেশের খবরাখবর জানতে অসুবিধে নেই, আমরা সেইসব খবর বেশি পাই। ওদিকে জাপান, এদিকে পশ্চিম জার্মানি আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে লাগল। বিশ্বের বাজার, আশির দশকে পশ্চিম জার্মানির কারেন্সি অতিশয় শক্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হল। পূর্ব জার্মানির ব্যাবসা প্রধানত পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কতটা দৃঢ় হল তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। এক দল বলে ওরা কিছুই উন্নতি করতে পারছে না, অন্য দল বলে ওসব ধনতান্ত্রিক নোংরা দেশগুলির অপপ্রচার, সি আই এ-র চক্রান্ত ইত্যাদি। প্রচার, অপপ্রচার, দাবি ও পালটা দাবির ধূম্রজাল সরিয়ে দেখা যায় যে পূর্ব জার্মানিরও উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। মাঝারি শিল্পের উৎপাদন হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। অবশ্য কৃষি উৎপাদন শতকরা ১১ ভাগ মাত্র। তবু পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় পূর্ব জার্মানির অবস্থা ভালোই বলতে হবে। পোল্যান্ড-হাঙ্গেরি-বুলগেরিয়ার চেয়ে পূর্ব জার্মানির পার ক্যাপিটা ন্যাশনাল ইনকাম দ্বিগুণ। রুমানিয়া-যুগোশ্লাভিয়ার তিনগুণ। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির অর্ধেক। পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পূর্ব খণ্ড পিছিয়ে পড়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ যেন দুই ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই হঠাৎ ধনী হয়ে গেল, অন্য ভাই গরিব রয়ে গেল।

গরিবেরও তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। ধনতন্ত্রের বিলাস, ভোগবাদ, অপরের শ্রমে, মুনাফা ও ঐশ্বর্যের অস্থিরতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পূর্ব জার্মানির ধীর, শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তাদের সামনে রয়েছে সমাজতন্ত্রের অনেক উন্নত আদর্শ, তাদের জীবিকা ও শিক্ষা-চিকিৎসার সমান সুযোগ দিতে রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। জীবনের এই সব ব্যাপারের নিরাপত্তা পেলেও মানুষ বিষম প্রতিযোগিতাময় অবস্থার মধ্যে ফিরে যেতে চাইবে কেন? এই শতাব্দীর শেষ দশকের প্রান্তকালে এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। মানুষ কী চায়?

রাজতন্ত্রের অবসানের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, মানুষ গণতন্ত্রকে আবার চিনে নেওয়ার পর তার চেতনায় গণতন্ত্র একটা স্থায়ী আসন পেয়ে গেল। অনেক দেশে এখনও স্বৈরতন্ত্র রয়েছে। অনেক দেশে গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যভিচার ঘটানো হচ্ছে। তবু সাধারণ মানুষের মন থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শ আর কোনওদিন মুছে যাবে না। এমনকী স্বৈরাচারীরাও মিথ্যে হোক, ধাপ্পা হোক, গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা উচ্চারণ করে। কিছু কিছু দিতে বাধ্যও হয়। সেইরকমই সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ, চিন ও লাতিন আমেরিকায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইতিহাস তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সমাজতন্ত্র যে একটি আদর্শ ধারণা তা বিশ্বের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষই বিশ্বাস করে। এমনকি যেসব ধনতান্ত্রিক দেশ সমাজতন্ত্রের শত্রু হিসেবে পরিগণিত, সেইসব দেশেও ফাঁক ফোকর দিয়ে সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু ধারণা ঢুকে পড়েছে, কিছু কিছু ব্যবস্থাও সেইসব রাষ্ট্র গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেইসব দেশে শোষণ আছে, প্রতিযোগিতা আছে, ধনী ও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণিবিভাগ আছে, আবার বেকার ভাতাও প্রবর্তিত হয়েছে, বুড়ো-বুড়িদের ভার নেয় রাষ্ট্র, দরিদ্রের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। অর্থাৎ কোনও ধনতান্ত্রিক দেশই এখন আর সে দেশের কোনও মানুষকে চরম বঞ্চনা ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় না, মোটামুটি বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়ে বলে, বাকি উন্নতির জন্য তুমি লড়ে যাও। সেই মোটামুটি সুযোগটাও আমাদের মতন গরিব দেশের মানুষের কাছে অনেকখানি আর সমাজতান্ত্রিক দেশের অনেক মানুষের সমান-সমান।

কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো এঁকে গিয়েছিলেন। সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একটা আদর্শ হিসেবে ধরলেও সেই রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত

হবে, তা কখনও স্পষ্ট হয়নি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি, সর্বহারাদের হাতে ক্ষমতা যায়নি, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে পার্টির বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর হাতে। সেই গোষ্ঠী-মানুষ কী চায়, এই প্রশ্নে বারবার ভুল করছে।

মানুষ কী চায়? মানুষকে যদি বলা যায়, তোমাকে জীবিকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না। পরিবারের খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হবে না, মাথা গোঁজবার ঠাঁই তুমি পাবে, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র করে দেবে, তা হলে মানুষ এর বেশি আর কী চাইবে? সমস্ত জাগতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সে সমাজ গড়ার জন্য সম্পূর্ণ শ্রম ও উদ্যম দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক, তবু তা হয় না কেন? সেই মানুষকে যদি বলা যায়, তোমাকে খেতে-পরতে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু তুমি কী বই পড়বে, কী সিনেমা বা টি ভি প্রোগ্রাম দেখবে, তা আমি ঠিক করে দেব, বেশিদূর ভ্রমণের স্বাধীনতা তুমি পাবে না বাপু, বিদেশিদের সঙ্গে গালগল্প কোরো না, এসব অমান্য করলে কিন্তু তোমায় পুলিশে ধরবে। তাহলে কি সে তা মাথা পেতে মেনে নেবে? কতদিন মানবে? চেকোশ্লোকিয়ার বাতিস্লাভা শহরে গিয়ে আমি এক বৃদ্ধের করুণ বিলাপ শুনেছিলাম। ও দেশের চেক দিকের বড় শহর প্রাগ, আর শ্লোভাক দিকের বড় শহর বাতিস্লাভা। এক সময় ওই শহরের খুব রমরমা ছিল, এখন নিষ্প্রভ। প্রাগ-এর তুলনায় বাতিস্লাভা বেশ মলিন। তা নিয়ে চেকদের বিরুদ্ধে শ্লোভাকদের বেশ ক্ষোভ আছে। যাই হোক, এক বৃদ্ধ দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, ওই যে ছোট ছোট পাহাড় দেখছ; ওর ওপাশেই ভিয়েনা শহর। এককালে আমরা সকালবেলা ট্রামে চেপে ভিয়েনা চলে যেতাম। সেখানে বিয়ার খেতাম, কনসার্ট শুনতাম, বাড়ি ফিরে আসতাম মাঝরাতে। সরকারের কতকগুলো গর্দভ সীমানায় পাহারা বসিয়ে এখন আর আমাদের ভিয়েনা যেতে দেয় না। সেই বৃদ্ধের বিলাপ শুনে মনে হয়েছিল, তাঁকে খেতে পরতে দিয়ে একটা বড়সড়ো খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।

প্রাগ শহরে গিয়েছিলাম, একটি বইয়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করেছিলাম ফ্রানৎস কাফ্‌কার কয়েকটি বইয়ের। আমাদের সঙ্গিনী গাইডটি বেশ সাহসের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলেছিল, জানো না, এই শুয়োরের বাচ্চারা আমাদের কাফ্‌কা পড়তে দেয় না। আমি হতবাক! ফ্রান্‌স কাফকা চেকোশ্লোভাকিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত লেখক, প্রাগ শহরে তাঁর মূর্তি আছে। অথচ তাঁর রচনা সে দেশের লোককে পড়তে দেওয়া হয় না! এই সিদ্ধান্ত কারা নেয়? সেদিনই লেখক সমিতির এক সভায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমি ফস করে জিগ্যেস করলাম, তোমাদের দেশে কাফ্‌কার বই পাওয়া যায় না কেন? ওঁদের এক মুখপাত্র, বেশ হোমরা চোমরা চেহারা, পার্টির উচ্চ পদাধিকারী মনে হয়, বললেন কে বলেছে পাওয়া যায় না, যায় তো! আমি নাছোড়-বান্দার মতো বললাম, দোকানে খোঁজ করেছি, তারা বলল, নেই, কুড়ি বছর ধরে নেই! ভদ্রলোক জোর দিয়ে বললেন, নেই মানে আউট অফ প্রিন্ট। নিষেধ কিছু নেই। এটা একটা ডাহা মিথ্যে কথা। কুড়ি বছর ধরে কোনও প্রধান লেখকের সমস্ত রচনা আউট অফ প্রিন্ট থাকতে পারে? নিষিদ্ধ করার চেয়েও এই মিথ্যেটা আরও বেশি অন্যায়। সাধে কি আর সেখানে ক্ষমতাসীন পার্টির ওপর সাধারণ মানুষের এত ক্রোধ জমে ছিল।

দুই দেশের চলাচলের মধ্যে বিধিনিষেধ জারি করেছিল পূব জার্মানি এক-তরফাভাবে। ধনতন্ত্রের নষ্টামি ও ভোগ্যপণ্যের প্রলোভন যাতে এদিকে না আসতে পারে তাই পূর্ব দিকের এই কড়াকড়ি। পশ্চিম কিন্তু সব সময় পূর্বের মানুষদের স্বাগত জানিয়েছে। সমাজতন্ত্রের চেতনা এসে এদিককার ধনতন্ত্রকে বিষিয়ে দিতে পারে, এ ভয় তারা পায়নি। এটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা। বার্লিনের দেওয়াল যারা আগে দেখেছে, তারা সবাই জানে পশ্চিম দিকে কোনও বিধিনিষেধ নেই। পুলিশ-মিলিটারি নেই, যার খুশি দেওয়ালের কাছে আসতে পারে, কত লোক সেই দেওয়ালে ছবি এঁকেছে, কাব্য রচনা করেছে, অনেক দুঃখের বাণী লিপিবদ্ধ করেছে। আর দেওয়ালের পূর্ব দিকে ধারে কাছে কেউ আসতে পারবে না, কিছু দূর অন্তর অন্তর গম্বুজের ওপর মেশিনগান হাতে প্রহরী, হিংস্র কুকুর

ছাড়া রয়েছে নীচে, পূর্ব থেকে কেউ পালাতে চাইলেই মরবে। তবু বহু লোক প্রাণ তুচ্ছ করে পালিয়ে এসেছে। তারপর একদিন তারা দল বেঁধে দেওয়াল ভাঙতে এল।

বিনা যুদ্ধে দুই প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মিলন বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটা বিরাট ঘটনা। আমি ভুক্তভোগী, দেশবিভাগের ক্ষত আমার বুকে এখনও দগদগ করে। তাই একই জাতির দুটি অংশ আবার স্বেচ্ছায় পুনর্মিলিত হতে যাচ্ছে, এই ঐতিহাসিক দৃশ্যটির সাক্ষী থাকবার জন্যই আমি অক্টোবরের তিন তারিখে বার্লিন গিয়েছিলাম।

॥ ৩ ॥

এককালে অবিভক্ত বার্লিন শহরের প্রতীক ছিল বিশাল, জমকালো ব্রান্ডেনবুর্গ গেট। এখানেই উন্টার ডেন লিনডেন একটি ভুবনবিখ্যাত সুদৃশ্য রাস্তা। অদূরেই রাইখস্ট্যাগ প্রাসাদ, যা এক সময়ে ছিল জার্মানির পার্লামেন্ট, দলবল নিয়ে এর মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেবার ছুতোয় বিরোধীপক্ষকে ঘায়েল করে হিটলার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। পটসডামের প্লাত্স ছিল একটি ব্যস্ত চৌরাস্তা, সেখানেই মাটির নীচে তৈরি হয় গুপ্ত বুংকার। এই অঞ্চল থেকেই হিটলার বিশ্বব্যাপী মারণযজ্ঞ চালিয়েছিল। মিত্র বাহিনীর ট্যাংকগুলি যখন গোলাগুলি ছুড়তে-ছুড়তে রাস্তায় এসে পড়েছিল, তখন মাটির নীচে হিটলার নিজের মাথায় গুলি চালায়।

এই অঞ্চলটি বিশ্ব ইতিহাসের পানিপথ।

আবার এখানেই সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে, বাতাসে একটুও বারুদের গন্ধ না ছড়িয়ে দুই জার্মানির মিলন-উৎসব হল। বিনা যুদ্ধে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতন দুই প্রবল প্রতিপক্ষ হাত মেলালো। এটাও বিশ্ব ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

বারুদের গন্ধ একেবারে ছিল না বলাটা ঠিক হল না। ছিল, তবে তা গোলাগুলির নয়। বাজির। দু-তারিখ রাত্রি ঠিক বারোটার পর বাজি ফাটতে লাগল, আকাশে উড়ল শত-শত বর্ণাঢ্য হাউই। বিমান থেকে বোমা বর্ষণের বদলে মাটি থেকে উত্থিত হাউইগুলির ঝলমলে রঙে আকাশ রাঙিয়ে দেওয়ায় কত তফাত। একই জায়গা, একই মনুষ্যজাতি, কখনও হিংসায় পরস্পরের দিকে অস্ত্র হেনেছে, কখনও বন্ধুত্বে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছে।

সন্ধে থেকেই এখানে সমবেত হয়েছিল কয়েক লক্ষ মানুষ। কথা ছিল প্রেসিডেন্ট বুশ, মিখাইল গর্বাচভ, মার্গারিট থ্যাচার প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক-নায়িকারা উপস্থিত থাকবেন এই মিলন-উৎসবে, কিন্তু এর মধ্যে ইরাকের সাদ্দাম হুসেন মধ্যপ্রাচ্যে কুয়ায়েতি কাণ্ডটি ঘটাবার পর সবাই বিচলিত ও ব্যস্ত, তাঁরা আসতে পারেননি কেউ। অবশ্য এই রাত্তিরে নেতাদের বক্তৃতারও তেমন গুরুত্ব নেই, দু-দিকের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত হাত মেলানোই বড় কথা, মাঝখানের বিভেদের দেওয়াল ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গেই তো মিলনপর্ব শুরু হয়ে গেছে। মধ্যরাত্রি পার হওয়া মাত্র সমস্ত গির্জায় গির্জায় বেজে উঠল ঘণ্টা, কনসার্ট হলে ধ্বনিত হল বিটোফেনের নাইনথ সিমফনি, আকাশে ভাসল আলোর মালা। সঙ্গীত ও আলোর মধ্যেই ঘোষিত হল জার্মান জাতির পুনর্জন্মের বার্তা।

এমনও আশঙ্কা ছিল যে এই উৎসবের মধ্যে আকস্মিক কোনও হামলায় আনন্দের বদলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। সকলেই যে মনে-প্রাণে এই মিলন মেনে নিয়েছে এমন তো নয়, এমন হতে পারে না। সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় যারা সত্যিকারের দীক্ষিত তাদের ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা থাকতেই পারে। কিংবা পূর্ব দিকে যারা ক্ষমতার মৌরসীপাট্টায় ছিল, তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ক্ষোভ হঠাৎ বিস্ফোরিত হতেই পারে। আবার এদিকের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা সচ্ছল, তাদেরও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি রয়েছে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য। অনেকেই মিলনের সমর্থক নয়। কিন্তু জার্মানির

অন্যান্য শহরে দু-একটা ছোটখাটো গোলমাল হলেও বার্লিনের মূল উৎসব নিরুপদ্রবেই শেষ হল, অনেক রাত পর্যন্ত বাজি পুড়িয়ে, বিয়ার পান করে ও সমবেত গান গেয়ে ভোরের দিকে সবাই শুতে গেল, ঘুমোল পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত। ৩রা অক্টোবর জাতীয় ছুটির দিন ঘোষিত হয়েছে।

জার্মানরা ছুটির দিনে সাধারণত বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না। কিন্তু বিকেলের দিকে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে ব্রান্ডেনবুর্গ গেটের দিকে এগোতে গিয়ে পদে-পদে থামতে হল। দারুণ ট্র্যাফিক জ্যাম, খানিক বাদে ট্যাক্সি ড্রাইভারই বলল, এরকমভাবে যেতে গেলে তোমাদের অনেক পয়সা খরচ হয়ে যাবে, এর চেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো।

হাঁটতে-হাঁটতে খানিক দূর যাওয়ার পর দেখলাম, মানুষের ভিড় এতই বেশি যে পুলিশ আর কোনও গাড়িকে সামনের দিকে যেতেই দিচ্ছে না। এখনও অনেকটা পথ। আমি ও বাদল বসু আগে বার্লিনে এলেও রাস্তা-ঘাট তেমন চিনি না। অনেককাল বার্লিন প্রবাসী পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল চেক পয়েন্ট চার্লির দিকে। চার বছর আগে এই সীমান্তদ্বার দিয়ে আমরা কয়েকজন পূর্ব বার্লিনে গিয়েছিলাম, সেবার সমরেশ বসুও সঙ্গে ছিলেন। ভারতের সঙ্গে পূর্ব জার্মানির সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ওই চেক পয়েন্ট চার্লি পার হতে আমাদের অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল, প্রহরীদের উৎকট গাম্ভীর্যমাখা মুখ, শিকারি কুকুরদের বুক কাঁপানো হুঙ্কার, জালে ঘেরা সরু পথ দিয়ে অনেকটা হাঁটতে বাধ্য করা, একটা ঘরের মধ্যে খামোকা বসিয়ে রাখা। সমরেশ বসু অসুস্থ ছিলেন, বারবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলছিলেন, কেন, কেন এরা মানুষকে এত অবিশ্বাস করে!

আজ সেইসব অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা, পাহারা, অস্ত্রধারী সৈনিকদের এলাহি ব্যবস্থা কোন হাওয়ায় উড়ে গেছে। দেওয়াল ভাঙা, কাঁটা তারের বেড়া এখানে সেখানে গোটানো, শিকারি কুকুরগুলো কিনে নিয়ে গেছে বিভিন্ন দেশের ধনী কুকুর-প্রেমিকেরা। একটা ফাঁকা চুঙ্গি ঘরে বসে তিনটি বাচ্চা ছেলে মিলিটারি-মিলিটারি খেলছে। আমাদের দেখে তারা বলে উঠল, হল্ট। পাসপোর্ট। তারপর খিলখিল করে হেসে এ-ওর গায়ে গড়াতে লাগল। এই সরল সুন্দর বাচ্চাদের মুখগুলো দেখে চারবছর আগেকার সেই রক্ত চক্ষু প্রহরীদের মুখের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি।

পথে-পথে জনারণ্য, অনেকে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এনেছে, যাতে তারাও এই ঐতিহাসিক ঘটনার অংশীদার হতে পারে। ফুটপাথে বসে গেছে অজস্র অস্থায়ী দোকান, সেখানে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের সুভেনির, প্রাক্তন পূর্ব জার্মানির প্রহরীদের টুপি, ইনসিগনিয়া, বার্লিন দেওয়ালের টুকরো। এই দেওয়ালের টুকরো স্মারক হিসেবে রেখে দিতে অনেকেই চায়। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী তরুণ-তরুণী নিজেরাই হাতুড়ি -খন্তা এনে দেওয়াল ভাঙছে। তখনই আমরা দেখলাম, কী শক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল এই দেওয়াল। ভেতরে-ভেতরে লোহা বসানো রি-ইনফোর্সড কংক্রিট। দড়াম-দড়াম করে হাতুড়ির ঘায়েও একটা চল্টাও উঠছে না। যারা এই দেওয়াল বানিয়েছিল, তারা ভেবেছিল, এই বিভেদের প্রাচীর চিরস্থায়ী হবে। দেওয়ালের এক দিকটা বর্ণহীন, সেখানে কারুর হাত ছোঁয়াবার অধিকার ছিল না, অন্যদিকে নানারকম রঙিন ছবি ও কবিতা। দেখা যাচ্ছে ছবি ও কবিতাই জয়ী হল।

এক জায়গায় সেই উঁচু প্রাচীরের ওপর উঠে এক জোড়া যুবক-যুবতী গান গাইছে। মাত্র বছর খানেক আগেও ওইভাবে পাঁচিলের ওপর বসলে তাদের গুলি খেয়ে মরতে হত। এখন অনেক মানুষ তাদের গান শুনে হাততালি দিচ্ছে।

যেখানে সেখানে বসে গেছে এরকম গানের দল। লোকসঙ্গীতে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ। এ যেন জয়দেব-কেঁদুলির মেলা।

এই সীমানা-ভাঙা মানুষের উচ্ছ্বাস আনন্দ দেখে আমার ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায় দুই বাংলার মাঝখানের গভীর বিভেদের রেখার কথা। মনে তো পড়বেই। কলকাতা থেকে পশ্চিমবাংলার সীমানা পর্যন্ত রাস্তাটির নাম আজও যশোর রোড। ওপারের রাস্তাটির নামও যশোর রোড। এ যেন আমাদের উল্টার ডেন লিনডেন। দুই ভিয়েতনাম এক হয়ে গেছে, দুই কোরিয়া মিলনের আলোচনা চালাচ্ছে।

আর আমাদের দুই বাংলা? 'হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর দণ্ড তব।'

চেক পয়েন্ট চার্লির একটি প্রবেশপথের কাছে প্রচুর পুলিশের সমাবেশ, আশেপাশের উঁচু বাড়িগুলির প্রতিটি জানলায় নারী-পুরুষরা দূরের কী যেন দেখছে। মাইক্রোফোনে বারবার কিছু ঘোষণা করা হচ্ছে, পঙ্কজ আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, একটা মিছিল আসছে, তাই সাবধান করে দিচ্ছে পুলিশ। পথচারীদের সরে যেতে বলছে।

অনেকে ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু একটা মিছিল এলে ভয় পেয়ে পালাতে হবে কেন? পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। মিছিলটা সম্মিলিত বামপন্থীদের, তাদের মধ্যে উগ্রপন্থী, নৈরাজ্যবাদী ও আরও অনেক রকম দল আছে, তারা গোলাগুলি ছুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া, এই বার্লিনেই আছে নিও-নাতসি দল, তারা বামপন্থীদের সাংঘাতিক বিরোধী, তারাও হঠাৎ এসে আক্রমণ করতে পারে এই মিছিল।

আমরা প্রথমে একটা মাঠের মধ্যে সরে গিয়েও আবার কৌতূহল দমন করতে না পেরে ফিরে এলাম রাস্তার ধারে। মিছিলটি বেশ বড়, অন্তত দশ-পনেরো হাজার লোক তো হবেই। নানারকম ফেস্টুন ও প্লাকার্ড, পোশাকও বিচিত্র, অনেকের মুখোশ পরা, কেউ-কেউ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে, যাতে তাদের চিনতে না পারা যায়। মিছিলের দু'পাশে হাঁটছে প্রায় সমান সংখ্যক পুলিশ, অস্ত্রধারী, কিন্তু নত মুখ, তারা মিছিলে কোনও বাধা দেবে না, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতেও দেবে না। শেষ পর্যন্ত কোনও সংঘর্ষ হল না।

মিছিলের উচ্চ কণ্ঠে স্লোগান দুই জার্মানির মিলনের বিরুদ্ধে। ভোগ্যপণ্য ও ধনতন্ত্রের চাকচিক্যের মোহে পূর্ব জার্মানির এই আত্মসমর্পণ ঠিক হয়নি।

বামপন্থীদের এই প্রতিবাদ মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ যোগ দিয়েছে বটে, কিন্তু ঘরে-ঘরে আরও লক্ষ-লক্ষ মানুষের মনে এই রকম সংশয় রয়েছে। এত দ্রুত সব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় অনেকেরই খানিকটা ভ্যাবাচাকা অবস্থা। পূর্ব জার্মানির শাসকদলের বিরুদ্ধে সেখানকার মানুষ প্রথমে রাস্তায় নেমেছিল, তারা চেয়েছিল শাসক শ্রেণির অপসারণ, দুই জার্মানির মিলনের ধ্বনি তখনও ওঠেনি। ক্রমশ আবেগ উত্তাল হয়ে উঠল, প্রহরীদের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে হাজার-হাজার মানুষ ছুটে গিয়ে বার্লিনের দেওয়াল ভাঙতে লাগল। একটুখানি ভাঙা গর্ত দিয়ে বহু লোক চলে এল পশ্চিমে, সেখানেও তারা কোনও বাধা পেল না, বরং পেল উষ্ণ অভ্যর্থনা, হাতখরচ হিসেবে পশ্চিম জার্মানির দুর্লভ মুদ্রা এবং আশ্রয় ও জীবিকার আশ্বাস। প্রথম দিকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির বিশেষ কেউ পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসেনি, এসেছে দলে-দলে শ্রমিক শ্রেণি। শ্রমিকরাই সমাজতন্ত্রের মেরুদণ্ড, অথচ শ্রমিকরাই যদি এই ব্যবস্থা ছেড়ে অন্য ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে আর সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা যাবে কী করে? পোল্যান্ডে লেক ভালেনসার নেতৃত্বে আন্দোলনই সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিল যে, শ্রমিকরাও এই ব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

পশ্চিম জার্মানিতে গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ এই মিলনকে স্বাগত জানিয়েছে বটে, আবার অনেকে ভিন্নমতও পোষণ করেছে। গুন্টার গ্রাস-এর মতন কিছু কিছু লেখক-বুদ্ধিজীবী বলেছেন, এত তাড়াহুড়ো করে দুই জার্মানির মিলনের প্রয়োজন ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কী, ঐতিহাসিক তেসরা অক্টোবরে সারা জার্মানিতে যত বিরাট উৎসব ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যাবে বলে আশা করা গিয়েছিল, ততটা দেখা যায়নি। বার্লিনে বড় আকারের উৎসব-আড়ম্বর হয়েছে বটে, কিন্তু জার্মানির অন্যান্য শহরে কিছু পটকা ফেটেছে, বাজি পুড়েছে, কিছু গান-বাজনা হয়েছে মাত্র, তেমন কিছু উদ্দামতা ছিল না। সব মিলিয়ে বরং যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব।

এর একটা কারণ, গত নভেম্বরে যখন দেওয়াল ভাঙতে শুরু করল, দলে দলে লোক এদিকে আসত লাগল, দু-দিকের যাতায়াতে আর কোনও বাধা রইল না, তখনই বোঝা গিয়েছিল, দুই জার্মানিকে

আর আলাদা করে রাখা যাবে না। দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও মাঝখানে সীমানা থাকে, সেই সীমানা নিয়ে ঝগড়াও হয়, যেমন হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চিনের, হাঙ্গেরির সঙ্গে রুমানিয়ার। মাঝখানে কোনও সীমানা থাকবে না, অথচ একটি সমাজতান্ত্রিক ও একটি ধনতান্ত্রিক দেশের সহাবস্থান হবে, পৃথিবী এখনও এর যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

অর্থাৎ দুই জার্মানির মিলন দেওয়াল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, তেসরা অক্টোবর তার চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হল মাত্র। সাধারণ মানুষের মাতামাতি এই কয়েক মাসে অনেকটা কমে এসেছে, মনে অন্য প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারছে।

হির্সবার্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের স্ত্রী ট্রুডবার্টাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, দুই জার্মানির মিলনে আপনি খুশি? তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, এত কালের বিচ্ছেদটাই ছিল অস্বাভাবিক, এই মিলনের বাসনা প্রত্যেক জার্মানের মনের মধ্যে ছিল। ফ্রাংকফুর্ট আমাদের বাংলাদেশি বন্ধু ইউসুফের স্ত্রী ক্লাউডিয়াকে ওই একই প্রশ্ন করতে সেও বলেছিল, জার্মানরা একই জাতি, একই ভাষা, তবু তারা দুটো আলাদা দেশের নাগরিক হয়ে কেন থাকবে? সে সদ্য তরুণী, সে দারুণভাবে জার্মান! এ ছাড়াও বিভিন্ন শহরে কিছু সাধারণ জার্মানদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, সীমানা মুছে যাওয়ায় তারা আনন্দিত। এটা যেন তাদেরই জয়। তবু কিছু কিছু সংশয় তাদের মনে এখন উঁকি ঝুঁকি মারছে। আবেগ ও উচ্ছ্বাস কেটে গেলে কিছু কিছু বাস্তব সত্য মনে পড়ে। পশ্চিম জার্মানি অর্থনৈতিকভাবে খুবই শক্তিশালী দেশ, বিশ্বের প্রধান তিনটি দেশের অন্যতম, তবু এত বড় একটা বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কি সামলাতে পারবে? এখানকার নাগরিকরা এতদিন যতখানি আরামে-বিলাসে ছিল, তার কিছু কিছু তো ছাড়তে হবে বটেই। ট্যাক্সের বোঝা চাপবে, এর মধ্যেই কিছু কিছু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। পশ্চিমের তুলনায় পূর্বের কলকারখানাগুলি অনুন্নত। সেগুলির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন, কাজ দিতে হবে প্রচুর বেকারকে। পশ্চিম জার্মানিতে বহু সংখ্যক বিদেশি শ্রমিক ও কর্মী রয়েছে, তুর্কি, ইতালিয়ান, ভারতীয়-বাংলাদেশি-পাকিস্তানিও। তাদের নিয়ে কী হবে, এবার কি তাড়িয়ে দিতে হবে এই হাজার-হাজার মানুষকে?

পূর্বের লোকদের মধ্যেও বাঁধ ভাঙার প্রাথমিক আনন্দ ও জোয়ার কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পর তাদের মনেও প্রশ্ন জাগে। পুনর্মিলিত দেশে তাদের অবস্থাটা ঠিক কীরকম হবে। বিরাট ধনীর বাড়িতে গরিব আত্মীয়ের আশ্রয় নেওয়ার মতন? এরা আশ্রয় দিচ্ছে, হাত খরচ দিচ্ছে, এরপর কাজের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে কী খানিকটা দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব নেই? পশ্চিমের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, পূর্বের লোকেরা কাজ করতে জানে না, অলস।

যেখানেই পূর্ব-পশ্চিমের ভাগাভাগির প্রশ্ন আসে, সেখানেই একটা যেন দো-টানার ভাব থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পরকে ঠিক যেন গ্রহণ করতে পারে না, আবার বর্জনও করতে পারে না, আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা চলতে থাকে। মানুষের ইতিহাসেই বারবার দেখা যায় পূর্ব-পশ্চিমের এই দ্বন্দ্ব ও টান। তার কারণ, আমার ধারণা, প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যেও থাকে পূর্ব-পশ্চিম, উদয় ও অস্তের বৈপরীত্য।

গরিবেরও আত্মমর্যাদা বোধ থাকে। সব গরিব কখনও ধনী আত্মীয়দের দিকে লোলুপ হয়ে ছুটে যায় না। সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষের সেরকম আত্মমর্যাদা বোধ থাকাই স্বাভাবিক। তবু পূর্ব থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ দেওয়াল ভেঙে পশ্চিমের দিকে যেতে চাইল কেন? শুধু ভোগ্যপণ্য আর ধনতন্ত্রের চাকচিক্যের লোভে? ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চেয়েও সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে আদর্শ হিসেবে উচ্চতর। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি। তবু সেই আদর্শের ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারছে না কেন?

মানুষ আদর্শ চিবিয়ে খায় না। আদর্শের জন্য অনেকে প্রাণ পর্যন্ত দেয়, সাধারণ মানুষও কিছু কিছু আত্মত্যাগ করতে রাজি থাকে। একটা সমাজ ব্যবস্থার যখন পালাবদল ঘটে তখন কিছু

কিছু বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, সাধারণ মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু কতদিন? পাঁচ বছর, দশ বছর? পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে নিশ্চয়ই নয়। পুরো একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে গেল। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পালাবদলের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা অত মনে রাখে না। তারা দেখে যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান যদি সব দুর্যোগ সামলে নিয়ে এত সচ্ছল হতে পারে, তা হলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পারবে না কেন? সমাজতান্ত্রিক দেশে বিধি-নিষেধের কঠিন বন্ধন, অথচ ওসব দেশের মানুষ খোলামেলা। এই মুক্তির টানে এবং পেটের টানেই দেওয়াল ভেঙেছে।

শুধু ভোগ্য পণ্য, অর্থাৎ গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি, চকলেট, মদের লোভ নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের প্রতিদিনের মূল খাদ্যেও টান পড়েছিল। মাংস আছে তো রুটি নেই, রুটি আছে তো মাখন নেই। দুধ নেই। শাক-সবজি ফল-মূল নেই, কফি নেই। এই নেই-এর তালিকা এক-একটা দেশে আরও সুদীর্ঘ। রুমানিয়ায় টয়লেট পেপার পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইলেকট্রিসিটি অকুলান, প্রচণ্ড ঠান্ডায় লোকে ঘর গরম করতে পারেনি। মাংস, রুটি, আলু, মাখন, আর দুধ, এইগুলি ইউরোপীয়দের প্রধান খাদ্য, এতেও টান পড়লে কত বছর তারা আদর্শ আঁকড়ে থাকবে?

সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ গরিব হয়ে থাকবে, যুগের পর যুগ কৃচ্ছ্রসাধন করবে। এমন কথা মার্কসবাদে কোথাও নেই। বরং এই ব্যবস্থায় সব মানুষের সচ্ছল, সুখী থাকার কথা। তবু কোনও গলদে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উৎপাদন কমে গেল, সাধারণ মানুষকে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও দিতে পারল না সরকার? অথচ অন্যদিকে ইউরোপের যেসব দেশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র আঁকড়ে আছে, তারা দিব্যি ফুলে ফেঁপে উঠল কী করে? সেসব দেশে সব জিনিসই অঢেল।

আমার একটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে। অনেক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্রের সমর্থক। অনেক তাত্ত্বিক ও অধ্যাপক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন এবং শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় তা প্রচার করে আসছেন। তাঁরা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শ্রদ্ধেয়, কিন্তু আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র সমর্থনীয় হলেও তার রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োগে যে অনেক ছিদ্র দেখা যাচ্ছে, সেসব দেশে যে অনেক বছর ধরেই নানা রকম অব্যবস্থা ও অনটন চলছে, সে সম্পর্কে তাঁরা কখনও কিছু বলেননি কেন? জানতেন না, কিংবা জেনেশুনেও সত্য গোপন করেছেন? এতরকম সেমিনারে তাঁরা ওই রকম সব দেশে যান। তাঁদের চোখে পড়েনি? নিছক প্রচার পুস্তিকার ওপর নির্ভর না করে ওইসব দেশের প্রকৃত অবস্থা জানার আগ্রহ তাদের হয়নি? একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি বছরখানেক আগে আমাকে আফসোসের সুরে বলেছিলেন, মস্কোয় মাংস পাওয়া যায় না, সোসালিজম টিকবে কী করে? আমি অবাক। তিনি অন্তত পঞ্চাশবার মস্কো গেছেন। সেখানে যে প্রায়ই মাংস পাওয়া যায় না, কখনও মাংস এলে দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়ে, তা কি তিনি জানতেন না? গর্বাচভ পেরেস্ত্রোইকা ঘোষণা করার পর তিনি মুখ খুলেছেন? সমাজতন্ত্রের সমর্থন করেও তার বাস্তব প্রয়োগের দোষত্রুটির বিচার-বিশ্লেষণ করা যেত না? সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধীরা এর যত না ক্ষতি করেছে, সম্ভবত তা'র চেয়েও বেশি ক্ষতি করেছে এর সমর্থক ও শাসকদের মিথ্যাচার ও গোপনীয়তা। সত্যকে কিছুতেই বেশিদিন চেপে রাখা যায় না। গর্বাচভ বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী মানুষ, তিনি তা বুঝতে পেরেই বিক্ষুব্ধ মানুষদের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করেছেন, খুলে দিয়েছেন দ্বার।

॥ ৪ ॥

বিভক্ত অবস্থায় পূর্ব বার্লিন আমি একবার দেখেছি। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক পূর্বের জাঁকজমক কম ছিল, কিন্তু একটা নিরলঙ্কার সৌন্দর্য চোখ টেনেছিল। পশ্চিমের এক-একটি

শহর এত বেশি ঝকঝকে তকতকে, এত বেশি নিখুঁত যে এক-এক সময় বেশ একঘেয়ে লাগে। যেমন ফ্রাংকফুর্ট শহর, যাতায়াতের সবরকম সুবিধে আছে, পৃথিবীর যে-কোনও খাবার পাওয়া যায়, সমস্ত রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, তবু মুগ্ধ হওয়ার মতন কিছু নেই। সেই তুলনায় পূর্ব বার্লিনের একটা চরিত্র আছে, এবং প্রাচীন শহরের অংশ হিসেবে দ্রষ্টব্য অনেক। মহাযুদ্ধের পর ভাগাভাগির সময়ে সোভিয়েত অংশেই বেশিরভাগ মিউজিয়াম, পুরোনো গির্জা ইত্যাদি পড়েছে। চমৎকার গাছপালা দিয়ে সাজানো বিশ্ববিখ্যাত উন্টার ডেন লিনডেন রাস্তার দুপাশে বিশাল সব বারোক-রোকোকো ধরনের প্রাসাদ। এবং তৈরি হয়েছে প্রচুর নতুন বাড়ি, বিরাট বিরাট হাউজিং কমপ্লেক্স। দেশের প্রতিটি নাগরিককে জীবিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান দিতেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ভারতীয়, আমরা ভারতের গ্রামের মানুষের অবস্থা জানি, শহরের ফুটপাথের অজস্র সংসার দেখেছি, আমাদের কাছে এই প্রতিশ্রুতি, সমস্ত মানুষের জন্য জীবিকা ও পাকা বাড়িতে মাথা গোঁজার মতন স্থান, এই দুটি জিনিসই তো সার্থকতার চরম। এই জন্যই তো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন।

অবশ্য সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলি দেশের সর্বত্র এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছে কি না সে বিষয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা শোনা যায়। একই ফ্ল্যাটে দু-তিনটি পরিবারকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিংবা জীবিকার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মূল্য দেওয়া হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিষয়ে কোনও মন্তব্য করার অধিকার আমার নেই। আমি নিজের চোখে যা দেখেছি কিংবা পারিপার্শ্বিক দেখে যেটুকু বুঝেছি, তার বাইরে যেতে চাই না।

পূর্ব বার্লিনে, সোভিয়েত ইউনিয়নে, যুগোশ্লাভিয়ায় আমি সরকারের বানানো ফ্ল্যাটে গিয়েছি কয়েকটি পরিবারের কাছে। বাড়িগুলো আহামরি কিছু না, আমাদের দেশের সরকারি বাড়ির মতনই সস্তা দায়সারা বলে মনে হয়। লিফটের চেহারা বেশ খারাপ, হয় খুব ছোট, দু-তিনজনের বেশি একসঙ্গে ওঠাই যায় না, অথবা রডগুলো ঘট-ঘটাং শব্দ করে কাঁপে, রক্ষণাবেক্ষণে অমনোযোগ। ফ্ল্যাটের ঘরগুলো খুপরি খুপরি। তবু আমি অভিযোগের কিছু দেখিনি, আমার ভারতীয় চোখে শহরে বস্তি কিংবা গ্রামের ফুটোফাটা কুঁড়ে-ঘরগুলির তুলনায় ওই সব ফ্ল্যাট অনেকগুণ ভালো!

পশ্চিম বার্লিন ও পূর্ব বার্লিনে গেলে ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের চেহারার বেশ একটা তুলনামূলক রূপ দেখার সুযোগ পাওয়া যেত। পশ্চিম থেকে পূর্বে গেলে মনে হয়নি যে এরা খুব দুঃখ-কষ্টে আছে, মনে হত সব কিছুই তো ঠিকঠাক চলছে, তবু কিছু মানুষ দেওয়াল টপকে ওদিকে যেতে চায় কেন? পশ্চিমের লোকেরা অবশ্য বলত, পূর্ব বার্লিন হচ্ছে সমাজতন্ত্রের শো পিস, সীমানার ওপারেই বড় বড় বাড়ি তুলেছে, আর সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে, টুরিস্টদের দেখাবার জন্য। আর পূর্বের কিছু কিছু লোক বলেছে, পশ্চিমের দোকানগুলো কনজিউমার গুডসে ভরতি। ওসব আমাদের না পেলেও চলবে।

এবারে ঠিক করলাম, সদ্য ভূতপূর্ব জার্মানির অন্য একটা শহর দেখতে হবে। ফ্রাংকফুর্ট থেকে বার্লিন পর্যন্ত যে টানা সড়ক, তারই এক পাশে একটি শহর আইসেনাখ। এক দুপুরে বাবুল আর জামি নামে বাংলাদেশি দুই তরুণ বন্ধুর সঙ্গে আমি আর বাদল রওনা দিলাম সেদিকে। বাবুল আর জামি দুজনেই এদেশে আছে এক যুগের বেশি সময়।

এই পথ ধরে বার্লিনের দিকে যেতে গেলে খানিকটা পূর্ব জার্মান ছিটমহল পার হতে হত। অর্থাৎ সেই কাঁটাতারের বেড়া, চেক পোস্ট, ওয়াচ টাওয়ার, গোমড়ামুখো রক্ষী। এখন সেই এলাকাটা জনশূন্য, চেক পোস্ট খাঁ-খাঁ করছে, কাঁটাতারের বেড়াটেড়া অনেকটাই উপড়ে ফেলা হয়েছে। একটা ওয়াচ টাওয়ারের গায়ে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় অক্ষরে জার্মান ভাষায় কী যেন লেখা। আমি জিগ্যেস করলাম, ওখানে কী লিখেছে? জামি অনুবাদ করে দিল, দোজখের কুত্তা।

সীমান্ত রক্ষীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কী পরিমাণ ঘৃণা জমেছিল, ওই দুটি শব্দেই

তা বোঝা যায়।

রাস্তা দিয়ে যে-সব গাড়ি যাচ্ছে, তার কোন কোনটা পূর্ব জার্মানির মানুষের, তা জামি অনায়াসে বলে দিতে পারে। সে গাড়িগুলোর চেহারা ছোট ছোট, টু স্ট্রোক ইঞ্জিন, পশ্চিমি মজবুত গাড়িগুলির পাশে সেগুলোকে খেলনা-খেলনা মনে হয়। তবু সেগুলোকে বলা যেতে পারে সস্তা জনতা গাড়ি। সীমান্ত খুলে যাওয়ার পরই পূর্ব জার্মানির অনেক লোক পশ্চিমে এসে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনতে শুরু করেছে।

বাবুল বলল, ফ্রাংকফুর্টের রাস্তায় মানুষদের দেখেও আমি বলে দিতে পারি, কারা কারা পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছে।

এটা খুবই অবাক হওয়ার মতনই কথা। আমরা শুধু চেহারা দেখে কে ইংরেজ, কে ফরাসি আর কে জার্মান বুঝতে পারি না। আর জার্মানদের মধ্যেই কে পূর্বে থাকে আর কে পশ্চিমে, তা কী করে বলা সম্ভব?

বাবুল বলল, প্রথম তো জুতো দেখলেই চেনা যায়। ছেঁড়াখোঁড়া, পুরোনো জুতো, তা ছাড়া পোশাকের মধ্যেও এমন একটা কিছু আছে...

মূল রাস্তা ছেড়ে আমরা বাঁক নিলাম আইসেনাখ শহরের দিকে। একটু পরেই আমাদের গাড়িটা লাফাতে লাগল। ভাঙাচোরা রাস্তা, অনেকটা কলকাতা-কলকাতা ভাব। দু'পাশের বাড়িগুলির চেহারা মলিন, অনেক দিন রং করা হয়নি, এখানে সেখানে কিছু আবর্জনা জমে আছে, আমাদের বেশ পরিচিত লাগে।

আইসেনাখ শহরটি কিন্তু ইতিহাস বিখ্যাত। প্রাচীন এই শহরটিতে দ্রষ্টব্য স্থান আছে অনেক, রোমান আমলের ওয়ার্টবুর্গ দুর্গ, তার পেছনেই থুরিঙ্গিয়া অরণ্য। প্রখ্যাত খ্রিস্টিয় সংস্কারক মার্টিন লুথারের নাম এই শহরটির সঙ্গে জড়িত, এখানে তিনি কিছুদিন নির্বাসিত ছিলেন, সেই সময়ই তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন গ্রিক থেকে জার্মান ভাষায়, আধুনিক জার্মান গদ্যের বিকাশ হয় সেই অনুবাদ থেকে।

এখানেই জন্মেছিলেন সঙ্গীত কমপোজার বাখ। রিচার্ড ভাগনারও তাঁর একটি বিখ্যাত অপেরা রচনা করেছিলেন এখানে। আর একটি তথ্যও উল্লেখযোগ্য, ১৮৯৮ সালে এই শহরে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম মোটর গাড়ি। তবে, এখন এখানে যে ছোট ছোট গাড়ি তৈরি হয়, তা পৃথিবীর অনেক দেশের গাড়ির সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না।

বিকেল গড়িয়ে গেছে বলে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমাদের ঘুরে দেখা হল না। আমরা এসে পৌঁছলাম একটা প্রশস্ত চত্বরে, যেখানে একটি অস্থায়ী বাজার বসেছে।

বাজার ঘুরে দেখলে সমাজের স্বাস্থ্য খানিকটা আন্দাজ করা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পশ্চিমি কনজিউমার গুড়সের বিরুদ্ধে একটা প্রচার সব সময় চলেছে, কিন্তু তাদের দেশে যে তরি-তরকারি, মাংস ও ফলমূলের যথেষ্ট অনটন, তা স্বীকার করা হয়নি। আমি অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের বড়-বড় শহরের বাজার ঘুরে দেখেছি। সেইসব বাজারের তুলনায় আমাদের দেশের যে-কোনও বাজারে অনেক বেশি জিনিস পাওয়া যায়। বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহরের বাজারে দেখেছি, মাংসের দোকানের মতন ফুলকপির দোকানের সামনেও লাইন, সেই লাইনে যত লোক দাঁড়িয়ে আছে, দোকানে তত ফুলকপি নেই। কিয়েভ শহরে দেখেছি, একজন লোক শশা হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, একটি বৃদ্ধা তাকে জিগ্যেস করলেন, শশা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, তারপর সেই দিকে ছুটে গেলেন। শশা জিনিসটাও যে এমন লোভনীয় বা দুর্লভ হতে পারে, তা সেদিনই প্রথম জানলাম। শুধু চিনের কোনও কোনও বাজারে তরিতরকারি ফলমূল যথেষ্ট দেখেছি।

আইসেনাখের বাজারটিতেও বিশেষ কিছুই নেই। আগে একটা সরকারি বাজার ছিল, এখন কিছু কিছু লোক তাদের গাড়ির পেছনের ডালা খুলে কিংবা ছোট তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সাজিয়ে

ব্যক্তিগত দোকান খুলে বসেছে। কেউ কেউ কাছাকাছি পশ্চিমি শহর থেকে চকচকে খেলনা, জুতো, হাল ফ্যাশানের পোশাক আর নানারকম ফলমূল কিনে এনে বিক্রি করছে এখানে। এখানে যাদের হাতে একটু পয়সা আছে, সবাই পশ্চিমে বাজার করতে যায়। পশ্চিম বার্লিনে পঙ্কজের স্ত্রী মাধুরী আমাকে বলেছিল, গত কয়েক মাস তার বাচ্চা মেয়ের জন্য দুধের জোগাড় করা খুব মুশকিল হয়ে পড়েছিল। বার্লিনের দেওয়াল ভাঙার পর দলে-দলে পূর্বের মানুষ, বিশেষ করে পোল্যান্ডের লোকেরা এসে প্রচুর জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেত নিজেদের দেশে ব্যবসা করার জন্য। পোলান্ডে দুধের খুব অনটন, তাই তারা সব দুধ কিনে নিয়ে যেত। পোলান্ডে সেই জন্যই তখন ডলারের ব্ল্যাক মার্কেট তুঙ্গে।

এখানকার বাজারে অনেক জায়গায় কলা বিক্রি হচ্ছে। এত কলা কেন? আমাদের সঙ্গীরা বলল, আহা, ওরা যে অনেকদিন কলা খায়নি।

কলা নিয়ে পশ্চিম বার্লিনে একটা মজার গল্প চালু আছে। এটাকে গল্প হিসেবেই গণ্য করা উচিত।

পাঁচিল তোলার পর পূর্ব ও পশ্চিমের দুটো বাড়ি একেবারে মুখোমুখি। দুটি বাড়িতেই একটি করে বাচ্চা মেয়ে থাকে, তারা জানলা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। একদিন পশ্চিমের মেয়েটি একটি ইলেকট্রনিক খেলনা দেখিয়ে বলল, এই, তোদের এটা আছে? পূর্বের মেয়েটি একটা সুন্দর পুতুল তুলে ধরে বলল, ওটা না থাকলে কী হয়, আমাদের এত সুন্দর পুতুল আছে। পশ্চিমের মেয়েটি এক জোড়া নতুন জুতো দেখিয়ে বলল, তোর আছে? পূর্বের মেয়েটি একটা কারুকার্য করা লেসের স্কার্ফ দেখিয়ে বলল, তোর এটা আছে? এইভাবে দুটি মেয়েই নানারকম জিনিস তুলে তুলে দেখাতে লাগল। এক সময় পশ্চিমের মেয়েটি একটা পাকা কলা তুলে দেখিয়ে বলল, তোর কলা আছে? পূর্বের মেয়েটি কখনও কলা চোখেই দেখিনি। কলার বদলে অন্য কোনও ফলও দেখাবার মতন তাদের বাড়িতে নেই। সে তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে মাকে জিগ্যেস করল, মা, আমাদের কলা নেই কেন? মা বললেন, আমাদের কলা নেই তাতে কী হয়েছে, আমাদের কমিউজিনম আছে। পূর্বের মেয়েটি সে কথা জানাতেই পশ্চিমি মেয়েটি একটু দমে গেল। কমিউনিজম কী তা সে জানে না, বাড়িতে তার মা-বাবা কেউ নেই তখন, জিগ্যেসও করতে পারছে না। কিন্তু সে পশ্চিমি কনজিউমার সোসাইটির মেয়ে তো, সে জানে, পয়সা থাকলে সব কিছুই কেনা যায়। তাই সে বলল, ঠিক আছে, আমার বাবাকে বলব, আমার জন্যও কমিউনিজম কিনে দেবে? তখন পূর্বের মেয়েটির মা মেয়েকে বলল, তুই ওকে বলে দে, ও যদি কমিউনিজম কেনে, তা হলে কিন্তু আর কলা পাবে না।

বাজারের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে লাগলাম। দু'পাশে দোকানপাট, এটাই এ শহরের প্রধান বাণিজ্য এলাকা। যে-কোনও পশ্চিমি শহরের তুলনায় দোকানগুলির দৈন্যদশা অতি প্রকট। আমাদের চোখেই এটা ধরা পড়ে। বাবুল ও জামির মতে, এটাকে জার্মান শহর বলে চেনাই যায় না। কোনও দোকানের অনেকগুলো তাক খালি, এমন দোকান পশ্চিম জার্মানিতে কল্পনাও করা যায় না।

এক সময় সবই ছিল সরকারি দোকান, এখনও অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস হয়নি, পালাবদল সবে শুরু হয়েছে, অনেক সরকারি দোকান রয়ে গেছে, পাশাপাশি কিছু ব্যক্তিগত ব্যাবসাও শুরু হয়েছে। অনেক দোকানপাট ভেঙেচুরে নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, মনে হয় পশ্চিমি ব্যবসায়ীরা সেখানে শাখা খুলছে। মিস্তিরিরা খাটাখাটুনি করছে পূর্ণ উদ্যমে। সরকারি দোকানগুলি নিষ্প্রভ, তার পাশেই কোনও ব্যক্তিগত মালিকানার দোকানে লোকজন বেশি।

চিনে গিয়েও এ জিনিস দেখেছি। মাও সে তুং-এর আমলের চিনে সমস্ত দোকানই ছিল সরকারি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, জামা-কাপড়ের দোকান, সেলুন, খবরের কাগজের স্টল, ট্যাক্সি ইত্যাদি

সবই। এখন কিছু-কিছু ব্যক্তিগত ব্যাবসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে, পাশাপাশি একটা বিরাট সরকারি দোকান ও এক দম্পতির পরিচালনায় ছোট দোকানের তফাতটা বোঝা যায়। সরকারি দোকানের কর্মচারীরা যে-যার নিজের জায়গায় অলস ভঙ্গিতে বসে আছে, খদ্দেররা এলে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন তাদের দয়া করছে, উঠে গিয়ে একটা জিনিস আনতে হলে তারা বরাত দিচ্ছে অন্য একজনের ওপর। আর পাশের ছোট্ট দোকানটিতে স্বামী-স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ডাকছে, কারু একটা জিনিস পছন্দ না হলে তাকে আর পাঁচটা জিনিস দেখাচ্ছে, একটু দাম কমিয়ে দিচ্ছে। সেই দোকানেই ভিড় বেশি।

বেইজিং শহরে একটা মজার কথা শুনেছিলাম। বেশ কয়েকজনের কাছে জেনেছি যে চিনের শিক্ষিত মেয়েরাও এখন বিয়ের পাত্র হিসেবে ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে একজন নাপিত কিংবা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেশি পছন্দ করে। অবাক হওয়ার মতন ঘটনা নয়। এর কারণ এই যে, কিছু কিছু সেলুন ও ট্যাক্সিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের ধরাবাঁধা মাইনে, পরামানিক বা ট্যাক্সি চালকরা যত খাটবে তত বেশি রোজগার করবে, তারা এখন রীতিমতন ধনী।

আমাদের সঙ্গে একটি সুন্দরী তরুণী আগাগোড়া ছিল গাইড হিসেবে। তার চুলের খুব বাহার। আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি কোন দোকানে চুল কাটতে যাও, সরকারি, না প্রাইভেট? মেয়েটি চিন্তা না করেই উত্তর দিয়েছিল, প্রাইভেট। আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম, কেন, সেখানে কি সস্তা? মেয়েটি বলেছিল, না, সস্তা নয়, কিন্তু প্রাইভেট সেলুনে ঢুকলেই মালিক আগ্রহের সঙ্গে হেসে কথা বলে, ব্যক্তিগত যত্ন নেয়।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, কলকাতার মতনই, মস্কো শহরের কিছু কিছু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সেই ড্রাইভার সরকারের কাছ থেকে মাস মাইনে পাবে, কত যাত্রী সে তুলল বা না তুলল, তাতে কিছু আসে যায় না, সুতরাং সে যাত্রীদের অবহেলা দেখাতেই পারে। কলকাতার কারণটা অবশ্য আলাদা, এখানে কেউ আইন মানে না, ট্যাক্সি ড্রাইভাররা একজনের বদলে পাঁচ-ছ'জন যাত্রী তুলে বেশি লাভ করতে চায়। মস্কোতে এক সন্ধ্যায় যখন আমরা চেষ্টা করেও ট্যাক্সি পাচ্ছি না, তখন একটি প্রাইভেট গাড়ির চালক আমাদের পৌঁছে দিতে চাইল। বিনা পয়সার লিফ্ট নয়, দশ রুবলের বিনিময়ে। এবং ওই দশ রুবল পাবে বলে সে ঠিকানা খুঁজে সযত্নে আমাদের নামিয়ে দিল নির্দিষ্ট বাড়ির দরজায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, সরকারি চাকরির নিরাপত্তা পেলেই মানুষ কাজে ঢিলে দিতে চায় কেন? অথচ সেই একই লোক যদি নিজস্ব ব্যাবসা খোলে, তাহলে দিন রাত খাটাখাটনি করে। একজন চাষি নিজের ক্ষেতের ফসল ফলাবার জন্য উদয়াস্ত শরীরের ঘাম ঝরায়, আর সেই চাষিই যখন দশজনের সমবায়ের অন্তর্গত হয়, তখন যথেষ্ট শ্রম দেয় না। মানুষ কি পরিশ্রম করে শুধু ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের জন্য? সবাই মিলে একটা কিছু উৎপন্ন করে তারপর সবাই মিলে সমান ভাগ করাই তো উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে, তবু সমবায় গড়লে সকলের শ্রমের আন্তরিকতা কমে যায় কেন?

এই সূত্র ধরে আরও একটা প্রশ্ন আসে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে যে সকলে মিলে সমান ভাগ করে নেওয়ার আদর্শ, তার জন্য কি মানুষকে তৈরি করা হয়েছে? নাকি তাড়াহুড়ো করে ওপর থেকে ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখায়, যারা সমাজ ব্যবস্থা বদলের জন্য মানুষকে ডাক দেয়, যারা সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকে, তারাও কি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ঈর্ষা, প্রতিযোগিতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে? তারা এসব পারেনি বলেই কি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি তাসের প্রাসাদের মতন ভেঙে পড়ল?

॥ ৫ ॥

দুই জার্মানি এক হওয়ার মূলে হাঙ্গেরির একটা বিরাট ভূমিকা আছে। সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই পশ্চিমি দেশগুলির সীমান্তে কঠিন প্রহরায় কাঁটা তারের বেড়া ছিল, এতকাল তারই নাম ছিল 'আয়রন কারটেইন'। হাঙ্গেরিই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অর্গল খুলে দেয় গত বসন্তে। তার জন্যই পূর্ব জার্মানির হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ হাঙ্গেরিতে ঢুকে পড়ে, অস্ট্রিয়া ঘুরে পশ্চিম জার্মানিতে চলে আসতে থাকে।

সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক পালাবদলের ইতিহাসে হাঙ্গেরির কাহিনি একেবারে আলাদা ধরনের। হাঙ্গেরিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টিই বিশ্বে প্রথম, যারা কোনও বড় রকম আন্দোলন কিংবা চাপের মুখে না পড়েও আত্মসমালোচনা করেছে। নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেছে এবং জোর জবরদস্তির শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে।

জার্মানি থেকে আমরা চলে এলাম হাঙ্গেরিতে।

ফ্রাংকফুর্টের বিশ্ব বইমেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে, এর পরে বাদল ও আমি কয়েকটি দেশ বেড়াবার কথা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। ইউরোপে আমাদের দুই ভ্রমণসঙ্গী ভাস্কর দত্ত ও অসীম রায়। এর আগে আমরা এক সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি। এবারেও খবর পেয়ে ওরা দু'জন ছুটি নিয়ে চলে এল হাঙ্গেরিতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। অসীম অনেক কিছু জানে শোনে, তার স্বভাবটা সাবধানি ধরনের। আর ভাস্কর অতিশয় এলোমেলো ও বেপরোয়া। এই দুই পরস্পরবিরোধী চরিত্রের জন্য আমাদের ভ্রমণ-আড্ডা খুব জমে যায়।

বুডাপেস্ট এয়ারপোর্টে আমাদের রাঁদেভু। বাদল ও আমি ফ্রাংকফুর্ট থেকে। অসীম ও ভাস্করের প্যারিস ও লন্ডন থেকে আলাদা ফ্লাইটে পৌঁছবার কথা। বাদল ও আমি যথা সময়ে পৌঁছে গেলাম, ভাস্করের আরও আগে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার দেখা নেই। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, লন্ডনের ফ্লাইট এসে গেছে বটে, কিন্তু সেটা অন্য এয়ারপোর্টে। সেটা এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। প্যারিসে যেমন ওর্লি আর শার্ল দ্যগল নামে দুটি এয়ারপোর্ট আছে, এখানেও সেইরকম। তা হলে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে? একটুক্ষণ চিন্তা করার পর আমি ইনফরমেশন কাউন্টারে গিয়ে অনুরোধ করলাম, শহরের অন্য এয়ারপোর্টটিতে টেলিফোন করে সেখানে একটা ঘোষণা করিয়ে দিতে পারবেন? লন্ডন থেকে আগত যাত্রী ভাস্কর দত্তকে জানিয়ে দিতে হবে যে অন্য এয়ারপোর্টে তার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

প্রথমত ইংরিজিতে এই কথাটা বোঝাতেই অনেকটা সময় লেগে গেল। আগেই জেনে এসেছিলাম হাঙ্গেরিতে ইংরাজি ভাষা প্রায় চলে না। কিন্তু এয়ারপোর্টেও ইংরেজি জানা কর্মী থাকবে না! ইনফরমেশন কাউন্টারের এক তরুণী ডেকে আনল অন্য একজনকে, যে আবার আর একজনকে, তৃতীয়জন আমার কথা বুঝল বটে, কিন্তু এই অনুরোধ তার উদ্ভট মনে হল। অনেক পীড়াপিড়ি করার পর সে বেজার মুখে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ ধরে থাকার পর দায়সারা ভাবে জানাল যে অন্য এয়ারপোর্টে এ নামে কোনও যাত্রী নেই।

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। কিন্তু আর কিছু করার উপায় নেই। আমরা রাত্তিরে কোথায় থাকব তা ভাস্কর জানে না, এই অচেনা শহরে একবার যোগাযোগ হারিয়ে ফেললে খোঁজ পাওয়া খুব মুশকিল হবে। তবু আমার মনে হল, ভাস্কর কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই। অসীম পৌঁছে গেল প্যারিস থেকে আমাদেরই এয়ারপোর্টে, যথা সময়ে। তারও খানিক বাদে ভাস্কর এল বীরের ভঙ্গিতে, প্রথমে দুই এয়ারপোর্টের ব্যাপারটা সেও বুঝতে পারেনি বটে, তারপর সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। এই শহরের অনেক কিছুর হদিশ জেনে নিয়েছে এর মধ্যে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি অত্যন্ত ভদ্র। এর পরের কয়েকটি দিন আমরা বুডাপেস্ট শহরে যতবার

ট্যাক্সি নিয়েছি, প্রত্যেক ড্রাইভারের ব্যবহার ভালো, কেউ ঠকাবার চেষ্টা করেনি, কেউ বেশি পথ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়নি। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডগুলিতে অপেক্ষমাণ ট্যাক্সির ড্রাইভার বই পড়ে সময় কাটায়, একজনের হাতে দেখেছি টমাস মান-এর 'ম্যাজিক মাউন্টেন', আর একজনের হাতে এফ ডালি'র লেখা 'রিট অ্যান্ড রিভোল্ট ইন হাঙ্গেরি'। অধিকাংশ ড্রাইভার উচ্চশিক্ষিত। পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে একজন ট্যাক্সি চালকের পরিচয় জেনেছিলাম, তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর ডক্টরেট। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলতেই যে বিশেষ শ্রেণির কথা আমাদের মনে আসে, তাদের সঙ্গে এদের কোনও মিলই নেই। উচ্চশিক্ষিতদের ট্যাক্সি চালাবার মতন স্বাধীন পেশা গ্রহণ করার প্রধান কারণ, সরকারি চাকরির তুলনায় এতে উপার্জন অনেক বেশি। যদিও এতে শিক্ষার অপচয় হয়। ট্যাক্সি চালাবার জন্য নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই।

ভিসা পাওয়ার জন্য আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র সব নিয়ম। আমরা চারজনেই বঙ্গ সন্তান, কিন্তু ভাস্কর ও অসীম যেহেতু হার্ড কারেন্সির দেশ থেকে আসছে, তাই তাদের ভিসা পেতে কোনও অসুবিধে নেই। আর আমাকে আর বাদলকে দামি হোটেল বুক করার শর্তে ভিসা যোগাড় করতে হয়েছে। অসীম প্যারিস থেকেই ফোন করে একটা থাকার জায়গা ঠিক করে এসেছে, বাদল ও আমাকে নির্দিষ্ট হোটেলে নামিয়ে সে ভাস্করকে নিয়ে চলে গেল।

নাম রয়াল গ্র্যান্ড হোটেল। এটাকে অনায়াসে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন বলা যেতে পারে। অতি সাধারণ হোটেল, অযত্নের ছাপ সর্বত্র, ডাবল বেডেড রুম হলেও আমাদের দেওয়া হয়েছে ছোট্ট একটি ঘর, বিকট বিছানা, বাথরুমে নড়াচড়া করার জায়গা নেই। এরই ভাড়া প্রায় একশো ডলার। নিয়ম রক্ষার জন্য কোনও মতে সেখানে এক রাত কাটিয়ে সকালেই বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আমরা দুজনে যোগ দিলাম অসীমদের সঙ্গে। ওদের থাকার জায়গাটি চমৎকার। ওরা এক বুড়ির অ্যাপার্টমেন্টে পেয়িং গেস্ট হয়েছে। বেশ বড় বড় দুটি ঘর, আলাদা একটি প্রকাণ্ড বসবার ঘর, পুরোনো আমলের সোফাসেট দিয়ে সাজানো, ঘর গরম করার জন্য অ্যান্টিক চিমনি। সব মিলিয়ে একটা ওল্ড ওয়ার্ল্ড চার্ম আছে। দু'জন অতিরিক্ত অতিথি পেয়ে বৃদ্ধা খুব খুশি। কারণ ভাড়া দেওয়া হবে মাথাপিছু। সত্তরের ওপর বয়েস। এককালে বেশ সুশ্রী ছিলেন, আমাদের মায়ের বয়সি, আমাদের সঙ্গে তিনি সস্নেহ ব্যবহার করতে লাগলেন সর্বক্ষণ। আমরা যাতে আরামে থাকতে পারি, আমরা যাতে শহরে পথ না হারিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক দেখতে পারি, সেজন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। কিন্তু মুশকিল এই তিনি ইংরেজি কিছুই বোঝেন না, অসীম ফরাসি চালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

হাঙ্গেরিয়ান ভাষার সঙ্গে শুধু আমাদের কেন, অধিকাংশ ইউরোপিয়ানেরই কোনও পরিচয় নেই। ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, ফিনোউগ্রিক-এর অন্তর্গত এই ভাষার খানিকটা আত্মীয়তা আছে ফিনিশ আর এস্তোনিয়ান ভাষার সঙ্গে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা বলে, হাঙ্গেরিয়ান ভাষা শুধু হাঙ্গেরিয়ানরাই বোঝে। যদিও এটা বেশ ধনী ভাষা। সাধারণ হাঙ্গেরিয়ানরা ইংরিজি না জানলেও, অস্ট্রিয়া-জার্মানির সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে, অনেকে কিছু কিছু জার্মান বোঝে। অসীম কিছুদিন জার্মানিতে কাজ করেছিল, তাই একটু একটু জার্মান জানে, ক্রিয়াপদহীন বাক্য দিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও পুরো অসুবিধে ঘুচল না। আমরা বাকি তিনজন আকারে-ইঙ্গিতে ও বাংলায় কথা বলা শুরু করতে দেখা গেল মোটামুটি কাজ চলে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে বেশ মজা হল। আমরা অলসভাবে আড্ডা দিচ্ছি, বৃদ্ধা আমাদের বারবার তাড়া দিচ্ছেন বাড়ি থেকে বেরুবার জন্য। অবোধ্য ভাষায় তিনি কী যে বলে যাচ্ছেন কিছুই বুঝি না, আমরা ঘর ভাড়া নিয়েছি, যখন খুশি আসব—যাব এই দুপুরবেলা আমাদের ঘরছাড়া করবার উদ্দেশ্য কী?

অসীম বলল, ট্যুরিস্টরা সকালবেলা উঠেই চান-টান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে সারাদিনের জন্য

বেড়িয়ে পড়ে। আর তোমরা ভেতো বাঙালির মতন পাজামা পরে দুপুর একটা পর্যন্ত শুয়ে বসে আড্ডা মেরে যাচ্ছ, এটা বুড়ির সহ্য হচ্ছে না!

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বাজে বকো না। আমরা বেড়াতে এসেছি বলে সর্বক্ষণ পায়ে চাকা বেঁধে দৌড়তে হবে নাকি? দেখার জিনিসগুলো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

আমাদের চারজনের মধ্যে অসীমই বৃদ্ধার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে দুটি কারণে। সে কিছু কিছু জার্মান শব্দ জানে, সকালে উঠেই সে প্যান্ট শার্ট পরে নেয়। আমি আর ভাস্কর বাড়িতে পাজামা পাঞ্জাবি পরেই থাকি আর বাদলের লুঙ্গি না হলে তো চলেই না। এই পোশাকেই আমরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসি, সেটা বৃদ্ধার পছন্দ নয়, প্রত্যেক সকালে তিনি আমাদের তিনজনকে ভর্ৎসনা করেন আর অসীমের শার্ট-প্যান্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, এলিগাঁস। এলিগাঁস।

ভাস্করের পাঞ্জাবিটা অত্যন্ত সুদৃশ্য কাজ করা, আর পাজামাও ধপধপে ফরসা, সেই পাঞ্জাবি পাজামার তুলনায় সাধারণ শার্ট-প্যান্ট কেন বেশি এলিগ্যান্ট হবে তা বোঝা দুষ্কর। বৃদ্ধা পুরোনো ইউরোপীয় আদব-কায়দায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে এমন এলোমেলোভাবে সব কিছু ছড়ানো যে এখানে আদব-কায়দা মানার প্রশ্নটাও কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়।

সেই দুপুরে আমাদের বাইরে বার করবার জন্য বৃদ্ধা এত বেশি উত্যক্ত করতে লাগলেন যে আমরা বাধ্য হয়েই পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়িওয়ালা কোনও পুরুষ হলে কিংবা অল্পবয়সি মেয়ে হলে ভাস্কর নিশ্চিত তাকে ধমক লাগাত, ইনি মায়ের বয়সি মহিলা বলেই কিছু বলা যায় না। আমরা তাঁকে ডাকি মাদাম। মাদামও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেরুলেন একটা ছাতা হাতে নিয়ে। রাস্তায় নামার পর তিনি আমাদের একজনের হাত ধরে টানলেন, অর্থাৎ তাঁর পিছু-পিছু যেতে বলছেন। কোথায় নিয়ে যেতে চান তা কিছুই না বুঝে অনুসরণ করলাম। দু'তিনটে বাঁক ঘোরার পর একটা পাহাড়ের গায়ে লম্বা সিঁড়ির কাছে এসে থেমে মাদাম আঙুল দিয়ে ওপরের দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

এবার বোঝা গেল। এই বুডা হিলের ওপর রয়েছে ম্যাগডোলেন টাওয়ার। এটা এ শহরে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ম্যাপ দেখে গেলে হয়তো আমাদের অনেক ঘোরাঘুরি করে যেতে হবে। তাই মাদাম আমাদের কিছুটা সংক্ষিপ্ত সিঁড়ি-পথ দেখাতে চাইছিলেন। পেয়িং গেস্ট টুরিস্টদের জন্য এতখানি যত্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যম নেওয়ার নজির খুবই দুর্লভ।

বুডাপেস্ট অতীব মনোহর নগর। সবাই জানে যে বুডা আর পেস্ট মানে দুটি আলাদা শহরকে এক সঙ্গে জোড়া হয়েছে। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ড্যানিয়ুব নদী। সেই নদী, যার নাম শুনলেই একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার মনে আসে। নদীর দু দিকের দুটি শহরের বহিরঙ্গের বেশ তফাত। বুডা শহরটি প্রাচীন, ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর গথিক ও বারোক স্টাইলের গির্জা ও প্রাসাদ রয়েছে অনেক, রাস্তাগুলো ঢেউ খেলানো। আর পেস্ট একেবারে সমতল, আধুনিক কালের দেশলাইয়ের বাক্স মার্কা বাড়িই বেশি।

আমাদের বাড়িটি নদীর খুব কাছেই। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার নদী সন্দর্শন হয়। ড্যানিয়ুব এখানে বেশ চওড়া, আমাদের কলকাতার গঙ্গার চেয়ে সামান্য কম হবে। নদীর দু'ধারেই প্রশস্ত, সুসজ্জিত রাস্তা, সেখান দিয়ে শুধু হাঁটতেই ভালো লাগে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান এমপায়ারের সময় এখানে প্রচুর ধনী ব্যক্তিদের সমাবেশ হয়েছিল। সেই চিহ্ন রয়ে গিয়েছে বড় বড় গির্জা ও বিলাসী হর্ম্যে। আমাদের দিকে নদীর পাড়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে অন্য পারে এক বিশাল নিও গথিক প্রাসাদ। এটা এখানকার পার্লামেন্ট। নদী পারাপারের সময় বহু দূর থেকেও এটা চোখে পড়বেই। এত বড় এবং জমকালো এই পার্লামেন্ট ভবন কিন্তু গণতান্ত্রিক লোকসভা হিসেবে বিশেষ ব্যবহৃত হয়নি।

আয়তন ও লোকসংখ্যায় বুডাপেস্ট শহর কলকাতার থেকে ছোট, কিন্তু কলকাতার গঙ্গায় বালি ব্রিজ ধরে দুটি মাত্র সেতু। তৃতীয় নির্মীয়মান সেতুটি দীর্ঘসূত্রতায় গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে

স্থান পেতে চলেছে, অথচ এখানে ড্যানিয়ুবের ওপর আটটি সেতু। এই সব কটিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটিকেই আগের মতন পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এসব আমাদের কল্পনাতীত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাঙ্গেরি এক দারুণ দো-টানার মধ্যে পড়েছিল। যুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন হাঙ্গেরি কোন পক্ষ নেবে তা ঠিক করতে পারেনি। হাঙ্গেরির সৈন্য-অস্ত্র যৎসামান্য, অস্ত্রশস্ত্রও অধিকাংশই জার্মানি থেকে আসে। হিটলারের জার্মানির মতন প্রবল প্রতিবেশীকে চটাবার সাধ্য হাঙ্গেরির নেই। তা ছাড়া এখানেও নাতসি চিন্তাধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এক শ্রেণির মধ্যে, তারা রাশিয়ার বোলশেভিকদের পছন্দ করে না। স্বদেশের ইহুদিদের প্রতিও বিদ্বেষী, সুতরাং এই শ্রেণি জার্মানদের সমর্থক। আবার বামপন্থী ও মধ্যপন্থীরা হিটলারের নীতি ঘৃণা করে, উল্লেখযোগ্য ইহুদি জনসাধারণও হিটলারবিরোধী। আরও একটি শ্রেণির সমর্থন পশ্চিমি দেশগুলির প্রতি।

কিন্তু হাঙ্গেরির শাসকশ্রেণি ও সেনাপতিদের ধারণা হয়েছিল যে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং জার্মানিরই জয় হবে। সেইজন্য তারা জার্মানিকে মৌখিক সমর্থন জানিয়ে ভেতরে-ভেতরে পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হাঙ্গেরি গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেছিল কিছুদিন। কিন্তু এই সুবিধাবাদ অচিরেই বুঝে গিয়েছিল হিটলার। বারবার সে হাঙ্গেরিকে যুদ্ধে টানতে লাগল। যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করার পর নাতসি হাঙ্গেরিকে বলল সৈন্য পাঠাতে। এদিকে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরি 'চির বন্ধুত্ব' চুক্তি করে বসে আছে। একদিকে চুক্তি পালন, অন্যদিকে হিটলারের চোখ রাঙানি, এর মধ্যে মনঃস্থির করতে না পেরে হাঙ্গেরির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টেলোকি আত্মহত্যা করে বসলেন।

হিটলার যখন সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে তখন হাঙ্গেরি ভেবেছিল প্রবল জার্মান বাহিনীর কাছে স্টালিনের ফৌজ দু-দশ দিনে বশ্যতা স্বীকার করবে। হাঙ্গেরি অল্প কিছু সৈন্য পাঠিয়ে হিটলারকে খুশি করতে গেল, কিন্তু যুদ্ধ চলতে লাগল দীর্ঘকাল। জার্মানি এবার হাঙ্গেরিকে বাধ্য করাল তার সমস্ত যুদ্ধ উপকরণ এবং সমর্থ ব্যক্তিদের সোভিয়েত ফ্রন্টে লড়াই করতে। অর্থাৎ হাঙ্গেরি এখন পুরোপুরি হিটলার-মুসোলিনির তল্পিবাহক। দেশের সরকার অবশ্য তখনও হিটলারের রোষ থেকে ইহুদি ও বামপন্থীদের রক্ষা করে চলেছিল এবং মনে মনে আশা ছিল, ইংরেজ-আমেরিকানদের যদি এ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলেই হাঙ্গেরি নাতসিদের পরিত্যাগ করে পশ্চিমি শক্তির সঙ্গে যোগ দেবে। দেশের প্রেসিডেন্ট হার্থি গোপনে বেশ কয়েকবার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে খবর পাঠালেন যে তারা হাঙ্গেরির সীমান্তে পৌঁছলেই হাঙ্গেরি বিনা শর্তে আত্মসমর্পন করবে।

কিন্তু যুদ্ধের গতি অনেক জটিল হয়ে গেল। হাঙ্গেরির পশ্চিম সীমান্তে ইঙ্গ-মার্কিন ফৌজ এলই না, বরং পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত বাহিনীর কাছে হাঙ্গরির বাহিনী সাঙ্ঘাতিক মার খেল। হাঙ্গেরির সামরিক শক্তি এমন কিছু আহামরি ছিল না। এই আঘাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হবার মতন অবস্থায় পৌঁছোলো। সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে আসছে। হিটলারও প্রেসিডেন্ট হার্থির দু'মুখো নীতি ধরে ফেলেছে। হিটলার হার্থিকে ডাকিয়ে এনে খুব একচোট ধমক দিয়ে দুটি শর্ত দিল। হয় জার্মান ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, নয়তো হাঙ্গেরি পুরোপুরি জার্মানির অধিকারে চলে আসবে এবং শত্রু দেশের মতন ব্যবহার পাবে। দ্বিতীয়টি যে কী রকম তা পোল্যান্ডেই দেখা গেছে, সেই মতো প্রেসিডেন্ট মেনে নিল প্রথমটি। এবার জার্মান গেস্টাপোরা এসে সারা দেশে দাপট দেখাতে লাগল। বামপন্থী দলগুলি তছনছ করে নেতাদের গ্রেফতার করল। ইহুদিদের ধরে ধরে পাঠাতে লাগল কনসেনট্রেশন ক্যাম্প কিংবা গ্যাস চেম্বারে। হাঙ্গেরিয়ানদের কার্যত কোনও স্বাধীনতা রইল না এবং মুক্ত বিশ্বের চোখে তারা নাতসিদের পদলেহী বলে গণ্য হল।

অগ্রসরমাণ সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে জার্মানদের মুখোমুখি লড়াই হয় হাঙ্গেরির ভূমিতে।

সে লড়াই বেশিদিন চলেনি। জার্মান-হাঙ্গেরিয়ান যৌথ ফৌজ পিছু হঠতে লাগল। তারপর সোভিয়েত ট্যাংক-বাহিনীর সামনে হাঙ্গেরিয়ানদের ফেলে রেখে এক সময় জার্মানরা পালাল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরাজিত হাঙ্গেরিয়ানদের মেনে নিতে হল অনেক অপমানজনক শর্ত। দেশের কিছুটা অংশ কেটে দিয়ে দেওয়া হল চেকোস্লোভাকিয়াকে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তাদের অর্থদণ্ড দেওয়া হল তিরিশ কোটি ডলার। ইচ্ছেমতো সেনাবাহিনী গড়ার আর অধিকার রইল না। এই সব শর্ত ঠিক মতন পালিত হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব মিত্রশক্তির চুক্তি অনুযায়ী বর্তাল দখলদার বিরাট সোভিয়েত বাহিনীর ওপর।

বছরের পর বছর সোভিয়েত বাহিনী যে দেশের বুকে চেপে বসে আছে, সেখানে যে কমিউনিস্ট পার্টিই শাসন ক্ষমতা পেয়ে যাবে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে বহু লোক দেশত্যাগী হয়েছে, নাৎসী সংসর্গদোষের জন্য বহু লোককে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়েছে, নিছক সন্দেহে বহু লোক কারারুদ্ধ। বছর চারেক ধরে নানা রকম বিশৃঙ্খলার পর কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ ক্ষমতায় এসে গেল। সোভিয়েত সংবিধানের অনুকরণে এখানে জারি হল নতুন সংবিধান, হাঙ্গেরিয়ান রিপাবলিকের নতুন নাম হল হাঙ্গেরিয়ান পিপলস্ রিপাবলিক।

॥ ৬ ॥

এক হাঙ্গেরিয়ান লেখক-দম্পতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল অনেকদিন ধরে। জর্জ সোমলিও এবং তার স্ত্রী আনা। জর্জ নামটি হাঙ্গেরিয়ান উচ্চারণে অনেকটা গিওর্গি হয়ে যায়। টেলিফোন গাইডে জর্জের ঠিকানা পাওয়া গেল, কিন্তু সেখানে এখন সে থাকে না, নতুন ঠিকানা সেই বাড়ির কেউ বলতে চায় না। জর্জ একজন বিখ্যাত কবি এবং সম্পাদক, তার নাম ওদেশে সবাই জানে। আমাদের বাড়িউলি বৃদ্ধাও জানেন। আমাদের সঙ্গে দরকারি কথাবার্তা চালাবার জন্য মাদাম এখন একটি নতুন কায়দা বার করেছেন। একটা খবরের কাগজের অফিসে ফোন করে ফরাসি কিংবা ইংরেজি-জানা কারুকে ধরেন, তারপর আমাদের একজন তার সঙ্গে কথা বলে, সে আবার মাদামকে হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। সেইরকমভাবেই মাদাম একজন মহিলা সাংবাদিককে ধরে দিলেন, সেই মেয়েটি জানাল যে, জর্জ কোথায় থাকে তা জানা একটু শক্ত, কারণ ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে সে আমাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করবে।

বছর কয়েক আগে অসলো শহরে নরোয়েজিয়ান লেখিকা বিয়র্গ ভিক আমাকে বলেছিল, জর্জ আর আনার খবর জানো? ওদের বিয়েটা বোধহয় টিকবে না। খবরটা শুনে আমি খুব অবাক হইনি। আয়ওয়াতে আন্তর্জাতিক লেখক সমাবেশে আমরা অনেকে মাস চারেক ধরে ছিলাম। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রিস, জাপান, মেক্সিকো, ব্রাজিল, পোলান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি বহু দেশের লেখক-লেখিকা ছিলেন, সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা ছিলেন চিনের প্রখ্যাত লেখিকা মাদাম ডিং লিং, যিনি ছিলেন মাও সে তুং-এর এক কালের বান্ধবী, তাঁর কাছে চিনের বিপ্লবের অনেক গল্প শুনেছি। আবার অন্যান্য দেশের অনেক তরুণ-তরুণী কবি-ঔপন্যাসিকও ছিলেন। তবে, নানা আলাপ-আলোচনায় ওই হাঙ্গেরিয়ান দম্পতির কথা এসে যেত প্রায়ই। তার কারণ, ওই দুজনই ছিল বিশেষ দ্রষ্টব্য। জর্জ মধ্যবয়স্ক, মোটাসোটা থলথলে চেহারা, মাথার চুল পাতলা, কথাবার্তাতেও চাকচিক্য নেই, আর আনা-র বয়েস তার অর্ধেক, সে অতিশয় রূপসী। আনা জর্জের তৃতীয় তরুণী ভার্যা। আনাকে দেখে আমাদের সকলের ধারণা হয়েছিল, হাঙ্গেরিয়ান মেয়েরা খুব সুন্দর হয়। অনেকে জল্পনা করত, এত বয়েসের তফাত সত্ত্বেও আনা জর্জকে বিয়ে করেছে কেন, শুধু জর্জের খ্যাতির মোহে? আনা নিজেও লেখিকা, সে ছোট গল্প লিখত। আনা একদিন আমাকে বলেছিল, পুরুষ লেখকদের

চেহারায় কিছু আসে যায় না কিন্তু কোনও লেখিকা যদি রূপসী হয়, তা হলে সে কিছু কিছু সুবিধে পায় বটে, তার চেয়ে অসুবিধে অনেক বেশি। আনা আমার সঙ্গে প্রায়ই গল্প করত, কারণ ওর ধারণা ছিল, ও সিকি পরিমাণ ভারতীয়। ওর চোখের তারা কালো, পিঠ পর্যন্ত ছাওয়া দীঘল কালো চুল, ও বলত, ওর শরীরে নিশ্চয়ই জিপসিদের রক্ত আছে। হাঙ্গেরিতে জিপসির সংখ্যা প্রচুর এবং অনেকের মতে সেই সব জিপসিরা গেছে ভারতবর্ষ থেকে।

আয়ওয়া ছাড়ার পরেও বছর চারেক বাদে জর্জ ও আনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বেলজিয়ামে। সেবারেও অনেক গল্প হয়েছিল, তবে আমি লক্ষ করেছিলাম, স্বামীর প্রতি আনার সেই গদগদ ভাবটা নেই, তার মিষ্ট কণ্ঠস্বরে মাঝে মাঝে ঝাল বাক্য বেরিয়ে আসছে।

ওরা দু'জনেই আমাকে অনেকবার হাঙ্গেরিতে আসার জন্য নেমন্তন্ন করেছে, এখন সত্যিই আমি বুডাপেস্টে উপস্থিত হয়েছি, তবু ওদের সঙ্গে দেখা হবে না? কিছুতেই ঠিকানা বা কোনও নাম্বার যোগাড় করা যাচ্ছে না। এটুকু খবর পাওয়া গেল যে জর্জ ও আনার বিচ্ছেদ এখানকার সাহিত্যিক সাংবাদিক মহলের সাম্প্রতিক বেশ একটা মুখরোচক ঘটনা, বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আনা একজন নামকরা চিত্র পরিচালককে বিয়ে করেছে এবং জর্জ খুব মুষড়ে পড়েছে।

মহিলা-সাংবাদিকটি সত্যিই আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। একদিন রাত দশটায় টেলিফোন বেজে উঠল, আমাদের মাদাম চেঁচিয়ে উঠলেন, ইংলিশ, ইংলিশ! অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি গিয়ে ফোন তুলতেই শুনতে পেলাম আনার কণ্ঠস্বর।

খানিকটা অপরাধী গলায় প্রচুর ক্ষমা চেয়ে আনা জানাল যে একটু আগে সে আমার খবর পেয়েছে এক সাংবাদিকের কাছ থেকে, কিন্তু কাল ভোরেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে প্যারিস, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না এ জন্য সে মর্মাহত, কিন্তু কোনও উপায়ও তো নেই। টেলিফোনেই অনেক গল্প হল, দু-তিনবার সে জিগ্যেস করল, তোমাদের খাওয়াদাওয়ার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

পরদিন সন্ধেবেলা ফোন করল জর্জ সোমলিও। সে-ও মহিলা সাংবাদিকটির কাছ থেকে খবর পেয়েছে। সেই সাংবাদিকটির সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ দেখা হয়নি, তার এই নিঃস্বার্থ তৎপরতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

খানিক বাদেই চলে এল জর্জ, তাকে নিয়ে আমরা কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গেলাম। হাঙ্গেরিয়ানরা সাহিত্যপ্রেমিক, রেস্তোরাঁর মালিক ও পরিচারকরাও চিনতে পারল এই বিখ্যাত কবিকে।

বিরহ কিংবা মর্মবেদনায় জর্জ বেশ রোগা হয়ে গেছে, চুলে কালো রং মাখার জন্য তার বয়েস এখন কিছুটা কম দেখায়। আমি অন্য বন্ধুদের আগেই বলে দিয়েছিলাম যে জর্জের কাছে আনার প্রসঙ্গ একেবারেই উল্লেখ করা হবে না। জর্জও প্রায় দু-ঘণ্টা আড্ডার শেষে আমার দিকে চেয়ে বলল—তুমি হয়তো জানো না, আনার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল, তুমি তার সঙ্গে আলাদা দেখা করতে পারতে, কিন্তু আমি তার কোনও খোঁজ রাখি না।

রেস্তোরাঁয় বসে জর্জ প্রথমেই একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল, সে এর মধ্যে ইংরিজি প্রায় ভুলে গেছে, ইংরিজিতে কথা বলতে তার অস্বস্তি হয়। হাঙ্গেরিয়ান ছাড়া ফরাসি ভাষায় কথা বলতে সে সাবলীল বোধ করে। তাতে অসুবিধে নেই, আমাদের ফরাসি ভাষী অসীম আছে, কিন্তু আমরা তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারব না। একটা ত্রিপাক্ষিক অনুবাদ-সংলাপ চালাতে হবে?

আস্তে আস্তে অবশ্য ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল। জর্জ কখনও ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে, কখনও ইংরিজি সঠিক শব্দ খুঁজে না পেলে অসীমকে ফরাসিতে জিগ্যেস করে, তখন তার মুখ কুঞ্চিত হয়ে যায়। ইংরিজি সম্পর্কে জর্জের দ্বিধার কারণ আমি বুঝতে পারি। লেখক মাত্রই শব্দের কারবারি,

নিজস্ব ধরনের শব্দ ব্যবহারেই তার বৈশিষ্ট্য, শব্দকে নিয়ে সে খেলা করতেও পারে, সেটা মাতৃভাষাতেই সবচেয়ে বেশি সম্ভব। লেখা কিংবা কথা বলার সময় সঠিক শব্দটা খুঁজে না পেলে একজন লেখকের শারীরিক কষ্ট হয়, অপমান বোধ হই। ভুল ভাষা আর যাকেই হোক, কোনও লেখককে মানায় না। তবু আমরা অনেক সময় বাধ্য হই। ইংরেজ-আমেরিকানদের সঙ্গে সব সময় আমাদের এক অসম প্রতিযোগিতায় থাকতে হয়। তারা কথা বলে মাতৃভাষায়, আমরা বলি আয়ত্ত করা ইংরিজিতে। অনেক সময়েই তারা ভাষার মোচড়ে চকিত রসিকতা করে, আমরা তার উত্তর না দিতে পেরে মুখে হাসি মাখিয়ে রাখি।

আড্ডায় ঘুরেফিরে সাম্প্রতিক পালা-বদলের প্রসঙ্গ আসবেই। আমার বন্ধুরা জিগ্যেস করল, হাঙ্গেরির সাধারণ মানুষ সবাই কি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন খুশি মনে নিয়েছে?

জর্জ বলল, বেশিরভাগ লোক চেয়েছে বলেই তো পরিবর্তন এসেছে। এখানে তো জোর করে সরকারের পতন ঘটানো হয়নি। একটুও যুদ্ধ বা রক্তপাত হয়নি।

ভাস্কর জিগ্যেস করল, কমুনিস্ট পার্টি কেন ক্ষমতা ছেড়ে দিল সেটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

জর্জ বলল, আমার ধারণা, সেটা এখন পৃথিবীর সবাই জেনে গেছে। তবু আমি সংক্ষেপে বলছি।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, জর্জ, দেশের সাধারণ মানুষ সরকার পরিবর্তনের জন্য চাপ দিয়েছিল, সেটা বুঝলাম, কিন্তু তোমার মতন বুদ্ধিজীবী-শিল্পীরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইল কেন? আমি যতদূর জানি অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশের তুলনায় তোমাদের এখানে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল, সেন্সরশিপের কড়াকড়ি ছিল না, তোমরা ইচ্ছেমতন বিদেশে যেতে পারতে, তুমি নিজে অনেকবার গেছ, তা হলে তোমার ব্যক্তিগতভাবে কি সরকারের প্রতি কোনও ক্ষোভ ছিল?

জর্জ বলল, আমি বিদেশে গেছি, হয় অন্য দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে, কিংবা হাঙ্গেরির সরকারের প্রতিনিধি হয়ে। একমাত্র সেইভাবেই যাওয়া যেত। সাধারণ মানুষের ইচ্ছেমতন বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ ছিল না। এখানে অনেক টুরিস্ট আসে, বাইরের বহু দেশের মানুষ বুডাপেস্ট বেড়াতে আসে, কিন্তু এখনকার মানুষ যেভাবে যখন খুশি বেড়াতে যেতে পারত না। ঠিক যে বাধা দেওয়া হত তা নয়, কিন্তু একটা পরোক্ষ চাপ ছিল, কেউ যেতে চাইলে তাকে অন্য কোনও ছুতোয় হয়রান করা হত। অন্য দেশের লেখক এ দেশে আসে, অথচ হাঙ্গেরিয়ানরা কেন বাইরে যেতে পারবে না, তারা তো কূপমণ্ডূক নয়। তাদের মনে ক্ষোভ তো জমবেই।

আমি বললাম, তোমার মতন বুদ্ধিজীবীদের তো সে অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। তোমরা অনেকটাই স্বাধীনতা পেয়েছ। তুমি কি মনে করো না যে ধনতন্ত্র বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্র অনেক উন্নততর ব্যবস্থা?

জর্জ বলল, আমি সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলাম। একটা আদর্শ হিসেবে। কিন্তু কাগজে-কলমে সেটা যত বড় আদর্শ, কাজে তার অনেক তফাত ঘটে যায়। সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। এতে কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা জমে যেতে বাধ্য। একদলীয় শাসনে পার্টি হয়ে যায় সর্বেসর্বা। পার্টির অনুগত না হলে তুমি কোনও ভালো কাজ পাবে না। এর থেকেই আসে করাপশান। এখানে পার্টির নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল, তার নাম ওয়াকার্স মিলিশিয়া, সাধারণ মানুষ, এমনকি আমরা এদের ভয় পেতাম। প্রত্যেকটা কারখানায়, অফিসে, পার্টির নিজস্ব সেল ছিল, তারা সব লোকের ওপর নজর রাখত, খবরদারি করত, চুকলি কাটত,... এদের জন্য সব সময় আমাদের একটা অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হত, এদের প্রতি বেশিরভাগ মানুষের একটা ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। গতবছর আমাদের পার্লামেন্ট তাড়াতাড়িতে কয়েকটা আইন পাশ করে পার্টির এই একচ্ছত্র ক্ষমতা যদি নষ্ট করে না দিত, তা হলে নির্ঘাত বড় রকমের আন্দোলন ও রক্তারক্তি শুরু হয়ে যেত। ওয়ার্কাস

মিলিশিয়া ভেঙে দেওয়া হল, অফিস-কারখানায় পার্টি সেলগুলো তুলে দেওয়া হল। কমিউনিস্ট পার্টি এগুলো মেনে নিয়ে খুব বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। ঠিক সময়ে তারা পার্টির নাম সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির বদলে শুধু সোসালিস্ট পার্টি করেছে। ওয়ার্কার্স পার্টি এটা ছিলও না, কোনও সোসালিস্ট দেশেই ওয়ার্কার্স পার্টি হয়নি, ওটা কথার কথা। আমাদের এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মনোপলি ছেড়ে দিয়ে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি মেনে নিয়ে দেশটাকে বাঁচিয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থাও এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে খোলা-বাজার নীতি না নিলে রুমানিয়ার মতন আমাদেরও না খেয়ে থাকতে হত।

ভাস্কর জিগ্যেস করলে, কমিউনিস্ট পার্টি বিনা যুদ্ধে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিল কেন?

জর্জ বলল, পোল্যান্ডের দৃষ্টান্ত দেখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা দেখে। অনেকটা অধিকার ছেড়ে দিয়ে তারা পার্টিটাকে বাঁচাল। সাধারণ মানুষ যে ফুঁসছে তা তারা টের পেয়েছিল। না হলে, পার্টির নাম বদলেও তারা সাধারণ মানুষের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেত না। সোভিয়েত ট্যাংক এবার তাদের বাঁচাতে আসত না। এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ইমরে পৎসগেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, ছাপ্পান্ন সালের ঘটনা মোটেই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ছিল না, সেটা ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ! এটাই তো একটা মস্ত বড় ট্রাজেডি।

অসীম জিগ্যেস করল, ইমরে নেগিকে এখন আর বিশ্বাসঘাতক বলা হচ্ছে না?

জর্জ বলল, সে কথা আমাকে জিগ্যেস করছ কেন, রাস্তার যে-কোনও মানুষের কাছ থেকে জেনে নাও। ছাপ্পান্ন সালের তেইশে অক্টোবর সেই অভ্যুত্থান হয়েছিল, এ বছর সেই দিনটাতে জাতীয় উৎসব হয়েছে। আর ১৬ জুন, একত্রিশ বছর আগে যে দিনটায় ইমরে নেগিকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই দিনটির স্মরণে প্রায় তিন লাখ লোক মিছিল করে গিয়ে ইমরে নেগির স্মরণ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছে। (আমাদের দেশে অনেক মিছিলে বা জনসভায় লাখ লাখ লোক হয়। কিন্তু হাঙ্গেরির মতন ছোট দেশে তিন লাখ লোকের মিছিল একটা অভূতপূর্ব ঘটনা)।

এটাও ইতিহাসের একটা ট্রাজেডি। আজ যাকে বিশ্বাসঘাতক কিংবা শত্রু বলে শাস্তি দেওয়া হয়, এক যুগ বা কয়েক যুগ পরে তাকেই বলা হয় হিরো। যার গলায় পরানো হয়েছিল ফাঁসির দড়ি, তার মূর্তির গলায় পরানো হয় ফুলের মালা। কিংবা, আজ মহান আদর্শবাদী হিসেবে যার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে, পরের যুগের ইতিহাস তাকে অভিহিত করেছে স্বার্থান্ধ খুনি হিসেবে। মানুষই মানুষ সম্পর্কে এরকম ভুল করে। মানুষই ইতিহাস বদলায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে দুর্দান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে রুখেছিলেন জোসেফ স্টালিন। সর্বকালের ইতিহাসে হিটলার এক নর-দানব বলে গণ্য। খর্বকায়, নিরামিষাশী সেই মানুষটি প্রায় অর্ধেক পৃথিবীতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, অকারণে লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশুকে প্রাণ দিতে হয়েছে তার পাগলামিতে। নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেও জিততে পারেনি, হিটলারের বাহিনি ছিল অনেক শক্তিশালী, সেই তুলনায় সীমিত অস্ত্রবল নিয়েও অসীম মনের জোরে স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশের মানুষ হিটলারকে হঠিয়ে দিয়েছে। শুধু বামপন্থীরাই নয়, সমস্ত মুক্ত বিশ্বের মানুষই সেজন্যে ধন্য ধন্য করেছে স্টালিনের নামে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান বীরপুরুষ স্টালিন। তাঁকে নিয়ে বীরপূজা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কত কবিতা, কত গান লেখা হয়েছে তাঁর নামে। বাংলাতেও একজন কবি স্টালিনের নাম উচ্চারণ করলেই কত শুভ কাজ হয় তার তালিকা দিতে দিতে লিখেছিলেন, 'স্টালিন, তোমার নামে গর্ভিনীর সুখ-প্রসব হয়।'

সেই স্টালিনের মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকেই তাঁর অন্য একটা পরিচয় প্রকাশিত হতে থাকে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐতিহাসিকরাই নথিপত্র ঘেঁটে এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, স্টালিনের নির্দেশে তাঁর নিজের দেশে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন বা পাঁচ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। মিথ্যা সন্দেহে কিংবা আক্রোশের বশে। জার্মানির মতন সোভিয়েত ইউনিয়নেও অনেক কনসেনট্রেশান ক্যাম্প

ছিল, সেখানে যাদের ভরা হত, তাদের আর সন্ধান পাওয়া যেত না, কয়েকজন বাঙালি বিপ্লবীও রাশিয়ার সেইসব কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে হারিয়ে গেছেন। হিটলারের আক্রমণে সোভিয়েত দেশে দু'কোটি মানুষ নিহত হয়েছে, আর স্টালিন মেরেছেন পাঁচ কোটি স্বদেশবাসীকে। অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে স্টালিনের নিজের দেশেই। সোভিয়েত দেশে আজ আর কেউ ভুলেও স্টালিনের নাম উচ্চারণ করে না।

১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, তা এখানকার কাগজপত্র পড়ে ও বিভিন্ন লোকের কথা শুনে নতুনভাবে জানা গেল। আমরা এতকাল জেনে এসেছিলাম যে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে বিপ্লবের ফসল নষ্ট করার জন্যেই হাঙ্গেরিতে একটি প্রতি-বিপ্লবী অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছিল। এতে মদত দিয়েছিল কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশের গুপ্তচররা। এখন হাঙ্গেরিয়ানরা বলছে যে, এই প্রচারটাই সম্পূর্ণ অপপ্রচার। হাঙ্গেরিয়ানদের দেশপ্রেমের প্রতি অপমান। এই অভ্যুত্থান মোটেই কমিউনিজম্-বিরোধী ছিল না। এই আন্দোলনের নেতাও ছিলেন মস্কোপন্থী। প্রতিবাদ বা আন্দোলন শুরু হয় পার্টির জুলুমবাজি ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে এবং হাঙ্গেরিয়ানদের আত্মমর্যাদা ও পুনরুদ্ধারের জন্য।

এগারো বছর ধরে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরির ভূমিতে বসেছিল। সমাজতন্ত্র দেশাত্মবোধ মুছে দিতে পারেনি কোনওখানেই। হাঙ্গেরিয়ানরা সোভিয়েত বাহিনীকে বিদেশি সৈন্য বলেই মনে করত, এবং কেউই নিজের দেশে বিদেশি সৈন্যের অবস্থিতি সম্মানজনক মনে করে না। ঘাড়ের ওপর ওইরকম একটা শক্তি থাকার ফলে হাঙ্গেরির সরকারও ছিল তার ক্রীড়নক। মস্কোর নির্দেশেই হাঙ্গেরির নেতাদের উত্থান-পতন ঘটত।

ছাপ্পান্ন সালে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। তিন বছর আগে স্টালিনের মৃত্যু হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশতম কংগ্রেস-এ নিকিতা ক্রুশ্চেভ স্টালিনের পার্সোনালিটি কাল্ট-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন। পোল্যান্ডে সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ শোনা গেল। এ বছরই সোভিয়েত সেনাবাহিনী তাঁবু গোটাতে শুরু করল হাঙ্গেরি থেকে। অনেকেরই ধারণা হল, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এবার খোলামেলা হাওয়া আসছে। বুডাপেস্ট-এর একদল ছাত্র তাদের দাবিদাওয়া জানাবার জন্য সমবেত হল একটা মিছিলে। পথ চলতি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিল সেই মিছিলে, সংখ্যা বাড়তে লাগল ক্রমশ সেই বিশাল জনতা কিন্তু সরকারের পতন চায়নি, চেয়েছিল শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু সংস্কার। কিন্তু তখন হাঙ্গেরির যিনি কর্তা, সেই জেরো ছিলেন মস্কোর পুতুল, তিনি সেই জনতার দাবিদাওয়া শোনার বদলে ধমক দিলেন, তারপর হুকুম দিলেন গুলি চালাতে।

রক্তপাত শুরু হতেই সেই শান্তিপূর্ণ মিছিল হিংস্র হয়ে উঠল, সেনাবাহিনী এনেও তাদের দমন করা গেল না, বরং হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যরা যোগ দিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, সেনা ব্যারাক থেকে অস্ত্র বিলি হতে লাগল জনসাধারণের মধ্যে। জেরো পালালেন, চতুর্দিকে গজিয়ে উঠল লোকাল কাউন্সিল, জেলখানার দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন রাজবন্দিরা। কৃষকরা তাঁদের বাজেয়াপ্ত জমি আবার দখল করে নিতে শুরু করলেন। বিভিন্ন দলের এক সম্মিলিত সরকারে ফিরিয়ে আনা হল ইমরে নেগি-কে। এই ইমরে নেগি কিছুদিন আগেই ছিলেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী। ইনি বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী। বামপন্থা জাতীয়তাবাদীকে স্বীকার করে না এবং জাতীয়তাবাদকে মুছে ফেলার মতন অবস্থা যে পৃথিবীতে আসেনি, তা-ও তারা মানতে চায় না। আজ দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেও প্রায় সর্বত্র জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেও চড়া জাতীয়তাবাদের সুর, এমনকি চিনও প্রবল জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদের বোধ যে কত তীব্র তা বোঝা গিয়েছিল চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনায়। সীমান্ত যেখানে মুছে যাওয়ার কথা, সেখানে তার বদলে সীমান্ত সংঘর্ষ!

যাই হোক, ইমরে নেগি যখন আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি মস্কোর অধীনতা অস্বীকার

করেননি, কিন্তু হাঙ্গেরির শাসনব্যবস্থায় কিছু কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ দেশের ওপর জোর করে হেভি ইন্ডাস্ট্রি চাপিয়ে দেওয়া তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। চাষিদের জমি কেড়ে নিয়ে জবরদস্তি সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য করা তাঁর মনে হয়েছিল অবাস্তব ব্যবস্থা। জনসাধারণকে কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করাও সরকারের দায়িত্ব। আধুনিক জীবনের সরঞ্জাম তো তারা চাইবেই। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিয়ে অন্তরীণ-শিবিরগুলি একেবারে তুলে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। এই সবগুলোই ছিল সাধারণ মানুষের দাবি। কিন্তু এই ধরনের কিছু কিছু উদার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যেতেই ইমরে নেগি-কে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর পার্টি মেম্বারশিপও কেড়ে নেওয়া হয়।

একবছর পর বিপ্লবী জনসাধারণ তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনল। নেগি তাঁর সংস্কার ব্যবস্থাগুলি পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন পুরো সৈন্যবাহিনী হাঙ্গেরি থেকে সরিয়ে নিতে। একটা কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের প্রধান হিসেবে নেগিকে জনসাধারণের দাবিগুলি মেনে নিতে হচ্ছিল।

মস্কো থেকে কয়েকজন কর্তাব্যক্তি এলেন নেগিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করতে। এর মধ্যে নেগি দুটি সাংঘাতিক ঘোষণা করে বসলেন। ওয়ারস চুক্তি থেকে হাঙ্গেরি নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিল। এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে হাঙ্গেরিকে একটি নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গণ্য করার দাবি জানানো হল। মস্কো হাঙ্গেরির এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করতে রাজি নয়। সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরির সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, আবার ট্যাংকগুলির মুখ ঘুরল, সোভিয়েত দেশ থেকে আরও কিছু ট্যাংক এল, আবার ট্যাংকের ঘর্ঘর শব্দে কেঁপে উঠল বুডাপেস্ট। প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দিকে ওঁচানো রইল কামানের মুখ।

ছাত্র ও শ্রমিকরা ইতস্তত সংঘর্ষের মধ্যে গেলেও সোভিয়েত ফৌজের তুলনায় তারা কিছুই না। এই সময় গুজব উঠেছিল যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি হাঙ্গেরির সাহায্যে এগিয়ে আসবে, সোভিয়েত বাহিনীর মোকাবিলা করবে। সে রকম কিছুই ঘটল না। বিদ্রোহ ক্রমশ প্রশমিত হয়ে গেল, বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পালাল দেশ ছেড়ে।

ইমরে নেগি প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিলেন বুডাপেস্ট-এর যুগোশ্লাভ দূতাবাসে। সেখান থেকে চলে গেলেন রুমানিয়া। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে গ্রেফতার করে একটা গুপ্ত বিচার অনুষ্ঠিত হল এবং অবিলম্বে গুলি করে মেরে ফেলা হল, একটা প্রতি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর নাম মুছে ফেলা হল হাঙ্গেরির ইতিহাস থেকে।

মাত্র তিনটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, এখন আবার ইমরে নেগির নামে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে এক মহান নেতা হিসেবে। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নেও প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ বলেছেন যে, নেগির বিচার ভুল হয়েছিল। তিনি যে সব সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এখন সেগুলিই গ্রহণ করা হচ্ছে!

মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভুল সিদ্ধান্তে ইমরে নেগিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং হাজার হাজার মানুষ বাধ্য হয়েছিল দেশত্যাগ করতে। কী নির্মম, হৃদয়হীন এই সব ভুল।

॥ ৭ ॥

বুডাপেস্ট শহরটি অতি মনোরম তো বটেই, সমগ্র হাঙ্গেরিই প্রকৃতির শোভায় নয়ন সুখকর। একটা সুন্দর শহরে এমনি এমনি হেঁটে বেড়াতেই ভালো লাগে। যেমন প্যারিস, রোম, সানফ্রান্সিসকো, কিয়েভ, ক্যান্টন। বুডাপেস্ট শহরটিও সেই পর্যায়ের, যদিও এখানে পথের ধারের রেস্তোরাঁ বা

দোকানপাটের তেমন বাহুল্য নেই।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটলেই বহু দূর থেকেও চোখে পড়ে একটা টিলার ওপরে এক নারী মূর্তি। এটাই এই শহরের স্ট্যাচু অব লিবার্টি। টিলার ওপর রয়েছে একটা পুরোনো দুর্গ, অস্ট্রিয়ান আধিপত্যের স্মৃতি। এর স্থানীয় নাম সিটাডেল্লা। আমরা চার বন্ধু মিলে একদিন উঠে গেলাম সেখানে। দু' হাতে উঁচু করা পাখির পালক, বিশাল পাথরের নারীটি শান্তির প্রতীক। রুচির দিক থেকে এই মূর্তিটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এর পাদদেশে এক সশস্ত্র সোভিয়েত সৈনিকের মূর্তিও দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। শিল্প সৃষ্টিতে বাহুল্যের মতন পীড়াদায়ক আর কিছুই নয়। কোনও শিল্পীই গোটা ক্যানভাসটা রেখা দিয়ে ভরিয়ে দেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত বাহিনী যে হাঙ্গেরিকে মুক্ত করে, ওই সৈনিকের মূর্তিটি তার স্মারক। শিল্পের বিচারে মূর্তিটি অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, তা ছাড়া ওটা হাঙ্গেরিয়ানদের আত্মাভিমানেও ঘা মারে। ধরে নেওয়া গেল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত বাহিনী এসে জার্মানির কবল থেকে হাঙ্গেরিকে উদ্ধার করে তাদের খুবই উপকার করেছিল, কিন্তু বছরের পর বছর কি তা মনে করিয়ে দিতে হবে? অতি উপকারীর প্রতিও ঘৃণা জন্মে যায়। পরোপকার তখনই মহৎ, যখন তার মধ্যে বিনয় থাকে এবং আত্মপ্রসাদের অভিসন্ধি থাকে না। কোনও রাষ্ট্রনীতিই অবশ্য পরোপকারের ধার ধারে না, স্বার্থের ওপর একটা মিষ্টি মানবতা কিংবা আদর্শের প্রলেপ দেয়।

বুলগেরিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভিন্ন শহরে আমি দেখেছি, একটা পাহাড় বা উঁচু জায়গা পেলেই সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে একটা শহিদ মিনার বানিয়ে রাখা হয়েছে, যেখানে অ-শিল্পসম্মত এক সোভিয়েত সৈনিকের মূর্তি দণ্ডায়মান, তলায় লেখাও থাকে যে এইসব সৈন্যরা এই দেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এখন ওইসব মূর্তি নিয়ে হাসাহাসি করে।

হাঙ্গেরির মানুষ অবশ্য শুধু হাসাহাসি করেনি, ছাপান্ন সালের অভ্যুত্থানের সময় সোভিয়েত সৈন্যরা মূর্তিটি উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। পরে আবার একটি অবিকল মূর্তি এনে বসানো হয় এবং দিবারাত্র সেটাকে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বাংলাদেশ-যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতা করেছিল ভারতীয় সেনানীরা। পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিল আঠারো হাজার ভারতীয় সৈনিক। অবশিষ্ট ভারতীয় সৈনিকদের সরিয়ে আনার আগে ভারত সরকার যে বাংলাদেশে এরকম কোনও বিকট মূর্তি বসিয়ে আসেননি, সে জন্য আমরা স্বস্তি বোধ করি। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কী ছিল তার চুল চেরা বিচার হবে ইতিহাসে, মূর্তি বা স্তম্ভ বানিয়ে বেশি বেশি জাহির করার তো দরকার নেই।

এই সিটাডেল্লার শান্তি মূর্তির সামনে গোটা গোটা বুডাপেস্ট শহরটাকে দেখা যায়। সন্ধের সময় যখন সেতুগুলিতে আলো জ্বলে ওঠে, ঝকঝক করে ড্যানিয়ুব নদী, সেই দৃশ্যটি বুকের মধ্যে গেঁথে যায়।

একদিন আমরা ট্রেনে চেপে গেলাম স্যানতান্দর নামে একটি গ্রামে। বুডাপেস্ট থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে এখানে ড্যানিয়ুব নদী বাঁক নিয়েছে। তার তীরে ছোট্ট একটা গ্রাম। তিনশো বছর আগে তুর্কিদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে কিছু সার্বিয়ার ব্যবসায়ী এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর থেকে গ্রামটির চেহারা আর বিশেষ বদলায়নি। যত্ন করে এর পুরোনো রূপটি বজায় রাখা হয়েছে। এখন এখানে প্রচুর শিল্পীর বাস। বলা যায় আর্টিস্টদের একটা কলোনি। এখানে নদীর ধারে চুপচাপ বসে কাটাতেই বেশ লাগে।

হাঙ্গেরিতে এলে বালাতোন হ্রদ তো অবশ্য দ্রষ্টব্য। বিশেষত আমাদের পক্ষে। এই হ্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে আছে।

আমরা একদিন একটা গাড়ি ভাড়া করলাম। ডলারের হিসেব করলে বেশ সস্তাই বলতে হবে। ডলার ভাঙালে এখানকার টাকা ফোরিন্ট পাওয়া যায় প্রচুর। ফোরিন্ট-এর দাম আমাদের টাকার চেয়েও অনেক কম। সেই জন্য খাবার দাবারও বেশ সস্তা মনে হয়। অবশ্য যদি পাওয়া যায়। ছোটখাটো

রেস্তোরাঁয় সব সময় খাবার পাওয়া দুষ্কর। যখন তখন বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও বা বিরাট একটা মেনিউ কার্ড দেবে, যাতে চল্লিশ-পঞ্চাশ রকম খাবারের নাম, কিন্তু যেটাই চাওয়া হবে, সেটাই নেই। একটি বা দুটি পদ মাত্র লভ্য। তবে, এর আগে, অন্য কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখেছি, পরিচারক-পরিচারিকারা মুখ গোমড়া করে বলে যায় নেই, নেই, নেই, নেই! যেন না-থাকাটাই নিয়ম। এখানে পরিচারক-পরিচারিকারা নেই বলতে গিয়ে লাজুক ভাবে হাসে। আমাদের অবশ্য খাওয়াদাওয়া নিয়ে তেমন কিছু অসুবিধে হয়নি। হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ অতি বিখ্যাত, এই মাংসের ঝোল আমাদের জিভেও সুস্বাদু। আর পাওয়া যায় স্নিটজেল। আইসক্রিমের জন্যও হাঙ্গেরির খ্যাতি আছে, সব জায়গায় দেখি আইসক্রিমের দোকানের সামনে টুরিস্টদের লাইন। আমি আর বাদল আইসক্রিম পছন্দ করি না, অসীম খুবই ভালোবাসে, ভাস্করের মিষ্টি খুব প্রিয়। কিন্তু ওর খাওয়া নিষেধ। তবু লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-একবার খেয়ে ফেলবেই। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনেই একটা রেস্তোরাঁয় শুধু মাছের নানারকম প্রিপারেশন পাওয়া যায়, বাইরে সেরকমই লেখা থাকে। কিন্তু আমরা সেখানে মাছ খেতে পারিনি, যখনই যাই, তখনই দোকানপাট বন্ধ।

ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়েকটি বেশ বড় বড় রেস্তোরাঁ এখন খোলা হয়েছে, তাতে অনেক কিছুই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভিড়ের চোটে ঢোকা যায় না, কিংবা টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বালাতোন হ্রদে আমাদের গাড়িটি যিনি চালিয়ে নিয়ে যাবেন, তাঁর নাম স্টিফেন। হয়তো উচ্চারণ অন্যরকম, কিন্তু তিনি আমাদের স্টিফেনই বললেন। মোটামুটি ইংরিজি জানেন। কী করে ইংরিজি শিখলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাদের অবাক করে উত্তর দিলেন, ইংরিজি শিখেছি ভারতবর্ষে গিয়ে।

স্টিফেনের বয়েস পঁয়ষট্টির ওপরে, নিরীহ, শান্ত ধরনের মানুষ, এক সময় তিনি ছিলেন ক্রেন অপারেটর, সেই চাকরি নিয়েই গিয়েছিলেন ভারতে, বম্বে এবং গোয়া'র বন্দরে কাজ করেছেন ছ-সাত বছর। এখন অবসর-জীবন। গাড়িটা তাঁর নিজের নয়, মাঝে মাঝে কিছু অতিরিক্ত রোজগারের জন্য তিনি অন্যের গাড়ির ড্রাইভারি করেন। সরকারের কাছ থেকে বার্ধক্য ভাতা পান স্টিফেন, তাতে কোনও রকমে জীবনযাত্রা নির্বাহ হতে পারত। কিন্তু এখন জিনিসপত্রের দাম বাড়ায় বেশ অসুবিধে হয়। বর্তমান সরকার আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ভাতা বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই। স্টিফেনের মুখে চোখে কিন্তু সে জন্য কোনও তিক্ততা বা ক্রোধ নেই, সব কিছুই যেন এক দার্শনিক সুলভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন।

বুডাপেস্ট থেকে বালাতোন যেতে ঘণ্টা দু-এক লাগে। মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় এই মিষ্টি জলের হ্রদটি ৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা এই হ্রদটি চোখ জুড়িয়ে দেয়। হাঙ্গেরিয়ানরা তো বটেই, প্রচুর বিদেশিও এখানে আসে সাঁতার, মাছ ধরা ও নৌকা ভ্রমণের জন্য। ধারে ধারে রয়েছে ছোট ছোট গ্রাম, প্রচুর হোটেল ও অতিথিশালা। এখন অবশ্য শীত পড়ে গেছে। অধিকাংশই বন্ধ। বেলাভূমির অনেক অংশই জনশূন্য। আমরা পৌঁছোলাম দুপুরের দিকে, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। ক্ষুধার্ত উদরে ভ্রমণ তেমন জমে না। কিন্তু একটি খাবারের দোকান খুঁজে বার করতে আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করতে হয়, প্রায় সব রেস্তোরাঁই বন্ধ কিংবা খাদ্য নেই। একটি রেস্তোরাঁ পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত, সেটি সদ্য সরকারি থেকে প্রাইভেট হয়েছে, আমাদের আপ্যায়ন করে খাওয়াল এক অল্পবয়েসি পরিচারিকা। তার উৎসাহ ও ছোটাছুটি দেখেই বোঝা যায়, বেশি বিক্রি হলে তারও কিছু বেশি বেতনের সম্ভাবনা আছে। সরকারি দোকানের বিক্রির কম-বেশি নিয়ে কর্মচারীরা মোটেই মাথা ঘামায় না।

খাওয়া শেষ হলে স্টিফেন নিজের খাদ্যগুলির দাম দিতে চাইলে আমরা না না করে উঠলাম। ভাড়া করা গাড়ি নিলেও সবাই তো ড্রাইভারকে নিয়ে এক সঙ্গেই খেতে বসে। কেউ আবার ড্রাইভারের

কাছ থেকে পয়সা নেয় নাকি? কিন্তু এইটুকুর জন্যই স্টিফেন এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলেন যে মনে হল, এক বেলার খাবারের খরচ বাঁচানোও তাঁর কাছে অনেকখানি।

এর আগে একদিন এক হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি আমাদের একটা বেশ উঁচু দরের রেস্তোরাঁয় খেতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের এক মেয়ে থাকে প্যারিসে। সেই সূত্রে অসীমের সঙ্গে যোগাযোগ। পিতা ছিলেন দেশে হাঙ্গেরির রাষ্ট্রদূত। ওঁদের গাড়ি আছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার। আমরা সব নাম জানি না বলে নানারকম মূল্যবান খাদ্য ও পানীয় ওঁরাই বেছে দিলেন, আমি মনে-মনে একটু সঙ্কুচিত বোধ করছিলাম এই ভেবে যে, আমাদের জন্য ওঁদের অনেক পয়সা খরচ হয়ে যাবে। আমরা বন্ধুরা সংখ্যায় চারজন এবং কেউই কম খাই না। বিল আসবার পর ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত বললেন, আমার স্ত্রী ও আমার অংশটুকু আমি দিয়ে দিই? কয়েক মুহূর্ত আমরা চুপ করে ছিলাম। তারপরেই ভাস্কর বলে উঠল, না, না, আপনারা দেবেন কেন। আমরা সবটাই দিয়ে দিচ্ছি। ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে তা মেনে নিলেন। ওই দম্পতিকে কৃপণ মনে করার কোনও কারণ নেই, তাঁদের কথাবার্তা যথেষ্ট পরিশীলিত, কিন্তু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় বোধহয় অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করতে তাঁরা সক্ষম নন। আমার বন্ধু জর্জ সামলিও- কে আমরাই ডিনার খাইয়েছিলাম, কিন্তু তার বিনিময়ে সে পরে আমাদের এক কাপ চা খাওয়ারও নেমন্তন্ন করেনি। এমনও কি হতে পারে যে বাড়িতে বিদেশিদের আমন্ত্রণ করার ব্যাপারে এখনও এদের কোনও দ্বিধা আছে?

খাওয়া দাওয়া সেরে, খানিকক্ষণ একদিকে ঘুরে, তারপর আমরা গাড়ি সুদ্ধু ওপারে চলে গেলাম একটা ফেরিতে।

রবীন্দ্রনাথ এক সময় ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই হ্রদের তীরে কাটিয়ে গেছেন কিছুদিন। জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন চমৎকার। এখানকার শান্ত নির্জনতায় মন আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কবি সেই ১৯২৬ সালে এখানে একটি গাছ পুঁতেছিলেন। কী গাছ কে জানে, মূল গাছটি নিশ্চয়ই এতদিন বেঁচে নেই, সম্ভবত তার থেকে অন্য চারা জন্মেছে, কেন না, এখন সেই গাছটি দেখলে তার বয়েস খুব বেশি মনে হয় না। হাঙ্গেরির সরকার জায়গাটি যত্ন করে ঘিরে দিয়েছেন। পাশে একটি ট্যাবলেটে ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে। তাতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছে হিন্দু পোয়েট', তখন এরা সব ভারতীয়কেই হিন্দু বলত। এই স্থানটি বেশ প্রসিদ্ধ, সমস্ত টুরিস্ট গাইড বুকেই রবীন্দ্রনাথের এই গাছটির উল্লেখ আছে, কোনও কোনও গাইড বুকে রবীন্দ্রনাথকে বলা হয়েছে 'হিন্দি কবি'।

এখানে রবীন্দ্রনাথের যে আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে, সেটি সম্পর্কে আমাদের পশ্চিম বাংলার এক মন্ত্রী একবার একটা বেফাঁস মন্তব্য করে বেশ বিপাকে পড়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে ওই মূর্তিটির শিল্পী রামকিংকর বেইজ। শিল্পীর পরিচয় কোথাও লেখা নেই। ইদানীং কালে কাছাকাছি আরও কয়েকটি গাছ পুঁতে গেছেন ইন্দিরা গান্ধি, ভি ভি গিরি ও আরও কয়েকজন রাম-শ্যাম-যদু-মধু ধরনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গাছ পুঁতে এঁরা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হতে চেয়েছিলেন নাকি? বরং ভারত সরকারের টাকায় এঁরা এই স্থানটি আর একটু সুসজ্জিত করতে পারলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

সরকার কিছু করেননি, কিন্তু বছর আষ্টেক আগে এক বাঙালি দম্পতি বাংলা হরফে রবীন্দ্রনাথের চার লাইন কবিতা সমন্বিত একটি শ্বেত মর্মর ফলকে তাঁদের শ্রদ্ধা অর্পণ করে গেছেন। ভাষার টান বড় টান। এই দূর বিদেশে বাংলা লেখা দেখে আমরা বেশ খানিকটা চাপা হর্ষ অনুভব করি। মাত্র চার লাইন কবিতা, তাও পড়ি বারবার। এই বাংলা লেখায় তবু অন্তত 'হিন্দু কবি' ও 'হিন্দী কবি'র বিভ্রান্তি দূর করতে পেরেছে খানিকটা।

বিদেশে আমাদের বাংলা সাহিত্য তথা গোটা ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রায় ভুলতে বসেছে। আধুনিক

লেখকদের মধ্যেও অনেকে রবীন্দ্রনাথের নামটা শুধু জানে, লেখা কিছু পড়েনি। যারা পড়েছে, তারাও ঠোঁট উলটে বলে, নট মাই কাপ অফ টি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এখনও খুবই সমাদৃত। বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে জনপ্রিয় সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে তাঁর রচনাবলি পাঁচ লাখ কপি ছাপা হলেও অবিলম্বে শেষ হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও রবীন্দ্র-অনুরাগীর সংখ্যা অনেক। আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম চিনেদের রবীন্দ্র-প্রীতি দেখে। বাষট্টি সালের পর চিনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন, তারপর একটি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে, চিনের যুবক-যুবতীরা ভারত সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। কিন্তু চিনের যেসব লেখক সমাবেশে আমি গেছি, প্রত্যেক জায়গায় আমি রবীন্দ্র-বন্দনা শুনেছি। কোনও কোনও চিনা লেখক বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ চিনা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন। এঁরা কেউ শরৎচন্দ্রেরও নাম জানেন না, জীবনানন্দ-তারাশঙ্করের তো প্রশ্নই ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছে কতটা পরিচিত তার উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনা বলি। ওখানকার সংস্কৃতিমন্ত্রীর সঙ্গে একদিন আমাদের মোলাকাত হয়েছিল। বৈঠকি মেজাজে গল্প করতে করতে তিনি এক সময় বললেন, বয়েস হয়ে গেছে, এখন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। কলম নিয়ে বসলেও কলম কামড়াতে হয়, বার্ধক্যে মানুষের লেখার ক্ষমতা কমে যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন মহামানবের কথা আলাদা, তিনি আশি বছর বয়সেও কী বিপুল উদ্যমে লিখে গেছেন।

সাংহাইয়ের এক লেখকদের সভায় আমাকে যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন আমি খানিকটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম, তোমরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক প্রশস্তি করছ বটে, কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথকে মোটেই গুরুঠাকুর মনে করি না। তোমাদের কি ধারণা, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা। আমি নিজে একজন লেখক হিসেবে এটাকে মোটেই সম্মানজনক মনে করি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের অনেক সমালোচনা করি, তাঁর অনেক লেখা নস্যাৎ করে দিই! রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করেও আমাদের দেশে জীবনানন্দ দাশের মতন কবিরা মহৎ কবিতা রচনা করেছেন।

আমার সহযাত্রী হিন্দী লেখক কমলেশ্বর বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। সভা শেষে একজন চিনা লেখক আমার পিঠে হাত দিয়ে বন্ধুর মতন আপন-করা সুরে বললেন, তুমি অন্য দেশে এসে তোমাদের দেশের এত বড় লোক সম্পর্কে এরকম উক্তি করলে কেন? আমি তো বিদেশে গিয়ে আমাদের জাতীয় লেখক লু সুন সম্পর্কে এরকম কোনও মন্তব্য প্রকাশের চিন্তাই করতে পারি না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, লু সুন বড় লেখক আমরাও জানি, যেমন তোমরা জানো রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু তুমি কি বিদেশে গিয়ে এই ধারণা দেবে যে লু সুনের পর চিনা সাহিত্য থেমে আছে? সেটা চিনা সাহিত্যের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্য বারংবার পাঠ, উপভোগ ও উপলব্ধি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে কারুর পক্ষে লেখক হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কলম হাতে নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে রাখাই তো স্বাভাবিক। কলম যখন হাতে থাকে না তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের মন অনেকটা জুড়ে থাকেন এখনও। আমি মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্ন দেখি, তাঁর সঙ্গে কথা বলি। সেদিন বালাতোন হ্রদের তীরে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির সান্নিধ্যই ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। হ্রদের অন্যান্য অঞ্চলে আর না গিয়ে সেখানেই রয়ে গেলাম অনেকক্ষণ। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমরা সকলেই বেশ খানিকটা আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা কৌতুক গল্পও চালু আছে হাঙ্গেরিতে। হাঙ্গেরিয়ানদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুরো নামটা উচ্চারণ করা বেশ শক্ত। ওদেশে কেউ যখন খুব মাতাল হয়ে যায়, তখন তার বন্ধুরা তার নেশার পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য জিগ্যেস করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান কর তো। পারবি? এই গল্প শুনে রবীন্দ্রভক্তদের ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত না, কারণ এই গল্পেও প্রমাণ হয় যে ওদেশে সাধারণ মানুষের মনে রবীন্দ্রনাথ কতখানি জড়িয়ে আছেন! মাতাল সম্পর্কে

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর ওইসব দেশের দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক তফাত। আমাদের দেশের মাতালরা রবীন্দ্রনাথের ধার ধারে না।

বালাতোন হ্রদ থেকে ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। বাড়ির কাছে এসে গাড়ি ভাড়া মেটাবার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে খুচরো খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। দিতে হবে ছত্রিশ ডলার। কিন্তু আমাদের কোষাধ্যক্ষ বাদলের কাছে খুচরো ঠিক মিলছে না। তখন গাড়ির চালক স্টিফেন খুব মৃদু ও বিনীত স্বরে বললেন, যদি চল্লিশ ডলারই দিয়ে দাও, তা হলে তোমাদের চারজনকে মাত্র এক ডলার করে বেশি দিতে হবে, এমন কিছু গায়ে লাগবে না, কিন্তু ওই চার ডলার আমি পেতে পারি।

বাদল তৎক্ষণাৎ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, চল্লিশ ডলারই দিচ্ছি।

অসীম আমাকে মৃদু স্বরে বলল, দ্যাখো, এই স্টিফেন যখন ভারতে চাকরি করতে গিয়েছিল, তখন সে ছিল প্যান্ট-কোট-টাই পরা এক শ্বেতাঙ্গ সাহেব, তাই না! আমাদের দেশের লোকেরা নিশ্চয়ই ওকে সাহেব বলে খাতির করত। অথচ ও এখন আমাদের কাছে মুখ ফুটে মাত্র চার ডলার বকশিশ চাইছে। ব্যাপারটা খুব করুণ না।

এখানে বিদেশি সিগারেট খুব দুর্লভ, অনেকের কাছেই লোভনীয়। ভাস্কর স্টিফেনকে পুরো এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিল। তারপর জিগ্যেস করল, আচ্ছা স্টিফেন, তোমাদের দেশে এই যে কমুনিস্ট রেজিম বদলে গেল, গণতন্ত্র আসছে, এটা তোমার মতে ভালো না খারাপ হল?

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন স্টিফেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন, বোধহয় আগেরটাই ভালো ছিল।

ভাস্কর বলল, তাই নাকি? তুমি বুঝি কমুনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিলে?

স্টিফেন বললেন, না, আমার সঙ্গে পার্টির কোনও যোগ ছিল না। আমি সাধারণ চাকরি করতাম, কখনও সাতে পাঁচে থাকিনি। তবু আমার মতে, হুট করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বদলের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আমি কৌতূহলী হলাম। এমন স্পষ্টভাবে আগের আমলের সমর্থনে কথাবার্তা আর কারুর মুখে শুনিনি। যারা কট্টর পার্টি মেম্বার ছিল তারা এখন প্রকাশ্যে নিজেদের পূর্ব পরিচয় দিতে চায় না, উলটো হাওয়ার স্রোতে কথা বলার সাহস নেই। সারাদিন ধরে স্টিফেনের সঙ্গে ঘুরে বুঝেছি, তিনি সরল, সাদাসিধে, ভালো মানুষ, তিনি কারুর মন জোগানো কথা বলবেন না। মিথ্যে কথাও বলবেন না। সুতরাং তাঁর যুক্তিটা শোনা দরকার।

স্টিফেন আবার বললেন, আমি বুদ্ধিজীবীও নই, অর্থনীতিবিদও নই। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কলকারখানা ও সব ব্যাবসা সরকার পরিচালনা করবেন, না ব্যক্তিগত মালিকানায় ভালো চলবে, তাও আমি বুঝি না। আমি শুধু ভাবছি, ভবিষ্যতে কী হবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, ট্যাক্স বাড়ছে, সেই তুলনায় উপার্জন বাড়বে কি? আমাদের মতন মানুষরা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে তো? আগেকার আমলে খেয়ে পরে বেঁচে তো ছিলাম। কিছু-কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, তবু... এখনকার তরুণ-তরুণীরা গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে। ওদের পক্ষে ওটা মানায়। কিন্তু আমার তো বয়েস হয়েছে, অনিশ্চয়তা দেখলে ভয় হয়।

একটু থেমে স্টিফেন আবার বললেন, সত্তরের দশকে কাদার-এর আমলে আমরা বেশ ভালোই ছিলাম। তারপর অবস্থা একটু একটু খারাপ হতে লাগল, জিনিসপত্রের অভাব দেখা দিল...

আমার মনে পড়ল, জানোস কাদার অনেকদিন আগে এমন একটা উক্তি করেছিলেন, যা সেই সময়ের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ছিল সম্পূর্ণ অভিনব।

আজ যিনি জাতীয় বীর হিসেবে পূজিত, সেই ইমরে নেগিকে বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিয়ে মেরে ফেলা হয় ১৯৫৮ সালে। সোভিয়েত ট্যাংক এসে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল হাঙ্গেরির গণঅভ্যুত্থান। সেই ট্যাংকবাহিনী আর ফিরে গেল না। হাঙ্গেরিকে বাধ্য করার জন্য সোভিয়েত ব্লক থেকে ব্যবস্থা

নেওয়া হল নানারকম। বুডাপেস্টে একটি পুরো কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, যার প্রধানমন্ত্রী করা হল জানোস কাদার-কে।

কাদার সোভিয়েত ব্লকের কাছে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য সব রকম চেষ্টা করে গেলেও তিনি বুঝেছিলেন, হাঙ্গেরির যুবসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও কৃষকদের মধ্যে যে ক্ষোভ রয়ে গেছে, তা শুধু জোর জবরদস্তি দিয়ে দমন করা যাবে না। কাদারও ছিলেন অনেকটা "জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট"। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে খনি ও কলকারখানায় পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিক কাউন্সিলগুলিকে অনেকটা অধিকার দেওয়া হবে না। অনিচ্ছুক কৃষকদের কৃষি-সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না। নতুন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এইসব প্রতিশ্রুতি তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত মাটির চাপে রক্ষা করতে পারেননি। তবু চেষ্টা করেছিলেন।

অভ্যুত্থান দমনের পর সাধারণত চলে প্রতিশোধের পালা। কাদার আন্তর্জাতিক যে-কোনও ঘটনায় সোভিয়েত লাইন পুরোপুরি মেনে চললেও স্বদেশে বিক্ষুব্ধদের হত্যা, নির্যাতন বা কারাদণ্ডের প্রতি প্রবণতা দেখালেন না। দেশকে গড়ার জন্য সব ধরনের যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য চাইলেন, শুধুমাত্র পার্টির সদস্য হওয়াই যাদের যোগ্যতার মানদণ্ড নয়। দেশের সাধারণ মানুষ যাতে ভয় কাটিয়ে উঠে নিজের নিজের পেশায় মন দিতে পারে, ওপর মহলের খবরদারি ছাড়াও ইচ্ছে মতন পড়তে, লিখতে, ছবি আঁকতে বা কথা বলতে পারে, সেইজন্য তিনি ঘোষণা করলেন, 'যারা আমাদের বিরুদ্ধে নয়, তারা সবাই আমাদের পক্ষে' (He who is not against us is with us)।

এটা কমিউনিস্ট দুনিয়ায় এক সম্পূর্ণ নতুন কথা। রুশ বিপ্লবের আগে লেনিন একবার বলেছিলেন, 'যারা আমাদের পক্ষে নয়, আমাদের শত্রু'। পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিস্ট এটাকেই ধ্রুব বাক্য বলে বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন। অ-কমিউনিস্ট মাত্রই প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা অল্প বয়েসে যখন স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, তখন আমাদেরও এই কথাই শোনানো হয়েছিল। এমনকি কেউ যদি নির্ঝঞ্ঝাট, নির্দল হয়, কেউ যদি নিজেকে মানবতাবাদী বলে, তাকেও প্রতিক্রিয়াশীল বলে ছাপ মেরে দেওয়া হবে। কিছু কিছু মানুষের স্বভাবই এই, তারা কোনও দলে যেতে চায় না। মিছিলে যেতে চায় না। তারা নিরালায় নিজেদের কাজ করে যেতে চায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, লেখক, শিল্পীদের মধ্যে অনেকে এই স্বভাবের, তারা এক ধরনের উদার মানবতায় বিশ্বাসী, যার সঙ্গে সাম্যবাদের প্রত্যক্ষ কোনও বিরোধ নেই। মানুষের এই নিরালা থাকার স্বভাবটাকে উপেক্ষা করে তাদের দলে টানবার চেষ্টা করে সাম্যবাদীরা, যারা তবুও দলে আসে না তাদের নানা বিড়ম্বনা, গালাগালি ও বাধা সহ্য করতে হয়।

এই গোঁড়ামির কুফল হয়েছে দুটি। কিছু লোক, যাদের জীবনযাত্রায় কিংবা চিন্তাধারায় সাম্যবাদের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই, তারা মুখে পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অনেক রকম সুবিধে ভোগ করে। এরকম বহু দেখা যায়। একজন অযোগ্য শিক্ষক অন্য অনেক যোগ্য শিক্ষককে সরিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যায় নিছক পার্টি সম্পর্কে গলাবাজির জোরে। এই অভিযোগ বহু শোনা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এরকম দৃষ্টান্ত ভুরি-ভুরি হওয়াতেই সাধারণ মানুষের এত ক্ষোভ জমেছিল।

অন্য কুফল হল, পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখানোটাই প্রধান যোগ্যতা হওয়ার ফলে সমস্ত রকম সমালোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল এক দলীয় স্বৈরতন্ত্র। পার্টির নেতাদের যে-কোনও নির্দেশই অলঙ্ঘনীয়। বাইরের লোক পার্টির কোনও সমালোচনা করলে তাদের বলা হবে সি আই এ'র এজেন্ট, ধনতন্ত্রের চাকর ইত্যাদি। আর পার্টির কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে দেওয়া হবে শাস্তি। পার্টির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এমনই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছোয় যে স্টালিন যখন কোটি কোটি মানুষকে হত্যার আদেশ দেয় তখনও কেউ প্রতিবাদ করে না। রুমানিয়ায় চাউসেস্কু যখন একটি খুদে হিটলার হয়ে ওঠে, তখনও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তাকে অপসারণের কথা উচ্চারণ করে

না কেউ।

প্রায় সব ক'টি সমাজতান্ত্রিক দেশেই বহু লেখক পার্টির নির্দেশে নির্যাতিত হয়েছে। যে-কোনও ব্যাপারেই অন্ধ বিশ্বাস সৃষ্টিশীল শিল্পের অন্তরায়। লেখক-শিল্পীদের চরিত্র গঠনই এই যে তারা কারুর নির্দেশ মেনে চলতে পারে না। এক ধরনের বেপরোয়া ভাব কিংবা ক্ষ্যাপামিই তাদের সৃষ্টির প্রেরণা। যে-কোনও সমাজ ব্যবস্থায় যে-কোনও গলদ দেখালেই তাদের প্রতিবাদ বেরিয়ে আসে। তারা প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, সমাজতন্ত্রের কোনও কোনও হাস্যকর দিকের প্রতিবাদ করতে তারা বাধ্য। কিন্তু পার্টির সুরে সুর মিলিয়ে কথা না বললেই কিংবা কিছু লিখলেই সেই লেখককে বলা হবে লোভী, ধনতন্ত্রের উপাসক কিংবা বুর্জোয়াদের দালাল কিংবা আরও বাছা বাছা সব গালাগাল। কেন সেই লোকরা প্রতিবাদ করছেন না বা সুরে সুর মেলাচ্ছেন না, তা ভালো করে বুঝে দেখার চেষ্টা না করেই তাঁর সততা সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়। অথচ লেখকরাই তো সমাজের বিবেক। তাদের সমস্তরকম দল মতের উর্ধ্বে রাখতে পারলেই সমাজ ও শিল্পের পক্ষে মঙ্গল।

পাস্তেরনাক, সোলঝেনিৎসিন, মিলান কুন্দেরার মতন লেখকরা অযথা নির্যাতিত হয়েছেন। পাস্তেরনাক ক্ষুণ্ন মনে লেখাই ছেড়ে দিলেন, একজন বিশিষ্ট কবি হয়েও জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়ে দিলেন অকিঞ্চিকের অনুবাদ কর্মে। নোবেল পুরস্কার পেয়েও নিতে গেলেন না, তারপর তার মৃত্যু অনেকটা দুঃখিত, নীরব প্রস্থানের মতন। এখন আবার মস্কোতে পাস্তেরনাকের রচনা নিয়ে খুব নাচানাচি চলেছে। একদা যাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, এখন তাঁর রচনাই বিশেষ সমাদৃত।

সোলঝেনিৎসিনের রচনা 'ইভান দেনিশোভিচ-এর জীবনের একদিন' অনুবাদ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যখন কমিউনিস্ট পার্টি এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। সোলঝেনিৎসিন ছিলেন আদর্শ লেখক। পরে যখন তিনি গুলাগ আর্চিপেলেগো লিখলেন, অমনি তিনি অচ্ছুৎ হয়ে গেলেন। দেশান্তরী হতে বাধ্য সোলঝেনিৎসিন, তবু তিনি কখনও স্বদেশের নিন্দে করেননি। অতি সম্প্রতি সেই গুলাগ-কেই একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং সোলঝেনিৎসিনকে স্বদেশে ফেরার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যারা তখন সোলঝেনিৎসিনকে অপবাদ দিয়েছিলেন তাদের বিচার কে করবে? সোলঝেনিৎসিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন এই পুরস্কার।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় মিলান কুন্দেরাও খুব বড় মাপের লেখক। আগামী যে-কোনও বছরের মধ্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন। চেক সরকার এঁকেও সহ্য করতে পারেননি, মিলা কুন্দেরা দেশ ছেড়ে চলে যান। তাঁর 'জোক' বা ঠাট্টা নামের উপন্যাসটি পড়লেই বোঝা যায় পার্টির নেতাদের হামবড়াই কোন নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল! এই উপন্যাসের কাহিনিতে একটি কলেজের ছাত্র তার এক বান্ধবীকে একটি পোস্ট কার্ডে চিঠি লেখে, যাতে শুধু লেখা ছিল, 'লং লিভ ট্রটস্কি'। পোস্টকার্ডটি পৌঁছে যায় ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারির কাছে। তার মতে এটা একটা সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়াশীল দলিল, কমিউনিস্ট দেশের এক ছাত্র এখনও ট্রটস্কির দীর্ঘজীবন কামনা করছে! আসলে কিন্তু ট্রটস্কি শব্দটার সঙ্গে স্টালিনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মেক্সিকোতে নির্বাসিত অবস্থায় স্টালিনপন্থীদের হাতে নিহত বোলশেভিক নেতা ট্রটস্কির কোনও সম্পর্ক নেই। ওটা একটা ঠাট্টা, একটা আদিরসাত্মক ইয়ারকি। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক গোপন কোড ওয়ার্ড থাকে। ওটাও সে রকম, ট্রটস্কি একটি গোপন শব্দ। ছাত্র ইউনিয়নের কট্টর সেক্রেটারি কিংবা লোকাল কমিটির কেউ সেই ঠাট্টা বুঝল না, তারা এটাও বুঝল না যে সত্যিকারের ট্রটস্কিপন্থী হলে কেউ পোস্ট কার্ডে ওভাবে লিখে নিজেকে জাহির করত না। ওই সামান্য ঠাট্টার জন্য ছেলেটির পড়াশুনো বন্ধ হয়ে গেল, তাকে পাঠানো হল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে, মেয়েটিরও জীবন নষ্ট হয়ে গেল। পার্টির কর্তাদের ওপর কোনও আপিল চলে না। তাদের নির্বোধ জেদে অপচয়িত হল দুটি জীবন।

সেইসব পার্টির কর্তারা আজ পলাতক কিংবা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে।

॥ ৮ ॥

হাঙ্গেরি থেকে আমরা রুমানিয়া যাত্রা করলাম ট্রেনে। এই সেই বিখ্যাত ট্রেন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, বহু গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে, সিনেমা তৈরি হয়েছে এই ট্রেন নিয়ে। নাম ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস হলেও এই ট্রেন অবশ্য প্রাচ্যের মধ্য দিয়ে যায় না, লন্ডন থেকে যাত্রা করে ইউরোপের অনেকগুলি দেশ পেরিয়ে ইস্তামবুলে এসে প্রাচ্যের এক প্রান্ত ছোঁয় শুধু। ইস্তামবুল শহরটিরও অর্ধেক ইউরোপে।

আমরা চারজন টিকিট কেটেছিলাম সেকেন্ড ক্লাসের। আন্তর্জাতিক যাত্রা হিসেবে ভাড়া খুবই সস্তা। আর একটু আরামদায়ক ক্লাসের টিকিট কাটার সাধ্য থাকলেও আমাদের স্বভাবই তো সস্তা খোঁজা। রাত ন'টা থেকে পরের দিন দুপুর পর্যন্ত থাকতে হবে ট্রেনে। ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস-এর সেই গৌরবের দিন আর নেই, তা ছাড়া গল্প-উপন্যাসগুলি উঁচু ক্লাসেই ঘটে, আমরা যে বগিতে উঠলাম সেটাতে রীতিমতন ভিড়। সাধারণ ট্রেনের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। এই ট্রেনটি যখন যে-দেশের মধ্য দিয়ে চলে, তখন সে দেশের ব্যবস্থাপনা, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য এই ট্রেনেও নানারকম বিশৃঙ্খলা। যে কুপেতে আমাদের স্থান হল, সেটি থ্রি-টিয়ার, অর্থাৎ ছ'জন লোকের শোওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু ছ'জন মানুষ শুয়ে পড়লে সেখানে মালপত্র রাখার আর কোনও জায়গা থাকে না, তা ছাড়া একেবারে ওপরের বাংক বেশ ছোট। লম্বা মানুষের অনুপযুক্ত। আমাদের দেশের ট্রেনের তুলনায় বেশ খারাপ। আরও দুজন লোক এসে পড়লে আমাদের চারখানা সুটকেস কোথায় রাখা হবে, এই চিন্তায় আমরা যখন বিচলিত তখন ভাস্কর একটা উপায় বার করে ফেলল। প্রথমে সে কন্ডাক্টরি গার্ডকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে এইটুকু একটা কুপেতে দুজন মানুষ থাকবে কী করে? কন্ডাকটর গার্ডটি বলল, এখানে তো ছ'জনেরই রিজার্ভেশান, অন্য ছ'জন এলে জায়গা দিতেই হবে। ভাস্কর বলল, অন্য কুপেতে যদি একটা-দুটো সিট খালি থাকে, সেখানে তাদের চালান করে দেওয়া যায় না? আমরা চারজন এক সঙ্গে আছি...। কন্ডাকটর গার্ডটি মানতে চায় না। তখন ভাস্কর একটা একশো ফোরিন্টের নোট এগিয়ে দিল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন কাজ হল। কন্ডাকটর গার্ডটি অল্প বয়েসি যুবক, অত্যন্ত সুদর্শন, স্যুট-টাই পরা নিখুঁত পোশাক, চিত্র তারকা হলে তাকে বেশ মানাত, মাত্র একশো ফোরিন্ট পেয়ে (আমাদের হিসেবে তিরিশ টাকার কাছাকাছি) তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে জানাল যে আমাদের কোনও চিন্তা নেই, আমাদের কুপেতে আর কেউ ঢুকবে না, সে আমাদের যে-কোনও সাহায্য করতে প্রস্তুত। সে নিজে ধরাধরি করে আমাদের ভারী ভারী সুটকেস তুলে দিল ওপরের বাংকে।

সুষ্ঠুভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর ভাস্করের হঠাৎ ঈষৎ গর্বিত মুখের দিকে চেয়ে অসীম ভর্ৎসনার সুরে বলল, ভাস্কর, তুমি কোন সাহসে লোকটিকে ঘুষ দিতে গেলে? আমি তো ইউরোপে কোনও লোককে এইভাবে ঘুষ দেওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারি না।

ভাস্কর বলল, মানুষের চরিত্র স্টাডি করতে হয়। সে ক্ষমতা তোমার নেই। এ ছেলেটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলেই আমি ধরে ফেলেছি এর লোভ আছে। দেখলে না, টাকাটা কী রকম খপ করে নিয়ে নিল।

আমিও এই প্রথম এত সাবলীলভাবে ঘুষের ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করলাম। এমন সুসজ্জিত, সুদর্শন যুবকটি যে এই সামান্য টাকার জন্য ব্যগ্র হবে, এ যেন কল্পনাই করা যায় না। ভাস্কর যখন প্রথম নোটটা বাড়িয়ে দিল, তখন আমার বেশ ভয়ই করছিল, যদি সে উলটে আমাদের অপমান করে।

চোখের সামনে না দেখলেও এইসব দেশে যে কী রকম ঘুষের রাজত্ব চলে, তা অনেকের মুখেই শুনেছি ও নানা লেখায় পড়েছি। ঘুষ ছাড়া অনেক জায়গায় কোনও কাজই হয় না। অনেকের ধারণা ভারতের মতন গরিব দেশগুলিতেই বুঝি ঘুষ-প্রবণতা রয়েছে, আসলে কিন্তু নানা ছদ্মবেশে

ঘুষ-ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্ব জুড়ে। এসব দেশে কী রকম বাধ্যতামূলকভাবে ঘুষ দিতে হয়, তার একটা উদাহরণ শুনেছি। ধরা যাক, এক বাড়িতে জলের কল খারাপ হয়ে গেল। খাবার জলও আসছে না। শহরের কোনও দাবিই ব্যক্তিগত মালিকানার নয়, সবই সরকারি কোয়ার্টার, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বের জন্যও সরকারি বিভাগ আছে। বিপন্ন ব্যক্তিটি জলের কল সারাবার বিভাগে খবর দিল। খবর দিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মিস্তিরি ছুটে আসবে তা তো নয়। কাকুতি-মিনতি করে একজন মিস্তিরিকে ডেকে আনতে হবে। মিস্তিরি দেখে শুনে বলল, একটা ওয়াশার না পালটালে কল ঠিক হবে না, জল আসবে না। নীতিগতভাবে, সরকারি বিভাগ থেকে বিনামূল্যে কিংবা নামমাত্র মূল্যে ওয়াশার পাওয়ার কথা। কিন্তু নীতি আর বাস্তব ব্যবস্থার মধ্যে অনেক তফাত ঘটে যায়। মিস্তিরিটি বলল, ওয়াশার তো এখন স্টকে নেই। কবে আসবে বলা যাচ্ছে না, এক সপ্তাহও হতে পারে, তিন মাসও হতে পারে! এখন উপায়? নাগরিকজীবনে কলের জল ছাড়া কি একদিনও চলে? তখন মিস্তিরিটি বলবে, দশ রুবল পেলে সে কোনওক্রমে একটা ওয়াশার জোগাড় করে দিতে পারে।

আমাদের দেশে বেচারা কলের মিস্তিরিরা এক পয়সাও ঘুষ পায় না, একজনের বদলে অন্য মিস্তিরি ডেকে আনা যায়, বাজারের অনেক দোকানেই ওয়াশার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশেও কোনও বাড়িতে বা কোয়ার্টারে নতুন জলের কলের কানেকশান পেতে হলে প্রচুর হাঁটাহাঁটি ও পুরসভার কোনও কর্মীকে ঘুষ দেওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। মানুষ নীতি নির্ধারণ করে, আবার মানুষই তা ভাঙে।

চিনে গিয়ে শুনেছি, সেখানে ঘুষ দেওয়া নেওয়া সাংঘাতিক অপরাধ হিসেবে গণ্য হলেও কোনও সরকারি কর্মচারী ও পার্টির উঁচু দিকের সদস্যদের সঙ্গে চেনাশুনো থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারুর কোনও জরুরি প্রয়োজন হলেই অমনি চতুর্দিকে খুঁজতে শুরু করে, কেউ চেনা আছে? ভালো চাকরি থেকে বিদেশযাত্রার অনুমতি পর্যন্ত অনেক কিছুই নির্ভর করে, ওপর মহলে কার কতটা চেনা আছে তার ওপর।

ধনতান্ত্রিক দেশের লোকজন আমাদের দেশে এলে রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ হাসপাতালের চতুর্থশ্রেণির কর্মচারীদেরও প্রকাশ্যে ঘুষ নিতে দেখে নাক সিঁটকোয়। অধিকাংশ বিদেশিদের রচনায় তার উল্লেখ থাকে। ওদের দেশে রাস্তার পুলিশ ঘুষ নেয় না, কোনও সামাজিক সরকারি অফিসের কর্মচারী ঘুষের জন্য হাত পাতে না তা ঠিক, এসব সামাজিকভাবে নিন্দনীয়। ওসব দেশের রীতি হচ্ছে, চোখের সামনে ভদ্র সেজে থাকো, আড়ালে যত খুশি কুকীর্তি করে যেতে পারো। সামান্য দু দশ টাকা ঘুষের বদলে ওসব দেশে যে লক্ষ-কোটি টাকার ঘুষের কারবার অনবরত চলে, তা কে না জানে। তবু ভণ্ডামি করে আমাদের দেশের এইসব ছোটখাটো ঘুষের ব্যাপার দেখে তারা আঁতকে ওঠে যেন ঘুষ কথাটার মানেই আগে জানত না।

সস্তায় এদিককার দেশগুলি ঘোরার জন্য 'ইস্টার্ন ইউরোপ অন আ শু স্ট্রিং' নামে একটি গাইড বই আছে। তার লেখক এই দেশগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল, কোথাও নিন্দে করেননি। ভালো দিকসপত্রের কথাই লিখেছেন, মন্দ দিকের কথা বাদ দিয়ে গেছেন। তবে তিনি কোথায় কীভাবে ঘুষ দিতে হবে, না দিলে কাজ পাওয়া যাবে না, তারও বেশ প্রয়োজনীয় বিবরণ দিয়েছেন। খুব বেশি টাকার ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন পকেটে অনেকগুলো এক ডলারের নোট এবং আমেরিকান সিগারেট রাখবার জন্য। আমেরিকান সিগারেটের খুব চাহিদা এই সব দেশে। তিনি লিখেছেন, কোনও কোনও জায়গায় কুড়ি ডলার দেওয়ার চেয়েও এক প্যাকেট কেন্ট সিগারেট দিলে বেশি কাজ হয়।

ভাস্কর সিগারেট খায় না, কিন্তু অনেকগুলি প্যাকেট কেন্ট সিগারেট নিয়ে এসেছে।

আমরা রুমানিয়ায় যাব শুনে জার্মানিতে অনেকেই চোখ কপালে তুলে বলেছিল, সেখানে কেন যাবে? রুমানিয়াতে গিয়ে কিছু খেতে পাবে না!

আমরা হেসে উত্তর দিয়েছি, আমরা গরিব ভারতের মানুষ, আমাদের আবার না খেতে পাওয়ার ভয় কী।

শুধু চাওসেস্কুর অপসারণের পরেই নয়, বছর চারেক ধরেই সারা ইউরোপে শোনা গেছে যে রুমানিয়ায় দারুণ খাদ্যাভাব। পোলান্ডে যখন দারুণ অনটন চলছে, তখনও অনেকে বলেছে যে এর তুলনায় রুমানিয়ার অবস্থা অনেক খারাপ। তবু কেউ কিছু ব্যবস্থা নেয়নি কেন? ওয়ারশ প্যাক্টের অন্তর্বর্তী হলেও এখানকার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কিন্তু পরস্পরকে অনেক ব্যাপারেই সাহায্য করেনি। এর মধ্যে হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া। এই পাশাপাশি দুটি দেশের মধ্যে চরম বিরোধ। হাঙ্গেরিতে আমরা রুমানিয়ার প্রসঙ্গ তুললেই সবাই গম্ভীর হয়ে গেছে। আমাদের বন্ধু জর্জ সোমলিও-কে জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি এর মধ্যে রুমানিয়া বেড়াতে যাওনি? জর্জ প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, রুমানিয়া বেড়াতে যাব কোন দুঃখে? ওটা আবার একটা দেশ নাকি?

অসীম বুদ্ধি করে কিছু রুটি-মাখন-সসেজ নিয়ে এসেছে সঙ্গে। অতি সুদৃশ্য ডাইনিং কার ঘুরে এসে ভাস্কর জানাল সেখানে কোনও খাবার নেই।

রাত আড়াইটের সময় ট্রেন এসে দাঁড়াল হাঙ্গেরি-রুমানিয়া সীমান্তে। তারপর শুরু হল ইমিগ্রেশান-কাস্টমসের অত্যাচার।

সারা পৃথিবীতেই এখন ভিসা ব্যবস্থা বিচিত্র ও উদ্ভট। কোন দেশে কার কী ধরনের ভিসা লাগবে, তার কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। হাঙ্গেরিতে ভিসা পাওয়ার জন্য বাদল ও আমাকে হোটেল বুক করে বাজে পয়সা খরচ করতে হয়েছিল, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে আসা অসীম ও ভাস্করের ভিসাই লাগেনি। ঠিক পাশের দেশটিতেই উলটো ব্যবহার। ভারতীয় হিসেবে বাদল ও আমার ভিসার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসীম ও ভাস্করের লাগবে, তাও আবার অসীমের তুলনায় ভাস্করের ভিসা ফি অনেক বেশি। তিনজন ব্যক্তি আমাদের কিউবিকলে এসে পাশপোর্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল, তাদের মধ্যে একজন ফরাসি ফ্রাংক ও ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যবান হিসেব করতে হিমসিম খেয়ে গেল, অন্য দুজন আবদার ধরল, আমাদের সুটকেস খুলে দেখবে। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে, ঘুম চোখে এসব অত্যাচারের মতনই মনে হয়। সুটকেস খুলতে বাধ্য করে, তারা হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে জামা-কাপড় উলটে দেয়, আসলে তারা কিছুই দেখে না, সত্যিকারের গোপনীয় কোনও বস্তু থাকলে ওভাবে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না, তবু নিছক লণ্ডভণ্ড করাতেই যেন তাদের আনন্দ।

কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের লোকজনদের ওপর যে কোনও চোটপাট করা যায় না, এ বিবেচনা হারিয়ে ফেলে ভাস্কর রীতিমতন তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল। আমি আর বাদল ভাস্করকে থামাবার চেষ্টা করেও পারি না, তাকে টেনে নিয়ে গেলাম একপাশে। লোকগুলো ইংরিজি প্রায় বোঝেই না, তাই যা রক্ষে।

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে লোকগুলি বিদায় নিলে অসীম বলল, ভাস্কর, তুমি কী করছিলে? বিপদে ফেলে দিচ্ছিলে সবাইকে।

ভাস্কর বলল, তা বলে কি অসভ্যতা সহ্য করতে হবে রাত আড়াইটের সময়? বিপদ, বিপদ আবার কী?

অসীম বলল, যদি আমাদের জেলে পুরে দিত? একটা কিছু ফল্স চার্জ দিয়ে দিলেই তো হল।

ভাস্কর বলল, জেলে দেবে, মামাবাড়ির আবদার? আমরা কি চুরি-জোচ্চুরি করেছি? আমাদের এমব্যাসিতে ফোন করতাম!

বাদল বলল। জেলে না দিলেও এই শীতের রাতে আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে রাখতে তো পারত! সে ক্ষমতা এদের আছে। তখন কী হত?

ভাস্কর এবার ঠিক কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে টপ করে শুয়ে পড়ে পাশ ফিরে নাক

ডাকাতে লাগল।

পৃথিবীর অনেক দেশেই ঢোকার সময় লক্ষ করেছি, আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করার আগেই, আমাদের চেহারা দেখে ভারতীয় (ভারত উপমহাদেশীয়) বলে চিনতে পারলেই ইমিগ্রেশানের লোকদের ব্যবহার বদলে যায়। ভারতীয়রা আজ আর পৃথিবীর কোথাও স্বাগত নয়। সকলেরই ধারণা, এ দেশটা অত্যন্ত জনবহুল আর দরিদ্র, এ দেশে ছেলেমেয়েরা চাকরি কিংবা জীবিকার লোভে সব সময় অন্য দেশে থেকে যাওয়ার সুযোগ খোঁজে। একবার আমি আফ্রিকার কিনিয়ায় গিয়েছিলাম। আগে সেখানে ভারতীয়দের জন্য ভিসা লাগত না, আমি যাওয়ার আগের দিন থেকে ভিসা প্রবর্তিত হয়েছে, তা জানতে পেরে আমি লন্ডন থেকে কষ্ট করে ভিসা সংগ্রহ করেছিলাম। ইমিগ্রেশানের কাউন্টারে একজন কুচকুচে কালো রঙের মানুষ লাইনের সামনের দিকের শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছিল ও চটপট স্ট্যাম্প মেরে ছেড়ে দিচ্ছিল। আমাকে দেখামাত্র লোকটি গম্ভীর হয়ে গেল। আমার কাগজপত্র সব ঠিকঠাক, তবু সে জিগ্যেস করল, তুমি কেন এসেছ? কতদিন থাকবে? আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, আমরা যতই বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে রাগারাগি করি, আসলে কালো লোকরাই কালো লোকদের দেখতে পারে না।

হাঙ্গেরিতে ঢোকার মুখে আমার ও বাদলের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। উপযুক্ত ভিসা সঙ্গে আছে, ইমিগ্রেশান কাউন্টার থেকে ছেড়েও অফিসার দূর থেকে ডেকে আমাদের থামাল এবং পাশপোর্ট দেখতে চাইল। কাস্টমস অফিসারের পক্ষে মালপত্রের আকার-প্রকার লক্ষ করাই স্বাভাবিক, কিন্তু সে আমাদের পাসপোর্ট দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল এবং আমাদের অতি নিরীহ চেহারার সুটকেস দুটি খুলতে বলল, কী দেখল সে আমাদের পাসপোর্টে? বিরক্তি চেপে তাকে আমাদের সুটকেস দুটি ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ দিলাম। যথারীতি মিনিট দু-এক বাদে লোকটি বলল, ঠিক আছে, যেতে পারো।

বাক্স গুছোবার পর আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি? এই যে দেখছি গ্রিন চ্যানেল দিয়ে অন্য অনেক লোক সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে, তুমি শুধু আমাদের থামালে কেন? আমাদের মুখ দেখে?

লোকটি থতোমতো খেয়ে বলল, না, সে সব নয়। পাঁচজন-দশজন পরপর এক এক জনকে থামাই।

এ কথাটি মোটেই সত্যি নয়। আমরা চোখের সামনে কুড়ি-পঁচিশ জনকে পার হতে দেখেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। তা ছাড়া, দশজন অন্তর একজনকে চেক করার ব্যবস্থা থাকলেও আমাদের দু'জনকে ধরা হল কেন? সমগ্র প্লেন-যাত্রীদের মধ্যে আমরা দু'জনেই মাত্র অশ্বেতকায়। হাঙ্গেরিতে বর্ণবিদ্বেষের কথা কখনও শোনা যায়নি, তবু আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক, ওই একটি ঘটনা ছাড়া। হাঙ্গেরিতে আমরা যে-কটা দিন কাটিয়েছি, সকলের কাছ থেকেই ভালো ব্যবহার পেয়েছি। এমনও হতে পারে, কাস্টমস অফিসারটি প্রথমে আমাদের জিপসি ভেবেছিল, পরে পাসপোর্ট দেখে বুঝেছিল, আমরা জিপসিদের পূর্বপুরুষের দেশের। হাঙ্গেরিতে অনেকেই জিপসিদের পছন্দ করে না। এখানকার জিপসিদের প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাব এবং পুলিশি অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ পত্র-পত্রিকায় পড়েছি।

লন্ডনের বিমানবন্দরে ভারতীয়দের বহু হয়রানির কাহিনি শোনা যায়। আমার কখনও সেরকম অভিজ্ঞতা হয়নি, বরং এ কথা বলতে পারি যে ইংরেজেরা এখানে রুল অফ ল মানে। ইমিগ্রেশান থেকে আপত্তি জানালেও তার ওপর আপিলের ব্যবস্থা আছে। মনে যদি অপরাধবোধ না থাকে, তা হলে ইমিগ্রেশান কর্মচারীর সঙ্গে তর্ক করা যায়। চার বছর আগেও ইংল্যান্ডে যাওয়ার জন্য ভারতীয়দের কোনও ভিসার ব্যবস্থা ছিল না। সেইরকমই একটা সময়ে আমি মস্কো থেকে ফেরার পথে লন্ডন গিয়েছিলাম। ভিসা ছিল না, কিন্তু ইমিগ্রেশান কাউন্টারে নানারকম প্রশ্নপর্ব চলত। আমাকে

কর্মচারীটি জিগ্যেস করল, তুমি লন্ডনে আসতে চাও কেন? আমি হালকাভাবে উত্তর দিলাম, রাশিয়ায় একটা সরকারি নেমন্তন্ন ছিল, ফেরার পথে লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকদিন আড্ডা দিয়ে যেতে চাই। সে জিগ্যেস করল, থাকবে কোথায়? পয়সা পাবে কোথায়? আমি উত্তর দিলাম, এক বন্ধুর বাড়িতে থাকব, বিশেষ পয়সা লাগবে না। লোকটি অবিশ্বাসের চোখে কয়েক পলক চেয়ে রইল। ইংরেজ জাতি আড্ডার মর্ম বোঝে না, আমাদের কাছে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার চেয়ে মনোরম আর কী হতে পারে? কর্মচারীটি একবার জিগ্যেস করল, সোভিয়েত সরকার যে তোমায় নেমন্তন্ন করেছিল, তার প্রমাণ কোথায়? তুমি যে মস্কো থেকে আসছ তা বুঝব কী করে? তোমার পাসপোর্টে তো সোভিয়েত ভিসা নেই এবার আমার একটু মজা করার ইচ্ছে হল। আমার কোনও ঝুঁকি নেই, জরুরি কোনও কাজেও আসিনি, ঢুকতে যদি না দেয়, পরের প্লেনে চেপে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, তুমি এই কাউন্টারে বসে কাজ করছ, অথচ তুমি এটা জানো না যে সোভিয়েত ভিসার ছাপ কখনও থাকে না পাসপোর্টে? আলাদা কাগজে ভিসা থাকে, আসার সময় সেটা নিয়ে নেয়! এই কথাটা শোনামাত্র রাগ করার বদলে অত্যন্ত বিনীতভাবে সেই কর্মচারীটি বলল, ঠিক। ঠিক! আপনার লন্ডন-বাস সুখকর হোক! ব্রিটিশ চরিত্রের এই দিকটি আমার ভালো লাগে।

সকালবেলা চলন্ত জানালা দিয়ে দেখা গেল রুমানিয়ার দৃশ্য। ছোট ছোট পাহাড় ও নিবিড় জঙ্গল। শীত শুরু হয়েছে, কিন্তু সব গাছের পাতা ঝরেনি। এদিককার গাছের পাতা ঝরে যাওয়ার আগে নানারকম রং বদলায়। এই অরণ্য যেন টেকনিকালার।

ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য আমরা গেলাম ডাইনিং কামরায়। প্রচুর চেয়ার টেবিল, প্রায় সবই ফাঁকা। ফাঁকা থাকার কারণটাও অবিলম্বে জানা যায়, কোনও খাবার নেই। এত বড় একটা খাবারের জায়গা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, অথচ কোনও খাবার নেই। অনেক দূরের একটা টেবিলে একজন লোক বসে কিছু খাচ্ছে। ভাস্কর সেই দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই পরিচারক বলল, ওইটুকুই শেষ খাবার ছিল, তারপর ফুরিয়ে গেছে।

ভাস্কর ছাড়ার পাত্র নয়। পকেট থেকে বার করল কেন্ট সিগারেটের একটা প্যাকেট। তারপরেই চলে এল চার প্লেট ওমলেট। এর সঙ্গে টোস্টের দুরাশা করে কোনও লাভ নেই, কারণ রুটি সত্যি নেই। ওমলেটে ছড়াবার জন্য গোলমরিচও পাওয়া যাবে না। চা-কফির জন্য দুধ নেই। শুধু নুন দেওয়া ডিম ভাজা ও কালো চা, তাই খেতে খেতে মনে পড়ল গ্রাহাম গ্রিন ও আগাথা ক্রিস্টি এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে খাওয়া দাওয়ার কত না বর্ণনা লিখেছেন!

বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আরও মনে হল, এই সুন্দর দেশটিতে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে কিছু মানুষ। রুমানিয়া কখনও খুব গরিব দেশ ছিল না, এখন সারা ইউরোপের করুণার পাত্র।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেট করে ট্রেন ঢুকল বুখারেস্ট শহরে।

॥ ৯ ॥

প্যারিস শহরের বিখ্যাত রেল স্টেশন গার দু নর-এর অনুকরণে বুখারেস্ট-এর প্রধান রেল স্টেশনের নাম গারা দে নরড হলেও, আমি এর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনেরই মিল পেলাম বেশি। ইউরোপের আর কোনও স্টেশনে আমি এত মাল বইবার কুলি দেখিনি। হাওড়া স্টেশনে যেমন লাল জামা পরা লাইসেন্সড কুলি ছাড়াও আরও কিছু ছুটকো-ছাটকা লোক মাল বইবার কাজ করে এখানেও আমরা কামরা থেকে নামার পর সরকারি কুলিরা এগিয়ে আসবার আগেই এক খোঁচা-খোঁচা দাড়ি

ভরতি মুখ, প্রায় বৃদ্ধ, আমাদের দুটো সুটকেস তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল।

ট্রেনে ভাস্কর দুটি গ্রিক মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল, মেয়ে দুটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজি জানে। আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেও ভাস্কর বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। কারণ ইংরিজি বলা মানুষ খুঁজে বার করা খুব দুষ্কর। মেয়ে দুটি ডাক্তারির ছাত্রী, সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে বুখারেস্ট পড়তে এসেছে। এই মেয়ে দুটি আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিল যে বুখারেস্ট রেল স্টেশনে চোর-জোচ্চোরের খুব উপদ্রব, পকেটের টাকাকড়ি সব সময় সামলে রাখতে হবে, নজরে না রাখলেই সুটকেস-ব্যাগ উধাও হয়ে যেতে পারে। হোটেল বাছতে হবে খুব দেখে শুনে, কারণ অধিকাংশ হোটেলেই ঠকায়। রাস্তার কোনও লোক যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতে আসে, তা হলে ধরে নিতে হবে, তার কোনও বদ মতলব আছে। এসব কথা আমাদের খুব অচেনা লাগে না।

সেই মালবাহক প্রৌঢ়ের পিছু পিছু ছুটলাম আমরা। কত ভাড়া দিতে হবে, তা আমাদের আন্দাজ নেই, খুচরো দু-চার ডলার দিতেই সে খুব কৃতজ্ঞ ভঙ্গি করল। পরে জেনেছি, এখানকার মধ্যবিত্তদের মাসিক উপার্জন একশো ডলারের মতন।

গ্রিক মেয়ে দুটি আমাদের বিশ্বাসযোগ্য হোটেল খুঁজে দিতে সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছি একটা টুরিস্ট অফিস দেখে অসীম বলল, আগে ওদের কাছ থেকেই সন্ধান নেওয়া উচিত। আমি আর বাদল রইলাম মাল পাহারা দিতে, বাকিরা চলে গেল সেদিকে। তারপর বেশ কিছু সময় চলে গেল। স্টেশনে বেশ কিছু লোক এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনে হয় যেন অলস, বেকার। কেউ-কেউ আমাদের কাছাকাছি এসে বসছে। আবার উঠে যাচ্ছে, কেউ একটু দূর থেকে তেরচাভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। আমি ভাবছি, এর মধ্যে কেউ কি আমাদের কোনও ব্যাগ তুলে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটছে? কেউ খুব কাছ ঘেঁষে এলে আমি বেশি সতর্ক হয়ে উঠছি। এক সময় আমার মনে হল, এরকমভাবে সব লোককে সন্দেহ করা অতি বিশ্রী ব্যাপার। দু-চারটি ছ্যাঁচড়া-ছিনতাইবাজ থাকতে পারে, বাকিরা অবশ্যই সাধারণ, ভদ্র মানুষ। কিন্তু রুমানিয়া সম্পর্কে আগে থেকে এত সাবধান বাণী শুনেছি যে সকলকেই যেন অবিশ্বাস করতে হয়, আবার মনের মধ্যে মানুষ সম্পর্কে এরকম অবিশ্বাস পুষে রাখতেও খারাপ লাগে। আমি অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলাম। জানি যে, বাদলের অতি সতর্ক নজর এড়িয়ে আমাদের কোনও জিনিসে কারুর হাত ছোঁওয়াবার সাধ্য নেই।

খানিক বাদে অসীম সদলবলে ফিরে এল, সঙ্গে একজন গোলগাল, মাঝ বয়সি মহিলা যুক্ত হয়েছে। বার্তা এই যে, পর্যটক দফতর থেকে জানা গেছে, শহরের কোনও হোটেল খালি নেই, কারণ এখানে ট্রেড ফেয়ার আছে। একমাত্র উপায়, কারুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকা। ওই দফতর থেকেই একজন মহিলাকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, তার বাড়িতে চার জনের স্থান হবে।

মহিলার নাম মাদাম দিদা। তাঁর ইংরিজি জ্ঞান দশ-বারোটি শব্দে সীমাবদ্ধ। তাতেই কাজ চলে যাবে। ট্যাক্সিতে অনেক রাস্তা ঘুরে আমরা তার বাড়িতে পৌঁছোলাম। এই এলাকার চতুর্দিকেই ফ্ল্যাট বাড়ি। এরকম এলাকা আজকাল পৃথিবীর সব শহরেই দেখা যায়। একই ধাঁচের সব বাড়ি, ভেতরে খুপরি এলাকা আজকাল পৃথিবীর সব শহরেই দেখা যায়। একই ধাঁচের সব বাড়ি, ভেতরে খুপরি খুপরি ফ্ল্যাট। দু-খানা ছোট ছোট শয়নকক্ষ, একটি বসবার ঘর, রান্না ঘর ও বাথরুম। এই ফ্ল্যাটটার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করে না। রং করা টিনের বাথ-টবের মধ্যে একটা বালতি। ইউরোপের আর কোনও দেশে আমি বালতি নামক বস্তুটি আগে দেখিনি। সভ্য দেশে চব্বিশ ঘণ্টাই কলে জল থাকে, সুতরাং বালতির প্রয়োজন কী? এই বালতিতে জল নিয়ে কমোড পরিষ্কার করতে হবে। সব সভ্য দেশেই দুটি কল থাকে, একটি দিয়ে অবিরাম গরম জল পাওয়ার কথা। এখানে অনেক সময় কোনও কলেই জল থাকে না। একটা সরু টয়লেট

পেপারের রোল রয়েছে। সেটাও মনে হয় নেহাৎ সাজাবার জন্য, তাও মোটা হলদে ও শিরিষ কাগজের মতন খসখসে। অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশেই টয়লেট পেপার অতি নিম্ন মানের। রুমানিয়াতে এই বস্তুও খুব দুর্লভ। এই সব দেশের লোক ইংল্যান্ড-ফ্রান্সে বেড়াতে গেলে নিশ্চয়ই ভাববে, কেন তাদের দেশ এই অতি প্রাথমিক প্রয়োজনীয় জিনিসটিও বানাতে পারে না? ভাস্কর নিজের পশ্চাদ্দেশের প্রতি মায়াবশত বিলেত থেকে ভালো জাতের টয়লেট পেপার সঙ্গে এনেছে। মোট কথা, আমাদের যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাড়ির তুলনাতেও এ বাড়ির বাথরুম বেশ খারাপ।

মাদাম দিদা বিধবা, তাঁর স্বামী কেমিস্ট ছিলেন, বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। সতেরো-আঠারো বছরের একটি মাত্র ছেলে তাঁর সঙ্গেই থাকে। ফ্ল্যাটটাতে ঢুকেই মনে হয়েছিল, এখানে আমাদের চারজনের জায়গা হবে কী করে? ছেলের ঘরে একটি সিঙ্গল খাট, অন্য ঘরের খাটটি নব-বিবাহিতের পক্ষে আদর্শ হলেও দুজন পুরুষের পক্ষে অনুপযুক্ত। বসবার ঘরের সোফাটি টেনে নিলে একজনের বিছানা হতে পারে। তা হলে চতুর্থজন শোবে কোথায়? মাদাম দিদা জানালেন যে বাকি একজনের জন্য মেঝেতে বিছানা পেতে দেওয়া হবে। বসবার ঘরের মেঝেতে রয়েছে একটা নোংরা, ক্ষয়ে যাওয়া কার্পেট।

ব্যবস্থা দেখে ভাস্কর খেপে উঠল। আমাদের মাথাপিছু দৈনিক কুড়ি ডলার দিতে হবে। সমস্ত কাগজপত্রে লেখা আছে যে কুড়ি ডলারে এখানকার প্রথম শ্রেণির হোটেলে ঘর পাওয়ার কথা। এত টাকা খরচ করেও আমরা এত কষ্ট সহ্য করতে যাব কেন?

এতটুকু ছোট ফ্ল্যাটে চারজন আত্মীয় এসে পড়লেও স্থান সংকুলান হওয়ার কথা নয়। তবু চারজন পেয়িংগেস্টকে নিয়ে আসা হল। কেন? বাড়িতে বিদেশি অতিথি রাখার জন্য নিশ্চয়ই লাইসেন্স লাগে, সরকারের পক্ষ থেকে এসব বাড়ি পরিদর্শন করার ব্যবস্থা নেই! এর আগে অন্যান্য দেশেও আমরা পেয়িংগেস্ট হয়ে থেকেছি, সে সব জায়গায় অতিথিদের কী কী সুবিধে দেওয়া হবে, তার একটা নির্দিষ্ট তালিকা থাকে। বুডাপেস্টেও আমরা এর চেয়ে অন্তত দশগুণ আরামে ছিলাম।

আমাদের উষ্মা দেখে মাদাম দিদা শেষ পর্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করলেন যে, আসলে তাঁর লাইসেন্স মাত্র দুজন অতিথি রাখার জন্য। কিন্তু আমাদের চারজনকে দেখে লোভে পড়ে তিনি নিয়ে এসেছেন। আমাদের স্থান দেওয়ার জন্য তাঁকে শুতে হবে রান্নাঘরে, ছেলেকে পাঠাতে হবে অন্য বাড়িতে।

শুধু তাই নয়, পরে আমরা শহর ঘুরে জেনেছিলাম, অনেক হোটেলের ঘর খালি আছে, টুরিস্ট দফতরের কর্মীটি আমাদের মিথ্যে কথা বলেছিল। নিশ্চিত তার সঙ্গে মাদাম দিদার কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

আমরা সহজেই বাসস্থান পালটে ফেলতে পারতাম, কিন্তু আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম, এই ক্ষুদ্র রুমানিয়ান পরিবারটি নিছক দারিদ্র্যের জন্যই এমন লোভী হয়েছে এবং নিজেরাও অনেক অসুবিধে ভোগ করছে, আমাদেরও খানিকটা মেনে নিয়ে এদের সাহায্য করাই উচিত।

বাদল বলল, চার-পাঁচদিন থাকব, কী আর এমন কষ্ট হবে। হোটেলে থাকার চেয়ে কারুর বাড়িতে থাকা অনেক ভালো। অসীমেরও সে রকমই মত। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভাস্করকে ঠান্ডা করা হল।

চারজনের মধ্যে মেঝেতে কে শোবে, সেটা ঠিক করা মুশকিল, কারণ প্রত্যেকেই রাজি, তাই লটারি করা হল এবং বলাই বাহুল্য এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম আমিই!

মেঝেতে শুতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না, তবে বারান্দার দিকের দরজার তলা দিয়ে একটা শিরশিরে বাতাস এসে বড় জ্বালাতন করল সারারাত। শীতের রাতেও ঘর গরম করা যাবে না, একটা রুম হিটার থাকলেও সেটার ব্যবহার নিষিদ্ধ। এখনও অবশ্য শূন্যের দিকে পারদ নামেনি, কিন্তু ডিসেম্বর -জানুয়ারিতে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে। তখনও বুখারেস্টের মানুষ বিদ্যুতের অভাবে ঘর গরম করতে পারেনি, ইউরোপের অন্য কোনও দেশে এ অবস্থা অকল্পনীয়।

'লোডশেডিং' এই বাক্যবন্ধ নিতান্তই পশ্চিমবঙ্গীয় ইংরিজি, কিন্তু এই ব্যাপারটিতে বুখারেস্ট শহর অনায়াসেই কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এখানকার অনেক রাস্তায় আলো থাকে না। এমনকি পরে আমরা এয়ারপোর্টেও অন্ধকার দেখেছি। তবে লাইন দেওয়ার প্রতিযোগিতায় সাম্প্রতিক বুখারেস্ট কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। আমরা পাউরুটি, চিনি, কেরোসিন, ডিজেলের লম্বা লাইন দেখেছি কলকাতায়, এখানে সর্বত্র লাইন, কোনটা যে কীসের জন্য, তা বোঝা দুষ্কর। লাইনে যারা দাঁড়ায়, তারাও অনেক সময় জানে না। পথ চলতি মানুষ কোনও একটা দোকানের সামনে লাইন দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছু একটা তো পাওয়া যাবে। বর্তমানে এখানে অপ্রাপ্য দ্রব্যের তালিকা বিশাল। দুধ-মাছ-মাংস থেকে টয়লেট পেপার পর্যন্ত! দুধ নেই, সুতরাং আইসক্রিমও নেই। হাঙ্গেরিতে সব দোকানে আইসক্রিম দেখেছি, পাশের দেশ রুমানিয়ায় আইসক্রিম অদৃশ্য। আমরা স্কুলে পড়বার পর স্কুল-গেটের সামনে এক রকম জিনিস পাওয়া যেত, গুঁড়ো করা বরফের মধ্যে লাল বা নীল রঙের একটু সিরাপ মেশানো, সেটাই চেটে চেটে খেতাম। অনেকদিন পর সেই জিনিস দেখলাম রুমানিয়ায়, ক্রিমবিহীন আইসক্রিম, বয়স্ক লোকেরাও তাই-ই খাচ্ছে।

একদিন এখানকার মেট্রো রেলে রাত্তিরবেলা চলন্ত কামরার মধ্যে মুরগির ডাক শুনে চমকে উঠেছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল, কোনও চ্যাংড়া ছেলে বুঝি ইয়ারকি করছে। দু-তিনবার শোনার পর লক্ষ করে দেখি, সত্যিই একজন লোক তার কোটের আড়ালে ঢেকে একটা জ্যান্ত মুরগি নিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের ট্রেনে জ্যান্ত মুরগি? অন্য কারুর মুখে এ ঘটনা শুনলে আমি বিশ্বাস করতাম না। এখানে মুরগি এখন এতই দুর্লভ যে একজন কেউ কোনওক্রমে একটা যোগাড় করে এই অবস্থাতেই বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য যাত্রীরা তার দিকে তাকাচ্ছে ঈর্ষার চোখে। সকালবেলা মেট্রোয় যেতে-যেতে দেখেছি, অনেক অফিসযাত্রীর ফিটফাট পোশাক, গলায় টাই রয়েছে বটে, কিন্তু গালে দু-তিন দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সাহেব জাতি দাড়ি রাখে, অথবা প্রতিদিন দাড়ি কামায়, এত লোক খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে অফিস যায়, এমন আগে দেখিনি। স্থানীয় একজনকে কারণটা জিগ্যেস করায় সে বলেছিল, ব্লেড পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের মুখের কাছে গিয়ে কথা বলো না, কারণ টুথপেস্টও পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেকে দাঁতও মাজে না।

রুমানিয়ানরা শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-দর্শন-জ্ঞান চর্চায় যথেষ্ট উন্নত। সেই জাতির এরকম শোচনীয় অবস্থা কেন? শুধু আজ নয়, পাঁচ-সাত বছর ধরেই নানা অনটন চলছে। এর জন্য দায়ী শুধু চাউসেস্কু আর তার দলবল? এই দুষ্টচক্রকে নিবৃত্ত করার কোনও উপায় এখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিল না?

রুমানিয়ার চাষিরা এক সময় যথেষ্ট সম্পন্ন ছিল। ১৯৬৫ সালের সংবিধানে সমস্ত চাষের জমিকে সামাজিক সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে চাষিদের বাধ্য করা হয় রাষ্ট্রীয় খামার কিংবা সমবায়ে যোগ দিতে। চাষিদের মনস্তত্ত্বের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হল না, সমাজতান্ত্রিক চেতনা গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হল না, একটা ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল ওপর থেকে। সব কিছু চলতে লাগল এক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায়, যা আসলে সমাজতন্ত্র-বিরোধী।

রুমানিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল চাউসেস্কু আর একটা উদ্ভট কাণ্ড করেছিলেন। গ্রামের চাষিদের বাড়িঘর ভেঙে-গুঁড়িয়ে সেখানে তৈরি করিয়েছিলেন লম্বা লম্বা ফ্ল্যাটবাড়ি। যে-সব চাষিরা নিজস্ব বাড়িতে ফুলগাছ-টমেটো গাছ, গোরু-ছাগল-মুরগি নিয়ে থাকত, তারা সেইসব নিয়ে উঠে যাবে দশতলার ফ্ল্যাটে? যত ছোটই হোক, তবু একটি পরিবারের নিজস্ব বাসস্থান নির্বাচন ও ইচ্ছেমতন সাজাবার স্বাধীনতাটুকুও যদি না থাকে, তবে তা কীসের সাম্যবাদ।

দ্রুত বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করে দেশটাকে শিল্পোন্নত করার ঝোঁকে কৃষি মার খেয়েছে। দানিয়ুব নদী থেকে বিশাল খাল কাটা কিংবা বুখারেস্টে মেট্রো রেল বানাবার জন্য এত অর্থের বিনিয়োগ হয়েছে যা দেশের অর্থনীতির পক্ষে অনুপযুক্ত। তবু এ দেশের জাতীয় উৎপাদনের একত্রিশ

ভাগই কৃষিদ্রব্য, সুতরাং দেশের মানুষের খাদ্যাভাব থাকার কথা ছিল না। কিন্তু রুমানিয়ার সরকার বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য খাদ্যদ্রব্য, পেট্রল, খনিজ অন্যান্য দেশে চালান দিয়ে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করেছে বছরের পর বছর। কাগজেকলমে দেখানো হত যে এই সব রপ্তানি করে রুমানিয়ার বৈদেশিক ঋণ অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন অবশ্য প্রকাশ পাচ্ছে যে, ওইসব বিদেশি মুদ্রা দিয়ে চাউসেস্কু আর তার পত্নী অঢেল ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়েছে, বাথরুমে পর্যন্ত নিয়েছে সোনার কল।

হাঙ্গেরিতে থাকার সময় আমরা লক্ষ করেছি, রুমানিয়ার সাধারণ মানুষদের এ রকম দুরবস্থা নিয়ে কারুর কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং রুমানিয়ানদের সম্পর্কে হাঙ্গেরিতে অবজ্ঞা বা বিদ্বেষের ভাব বেশ প্রবল। ট্রানসিলভানিয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটা ক্ষত আছে বটে, কিন্তু এই দুই সমাজতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষও পরস্পরের প্রতি কোনও সমভ্রাতৃত্ব বোধ করে না? শ্রেণিহীন সমাজের আদর্শ যারা গড়তে চায়, সেখানেও জাতিভেদ!

হাঙ্গেরিতে একজনও বাঙালি বা ভারতীয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। একদিকে বাঙালিদের ঘরকুনো বলে বদনাম আছে, আবার পৃথিবীর বহু দুর্গম অঞ্চলেও বাঙালির সন্ধান পাওয়া যায়। আফ্রিকার নাইরোবি শহরের টিমে আমি একজন বাঙালির নাম দেখেছিলাম। আমার দেখা জায়গাগুলোর মধ্যে শুধু বুলগেরিয়া আর সাংহাই শহরে কোনও বাঙালির খোঁজ পাইনি। অতিশয় জনবহুল সাংহাই শহরে কোনও ভারতীয়ের সন্ধান পাওয়াও দুষ্কর। হাঙ্গেরিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-চারজন ভারতীয় আছে বটে, কিন্তু কেউ তাদের ঠিকানা বলতে পারেনি, ভারতীয় দূতাবাসে ফোন করেও কিছু সুবিধে হয়নি।

রুমানিয়ায় এসে আমরা আমাদের দূতাবাসে ফোন করে কোনও ভারতীয়ের সন্ধান চাইলাম। ওঁরা যে মহিলার নাম ও ঠিকানা দিলেন, তিনি একজন বাঙালি। গোটা রুমানিয়ায় দূতাবাসের বাইরে ভারতীয় বলতেও ওই একজনই। শ্রীমতী অমিতা বসুর নামের সঙ্গে আমরা আগেই পরিচিত, তিনি একজন লেখিকা, 'দেশ'-'আনন্দবাজারে' তাঁর বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের ফোন পেয়েই অমিতা বসু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আপনারা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন, আমি আপনাদের কাছে চলে আসছি।

অমিতা বসু অনেক বছর আগে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন এ দেশে। স্বামী এসেছিলেন চাকরির সূত্রে, অমিতা অবসর সময়ে রুমানিয়ার ভাষা শিখে নিয়েছিলেন, তারপর ওই ভাষা থেকে কিছু কিছু অনুবাদ করেন বাংলায়। বছর দু-আড়াই বাদে এই দম্পতি ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। কিছুদিন বাদে অমিতা আবার একা রুমানিয়াতে যান একটা অনুবাদক-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে। তারপর থেকে তিনি এই দেশের সঙ্গে যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন। বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে অমিতা এখানে একা-একা রয়ে গেছেন দীর্ঘকাল। চাউসেস্কুর আমলের যাবতীয় কাণ্ডকারখানা ও গণঅভ্যুত্থান তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, চরম দুঃসময়ে আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন।

গত শতাব্দীর রুমানিয়ার প্রখ্যাত কবি, বলা যায় রুমানিয়ার জাতীয় কবি মিহাইল এমিনেস্কু-কে নিয়ে গবেষণা করেছেন অমিতা। মিহাইল এমিনেস্কুর খ্যাতি এখন আন্তর্জাতিক, যদিও আমাদের বাংলাতে তেমন পরিচিত নন। এই কবি বেঁচেছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর, লিখেছেনও খুব কম, তাতেই তিনি চিরস্মরণীয়। রুমানিয়ান ভাষা ল্যাটিন ভাষার অন্তর্গত, কিছু কিছু স্লাভিক শব্দ এর মধ্যে ঢুকে গেলেও এই ভাষার আত্মীয়তা অনেকটাই ফরাসি-ইতালিয়ানের সঙ্গে। এখানকার কবি-সাহিত্যিকরা এককালে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, কেউ কেউ পশ্চিমি সাহিত্যকেও মাতিয়েছেন। ফ্রান্সে সিম্বলিজম্-এর পূর্ববর্তী যে ডাডাইজম, তার অন্যতম প্রবক্তা ত্রিস্তান জারার জন্ম রুমানিয়ায়। একালের বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কোও রুমানিয়ান। আমাদের

জানাশোনা সাহিত্য পরিধির মধ্যে আরও দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। রোমান আমলে সম্রাট অকটেভিয়ান অগাস্টাস মহান ল্যাটিন কবি ওভিদ-এর ওপর রাগ করে তাঁকে রুমানিয়ার কৃষ্ণ উপসাগরের তীরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আর পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানকারই এক পরগণার রাজকুমার শত্রুদের ছিন্নমুণ্ড বর্শার ডগায় গেঁথে, কোনও রাসায়নিক দ্রব্য মাখিয়ে জীবন্তর মতন করে রাখতেন। তাঁকে নিয়েই কাউন্ট ড্রাকুলার গল্প প্রচলিত হয়, আয়ার্ল্যান্ডের ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটি নিয়ে ভ্যাম্পায়ারের গল্প লিখে বিখ্যাত হন।

মিহাইল এমিনেস্কু অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্য থেকে। আবার রুমানিয়ার প্রাচীন গাথা ও উপকথা, দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকসাহিত্যের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। এই দুই ধারা মিশিয়ে তিনি রুমানিয়ান সাহিত্যে এক নতুন রূপ এনে দেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রতিভাবান কবি বেশিদিন বাঁচলেন না, ব্যর্থ প্রেম, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারা, নৈরাশ্যবোধ থেকে শেষপর্যন্ত এক পাগলাগারদে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরেও ফরাসি সাহিত্য ও রুমানিয়ার লোকসাহিত্যের একটা মিশ্র রূপ এখানে চলে আসছিল, পরবর্তীকালে অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়।

অমিতা বসু এখানে একজন এমিনেস্কু বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। আবার রবীন্দ্রনাথকে এ-দেশের মানুষের কাছে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করার জন্য তিনি রবীন্দ্র রচনাবলি অনুবাদেও হাত দিয়েছেন। রুমানিয়ান ও বাংলা, এই দু-ভাষাতে লেখাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত। এখানকার বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি বাংলা-রুমানিয়ান অভিধান একটা তৈরি করেছেন, সেটা খুবই মূল্যবান কাজ।

এক সময় আমি জিগ্যেস করলাম, আপনার বাংলা বিভাগ কেমন চলছে? ক'জন ছাত্রছাত্রী?

উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ করে চেয়ে রইলেন।

আমাদের ডাক শুনে চলে আসবার পর অমিতার সঙ্গে অল্পক্ষণেই ভাব জমে গেল। শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি সবদিকেই সজাগ এই মহিলার রসিকতাবোধ খুব প্রবল। আমাদের সঙ্গে নিয়ে বুখারেস্ট শহরটি দেখাবার সময় তিনি গত বছরের ভয়াবহ দিনগুলির কথা বলতে-বলতে নানারকম কৌতুক কাহিনিও শোনাচ্ছিলেন। কিন্তু লক্ষ করছিলাম, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। সে বিষয়ে প্রশ্নও করা যায় না। একবার শুধু বলেছিলেন, আপনারা চরজন বাঙালি এসেছেন, আপনাদের তো একদিন আমার ফ্ল্যাটে রান্না করে খাওয়ানো উচিত। কিন্তু কিছুই যে পাওয়া যায় না এখানে।

বাংলা বিভাগ সম্পর্কে আমার কৌতূহলের উত্তরে, একটু সময় নিয়ে, নির্লিপ্ত গলায় তিনি বললেন, এখন বুখারেস্টে কোনও বাংলা বিভাগ নেই। উঠে গেছে।

বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও হিন্দি পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। গত এক-দেড় বছর ধরে হিন্দির কোনও অধ্যাপক ছিল না, হিন্দি জানা এক রুমানিয়ান মহিলা সেই ক্লাস নিচ্ছিলেন। তা নিয়ে আমাদের দূতাবাসের হিন্দিওয়ালাদের খুব মাথাব্যথা দেখা দিল। হিন্দির কেউ নেই, অথচ বাংলার একজন দেশি অধ্যাপিকা রয়েছে, এ কখনও হতে পারে? হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, হিন্দির দাবি আগে। হিন্দি প্রেমিকারা এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বারবার উত্যক্ত করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা-হিন্দি দুটো বিভাগই তুলে দিয়েছেন।

অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন অমিতার কোনও জীবিকা নেই।

এরপর যে প্রশ্নটা আমাদের সকলেরই মনে এসেছিল সেটা অসীম জিগ্যেস করল, চাকরি নেই, তা হলে আপনি এখানে চালাবেন কী করে?

অমিতা বললেন, যেমন করে হোক আমি চালাব। দেশে ফিরব না। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে ভালোবাসে। চরম বিপদ আর দুঃখের দিনগুলিতে আমি ওদের সঙ্গে থেকেছি। এখন ওদের ছেড়ে চলে যেতে পারব না। শেষপর্যন্ত কী হয়, আমি দেখতে চাই।

আস্তে-আস্তে কথা বললেও তাঁর কণ্ঠস্বরে একটা তীব্র জেদ ফুটে ওঠে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এমন সাহসিনী খুব কমই দেখা যায়।

॥ ১০ ॥

বুখারেস্টে রাস্তায় বেরুলেই একটা ধ্বনি শোনা যায়। সেটা অনেকটা গানের গানের ধুয়োর মতন। ডলার, ডলার, চেইঞ্জ মানি? চেইঞ্জ মানি? যে এক বর্ণও ইংরিজি জানে না, সেও এই গানের লাইনটা জানে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রথম প্রথম এই ডলার-লোভ দেখে বিস্মিত হয়েছি, পরে মন খারাপ লেগেছে। যেবারে বুলগেরিয়া গিয়েছিলাম, সেবারে হোটেলে পৌঁছেই লিফট দিয়ে উঠছি, দুজন পোর্টার দু-দিক থেকে বলতে শুরু করেছিল, ডলার, ডলার? চেইঞ্জ মানি? চেকোস্লোভাকিয়ায় কোনও দোকানে দিনার দিয়ে কিছু কিনতে গেলেই কাউন্টারের লোকটি ফিসফিসিয়ে বলেছে, ডলার, থ্রি টাইমস। ফোর টাইমস। হাঙ্গেরিতে, প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিতে এরকম বহুবার শুনেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোথাও আমার এ অভিজ্ঞতা হয়নি। সেখানে আমার সঙ্গে সব সময় একজন সরকারি প্রতিনিধি থাকত। চিনে আমাদের সঙ্গে প্রতিনিধি থাকত দুজন। কিন্তু কখনও একলা হোটেল ছেড়ে বেড়াতে বেরুলেই অমনি কয়েকজন লোক ঘিরে ধরে সেই ধুয়ো তুলেছে, ডলার, ডলার, চেইঞ্জ মানি? এইসব দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চরম শত্রু মনে করে, আমেরিকায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে প্রতিনিয়ত প্রচার চলে, তবু ডলারের প্রতি এই কাঙালপনা কেন? জার্মান মার্ক ও জাপানি ইয়েন খুব দৃঢ় কারেন্সি, ব্রিটিশ পাউন্ড তার ক্রম হ্রাসমান সম্মান অনেকটা পুনরুদ্ধার করেছে, তবু সবাই ডলার চায়। পাউন্ড ও মার্কেরও চাহিদা আছে হাঙ্গেরি-রুমানিয়ায়, কিন্তু প্রথমে সকলেই ডলারের গানটি গায়। এইসব দেশগুলিতে পুলিশ ও গুপ্তবাহিনী যথেষ্ট সক্রিয়, তবু তারা প্রকাশ্য রাস্তায় এরকম চোরাকারবারিকে ধরতে পারে না? এটা অবিশ্বাস্য। কাগজে-কলমে সরকারি ব্যাংক ছাড়া বিদেশি মুদ্রা ভাঙানো নিষিদ্ধ, অথচ হাজার-হাজার লোক দিনের বেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টুরিস্টদের কাছ থেকে অনেক গুণ বেশি দামে ডলার কিনছে, অথচ তাদের পুলিশে ধরে না। নিশ্চয়ই সরকারিভাবে এই চোরা কারবারের প্রতি প্রশ্রয় আছে। এটা যে অর্থনীতির কোন কূটকৌশল তা আমার বোধগম্য হয় না। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরাও এর কোনও ব্যাখ্যা দেননি, অনেকে এই ব্যাপারটার উল্লেখই করেন না, যেন এর কোনও অস্তিত্ব নেই।

আর একটা ব্যাপারও আমার খুবই বিসদৃশ মনে হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বড় বড় শহরে কিছু কিছু দোকান থাকে বিদেশিদের জন্য। এদের চলতি নাম 'ডলার শপ'। সেইসব দোকানে ভালো ভালো জিনিসপত্র সাজানো থাকে। স্কচ হুইস্কি, আমেরিকান সিগারেট থেকে শুরু করে ফরাসি পারফিউম, সুইস ঘড়ি, শৌখিন জামা-কাপড় পর্যন্ত। সেগুলি শুধু ডলার কিংবা হার্ড কারেন্সি দিয়ে কেনা যাবে, অর্থাৎ বিদেশিদের জন্য। দেশের মানুষ দোকানের শো উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে সেইসব জিনিসপত্র লোভীর মতন দেখে! দোকানে জিনিসপত্র সাজানো হয়েছে, অথচ তারা নিজেদের টাকায় কিনতে পারবে না, এ কী অপমানজনক ব্যবস্থা। ওইসব দোকান একেবারে না রাখলে কী ক্ষতি ছিল? বিদেশি পর্যটকরা সমাজতান্ত্রিক দেশে বেড়াতে গিয়ে ফ্রেঞ্চ পারফিউম কিনতে যাবে কেন? দেশের মানুষদের এইসব জিনিস কেনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলে তারা যে-কোনও উপায়ে ডলার সংগ্রহ করতে চাইবে, এতে আর আশ্চর্য কী। আমাদের ভারতে এরকম কোনও দোকান নেই, সেজন্য ধন্যবাদ।

চিনে আর একটা ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। দু'রকম টাকা। সরকারি-ভাবে ডলার

ভাঙালে একরকম চিনা টাকা দেওয়া হবে, যার চেহারা সাধারণ চিনা টাকার থেকে আলাদা। বিদেশিরা ওই টাকা দিয়ে যে-কোনও দোকান থেকে যে-কোনও জিনিস কিনতে পারে। সেই নোটের চেহারা আলাদা হলেও অন্য চিনা নোটের সঙ্গে মূল্যের কোনও তফাত নেই। একই দেশে এই দু'রকম নোট চালু রাখার সুবিধে কী তা জানি না, কিন্তু দেখেছি, কোনও দোকানে গিয়ে আমাদের ওই টাকা দিয়ে কিছু কিনতে গেলে পাশ থেকে অনেকে এসে নিজেদের টাকার সঙ্গে বদলাবদলি করতে চায়। অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এই টাকা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মূল্যমান সমান, সুতরাং হস্তান্তরে বে-আইনি বোধ হয় না। চিনারা ওই টাকা দিয়ে বিদেশিদের জন্য নির্দিষ্ট দোকানে বিদেশি দ্রব্য কিনতে পারে। চিনে এখন আমেরিকান দ্রব্য এবং জামাকাপড় সম্পর্কে দারুণ ঝোঁক। আমেরিকান সিগারেটের বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গেছি। আমাদের দেশে কোথাও এরকম নেই। বড় বড় হোটেলগুলিতে আমেরিকানদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। হোটেলের একটা টিভি চ্যানেলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই আমেরিকান প্রোগ্রাম দেখানো হয়। পোর্টার, লিফটম্যান, রেস্তোরাঁর বয়রা থ্যাংক ইউ-এর উত্তরে আমেরিকান কায়দায় বলে ইউ আর ওয়েলকাম। ষাট-সত্তরের দশকে আমাদের বাংলার যুব সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ পৃথিবীর অন্য দেশগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আদর্শের জন্য চিনের দিকে ব্যাকুল-ভাবে তাকিয়েছিল, তাদের কথা ভেবে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

চিনের সাধারণ মানুষের ভদ্রতা, বিনয় ও শৃঙ্খলাবোধ দেখে অনবরত মুগ্ধ হতে হয়। গ্রামে ঘোরার সুযোগ হয়নি, বড় বড় শহরগুলির অবস্থা আমাদের দেশের থেকে কিছুটা ভালো। গ্রামে দারিদ্র্যের কথা শোনা যায়, নেশা ও নারীদেহ নিয়ে ব্যাবসা একেবারে লুপ্ত হয়নি, বেকার রয়েছে, জীবিকার ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যও রয়েছে, সেটাই তো কত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, সেটাও আমাদের সরকার বোঝে না। বোম্বাইয়ের তুলনায় পেইচিং অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন। কলকাতার চেয়ে সাংহাইয়ের জনসংখ্যা অনেক বেশি, তবু সাংহাইয়ের কোনও রাস্তাতেই কলকাতার মতন এমন জঘন্য আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে না। সাংহাইয়ের এক জনবহুল জায়গায় সিগারেটের টুকরো ফেলায় এক বৃদ্ধা সরকারি প্রতিনিধি আমার চার ইউয়ান ফাইন করায় বেশ মজা লেগেছিল। আমাদের দেশে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলার জন্য কেউ যদি ফাইন করত, আমি খুশি হতাম।

কিন্তু চিনে আমেরিকান উপস্থিতি দেখে বিমূঢ় বোধ করেছিলাম। সরকারি ভাবেও আমেরিকা-তোষণের ঢালাও ব্যবস্থা। চিনাদের যে-জাতীয় পোশাক দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তা একেবারে অদৃশ্য। রাস্তার সমস্ত নারী পুরুষ পশ্চিমি পোশাক পরে আছে। আমার সহযাত্রী হিন্দি লেখক কমলেশ্বর একটা চিনা কোট কিনতে চেয়েছিলেন, অনেক খোঁজ করেও পেলেন না। ভারতে কিন্তু আমেরিকা এভাবে এখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

ডলার-হ্যাংলামি অন্য অনেক দেশে দেখলেও বুখারেস্টের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না। অন্যান্য দেশে হোটেলের সামনে, বাজারে, বাসস্টপে, রেল স্টেশনে এইসব কালোবাজারিরা ঘোরাফেরা করে। বুখারেস্টে এরা সর্বত্র। রাস্তায় যেতে-যেতে কোনও মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই যদি সে চিনতে পারে যে আমরা বিদেশি, অমনি কাছে এসে বলে ডলার, ডলার, চেইঞ্জ মানি? এই একঘেয়ে গানের ধুয়ো শুনতে শুনতে আমাদের তিতিবিরক্ত হওয়ার মতন অবস্থা। রুমানিয়ার টাকার নাম লেই, সরকারি বিনিময় হারের চেয়ে আটগুণ-দশগুণ এক একজন দিতে চায়। টুরিস্টদের ঠকাবারও নানারকম প্রক্রিয়া আছে। ডলারের বিনিময়ে বড় একটা টাকার বাণ্ডিল হাতে গুঁজে দিয়ে একজন দ্রুত চলে যায়, খুলে দেখা যায়, ওপরে কয়েকখানা মাত্র নোট, ভেতরে বাজে কাগজ।

বেশি টাকা পেয়েও তো লাভ নেই, লেই দিয়ে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। রেস্তোরাঁয় গয়ো পঞ্চাশ রকম খাবারের তালিকার মধ্যে শুধু একরকম যদি পাওয়া যায়, তাহলেই সেটা ভাগ্য

বলতে হবে। যদি কোনও দোকানে বিয়ার পাওয়া যাচ্ছে এমন শোনা যায়, তা হলেই সেখানে বিরাট ভিড় জমে। অন্যান্য দোকান থেকেও কিছুই কেনার নেই। আমাদের দেশে আজকাল সমস্ত দোকানদারই জিনিসপত্র কিনলে পাতলা পলিথিনের ব্যাগ দেয়, এমনকি বাজারের মাছওয়ালারাও দেয়। বুখারেস্টে আমাদের হাতের জিনিসপত্র বইবার জন্য সেরকম একটা ব্যাগ খোঁজ করেছিলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বহু দোকান ঘোরার পর শেষ পর্যন্ত একটা দোকান থেকে ওইরকম একটা অতি সাধারণ ব্যাগ পয়সা দিয়ে কিনতে হল।

অমিতা বসুর সঙ্গে বুখারেস্ট শহর ঘুরতে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। চাউসেস্কুর আমল থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামকে এখানে সবাই বলে দ্বিতীয় বিপ্লব। তার কেন্দ্র ছিল এই এলাকা। বারবার এখানে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে। নিহতদের স্মরণে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে শহিদ বেদি, সেখানে জ্বলছে অনেক মোমবাতি। রাস্তায় যেতে-যেতে অনেকেই হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা করে মোমবাতি কিনে জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কোনও মহিলার বিষণ্ণ থমথমে মুখ দেখে মনে হয়, হয়তো তাঁরই স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যা প্রাণ দিয়েছে সেই সময়ে।

অমিতা সেই পুরো সময়টার প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর কাছে আমরা বিস্তৃতভাবে শুনলাম সব ঘটনা। এসব অমিতা লিখেছেনও। পার্টি অফিসের বারান্দা থেকে চাউসেস্কুর শেষ বক্তৃতা দিতে-দিতে মাঝপথে থামিয়ে, সেই বাড়িরই ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে সস্ত্রীক পালাবার চেষ্টা, ধরা পড়া, দ্রুত বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের কথা এখন অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। এখানে ঘুরতে-ঘুরতে আমার চিনের কথা মনে পড়ছিল বারবার, কারণ, রুমানিয়ায় গণঅভ্যুত্থান যখন ঘটে, তখন আমি চিনে ছিলাম। সে প্রায় বছরখানেক আগেকার কথা। চিনের কোনও সংবাদপত্রে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ থাকত না। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যে কী সব পরিবর্তন ঘটছে তার চিন সরকার তাদের দেশবাসীকে জানাতে চান না। কিন্তু আমরা হোটেলে টিভি-র একটা চ্যানেলে আমেরিকানদের দ্বারা পরিবেশিত সমস্ত ছবিই দেখেছি! মজার ব্যাপার, হোটেলে থাকলে সব কিছু দেখা ও জানা যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সে অধিকার নেই। অবশ্য বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর ব্যাপারটাও টের পেয়েছিলাম তখন। সকালবেলা আমাদের গাড়ির ড্রাইভার, ইন্টারপ্রেটাররা নিজেদের মধ্যে যখন কথা বলত, তখন চিনে ভাষা একবর্ণ বুঝতে না পারলেও একটা নাম শুনতাম বারে-বারে, রুমানিয়া। রুমানিয়া। অর্থাৎ তারা ঠিক জেনেছে।

বুখারেস্টের সর্বত্র লাইন। কে যে কীসের জন্য লাইন দিয়েছে তা বোঝবার উপায় নেই। লাইনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, সবাই যে গম্ভীর ও বিরক্ত তাও নয়। কেউ কেউ হাসাহাসি করছে। চরম দুঃসাহসের মধ্যেও রসিকতাবোধ নষ্ট হয় না। বছরের পর বছর দুর্ভোগ চলেছে রুমানিয়ায়, তার মধ্যেও রসিকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং মুখে মুখে ছড়িয়েছে। মানুষের প্রতিবাদ জানাবার আর কোনও উপায় নেই, খবরের কাগজগুলি শুধু মিথ্যে কথা লেখে, বেতারে দূরদর্শনে শুধু সরকারি প্রচার, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ। চতুর্দিকে গুপ্তচর, কোথাও যে সাধারণ মানুষ পাঁচজনে মিলে সুখ-দুঃখের কথা বলবে তারও উপায় নেই, তাদেরই মধ্যে একটা গুপ্তচর কিনা তাই বা কে জানে! এই গুপ্তচর ব্যবস্থা যে এখানে কী সাংঘাতিক ছড়িয়েছিল, তার একটা অবিশ্বাস্য উদাহরণ শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। ইস্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের বলা হত, তাদের বাবা-মায়েরা বাড়িতে কী আলোচনা করে তা স্কুলে এসে জানাতে হবে। তার মধ্যে কোনও সরকার-বিরোধী কথা থাকলেই অমনি গ্রেফতার। অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশুদেরও গুপ্তচর বানানো হত। তাদেরই বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এ কী হৃদয়হীন বন্ধনেরও ব্যবস্থা করে ছিল।

এই রকম সময়ে রসিকতাগুলোই প্রতিবাদ। রসিকতার স্রষ্টার কোনও নাম থাকে না, মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। অনেক বক্তৃতার চেয়েও একটি রসিকতার আঘাত বেশি মোক্ষম!

অমিতার কাছ থেকে শোনা একটি রসিকতা এখানে বলা যেতে পারে। এই ডাক্তারের কাছে এক যুবতী মহিলা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। মহিলাটির খুবই শক্ত অসুখ করেছিল, অন্য ডাক্তাররা

জবাব দিয়ে দিয়েছিল, বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। এই ডাক্তারটি প্রায় যমের সঙ্গে লড়াই করে মহিলাটিকে শুধু বাঁচালেন তাই-ই নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুললেন। প্রায় একটি মিরাকল বলা যেতে পারে। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে মহিলাটি ডাক্তারকে বললেন, আপনি আমার জন্য যা করলেন, তা তো শুধু টাকাপয়সা দিয়ে শোধ করা যায় না। আমি আপনাকে অন্য একটা কিছু দিতে চাই। আপনি কি নেবেন বলুন। ডাক্তার এ কথা উড়িয়ে দিলেন, তিনি কিছুই চান না, কিন্তু মহিলাটি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিছু একটা না দিলে তিনি তৃপ্তি পাবেন না। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তারটি বললেন, বেশ, ঠিক আছে, যদি কিছু দিতেই চান, তা হলে আপনার জীবনের একটি রাত্রি শুধু আমাকে দিন!

এ কথা শুনে চুপসে গেলেন মহিলাটি। ডাক্তারটিকে তাঁর খুবই ভদ্র ও সভ্য মনে হয়েছিল, কিন্তু এ যে কুপ্রস্তাব। এমন তিনি আশা করেননি।

কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেলেন মহিলাটি। স্বামীকে বললেন সব কথা। ডাক্তারটিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু একটা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ডাক্তার যা চাইলেন, তা দেওয়া যায় না। এমনই নিরাশ হয়ে পড়েছেন মহিলা যে তাঁর প্রায় ভেঙে পড়বার মতন অবস্থা। স্বামী বললেন যে বউ যদি এত কান্নাকাটি করে, তাহলে সে বোধহয় আবার অসুখে পড়বে! তখন স্বামী বললেন, ডাক্তার যা চেয়েছেন, তা দিতেই বা আপত্তির কী আছে? ডাক্তার প্রায় তোমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। ওঁর সাহায্য ছাড়া তুমি বাঁচতেই না। সুতরাং এই নতুন জীবন থেকে মাত্র একটা রাত ওঁকে দিতেই পারো। আমি কিছু মনে করব না।

স্বামীই জোর করে আবার পাঠালেন স্ত্রীকে। মহিলাটি ডাক্তারের কাছে এসে নতমুখে বললেন, আমি রাজি। আজ রাতে আমি নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করলাম।

ডাক্তার সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, রাজি? চলুন তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক্তার নিজের গাড়িতে মহিলাটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন বেশ রাত, রাস্তাঘাট ফাঁকা। খানিকটা দূর যাওয়ার পর ডাক্তার এক জায়গায় গাড়ি থামালেন। তারপর গাড়ি থেকে একটা ছোট্ট টুল বার করে ফুটপাথে পেতে দিয়ে মহিলাটিকে বললেন, আপনি এই টুলের ওপর সারারাত বসে থাকুন!

মহিলাটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, তার মানে? আমি এখানে সারারাত বসে থাকব?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, ওই যে সামনে দোকানটি দেখছেন, কাল সকালে ওর দরজা খুললেই সামনে বিরাট লাইন পড়ে যাবে! তাই আপনি আমার জন্য এখানে জায়গা রাখুন।

রুমানিয়ার লাইনের প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা যায়। এখানে মাংস, রুটি, চিনি, দুধ, মাখনের জন্য যেমন লোকে লাইন দেয়, তেমনি লোকে লাইন দেয় বইয়ের দোকানেও। বই পড়ার আগ্রহও এখানে প্রচণ্ড। আমাদের সামনেই একটি দোকানে বিদেশি কিছু পত্র-পত্রিকা এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে লম্বা লাইন পড়ে গেল। তরুণ-তরুণী ছাড়া বয়স্করাও রয়েছেন সেই লাইনে। আমি আগেও শুনেছি, বিখ্যাত কবিদের নতুন কবিতার বই বেরুলে এখানে লোকে লাইন দিয়ে কেনে। রুমানিয়ানদের মতন কবিতা-প্রেমিক জাত খুব কমই আছে। আমরা বাঙালিরা কবিতা নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমরা এখনও শতকরা চল্লিশ জনের বেশি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি। শতকরা চল্লিশ জনের মধ্যেও অনেকেই স্কুলের গণ্ডি পেরোয় না। সুতরাং এরা কবিতার পাঠক হবে, এমন আশা করা যায় না। শতকরা কুড়ি-পঁচিশজন মোটামুটি শিক্ষিত, তাদেরও অনেকেরই আর্থিক ক্ষমতা নেই। সেই জন্যই জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশে অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ কবিতা কিংবা সাহিত্যপাঠ করে। আর এই ছোট দেশ রুমানিয়ায় প্রায় সকলেই সাক্ষর। কবিতার বইয়ের এমন বিক্রি ছিল এখানে, তাতে একজন কবি শুধু কবিতা রচনা করেই জীবিকাও নির্বাহ করতে পারতেন। এমন সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি জাতিকে শুধু পেটে মারা হয়েছে তাই-ই নয়, তাদের সুস্থ সংস্কৃতি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে বছরের পর বছর। পত্র-পত্রিকায় শুধু ভরা থাকত চাউসেস্কু

ও তাঁর পত্নীর জয়গান। চাউসেস্কু ও তার চেলাচামুণ্ডারা এমন তাণ্ডব চালালোই বা কী করে এতগুলি বছর? মার্কসবাদের এমন অপব্যবহারের প্রতিবাদ করেননি কেন প্রকৃত মার্কসবাদীরা? আমাদের দেশের কোনও তাত্ত্বিক কি এর আগে কখনও স্বীকার করেছেন যে, রুমানিয়ায় যা চলছে, তা সমাজতন্ত্রও নয়, মার্কসবাদও নয়? তাঁরা কিছুই জানতেন না?

॥ ১১ ॥

ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছিলেন, মার্কসবাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে জাতীয়তাবাদ।

আমরা ভাবতাম, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে জাতীয়তাবাদই একদিন পরাস্ত হবে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংকীর্ণতা আছে, কিন্তু মার্কসবাদ বিশ্বমানবতার পথ দেখিয়েছে। আমরা কি নিছক বাঙালি বা ভারতীয় বা পাকিস্তানি বা ইংরেজ বা চিনে বা রাশিয়ান হওয়ার বদলে শুধু মানুষ হতে চাই না? আমরা শুধু একটা দেশের নাগরিক হওয়ার বদলে কি হতে চাই না সমগ্র পৃথিবীর নাগরিক? পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলির সীমানাই তো কৃত্রিম, মাত্র আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে এই সব সীমানার রেখাগুলি কতবার ভাঙচুর হয়েছে। মাতৃভূমি কিংবা পিতৃভূমি বলে যে ভাবমূর্তি তৈরি করা হয়েছে, সেসব শুধু শাসকশ্রেণির প্রচার ছাড়া আর কী? দেশাত্মবোধক গানগুলিতে সমৃদ্ধ হয় অস্ত্রের কারখানা। দেশপ্রেমের নামে বহুবার লক্ষ লক্ষ মানুষ অকারণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকালে এই পৃথিবীটাকেই ছেড়ে চলে যাওয়ার কি কোনও যুক্তি থাকতে পারে?

বিশ্বমানবতা কিংবা বিশ্বনাগরিকত্ব, এসবই এখনও নিছক কবি-কল্পনা? অনেক সময় কবিরাও উগ্র জাতীয়তাবাদী হয়।

মার্কসবাদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের লড়াইটা ঠিকমতন শুরুই হল না। জাতীয়তাবাদ প্রবল প্রতাপে প্রায় সমস্ত মানুষের মস্তিষ্ক অধিকার করে আছে। মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছিল, সেখানেও জাতীয়তাবাদ নির্মূল করার কোনও চেষ্টা হয়নি। পাশাপাশি দেশগুলির মধ্যে রেষারেষি প্রকট হয়ে উঠেছে মাঝে-মাঝে। চিনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়েছে। অথচ সীমান্ত থাকারই তো কথা নয়! এই দুই অতিকায় সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল। যে এরা দুজনেই এদের আদর্শের প্রবল প্রতিপক্ষ আমেরিকার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াল।

একই সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যেও হয়ে রয়ে গেছে জাতিভেদ। চেকোস্লোভাকিয়ায় গিয়ে টের পেয়েছিলাম, চেক এবং স্লোভাকদের মধ্যে রীতিমতন ঈর্ষার সম্পর্ক, স্লোভাকরা চেকদের তুলনায় নিজেদের বঞ্চিত মনে করে।

ভারত এবং পাকিস্তানের চিরবৈরিতার উপলক্ষ যেমন কাশ্মীর, তেমনি হাঙ্গেরি আর রুমানিয়া, এই দুই পাশাপাশি দেশের মধ্যে রয়ে গেছে এক কাশ্মীর, এখানে তার নাম ট্রানসিলভানিয়া।

কাশ্মীরের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু রাজা ছিল হিন্দু, গোড়ার দিকে জনসাধারণের নেতা শেখ আবদুল্লা ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, তাই কাশ্মীর সংযুক্ত হল ভারতের সঙ্গে। কিন্তু ওই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পাকিস্তান তার দাবি ছাড়বে কেন? আর ট্রানসিলভানিয়া রুমানিয়ার অন্তর্গত হলেও এককালে ছিল হাঙ্গেরির মধ্যে, এখনও সেখানে প্রচুর হাঙ্গেরিয়ান বাস করে। এই উপলক্ষ নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে। হাঙ্গেরিতে 'হিস্ট্রি অব ট্রানসিলভানিয়া' নামে বই প্রকাশিত হলে রুমানিয়া সেটা ইতিহাসের বিকৃতি বলে নিষিদ্ধ করে দেয়। আবার রুমানিয়ার সরকার একবার সে দেশে হাঙ্গেরিয়ার নাম শুনলেই অবজ্ঞায় ঠোঁট কুঁচকোয়। আর রুমানিয়ানরা মনে করে, তাদের অনেক দুর্ভাগ্যের মূলে আছে হাঙ্গেরিয়ানরা। বর্তমান দুঃসময়েও

হাঙ্গেরিয়ানরা আইসক্রিম খায়, রুমানিয়ানরা শুধু বরফ চোষে। বেলজিয়ামে এক আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে আমি একদিন হাঙ্গেরিয়ান কবি জর্জ সোমলিও'র স্ত্রী আনাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। কারণ জিগ্যেস করে জেনেছিলাম যে আমার ঠিক পাশেই এক রুমানিয়ান কবির বসার জায়গা, কিন্তু সে একজন হাঙ্গেরিয়ানদের পাশে বসতে অস্বীকার করে উঠে চলে গিয়েছিল। কবিদের মধ্যেও এমন ভুল জাত্যাভিমান।

রুমানিয়ায় কোনওদিন গণতন্ত্রের ঠিক মতন পরীক্ষাই হয়নি। সামন্ততন্ত্র থেকেই পৌঁছে গিয়েছিল সমাজতন্ত্রে। নানা উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি মোটামুটি একটি দেশ হিসেবে দানা বাঁধে রোমান আমলে। রোমান সাম্রাজ্য ড্যানিউব নদীর দুই প্রান্ত ধরে এগিয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দশম শতাব্দীর থেকে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা শুরু হয়। রোমানিয়ার ট্রানসিলভানিয়া অঞ্চল চলে যায় হাঙ্গেরির দখলে। তারপর তুর্কিদের অটোমান সাম্রাজ্য হাঙ্গেরিকে গ্রাস করার পর ট্রানসিলভানিয়াও নিয়ে নেয়। তারপর হাতবদল হতে হতে, এই শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধে ট্রানসিলভানিয়া আবার রুমানিয়ার অন্তর্গত হয়ে যায়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর রুমানিয়া নিজের পায়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুমানিয়ার ভূমিকা ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রথমদিকে এই দেশ ছিল মিত্র বাহিনীর পক্ষে। নাতসি জার্মানি হাঙ্গেরির ওপর আধিপত্য বিস্তার করার পর রুমানিয়ার দিকে ধেয়ে আসে। ট্রানসিলভানিয়ার অনেকখানি অংশ আবার হাঙ্গেরিতে চলে যায়। এর ফলে যে জনবিক্ষোভ হয়, তাতে রাজা দ্বিতীয় ক্যারল সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, সেই সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে মাইকেল। রাজা মাইকেল সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে আপোস করতে গেলেন হিটলারের সঙ্গে। জনগণ কিন্তু সোভিয়েত বিরোধী ভূমিকা মেনে নিতে চায়নি। জার্মানির শেষ দশায় সোভিয়েত বাহিনী যখন রুমানিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে, তখন জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদে রুমানিয়া আবার হঠাৎ দল বদল করে। রুমানিয়ার সরকার সোভিয়েত পক্ষকে সমর্থন করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীর সহায়তায় জার্মানি-হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হয় রুমানিয়া। দুবার দু পক্ষে লড়াই করে তার নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতি ছিল প্রচণ্ড। এইটুকু দেশের সাড়ে ছ'লাখেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রুমানিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান হল। ত্রাতা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংবর্ধনা জানাল সাধারণ মানুষ, এবং সোভিয়েত ধাঁচের সরকারই যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেটাও স্বাভাবিক। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো মিলে গিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি নাম দিয়ে সরকার গড়ল। ১৯৬৫ সালে এই ওয়ার্কার্স পার্টি আবার নাম নিল কমিউনিস্ট পার্টি, সেই সালেই চাউসেস্কুর ক্ষমতার রঙ্গভূমিতে প্রথম আগমন।

প্রথমদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রুমানিয়া যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি আস্তে-আস্তে চাঙ্গা হয়, বৈদেশিক ঋণ অনেক কমে যায়, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপও সমৃদ্ধ হয়। সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্গত হয়েও রুমানিয়া তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। প্রেসিডেন্ট চাউসেস্কুর ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ সর্ব স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্রমে সেই আত্মসম্মানবোধ, রূপান্তরিত হতে লাগল স্বেচ্ছাচারিতায়, সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রীর হাতে, স্বেচ্ছাচার থেকে এল স্বৈরাচার। হিটলারের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে যে দেশ এক কল্যাণমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক যে ক্রমশ এক ছোটখাটো হিটলারে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেদিকে কেউ নজর দিল না, কিংবা বাধা দিল না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যতই ত্রুটি থাক, অপদার্থ প্রধানমন্ত্রীকে দল সরিয়ে দেওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে ব্যবস্থা থাকতে পারে না? যেহেতু সংবাদপত্রের বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কোনও বিরোধী দলের অস্তিত্ব রাখা হয় না, তাই স্বৈরাচারী শাসক ও তার ঘনিষ্ঠ দলবলের কীর্তিকাহিনী প্রকাশেরও কোনও উপায় থাকে না। স্টালিনের জীবিতকালে

কেউ তার প্রতিবাদ করেনি, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে, এমনকী হাজার হাজার সাচ্চা কমিউনিস্টকেও স্টালিন ফাঁসির মঞ্চে পাঠিয়েছিল, তা তখন জানা যায়নি।

মানুষকে হাত-পা বেঁধে কারাগারে রাখা যায়, কিন্তু তার মনটাকে কিছুতেই বন্দি করা যায় না।

বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার দশ বছর আগেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে একসঙ্গে কাঁপিয়ে দিল। একটির পর একটি দেশ জনসাধারণের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। সৈন্যবাহিনী দিয়েও যে এই প্রতিবাদ দমন করা যাবে না, শাসকশ্রেণি তা বুঝেছিল বলে রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়নি। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মিছিলের মানুষ সৈন্যদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে ফুলের মালা।

একমাত্র রুমানিয়ার বৃদ্ধ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কী নিদারুণ লোভ! সেই লোভের পরিণামে বুখারেস্টের পথে পথে রক্ত-গঙ্গা বয়েছে। চাউসেস্কু ভেবেছিলেন তিনি অমর হবেন, কী সব ওষুধ-বিষুধ খেয়ে নাকি তিনি জরা দমন করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁর ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়া বউ ইচ্ছেমতন ডক্টরেট নিয়েছেন, রুমানিয়ার রাজরাজেশ্বরী হয়েও তৃপ্ত হননি, চেয়েছিলেন অনন্ত পরমায়ু। বুখারেস্ট শহরের একটা বিরাট এলাকার সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস করে চাউসেস্কু বানাচ্ছিলেন এক বিশাল প্রাসাদ। তার সামনের উদ্যানে সবেমাত্র গাছ পোঁতা হয়েছিল, ফুল-ফল দেখা দেয়নি। চাউসেস্কু দম্পতি আশা করেছিলেন, আরও বহু বছর বেঁচে তারা ওই প্রাসাদ ও উদ্যান উপভোগ করে যাবেন।

বিক্ষোভ বা বিদ্রোহের আশঙ্কায় চাউসেস্কু আগে থেকেই এক নিজস্ব গুপ্ত রক্ষী বাহিনী তৈরি করে রেখেছিলেন। শুধু চাউসেস্কু দম্পতিকে আমৃত্যু রক্ষা করার জন্য এরা নাকি ছিল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এদের অবস্থান ছিল মাটির নীচে। যে-কোনও বাড়ির ভূমি ভেদ করে এরা উঠে আসতে পারত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় মিউজিয়ামের ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যেও এরা লুকিয়ে ছিল। যেখান থেকে সেখান থেকে এরা হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেনাবাহিনী জনসাধারণের দিকে চলে গেলেও এই গুপ্ত রক্ষীবাহিনী অকারণে কত যে নরহত্যা করেছে তার ঠিক নেই। বুখারেস্টে এখনও লোকের মুখে মুখে সেই বীভৎস কাহিনি শোনা যায়। সে সব কাহিনি যে অতিরঞ্জিত নয়, তার প্রমাণ রয়েছে শহরের বহু বাড়ির দেওয়ালে গুলিগোলার দাগে। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির হাজার হাজার বই পুড়েছে, জাতীয় মিউজিয়ামের অনেক অমূল্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে এদের তাণ্ডবে।

বুখারেস্ট শহরটি এককালে বেশ সুদৃশ্য ছিল এমন পড়েছি, কিন্তু এখন দেখার মতন বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না। বুডাপেস্ট-এর সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না। ড্যানিয়ুব নদী এ শহর থেকে অনেক দূরে। এখানকার প্রাচীন এলাকাগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয়রা ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য পুরোনো বাড়িগুলো সযত্নে রক্ষা করে, চাউসেস্কু সেগুলো নষ্ট করে শুধু সারি সারি ফ্ল্যাটবাড়ি তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। অমিতা বসুর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘুরছিলাম। যে-কোনও কথাতেই চাউসেস্কুর কোনও না কোনও অত্যাচারের প্রসঙ্গ আসে। চাউসেস্কুর প্রাসাদ, পার্টি অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রণাঙ্গন, বুলেট-বিক্ষত মিউজিয়াম, এই সব ছাড়া যেন আর কিছুই দেখার নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি কিংবা হাঙ্গেরিতে বড় বড় গির্জাগুলি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত, কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে বাদ দিলেও এই সব পুরোনো গির্জাগুলি চমৎকার ভাস্কর্যের নিদর্শন। এখানে গির্জাগুলি অবহেলিত, কোনও কোনও গির্জা ভেঙেও ফেলা হয়েছে শুনেছি।

রুমানিয়ার একজন কবির সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। আয়ওয়া শহরে আমরা কিছুদিন প্রতিবেশী ছিলাম। সেই কবির নাম মারিন সোরেস্কু, তাঁর খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি কানাডা চলে গেছেন কোনও সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে। রাজনীতির লোকদের সঙ্গে আমি কথাবার্তায় সুবিধে করতে পারি না, আমার ইচ্ছে ছিল দু-একজন কবি বা লেখকের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর।

অমিতা এরকম অনেককে চেনেন। বিদেশ যাত্রার পথ খুলে যাওয়ায় প্রধান কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই এখন বিদেশে। যে দু-একজন আছেন, তাঁরা ইংরিজি জানেন না। ইয়োন হোরেয়া এখানকার একজন বিখ্যাত কবি এবং সম্পাদক। এঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও নিরাশ হতে হল, কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে এই কবির মা মারা গেছেন, তিনি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন না। তবে ইয়োন হোরেয়া'র মেয়ে ইরিনা আমাদের নেমন্তন্ন করল এক সন্ধ্যায় তার অ্যাপার্টমেন্টে।

রুমানিয়ায় নিজের বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে কোনও বিদেশিকে আমন্ত্রণ জানানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কারুর বাড়িতে বিদেশি অতিথি এলে পুলিশি হামলা ছিল অবধারিত। ইরিনার ফ্ল্যাটে আমরাই প্রথম বিদেশি।

ইরিনার বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, ছিপছিপে ধারালো চেহারা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না। একটি সন্তান নিয়ে আলাদা থাকে। ইরিনা ঠিক লেখিকা নয়, অনুবাদিকা, ইংরিজি সাহিত্য পড়েছে, তার বাবার একটি সাহিত্য পত্রিকা চালাতে সে সবরকম সাহায্য করে, নিজে প্রুফ দেখে পর্যন্ত।

ঠিকানা খুঁজে আমরা এলাম একটা দশতলা বাড়িতে। ইরিনা থাকে দশমতলায় কিন্তু সে বাড়ির লিফট ন'তলা পর্যন্ত। বাড়িটি নতুন, কিন্তু লিফটটা অমন কেন, তা বোঝা গেল না। ইরিনার ফ্ল্যাটটি বেশ বড়। ভাড়া নয়, নিজস্ব। এত কম বয়েসে, শুধু অনুবাদের কাজ করে সে এরকম একটা ফ্ল্যাট কিনেছে? এদেশে লিখে কি এত টাকা পাওয়া যায়? আমাদের মনে-মনে এই প্রশ্নটা ঘুরছিল, সেটা একবার উচ্চারিত হতে ইরিনা জানাল যে সে তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ বাবদ এক পয়সাও নেয়নি, তার নিজস্ব উপার্জনেও এরকম ফ্ল্যাট কেনা যায় না। সে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান, তাঁরা তাঁদের কন্যাকে এই ফ্ল্যাটটা উপহার দিয়েছেন।

এসব দেশে কেউ সন্ধের পর নেমন্তন্ন করলে ফুল ও ওয়াইনের বোতল নিয়ে যাওয়ার প্রথা। ইরিনা আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেছিল, তিনটি ডিম সেদ্ধ টুকরো-টুকরো করা, কয়েক স্লাইস রুটি, কয়েক টুকরো স্যালামি ও কিছু স্যালাড। আমরা পাঁচজন বুভুক্ষুর মতন দ্রুত সেগুলো শেষ করে ফেললাম। কারুর বাড়ির খাদ্যতালিকা এভাবে জানানো শিষ্টাচার সম্মত নয়, তা ছাড়া আমরা গেছি আড্ডা দিতে, খাবারের ব্যাপারটা জরুরি নয়। তবু এই কথাটা মনে আসেই যে আমাদের দেশের যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাড়িতে পাঁচজন অতিথি এলে এর চেয়ে অনেক বেশি খাবারের ব্যবস্থা থাকে। ইরিনার ফ্ল্যাটটা যেভাবে সাজানো, তাতে তার অবস্থা বেশ সচ্ছলই বলা যায়। কিন্তু এদেশে যে এখন পয়সা থাকলেও কিছু পাওয়া যায় না। এইগুলি সংগ্রহ করতেই নিশ্চয়ই ইরিনাকে অনেক কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।

ইরিনা বেশ তেজি ধরনের মেয়ে। যে-কোনও প্রশ্নের উত্তরে কোনও দ্বিধা না করে স্পষ্ট কথা বলে। আমরা অমিতার মুখে এখনকার দ্বিতীয় বিপ্লব ও চাউসেস্কুর পতনের কাহিনি শুনেছি। এবার সেই কাহিনিই শুনতে চাইলাম ইরিনার মুখে। দুটো ভাষ্য মিলিয়ে নেওয়ার জন্য। অমিতা ও ইরিনার মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে, চাউসেস্কুর আমলের প্রতি অমিতার রয়েছে ভীতি ও ঘৃণার ভাব, ইরিনার রয়েছে অবিমিশ্র ক্রোধ। এমনকি বর্তমান রুমানিয়ার শাসকদেরও ইরিনা পছন্দ করে না, তার ধারণা এদের মধ্যেও রয়ে গেছে চাউসেস্কুর কিছু কিছু গুপ্ত সমর্থক।

আমি জিগ্যেস করলাম, চাউসেস্কুকে এরকম বাড়তে দেওয়া হল কেন? একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্ণধার কী করে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে? তাকে সংযত করার কোনও ক্ষমতা কি পার্টির ছিল না। কিংবা পার্টি তাকে সরিয়ে দিতে পারেনি?

ইরিনা বলল, না। কেউ সাহস করেনি। তার জন্য আমিও দায়ী। এককালে আমিও ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির কট্টর সদস্য।

ভাস্কর জিগ্যেস করল, তুমি গোড়া থেকে বলো। তুমি কবে পার্টি মেম্বার হলে?

ইরিনা বলল, তখন আমি সদ্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি। আমার বাবা বহুদিনের কমিউনিস্ট।

সাচ্চা কমিউনিস্ট, এই আদর্শে বিশ্বাস করতেন, কোনওদিন পার্টির পোস্ট নিতে চাননি। আমার বয়ফ্রেন্ড যে পরে আমার স্বামী হয় সেও পার্টির সক্রিয় সদস্য। পৃথিবীতে যে দুজনকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, তারা যে আদর্শে বিশ্বাস করে, আমি সেই আদর্শকে মহৎ মনে করব না? তাই আমিও পার্টির সদস্য হতে চাইলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি অবশ্য আমাকে যাচাই করে নিয়েছিল। বারবার প্রশ্ন করেছিল, কেন আমি সদস্য হতে চাই।

বাদল জিগ্যেস করল, কেন, যে কেউ বুঝি ইচ্ছে করলেই পার্টির মেম্বার হতে পারত না?

ইরিনা বলল, না। খুব বেছে-বেছে মেম্বার করা হত। পরে আমি তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। তখন আমাদের দেশের যা অবস্থা, তাতে পার্টির মেম্বার হওয়া মানেই বিশেষ কতকগুলো সুবিধেভোগী হওয়া, সবাইকে তারা সেই সুযোগ দেবে কেন?

অসীম জিগ্যেস করল, এটা তুমি কবে জানলে?

ইরিনা বলল, প্রায় প্রথমদিকেই। আমি ভালো ছাত্রী ছিলাম, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য আমাকে কাজে লাগানো হত। আমি সেটা খুশি মনেই করতাম। একদিন একটা ধাক্কা খেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি মেম্বারদের নিয়ে একদিন একটা গোপন মিটিং হল, একজন অধ্যাপক আমাদের নীতি বোঝাতে এলেন। সেই অধ্যাপকটির ভাষা কী খারাপ! সে অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপকের নামে কুৎসিত গালমন্দ করে বলল, ওরা প্রতিক্রিয়াশীল, ওদের চিনে রাখতে হবে। কিন্তু সেইসব অধ্যাপকদের আমি চিনি, তাঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, মন দিয়ে পড়ান, কোনও সাত-পাঁচে থাকেন না। বরং আমাদের নেতা এই অধ্যাপকটিই ফাঁকিবাজ এবং অযোগ্য! বাড়িতে আমি বাবার সামনে এসে কেঁদে ফেলেছিলাম। কেন একজন কমিউনিস্ট খারাপ গালাগালি দেবে? নিজে অযোগ্য হয়েও কেন অন্য অধ্যাপকদের নিন্দে করবে। এইরকম লোক নেতা হয় কী করে?

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পার্টির মধ্যে এরকম দু-একজন লোক তো ঢুকে পড়তেই পারে। প্রথমেই অত ভেঙে পড়িস না। এই আদর্শের জন্য কত মেম্বার কত আত্মত্যাগ করেছে, সেটাও দেখতে পাবি।

কিন্তু আমি আরও ধাক্কা খেতে লাগলাম। আমার ধারণা ছিল, যারা এই পার্টির মেম্বার হয়, তারা একটা আদর্শকে নিজের জীবনেও প্রমাণ করে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভ থাকে না, তারা দেশের মানুষের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সে রকম মানুষ অনেক ছিল, যখন পার্টি ছিল সংগ্রামের মধ্যে, যখন পার্টি ছিল বামপন্থী অর্থাৎ সরকার বিরোধী পক্ষ। কিন্তু পার্টি যখন একচ্ছত্র ক্ষমতায় এল, তারপর থেকে অবস্থা হল, যেন পার্টির মেম্বার হওয়া মানেই যা খুশি করার লাইসেন্স পেয়ে যাওয়া। ঘুষ, কালোবাজারি, ইচ্ছেমতন যাকে তাকে শাস্তি দেওয়া, এসব কিছুই বাদ যায়নি। বিয়ের আগেই আমি প্রেগন্যান্ট হই। আমার বয়ফ্রেন্ডের তখন আমার ওপর টান চলে গেছে। আমি তাকে জোর করে বিয়ে করতে চাইনি। কিন্তু আমার সন্তানকেও নষ্ট করতে চাইনি। আমি তাকে কাতরভাবে অনুরোধ করলাম, কিন্তু সে ছিল একটা সত্যিকারের রাস্কেল, কিছুদিন পরই বিয়ে ভেঙে গেল। এবং আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে চাইল। আমি তখন লড়ে গেছি। একা ছুটোছুটি করেছি ডাক্তারের কাছে, কোর্টে কেস করেছি। কিন্তু ডাক্তার থেকে বিচারক পর্যন্ত আমার কাছে ঘুষ চেয়েছে। এক এক সময় আমার নার্ভাস ব্রেকডাউনের মতন হত।

আমি জিগ্যেস করলাম, ডাক্তার, বিচারক, এঁরা ঘুষ চাইলে এঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করা যেত না।

ইরিনা বলল, এরা সবাই ছিল পার্টির বড় বড় পোস্টে। এদের গায়ে হাত ছোঁয়াবার কোনও উপায় ছিল না। বুঝতে পারছ না, এরাও ছিল ছোট ছোট চাউসেস্কু! সেইজন্যই বড় চাউসেস্কুকে এরা সরাতে চায়নি। আমি নিজে তখন পার্টির মেম্বারশিপ ছেড়ে দেওয়ার কথা অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু পারিনি। মেম্বারশিপ পাওয়া যেমন শক্ত, ছেড়ে দেওয়াও তেমন শক্ত। ছেড়ে দিলেই পার্টি

পেছনে লাগত। আমি তবু অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম, আমি চলে গেলে ওরা আমার বাবার ওপর অত্যাচার করবে। আমার বাবা যে খাঁটি মানুষ! পরে, এই বিপ্লবের পরে, বাবা বলেছেন যে সেই সময়ে দুঃখে-অভিমানে বাবাও পার্টি ছেড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ভয় পেয়েছিলেন আমার কথা ভেবে। তিনি ছেড়ে দিলে ওরা যদি আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়!

অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগল এইসব কথা। ইরিনা চোখের জল মুছতে লাগল বারবার। একসময় ধরা গলায় সে আবার বলল, আপদগুলো বিদায় হয়েছে। আমাদের দেশটা কবে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবে জানি না। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আমি কমিউনিজমের ওপর বিশ্বাস হারাইনি। এইসব লোকগুলো তাকে নষ্ট করেছে, দেশটাকে এত খারাপ অবস্থায় নিয়ে গেছে, তবু আদর্শ হিসেবে একে বাদ দেওয়া যায় না।

আমি বললাম, আদর্শ হিসেবে সাম্যবাদ অবশ্যই অনেক উঁচুতে।

ইরিনা বলল, ইচ্ছে করলে আমি এখন দেশের বাইরে চলে যেতে পারি। আমি ইংরিজি জানি, জার্মান জানি, জার্মানিতে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে, সেখানে গেলে আমার কাজ পাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। অনেকে চলে যাচ্ছে, আমি যাব না। সাম্যবাদের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার কি কোনও বিরোধ আছে? কেন এতগুলো বছর ধরে দেশের মানুষকে ভয় দেখিয়ে, ঠকিয়ে, মিথ্যে কথা বলে সাম্যবাদ প্রচার করা হয়েছিল? মিথ্যে কথা আমি দু চক্ষে সহ্য করতে পারি না। আমি চাই সত্য এবং ন্যায়, সমস্ত মানুষের চিন্তা ও জীবনযাত্রার স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সাম্যবাদ, সব একসঙ্গে।

॥ ১২ ॥

রুমানিয়ার অবস্থা কি আমাদের দেশের চেয়েও খারাপ?

আপাতদৃষ্টিতে সেইরকমই মনে হয় বটে। কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে? আমাদের চার জনের দলটির মধ্যে বাদল ও আমি কলকাতাবাসী, ভাস্কর ও অসীম বহুকাল প্রবাসী। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা আলাদা হবেই। রুমানিয়ায় মাংস পাওয়া যায় না, দুধ নেই, মাখন নেই, এরকম প্রয়োজনীয় অথচ অপ্রাপ্তব্য বস্তুর তালিকা অতি দীর্ঘ। ইংল্যান্ড ফ্রান্সে এই অবস্থা অকল্পনীয়, পয়সা থাকলে সেখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। ওই সব দেশে বিক্রেতারাই খদ্দেরদের নানারকম প্রলোভন দেখায়, নিছক খাবারের জিনিস কেনার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওই সব দেশের দোকানে ঢুকলে কুড়ি রকমের মাংস, বারো রকমের রুটি, সাত রকমের দুধ, পাঁচ রকমের ডিম, চল্লিশ রকমের বিস্কিট ইত্যাদির মধ্যে পছন্দমতন বেছে নিতে যা সময় লাগে। ভাস্কর আর অসীমের মনে এই তুলনা আসবেই।

বাদল বলল, আমাদের কলকাতার অবস্থাও এর চেয়ে অনেক ভালো। টাকা থাকলে সব কিছু পাওয়া যায়।

আমি বললাম, না, পাওয়া যায় না।

বাদল বলল, মাছ, মাংস, রুটি, ডিম, এসব পাওয়া যায় না?

আমি বললাম, না।

বাদল খানিকটা হকচকিয়ে যেতে আমি খানিকটা রহস্য করে বললাম, মনে করুন, কলকাতার সব লোক একদিন মাংস খাবে ঠিক করল, তখন কি লাইন দিয়েও সবাই মাংস পাবে? মনে করুন, পশ্চিম বাংলার সব মানুষ ভাবল, তাদের প্রতিদিন ডিম খাওয়া উচিত, তত ডিম পাওয়া যাবে বাজারে?

আমাদের দেশের শতকরা পঞ্চাশ ষাটজন লোক জীবনে কখনও মাখন খায়নি, তারাও যদি মাখন খেতে চায়, তার জোগান দেওয়া যাবে?

আমাদের দেশের শতকরা পঞ্চাশ জনেরও বেশি মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে, তাদের কোনও ক্রয়ক্ষমতাই নেই, তাদের জন্য ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও হয় না। আমাদের দেশে কংগ্রেসি কিংবা বামপন্থী কোনও সরকারই দারিদ্র্যসীমার বিশেষ হেরফের ঘটাতে পারেনি। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষরাই কখনও পাউরুটি কিংবা বিদ্যুৎ কিংবা পেট্রোল না পেলে চেঁচামেচি করে, সরকারও তাদেরই মনতুষ্টির চেষ্টা করে। আর দেশের যে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ প্রায় কিছুই পায় না, তারা নীরবই থেকে যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু রোজগার থাকে, মাংস-মাখন-ডিম-কফি এসব, আমাদের শুধু ডাল-ভাতের মতনই, ওদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, সকলেরই এগুলো পাওয়ার কথা, রুমানিয়ায় সকলে সেগুলো এখন পাচ্ছে না বলেই এত কথা উঠছে। তাহলেও এদেশে কেউ এখনও না খেয়ে নেই, শহরের ফুটপাথে ভিখিরির পাল জোটেনি। সুতরাং আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা চলে না।

অসীম বলল, ভারতের চেয়ে এখানকার অবস্থা অবশ্যই ভালো। এখানে তবু তো সব লোক লেখাপড়ার সুযোগ পায়, না খেয়ে কেউ মরে না, সকলেরই কিছু না কিছু কাজ আছে, শহরে আবর্জনার স্তূপ জমেনি।

ভাস্কর বলল, সমাজতন্ত্র আসবার আগে কি এখানে কেউ না খেয়ে থাকত? ইউরোপের কোন দেশের লোক না খেয়ে থাকে? তথাকথিত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সাধারণ মানুষও এদের তুলনায় ভালো খেতে-পরতে পায় না? সেখানেও সব লোক কাজ পায়, কাজ না থাকলে সরকার বেকার-ভাতা দেয়। এখানে সবাই কাজ পায় তবু কাজ করে না।

আমি আর তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। তুলনা করে লাভ নেই। সমাজতন্ত্র সমস্ত মানুষের মধ্যে সমবন্টনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘোচাবার কথা বলেছিল, এই আদর্শ ব্যবস্থাকে কে অস্বীকার করবে? তবু অতিরিক্ত ক্ষমতালোভী একটা শ্রেণি তৈরি হয়ে গেল, তাদের জন্য এই আদর্শ ব্যর্থ হয়ে গেল। এ জন্য মনের মধ্যে একটা বেদনাবোধ থেকেই যায়।

আমাদের রুমানিয়ায় ফেরার পালা এবার শেষ হল। আমাদের বাড়িউলি মাদাম দিদার ইচ্ছে আমরা আরও কয়েকটা দিন থেকে যাই। আমাদের কাছ থেকে চার দিনের ঘর ভাড়া হিসেবে উনি যত ডলার পেয়েছেন, তা এখানকার সাধারণ মানুষের তিন মাসের মাইনে। সুতরাং আমাদের আরও কয়েকটা দিন ধরে রাখার আগ্রহ তো ওঁর থাকবেই। ওঁর মতে, ভারতীয়রা বেশ ভালো লোক, পছন্দ মতন পেলে উনি একজন ভারতীয়কে বিয়ে করতে চান। আমাদের দলে অসীমই একমাত্র অকৃতদার এবং অতিশয় সুপাত্র এবং বয়েসের দিক দিয়েও মাদাম দিদার সঙ্গে মানিয়ে যাবে। আমরা তিনজনে অসীমের নাম প্রস্তাব করায় অসীম তৎক্ষণাৎ এ দেশ থেকে একটা দৌড় লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ছুটি ফুরিয়ে গেছে বলে ভাস্কর ও অসীম ফিরে যাবে যে-যার শহরে এবং ওদের ফিরতে হবে হাঙ্গেরি হয়ে। বাদল আর আমি যাব পোল্যান্ড। ওরা দু'জন গেল রেল স্টেশানের দিকে, আমরা দুজন বিমানবন্দরে।

বুখারেস্ট শহর ছাড়িয়ে বিমানবন্দরটি বেশ দূরে। আমাদের ফ্লাইট ডিলেইড, বসে থাকতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। বিদ্যুৎসংকটের জন্য এয়ারপোর্টের অধিকাংশ জায়গাই অন্ধকার, দু-এক জায়গায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে। রেস্তোরাঁয় খাবারদাবার কিছু নেই। এখানে অপেক্ষা করাটা মোটেই সুখকর নয়। আমাদের কাছে যে সামান্য কিছু রুমানিয়ান টাকা রয়ে গেছে তা খরচ করে ফেলবার জন্য আমরা দুটো বিয়ার নিয়ে বসলাম। রেস্তোরাঁয় আর বিশেষ লোক নেই। এক কোণের টেবিলে

তিনটি যুবক বসে নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথা বলছে, এক সময় আমি তাদের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনারা ঢাকা থেকে এসেছেন?

ওরা ভূত দেখার মতন চমকে উঠল, একজন বিস্ফারিত চোখে জিগ্যেস করল আপনি বাংলার কথা বলছেন? সত্যি? কানে ভুল শুনছি না তো!

যুবক তিনটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমাদের কাছাকাছি এসে বসল। ওদের দুজনের বয়েস একুশ-বাইশ, অন্য জনের ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বয়স্ক ছেলেটি চালু ধরনের, অন্য দুজন একেবারেই সরল নিরীহ। ওদের কাহিনি খুবই করুণ। রুমানিয়ায় ঢুকতে ভারতীয়-বাংলাদেশিদের ভিসা লাগে না, ওরা তবু ঢাকা থেকে ভিসা নিয়ে এসেছে, এখানে তবু ওদের আটকে দিয়েছে। ওদের প্লেনের টিকিট এক দিকের, এখানে ইমিগ্রেশান থেকে সন্দেহ করা হয়েছে যে, ওরা বেড়াতে আসেনি, কাজ খুঁজতে এসেছে। ওদের উদ্দেশ্য সত্যিই তাই।

বাদল বলল, তোমরা আর কোনও দেশ খুঁজে পেলে না? রুমানিয়ায় এসেছ কাজ খুঁজতে?

অল্প বয়সীদের একজন জিগ্যেস করল, কেন দাদা, দেশটা খারাপ?

বাদল বলল, ভাগ্যিস ঢুকতে পারনি। ভেতরে গেলে কাজ তো পেতেই না, ক'দিন বাদে না খেয়ে থাকতে হত।

কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, বয়স্ক ছেলেটি অন্য দুজনকে স্বপ্ন দেখিয়ে এনেছে। এর আগে সে আরও কিছু ছেলেকে ঢাকা থেকে চালান করেছে অন্য দেশে। তার ধারণা, রুমানিয়ায় ঢোকা সবচেয়ে সহজ, তারপর এখান থেকে কোনওক্রমে জার্মানিতে পৌঁছে যেতে পারবে। জার্মানি হচ্ছে সমস্ত সুযোগ সন্ধানীদের স্বর্গ। অল্পবয়েসি ছেলে দুটির ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই, ঢাকায় কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রায়ই বন্ধ থাকে, পাস করলেও চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, তাই বিদেশের হাতছানিতে ওরা প্রলুব্ধ হয়েছে। এটাকে ঠিক অ্যাডভেঞ্চারও বলা যায় না, ওরা দেশ ছেড়েছে হতাশায়। মরিয়া হয়ে প্লেন ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করেছিল, এখন সবই গেল।

ওদের তিনজনকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে এই এয়ারপোর্টে। একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। চারদিন ধরে ওরা রয়েছে। অন্য কোনও দেশ ওদের নামতে দেবে না, এখান থেকে ঢাকার সরাসরি কোনও ফ্লাইট পেলে তাতে ওদের পাঠানো হবে। এর মধ্যে সেপাই-সান্ত্রিরা নানা ছুতোয় ঘুষ নিচ্ছে ওদের কাছ থেকে। কখনও ভয় দেখিয়ে, কখনও মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে। আজ সকালেই একজন পুলিশ ওদের বলেছে, একশো ডলার দাও, দু-ঘণ্টা বাদে ওদের শহরে পাচার করে দেবে। একশো ডলার গেল, দু-ঘণ্টা পরে জানা গেল, সেই পুলিশটি কয়েকদিনের জন্য ছুটিতে চলে গেছে। আবার আর একজন সেই একই আশ্বাস দিয়েছে।

ওদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। একজন বলল, দাদা, সাহেবরা যে এত ঘুষ নিতে পারে, তা আমরা জানতাম না। এখানে প্রত্যেকে ঘুষ চায়। আমাদের একেবারে ফতুর করে দিচ্ছে। এখানে ওরা দুবেলা খেতে দেয় বটে, কিন্তু যা খাই কিছুই ভালো লাগে না।

বাঙালি পেয়ে ওরা আমাদের ছাড়তে চায় না। কিন্তু ওদের সাহায্য করার কোনও উপায়ই আমরা খুঁজে পেলাম না। আমাদের একটু পরেই চলে যেতে হবে। বাদল আর আমি প্রস্তাব দিলাম তোমাদের টাকা পয়সা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, আমরা কিছু দিতে পারি। পরে না হয় দেশে ফিরে গিয়ে কোনওসময় শোধ করে দিও।

ওদের একজন বলল, আপনাদের কাছ থেকে নিলে সে টাকাও চলে যাবে। কোনও লাভ নেই। আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলে, যখন দেখবে ঘুষ পাওয়ার আর কোনও আশা নেই, তখন ওরা নিজেদের গরজেই আমাদের ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

ভারাক্রান্ত মনে ছেলে তিনটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বিমানের দিকে হেঁটে গেলাম।

তারপর ওদের কী পরিণতি হল জানি না। আশা করি, সুস্থভাবে তারা দেশে ফিরে গিয়ে দুটি মাছের ঝোল-ভাত খেতে পেয়েছে।

আমরা ওয়ারশ পৌঁছলাম সন্ধের পর। এখানে আমাদের অভ্যর্থনা হল চমকপ্রদ। ওয়ারশ-তে আমাদের থাকার জায়গা ঠিক করে আসিনি। সেরকম বিশেষ চেনাশুনোও কেউ নেই। তবে ফ্রাংকফুর্টে থাকার সময় লন্ডনে টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছিল বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক আকুমল রামচন্দরের সঙ্গে। আকুমলের সঙ্গে পোল্যান্ডের খুব যোগাযোগ। আমরা ওয়ারশ যাব শুনে, দিন হিসেব করে আকুমলও চলে এসেছে। বিমান বন্দরের বাইরে এসে দেখি আকুমল দুটি পোলিশ যুবককে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকুমল তো বাংলা জানেই, তা ছাড়া পোলিশ যুবকদ্বয়ের একজন বেশ পরিষ্কার বাংলায় বলল, আসুন, পোল্যান্ডে স্বাগতম। কোনও কষ্ট হয়নি তো?

এই যুবকটির নাম পিওতর বালসেরোউইভস, ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করে। অন্যজনের নাম জাসেক ফ্রাকৎসাক (কিংবা ফ্রমসাফ), একজন প্রখ্যাত গ্রাফিক শিল্পী। ট্যাক্সি ধরতে হল না, জাসেক এর নিজের গাড়ি আছে। সেই গাড়িতে উঠে আরও ভালো খবর পাওয়া গেল যে, আকুমল আমাদের জন্য থাকার জায়গাও ঠিক করে ফেলেছে।

আগেই শুনেছিলাম যে ওয়ারশ-তে সাধারণ হোটেল পাওয়া দুষ্কর, নামি হোটেলগুলি এতই দামি যে আমাদের প্রায় সাধ্যাতীত। কিন্তু আকুমলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তুলনা নেই। অনেক হোটেলের সে সন্ধান নিয়েছে বটে, কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছোবার মাত্র দু-ঘণ্টা আগে একটা চায়ের আসরে সে অনেকের মধ্যে বসে আমাদের থাকার জায়গার প্রসঙ্গ তুলেছিল। তখন শিক্ষা বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি একটি গেস্ট হাউসের ঘর ঠিক করে দেন আমাদের জন্য। সে গেস্ট হাউসটিও সাধারণ নয়, আর্ট হিস্টোরিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত, খরচ যৎসামান্য। অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই শুধু সেখানে থাকার অধিকারী, এই প্রথম আমাদের মতন দুজন অপণ্ডিতের সেখানে পদার্পণ।

গেস্ট হাউসটি পুরোনো শহর। সেন্ট জনস্ ক্যাথিড্রালের কাছাকাছি এই এলাকাটি টুরিস্টদের একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। অর্থাৎ যেখানে সবাই বেড়াতে আসে, আমরা রাত্রিবাস করব সেখানেই। বাড়িটি পুরোনো আমলের, এক একটা ফ্লোর এখনকার দেড়তলার সামন তো হবেই এবং লম্বা কাঠের সিঁড়ি। আমাদের ঘর চার তলায়। খুবই প্রশস্ত কক্ষ, কাছেই বাথরুম ও রান্নাঘর, চমৎকার ব্যবস্থা। প্রথম রাত্তিরেই যাতে আমাদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে না হয়, সে বন্দোবস্তও করে রেখেছে আকুমল। মালপত্র রেখেই আমাদের আবার রওনা দিতে হল। জীবনে যাঁদের দেখিনি, যাঁদের নামও শুনিনি, সেরকম একটি পরিবারে আমাদের নেমন্তন্ন আছে।

শহরের অন্য প্রান্তে সেই বাড়ির গৃহকর্তা একজন সাংবাদিক, তাঁর নাম অ্যানড্রু টারনডস্কি। ইনি রয়টারের ওয়ারশ প্রতিনিধি। কথাবার্তা শুনে পাক্কা ইংরেজ মনে হলেও পদবিটা খটকা জাগায়। এঁর বাবা-মা পোলিশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই তাঁরা পোল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। অ্যানড্রু'র জন্ম সুইটজারল্যান্ডে, কৈশোর কেটেছে স্কটল্যান্ডে, লেখাপড়া করেছেন অক্সফোর্ডে। তারপর চাকরির সূত্রে ঘুরেছেন সারা পৃথিবী। পোল্যান্ডে এসে ইনি এখন পোলিশ ভাষা শিখছেন এবং এখানকার ঘটনাবলি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ শুধু জীবিকার কারণের চেয়ে অনেক বেশি। এঁর স্ত্রীর নাম ওয়াফা, গৌরাঙ্গিনী হলেও তাঁকে ঠিক মেমসাহেব বলে মনে হয় না। বসবার ঘরের দেওয়ালে দু-একটা ভারতীয় মোটিফ দেখে সন্দেহ হয়, ইনি ভারতীয় নাকি? কথা বলে জানা গেল, ওয়াফা লেবাননের মেয়ে, তিনিও সাংবাদিক ছিলেন এবং একসময় দু'জনেই ছিলেন দিল্লিতে। এঁর কথার মধ্যে বেশ একটা আপন-আপন সুর আছে। রান্না-বান্নায় লেবানন, পোল্যান্ড, ব্রিটেন ও ভারতের ছোঁয়া আছে। আকুমল বানিয়েছে স্যালাড ও পাঁপড় ভাজা। এই সাংবাদিক দম্পতির পাঁপড় ভাজা খুব প্রিয়। এ বাড়ির খাবার টেবিলে বসলে বোঝা যায় না যে এ দেশে খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব আছে।

কোনও একটা নতুন শহরে এসে পরিবেশটা বুঝে নিতে অন্তত একটা দিন সময় লাগে। ওয়ারশতে এসে আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেশ একটা অন্তরঙ্গ আবহাওয়া পেয়ে গেলাম। শিল্পী জাসেক বেশ ঝকঝকে ইংরিজি বলে এবং জোর দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। সমস্ত কথাই পোল্যান্ডের সাম্প্রতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। অ্যানড্রু আমাদের কাছে রুমানিয়ার অভিজ্ঞতা জানতে চাইছিলেন কিন্তু জাসেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার পোল্যান্ডের প্রসঙ্গে টেনে আনে। জাসেক এবং আকুমল দুজনেই আগেকার শাসনতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, ওদের মতে পোল্যান্ড দুঃশাসন মুক্ত হয়েছে। অ্যানড্রু ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত। এই পরিবর্তনের কতটা সুফল পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট সংশয় আছে।

আকুমল বাইরের মানুষ হলেও গত এক দশক ধরে পোল্যান্ডের সমস্ত ঘটনা তার নখদর্পণে। তবু আমরা জাসেক-এর কাছেই জানতে চাইলাম, পূর্ববর্তী ব্যবস্থা সম্পর্কে তার প্রধান অভিযোগ কী কী।

জাসেক শুধু শিল্পী নয়, খুবই ইতিহাসমনস্ক। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে মাঝে মাঝেই উদ্ধৃতি দেয়। সে বলল, মানুষ অনেক কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু বেশিদিন ভণ্ডামি সহ্য করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে পোলিশরা বহু অত্যাচার সহ্য করেছে, বিদেশি শক্তি এ দেশটাকে বারবার টুকরো-টুকরো করেছে, এক সময় পোলান্ডের নামটাও পৃথিবীর ম্যাপ থেকে মুছে গিয়েছিল, তবু এদেশের মানুষ কখনও আত্মমর্যাদা হারায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এদেশের ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তবু তো ভেঙে পড়েনি এ জাতটা। সমাজতন্ত্রের রাস্তা ধরে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে এই জাতটা আবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তারপর একদলীয় শাসন এমন একটা স্বৈরতন্ত্রের পর্যায়ে গেল, যাতে গড়ে উঠল একটা নতুন অ্যারিস্টোক্র্যাট শ্রেণি, যারা দেশকে মানুষকে সমাজতন্ত্রের স্তোক বাক্য দেয়, আর নিজেরা বেশি-বেশি সুবিধে ভোগ করে। তাদের পতন অনিবার্য ছিল।

কথায়-কথায় লেক ভালেনসার কথা এসে পড়ে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে তখন হাওয়া গরম। সলিডারিটির নেতা ভালেনসা শুধু পোল্যান্ডের নয়, পূর্ব ইউরোপের সবকটি দেশের পালা বদলের নেতা। ১৯৮০ সালে তাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট শ্রমিক আন্দোলন পোল্যান্ড কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যে দেশ শাসন করছে ওয়ার্কার্স পার্টি, সে দেশের শ্রমিকরাই বিদ্রোহ করে কেন? তা হলে কারা প্রকৃত শ্রমিক? মার্শাল ল জারি করে সলিডারিটির আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করা গেলেও জনতার রোষ আবার ফুঁসে ওঠে।

পূর্বতন সরকারের পতনের পর লেক ভালেনসা বলেছিলেন, তিনি শ্রমিক, তিনি সরকারের কোনও পদ চান না। কিন্তু এতবড় একটা ইতিহাস বদলের নায়কের মর্যাদা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। কয়েকমাসের মধ্যে নিজেকে কিছুটা অবহেলিত মনে করে ভালেনসা মত বদল করে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছেন।

জাসেক কিন্তু ভালেনসার সমর্থক নয়। ভালেনসা-কে সে অবশ্যই হিরো মনে করে, তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকাও মান্য করে, কিন্তু ভালেনসা প্রেসিডেন্ট হোন, এটা সে চায় না।

জাসেক বলল, ভালেনসা হেরে গেলে আমি দুঃখিত হব, আর জিতলে হতাশ হব।

কথাটা ধাঁধার মতন, ঠিক বোঝা যায় না।

অ্যানড্রু বললেন, ভালেনসা নির্বাচনে হেরে গেলে তাঁর খুবই অসম্মান হবে। এতবড় একটা কাণ্ড যিনি ঘটালেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যিনি এনে দিলেন, তাঁকেই দেশের মানুষ ভোট দেবে না, এটা অকৃতজ্ঞতা নয়? কিন্তু জাসেক-এর মতন বুদ্ধিজীবীরা ভালেনসাকে রাষ্ট্রপতির পদে চায় না, কারণ ভালেনসা ঠিক শিক্ষিত নন। তিনি একজন ইলেকট্রিশিয়ান। তাঁকে অন্যভাবে সম্মান জানানো যেতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে বসানোর দরকার কি? দেশ গড়ার জন্য একজন উপযুক্ত লোক

দরকার, তাই না জাসেক?

জাসেক বলল, ভালেনসা একজন ইলেকট্রিশিয়ান বলেই যে তাঁকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসাতে আমাদের আপত্তি তা নয়। আমাদের আশঙ্কা অন্য। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হিসেবে যাঁকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি তিনি যদি ক্ষমতার আসনে বসার পর বদলে যান? যদি তিনিও আস্তে-আস্তে রূপান্তরিত হয়ে, হয়ে ওঠেন এক স্বৈরাচারী? তাহলে যে আমাদের দুঃখের শেষ থাকবে না।

॥ ১৩ ॥

সকালবেলা আমাদের বাসস্থান থেকে বেরুলেই দেখতে পাই চতুর্দিকে টুরিস্টদের মেলা। ওয়ারশ শহরের এই 'ওল্ড টাউন' টুরিস্টদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। একটা প্রকাণ্ড চত্বর ঘিরে সব পুরোনো আমলের বাড়ি, গির্জা, মিউজিয়াম। অনেক রকম জিনিসপত্তর নিয়ে সকাল থেকেই এখানে বসে যায় সার সার নারী-পুরুষ ফেরিওয়ালা। কাছাকাছি অনেক বিখ্যাত হোটেল-রেস্তোরাঁ, খুচরো খাবারের দোকান। খোয়া-পাথর বাঁধানো এই চত্বরটায় ঘুরলে খানিকটা মধ্যযুগীয় আবহাওয়া অনুভব করা যায়। আবার একটা বিস্ময়বোধও জেগে থাকে। এই যে সব বিশাল বিশাল প্রাসাদ, এর কোনওটাই আসল নয়, সব নকল। গোটা পুরোনো শহরটাই প্রকৃতপক্ষে অর্বাচীন।

ওয়ারশ শহরের প্রায় পুরোটাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পোলিশ জাতি দারুণ অধ্যবসায়ে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সমস্ত পুরোনো বাড়িগুলো আবার নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছে। ঐতিহ্য রক্ষা করার প্রতি মমতায় তারা পুরোনোর জায়গায় নতুন গড়েনি, সবকিছুই পুনর্নির্মাণ করেছে। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় সর্বত্রই ঐতিহ্য রক্ষার এই আন্তরিক প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাড শহরে এবং অন্যত্র অনেক ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক বাড়ি আবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে হুবহু আগের মতন গড়ে তোলা হয়েছে। চিনেও আছে এরকম সংরক্ষণের নিদর্শন। একমাত্র রুমানিয়ায় চাউসেস্কু ঐতিহ্যের কোনও তোয়াক্কা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর আমল থেকেই নতুন ইতিহাস শুরু হোক। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে এবং তাঁর পত্নীকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করল নির্দয়ভাবে।

নাতসিরা ওয়ারশ শহরটা দখল করেও এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে পুরো শহরটা ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। যুদ্ধের সময় অন্যান্য অনেক শহর ধ্বংস হয়েছে বোমাবর্ষণে, কিন্তু ওয়ারশ ধ্বংস হয়েছিল ডিনামাইটে। যে কারণ উপলক্ষে এমনটি ঘটেছিল, তা নিয়ে আজও বিতর্ক আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন চরম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে পোল্যান্ডকে, তেমনি পোলিশ জাতি অসম সাহসিকতারও পরিচয় দিয়েছে। অসম্ভব অমানুষিক অত্যাচারেও তারা মাথা নত করেনি। পোলান্ড কোনও কুইশলিং-এর জন্ম দেয়নি। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই তারা বিনা প্রতিরোধে এগোতে দেয়নি জার্মানদের। ডানজিগ বন্দরে মাত্র ১৮৯ জন পোলিশ বীর সাতদিন ধরে শ্লেসুইটগ হলস্টিন নামে রণতরীকে আটকে রেখেছিল। পশ্চিম সীমানা দিয়ে যখন জার্মান ট্যাংক বাহিনী ঢোকে তখন তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়েছিল পোল্যান্ডের পো মোরস্কা বিগ্রেড নামে অশ্বারোহী বাহিনী। কামানের বিরুদ্ধে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে লড়তে যাওয়ার মতন ঘটনা। শত্রুর গোলায় সেই অশ্বারোহী বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও সেই শৌর্যের কাহিনি অবিস্মরণীয়।

জার্মান অধিকারের সময় দেশের ভেতরে ও বাইরে পোলিশ প্রতিরোধ বাহিনী আগাগোড়া সক্রিয় ছিল। এই প্রতিরোধ বাহিনী ছিল দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি গোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী, নাম আরমিয়া ক্রাজাওয়া বা হোম আর্মি, অন্যটি ছিল কমিউনিস্ট গোয়ারডিয়া লুডো, বা পিপলস গার্ড। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি যুদ্ধের গতি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বোঝা গিয়েছিল যে জার্মানদের

শেষ পর্যন্ত হারতেই হবে। সেই সময় ওয়ারশ-তে লুকিয়ে থাকা পোলিশ প্রতিরোধ বাহিনী একটা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিল। তারা চেয়েছিল সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সাহায্য নিয়ে নিজেরাই ওয়ারশ-কে শত্রুমুক্ত করবে। সোভিয়েত বাহিনী ততদিনে ভিস্টুলা নদীর দক্ষিণ তীরে পৌঁছে গেছে। শহরের মধ্য থেকে প্রতিরোধ বাহিনীর অভ্যুত্থানে নাতসিদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হবে, সেই সুযোগে সোভিয়েত বাহিনী নদী পেরিয়ে এসে আক্রমণ করলেই নাতসীরা ফাঁদে পড়ে যাবে। লন্ডন থেকেও প্রতিরোধ বাহিনীর এই পরিকল্পনাকে সমর্থন জানানো হল। অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হল। ১ আগস্ট। যথাসময়ে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেল, ওয়ারশ-এর পথে পথে শুরু হল লড়াই, কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে এল না সাহায্য করতে। জার্মানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মতন অস্ত্রও ছিল না প্রতিরোধ বাহিনীর, তবু তারা একমাস পাঁচ দিন ধরে দুরন্ত লড়াই করার পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, ততদিনে আড়াই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছে।

এই প্রতিরোধ দমন করার পর, ওয়ারশ শহরে যারা বেঁচেছিল তাদেরও শহর থেকে তাড়িয়ে দিল নাতসিরা। তারপর এক একটা পাড়া ধরে-ধরে সমস্ত বাড়িঘর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে লাগল। ওয়ারশ শহরটাকেই তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। তিন মাস পরে সোভিয়েত বাহিনী যখন বিজয়ীর বেশে এখানে প্রবেশ করল, তখন চতুর্দিকে শুধু ধ্বংসস্তূপের নীরবতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পোল্যান্ডের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ, প্রায় ষাট লক্ষ নারী-পুরুষ নিহত হয়, তার মধ্যে অর্ধেক ইহুদি।

এখন আবার নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, চুয়াল্লিশ সালে সেই ওয়ারশ অভ্যুত্থানের সময় সোভিয়েত বাহিনী নদী পেরিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এল না কেন? এই নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কী? আজও এর সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। স্টালিন পরবর্তীকালে বলেছিলেন, ওই ওয়ারশ অভ্যুত্থান ছিল প্রি-ম্যাচিওর, আরও প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করা উচিত ছিল। তাহলে লন্ডন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই অভ্যুত্থান শুরু করার সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছিল কেন? লন্ডন-মস্কো তখন তো মিত্র পক্ষীয় আঁতাতে ছিল। আসলে যুদ্ধের সময়েও হৃদয়হীন রাজনীতির খেলা চলে, যুদ্ধ যখন চলছে, তখনই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কে কোন অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করবে, সেই হিসেব কষা হয়। ওয়ারশ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল অ-কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী হোম আর্মি, চার্চিল ট্রুম্যানের পশ্চিমি জোট মনে করেছিল, এই অভ্যুত্থান সফল হলে জার্মানদের হঠিয়ে দিয়ে হোম আর্মি পোল্যান্ডে সরকার গড়তে পারবে। অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইচ্ছে কমিউনিস্ট পিপলস গার্ডের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। সুতরাং ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর হোম আর্মির মুক্তিযোদ্ধারা যখন জার্মানদের হাতে কচু-কাটা হতে লাগল, তখন নদীর অপর পারে সোভিয়েত বাহিনী রয়ে গেল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। হোম আর্মির আর বিশেষ কেউ অবশিষ্ট রইল না, এরপর পোল্যান্ড যুদ্ধ শেষে স্বাভাবিক ভাবেই পিপল্স গার্ডের হাতে চলে এল। যে নাতসিরা ছিল কমিউনিস্টদের ঘোর শত্রু, তারাই কিন্তু এখানকার সমস্ত জাতীয়তাবাদীদের হত্যা করে সমগ্র পোল্যান্ড কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করে গেল।

পশ্চিমি জোট কিংবা সোভিয়েত পক্ষ, কেউই তাদের বিশেষ স্বার্থসম্পন্ন মনোভাবের কথা এ পর্যন্ত স্বীকার করেনি। কিন্তু পোল্যান্ডের তরুণ সমাজ ওয়ারশ অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার এইরকম ভাবেই ব্যাখ্যা করে।

সকালবেলা আকুমল ও শিল্পী জাসেক আমাদের সঙ্গী। জাসেক আমাদের নিয়ে এল ইতিহাস-মিউজিয়াম দেখাতে। ওয়ারশ-তে এই মিউজিয়ামটি একটি অবশ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। এটি পোল্যান্ডের সমগ্র ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের একটি মূল্যবান সংগ্রহশালা তো বটেই। তা ছাড়া এখানে প্রতিদিন সকালে একটি ফিল্ম শো হয়, তাতে বোঝা যায়, যুদ্ধে এই নগরীর কতখানি ধ্বংস হয়েছিল, এবং আবার কত নিখুঁত সুন্দরভাবে তা গড়ে উঠেছে। সম্প্রতি সরকারের পালা বদলের পর নতুনভাবে

সাজানো হয়েছে মিউজিয়ামটিকে। জাসেক মাঝে মাঝেই দেওয়ালের দু-একটি ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগল, এই ছবি আগে ছিল না। আগের সরকার টাঙাতে দিত না। তার মধ্যে কোনও কোনওটি নিরীহ ঐতিহাসিক যুদ্ধের আঁকা ছবি। তার মধ্যে নগ্নতা, অশ্লীলতা বা বিমূর্ততা কিছুই নেই। আমি সেরকম একটা ছবি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, এই ছবিটার কী দোষ ছিল? এটা টাঙাতে দিত না কেন? পুরোনো ঐতিহাসিক ছবি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক সরকারের কী আপত্তি থাকতে পারে?

জাসেক হাসতে-হাসতে বলল, এটা কোন যুদ্ধের ছবি জানো? চারশো বছর আগে রাজা প্রথম সিগিসমুণ্ডের আমলে পোলান্ড খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেই সময়ে আমাদের রেনেশাঁস আসে। প্রথম সিগিসমুণ্ডের নেতৃত্বে পোল্যান্ড আর লিথুয়ানিয়া এক হয়ে যায়, আমাদের সামরিক বাহিনী রাশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিহত করে। এটা সেই যুদ্ধের ছবি। এটা টাঙাতে দেওয়া হয়নি, কারণ এখনকার রাশিয়ানরা এবং মস্কোপন্থীরা মনে করত, কোনও কালে, এমনকি সুদূর অতীতেও পোল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘর্ষ হয়েছিল, তা দেখানো উচিত নয়। তা হলে সোভিয়েত পোল্যান্ড মৈত্রী নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আসলে পোল্যান্ডের মানুষ যে কখনও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সেটাই ও ব্যাটারা দেখাতে চাইত না।

আমি স্তম্ভিত। সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য ইতিহাসের এমন বিকৃতি কিংবা ইতিহাস এমনভাবে মুছে ফেলার চেষ্টারও যে প্রয়োজন আছে, তা কখনও শুনিনি। মার্কস কিংবা লেনিন কখনও এরকম কথা বলেছেন? নিশ্চিত কিছু মাথামোটা লোক এরকম নীতি নির্ধারণ করেছিল। এরাই সেনসারশীপ চাপাতে চাপাতে ক্রমশ একটা কুৎসিত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। বই ছাপার আগেই সেনসরশিপ, সিনেমা তোলার আগেই সেনসরশিপ। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে শুধু প্রচার আর প্রচার। শিল্পগুণহীন একঘেয়ে প্রচারে মানুষ যে অনেক ভালো জিনিস সম্পর্কেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তা এইসব নীতি নির্ধারকরা বোঝে না। দেশের সব মানুষ কি শিশু যে একই কথা বারবার বোঝাতে হবে তাদের? একই ধরনের সাহিত্য, একই ধরনের ছবি কিংবা গান দেওয়া হবে! সোভিয়েত ইউনিয়নের কত ভালো দিক আছে, কিন্তু এখানে অতিরিক্ত সোভিয়েত পক্ষপাতিত্বে অনেক মানুষ সে দেশ সম্পর্কে বিরূপ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা পোলান্ডের ওপর কত অত্যাচার করেছে তা আমরা জানি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এসেছিল পরিত্রাতা হিসেবে। কিন্তু জাসেক এবং আরও অনেকের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, নাতসি বাহিনী এবং সোভিয়েত বাহিনীর ওপর এদের সমান রাগ রয়ে গেছে। জাসেক বলল, তার দুই দাদু, মায়ের বাবা এবং বাবার বাবা, দুজনেই গত মহাযুদ্ধে মারা গেছে, একজন রাশিয়ান কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে, অন্যজন জার্মানদের। ওয়ারশ অভ্যুত্থানের সময় নাতসী বাহিনী আড়াই লক্ষ নাগরিককে হত্যা করেছে তা যেমন ক্ষমার অযোগ্য, তেমনি কমিউনিস্ট নয় বলেই তাদের সাহায্যের জন্য সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে আসেনি, এটাও এরা ভুলতে পারে না।

স্টালিন আমলের দর্পের প্রতীক হয়ে আছে ওয়ারশ শহরের মাঝখানে একটা তিরিশতলা বাড়ি। পোলান্ডের প্রতি এটা জোসেফ স্টালিনের উপহার, এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্যালেস অফ কালচার'। মস্কো শহরে হোটেল ইউক্রাইন আমি দেখেছি, হুবহু তারই অনুরূপ এই বিশাল বাড়িটি ওয়ারশ শহরের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ও খুবই দৃষ্টিকটু দেখায়। একটা শহরের গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হল কি না তা তোয়াক্কা না করে, এ যেন এক রাজা তাঁর ইচ্ছে মতন একখানা বাড়ি চাপিয়ে দিয়েছেন। বাড়িটি দেখলে জোর জবরদস্তি করে কালচার চাপিয়ে দেওয়ার কথাও মনে হয়। যে-কোনও টুরিস্টের চোখেও বাড়িটি বিসদৃশ লাগে, ওয়ারশ নাগরিকরা এর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। জাসেক-এর মতে এই বাড়িটি এখন ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা উচিত। আমরা বলি, এত বড় একটা বাড়ি ভেঙে নষ্ট করবে কেন, হোটেল-টোটেল বানালেই তো হয়। জাসেক-

এর মতন অনেকেই ওই দর্পের আর কোনও চিহ্ন রাখতে চায় না।

এ বাড়িটি নিয়ে অনেক রসিকতা চালু আছে তার মধ্যে একটা এরকম :

বলতে পারো কোন জায়গা থেকে ওয়ারশ শহরের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়?

হ্যাঁ পারি। এই প্যালেস অফ কালচারের ছাদ থেকে।

কেন? কেন?

কারণ এই একমাত্র জায়গা থেকেই এ বাড়িটা দেখা যায় না।

এই শহরে যাতায়াতের পথে আর একটি বড় বাড়িও চোখে পড়বেই। এটার নাম 'পার্টি হাউজ'। কিছুদিন আগেও এটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর। এতবড় বাড়িটিকে পার্টির বিলাসিতার চিহ্ন প্রকট। বাড়িটা এখন খাঁ খাঁ করছে। পোলান্ডে এখন কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব নেই, সুতরাং বাড়িটার দাবিদারও কেউ নেই, কেউ আর এখানে ঢোকে না। এখন কী হবে এই বাড়ি নিয়ে? শোনা যাচ্ছে সরকার থেকে কোনও ব্যাংককে ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে।

আগের আমলে সরকারি প্রচারযন্ত্র কত নির্লজ্জ অবস্থায় পৌঁছেছিল, তার একটি কাহিনী শুনলাম প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জানুসির বাড়িতে গিয়ে। জানুসি এখানে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পোলান্ডের চলচ্চিত্র বিশেষ উন্নত, আমরা আন্দ্রে ওয়াইদার ভক্ত অনেকদিন থেকেই। এখন ওয়াইদা'র পাশাপাশি জানুসির স্থান। শিল্পী জাসেক-এর মতে, ওয়াইদা'র চলচ্চিত্রকে যদি কনসার্টের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে জানুসির ছবিগুলিকে বলা যেতে পারে চেম্বার মিউজিক।

জানুসি যেখানে থাকেন, সেটা মনে হয় ওয়ারশ'র অভিজাত পাড়া। নিরিবিলি রাস্তা, সুন্দর সুন্দর বাড়ি, রাস্তার মোড়ে মোড়ে আগেকার দিনের গ্যাসের আলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আকুমলের সঙ্গে জানুসির বিশেষ বন্ধুত্ব, আমার সঙ্গেও তাঁর আগে পরিচয় হয়েছে, সেই সুবাদে আমরা তাঁর বাড়িতে এক সন্ধেবেলা চায়ের নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম।

জানুসির সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ সময় কাটালেই বেশ একটা মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিভাবান মানুষটির ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রাখর্য অনুভব করা যায় অবিলম্বে, তবু তাঁর ব্যবহারে রয়েছে বিনীত ভদ্রতা। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে তিনি তাঁদের ছবি তুলে রাখেন, একটা বড় খাতায় অতিথিদের নাম ঠিকানা ও কিছু একটা বক্তব্য লিখে দিতে অনুরোধ করেন। এই ভাবে তাঁর অনেক খাতা জমেছে। তিনি নিজে পৃথিবীর যত দেশে গেছেন, যত মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে, সেইসব জায়গা ও মানুষজনের ছবি তিনি সেঁটে রাখেন আলাদা একটি অ্যালবামে। সেই অ্যালবামটা খুলে তিনি কলকাতা ও আমার ফ্ল্যাটের ছবি দেখিয়ে চমকে দিলেন। জানুসি বললেন, অনেক বই পড়ার মতন, মাঝে মাঝে এই খাতা ও অ্যালবামের পাতা উলটে স্মৃতি-রোমন্থন করাও বেশ আনন্দদায়ক।

জানুসির বাড়িটি যথেষ্ট বড়। তিনি আর একটা ছ'খানা ঘরওয়ালা বাড়ি বানাচ্ছেন, সেই পুরো বাড়িটাই হবে অতিথিশালা। যে-কোনও সময় সেখানে বারোজন অতিথি থাকতে পারবে। অতিথি আপ্যায়ন করা তাঁর বিশেষ শখ। তাঁর মতে, হোটেলে কিংবা কনফারেন্স রুমে মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঠিক মতন জমে না, বাড়িতে এসে কেউ থাকলে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হতে পারে। কতরকম অতিথি যে তার বাড়িতে এসে থেকে যায় তার ইয়ত্তা নেই! (তিনি আমাদেরও থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।) এই সন্ধেবেলা মস্কো থেকে তাঁর কয়েকজন অতিথি আসবার কথা। কিছুদিন আগে জানুসি মস্কো গিয়েছিলেন, তখন এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পোল্যান্ডের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের কাহিনি মস্কোতে অনেকটা বিকৃতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, সেইজন্য ট্যাক্সি ড্রাইভারটি জানুসিকে হঠাৎ বলেছিল, পোল্যান্ডের লোকেরা অকৃতজ্ঞ। একথা শুনে জানুসি রাগ করেননি, তিনি বলেছিলেন, পোল্যান্ডের অবস্থা নিজের চোখে দেখলে তুমি সব বুঝতে পারবে, তুমি

ওয়ারশ-তে চলে এসো, আমার বাড়িতে থাকবে। তোমার কোনও খরচ লাগবে না। লোকটি এই প্রস্তাবে হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিল, বিনা পয়সায় ওয়ারশ ঘুরে আসতে পারব? তা হলে আমার স্ত্রীকে...। জানুসি বললেন, তাঁকেও নিয়ে এসো। লোকটি বলল, আমার তিনটি ছেলেমেয়ে...। জানুসি বললেন, তাদেরও। এমনকি তোমার যদি শাশুড়ি থাকেন...

আজ সন্ধেবেলা সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারের সপরিবারে পৌঁছবার কথা।

খানিকক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর জানুসি জানতে চাইলেন, আপনারা কী খাবেন, বলুন! চা, কফি, হুইস্কি, রেড ওয়াইন, হোয়াইট ওয়াইন?

আমি বললাম, কফি, দুধ চিনি ছাড়া।

জানুসি হেসে বললেন, দুধ অবশ্য চাইলেও দিতে পারতাম না। দুধ কোথায় পাব?

জানুসির মতন সচ্ছল ব্যক্তির বাড়িতেও দুধ নেই, এতে বোঝা যায়, ওয়ারশ-তে দুধের অভাব কত প্রকট।

কয়েকদিন আগে বাইরে কোথাও শুটিং করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, জানুসির পায়ে বেশ চোট লেগেছে, তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার কথা, তবু তিনি একটা লাঠি হাতে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে তার বাড়ির নানান ছবি দেখিয়ে, নিয়ে এলেন চায়ের টেবিলে। চা-কফির সঙ্গে নানারকম নোনতা মিষ্টি খাবারও রয়েছে। এ বাড়িতে থাকেন জানুসি, তাঁর স্ত্রী ও মা। কয়েকজন অন্য অতিথিও রয়েছেন। খাবার টেবিলে অনেক গল্প হতে লাগল, তার মধ্যে জানুসির দাড়ির গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কোনও কারণে আমি দাড়ির প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, জানুসি তাঁর গালের অল্প অল্প দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, এই দাড়ি আমি কবে থেকে রাখতে শুরু করেছি, শুনবেন? এই দাড়ির সঙ্গে আমাদের বিপ্লবের সম্পর্ক আছে।

জানুসি সলিডারিটির সক্রিয় সমর্থক ছিলেন তা জানি। পূর্বতন সরকার পরিবর্তনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। নতুন সরকার গঠনের সময় জানুসির মন্ত্রিত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি রাজি হননি। কিন্তু তার সঙ্গে দাড়ির সম্পর্ক?

গত কয়েক দশক ধরে পোল্যান্ডের প্রচার ব্যবস্থা অতি বিশ্রী অবস্থায় পৌঁছেছিল। রেডিও, টিভিতে শুধু সরকারি প্রচার। বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা কেউ রেডিও টিভির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত না। টিভির খবরে এত বেশি মিথ্যে কথা থাকত যে কেউ তো শুনতোই না, ওই সময় টিভি বন্ধ করে অনেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসত, যাতে প্রতিবেশীরা বোঝে যে টিভির খবর বয়কট করা হয়েছে।

এইরকম একটা সময়ে জানুসি ফিল্মের কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকতে থাকতেই তিনি কানাঘুষো শুনলেন যে ফেরার সময় তিনি যখন প্লেন থেকে নামবেন, তখন টিভি ক্যামেরায় তাঁর ছবি তোলা হবে। তাঁর অনেক পুরোনো যে-সব সাক্ষাৎকার ছিল তার থেকে কিছু কিছু ক্লিপিং বাছাই করে, প্লেন থেকে নামার ছবির সঙ্গে জুড়ে টিভিতে প্রচার করা হবে যে জানুসি বিদেশ থেকে ফিরে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

সরকারি প্রচারযন্ত্রে এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার জন্য জানুসি বিদেশে বসেই দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলেন। এক মুখ দাড়ি নিয়ে যখন ফিরলেন, তখন তাঁর সেই মুখের সঙ্গে আগের কোনও ছবিই মিলবে না। পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে গেলে তখনকার প্রচারমন্ত্রী জানুসিকে একদিন ডেকে জিগ্যেস করলেন, টিভিতে অংশগ্রহণ করতে তোমার এত আপত্তি কেন? জানুসি উত্তর দিলেন, তোমরা একটাও সত্যি কথা বলতে দাও না, সেইজন্যই আপত্তি? মার্শাল ল' তুলে নাও, সেনসরশিপ তুলে নাও, আমাদের সত্যি কথা বলতে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করব। প্রধানমন্ত্রী তখন মৃদু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বললেন, ঠিক আছে, দাড়ি যখন রেখেছ, তোমার পাশপোর্টের ছবি বদলে এই দাড়িওয়ালা মুখের ছবি বসাতে হবে। তুমি আর দাড়ি কামাতে পারবে না। ভুল করেও যদি দাড়ি

কামিয়ে ফেলো, তারপর দেশের বাইরে যেতে গেলে তোমাকে আটকানো হবে।

কাহিনিটি শেষ করে জানুসি হাসতে-হাসতে বললেন, এখন অবশ্য আর কোনও অসুবিধে নেই। এখন দাড়ি কামিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু এই দাড়ির ওপর মায়া পড়ে গেছে!

এরপর আমাদের একটা ব্যালে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল বলে আর বেশিক্ষণ গল্প করা গেল না।

কিন্তু আর একটা ঘটনারও উল্লেখ করা দরকার। আমাদের দলটিতে ওম চৌহান নামে আর এক ভারতীয় ছিলেন। ইনি একজন লন্ডন-প্রবাসী ব্যবসায়ী, আকুমলের পূর্ব পরিচিত। বেশ ধনী ব্যক্তি। পোল্যান্ড এখন পশ্চিম দুনিয়ার দিকে ব্যাবসা-বাণিজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছে, সেইজন্য শ্রীযুক্ত চৌহান লন্ডন থেকে এসেছেন ওয়ারশ-তে তাঁর ব্যবসায় কোনও শাখা খোলা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে। এমনকি স্বল্পভাষী ভদ্রলোক, কিছু কিছু বাংলা জানেন, কারণ অল্পবয়েসে কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন। জানুসির বাড়িতে পৌঁছবার পর আলাপ-পরিচয় পর্বের সময় জানুসি বাদল বসুর পরিচয় জানলেন, তারপর চৌহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিও কি কলকাতার? আপনার সঙ্গে কি আমার দেখা হয়েছিল? শ্রীযুক্ত চৌহান তক্ষুনি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপর বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, আপনি আমাকে চেনেন না, তাই না? আপনার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি? বেশ ভালো কথা!

শ্রীযুক্ত চৌহানের কথার এরকম তীব্রতায় আমরা চমকে উঠলাম। জানুসি বিব্রতভাবে আকুমলের দিকে তাকালেন। আকুমলও লজ্জা পেয়ে বলল, ওম চৌহানের সঙ্গে আপনার লন্ডনে একবার দেখা হয়েছিল, আরও অনেক লোক ছিল তাই আপনার মনে নেই, আমরা একসঙ্গে ডিনার খেয়েছিলাম, উনি কিছু সাহায্য করেছিলেন।

ওম চৌহান আরও উগ্রভাবে বললেন, আপনারা বিখ্যাত লোক, তাই ইচ্ছে মতন অন্যদের ভুলে যেতে পারেন, আমি সেই সময় পাঁচ হাজার পাউন্ডের ওষুধ দান করেছিলাম, পাঁচ হাজার পাউন্ড, তাও আপনার মনে নেই নিশ্চয়ই।

জানুসি বারবার বলতে লাগলেন, অবশ্যই, অবশ্যই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমায় ক্ষমা করবেন।

ওম চৌহান আবার বললেন, পাঁচ হাজার পাউন্ড দান করেছি, কম নয়, আপনার মনে রাখা উচিত ছিল...

জানুসি আমাদের দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বললেন, আমারই দোষ, পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরতে হয়, অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, সব মুখ মনে না রাখতে পারাটা আমার অন্যায়।

জানুসির প্রতি এরকম আক্রমণে আমরা মর্মাহত বোধ করছিলাম। এরকম ভুল তো হতেই পারে, আমাদের সকলেরই হয়। পোল্যান্ডের যখন খুবই দুঃসময় চলছিল, তখন জানুসি বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও ওষুধপত্র সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় আকুমলের দৌত্যে লন্ডনের ব্যবসায়ী চৌহান কিছু ওষুধ দান করেছিলেন, তাঁর ওষুধের ব্যাবসা। পাঁচ হাজার পাউন্ডের ওষুধ তিনি জানুসিকে দান করেননি। করেছিলেন পোল্যান্ডের মানুষকে। তবু সেই দানের কথা তিনি এতবার উল্লেখ করতে লাগলেন যে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যেতে লাগল। দান তাকেই বলে, যার বিনিময়ে কোনও প্রত্যাশা থাকে না। তিনিই প্রকৃত দাতা, যিনি আত্মগোপন করে দান করেন। এইরকমই আমাদের ধারণা। সেসব ধারণা কবে চুকে বুকে গেছে। এখন লোকে দান করে আত্মপ্রচার কিংবা ইনকাম ট্যাক্স বাঁচাবার জন্য। বুদ্ধ-গান্ধির দেশের মানুষ নাকি শান্তিপ্রিয় জাতি, আজ সারা ভারত জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখলে তা কে বলবে? ভারতীয়দের কি ভদ্রতা ও সৌজন্যর খ্যাতি ছিল? আজ আর তা বোঝার উপায় নেই।

আকুমল আমাদের জন্য গ্র্যান্ড থিয়েটারে একটি ব্যালের টিকিট কেটে রেখেছিল। এসব টিকিট

যেমন দামি, তেমনই দুষ্প্রাপ্য। ওম চৌহানদের মতন মানুষদের ঠিক বিপরীত চরিত্র আকুমল। যত উপার্জন তার চেয়েও বেশি ব্যয় করাই যেন আকুমলের ব্রত। অন্যদের জন্য খরচের কোনও প্রসঙ্গই সে তুলতে দেয় না। সকলের পীড়াপীড়িতে তার একটাই উত্তর। আমার পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমি চাইব।

আকুমল বিভিন্ন শিল্পীকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। আপাতত সে পোল্যান্ডের তরুণ শিল্পীদের লন্ডনে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার চেষ্টায় মেতে আছে। পোল্যান্ডে যে যাওয়া-আসা করছে বহুবার, এ দেশের অনেক কিছু সম্পর্কেই সে উচ্ছ্বসিত। ওয়ারশ শহরটিকে সে এত ভালোবেসে ফেলেছে যে তার মতে এ শহর প্যারিসের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না অবশ্য। প্যারিসের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও শহরেরই তুলনা চলে না। এমনকি বুডাপেস্ট নগরও দৃশ্যত ওয়ার'শর চেয়ে রূপবান। তবে, ওয়ারশ'রও এক ধরনের সাদামাটা সৌন্দর্য আছে। কোপারনিকাস ও সপ্যাঁর এই শহর, বিজ্ঞান-সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র নিয়ে অতি জীবন্ত।

আকুমলের মতে, এখানকার গ্র্যান্ড থিয়েটারও বিশ্বে অতুলনীয়। এটাও ঠিক মেনে নেওয়া যায় না, এর চেয়ে আরও বড়, আরও সুসজ্জিত থিয়েটার হল আমরা দেখেছি। পূর্ব ইউরোপে এমন থিয়েটার হল আর নেই শুনেছি। আমাদের ভারতে নেই, জাপানের কথা জানি না, এশিয়ার অন্য কোনও দেশেও নেই। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বিশাল, জাঁকজমকপূর্ণ থিয়েটার হলটিও জার্মানরা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল, পোল্যান্ডের মানুষ অবিকল আগের মতন গড়ে তুলেছে।

ব্যালে বলতেই আমাদের মনে পড়ে ধপধপে সাদা পোশাক পরা, পুতুল-পুতুল নারী-পুরুষদের রূপকথা আশ্রয়ী নাচ, সমগ্র মঞ্চের দৃশ্যটা স্বপ্নের মতন। এটা কিন্তু তা নয়, এই ব্যালেটির নাম 'ফাউস্ট গোজ রক', একেবারে অত্যাধুনিক, পাত্র-পাত্রীদের সাজ-পোশাক নানা রঙে উদ্ভট, ব্যাক ড্রপে কখনও আগুন জ্বলে উঠছে, কখনও ধোঁয়ায় সব কিছু ঢেকে যাচ্ছে। সঙ্গীত একেবারে হার্ড রক। কাহিনির পারম্পর্য রক্ষার কোনও চেষ্টাই নেই। পালাটি পুরোপুরি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্। বছর কয়েক আগে এখানে এরকম প্রোডাকশান সম্ভব ছিল না। সোসালিস্ট রিয়েলিজম-এর সঙ্গে অ্যাবস্ট্র্যাকশানের কেন যেন একটা বিরোধ ছিল। কিন্তু সব শিল্পই অ্যাবস্ট্র্যাকশানে যেতে চায়। এই যে এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যালেটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, মার্কসীয় নীতিবাগীশরা কেন একে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করত, তা আমি বুঝতে পারি না। এখন কয়েক হাজার মানুষ গভীর মনোনিবেশে দেখছে, এতে কার কী ক্ষতি হচ্ছে? এর বদলে একটা প্রচারমূলক, স্লোগানমুখর অনুষ্ঠান দেখলেই বা কী উপকার হত?

অনেক রাত্তিরে, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। ওয়ারশ শহরে গুণ্ডামি ডাকাতির মতন উপদ্রব বিশেষ নেই, তবে চুরি হয়, গাড়ি বেশ চুরি হয়, চোর বিষয়ে সাবধানতা দেখেছি। এত রাত্রেও রেস্তোরাঁটি জমজমাট। অনেক রকম খাদ্যই পাওয়া যায়। আমি নতুন খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা করি। বাদল পছন্দমতন একটা বড় মাছ পেয়ে গেল, খুব সুস্বাদু। আকুমল নিরামিষাশী, তার জন্য কোনও পদই নেই। কিন্তু আকুমল ছাড়বার পাত্র নয়, অতি ব্যস্ত ম্যানেজার-মহিলাকে ডেকে সে নিরামিষ খাদ্যের মাহাত্ম্য বোঝাতে লাগল, শেষ পর্যন্ত একজন রাঁধুনীকে ডেকে আকুমল বিশেষ নিরামিষ রান্নার প্রণালী বর্ণনা করার পর সেইরকমই খাবার রান্না হয়ে এল তার জন্য। ম্যানেজার জানাল যে, এখন থেকে এই পদটি তাদের রেস্তোরাঁর মিনিউতে স্থান পাবে, এর নাম হবে ইন্ডিয়ান ভেজিটেরিয়ান আকুমল!

একটু দূরে কয়েকটা টেবিল জুড়ে বসেছে একটা বিয়ের পার্টি। সুন্দরী পরির মতন সাজপোশাক করা কনেটি চুমু খাচ্ছে অনেকের গালে। এক সময় তারা একটা গান গেয়ে উঠল, অন্যান্য টেবিল থেকে অনেকে গলা মেলাল।

শিল্পী জাসেকও সেই গান গাইতে-গাইতে বলল, আগেকার সঙ্গে এখনকার কী তফাত জানো? এরকম একটা খোলামেলা পরিবেশের অভাব ছিল। মার্শাল ল' জারি থাকলে সব সময়েই মানুষ গম্ভীর, থমথমে হয়ে থাকে। গলা খুলে হাসতে কিংবা গান গাইতেও লজ্জা পায়। কিন্তু ইচ্ছে মতন চলাফেরার স্বাধীনতা থাকবে না, ইচ্ছেমতন হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকির স্বাধীনতা থাকবে না, এরকম পরিবেশ মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না।

॥ ১৪ ॥

শ্রীমতী এলজবিয়েটা ভালটারোভা'র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতাতেই। এই তরুণীটি বাংলা সাহিত্য ও ভারততত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। মাঝখানে একদিন কলকাতায় এসে অতি শিশুকন্যা ও স্বামীকে নিয়ে আমার বাড়িতে এক সন্ধ্যায় বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। সে প্রায় বছর দশেক আগের কথা, তবু মনে আছে এই জন্য যে পোল্যান্ডের এই তরুণীটি বাংলা শব্দগুলি উচ্চারণ করছিলেন খুব সযত্নে এবং তাঁর পরনে ছিল একটা আগুন-লালবর্ণ শাড়ি। দেশে ফিরে এলজবিয়েটা আমাকে দু-তিনবার চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আর যোগাযোগ রাখিনি, এখানে আসার আগে তাঁকে কোনও খবরও দিইনি, কারণ, এই ধরনের সুচারু কাজকর্ম করা আমার স্বভাবে নেই। ওয়ারশ পৌঁছবার দ্বিতীয় দিনে আকুমল যখন বলল আজ রাত্তিরে অধ্যাপিকা এলজবিয়েটা ভালটারোভার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন, তখন আমি চমকে উঠলাম। আকুমল আরও বলল, উনি আপনাকে চেনেন, আপনি আসছেন এই খবর আমার মুখে শুনে তিনি আজ সন্ধেটি বুক করেছেন। যেতে হবেই। আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম।

উপহার হিসেবে কিছু ফুল নিয়ে যাওয়ার জন্য আকুমল আমাদের নিয়ে গেল একটা দোকানে। রুমানিয়াতে যেমন সর্বত্র সব দোকানের সামনে লাইন দেখেছি, ওয়ারশতে সে রকম চোখে পড়ে না। এখানে খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রকট নয়। কিন্তু ফুলের দোকানে লাইন। নিছক ফুল নয়, ফুলকে সাজাবার কায়দা পোল্যান্ডে একটি উচ্চাঙ্গের আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এমনভাবে এই সব দোকানে বিভিন্ন রঙের ফুলের গুচ্ছ বেঁধে দেয়, মনে হয় যেন ছবি। ফুল উপহার দেওয়া এখানে আত্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। সোভিয়েত ইউনিয়নেও এমন দেখেছি। আমেরিকাতে ফুলের এত কদর নেই, প্রাচ্য দেশেও তেমন নেই। আমাদের দেশে মৃতদেহের ওপর ফুলের স্তূপের অপচয় দেখলে গা জ্বালা করে।

যেতে হবে বেশ দূরে। আকুমল আগে থেকে একটি ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছিল। আকুমল এ দেশে অনেকবার এসেছে, ট্যাক্সি ড্রাইভারটি তার পূর্ব পরিচিত, বন্ধু পর্যায়ের। তাঁর নাম ইভান, তিনি একজন ভূতপূর্ব মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তাঁর স্ত্রী একজন সাইকোলজিস্ট। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের এমন বিদ্যাবত্তার পরিচয় জেনে কিন্তু আমার মনে শ্রদ্ধা জাগে না, বরং বিরক্ত বোধ করি, শিক্ষার এই অপচয় আমার সহ্য হয় না। হাঙ্গেরিতেও এমন দেখেছি। বেশি টাকা রোজগারের জন্যই এঁরা নিজেদের পেশা ছেড়ে ট্যাক্সি চালাচ্ছেন তা বুঝি। কিন্তু একটা দেশের শাসনব্যবস্থা কেন এমন হবে, যাতে যারা উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, তারা তা প্রয়োগ করতে পারবে না?

ছোটোর মধ্যেও এলজবিয়েটার ফ্ল্যাটটি বেশ ছিমছাম সুন্দর। এলজবিয়েটার স্বামী একজন শিল্পী, মাটি দিয়ে তিনি এক ধরনের ভাস্কর্য নির্মাণ করছেন, যা একেবারে নতুন ধরনের। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় এক বাঙালি শিল্পীর কাছে তিনি মাটির কাজ শিখেছিলেন, তার সঙ্গে নিজস্ব রীতিতে তিনি খুব চমৎকার একটা ধারা তৈরি করেছেন। এই বিভিন্ন মৃত্তিকা-ভাস্কর্য দিয়ে ঘরগুলি সাজানো বলে অন্যরকম একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এলজ্‌বিয়েটার বয়েস বেশি নয়, যখন তিনি বাংলা বলেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরটি একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতন শোনায়। তিনি সত্যজিৎ রায়ের বই পোলিশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন, এখন করছেন মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে'। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলের অন্ত নেই। যে-হেতু বইপত্র বেশি পান না, তাই তিনি আমাকে নানান প্রশ্ন করছিলেন। এখানে যে-কোনও আলোচনায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালা-বদলের প্রসঙ্গ আসবেই। অন্যরা সেই আলোচনায় মেতে ওঠে। এলজ্‌বিয়েটার রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ নেই, শুধু দু-একবার বললেন, ওঃ, যা সব দিন গেছে না! সব চুকেবুকে গেছে, বেঁচেছি। এখন প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিতে পারছি, এইটাই বড় কথা। এখন ইচ্ছে মতন কাজ করতে পারব।

এদিককার বিভিন্ন দেশে এ রকম কথা অনেকবার শুনতে হয়েছে। যতবার শুনি, আমার একটু একটু মন খারাপ লাগে। সাম্যবাদ বা সমাজবাদ, যার প্রতিশ্রুতি ছিল সমস্ত মানুষের ঐক্য এবং সমান অধিকার, সেখানেও কেন সামান্য কিছু লোক গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষকে প্রায় একটা বন্দিদশায় রেখেছিল, কেন একটা দম বন্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল? এই আদর্শ-বিচ্যুতির মূল কোথায়? মানুষের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যে?

পরদিন আমরা দেখতে গেলাম ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারততত্ত্ব বিভাগ। এখানে হিন্দি ও বাংলার ক্লাস হয়। ভারততত্ত্ব বিভাগের প্রধান হলেন অধ্যাপক বিরস্কি, যিনি অবিলম্বেই দিল্লিতে পোল্যান্ডের দূতাবাসের কালচারাল ফার্স্ট সেক্রেটারি হয়ে যাচ্ছেন। এলজ্‌বিয়েটা বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা, নানা কলেজের অনেকগুলি ছাত্র-ছাত্রী। আমরা ক্লাসরুমে গিয়ে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বসে আলাপ-পরিচয়, সাহিত্য বিষয়ে প্রশ্নোত্তর, কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলাম। এমন নির্মল আনন্দ বহুদিন পাইনি। এতদূর বিদেশে বাংলা ভাষা সম্পর্কে এত মানুষের আগ্রহ দেখলে আমাদের তো আনন্দ হবেই। আমার মাঝে-মাঝে বুখারেস্টের অমিতা বসুর কথা মনে পড়ছিল। সেখানে বাংলা-হিন্দির রেষারেষিতে দুটি বিভাগই উঠে গেল। এখানে সে রকম কোনও পরিবেশ নেই। পোল্যান্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী।

অনেককাল আগে আমি হিরন্ময় ঘোষাল নামে একজন লেখকের 'কুল্‌টুর কাম্‌প্‌ফ' নামে একটি বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। হিটলারের রচনা 'মাইন কাম্‌ফ্‌প্‌'-এর ঠাট্টায় বইটির নাম, অর্থাৎ 'সাংস্কৃতিক লড়াই', আসলে সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতিকথা। ভাষা চমৎকার, দারুণ লেখা। সে বই এখন আর বোধহয় পাওয়া যায় না। বইটা পড়ে আমি শুধু জানতাম যে হিরন্ময় ঘোষাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পোল্যান্ডে চাকরি করতেন, যুদ্ধের ডামাডোলে তাঁকে পালাতে হয়। এখানে এসে জানলাম, তিনিই ওয়ারশ বিদ্যালয়ে প্রথম বাংলা বিভাগ চালু করেন, তাঁর স্মৃতিতে অফিস-কক্ষটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ঘোষাল রুম।'

পোল্যান্ডের আর একজন লেখকও আমার বন্ধু। তাঁর নাম ক্রিস্তফ জারজেস্কি। ইনি ঠিক লেখক নন, অনুবাদক। এক সময় আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্রিস্তফ আর আমি শুধু সতীর্থ নয়, ছিলাম একই বাড়িতে প্রতিবেশী। আমার বান্ধবী মার্গারিটের সঙ্গে ক্রিস্তফেরও বন্ধুত্ব ছিল, ক্রিস্তফের ঘরে আমরা অনেক আড্ডা দিয়েছি। এখানে খোঁজ করে জানলাম, ক্রিস্তফ শহরে নেই, সে আমেরিকা চলে গেছে। সেখানেই সে থাকবে। আমেরিকার মোহিনী মায়া কতজনকে যে টানে। পোল্যান্ডে এসে অবশ্য ডলার-লোভীদের ফিসফিসানি তেমন শুনতে পাইনি পথেঘাটে। অথচ আগেকার ভ্রমণকারীরা সকলেই 'ডলার, ডলার, চেইঞ্জ মানি!' এই ফিসফিসানি ও দালালদের উৎপাতের কথা লিখে গেছেন। এখন তা বন্ধ দেখে প্রথম একটু অবাক হয়েছিলাম, পরে জানলাম, নতুন সরকার ব্ল্যাক মার্কেট রেটটাকেই মেনে নিয়ে বাস্তব অবস্থার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এখন ব্যাঙ্ক থেকেই ডলার ভাঙিয়ে অনেক বেশি জ্লোটি পাওয়া যায়। কিছু কিছু দালাল এখনও রাস্তায় ঘোরাফেরা করে, বোধহয় পুরোনো অভ্যেসবশত, কিন্তু তাদের কেউ আর পাত্তা দেয় না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ মোটামুটি একই রকম। কৃষির বদলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের দিকে অত্যধিক ঝোঁক, বিশ্বের বাজারে সেগুলি রফতানি করতে গিয়ে অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে সব সময় পাল্লা দিতে পারেনি। পশ্চিমের বাজারে চাহিদা কমে গেলে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কল-কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্য ঋণ নিতে হয়েছে বৈদেশিক ব্যাংক থেকে, পোলন্ডে এক সময় এই ঋণের বোঝা দাঁড়িয়েছিল সাতাশ বিলিয়ান ডলার। তখন সেই ঋণ শোধ দেওয়ার জন্য দেশের খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য বিক্রি করতে হয়েছে বাইরে, তার ফলে দেশের মানুষের পেটে টান পড়েছে। টাকার অভাবে কল-কারখানাগুলির আধুনিকীকরণও হয়নি, তাতে সেগুলি রুগ্ন হয়ে পড়েছে একে একে। জীবনযাত্রার মান নেমে যাওয়ায় ক্ষোভ জমেছে মানুষের মনে। এরই মধ্যে শ্রমিকদের মধ্য থেকে সলিডারিটির উত্থান হওয়ায় তা সর্বশ্রেণির মানুষের সমর্থন পায়।

শাসকদল বদলের পর পোল্যান্ডের মানুষ যেন অনেককাল পরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। এর মূলে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি অবিশ্বাস রয়েছে তা হয়তো নয়। মূল কারণ বোধহয় তীব্র স্বাজাত্যাভিমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের তাঁবেদারি থেকে মুক্তিই যেন বড় কথা। পৃথিবীর সর্বত্রই এরকম একটা মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী আর মিলিত হয়ে থাকতে চাইছে না, বড় দেশগুলি টুকরো টুকরো হতে চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা, যেমন আমাদের ভারতেও। যুক্তি থাক বা না থাক, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মানুষই যেন নিজস্ব বালিস্থান চায়। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব নিছক আজগুবি ধারণা?

এই স্বাধীনতাবোধের মধ্যে এমনই জাদু আছে, যা কিছুদিনের জন্য অনেক অভাব-অভিযোগও ভুলিয়ে দেয়। পোল্যান্ডের অনেক কিছুর অভাব আছে, ভবিষ্যতে অর্থনীতি কীভাবে চাঙ্গা হবে তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে, কিন্তু বর্তমানের অনটন সবাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে, কারুর মুখে বিরক্ত ভাব নেই, যেমন দেখেছি, রুমানিয়ায়। ওয়ারশ'র জীবনযাত্রা অনেকটাই স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল। ক্ষমতা বদলের সময় এখানে রক্তপাত হয়নি, তাই আর যখন-তখন হিংসা কিংবা অস্ত্র উঁকি দেয় না।

আকুমলের সঙ্গে আমাদের রোজ কোপারনিকাসের মূর্তির পাদদেশে দেখা হয়। তারপর আমরা টো টো করে ঘুরি, দেখা করি বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। একদিন গেলাম চিটেলনিক নামে এক প্রকাশন সংস্থায়। চিটেলনিকের বেশ সুনাম আছে প্রকাশক হিসেবে। আকুমলের লেখা একটি ছোটদের বই এঁরা প্রকাশ করছেন। এই সংস্থার প্রধান জেকফি সিটো'র সঙ্গে আলোচনা হল অনেকক্ষণ। ভারতের অন্যতম মুখ্য প্রকাশক হিসেবে বাদল বসু অনেক তথ্য বিনিময় করলেন তাঁর সঙ্গে। জেকফি সিটো নিজে একজন নাট্যকার, শেকসপিয়রের অনেক নাটক অনুবাদ করেছেন। তিনি সম্প্রতি এই সংস্থার ভার নিয়েছেন, অনেক ধরনের বই প্রকাশের পরিকল্পনা আছে তাঁর। কিন্তু কাগজের অভাবে ছাপা শুরু করা যাচ্ছে না। কাগজের অভাবের জন্যও তিনি খুব ক্ষুব্ধ নন, বললেন, নতুন সরকারি নীতি এখনও ঠিক মতন গড়ে ওঠেনি, তাই এই সময়টা কিছুদিন তো অসুবিধে থাকবেই।

অনেকের মুখেই এরকম কথা শুনি, তবু মনে প্রশ্ন জাগে, এইসব দেশগুলির ভবিষ্যৎ রূপ কী হবে? আপাতত সকলে গণতান্ত্রিক অধিকার, অবাধ ভোট, বিরোধী দল গড়ার স্বাধীনতা পেয়েই খুশি। এরই নাম স্বাধীনতা। কিন্তু গণতন্ত্রে ফিরে এসে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব কিছুই কি বর্জন করা হবে? মানুষের ইতিহাসে গণতন্ত্রের পরবর্তী ধাপই কি সমাজতন্ত্র নয়? সকলের স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার অধিকারের পরেই তো আসে সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবিকার সমান সুযোগ। ইতিহাস কি এক পদক্ষেপ সামনে ফেলে আবার পিছিয়ে আসে?

জানুসির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, একদলীয় শাসনে কিছু কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি ঘটেছে, সাধারণ মানুষের ওপর জোর-জবরদস্তি খাটিয়ে, ব্যক্তি-মানুষকে অগ্রাহ্য করে, শিল্প-সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ রোধ করার জন্য অনেক নিয়ম-কানুন চাপিয়ে

সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যটাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তা হলেও সমাজতন্ত্রের আদর্শটিকে কি ব্যর্থ বলা যায়? ভুল প্রয়োগে কি মূল বিষয়টিকে নস্যাৎ করা চলে? সমাজতন্ত্র নিশ্চয়ই অন্য কোনও রূপ নিয়ে ফিরে আসবে।

জানুসি জিগ্যেস করেছিলেন, কী রূপ?

আমি বলেছিলাম, তা ঠিক জানি না। নিশ্চিত কোনও পরিচ্ছন্ন রূপ। সর্বজনগ্রাহ্য কোনও মানবিক রূপ, সোসালিজম উইথ এ হিউম্যান ফেস।

জানুসি ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন, হিউম্যান ফেস-এর তো নানারকম মুখোশও হয়। চমৎকার সব মুখোশ। আবার সুযোগ দিলেই ওরা মানব দরদীর মুখোশ পরে এসে ক্ষমতা দখল করে যথেচ্ছাচার চালাবে। স্টালিনের আমলে তাকেও তো মহান আদর্শবাদী বলা হত, কিন্তু সেই স্টালিন পাঁচ কোটি মানুষকে হত্যা করিয়েছে।

এইসব দেশে এখন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি তুলনা ও তর্ক-বিতর্ক সব জায়গায় চলছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিদারুণ ক্ষতচিহ্নগুলি এখনও চতুর্দিকে ছড়ানো বলে সবাই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পক্ষে। পরপর এতগুলি দেশ সমাজতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করল, তার কারণ সর্বত্রই এই একই নজির। এক পার্টির শাসনে পার্টি সদস্যরা হয়ে যায় সর্বেসর্বা, তারা অনেকরকম সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, অন্যরা বঞ্চিত হয় হোক। পার্টির উঁচু মহলের কর্তারা আজীবন ক্ষমতা দখল করে থাকে, তাদের নড়ানো যায় না, শ্রমিকরা পায় না কল-কারখানার নীতি নির্ধারণে কোনও ভূমিকা, যুবসমাজ পায় না সমাজ পরিচালনার কোনও অধিকার। উঁচু মহলের কর্তারা এমনকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাজা-মহারাজার মতন বাড়িয়ে গেলেও বাধা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। হো-চি-মিন-এর মতন আদর্শ নেতা যেন নিছক ব্যতিক্রম, বাকি সকলেই গোপনে গোপনে বিলাসী ও ভোগী। শুধু চাউসেস্কুকে একা দোষ দেওয়া হবে কেন, আরও অনেকের এই স্বরূপ এখন উদঘাটিত।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কেউই আন্তরিক শ্রম দিতে চায় না। প্রতিযোগিতা নেই বলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার অধিকার চলে যাওয়ায়, সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের সম্পত্তিকে আপন মনে করে না। প্রতিযোগিতা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি, নারী-পুরুষের প্রেমের সম্পর্কের মতনই, ভূমির ওপর আকর্ষণও অতি ব্যক্তিগত। সূচ্যগ্র মেদিনী আজও স্বেচ্ছায় ছাড়তে চায় না কেউ।

অর্ধ শতাব্দী ধরে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাতে দেশ ও জাতির সীমা মুছে দেওয়া গেল না। এমনকী সমাজতন্ত্রের বর্ণবৈষম্যও কি ঘোচানো গেছে? দিকে দিকে ফুঁসে উঠেছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত, শ্রেণিহীন সমাজ কি শুধুই একটা সুন্দর স্বপ্ন? ইউটোপিয়া? একে বাস্তবে সার্থক করার ক্ষমতা মানুষের নেই? মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য, সমভ্রাতৃত্ব ও স্বার্থপরতার লড়াই চলতেই থাকবে?

বয়স্ক-নেতৃত্ব সুবিধাবাদকে আঁকড়ে ধরে, তারা কথার ফুলঝুরি দিয়ে সাধারণ মানুষের মন ভোলায়, মঞ্চের ওপর উদ্দীপ্ত ভাষণের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের কোনও মিল থাকে না, তাদের নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার লালসা আর সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেয়। কিন্তু কৈশোর-তারুণ্যের সময় অনেকেটাই খাঁটি আদর্শবাদী থাকে। আদর্শের জন্য তারা যে-কোনও মুহূর্তে জীবন দিতেও ইতস্তত করে না। যে-বয়সে জীবন সবচেয়ে মূল্যবান, সেই বয়েসেই মানুষ মাথা উঁচু করে মৃত্যুর দিকে যেতে পারে। সারা দেশে অনাচার, বৈষম্য ও দুর্নীতি দেখে ফুঁসে ওঠে তরুণ সমাজ, একটা বিপ্লবের ডাক শুনলে তারা সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে আসে, নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও বিপ্লব সফল করতে চায়। কিন্তু বিপ্লব সফল হলে তারা নতুন শাসনভার তুলে দেবে তাদেরই হাতে, যারা আবার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সাধারণ মানুষদের স্তোকবাক্যে ভোলাবে? বিপ্লব যারা সফল করে আর বিপ্লবের পরবর্তীকালে যারা দেশ গড়ার ভার নেয়, এদের চরিত্রগত একটা

তফাত এসে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই যদি হয় বিপ্লবের পরিণাম, তা হলে পরবর্তীকালের তরুণরা কোন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবে?

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে এখন আর বিপ্লব বলা হচ্ছে না, যে-অভ্যুত্থানের ফলে সেই ব্যবস্থার পতন হল, তাকেই এখন বলা হচ্ছে বিপ্লব। এটা একটা নিয়তির পরিহাস নয়? যতবার এই বিপ্লব শব্দটি শুনেছি, আমার কানে খট করে লেগেছে। ইরানে যখন রাজতন্ত্র সরিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মৌলবাদের, তাকেও বলা হয়েছিল বিপ্লব!

গণতন্ত্রই বা মানুষকে কতখানি মুক্তি দিতে পারে? সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র। নির্বাচন ও ভোটে জিতে যারা ক্ষমতা হাতে পায়, তারা যদি সত্যিই দেশের সমস্ত মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছার মূল্য দেয়! ভোটে জেতার জন্য সর্বত্রই চলে টাকার খেলা এবং গায়ের জোর, সুতরাং যারা জয়ী হয়, তারাই যে যোগ্যতম, তা কিছুতেই বলা যায় না। ব্রিটেন এবং আমেরিকা গণতন্ত্রের গর্ব করে, কিন্তু ওইসব দেশের শাসকরা যখন একটা আগ্রাসী যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় তখন কি তারা দেশের মানুষের মতামতের তোয়াক্কা করে? তারা চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে ধরলেও যুদ্ধের প্রকৃত খবর জানতে দেয় না দেশবাসীকে, মিথ্যে খবর জানাতে দ্বিধা করে না। যুদ্ধের সময় পরিকল্পিতভাবে দেশের মধ্যে কুৎসিত রকমের উগ্র দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা হয়, ছড়ানো হয় অন্য দেশের প্রতি ঘৃণা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন প্রকাশ্যে বলেন যে, তিনি ইরাকের প্রেসিডেন্টের মৃত্যু চান, তখন মনে হয় পৃথিবী কি সত্যিই সভ্য হয়েছে? এই কি সভ্যতার নমুনা? তা হলে বর্বরতা কাকে বলে?

আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় আমরা কী পেয়েছি? দিন দিন বেড়ে চলেছে গণতন্ত্রের ব্যভিচার। এক রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন হয়, শাসনভার হাতে পেলেই তা তুচ্ছ হয়ে যায়। একই দল বিরোধী পক্ষে থাকলে বলে, হরতাল ডাকো, শাসনক্ষমতা পেলে বলে, হরতাল ভাঙো। নির্বাচিত হওয়ার পর আজ যে বিরোধী পক্ষে কাল সে সরকার পক্ষে। নীতির কোনও বালাই নেই। যে দল গতকাল বৃহৎ ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে শোষক ও শ্রেণিশত্রু বলেছে, আজ সে তাদেরই সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। আমাদের গণতন্ত্র বাক্-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অথচ দেশের শতকরা ষাটজন মানুষকেই অশিক্ষিত রেখেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি কাগজে-কলমে গ্রহণ করা হলেও এত বছরের মধ্যে সাধারণ মানুষকে বোঝানোই হল না ধর্ম-নিরপেক্ষতা কাকে বলে।

আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে, আধা মফঃস্বলে আমি ঘুরেছি অনেক। আমি দেখেছি বাঁধের ওপর বসে থাকা বিষণ্ণ মানুষ, যার কোনও কাজ নেই, পেটে ভাত নেই। দেখেছি খরায় বিবর্ণ ফসলের খেতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিমর্ষ চাষিকে। বস্তির ধারে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলা করে ধুলোর মধ্যে। শহরের চৌরাস্তায় গাড়িগুলো থামলে শিশু কোলে নিয়ে ভিক্ষে চাইতে আসে জননী। পুরীষের পাত্র মাথায় করে নিয়ে যায় হরিজন। এরা যেন অনন্তকালের স্রোতে এক একটি বিন্দু। কোনও পরিবর্তন নেই। আমাদের শৈশবে যেমন শিশু-কোলে জননীকে ভিক্ষে করতে দেখেছি, আজও তাই দেখছি। গণতন্ত্র এই শিশু ও তার জননীকে মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন দিতে পারেনি, দিতে পারেনি একটা সম্মানজনক জীবিকা। কোনও শিল্পী হয়তো সেই ভিখারিণীর মর্মন্তুদ ছবি আঁকেন, তার জন্য বাহবা পান, লেখা হয় কবিতা, মঞ্চস্থ হয় নাটক, তবু চৌরাস্তার মোড়ে শিশুকোলে জননীকে দেখতে পাওয়া যাবেই। ছেলেবেলায় রাস্তার মুচিকে ঠিক যে-অবস্থায় যে পোশাকে বসে থাকতে দেখতাম, এখনও তারা ঠিক সেরকমই রয়েছে। বাড়িতে ধাঙড়েরা আসে খালি পায়ে, নেংটি পরে, আমাদের ঠাকুরদারা যেমন দেখেছিলেন, আমরাও সে রকমই দেখছি। প্রতিদিন যে-মানুষটি আসে তার নামও আমরা জানি না, ওরা সবাই ধাঙড় বা মেথর। আফ্রিকার কেনিয়া শহরে আমি জুতো-পায়ে মেথর দেখেছি, পরনে প্যান্ট-শার্ট, আমাদের এখানকার যে-কোনও ধনী কিংবা সাম্যবাদীর

বাড়ির মেথরের একইরকম চেহারা। কাশী শহরে ভিখারির লাইনের মধ্যে এক বৃদ্ধকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, তার মুখে অজস্র আঁকিবুকি, সামনে হাত পেতে বসে সে ঘুমে ঢুলছে। আমার মনে হয়েছিল, ওই ভিখারির বয়েস আড়াই হাজার বছর, গৌতম বুদ্ধ ওকে যেমন দেখেছিলেন, আমরাও সেই অবস্থাতেই দেখছি। কিছুই বদলাতে পারিনি।

এই গণতন্ত্র আমাদের কোন ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে? কোন পথে আসবে সমস্ত মানুষের মুক্তি? নাকি সেই মুক্তি কোনওদিনই আসবে না? তার আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী কিংবা মানব সভ্যতা? যদি মানব সভ্যতার বিনাশ হয়ই, তবে তা পরমাণু অস্ত্র বা বিষবাষ্পে হবে না। হবে বঞ্চিত মানুষদের দীর্ঘশ্বাসে।

দ্বিতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

ঠিক সাড়ে সাত বছর পর আমি আবার পা দিলাম মস্কো শহরে। এর মধ্যে কী চমকপ্রদ পালাবদল ঘটে গেছে এই পৃথিবীতে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এক মহা শক্তিশালী বিশাল সাম্রাজ্য। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে এমন এক সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার মতন ঘটনা মানুষের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

সাড়ে সাত বছর আগে এরকম পট পরিবর্তনের সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল না কারুর সুদূর কল্পনায়। মস্কো তখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার রাজধানী। অন্যান্য অনেক দরিদ্র দেশের বহু মানুষ, যারা সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, তারা প্রেরণার জন্য তাকিয়ে থাকে মস্কোর দিকে। আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিয়ে যেতে চাইছে মহাকাশে, সেখান থেকে পেশি আস্ফালন করবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আমেরিকা এক হাতে দান-খয়রাত করে, অন্য হাতটা যে-কোনও সময় থাপ্পড় মারার জন্য উদ্যত রাখে। মাও-এর পরবর্তী চিন অবশ্য ততদিনে আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছে। মার্কিন দেশের বড়-বড় ব্যবসায়ীরা ভারতের প্রতি নাক কুঁচকে চিনে গিয়ে কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত স্থান খুঁজছে। চিনের বড়-বড় হোটেলের পরিচারকরা পর্যন্ত থ্যাংক ইউ-এর বদলে ইউ আর ওয়েলকাম বলতে শিখে গেছে।

আমেরিকান ইগলকে তখন বাধা দিতে পারে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল পতাকা। ওয়াশিংটন থেকে কোনও হুঙ্কার উঠলে মস্কো থেকে পাল্টা হুঁশিয়ারি যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নতুন এক শব্দ তৈরি হয়েছে, কোলড ওয়র, ঠান্ডা যুদ্ধ। এক অদৃশ্য দাঁড়িপাল্লায় দু-দিকেই দু-পক্ষ নিযুত অর্বুদ টাকা দামের অস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে। ঠান্ডা যুদ্ধ যে-কোনও সময়ে পরিণত হতে পারে সর্ব-বিধ্বংসী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সেরকম কোনও যুদ্ধ শুরু হলে আমি এবং আমার মতন অজস্র মানুষ নিশ্চয়ই সোভিয়েত পক্ষকেই সমর্থন করত। কারণ তখন পর্যন্ত আমাদের মনে হত, আমেরিকা নামের দেশটা চালায় বড়-বড় ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত এক স্বার্থপর সরকার আর সোভিয়েত ইউনিয়ান তথা সমাজতান্ত্রিক জোট এক বৃহৎ আদর্শের প্রতিভূ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অস্ত্র বিক্রেতা, তাই তারা যুদ্ধের উস্কানিদাতা, আর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া শান্তিবাদী।

রাজনীতি বা কূটনীতি অবশ্য এমন সরল অঙ্কের নিয়মে চলে না।

সাড়ে সাত বছর আগে আমি এসেছিলাম শক্তিশালী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটের রাজধানী মস্কোতে। সেবারে আমি ছিলাম সরকারি অতিথি। দলের সঙ্গে নয়, একা। আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল সেরগেই নামে এক যুবক। বেশ হাসিখুশি, সুন্দর স্বভাব, সে ছিল আমার দোভাষী, পথ প্রদর্শক ও সব কিছুর ব্যবস্থাপক। আমার ওপর নজরদারি করাও ছিল তা দায়িত্বের অঙ্গ, তা বুঝতে

অসুবিধে হয়নি। আমি একটুক্ষণ তার চোখের আড়ালে গেলেই সে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠত। অবশ্য সোভিয়েত দেশের কোনও ছিদ্র অনুসন্ধান করার কোনও উদ্দেশ্যেই আমার ছিল না, আমি গিয়েছিলাম মুক্ত মন নিয়ে। তার আগে অনেকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশ আমার ঘোরা হয়ে গেছে, সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ নিজের চোখে দেখার আগ্রহ ছিল খুব।

সরকারি আমন্ত্রণের ভ্রমণসূচি সব আগে থেকে নির্দিষ্ট থাকে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সাক্ষাৎকার ও পরিদর্শনের প্রোগ্রামে ঠাসা। মস্কো, লেনিনগ্রাড, রিগা ও কিয়েভ এই চারটি শহরেই সেরগেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পরে আমি চিনে গিয়ে দেখেছি, সেখানেও বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধি নয়, একই দোভাষী গাইড সব ক'টি শহরে সঙ্গী। এর কারণ বোধ হয় এই যে, এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের পথে, ট্রেনে বা বিমানে সরকারি অতিথি যাতে হারিয়ে না যান, কিংবা অন্য লোকদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা জুড়ে না দেন, সেটা দেখা।

সেবারে চারটি শহরেই যা যা আমাকে দেখানো হয়েছে, তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যা যা দেখানো হয়নি, সে বিষয়ে কিছু জানি না। লেনিনগ্রাড শহরটি অতি সুদৃশ্য, সেখানে রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত হারমিটেজ মিউজিয়াম, রিগা শহরের কোথাও কোথাও রয়েছে প্রায় অবিকৃত মধ্যযুগীয় রূপ, কিয়েভ শহরে সবুজের অপূর্ব সমারোহ, এসব দেখে কার না ভালো লাগবে। দেখেছি, উন্নত ধরনের যৌথ খামার, সারা দেশে নির্দিষ্ট ও সস্তা দামে খাদ্যদ্রব্য ও যানবাহন ব্যবস্থা, শুনেছি সমস্ত নাগরিকদের বাসস্থান ও জীবিকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কথা। ফিরে এসে ভ্রমণকাহিনিতে সেই সবই লিখেছি। কেউ-কেউ বলেছেন, এদেশে এবং মস্কোতেও, এই ব্যবস্থার অনেক দুর্বলতা, গলদ ও অন্যায় আছে, সেসব আপনি কিছুই লেখেননি কেন? আমি বলেছি, যা দেখিনি, তা আমি লিখব কেন? আমি ভ্রমণকাহিনিতে উপন্যাস ঢোকাতে চাই না, অনুমান বা শোনা-কথা একপাশে সরিয়ে রাখি।

সেবারে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের বহিরঙ্গ দেখে আমি মুগ্ধই হয়েছিলাম। আমাদের মতন দরিদ্র দেশের পক্ষে তো আদর্শ বটেই। কয়েকটি ব্যাপারে শুধু খটকা লেগেছিল। যৌথ খামারটিকে মনে হয়েছিল মডেল খামার, বড় বেশি সাজানো, ওটা যেন বিদেশিদের দেখাবার জন্যই। সারা দেশে সমান দামে সমস্ত খাদ্য সরবরাহের প্রচারটাও বোধহয় ঠিক নয়। খাদ্যের বেশ অভাব আছে। সরকারি অতিথি হিসেবে আমাকে ভালোই খাওয়ানো দাওয়ানো হচ্ছে বটে, কিন্তু অনেক রেস্তোরাঁতেই একটু দেরি করে গেলেই কিছু পাওয়া যায় না, বাজারে তরিতরকারি ফলমূল বলতে শুধু কিছু আলু আর বিট গাজর, মাখন আর মাংসের অভাবের কথা লোকের মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। আর, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রত্যেক সাক্ষাৎকারেই যেন হুবহু এক কথা শুনতে হয়েছে, [illegible], শান্তি ও সাম্যের জয়গান, কথাগুলো যেন মুখস্থ করা, একেবারে বাঁধা ধরা সরকারি ভাষা, বলতে বলতে ওঁরা বারবার হাই-তোলা গোপন করেছেন। তার কারণ কি কে জি বি'র অদৃশ্য ছায়া?

আমেরিকাকে পৃথিবীর সব দেশ গালমন্দ করে। আমেরিকার মধ্যে বসেও সে দেশের সরকারের প্রকাশ্যে সমালোচনা করার কোনও বাধা নেই, এমনকি বিদেশিরাও তা পারে। ওদেশের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে হাসি-মসকরা চলে অবাধে। কেনেডি হত্যার পর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জনসনকে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে একটা নাটকের অভিনয় আমি দেখেছিলাম ওদেশে, মার্কিন সরকার সে নাটকের মঞ্চানুষ্ঠান বন্ধ করতে পারেনি। সেরকম কোনও আইনের ক্ষমতা সরকারের নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ান, তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সমালোচনার কোনও স্থানই ছিল না। সরকারের কোনওরকম ত্রুটি সম্পর্কে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করার অধিকার ছিল না সাধারণ মানুষের। কেউ কিছু বলার চেষ্টা করলেই তাকে অদৃশ্য করে দেওয়া হত। স্টালিনের সময় এরকম কোটি কোটি মানুষকে যখন তখন মনুষ্য জন্ম শেষ করে চলে যেতে হয়েছে। বাড়ির মধ্যে বসে স্বামী-

স্ত্রী সরকারের কোনও গলদ নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না, ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের ওপর নজর রাখার নজির আছে। সব মিলিয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

ওইসব দেশের বাইরে যারা সমাজতন্ত্রের সমর্থক কিংবা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা তথাকথিত কমিউনিস্ট বা আরামের জীবনযাপনে অভ্যস্ত, ক্ষমতাভোগী দলের কমিউনিস্ট, তারাও সহ্য করতে পারে না কোনও সমালোচনা। যারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও বৈপরীত্য নির্দেশ করে কিংবা গোষ্ঠীচক্রের প্রতিবাদ জানায়, অমনি তাদের প্রতি বর্ষিত হয় অজস্র গালি-গালাজ, তারা সমাজতন্ত্রের শত্রু, তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল, তারা ধনতন্ত্রের উচ্ছিষ্টভোজী, তারা স্বার্থপর ও লোভী ইত্যাদি। যুক্তি নয়, শুধু গর্জন। যারা প্রকৃত আদর্শবাদী, তারা সমালোচনাকে এত ভয় পাবে কেন, তাদের মুখের ভাষা এত খারাপ হবে কেন? শাখারভের মতন বৈজ্ঞানিক, পাস্তেরনাক কিংবা সোলঝেনিৎসিনের মতন লেখক, এঁদের বক্তব্য শোনা ও বোঝার বদলে যারা শুধু গালাগালি দেয়, তাদের মনুষ্যত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ করা উচিত নয় কি?

যেসব শিল্পী বা লেখক নিজেদের দলভুক্ত নয়, কিংবা পার্টির নির্দেশে চলে না, কিংবা মানবতাবাদকেই একমাত্র অনুসরণযোগ্য মনে করে, তাদের একেবার নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। তাদের রচনায় কোনও গুণই নেই বলে দেগে দেওয়া হয়। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে এরকম অদ্ভুত বিচারবোধের ফলে এই সব গোঁড়াদের শিল্পসাহিত্যের বোধই নষ্ট হয়ে যায়।

যারা সমালোচনাকে এত ভয় পায় তাদের নিশ্চয়ই গোপন করার অনেক কিছু থাকে। সেই সব বহু গোপন কেলেঙ্কারি এখন ফাঁস হয়ে গেছে। যদি আগে থেকেই সাধারণ মানুষের সব কিছু জানার ও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকবে, তা হলে এসব কেলেঙ্কারি হয়তো ঘটতেই পারত না। নিজ দেশবাসীর রক্তের সমুদ্রে স্নান করেছেন যে স্টালিন, তার দাপট খর্ব করে কিছু মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেতে পারত, চাউসেস্কু হয়ে উঠতে পারত না সমাজতান্ত্রিক দেশে এক স্বৈরাচারী রাজা।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা দিয়েও কেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। কেন মার্কসবাদীরা ব্যক্তি স্বাধীনতার এমন ঘোরতর বিরোধী? পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে গিয়ে আমি দেখেছি, সেই সব দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের মূলে যে দুটি প্রধান কারণ, তার প্রথমটি অবশ্যই খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, দ্বিতীয়টি ওই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার অনধিকার। এতদিন পর যেন মাথার ওপর থেকে বিরাট ঢাকনা তুলে নেওয়ার পর সকলের মুখে খই ফুটছে। কবি ইয়েফতুশেঙ্কো সেইজন্যই বলেছেন, বাক-স্বাধীনতার বদলে আমরা যেন পেয়ে গেছি বকবকানির স্বাধীনতা। প্রথম প্রথম তো এরকম হতেই পারে।

আধুনিক পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তির একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তো বটেই, এমনকি চাঁদের অভিযাত্রীদের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বলা যায়। বেতারে ও টেলিভিশানে শোনা ও দেখা যায় এক রাষ্ট্র থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবাদ ও সমাজচিত্র। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাধারণ মানুষদের এই রকম যোগাযোগের তো সুযোগ দেওয়াই হয়নি, সবরকম যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে তুলে দেওয়া হয়েছে কঠিন দেওয়াল ও কাঁটাতারের বেড়া, যেখানে পাহারা দিয়েছে হিংস্র কুকুর ও মারাত্মক অস্ত্রধারী সৈনিকরা। দেশের মানুষকে সব সময় ভয় দেখিয়ে এ কীরকম সাম্যবাদ!

লেনিন নাকি বলেছিলেন, বাড়ির বাইরের কোনও দিক থেকে যদি দুর্গন্ধ আসে, তা হলে সেদিকের জানলাটা বন্ধ করে রাখতে হয়। মনে হয়, কথাটায় আপাত যুক্তি আছে, লেনিনের সময় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রকে বহুরকম শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এরকমভাবে পশ্চিমের জানলা কিছুদিন বন্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তাও হয়তো ছিল। কিন্তু সত্তর বছর ধরে কোনও জানলা বন্ধ রাখা যায়? সত্যিই দুর্গন্ধ আসছে কি না তা বাড়ির মালিক একবার জানলা খুলে দেখতে পারবে না? রাজধানী থেকে কয়েকজন নেতা তা ঠিক করে দেবে! হাঙ্গেরি কিংবা চেকোস্লোভাকিয়াতে কেউ

জানলা খুলতে চাইলে মস্কোর নির্দেশে ট্যাংক পাঠিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে!

লেনিনের পরবর্তী নেতারা দেখলেন, এরকম জোর-জবরদস্তি করে দেশের সাধারণ মানুষকে কূপমণ্ডূক অবস্থায় রাখতে পারলে নিজেদের ক্ষমতায় টিকে থাকা নির্বিঘ্ন হবে। স্টালিন যে অজস্র নরহত্যা করিয়েছিলেন, তা কি সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, না ক্রেমলিনে নিজের আসনটি পাকা করার জন্য? দেশত্যাগী ট্রটস্কিকে নৃশংসভাবে খুন করাবার আর কী কারণ থাকতে পারে!

জানলা বন্ধ রাখার এতরকম কলাকৌশল যারা করেছিল, তারা অন্য দিকটা ভেবেও দেখেনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি / সত্য বলে আমি তবে কোথা গিয়ে ঢুকি?' কিংবা তারা আসলে সত্যকেই ভয় পেত?

পশ্চিমের দুর্গন্ধের অপর নাম ভোগ্যপণ্য। এই ভোগ্যপণ্য শব্দটি হচ্ছে ভাষার চাতুরি, মিথ্যেকে ঢাকার প্রয়াস। দাঁত মাজার টুথপেস্ট, গায়ে মাখার সাবান, পায়ে দেওয়ার জুতো, টয়লেটের কাগজ, এগুলি কি ভোগ্যপণ্য না নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এগুলোও কেন ঠিকঠাক দিতে পারেনি সমস্ত নাগরিকদের? বড় বড় মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা এই ত্রুটি লক্ষ করেননি। পাউরুটির সঙ্গে মাখন আমাদের মতন দেশে এখনও বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে বটে, কিন্তু ইউরোপে বহু যুগ ধরে এটা সাধারণ মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে যে মিসাইল, রকেট, মহাকাশযান এই সবগুলোই সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসকদের ভোগ্যপণ্য, বিলাসিতার দ্রব্য।

পোল্যান্ডের সাধারণ মানুষ যদি জানতে পারে যে পাশের দেশ ফ্রান্স গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও সে দেশের সমস্ত মানুষই রুটির সঙ্গে মাখন মাংস খেতে পায়, তা হলে তারা সমাজতন্ত্রের ওপর শ্রদ্ধা রাখবে কী করে? মার্কসবাদ তো মানুষকে দুঃখে-কষ্টে-নিপীড়নের মধ্যে রাখার কথা বলেনি, মার্কসবাদ তো এক সুখী সমৃদ্ধ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছে।

মাত্র দু-বছরের বিপরীত ধরনের ঘটনা ও ওলোটপালট দিয়ে ইতিহাসের বিচার করা যায় না। সমাজতন্ত্রকে নস্যাৎ করা যায় না। কিন্তু এইসব প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যায়।

মনের মধ্যে এমন ধরনের অনেক প্রশ্ন নিয়েই আমি দ্বিতীয়বার উপস্থিত হলাম মস্কো শহরে। আগেরবার আমাকে রাখা হয়েছিল অতিকায় সুরম্য হোটেল ইউক্রানিয়ায়। এবারও উঠলাম সেই একই হোটেলে। আগেরবার বিমানের মধ্যেই সুবোধ রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই সাড়ে সাত বছরে তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মে গেছে। এবারে বিমানবন্দরে কোনও সরকারি প্রতিনিধি নেই, কিন্তু উপস্থিত রয়েছে সুবোধ এবং তার ছোট ভাই সমর রায়।

খুব সম্ভবত সুবোধ রায়ই একমাত্র বাঙালি, যে গত অগাস্ট মাসের আড়াই দিনের ব্যর্থ অভ্যুত্থান, রাশিয়ার পার্লামেন্টের সামনে ট্যাংক বাহিনী, ইয়েলৎসিনের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ সব কিছু নিজের চোখে দেখেছে। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত পাহারা দিয়েছে যে অতন্দ্র জনতা, সুবোধ ছিল সেই জনতার একজন।

॥ ২ ॥

একটা বড় রকমের পরিবর্তনের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নেওয়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলেন তাঁর বাগানবাড়িতে। কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী ক্রিমিয়ার এই ডাচা-তে তাঁর পরিবারের সকলেই উপস্থিত। দু-দিন বাদেই মস্কোতে ফিরে কাজাকাস্তানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর নতুন এক চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলিকে অনেকখানি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে দেওয়া হবে। রবিবার, ১৮ অগাস্ট, ১৯৯১, বিকেলবেলা

গরবাচেভ বসে বসে সেই চুক্তি সম্পাদনের সময় কী বক্তৃতা দেবেন তার খসড়া তৈরি করছেন। কাছাকাছি আর একটি ছুটি ভবনে রয়েছেন জর্জি শাখনাঝারভ নামে একজন পরামর্শদাতা ও বন্ধু, গরবাচেভ তাঁকে টেলিফোন করে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। মনোরম পরিবেশে এক শান্ত অপরাহ্ন। কোথাও কোনওরকম অস্বাভাবিকতার ছায়া নেই।

ঘন্টাখানেক বাদে সেই বাড়ির বাইরে শোনা গেল গাড়ি থামার শব্দ, জুতোর আওয়াজ করে একদল লোক ঢুকে এল ভেতরে। গরবাচেভ-এর নিরাপত্তারক্ষীদের প্রধান হন্তদন্ত হয়ে প্রেসিডেন্টের অফিস কক্ষে এসে জানাল যে কয়েকটি ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এমনভাবে যখন তখন দেখা করা যায় না, নিরাপত্তা রক্ষীরা থাকতেও তারা ভেতরে ঢুকল কী করে? ওরা কারা? রক্ষীদের প্রধান জানালো যে ওই দলটিতে রয়েছে ইউরি প্লেখানভ, সমস্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষীদের সে প্রধান, তাকে বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু না ঘটলে এরকম বেয়াদপি দেখানো অসম্ভব, তাই প্রকৃত ব্যাপার জানবার জন্য গরবাচেভ মস্কোতে টেলিফোন করতে গেলেন। প্রথম ফোনটি বিকল। বাড়িতে মোট পাঁচটি টেলিফোন, একে একে তুলে দেখা গেল, সব ক'টিই নিঃশব্দ। অর্থাৎ লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

বাইরের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার একটাই অর্থ হয়। তিনি আর প্রেসিডেন্ট নেই। এক সময় প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভের হাত থেকে টেলিফোন কেড়ে নেওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। গরবাচেভ অন্দর মহলে গিয়ে স্ত্রী ও মেয়েজামাইদের ডেকে বললেন, তোমরা মন শক্ত করো, আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরা আমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবে কিংবা অজানা কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলবে।

এরপর তিনি এলেন অফিস ঘরে। অনাহূত অতিথিরা সেখানে আগেই চেয়ার দখল করে বসে আছে। তাদের মধ্যে রয়েছে প্রেসিডেন্টের নিজস্ব বাহিনীর প্রধান ভালেরি বলডিন, এবং আরও কয়েকজন সরকার ও পার্টির হোমরা-চোমরা। এরা অনেকেই গরবাচেভ-এর বিশ্বস্ত বলে পরিচিত ছিল। ভালেরি বলডিনকে গরবাচেভ নিজে বেছে নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়েছেন। এই আগন্তুক দলটি দাবি জানালো যে, গরবাচেভকে জরুরি অবস্থা ঘোষণাপত্রে সই করতে হবে এবং উপরাষ্ট্রপতি গেন্নাদি ইয়ানাইয়েভ-এর হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।

গরবাচেভ বললেন, তোমরা গোল্লায় যাও!

এরপর বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনও একজনের একটা রিভলবার বার করে রাষ্ট্রপতির বুকে পরপর ছ'টা গুলি দেগে দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিংবা তাঁর চোখ-মুখ বেঁধে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল কোনও গুপ্ত স্থানে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। কে জি বি-র একটি বাহিনী ঘিরে রইল সেই বাড়ি, নিকটবর্তী বিমানবন্দরটির রানওয়ে খুঁড়ে দেওয়া হল, যাতে গরবাচেভ কোনওক্রমে প্লেনে না পালাতে পারেন।

পরদিন সকালে সোভিয়েত দেশের প্রধান সংবাদ সংস্থা তাস্ জানাল যে প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ অসুস্থ, তাই তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ইয়ানাইয়েভ-এর ওপর হস্তান্তর করেছেন এবং আট সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটির নেতৃত্বে সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। সমস্ত মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ। গরবাচেভ-এর অসুস্থতার কথা কেউ বিশ্বাস করল না, অনেকেই ধরে নিল, গরবাচেভ এর মধ্যেই নিকেশ হয়ে গেছেন। মস্কোর রাস্তায় তখন শোনা যাচ্ছে ট্যাংকের ঘর্ঘর শব্দ। রেড স্কোয়ার-এর সেই বেসিলস ক্যাথিড্রাল-এর পাশে, বলশয় থিয়েটারের সামনে স্থাপিত হয়েছে রায়ট পুলিশ ভরতি বহু ট্রাক। স্পষ্টই এক অভ্যুত্থান। গরবাচেভ গেছেন, এবার ইয়েলেৎসিনের পালা। হয় হত্যা, অথবা নির্বাসন। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটবার আগেই ইয়েলেৎসিন বাড়ি ছেড়ে দ্রুত চলে এলেন রুশ পার্লামেন্ট ভবনে। সেখানে ততক্ষণে তার কিছু সমর্থকও জমায়েত হয়েছে। এ এমনই এক অভ্যুত্থান যে, যারা এর পক্ষে এবং যারা এক বিপক্ষে, দু-দলেরই বিমূঢ় অবস্থা। যারা পক্ষে তারা

ভাবছে যে কোনওরকম বাধা না পেয়েও অভ্যুত্থানের নায়করা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিতে পারছে না কেন? যারা বিপক্ষে, তারা ভাবছে, এ ধরনের অভ্যুত্থানের পর যেসব সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবার কথা, তা কেন ঘটছে না? যারা সংবিধান ও আইনসঙ্গত উপায় বর্জন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে, তাদের খানিকটা বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা দেখাতেই হয়। কিন্তু ইয়েনাইয়েভ ও তার সহচররা এখনও এত দুর্বলতা দেখাচ্ছে কেন? সোভিয়েত ইউনিয়ানের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র রাশিয়া, তার প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিন এককালের কমিউনিস্ট নেতা হয়েও এখন ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী, সেই লোকটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দর্পিত, বিলাসী, স্পষ্টত পশ্চিম-ঘেঁষা। কিন্তু ইয়েলেৎসিন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, বিপুল জনসমর্থন পেয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছেন, রুশ প্রজাতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। একে না সরিয়ে ফেললে কোনও অভ্যুত্থান সার্থক হতে পারে না।

মস্কোভা নদীর তীরে ট্যাংক বাহিনী এসে উপস্থিত, কিন্তু ইয়েলেৎসিনের ওপর কোনও আঘাত হানার চেষ্টা হল না। ইয়েলেৎসিন নিজেও যেন এটা বিশ্বাস করতে পারেননি। সকাল সাতটার মধ্যে তিনি রাশিয়ান পার্লামেন্ট ভবনে পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু কীভাবে পাল্টা আক্রমণ করবেন, তা বুঝে উঠতে পারেননি দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। ইয়েলেৎসিন-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পালাবদল ঘটছে সোভিয়েত নেতৃত্বে, কিন্তু রুশ প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে, রাশিয়ান ভূমিতে অধিষ্ঠিত সেনা বাহিনী ও কে জি বি-র আইনসঙ্গত সর্বাধিনায়ক তিনি, এই অধিকারের কথা ঘোষণা করলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত হবে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে ইয়েলেৎসিন দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। রুশ বাহিনী ও সোভিয়েত বাহিনীর মধ্যে ভাগাভাগির প্রশ্ন এনে ফেললে যে-কোনও মুহূর্তে গৃহযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা। যুগোস্লাভিয়ায় যেমন ঘটছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই গৃহযুদ্ধ অনেক বেশি রক্তাক্ত হবে।

শেষ পর্যন্ত মনঃস্থির করে, সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় ইয়েলেৎসিন বেরিয়ে এলেন রুশ পার্লামেন্ট ভবন থেকে। একটা সাঁজোয়া গাড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ইয়েলেৎসিন ঘোষণা করলেন যে এই অভ্যুত্থান অবৈধ। ইয়েনাইয়েভ-এর রাষ্ট্রপতিত্বে কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি জরুরি অবস্থা জারির নির্দেশ মানছেন না। প্রতিবাদ হিসেবে তিনি দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিচ্ছেন।

ইয়েলেৎসিনের সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাতটি দশকের ইতিহাস রূপান্তরিত হয়ে গেল।

এইসব ঘটনার বিবরণ আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করেছি, দূরদর্শনে জ্যান্ত দেখেছি। তবু আমি সুবোধ রায়ের মুখে আবার শুনছিলাম। হোটেল ইউক্রানিয়ার পাশেই মস্কোভা নদী। তার ওপাশেই রুশ পার্লামেন্ট ভবন, সাদা রঙের ওই প্রাসাদটির ডাক নাম হোয়াইট হাউজ। ওই বাড়িটির সিঁড়ি, নদীর ওপরে ব্রিজ, তার নীচের এবং পাশের রাস্তা, এই এলাকাটুকুই এখানকার পানিপথ। হোটেলের জানলা দিয়েই সব দেখা যায়।

ইয়েলেৎসিন যখন তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি দেন, তখন সুবোধ সেখানে যায়নি। মস্কোর অগণ্য নাগরিকরাও সেখানে গিয়ে ভিড় জমায়নি। ইয়েলিৎসিন প্রথম থেকেই যে বিরাট জনসমর্থন পেয়েছিলেন, তা ঠিক নয়। সোভিয়েত দেশের মানুষ অনেককাল ধরেই সরকারের সবরকম ডিক্রি মানতে অভ্যস্ত, কে জি বি-র ভয় পদে পদে। ইদানীং গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রাইকার খানিকটা খোলামেলা বাতাস বইলেও তা দিয়ে কামান-বন্দুকের গোলাগুলি যে আটকানো যাবে, সে ভরসা কোথায়! অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যারা সরকারি ক্ষমতা নিয়েছে, কামান-বন্দুক সবই তো তাদের দখলে।

সেইজন্যই ইয়েলেৎসিনের প্রথম বক্তৃতার সময় সেখানে সর্ব সাকুল্যে দুশোর বেশি শ্রোতা

ছিল না। কয়েকটা গোলা ছুড়েই ভয় দেখিয়ে এই জনতা ছত্রভঙ্গ করা যেতে পারত, ইয়েলেৎসিনকে বন্দি করা সহজ ছিল। কিন্তু কেন অভ্যুত্থানের নেতারা দ্বিধা করতে লাগলেন, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। দেশের অভ্যন্তরে কোনও বড় রকম প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি, বিদেশেও কোনও তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল না। ব্রিটেন, আমেরিকা সমেত পশ্চিমি দেশগুলি দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কিছু মন্তব্য করলেও সরাসরি বিরুদ্ধাচরণের কোনও হুমকি আসেনি। অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রপতি বদল এ সব প্রত্যেক দেশেরই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তাতে অন্য দেশের মাথা গলানোর নজির নেই। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনও রাষ্ট্রনায়ককে খুন করে কোনও সামরিক শাসক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও কিছুদিনের মধ্যেই সে দেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। পরে জানা গেছে, পশ্চিমি দেশগুলি ইয়ানাইয়েভ-এর নেতৃত্বকে মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। অভ্যুত্থানকারীরা এসব সুযোগ নিতে পারল না।

সোমবার বিকেল পাঁচটায় অভ্যুত্থানকারীরা ডাকল প্রেস কনফারেন্স। সেখানেও তাদের বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট। তারা জানাল যে, গরবাচেভ অত্যন্ত অসুস্থ বলে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব নিতে অক্ষম, তাই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইয়ানাইয়েভ-কে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল হতে দেবে না, সংস্কারের কাজগুলোও চালিয়ে যাবে। তাদের এই ক্ষমতাগ্রহণ সংবিধানসম্মত ইত্যাদি।

দেশের মানুষ এতে কী বুঝবে? রাষ্ট্রপতি গরবাচেভ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে উপরাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যাবেন, এ তো স্বাভাবিক। তার জন্য অভ্যুত্থান ঘটাতে হবে কেন, জরুরি অবস্থাই বা জারি করতে হবে কেন? গরবাচেভকে বাদ দিয়ে যদি নতুন সরকার গড়া হয়, তা হলে ইয়ানাইয়েভের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচন হল কখন সুপ্রিম সোভিয়েতে? কী করে এই পালাবদল সংবিধানসম্মত হয়?

ততক্ষণে ইয়েলেৎসিনের প্রতিবাদী ঘোষণার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে। রুশ পার্লামেন্ট ভবন ঘিরে অনেক ট্যাংক জমায়েত হয়েছে বটে কিন্তু গুলি গোলার শব্দ নেই। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল, ক্রমে সহস্র থেকে তা পরিণত হল লক্ষে লক্ষে। একবার ভয় ভেঙে গেলে আর কোনও বাধাকেই বাধা বলে মনে হয় না। যে-কোনও মূল্যে এই অভ্যুত্থানকে রোখার জন্য শপথের গর্জন শোনা গেল, অনেকে ট্যাংকের ওপর উঠে নাচানাচি শুরু করল। এতকালের পরিচিত কাস্তে-হাতুড়ি লাঞ্ছিত রক্ত পতাকার বদলে এসে গেল রুশ প্রজাতন্ত্রের পুরোনো আমলের ত্রিবর্ণ পতাকা।

লেনিনগ্রাডেও একই অবস্থা। সেখানকার নির্বাচিত মেয়র আনাতোলি সোবচাক প্রথম থেকেই অভ্যুত্থানের ক্ষমতা দখলকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সমবেত হল অসংখ্য মানুষ। যে সেনাবাহিনী সিটি কাউন্সিল দখল করতে আসছিল, তারা জনতার প্রতিরোধে লেনিনগ্রাড শহরে ঢুকতেই পারল না। লেনিনগ্রাডের বিখ্যাত উইন্টার প্যালেস, যার সামনে ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম বিপ্লব শুরু হয়েছিল, এখন সেখানেই অজস্র মানুষ অস্বীকার করল লেনিনবাদ। ইতিহাসের কী বিচিত্র নিয়তি।

এর মধ্যে বালটিক রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, তা ছাড়াও ইউক্রাইন, মালডাভিয়া, বেলোরাশিয়া, উজবেকিস্তান ইত্যাদি অন্যান্য রাষ্ট্রও এই অভ্যুত্থানকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করল, তাদের কোনও নির্দেশই মানতে সম্মত হল না। সাইবেরিয়ার খনি শ্রমিকরা ধর্মঘটের হুমকি দিল।

মস্কোয় যখন জনসাধারণ সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে সেনাবাহিনীকেও তুচ্ছ করে দিয়েছে, প্রতিবাদ নিয়েছে এক উৎসবের রূপ, তখন সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে সুবোধ রায়, ইতিহাসের এক বিরাট সন্ধিক্ষণের সে সাক্ষী। তার হোটেলের সামনেই রয়েছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কগুলি চালিয়ে এনেছে তরুণ সৈনিকেরা। তাদের মুখগুলি উদ্‌ভ্রান্তের মতন। তাদের একজনকে সুবোধ জিগ্যেস করেছিল, তুমি কি নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাবে? সে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, না। তারপর তাকে জিগ্যেস করা হল, তবে তুমি এখানে এসেছ কেন? সে বলেছিল, তা তো জানি না। আমাকে আসতে বলা হয়েছে...।

চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও সেই ট্যাংক চালকরা কোনও খাবার পায়নি। এমনই অব্যবস্থা যে, রুশ পার্লামেন্ট ঘিরে রাখার জন্য সেনা পাঠানো হল, কিন্তু তারা কী খাবে তা নিয়ে চিন্তা করেনি কেউ। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদকারী জনতাই তাদের হাতে রুটি তুলে দিয়েছে।

এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নে, তথা পৃথিবীতে, বিনা রক্তপাতে। কালিনিস্কি ব্রিজের কাছে যে তিনজন মানুষ নিহত হল, তা নিছক দুর্ঘটনা। তারা ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ট্যাংকের মুখ ঘোরাতেই তাদের আঘাত লাগে।

পৌনে তিনদিনের এই অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? এ রকম একটা দুর্বল, অপটু অভ্যুত্থানেরও কারণ বোঝা যায় না। ক্ষমতা যারা দখল করতে চায়, তারা দখলের প্রক্রিয়াগুলো পালন করবে না। ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টিই তো প্রধান অস্ত্র। কিছু রক্তস্রোত গড়াবেই, সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষ মারা তো নতুন কথা নয়! যারা দেশটাকে আবার স্তালিন জমানায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল, তারা ভয় পেয়েছিল জনসাধারণ নামে এক বস্তুপিণ্ডকে? কিংবা সেনাবাহিনী তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে কিনা, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল না? বিমানবাহিত বাহিনী তুলস্কায়া এবং ট্যাংকবাহিনীর কিছু অংশ তো ইয়েলেৎসিনের দিকেই চলে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীকে গুলি চালাতে বললে তারা অস্বীকার করত? চিনে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে দু বছর আগের ছাত্র বিপ্লবের সময় বেশ কয়েক ঘণ্টা চিনা শাসকদের ভাগ্য অনিশ্চিত ছিল। সেনাবাহিনী নিজেদের পুত্র ও ভাইয়ের মতন ছাত্রদের হত্যা করতে রাজি হবে কি না। সেবার ট্যাংকের কামানের নলগুলি মুখ ঘোরালেই চিন সরকারের পতন ঘটত। শেষ পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী অবাধ্য হয়নি, তারা কর্তব্যের খাতিরে তিন হাজার ছাত্রকে গুলি করে ও ট্যাংকের তলায় পিষে মেরেছে। কিন্তু প্রাচ্য দেশগুলিতে প্রাণ দেওয়া ও নেওয়া এখনও খুব সহজ, ইউরোপে আর তেমন পরিবেশ নেই। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জনসাধারণ যখন রাস্তায় নেমেছে, তখন সেনাবাহিনী তাদের ওপর গুলি চালাতে প্রত্যাখ্যান করেছে। সাধারণ মানুষ কোনও কোনও দেশে ট্যাংকের কামানের ডগায় পরিয়ে দিয়েছে ফুলের মালা।

সোভিয়েত সৈন্যরাও তাদের স্বদেশবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করতে এখনও রাজি কি না, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন।

এত সহজে অভ্যুত্থানের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেল বলে অনেকের সন্দেহ জেগেছে যে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো নয় তো? স্বয়ং গরবাচেভই কলকাঠি নেড়েছেন পেছন থেকে? এই সন্দেহের কথা অনেকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন, আমি গিয়েও শুনেছি। ক্রিমিয়ার বিশ্রাম-ভবনে সত্যি কী ঘটেছিল, তা সকলে জেনেছে গরবাচেভের মুখ থেকেই। কেন তাঁকে বন্দি করা হল না? তা হলে কি তিনি নিজেই এই নকল অভ্যুত্থানের উস্কানি দিয়ে আবার তার পতন ঘটালেন। এতে সুকৌশলে সার্থক হল, জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাবও জেনে নেওয়া হল। পুরোটাই যেন একটা নাটক, এর ফলে নায়ক হিসেবে ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করে নিলেন গরবাচেভ।

এই সন্দেহও সত্যি না মিথ্যে, তা জানতে হয়তো আরও ঢের দিন লেগে যাবে। আমরা জমজমাট নাটক পছন্দ করি, কিন্তু এই নাটকটিও তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। গরবাচেভ একা সবাইকে বোকা বানালেন, তিনি এত বুদ্ধিমান আর বাকিরা সবাই নির্বোধ? অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারীরা পরে দু একজন আত্মহত্যা করেছে, বাকিরা ধরা পড়েছে। তারা গরবাচেভ-এর চক্রান্ত কেন ফাঁস করে দিচ্ছে না? এদেশে সংবাদপত্র এখন স্বাধীন, তারা খুঁজে বার করতে পারছে না প্রমাণ? তা ছাড়া, মাঝখান থেকে ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হল এবং ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল ইয়েলেৎসিনের, গরবাচেভের তো নয়। তিনি যেন অনেকটাই করুণার পাত্র।

ষড়যন্ত্রকারীরা যে স্বার্থান্বেষী ও দুর্বল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে তাদের অনেকেরই চাকরি যাবে কিংবা পদমর্যাদা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাতেই

তারা যে-কোনও উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল। সে যোগ্যতা তাদের আছে কি না বুঝে দেখেনি। গরবাচেভ-ইয়েলেৎসিনকে বন্দি করার বদলে তারা নিজেরাই বিপদের ভয়ে কাঁপছিল। সবাই দেখেছে যে প্রেস কনফারেন্সের সময় ইয়ানাইয়েভের মুখ ছিল পাণ্ডুর বর্ণ এবং হাত কাঁপছিল সত্যিই। পরে গরবাচেভ বলেছেন, ওরা প্রচার করেছিল যে, আমি অসুস্থ, কিন্তু আসলে অসুস্থ ছিল তো ওরাই।

এই এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে সত্যিই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন। নিষিদ্ধ হল কমিউনিস্ট পার্টি। বিশ্বের প্রথম ও সর্ববৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা অসফল বলে গণ্য হল। ফাঁস হয়ে গেল যে দেশের মানুষকে না খাইয়ে রাখা এবং নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে সমাজতন্ত্রের নামে।

সোভিয়েত পার্লামেন্টের সাদা ধপধপে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি বেশ বিষণ্ণ বোধ করলাম। মাত্র কিছুদিন আগে এখানে এক বিপ্লব ঘটে গেছে, এখন তার কোনও চিহ্নমাত্র নেই। কোনও পাহারা নেই, কোথাও মিলিটারি বা পুলিশ চোখে পড়ে না, অনেকে ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে, আমরাও যদৃচ্ছ ঘুরছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় একজন ভারতীয় হিসেবে আমার খুশি হওয়ার কোনও কারণ নেই। এ দেশের অভ্যন্তরে কতরকম অনাচার ঘটেছে তা আমাদের অজানা ছিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই ভারতবন্ধু। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ান যে কোনো সঙ্কটের সময় ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্নে আমরা সব সময় সোভিয়েত দেশের সমর্থন পেয়েছি। আমি আগের বার এসে যখন এ দেশে ঘুরেছি, তখন সর্বত্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। রাস্তার লোক এসে ভারতীয় বলে চিনতে পেরে খাতির করেছে, এমনটি আর কোনও দেশে ঘটে না। সেই দেশের রূপ বদলে গেল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল? ভারত কি এবার হারাবে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধুকে।

আর একটি প্রশ্নও অনবরত ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে। এত সহজে কী করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল এ দেশে? সি পি এস ইউ, দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি, দারুণ তার প্রতিপত্তি, একটি মাত্র নিষেধাজ্ঞায় সেই পার্টি একেবারে স্তব্ধ? কোনও প্রতিবাদ হল না? এখানকার মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, মিছিল-সমাবেশে কোনও বারণ নেই। কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে হাজার হাজার ক্যাডাররা রাস্তায় নেমে এল না কেন? এই পার্টির ক্যাডাররা সব দেশেই লড়াকু হয়, তারা ভয় পাবে কেন, বিশেষত যখন লাঠি-গুলির আশঙ্কাও নেই? কমিউনিস্ট পার্টির ওপর মহলের নেতারা না হয় অভ্যুত্থান সমর্থন করার লজ্জায় কিংবা নিজেদের নানারকম দুষ্কর্ম গোপন করার জন্য আড়ালে রয়ে গেছে, কিন্তু ক্যাডারা কেন পার্টির সমর্থনে প্রকাশ্যে দেখা দিল না?

তা হলে কি এত বড় সি পি এস ইউ নিছক একটা মাথা ভারী পার্টি হয়ে গিয়েছিল, যার শুধু এক গুচ্ছ নেতা আছে ক্যাডার নেই?

॥ ৩ ॥

মস্কোয় পৌঁছোবার আগে আমাকে জার্মানির অনেকগুলো শহর ঘুরতে হয়েছে। ভারত উৎসব চলছে সে দেশে, সেই সূত্রে আমন্ত্রণ। এর আগে জার্মানির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে দেখার সুযোগ আমার হয়নি, এখন পূর্ব-পশ্চিম একাকার, দুই দিকের মিলনের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। দেওয়াল ভাঙার উন্মাদনা ও উল্লাস থিতিয়ে গেছে অনেকখানি, লাভ-লোকসান নিয়ে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। এত বড় একটা পরিবর্তনের পর কিছু বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার সৃষ্টি হবেই। পূর্ব জার্মানির মানুষ স্বাধীন

হয়েছে বটে কিন্তু পশ্চিম জার্মানির মতন যে তাৎক্ষণিক সমৃদ্ধি আশা করেছিল, তা জোটেনি। পশ্চিমেও কর-বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য জমা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষোভ। কিন্তু জার্মানির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনই সুদৃঢ় যে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও কোনও কিছুই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়নি, পাওয়া যায় সব কিছুই, কালোবাজারির প্রশ্নই ওঠে না, দরবৃদ্ধিও বেসামাল রকমের নয়।

পূর্ব দিকে অনাধুনিক কলকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় তুর্কি ও ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশি ও শ্রীলঙ্কার ইমিগ্রান্টসদের ওপর হামলা চলছে কোনও কোনও জায়গায়, উগ্রপন্থী নব-নাতসি দলেরও সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের দেশে এসব কোনও কিছুই লুকিয়ে রাখা যায় না। দুই জার্মানির মিলনের এমন তাড়াহুড়োর কী দরকার ছিল, এ প্রশ্ন অনেক জায়গাতেই শোনা যায়। পূর্ব জার্মানির দিকে কেউ কেউ তিক্তভাবে বলে, দুই জার্মানির মিলনের ফলে আমরা কী পেলাম? এর চেয়ে আগের অবস্থাটাই বা মন্দ ছিল কী? ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যখন নানারকম ডামাডোল শুরু হয়েছিল, চাল-চিনি-কাপড়-কয়লার জন্য রেশনের লাইনে দাঁড়াতে হত, তখনও কিছু বয়স্ক লোক বলত, এর থেকে ইংরেজ রাজত্ব ভালো ছিল।

পশ্চিম দিকের লোকদের কাছে পূর্ব দিকের লোকরা এখনও অনেকটা গরিব আত্মীয়ের মতন। ট্রেনে যাওয়ার সময় এক পূর্ব দিকের সহযাত্রী এই সব প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা করতে-করতে বলল, ৪৫ বছর আমরা দেওয়ালের ওপাশে ছিলাম, দেওয়াল ভাঙার জন্য ব্যাকুলতা ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন দেখছি, ওদের সঙ্গে আমাদের মানসিক ব্যবধান এতটাই তৈরি হয়ে গেছে যে, একমাত্র ভাষার মিল ছাড়া আমাদের দু'দিকের জার্মানদের আর কী মিল আছে?

একজন বঙ্গবাসী ও ভুক্তভোগী হিসেবে আমি মনে-মনে বললাম, ভাগ্যিস তোমাদের ধর্মের অমিল নেই। তা হলে নিশ্চিত এতদিনে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যেত।

দুই অসম দিকের মিলনের ফলে বেশ কিছু বিক্ষোভ, হতাশা, তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু গোটা জার্মানির জীবনযাত্রায় তার প্রভাব বিশেষ পড়েনি। বেকাররা যা ভাতা পায়, তাতে তাদের খাদ্য-বস্ত্র পানীয় ঠিক জুটে যায়। মিটিং-মিছিল হয়, কিন্তু তার জন্য যানবাহন বা উৎপাদন বন্ধ থাকে না। এশিয়ান ইমিগ্রান্টসদের ওপর হামলা হচ্ছে বটে, আবার বহু জার্মান তার প্রতিবাদও জানাচ্ছে। জার্মান মুদ্রা বিশ্বের বাজারে এখনও অত্যন্ত সুদৃঢ়। ডলারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার দাম বাড়ছে।

জার্মানি থেকে মস্কোয় এসে প্রথমেই যেটা চোখে বিসদৃশ লাগে, তা হল রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং সোভিয়েত মুদ্রা রুবলের হেনস্থা।

জার্মানির পশ্চিম অঞ্চলের রাস্তা একেবারে একঘেয়ে রকমের নিখুঁত। রেন্সশাইড থেকে বার্লিনে ফিরেছিলাম গাড়িতে বেশ কয়েকশো কিলোমিটার, কোথাও একটা গর্ত নেই, উঁচু-নীচু নেই। সেই তুলনায় মস্কোর রাস্তায় অনেক ফাটল ও খন্দ। সাড়ে সাত বছর আগেও এরকম দেখিনি। সরাসরি কলকাতা থেকে গেলে হয়তো এসব চোখে পড়ত না। কলকাতার সঙ্গে কোনও জায়গারই তুলনা হয় না, কলকাতা সত্যিই অতুলনীয়, এত খারাপ রাস্তা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। মস্কোর রাস্তা কলকাতার তুলনায় অবশ্যই ভালো, কলকাতার মতন এত নোংরা আবর্জনা সেখানে নেই।

আগে এক রুবলের সরকারি মূল্য ছিল দেড় ডলারের কাছাকাছি। আগেও ডলারের ব্ল্যাক মার্কেট ছিল অবশ্যই। কিন্তু আমি সরকারি অতিথি হিসেবে এসে সে ব্যাপারটা খেয়াল করিনি। গত দু তিন বছরে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্থানীয় মুদ্রার সঙ্গে ডলারের সরকারি ও বেসরকারি মূল্যমানের ব্যবধান প্রকটভাবে চোখে পড়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় বর্তমানের অবস্থাটা অবিশ্বাস্য রকমের। হাঙ্গেরি, রুমানিয়ায় দেখেছি এক ডলারে সাত গুণ, দশ গুণ বেশি স্থানীয় টাকা পাওয়া যায়। আর মস্কোতে? এক ডলারের চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ গুণ। প্রতিদিনই সেটা বাড়ছে। দশটা ডলার

ভাঙালে রাশি রাশি রুবল পাওয়া যায়। যার কাছে ডলার আছে, তার কাছে মস্কো এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা শহর!

তার কারণ, অনেক কিছুরই দাম বাঁধা আছে আগেকার মতন। যেমন ট্রেন ভাড়া। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাডের (সেন্ট পিটার্সবার্গের) প্রথম শ্রেণির ট্রেন ভাড়া। সারারাত গরম বিছানায় শুয়ে আরামের যাত্রা। এই দীর্ঘপথের ভাড়া ২৪ রুবল। ডলারের হিসেবে মাত্র আধ ডলার, আমাদের টাকার হিসেবেও বারো-চোদ্দ টাকা। এটা হাস্যকর না। রুবলের এই করুণ পরিণামের ফলেই ব্ল্যাক মার্কেট ও ঘুষের রাজত্ব চলছে চারদিকে। ওখানকার ঘুষের সঙ্গে আমাদের ঘুষের কোনও তুলনাই চলে না।

মস্কোর ট্যাক্সি কলকাতাকে বহু গুণ হার মানিয়ে দিয়েছে। ট্যাক্সিচালকরা সরকারি কর্মচারী, ভাড়ার রেটও বাঁধা। সেই জন্য কোনও ট্যাক্সিচালকই বাঁধা রেটে যেতে রাজি নয়। চলন্ত ট্যাক্সি হাত দেখালে গ্রাহ্যই করে না। স্ট্যান্ডের ট্যাক্সি আগে দরাদরি করে, বিদেশি দেখলে সরাসরি ডলারে ভাড়া দাবি করে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা কুড়ি টাকা মিটার উঠলে যদি চল্লিশ টাকা চায় আমরা আঁতকে উঠি, মস্কোর ট্যাক্সি কুড়ি রুবলের জায়গায় চাইবে পাঁচশো রুবল। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় একটা সগর্ব ঘোষণা ছিল যে সেখানে জিনিসপত্রের কোনও দাম বাড়ে না!

মস্কোর রাস্তায় যখন তখন দেখা যায় বহু নারী-পুরুষ চলন্ত গাড়িগুলির দিকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। ট্যাক্সি থামে না, কিন্তু অনেক প্রাইভেট গাড়ি বুড়ো আঙুল দেখলে থামে। যাত্রীদের তুলে নেয়। বিনা পয়সায় লিফট দেয় না অবশ্য, প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। গরবাচেভ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর গাড়ির মালিকদের এই ব্যবসায়ের আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সরকারি বাঁধা দামের দোকানগুলিতে এখনও কোনও জিনিসের দাম বাড়েনি। এটা এখন বেশ কৌতুকের ব্যাপার। দাম বাড়বে কীসের, কোনও জিনিসই তো নেই! সমস্ত সরকারি দোকান খালি। রেড স্কোয়ারের পাশে একটা সুপার মার্কেট আছে, এত বড় মার্কেট খুব কমই দেখা যায়। বহু দোকান, তার অধিকাংশই বন্ধ, যে দু-একটা খোলা আছে, তাদের অবস্থা করুণ। একটা দোকানে ঢুকে বেশ মজার ব্যাপার হল। সে দোকানটি সরকারি ঘড়ির দোকান, কিন্তু তাতেও একটাও ঘড়ি নেই। রয়েছে কিছু সাবান। তাও ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। আমরা জিগ্যেস করলাম, ঘড়ির দোকানে ঘড়ি নেই কেন? তখন কর্মচারীটি একটি শো-কেস দেখিয়ে দিল। তাতে রয়েছে কিছু হাতঘড়ির ব্যান্ড! অর্থাৎ এখন শুধু ব্যান্ড কিনে নিয়ে যান, পরে কখনও ঘড়ি কিনবেন। এই নিয়ে মস্কোতে, অনেক রসিকতা চালু আছে। একজন কেউ এক শিশি রান্নার তেল কিনতে গিয়েছিল, কিনে আনল এক জোড়া জুতো। কারণ, তেল নেই, জুতো আছে। এরপরে যখন তার জুতো কেনার দরকার হবে, তখন জুতো পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে টুথ ব্রাশ!

এই নিয়ে একটি বেশ মজার গল্প শুনেছি। মস্কো অলিম্পিকের সময় একটি হোটেল ঘোষণা করেছিল যে সেখানে বিশ্বের সবরকম খাবার পাওয়া যায়। যে কেউ যে-কোনও খাবারের অর্ডার দিলে তা পাওয়া যাবে আধঘণ্টার মধ্যে। যদি আধঘণ্টার মধ্যে দেওয়া না যায়, তা হলে হোটেল কর্তৃপক্ষ সেই খরিদ্দারকে দশ হাজার রুবল দেবে। একজন খরিদ্দার সেই হোটেলে এসে জিগ্যেস করল, আমাকে কচি উটের মাংস আর আলুর ঝোল খাওয়াতে পারবে? ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। খদ্দেরটি বসল টেবিলে, অপেক্ষা করতে লাগল। একটু বাদে সে জানলা দিয়ে দেখতে পেল, একটা বাচ্চা উটকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পেছন দিকে। তা হলে তার মনোমতন খাবার আসবেই। কিন্তু আধঘণ্টা কেটে গেল, ম্যানেজার কাঁচুমাচু মুখে এসে বলল যে, স্যার আপনার খাবারটা দেওয়া যাচ্ছে না, আপনি দশ হাজার রুবল নিন। খরিদ্দারটি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কেন পাওয়া যাবে না? ওই যে একটা উটকে নিয়ে যেতে দেখলাম? ম্যানেজার বলল, হ্যাঁ, উট জোগাড় হয়েছে বটে, কিন্তু আলু নেই।

সরকারি দোকানগুলোর পাশাপাশি এখন অনেক লোক পশরা সাজিয়ে বসে। কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকারি দোকানে হয় কিছুই নেই অথবা পড়ে আছে দু-চারটে পচা-ধচা জিনিস, আর পাশের দোকানগুলিতে বিক্রি হচ্ছে টাটকা সবজি ও মাংস। সরকারি বাঁধা রেটের চেয়ে অনেক গুণ বেশি মূল্যে। মাংসের সরকারি রেট আট রুবল, অন্য ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছে ষাট রুবল দরে। ভর্তুকি দিয়ে সস্তায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার এই অবস্থা! সোভিয়েত ইউনিয়নে মাঝারি ধরনের চাকুরিজীবীদের মাইনে গড়ে তিনশো রুবল। তারা ষাট রুবল কিলো দরে ক'দিন মাংস খাবে? বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেনশান মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ রুবল, এক কিলো মাংসের দামের চেয়েও কম।

রেড স্কোয়ারের পাশের সুপার মার্কেটটির অনেক ঘর এখন ভাড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিদেশি কোম্পানিতে। সরকারের ওই বাজার চালাবার সাধ্য নেই। ইতালিয়ান, বেলজিয়ান অনেক কোম্পানি বেশ কিছু দোকানঘর কিনে নিয়ে নিজেদের মতন করে সাজাচ্ছে। কোন মুদ্রায় জিনিসপত্র বিক্রি হবে সেখানে? বিদেশি ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই রুবলকে বেয়াত করবে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কলঙ্ক হল বিরোউস্কা অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রার দোকান। চিনেও এরকম দোকান আছে। এইসব দোকানে ভালো ভালো বাছাই করা সব বিদেশি দ্রব্য থাকে কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় কিছুই কেনা যাবে না, ডলার, পাউন্ড লাগে। এই সব কোনও দেশেরই সাধারণ মানুষের কাছে ডলার-পাউন্ড থাকা আইনসঙ্গত নয়। সুতরাং সাধারণ মানুষার পথে যেতে-যেতে জানলার কাচ দিয়ে এইসব লোভনীয় দ্রব্যগুলি দেখবে কিন্তু কিনতে পারবে না। একটা দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি এটা চরম অপমান। বিদেশি মুদ্রার কালোবাজারের উৎসও এইসব দোকান।

এখন বিদেশি মুদ্রার দোকান অনেক গজিয়ে উঠেছে মস্কো শহরে। এক আইরিশ কোম্পানি রীতিমতন একটা সুপার মার্কেট বসিয়েছে, তার মধ্যে ঢুকলে কে বলবে যে মস্কোতে খাবারদাবারের অভাব, পৃথিবীর সব কিছুই পাওয়া যায়, যেমন ইউরোপ-আমেরিকার সুপার মার্কেট হয়, ট্রলি ভরতি করে যা খুশি নেওয়া যায়, দাম দিতে হবে শক্ত কারেন্সিতে। এখানকার খরিদ্দার কারা? শুধু বিদেশিদের দিয়ে তো আর সুপার মার্কেট চলে না। অর্থাৎ ডলারের চোরাকারবারের প্রতি এখন চোখ বুজে থাকা হচ্ছে। সাধারণ রাশিয়ানরা যদি কোনও উপায়ে ডলার জোগাড় করতে পারে তো কিনুক।

যারা হতভাগ্য, যাদের ডলার নেই, তারা খাদ্য-নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সন্ধানে সারা দিন ঘোরে। রাস্তার যে-কোনও মানুষকে যদি জিগ্যেস করা যায়, এই দেশটা ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে, তা নিয়ে তুমি কী ভাবছ? সে বিরক্ত হয়ে উত্তর দেবে, ওসব ভাবার সময় নেই, আজকের জন্য দুটি আলু-মাখন পাওয়া যাবে কি না সেটাই আমার প্রধান চিন্তা।

ভবিষ্যৎ বলতে আগামী শীত। ভয়াবহ শীত। অনেকেই বলাবলি করছে যে এবারের শীতে খাদ্যসংকট আরও বাড়বে এবং জ্বালানির অভাবে ঘর গরম করা যাবে না।

মস্কো শহরে ঘুরে বেড়ালে এখন চোখে পড়ে শুধু চিন্তিত ও নিরানন্দ মানুষের মুখ। আমার পূর্ব পরিচিতরা অনেকেই শহরে নেই। যে যুবকটি আমার আগেরবারের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল, তার সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না, সে ইউক্রাইনের লোক। ইউক্রাইন এখন সোভিয়েত সংঘে থাকতে চায় না। আগেরবার রাইটার্স ইউনিয়ানে আড্ডা দিতে গেছি কয়েকবার। এবার শোনা গেল, কট্টরপন্থীদের তিনদিনের অভ্যুত্থানের সময় কোনও কোনও লেখক তাড়াহুড়ো করে সেই অভ্যুত্থান সমর্থন করে ফেলেছিল। এখন তারা লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে। অভ্যুত্থানের সমর্থকদের প্রতি এই মুহূর্তে অসন্তোষ প্রচণ্ড। লেখকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে, তাই রাইটার্স ইউনিয়ন বন্ধ। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং হাউজ, যেখান থেকে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হত, আমাদেরও কিছু কিছু অনুবাদ বেরিয়েছে, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। যারা অনুবাদকের চাকরি করত, তাদের ভবিষ্যৎ

অনিশ্চিত।

আবহাওয়া বেশ মনোরম, মস্কো শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান অবশ্যই রেড স্কোয়ার। সেখানে ভিড় তেমন নেই। লেনিনের মরদেহ দেখতে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন দেখেছি আগেরবার, এখন সে দিকটা ফাঁকা। এই দেহ সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। লেনিনগ্রাড অর্থাৎ সেন্ট পিটার্সবার্গের মেয়র আনাতোলি সোবচাক বলেছেন, লেনিনকে তো সরানো হচ্ছে না। লেনিনের ইচ্ছে ছিল, তাঁর জন্মস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হোক। এতকাল আমরা সেই ইচ্ছের মূল্য দিইনি। এবার তাঁকে রেড স্কোয়ার থেকে সরিয়ে এনে যথারীতি তাঁর জন্মস্থানে কবর দেওয়া হবে।

মস্কো শহরে স্টালিন বহুকাল নিশ্চিহ্ন, কিন্তু লেনিনের মূর্তি কেউ ভাঙেনি। বলটিক রাষ্ট্রগুলিতে লেনিনকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে শুনেছি, কিন্তু এখানে আমি দেখলাম, কার্ল মার্কসের একটা মূর্তির গায়ে অনেক হাবিজাবি লিখে রেখেছে কেউ, কিন্তু লেনিনের মূর্তিগুলি অবিকৃত। তবে সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে লেনিন সম্পর্কেও। বাক্-স্বাধীনতা পাওয়ার পর এখন কেউই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। আমাদের দেশে অনেকে মহাত্মা গান্ধিকে কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করেছেন, তাঁর তুলনায় লেনিন নিশ্চয়ই দেবতা নন। অনেকে বলছে যে, এই যে সাধারণ মানুষকে যখন তখন ধরপাকড় ও পুলিশি রাষ্ট্রব্যবস্থা, লেনিনই তো তার প্রবক্তা। কেউ কেউ আবার লেনিনকে বাঁচিয়ে এমন কথাও বলছেন যে একেবারে শেষের দিকে লেনিন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, এই ব্যবস্থা বদলাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন আর তাঁর ক্ষমতা ছিল না, স্টালিন কার্যত সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে লেনিনকে প্রায় গৃহবন্দি করে রেখেছিল। এসব কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। লেনিনের ব্যক্তিগত জীবন থেকেও অনেক কিছু খুঁড়ে বার করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তা ধর্তব্যের বিষয় নয়।

রেড স্কোয়ারে এখন প্রধান দ্রষ্টব্য একটি লাল পতাকা। মস্কো থেকে লাল রং একেবারে মুছে গেছে বলা যায়। আমি আগেরবার এসেছিলাম মে-দিবসের ঠিক আগে, তখন সর্বত্র ছিল লালে লাল, সমস্ত ল্যাম্পপোস্টে লাল পতাকা, মোড়ে মোড়ে সংগ্রামী শ্রমিকদের বড় বড় লাল রঙের কাটআউট ছবি। বস্তুত অত লাল দেখে গা শিরশির করত। লাল রং রক্তের রং তা চক্ষের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়। বড় বড় শিল্পীরা পারতপক্ষে লাল রং ব্যবহার করেন না। মিছিল-টিছিলে খুব বেশি লাল রং মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

এখন সব লাল যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাশিয়াতে ফিরে এসেছে তেরঙা ঝাণ্ডা, তারও ব্যবহার সর্বত্র নেই। পতাকার বাহুল্যই নেই। গোটা মস্কো শহরে এখন একটি মাত্র কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা লাল পতাকা আমার চোখে পড়েছে ক্রেমলিনের একটি অংশে। সেখানে গরবাচেভ বসেন, সোভিয়েত ইউনিয়ানের রাষ্ট্রপতির দপ্তর। তার কাছেই আর এক জায়গায় উড়ছে তেরঙা পতাকা। সেটা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিনের এলাকা। ক্রেমলিনে এখন এই দুটি পতাকা উড়ছে। তবে গরবাচেভ-এর কক্ষের ওই সবেধন নীলমণি লাল পতাকাটিরও দিন ঘনিয়ে এসেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ান বলে আর কিছু থাকছে না, কয়েকটি রাজ্য মিলে যদি একটি আলাদা ধরনের জোট বেঁধে থাকতে রাজিও হয়, তার পতাকা কী হবে কে জানে। ওই লাল পতাকা টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা খুবই কম।

॥ ৪ ॥

করে সাজাবার প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারণ কোনওরকম প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল না। আর প্রতিযোগিতা না থাকলে বিজ্ঞাপনেরও প্রশ্ন নেই।

আমরা যে, সব সময় বিজ্ঞাপন পছন্দ করি, তা নয়। অনেক বিজ্ঞাপনের ছবি ও গালভরা মিথ্যে রীতিমতন কুৎসিত লাগে, অনেক পশ্চিমি দেশে বিজ্ঞাপনে আলোর জাঁকজমক দেখে মনে হয় বিদ্যুতের অপচয়। তবু আমরা বিজ্ঞাপনে অনেকটা অভ্যস্তও হয়ে গেছি। নাগরিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে নানা ধরনের দোকানপাট জড়িয়ে থাকবেই। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন না থাকলে বর্ণহীন মনে হয়। বিজ্ঞাপনের মধ্যে মুনাফার গন্ধ এবং ভাবী ক্রেতাদের ছেলেমানুষ ঠাওরাবার ব্যাপার থাকলেও আর একটা অন্য দিকও আছে। মানুষ সবসময় বৈচিত্র্য সন্ধানী এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সেই সুযোগ নেয়। শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্যে মনের ক্ষুধা মেটে না। কিংবা এমনও বলা যায়, অনেক অপ্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য সুন্দর জিনিস আসলে মানুষের খুবই প্রয়োজনীয়। সামান্য এক টুকরো ন্যাকড়া পকেটে রাখলেই মুখ মোছা যায়, তবু মানুষ নানারকম নকশা কাটা রুমাল ব্যবহার করে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপন্ন দ্রব্যের সেই বৈচিত্র্য নেই, তাই বিজ্ঞাপনও নেই। মানুষের পছন্দের কোনও অধিকার থাকবে না, সরকার যা বানাবে, সকলে তাই নিতে বাধ্য। সরকার লাভ করতে চায় না। দেশের সকলকে সমান মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সরবরাহ করবে, এই নীতি শুনতে খুবই ভালো। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তা অবাস্তব। মূল্য কম হলেও সরকারি দ্রব্য সবসময় উৎকৃষ্ট হয় না। বৈচিত্র্যহীন বস্তু কম দামে পেলেও মানুষ পছন্দ করে না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সরকার অতি প্রয়োজনীয় বস্তুও সরবরাহ করতে না পারলে পাশের দোকান থেকে কিনে নেওয়ার উপায় নেই। টুথপেস্ট কিংবা টয়লেট পেপার পাওয়া যায় না, এমনও হয়।

এখন অবশ্য মস্কোতে কিছু কিছু বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের দোকানও খুলছে ক্রমে ক্রমে। তবে দু'রকম মুদ্রার ব্যবহার ন্যক্কারজনক লাগে। বাইরের লোকের কাছে ডলার থাকলে যা খুশি কিনতে পারবে, আর মস্কোর নাগরিকরা রুবল দিয়ে অনেক কিছুই কিনতে পারবে না, এই অপমানজনক ব্যবস্থাটা এখন সর্বত্র প্রকট। এমনকি, মস্কোতে 'দিল্লি' নামে যে ভারতীয় রেস্তোরাঁটি খোলা হয়েছে, সেখানেও দু'টি ভাগ। একদিকে ডলারের খরিদ্দার, অন্যদিকে রুবলের। বলাই বাহুল্য, রুবলের দিকটা অনেক মলিন এবং সেখানে সব কিছু পাওয়া যায় না।

সন্ধের পর মস্কোতে যাওয়ার জায়গা বিশেষ নেই। একদিন রাত এগারোটার পর আমরা এমনিই শহর ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সি পি এস ইউ-র বিরাট ভবনের সামনের রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। সদর দরজায় তালা বন্ধ, পুরো বাড়ি অন্ধকার শুধু আলো জ্বলছে একতলার একটি ঘরে, বোধহয় সেখানে রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রহরীরা। শোনা যায় যে, এই কমিউনিস্ট পার্টির উঁচু দিকের নেতারা একশো বিলিয়ান ডলার গোপন রেখেছে বিভিন্ন জায়গায়। এখন ইয়েলেৎসিনের সরকার সেই বিপুল অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে।

ঝারঝিনস্কি স্কোয়ারে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে। এককালে এই জায়গাটার নাম শুনলেই অনেকের ভয়ের শিহরণ হত, অসময়ে কেউ এদিক দিয়ে হাঁটত না। এখানেই কে জি বি-র হেড কোয়ার্টার। ওই প্রকাণ্ড বাড়িটিতে বহু মানুষের আয়ু হারিয়ে গেছে। পুরো এলাকাটা জুড়েই মাটির তলায় রয়েছে জেরা কক্ষ। সেখানে আমরা হাঁটছি রাত সাড়ে এগারোটায়। আমার সঙ্গী সুবোধ ও সমর রায় বলল, কিছুদিন আগেও এটা ছিল অবিশ্বাস্য। আমাদের অবশ্যই গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হত। এখন শুনলাম, শুধু কিছু কিছু গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

চৌরাস্তার মাঝখানে উঁচু বেদির ওপর ছিল ঝারঝিনস্কির দীর্ঘ প্রস্তরমূর্তি। লেনিনের সহচর এই ঝারঝিনস্কি বলশেভিক বিপ্লবের ঠিক পরেই গুপ্ত পুলিশবাহিনী সৃষ্টি করেছিল। এতদিন যারা কে জি বি-র ভয়ে মুখ খোলেনি, তারা এখন বলছে যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে জারের আমলের পুলিশি ব্যবস্থাই আবার চালু করা হয়েছিল। জারের আমলেও গুপ্ত পুলিশ যে-কোনও মানুষকে সামান্য

সন্দেহে ধরে নিয়ে যেত, তারপর তাদের অনেকেরই আর হদিশ পাওয়া যেত না। ডস্টয়েভস্কিকে কত তুচ্ছ কারণে গুলি করে মারার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা আমরা জানি। বিপ্লবের পরেও সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা পায়নি। স্তালিনের আমলে নাকি মাসে অন্তত দশটা অভিযোগ দায়ের করতে না পারলে শাস্তি পেতে হবে এই ভয়ে গুপ্তচররা নিরীহ পাড়াপ্রতিবেশীদের নামে চুকলি কেটে আসত কে জি বি-র কাছে। এরকম ভীতির আবহাওয়া তৈরি করা কি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? সমাজতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে যে ব্যক্তিটি সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই জোসেফ স্তালিনই আসলে সমাজতন্ত্রের এমন ব্যর্থতার জন্য দায়ী। এদেশে এখনও মুষ্টিমেয় সংখ্যক যারা কমিউনিজমে বিশ্বাসী, যারা মনে করে যে সমাজতন্ত্রের পথে কিছু ভুলভ্রান্তি ঘটলেও আদর্শটা মিথ্যে হতে পারে না, তারাও কিন্তু, ঘৃণার সঙ্গে ছাড়া, কখনও উচ্চারণ করে না স্তালিনের নাম।

ঝারঝিনস্কির মূর্তিটা উপড়ে ফেলা সেই ঘৃণারই প্রকাশ। স্তালিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ওই মূর্তিটা ছিল সমস্ত অত্যাচারের প্রতীক। ওই মূর্তির মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন নামহীন মানুষ, এই ছবি ছাপা হয়েছে বিশ্বের সমস্ত সংবাদপত্রে। দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিল। আমরা তিনজনে এখন সেই শূন্য বেদিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কী মজবুত করে বানানো হয়েছিল এই পাথরের মঞ্চ, আরও দু-এক শতাব্দীতে ওই মূর্তির ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মানুষের ঘৃণার কাছে পাথর-বন্দুক-ট্যাংক-মেশিনগান সবই শেষ পর্যন্ত হার মেনে যায়।

আর কোনও পথচারী নেই, তবু ভারী জুতোর শব্দ শুনে আমরা মুখ ফিরিয়ে তাকাই। অদূরে রাস্তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজন পুলিশ। তারা আমাদের কিছু বলবে কি না এই কৌতূহল নিয়ে আমরা অপেক্ষা করি। কিন্তু তারা কিছুই বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে। একটু পরে আমরাই এগিয়ে যাই ওদের দিকে।

আমরা তিনজনই চেহারায় বিদেশি হলেও সুবোধ ও সমর ওই পুলিশদের মাতৃভাষা জানে জলের মতন। সুবোধ যেই জিগ্যেস করল, কেমন ঠান্ডা পড়েছে, স্বদেশিভাষা শুনে তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ওরা তিনজনই বেশ তরুণ, সারল্য মাখা মুখ, ওরা মিলিশিয়ার অন্তর্গত, ওদের কাজ সারারাত রাস্তায় পাহারা দেওয়া। আমাদের দেখে ওরা অবাক হয়েছে, বেদিটার ওপর উঠে আমরা এত রাতে কেন গল্প করছি, তার কারণ বুঝতে পারছে না। সত্যিই তো কোনও কারণও নেই, আমরা এমনিই এসেছি ঘুরতে-ঘুরতে। ওরা বলল, ঝারঝিনস্কির মূর্তিটা আছে একটা মিউজিয়ামের পাশের বাগানে, আমরা ইচ্ছে করলে যেতে পারি সেখানে।

আমাদের পেয়ে ওরা খুশিই হয়েছে মনে হল, গল্প করতে লাগল নানারকম। আমি ওদের ভাষা জানি না, আমাকে বোঝানো হচ্ছে অনুবাদে। আমি প্রকৃতই বিদেশি এবং এই দ্বিতীয়বার মস্কো এসেছি শুনে ওরা সুবোধকে বলল, আমাদের এই অতিথিটিকে জিগ্যেস করুন তো, এই যে আমাদের দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল, এতে আমাদের ভালো হবে, না আরও খারাপ হবে?

আমি উলটে জিগ্যেস করলাম, তোমরাই বলো না, তোমাদের কী মনে হয়।

তিনজন তরুণ পুলিশই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।

এটা রাশিয়ার অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই প্রতীক প্রশ্ন বলা যায়। সব দেশেই সাধারণ মানুষ সমাজ, সরকার বা বিশ্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, নিজস্ব রুজি-রোজগার, খাদ্য-বস্ত্র-গৃহের সংস্থান আর নিজের পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় দিন কাটিয়ে দেয়। এতদিন এরা একটা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, ভালো-মন্দ যাই-ই হোক সেটা জানা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যৎ অজানা। সেই অজানা সম্পর্কে সংশয় থাকাও স্বাভাবিক। তা ছাড়া, এতদিন ওপর থেকে যা চাপিয়ে দেওয়া হত, তাই মান্য করতে সবাই বাধ্য ছিল। এখন ওপর থেকে সেই

চাপ সরে গেছে, তার ফলে এসেছে এক শূন্যতা। মানুষ একমাত্র শূন্যতার কাছেই হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

পরদিন আমরা মস্কোর নতুন মিউজিয়ামটি দেখতে গিয়েছিলাম। ভেতরটা এখনও সম্পূর্ণ সাজানো হয়নি, ভেতরে দ্রষ্টব্য খুবই কম। তবু টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। বাইরে বাগানের এক পাশে খানিকটা জায়গাকে বলা যায় মূর্তির কবরখানা। সদ্য উৎপাটিত ঝারঝিনস্কির লম্বা মূর্তিটা পড়ে আছে মাটিতে। চিৎ ও উপুড় অবস্থায় একাধিক স্তালিন। আরও কয়েকটি মূর্তি ঠিক কাদের তা চেনা গেল না। আমাদের সঙ্গে একজন জর্জিয়ার যুবক ছিল। সে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি দেখিয়ে বলল, ওই তো লেনিন! আমি খুব কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলাম, না, লেনিন নন, অন্য কেউ। অত্যুৎসাহী জর্জিয়ানটির বোধ হয় লেনিনকেও ধরাশায়ী করার ইচ্ছে। এখন উগ্র জাতীয়তাবাদের সময়, জর্জিয়ানরা লেনিনকে নস্যাৎ করে স্তালিনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় কি না, তাই-ই বা কে জানে। ওদের কথাবার্তায় সেরকম আভাস যেন মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

জাতীয়তাবাদের এই উগ্রতাও অদ্ভুত। সারা বিশ্বের মার্কসবাদীরা ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবিকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু টয়েনবি অনেক দিন আগেই বলে গিয়েছিলেন যে কমিউনিজমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে ন্যাশনালিজম। এখন তো দেখা যাচ্ছে, সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জাতীয়তাবাদই জয়ী হল। মার্কসবাদে যেমন শ্রেণিবৈষম্য কিংবা ধর্মের স্থান নেই, সেইরকম জাতীয়তাবাদেরও স্থান নেই। সারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির ঐক্যের ডাক দিয়েছে মার্কসবাদ, কিন্তু এই 'সারা বিশ্ব' নিছক কথার কথা, কোনও এক দেশের বঞ্চিত শ্রমিকদের নিয়ে অন্য দেশের শ্রমিকরা মাথা ঘামায় না। প্রবল স্বাজাত্যাভিমান সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশ যেমন ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হলেও ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও শিক্ষা দেওয়া হয়নি সাধারণ মানুষকে, ধর্মের অরাজকতা চলছে যথেষ্টভাবে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও শুধু কিছু বুলি শোনানো হয়েছে, স্লোগান দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে মানুষের মনের ভাষা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে ওঠার কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয়নি। যুগোস্লাভিয়ার রাশ একটু আলগা হতেই সার্বিয়ান আর ক্রোয়েশিয়ানরা খুনোখুনি শুরু করেছে। এতকাল সাম্যবাদের নামে তারা পাশাপাশি ছিল অথচ, তাদের ভেতরে-ভেতরে পরস্পরের প্রতি এমন তীব্র বিদ্বেষ জমে ছিল? চিন ও সোভিয়েত দেশের সীমান্ত সংঘর্ষের সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল ভিন্ন জাতিতত্ত্ব। সমাজতন্ত্র গ্রহণ করলেও শ্বেতাঙ্গ ও পীতাঙ্গ মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে শান্তির পথে এগোতে পারে না। শুধু গায়ের রং নয়, ভাষাও মিলনের অন্তরায়। রুমানিয়ানরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না হাঙ্গেরিয়ানদের। চেকোস্লোভাকিয়ায় চেক ও স্লোভাক এই দুই আলাদা ভাষাভাষীদের মধ্যে বিরূপতা রয়ে গেছে। আলবেনিয়ানরা অন্য সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মিশতে চায় না। পোল্যান্ডের মানুষ রাশিয়ানদের সম্পর্কে তিক্ত সুরে কথা বলে। পূর্ব জার্মানিতে কালো ভিয়েতনামিদের অবজ্ঞা দেখানো হত।

সোভিয়েত রিপাবলিক যে ভেঙে গেল। এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই যে স্বাধীন হতে চাইছে, এই ঘটনা থেকে আর একটি সত্য বেরিয়ে আসছে। এতকাল তা হলে এদের জোর করে ধরে রাখা হয়েছিল? সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদের দীক্ষা হয়নি, নিছক জোর জবরদস্তি! আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, এই শুনতে-শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আমেরিকা যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা অস্বীকারও করা যায় না। কিন্তু রাশিয়াও যে সোভিয়েত ইউনিয়নের নামে এতকাল এক সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে গেছে, তা গোপন করে যাওয়া হয়েছিল কেন? নিজেরা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে অন্যকে সেই একই অভিযোগে গালমন্দ করা যায়?

আমাদের সঙ্গে সদ্য পরিচিত জর্জিয়ান যুবকটি সেখানকার এক মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি। বুদ্ধিমান, ঝকমকে চেহারা, দায়িত্বপূর্ণ পদে আছে। তার মুখে সাংঘাতিক এক চমকপ্রদ কথা শুনলাম। কথায়-কথায় সে বলল, তোমরা ভারতীয়রা দুশো বছর ইংরেজদের অধীনে ছিলে, তবু আমি বলব,

তোমরা ভাগ্যবান। এ কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাতেই সে আবার বলল, তোমরা পরাধীন ছিলে বটে, তা হলেও তোমরা ছিলে ব্রিটিশদের মতন এক সভ্য জাতের অধীনে। আমাদের মতন বর্বর রাশিয়ানদের অধীনে তোমাদের থাকতে হয়নি।

আমি একেবারে স্তম্ভিত। আমি এ পর্যন্ত যত রাশিয়ান দেখেছি, তারা সকলেই ভদ্র, সভ্য, উদার, অনেকেরই বেশ রসিকতা জ্ঞান আছে। কিন্তু জাতিগতভাবে তারা জর্জিয়ানদের চোখে বর্বর? একেই বলে জাতি-বৈর। আমি জর্জিয়ায় কখনও যাইনি বটে, কিন্তু আগে ল্যাটভিয়া এবং ইউক্রাইনে গেছি। সেখানে যাদের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল, সকলের মুখেই মহান সোভিয়েত ইউনিয়ানের জয়গান শুনেছি। এখন ল্যাটভিয়ার এবং ইউক্রাইনের যেরকম ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে রাশিয়া থেকে বিযুক্ত হওয়ার, তাতে বোঝা যাচ্ছে, সেইসব জয়গান ছিল নিতান্ত মুখস্থ বুলি।

আমাদের দেশেও যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ানের প্রদর্শিত পথকে আদর্শ পথ ভেবে এসেছেন, তাঁরাও কি বুঝতে পারেননি যে জোর-জুলুম করে, কামান-ট্যাংকের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জাতিকে এক পতাকার নীচে মেলাবার চেষ্টা চলেছে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্তালিন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে গ্রাস করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন, আগেকার রাশিয়ান সাম্রাজ্যেরই একটা অন্য রূপ। সমাজতন্ত্র একটা ছুতো। হাঙ্গেরি-পোল্যান্ড-চেকোশ্লোভাকিয়ার মতন দেশগুলির শাসকদের মস্কোর অঙ্গুলি হেলনে পুতুলের মতন উঠতে-বসতে হত। সোভিয়েত ইউনিয়ানের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির তো আলাদাভাবে কোনও কণ্ঠস্বরই ছিল না। সর্বত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ান ভাষা। যুগোশ্লোভিয়ায় গিয়ে দেখেছি, সেখানে অনেকগুলি ভাষা এবং তা নিয়ে রেষারেষি আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই রুশ ভাষা শিখতে বাধ্য।

বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এতগুলি রাষ্ট্রের ওপর ডান্ডা ঘুরিয়েও রাশিয়া তাদের অধীনস্থ রাখতে পারল না। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আর চাইল না চাটুকার হয়ে থাকতে। চোখ রাঙিয়ে, হাতে অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখিয়ে কোনও আদর্শ প্রচার করা যায়? মার্কসবাদ যদি সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ হয়, তা হলে এতগুলি বছর ধরে সেই পথে থেকেও আর কোনও রাষ্ট্র তা মানতে চাইছে না কেন? ভুল হয়েছিল কোথায়? মার্কসবাদের বিরুদ্ধাচারীরা নয়, প্রকৃত মার্কসবাদীদের মনেই তো এই প্রশ্ন জাগা উচিত। শুধু গরবাচেভ বা ইয়েলৎসিন বা দু-তিনজনের ভুলের জন্য এতবড় একটা আদর্শ, এতবড় একটা সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ল, এটা শিশুর যুক্তি। অতিসরলীকরণ।

কেউ কেউ অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জোর জবরদস্তি কিংবা মগজ ধোলাই করে রাশিয়ান সমাজতন্ত্র বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। খুবই বিস্ময়কর লাগে, বহুকাল আগে, উনিশশো বাইশ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইতিহাসের গতি সম্পর্কে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

The recent revolution in Russia is very interesting study. The Shape which it has now assumed is due to the attempt to force Marxian doctrines and dogmas on the unwilling genius of Russia. Violence will again fail. If I have read the situation accurately, I except a counter revolution. The soul of Russia must struggle to free herself from the socialism of Karl Marx.

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়ে অনেক প্রশংসার কথা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশংসার ব্যাপারে ছিলেন অকৃপণ। জীবনে কি তিনি কখনও কারুর নিন্দে করেছেন? যাদের পছন্দ করতেন না (যেন, আধুনিক কবিদের), তাদেরও তিনি প্রশংসার সার্টিফিকেট দিতে দ্বিধা করতেন না। ইতালিতে গিয়ে আতিথ্যের বহর দেখে তিনি মুসোলিনিরও প্রশংসা করে ফেলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া সফর ছিল ১৪ দিনের। সমস্ত বিদেশি অতিথিদেরই দু'সপ্তাহের ভিসা দেওয়া হত। এবং আগে থেকে নির্দিষ্ট, সাজানো গোছানো জায়গাগুলিই দেখানো হত তাঁদের। রাশিয়ায় প্রশংসনীয় অনেক কিছুই ছিল অবশ্যই এবং রবীন্দ্রনাথ যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গেই তার প্রশংসা করেছেন। সংস্কার থেকে মুক্তি, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দমন, মানুষে মানুষে সম-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা, এসব কোন কবি না চায়? কিন্তু এই মহৎ আদর্শের নামে জোর জবরদস্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ, এসবও সেই দূরদর্শী কবির নজরে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে উদ্ধৃতি যারা প্রচারের কাজে লাগায়, তারা রবীন্দ্রনাথের ওইসব মন্তব্যের উল্লেখও করে না। 'রাশিয়ার চিঠি'র রুশ অনুবাদে ওইসব অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সামান্য বিকৃতি হলেই আমরা হইচই তুলি। ইন্দিরা গান্ধির এমার্জেন্সির আমলে কোনও কোনও নির্বোধ প্রশাসক রবীন্দ্রনাথের দু-একটি কবিতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চেয়েছিল। সে জন্য ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস দল অবশ্যই ধিক্কারযোগ্য। কিন্তু সোভিয়েত দেশে রবীন্দ্রনাথের লেখার ওপর কাঁচি চালিয়ে যখন প্রকাশ করা হল, তখন আমরা উচ্চবাচ্য করিনি।

॥ ৫ ॥

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড ট্রেনে এক রাত্রির পথ। আমি এ দেশে এসে পৌঁছোবার মাত্র কয়েকদিন আগেই লেনিনগ্রাড শহরের নাম বদলের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। লেনিনের দুটো-একটা মূর্তি ভাঙা কিংবা সরিয়ে ফেলার চেয়েও অনেক মর্মান্তিক এই নাম পরিবর্তন। এই শহরের সঙ্গে লেনিনের স্মৃতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রমিক অসন্তোষ এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ শুরু হয় এখানেই। শ্রমিক সংঘ ও সৈন্যবাহিনী হাতে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে জারকে এই শহরে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয়নি, তেসরা এপ্রিল জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কেরেনস্কির প্রধানমন্ত্রিত্বে গঠিত হয়েছিল জাতীয় সরকার। লেনিন অবশ্য সে সময় এখানে উপস্থিত ছিলেন না। জারের পতনের খবর পেয়ে তিনি সুইজারল্যান্ড থেকে দ্রুত চলে আসেন, তারপর ২৫ অক্টোবর (এখনকার পরিবর্তিত ক্যালেন্ডারে ৭ নভেম্বর) বোলশেভিক বিপ্লবের শুরু। সম্রাটদের বিখ্যাত শীতপ্রাসাদ দখল করে নিয়ে লেনিন কমিউনিস্ট পার্টির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেন। নিঃসন্দেহে এ এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। একটা রাজবংশকে চিরকালের মতন মুছে দিয়ে ক্ষমতায় এল সাধারণ মানুষ।

লেনিনের আমলে এই শহরের নাম ছিল পেট্রোগ্রাড। শহরের নাম বদল করার রীতি রাশিয়ায় অনেক দিনের। ব্যক্তিবিশেষের নামে শহরের নামকরণও এদেশে প্রচলিত। অন্যান্য দেশে সাধারণত এরকম ঘটনা ঘটে না, একটা শহরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একবার স্থান করে নিলে তার পরিবর্তন না করাই সংগত। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট পিটার দা গ্রেট সম্ভবত চক্ষুলজ্জায় নিজের নামে এই নতুন শহরের নামকরণ করেননি, কিন্তু খুঁজে খুঁজে এমন এক সন্তের নাম বার করেছিলেন, যাঁর সঙ্গে নিজের নামের মিল আছে। সেন্ট পিটার্সবার্গ নামটি বদলে ফেলা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। বার্গ কথাটায় জার্মান গন্ধ আছে, তাই নতুন নাম হল পেট্রোগ্রাড। এই নাম অবশ্য দশ বছরের বেশি টেঁকেনি। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর নামে সম্মানিত হল এই শহর। কিন্তু নাম একবার বদলালে যেন বারবার বদলাবার ঝোঁক এসে যায়। কয়েক দশক আগে এ দেশে স্তালিনগ্রাড নামেও একটা শহর ছিল, স্তালিনের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়ার ফলে সেই শহরেরও নাম বদলেছে। এবার, সর্বকালের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে লেনিন সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে, তাঁর নামাঙ্কিত শহর আবার রূপান্তরিত হল। প্রথমে শোনার পর

কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল বিনা প্রতিবাদে? কোনও আপত্তি উচ্চারিত হল না।

লেনিনগ্রাড সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে গেল কেন পেট্রোগ্রাডে কেন নয়, তাও বোঝা যায় না। সেন্ট পিটার্সবার্গে ধর্মীয় গন্ধ আছে, পেট্রোগ্রাড ধর্মনিরপেক্ষ।

কাগজে কলমে পরিবর্তন ঘটলেও মানুষের মন থেকে পুরোনো নাম সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। অনেকেই এখনও লেনিনগ্রাড বলে, শুধু দু-চারজন সরকারি কর্মচারী সে নাম বলে ফেললেও শুধরে নেয়।

মস্কো থেকে ট্রেনে চাপার সময় আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল ঘুষের। এখানে এখন কী ধরনের ঘুষের কারবার যে চলছে, তা বর্ণনা করলেও অবিশ্বাস্য মনে হবে। চতুর্দিকে ঘুষ। যে-কোনও কাজে ঘুষ। এক টাকার কাজের জন্য দশ টাকা ঘুষ। সরকার এখন শিথিল বলে লোকে বেপরোয়া। ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে ঘুষের শুরু। সারা রাতের জন্য ফার্স্ট ক্লাস স্লিপারের ভাড়া চব্বিশ রুবল, আগেকার হিসেবে চব্বিশ রুবল ছিল অনেক টাকা, এখনকার বাজারদরে টাকা দশেক মাত্র। কিন্তু এত সস্তায় টিকিট পাওয়া যাবে কেন, সব টিকিট অদৃশ্য, দালালদের কাছ থেকে কিনতে হল পাঁচগুণ দামে। তারপর রাত্রিবেলা ট্রেনে ওঠার সময় কন্ডাকটর গার্ড আমাদের দরজার কাছে আটকাল। আমাদের তিনজনের দলটিতে একজন রুশী, দু'জন বঙ্গসন্তান। আমরা কোনও রকম মুখ খোলার আগেই সে বলল, তোমাদের মধ্যে দু'জন বিদেশি, বিদেশিদের ডলারে টিকিট কেনার কথা, তোমাদের এ টিকিট চলবে না। আমরা যে বিদেশি, তা সে চিনল কী করে, নিশ্চয়ই গায়ের রঙ কালো দেখে। কোনও শ্বেতাঙ্গ জার্মান বা ফরাসি অবশ্যই অবলীলাক্রমে পার হয়ে যেত, কারণ, ট্রেনে চাপার সময় তো পাসপোর্ট দেখাতে হয় না।

যাই হোক, ট্রেন প্রায় ছাড়ার মুখে। গার্ডটি বলল, ঠিক আছে, তোমরা উঠে সিট খুঁজে বসো, আমি দেখছি কী করতে পারি। ট্রেন চলতে শুরু করার পর গার্ডটি আমাদের কুপেতে প্রবেশ করল। কোনও দরাদরির প্রশ্নই নেই। সে ব্যস্তভাবে বলল, তোমরা প্রত্যেকে একশো রুবল করে দিয়ে দাও। যেন এটা তার ন্যায্য দাবি। টাকাগুলো নিয়ে সে বেরিয়ে গেল, আর একবারও তার দেখা পাওয়া যায়নি। আগেরবার দেখেছিলাম, ভোরবেলা কন্ডাকটর গার্ড প্রত্যেক কুপেতে এসে চা দিয়ে যায়, এবার অনেক ডাকাডাকি করেও চা পাওয়া গেল না। সে ব্যবস্থা উঠে গেছে।

লেনিনগ্রাড রেল স্টেশনের মতন এতবড় একটা স্টেশনে একটা খাবারের দোকান নেই! সব বন্ধ। একটি মাত্র দোকানের সামনে লম্বা লাইন, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে অতি বিস্বাদ ট্যালটেলে কফি এবং ততোধিক খারাপ একটা বিস্কুট। আমাদের খিদে পেয়েছে, পকেটে পয়সা আছে, তবু আর কিছু কেনার উপায় নেই।

ট্রেনে যেমন ঘুষের অভিজ্ঞতা হল, স্টেশনে সেরকম অভিজ্ঞতা হল ভিক্ষার। এদেশে এখন ভিখারি এমন কিছু দুর্লভ নয়। মস্কোর রাস্তায় ভিখারি ও আঁস্তাকুড়-কুড়ানি দেখেনি বটে কিন্তু লেনিনগ্রাডের রেল স্টেশনের ভিখারিটি মনে ছাপ ফেলে দিয়ে গেল।

আমাদের রুশী বন্ধুটি গেছে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে। ট্যাক্সি সংগ্রহ করা অতি কঠিন কাজ। বাইরে অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু কেউ নির্দিষ্ট ভাড়ায় যাবে না, পঁচিশগুণ, তিরিশগুণ বেশি চায়। আমাদের দেখে বিদেশি বলে চিনতে পেরে তারা আরও বেশি দর হাঁকবে, তাই আমাদের আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে রুশী বন্ধুটি একা গেছে।

এই সময় একজন লোক এসে সুবোধের সঙ্গে কী যেন কথা বলতে লাগলেন। লোকটির চেহারা পর্বত-অভিযাত্রীদের মতন, সারা মুখে অবিন্যস্ত দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে একটা তালিমারা ওভার কোট। লোকটির ডান হাতের তিনটি আঙুল নেই, তার কথা বলার ভঙ্গিতে

কিছুটা যেন লজ্জা লজ্জা ভাব। কী বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তাকে ভিখিরি বলে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিনি, একটু পরে সুবোধ তাকে একটা বড় সংখ্যার রুবলের নোট দিল। তখন লোকটি সুবোধের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল আর সুবোধ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত লোকটিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে হল। আমি জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার বলো তো সুবোধ!

সুবোধ বলল, এই লোকটি আগে আর্মিতে ছিল। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আর্মির হয়ে লড়তে গিয়েছিল, সেখানে আঙুলগুলো কাটা গেছে। ওই হাত দিয়ে বিশেষ কোনও কাজ করতে পারে না, কিন্তু সরকার ওর জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি। যা সামান্য পেনসন পায়, তাতে এই ইনফ্রেশানের বাজারে দু-বেলা খাওয়া জোটে না। ভিক্ষে করার ব্যাপারে এখনও পাকা হয়ে ওঠেনি। এখনও লজ্জা পায়।

তোমার হাত ধরে টানছিল কেন?

কিছু বেশি টাকা পেয়েছে বোধ হয়। যা আশা করেনি। তাই আমার হাতে চুমু খেতে চাইছিল। আমি আবার ওসব আদিখ্যেতা পছন্দ করি না।

লোকটি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে লজ্জা, দুঃখ, কৃতজ্ঞতা সব মিলেমিশে একটা অদ্ভুত রূপ নিয়েছে।

লেনিনগ্রাড তথা সেন্ট পিটার্সবার্গে আরও কয়েকটি মুখের কথা ভোলা যায় না।

এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্যই হচ্ছে হারমিটের মিউজিয়াম। বিশ্ববিখ্যাতএই মিউজিয়ামে ইম্প্রেশনিস্টদের ছবির দারুণ সংগ্রহে আছে। টিকিট কেটে ঢুকতে যাচ্ছি, সিঁড়ির মুখে এক বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বলল, তোমরা তো বিদেশি, তোমাদের দুটো করে টিকিট কাটতে হবে।

কেন এই অদ্ভুত নিয়ম? অন্য কোথাও তো দেখিনি!

বৃদ্ধা বলল, তোমরা তো আমাদের দেশে অতিথি, তাই তোমাদের কাছে থেকে বেশি পয়সা চাইছি।

অতিথিপরায়ণতার এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা কখনও শুনিনি। সুবোধ বিদ্রূপের সুরে বলল, অতিথি বলে তো আমাদের বিনা পয়সায় ঢুকতে দেওয়া উচিত!

বৃদ্ধা আঙুল তুলে বলল, ওপরওয়ালারা এই নিয়ম করেছে, আমি তো করিনি। আসলে আমাদের সরকারের এখন টাকা নেই।

সুবোধ বলল, সরকারকে দিতে চাই না, বেশি পয়সাটা বরং তুমি নাও।

বৃদ্ধা মুখ নীচু করল। নিদারুণ লজ্জায় সেই মুখখানা কুঁকড়ে গেছে।

আরও কয়েকটা মুখ দেখেছিলাম একটা হোটেলের দরজার বাইরে। দশ-বারোটি যুবতী, প্রত্যেকেই সাদা পোশাক পরা, কারুরই বয়েস তিরিশের বেশি নয়। সন্ধে আটটা, এমন ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে যে, ওভারকোটের তলায়ও কেঁপে উঠছে আমাদের শরীর। সেই যুবতীদের অঙ্গে কিন্তু পাতলা পোশাক।

হোটেলটি নতুন ও পাঁচতারা। তার দরজার বাইরে অতগুলি সুশ্রী মেয়ে ভেতরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? হোটেলের ভেতরে ঢোকার তো কোনও নিষেধ নেই। আমরা সে হোটেলের বাসিন্দা নই, ভেতরে গিয়েছিলাম বাথরুম ব্যবহার করার জন্য। ওই নারীরা বাইরে কেন?

আমাদের রুশী বন্ধুটিকে এ প্রশ্ন করতে সে একটু দ্বিধা করে উত্তর দিল, বুঝতে পারছ না? ওরা দাঁড়িয়ে আছে ডাক পাওয়ার জন্য।

এরা পণ্যা নারী? এত ঠান্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, কখন কোন মাংসলোভী হাতছানি

দেবে, সেই অপেক্ষায়? ওভারকোট পরেনি, কারণ বেশি বস্ত্র থাকলে শরীরের গড়ন বোঝা যাবে না। কিছুক্ষণের জন্য এই শরীরের বিনিময়ে পাবে কিছু টাকা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে এসব কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। টকটকে লাল ঠোঁট, গালে গোলাপি রং, গাঢ় করে আঁকা ভুরু, চুড়ো করে বাঁধা চুল, জ্বলজ্বলে পোশাক, এইরকম চেহারা হয় বারবণিতাদের। কিন্তু এই মেয়েগুলি সেরকম কোনও সাজপোশাক পরেনি, সারল্য মাখা সুন্দর মুখ, মনে হয় যেন কোনও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। এরা প্রত্যেকেই উৎসুক যুবকদের প্রেমিকা হতে পারত, বিমান-সেবিকা হতে পারত, শিল্পীরা এরকম মডেল পেলে ধন্য হত, এরা কবিদের প্রেরণা দিতে পারত, কিংবা সুন্দর একটা সংসার গড়তে পারত। তার বদলে এই ঠান্ডার মধ্যে স্বল্পবেশে কাঙালিপনার মতন দাঁড়িয়ে আছে কোনও একজন অচেনা মানুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য। প্রত্যেকের দৃষ্টি একেবারে স্থির, তাতে কোনও ভাষা নেই। ক্ষুধা নেই, লোভ নেই, ব্যাকুলতা নেই, এমনকি লজ্জাও অনুপস্থিত। এই দৃষ্টি কি ভোলা যায়? সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ সেই দৃশ্যটি আমার চোখে ভাসে, এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কতখানি অসহায়তার জন্য এইসব মেয়েরা পুরুষদের লোভের সামগ্রী হতে চায়? পৃথিবীর সব দেশেই বড়-বড় হোটেলের ধারে-কাছে বেশ্যাদের ঘোরাঘুরি নতুন কিছু নয়, এমনকি চিনেও দেখেছি, কিন্তু লেনিনগ্রাডের ওই দৃশ্যটি আমার খুবই করুণ লেগেছিল।

মস্কোর তুলনায় লেনিনগ্রাড শহরটি অনেক সুন্দর। আগেকার তুলনায় চেহারাটা এখন কিছুটা মলিন। এখানকার মেয়র মহোদয় খুবই জনপ্রিয়, তাঁর চেষ্টায় গত অগাস্টের ব্যর্থ বিপ্লবের সময় লাল ফৌজ এই শহরে ঢুকতেই পারেনি, কৌশলে ট্যাংকগুলিকে ভুল রাস্তায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেয়র মহোদয় রাজনীতিতে যতটা উৎসাহী, শহরের রাস্তা সারাবার দিকে তেমন মন নেই মনে হল। বড় বড় শহরের মেয়রদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, এই পদ থেকে তাঁরা মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হওয়ার দিকে ঝোঁকেন। কিন্তু নগরপ্রধান হওয়ার জন্য কি রাজনৈতিক নেতা অপরিহার্য? বরং এমন যোগ্য ব্যক্তিকেই কি নির্বাচন করা উচিত নয়, যিনি নগর সম্পর্কে বেশি চিন্তা করবেন, নগর-পরিকল্পনায় অভিজ্ঞ হবেন? কিন্তু আজকাল রাজনীতি বিনা কথা নেই, দল ছাড়া রাজনীতি হয় না, নির্দলীয় গুণী-জ্ঞানীরা থাকেন আড়ালে।

স্টেশনে কিংবা রাস্তার ফলকে এখনও লেনিনগ্রাড নাম পালটে সেন্ট পিটার্সবার্গে লেখা হয়নি, তবে এরই মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে শহরের ম্যাপ ছাপা হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গী রুশী বন্ধুটি মস্কোয় সরকারি অফিসার, কিন্তু তাঁর নিজের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ি এই শহরে, এখানেই তিনি বর্ধিত হয়েছেন। তাঁরও নাম সের্গেই, মনে রাখা সহজ। আমি জিগ্যেস করলাম, এই যে আপনার বাল্যকাল থেকে পরিচিত শহরটার নাম বদলে গেল, এটা কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

সের্গেই বললেন, এটা একটা জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত, সবাই মেনে নিয়েছে, এ বিষয়ে আমার মতামত দেওয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না!

আমি বললাম, আপনার কূটনীতি অবলম্বন করার দরকার নেই, সোজাসুজি আপনার মনের কথাটা বলুন না। আপনার পছন্দ-অপছন্দের কথা জানতে চাই।

সের্গেই কিছুক্ষণ আমতা আমতা করলেন, তারপর বলেই ফেললেন, আমার লেনিনগ্রাড নামটাই পছন্দ। বদলাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না বোধহয়।

আমি লেনিনগ্রাড শহরের কেউ নই, আমার মতামতেরও কোনও মূল্য নেই। কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্যে অকস্মাৎ লেনিনগ্রাড থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে যাওয়াটা আমারও মতে ঠিক হয়নি। লেনিনের ভূমিকা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাসে লেনিনের নাম চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। এমন এক বিপ্লবের তিনি নায়ক, যা সত্যিই দুনিয়া কাঁপিয়েছে। যারা ঝটপট শহরের

নাম বদলায়, তারা ভুলে যায় যে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়, ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি আছে, জোর করে ইতিহাস বদলানো যায় না, আজকের নাম বদল এক যুগ বাদে আবার অন্য নাম বদলের পালা আনতে পারে।

॥ ৬ ॥

মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনা করা যেন অন্যায়, মানুষকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়াও একই রকমের অন্যায়। মানুষকে দুর্দশায় ঠেলে দেওয়া যেমন অমানবিক, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে কপট আশ্বাস দেওয়াও একইরকম অমানবিক। যে সমাজ সমস্ত মানুষকে খাদ্য-বস্ত্রের অধিকার দেয় না, সেই সমাজ যেমন অপরাধী, তেমনই যে সমাজ সমস্ত মানুষকে সমান খাদ্য-বস্ত্রের অধিকার দেওয়ার নামেই গড়ে ওঠে ও এক শ্রেণির সুবিধাভোগীকে প্রশ্রয় দেয়, সেই সমাজও অপরাধী।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি, শাসনব্যবস্থা কিংবা সমাজব্যবস্থাই ত্রুটিমুক্ত নয়। এক শ্রেণির ওপর আর এক শ্রেণির আধিপত্য চলতেই থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেও প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োগ আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের বাধা তো আছেই, ধনী-নির্ধনের সমান অধিকারও অবাস্তব। আজকের পৃথিবীতে কোনও গরিব মানুষের পক্ষে সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া অসম্ভব। দলীয় রাজনীতিতে দলনেতাই যে দেশের সেরা মানুষ হবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেক সময়েই দেশের সমস্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন না। গণতন্ত্রে শাসক দলের পরিবর্তনের সুযোগ আছে, এটাই প্রধান কথা।

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র শুধু আধুনিক চিন্তাই নয়, তাতে প্রকৃত পক্ষেই অনেক আশার বাণী আছে। শ্রেণি বিলোপ, উৎপাদনের সমবণ্টন, দেশের সম্পদের অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে, রাষ্ট্রই সব মানুষের জীবিকা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে, এসব প্রতিশ্রুতি তো আছেই, তা ছাড়া ধর্মীয় প্রভেদ একেবারে মুছে দিতে চেয়েছে। সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা একেবারে মুছে দেওয়ার এই চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। ধর্মীয় মূর্খতার জন্য মানুষের যে কত ক্ষতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ধর্ম তো নিছক একটা রূপকথা, তা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে বিশ্বের কোটি-নিযুত-অর্বুদ সংখ্যক মানুষকে। আমাদের ভারতে এবং ভারতীয় উপ-মহাদেশে ধর্ম-রেষারেষি না থাকলে সাধারণ মানুষের উন্নতি যে অন্তত দ্বিগুণ হতো, তাতে কোনও সন্দেহ আছে কী? সীমান্তের বিপুল প্রহরা, গ্রাসাচ্ছাদনের বদলে কামান-বন্দুকের উৎপাদন এবং মাঝে-মাঝে ছেলেমানুষি যুদ্ধে আমরা যে বিপুল অর্থব্যয় করেছি, সবই আসলে গেছে ধর্মের আগুনে।

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের এই উচ্চ আদর্শ মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যায় কি না এবং ঠিক কোন পথে প্রয়োগ করা বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেছে। যাদের ওপর প্রয়োগের ভার, তারা ধরেই নিয়েছে যে মানুষ হচ্ছে ভেড়ার পাল। দেশে একটিই পার্টি থাকবে, যার নাম কমিউনিস্ট পার্টি, সেই পার্টির রাখালরা লাঠি উঁচিয়ে তাড়ালেই ভেড়ার পাল এদিকে ছুটবে।

সমাজতন্ত্রের এই দুঃখজনক ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল ব্যর্থতার কথা গোপন করার চেষ্টা। মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি স্বীকার এবং সংশোধনের পথে গেলে হয়তো গতিটা মন্থর হত, কিন্তু এমন বিপর্যয় ঘটত না। তার বদলে তৈরি করা হল মিথ্যার বাতাবরণ।

সমাজতান্ত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে মস্কোতে একটা প্রতীকী গল্প প্রচলিত আছে। ধরা যাক, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে একটা ট্রেন। লেনিন এই ট্রেনটা চালাতে চেষ্টা করলেন। এত বড় একটা

ট্রেন চালাবার জন্য প্রচুর জ্বালানি দরকার, লেনিন বললেন, মানুষের বাড়ির দরজা-জানলা ভেঙে আনো, বন-জঙ্গল কাটো, যে-ভাবে হোক এ ট্রেন চালাতেই হবে। এরপর স্তালিন হলেন সেই ট্রেনের চালক। তখন লোকের বাড়ির দরজা-জানলা আর নেই, বন-জঙ্গলও সাফ হয়ে গেছে, স্তালিন বললেন, মানুষ ধরে ধরে এনে ইঞ্জিনে ভরে দাও। মানুষ বেশ ভালো জ্বালানি। কয়েক কোটি মানুষকে সমাজতন্ত্রের শত্রু বলে দেগে দিলেই হবে। তারপর এল ক্রুশ্চেভের আমল। তখন দেখা গেল, ট্রেন যে চলবে, সামনের দিকে আর লাইন পাতা নেই, লাইন পাতার মতন ইস্পাতও নেই। তবু সমাজতন্ত্রের ট্রেন চালাতেই হবে। ক্রুশ্চেভ বললেন, পেছন দিককার রেল লাইন উপড়ে এনে সামনের দিকে পাত, এইভাবে পাততেই থাক। এরপর এলেন ব্রেজনেভ। তখন জ্বালানি নেই, লাইন পাতা যাচ্ছে না তো বটেই, তা ছাড়াও সামনে এক বিশাল পাহাড়। ট্রেন এগুবে কী করে? ব্রেজনেভ বললেন, এক কাজ করা যাক। সমস্ত কামরার দরজা-জানলা বন্ধ করে দাও, ভেতরে সারা দেশের মানুষ থাকুক, পার্টি মেম্বাররা শুধু নেমে দাঁড়াও। তারপর পার্টি মেম্বাররা সবাই মিলে ট্রেনটাকে ঝাঁকাতে থাক, তা হলে ভেতরের লোকগুলো ভাববে, ট্রেন ঠিকই চলছে। এরপর গরবাচেভ এসে বললেন, ভেতরে অন্ধকারে লোকগুলো যে কাতরাচ্ছে। দরজা-জানলা সব খুলে দাও। ভেতরের লোকগুলো বাইরের আসল চেহারাটা দেখুক। তারপর যা হওয়ার হোক!

এটা একটা মর্মান্তিক রসিকতা! সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা নিশ্চয়ই এতটা খারাপ হয়নি, কিন্তু দেশের অবস্থা কতটা খারাপ হলে সাধারণ মানুষ নিজের দেশ সম্পর্কে এরকম গল্প ছড়াতে পারে?

কী পরিমাণ প্রচার চালানো হয়েছে সমাজতন্ত্রের সার্থকতার সপক্ষে! প্রচারের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশ-বিদেশে যত খরচ করেছে, ততটা কি করছে উৎপাদন বাড়াবার জন্য? পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের আগে পর্যন্ত অনেকের ধারণা ছিল, পশ্চিমের দেশগুলি সব নরক, আর সমাজতান্ত্রিক জোট একেবারে স্বর্গরাজ্য।

অনেকেই এখন বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্য সব ইন্ড্রাস্ট্রি (আমরা ইন্ড্রাস্ট্রির বাংলা করেছি শিল্প, কিন্তু সব জায়গায় শিল্প কথাটা খাটে না) উন্নত হতে না পারলেও একমাত্র যে ইন্ড্রাস্ট্রি খুব সার্থক হয়েছিল, তার নাম মিথ্যে প্রচারের উৎপাদন।

কিছুদিন আগেও অনেকের ধারণা ছিল, সোভিয়েত দেশ পৃথিবীর দুই বৃহত্তম শক্তির অন্যতম। কে প্রথম, কে দ্বিতীয় বলা দুষ্কর। আমেরিকা যত অণু-পরমাণু অস্ত্র বানাচ্ছে, সোভিয়েত দেশও তা বানাচ্ছে, এদের মিসাইল আছে, ওদেরও আছে। এরা মহাকাশযান পাঠাচ্ছে, ওরাও পাঠাচ্ছে। দু'দিকে চলেছে সমান টক্কর, তাহলে সোভিয়েত দেশ দুর্বল হবে কেন? কিন্তু এর মধ্যেও প্রচুর মিথ্যে আছে। আমেরিকা কতবার রকেট পাঠাতে ব্যর্থ হয়, কোনটা ভেঙে পড়ে, তা জানতে কারুর বাকি থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন কত বার ব্যর্থ হয় তা কেউ জানে? আমেরিকা তারকা-যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে কোটি কোটি ডলার খরচ করে। কিন্তু সে জন্য কি সে দেশের মাংসের উৎপাদন কম পড়ে? আমেরিকা চাঁদে রকেট পাঠায় কিন্তু সে জন্য দেশের সাধারণ মানুষের খাদ্যে টান পড়ে না। আর সোভিয়েত দেশে? এখন জানা যাচ্ছে যে, অস্ত্র কিংবা মহাকাশযানের কোনও যন্ত্র বানাতে গিয়ে আমেরিকা যদি তিনবারের পরীক্ষায় সার্থক হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের লাগে কুড়িবার। আমেরিকার কোনও টেকনিশিয়ান দু-তিনবারের বেশি ব্যর্থ হলে তাকে চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনও সরকারি কর্মী কুড়িবার ভুল করলেও তার কোনও শাস্তি নেই। এর ফলে, একই ধরনের প্রতিযোগিতায় নেমে আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের খরচ হয়েছে অনেক গুণ বেশি। অস্ত্র ও মহাকাশযান নির্মাণে এই বিপুল অপচয়ে সেখানকার অর্থনীতি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাধারণত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের কল-কারখানাগুলি পুরোনো, ঝরঝরে অবস্থা, অথচ সে দেশের

সরকার মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার রকেট বানিয়েছে। দেশের মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র, টুথপেস্ট, সাবান না দিয়ে এই সব খেলনা বানানোর উদ্দেশ্যও নিছক মিথ্যে প্রচার। বাইরের পৃথিবীকে জানানো যে সে দেশ কত শক্তিমান! এ যেন আধখানা জানলার কাছে দাঁড়ানো কোনও সুসজ্জিত মানুষ, যে কোমরের তলা থেকে উলঙ্গ।

পশ্চিমি দেশগুলির অবস্থাও এমন কিছু আহামরি নয়। নিখুঁত ব্যবস্থা কোথাও নেই। আমেরিকা যতটা সর্বশক্তিমানের ভাব দেখায়, ততটা শক্তিমান নয় সে দেশ। এত শক্তি নিয়েও তো আমেরিকা কানমলা খেয়েছে ভিয়েতনামের কাছে! উপসাগরীয় যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে জব্দ করে জিতেছে বটে, আর কোনও দেশ থেকে বাধা আসেনি, মনে হয় যেন আমেরিকা এখন পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি, তা আসলে নয়, আমেরিকার অর্থনীতি একটা বিপুল ধাক্কা খেয়েছে। উনিশশো একানব্বই সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় আমেরিকার লাভ হয়নি কিছুই। ভূতপূর্ব সোভিয়েতের বিভিন্ন স্বাধীন দেশগুলিতে ছড়িয়ে থাকা সাতাশ হাজার পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। ধনতান্ত্রিক দেশের বাণিজ্য এক এক সময় যেমন উত্তুঙ্গ হয়, তেমনি এক এক সময় ঝপ করে পড়েও যায়। আমেরিকায় এত বড় জেনারেল মোটরস কোম্পানি ধুঁকছে আই বি এম লোকসান করছে। প্যানাম-এর মতন বিশাল বিমান সংস্থা বন্ধ হয়ে গেল। বহু সহস্র মানুষ বেকার। আমেরিকার বাজারে এমন হতাশার অবস্থা বহুদিন দেখা যায়নি। ও দেশের মানুষ সঞ্চয় শেখে না। ভোগ্যপণ্যের এমনই তীব্র আকর্ষণ ও প্রচার যে অধিকাংশ মানুষই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করে। হঠাৎ উপার্জন বন্ধ হয়ে গেলে তাদের বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হয়। ব্যাংকের কাছ থেকে উদার ঋণ নিয়ে সবাই বাড়ি কেনে, কিন্তু ঋণ শোধের কিস্তি বন্ধ হলেই ব্যাংক টুঁটি চেপে ধরে। ওদেশের পথে পথে এখন বেকারের ভিড়। সবচেয়ে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশ এখন একা আমেরিকা নয়, জাপান। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় আমেরিকা এখন জাপানের থেকে পিছিয়ে। ওদিকে সংযুক্ত জার্মানি গোকুলে বাড়ছে। ইউরোপের দেশগুলি জোটবদ্ধ হয়েছে। পৃথিবীতে আমেরিকার একাধিপত্যের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

অনেকে এখন ঠাট্টা করে বলছে যে, এরপর আমেরিকা হয়ে যাবে কমিউনিস্ট দেশ, আর রাশিয়া হবে ক্যাপিট্যালিস্ট। রাজনীতির খেলায় কিছুই অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে অনেকে বলেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যতই গণ্ডগোল থাক, ওসব দেশের সমস্ত মানুষ মোটামুটি খেতে পরতে পেত এবং কিছু না কিছু জীবিকার নিশ্চয়তা ছিল, এখন সেই ব্যবস্থা বদলের পর সকলকেই ঠেলে দেওয়া হল অনিশ্চয়তার দিকে।

এই কথার মধ্যে অনেকখানি যুক্তির ফাঁক আছে। চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপার আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা আছে। আমাদের দেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষই সারা বছর দু'বেলা খেতে পায় না। কোটি কোটি শহুরে বেকার তো আছেই, তা ছাড়া গ্রামের ভূমিহীন, কৃষক-মজুররা বছরের কিছু সময় কাজ পায়, অন্য সময় তাদের কোনও ক্রয় ক্ষমতাই থাকে না। বহু মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা নেই। এই ব্যবস্থার তুলনায় যেখানে মানুষ দু'বেলা কিছু না কিছু খেতে পাচ্ছে, যে-কোনও রকম একটা বাসস্থান আছে এবং সরকার প্রত্যেকেরই কিছু একটা জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়, সে দেশের ব্যবস্থা নিশ্চিত অনেক ভালো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই, আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করা হবে কেন?

মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ বাদ দিলে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সবই ইউরোপে। সমাজতন্ত্র বর্জিত বাকি ইউরোপের অবস্থা কী? সোভিয়েত দেশের সঙ্গে আমেরিকার তুলনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তুলনা দিতে হবে ইউরোপের সঙ্গে। যেমন ভারতের সঙ্গে তুলনা দেওয়া চলে চিনের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের যে পরিবর্তন ঘটেছে, এর আগে কোনওকালে

তেমনটি হয়নি। এককালে ইউরোপেও এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে চরম দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ছিল, গৃহহীন-উপবাসীও ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলি গত পঁয়তাল্লিশ বছর যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, এমন বিশ্রাম তারা আগে কখনও পায়নি। এই সব দেশের অর্থনীতি এমন একটা রূপ নিয়েছে, যাতে অতি ধনী হয়েছে কিছু লোক। আর আছে উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আমরা যাকে দরিদ্র শ্রেণি বলি, সেই শ্রেণিটা মুছে গেছে ওইসব দেশ থেকে। দু-বেলা খেতে পায় না কিংবা বাড়িঘর নেই কিংবা শীতবস্ত্র নেই, নিছক পাগল-মাতাল ছাড়া এমন মানুষ নেই ওসব দেশে। বেকারদেরও ওইসব দেশের সরকার না খেয়ে মরতে দেয় না। সোশাল সিকিউরিটির ওপর যারা নির্ভর করে, তাদের অবস্থা আমাদের দেশের অনেক চাকরি পাওয়া লোকের চেয়ে ভালো। কারখানা থেকে যে শ্রমিকটির চাকরি যায়, সে পেট্রোল পাম্পের তেল দেওয়ার একটা কাজ পেয়ে যেতে পারে, এবং তার উপার্জন তুচ্ছ নয়। ওইসব দেশের শতকরা আশিজনের অবস্থা সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষদের তুলনায় অনেক বেশি সচ্ছল। ওইসব দেশ গ্রাম ও শহরের ব্যবধান অনেকটা ঘুচিয়ে ফেলেছে। আমি ইউরোপের বহু গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি, প্রকৃত গ্রাম বলতে আর কিছু নেই। সর্বত্রই পাকা রাস্তা, জরাজীর্ণ বাড়ি চোখে পড়ে না, জীবন যাপনের সব রকম উপকরণ সারা দেশে একইরকম ভাবে পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র অনেক মহত্তর আদর্শ নিয়েও এইখানে ধাক্কা খেয়েছে।

পোল্যান্ড-হাঙ্গেরি-চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষ কখনও ভাবেনি যে তারা গরিব ভারতীয়দের তুলনায় ভালো আছে। তাদের ক্ষোভ জমা হয়েছে এই কারণে যে তারা ফ্রান্স-জার্মানি-ইংল্যান্ডের চেয়ে কেন খারাপ আছে? প্রতিযোগী রাষ্ট্রের মানুষ যদি ভালো খেতে পরতে পায়, তাদের বাসস্থান যদি উন্নতমানের হয়, তারা নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলি যদি নিয়মিত পায়, তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় থাকবে কতদিন? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান প্রকট। শহরে তবু যা পাওয়া যায়, গ্রামে সেসবও দুর্লভ। লোক দেখানোর জন্য শহরে ঢাউস ঢাউস বাড়ি বানানো হয়েছে, অথচ সেগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নেই। সবাইকে চাকরি দেওয়ার নামে মানুষগুলির ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিংবা যোগ্যতার মূল্য না দিয়ে যে-কোনও একটা কাজে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে এরকম বহু বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির দেখা পেয়েছি আমি ওই দেশগুলিতে। গ্রামের মানুষ শহরে যেতে পারে না ইচ্ছেমতন, দেশের যে-কোনও জায়গায় জীবিকা খুঁজে নেওয়ার অধিকার নেই তার। সমাজতন্ত্রের আসল প্রতিযোগিতা ছিল অন্য ইউরোপের সঙ্গে, কিন্তু সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য সমাজতন্ত্রের কর্তা ও তাত্ত্বিকেরা আমেরিকা আমেরিকা বলে চিৎকার করেছেন।

এখন সমাজতন্ত্রের এই পতন থেকে আমরা কী শিক্ষা নেব? এই পতন সাময়িক কিনা সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। ওই দেশগুলি ঘুরে আমার মনে হয়েছে, অন্তত এই শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের ভূখণ্ডে ওই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সকলেই তো স্বার্থপর বা ভণ্ড নয়, মস্কোতে এমন কিছু কিছু মানুষের দেখা পেয়েছি, যাঁরা প্রকৃত আদর্শবাদী, মার্কসবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী, মার্কস-লেনিন প্রদর্শিত সমাজব্যবস্থার পতনে মর্মাহত কিন্তু ঠিক কোথায় কোথায় ভুল হয়েছিল, কিংবা ভবিষ্যৎ রূপ কী হতে পারে সে বিষয়ে বিভ্রান্ত। একজন বেশ উঁচু পদের ব্যক্তি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, আমরা রাজনীতি নিয়ে যতটা মাতামাতি করেছি, ততটা মন দিয়ে অর্থনীতি বোঝার চেষ্টা করিনি। মানুষের মনস্তত্ত্বও বুঝিনি। আগামী দশ বছর এইসব শিখতে হবে।

আমাদের বিভ্রান্তি আরও বেশি। আমরা ইউরোপ-আমেরিকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করি কিন্তু নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে প্রায় অন্ধ। আমাদের অবনতির মূল কারণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ক্লেদ। বহু বছরের পরাধীনতায় যে সব দূষিত চিন্তা ও আবর্জনা জমেছিল, সে সব

সাফ করার উদ্যোগই নেওয়া হল না। সাউথ আফ্রিকাতেও সাদা-কালোর ব্যবধান ঘুচতে চলল, কিন্তু আমাদের দেশে বর্ণবিদ্বেষ ঘোচাবার কোনও চেষ্টা হয়েছে; ধর্মীয় গোঁড়ামি বাড়ছে দিন দিন। বিবাহের নামে মেয়ে কেনাবেচা হয়। নামে ভারতীয় হলেও ভারতীয়ত্ব বলে কিছু নেই। জাতি হিসেবে কী আমাদের পরিচয়? কোন বৈশিষ্ট্যে হবে এই জাতির মর্যাদা? জাতি গড়ার কাজে মনই দেওয়া হল না। বরং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটাই একটা নিন্দনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমরা মনে-মনে বিশ্ব নাগরিক, কিন্তু বিশ্বের কাছে আমরা উপহাসের পাত্র।

এ দেশের দারিদ্র্য দূর করার জন্য সমবন্টন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখা অসংগত নয়। কেন্দ্রের সরকার সমাজতন্ত্রের পথে এক ধাপ এগিয়ে আবার দু-ধাপ পিছিয়ে যায়। যেহেতু পুরোপুরি সমাজতন্ত্র আসেনি, তাই অনেকের বিশ্বাস ছিল সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বামপন্থীরা এই বিশ্বাসে উস্কানি দিয়ে এসেছেন। তাতে ফল হয়েছে এই যে, অন্য অনেক ব্যাধি, অনেক কুসংস্কার, অনেক জঞ্জাল, অনেক অনুদ্যম ধামা চাপা দিয়ে রাখা গেছে, পুরোপুরি সমাজব্যবস্থা বদলালে ওই সব ঠিক হয়ে যাবে। পানের পিক ফেলে দেওয়াল নোংরা করা উচিত নয়, এই কথাটা বলার জন্যও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বদলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখন কেউ কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে সমাজব্যবস্থা বদলালেই এ দেশের নব্বই কোটি মানুষকে উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরলে, খোলা বাজারের অর্থনীতিতে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে যাবে নিঃসন্দেহে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কি এই নব্বই কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। আমার সন্দেহ হয়, এ দেশের বামপন্থীরাও এখন আর তা বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য মুখে তারা যতই সমাজতন্ত্রের জয়গান করুন, সেদিকে এগোবার কোনও উদ্যমই আর চোখে পড়ে না। বরং যেন তাঁরা অন্য পথ খোঁজাখুঁজি করছেন।

পূর্ব ইউরোপ আর সোভিয়েত দেশে যাই-ই ঘটুক, আমাদের তাকাতেই হবে চিনের দিকে। অনেক বিষয়েই এই দুই দেশের মিল আছে। এবং চিন আমাদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে আছে। চিনের শহরগুলি এবং রাস্তাঘাট আমাদের চেয়ে উন্নত। মোটামুটি দু'বেলার অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু চিনের সমাজতন্ত্র বহু সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। গ্রামের লোকদের জীবিকার সংস্থান করতে পারেননি সরকার। যুব সমাজকে বলা হচ্ছে, তোমরা কাজ তৈরি করে নাও! গ্রামের মানুষ শহরে ঢুকতে এলে তাদের জোর করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। এক শহর থেকে অন্য শহরেও যাতায়াত করা যায় না বিনা অনুমতিতে। ছেলেমেয়ে বিক্রি, বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ হয়নি। সেখানকার সমাজতন্ত্রের রং বদল হচ্ছে অতি দ্রুত, কমিউনিস্ট পার্টি নেহাত নিজেদের নামটা বজায় রেখেছে কিন্তু ধনতন্ত্রের অনেক রীতিনীতি তারা মেনে নিচ্ছে স্বেচ্ছায়। সাম্যের কথা ঘুচে গেছে, কিছুদিন আগে চিনা সরকার ঘোষণা করেছে যে বৈদেশিক সাহায্যে উপকূল অঞ্চলের অগ্রগতি হবে আগে, সেখানকার তুলনায় অন্য অঞ্চলের মানুষকে আপাতত পিছিয়ে থাকতে হবে। চিনেরা আমাদের মতন কথার ফুলঝুরি নয়, তারা অনেক বেশি বাস্তববাদী। চিন দেশে সত্যিই কথা কম, কাজ বেশি।

নব্বই কোটির জায়গায় আমাদের জনসংখ্যা অবিলম্বেই হবে একশো কোটি। মার্কসবাদে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা নেই, তাই আমাদের মার্কসবাদীরা তা নিয়ে মাথা ঘামান না। পূর্ব ইউরোপে বা সোভিয়েত দেশে সে সমস্যাও ছিল না। দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে হয়নি, বহিরাগতদেরও গ্রহণ করা হয়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের মতন চিনেরও সমস্যা, তাই চিন সরকার এই ক্ষেত্রে মার্কসবাদের তোয়াক্কা না করে কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধি চাপিয়েছে। সাংহাই শহরে আমাদের তরুণী গাইডকে জিগ্যেস করেছিলাম, তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি? সে বলেছিল, একটির বেশি হলে আমার চাকরি যাবে এবং জেল খাটতে হবে। ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সীমাবদ্ধ

নিছক কিন্তু পোস্টারে-হোর্ডিংএ। শহরের বস্তিতে এবং গ্রামের গরিব পরিবারেই সন্তানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের পাশের রাজ্যে পৌনে এক ডজন সন্তানের পিতা মুখ্যমন্ত্রী হয়।

আমাদের জনসংখ্যা একশো কোটি ছাড়াবে, দারিদ্র্য এবং সেই অনুষঙ্গের অন্যান্য সমস্যা বেড়েই চলবে। এ যাবৎ অন্য কোনও ব্যবস্থাতেই এই অবস্থার বদল হয়নি। সমাজতন্ত্র নামে চমৎকার একটি স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নে আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির একটা স্থির চিত্র আঁকা ছিল। এখন সেই স্বপ্ন, সেই ছবিও অলীক হয়ে গেল? এটাই খুব বেদনার। পূর্ব ইউরোপের পট পরিবর্তন আসলে এক শোকাবহ ঘটনা। এক মহৎ আদর্শের পরাজয়। আমাদের দেশের সামনে কি তা হলে আর কোনও আশাই রইল না। দিন দিন আমাদের আরও অবনতি হবে এবং জনসাধারণকে মিথ্যে স্তোকবাক্য শুনিয়ে যাওয়া হবে? এ দেশের ভূমি বহু ব্যবহৃত, খনিজ ও বনজ সম্পদ যথেষ্ট নয়, তাহলে একশো কোটি মানুষের ক্ষুধা মিটবে কীসে? একমাত্র বিজ্ঞানই ভরসা। বিজ্ঞানের কোনও নতুন আবিষ্কার হয়তো মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার সমাধান করে দিতে পারে। ম্যাজিকের মতো চমকপ্রদ কিন্তু বাস্তব সত্য কোনও পথ উপহার দেবে বিজ্ঞান, আমাদের দেশটা উদ্ধার পেয়ে যাবে। আমি আশাবাদী, মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত এই আশা করে যাব।

মাটি নয়, মানুষের টানে

॥ পঞ্চান্ন বছর আগে পরে ॥

একটি চোদ্দো বছর বয়েসের কিশোর গিয়েছিল তার এক মামার বাড়িতে বরযাত্রী হয়ে। পূর্ববাংলা তখন সদ্য নাম বদল করে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান, তার ফরিদপুর জেলায়, মামাবাড়ির গ্রামের নাম আমগ্রাম বা আমগাঁ। মামার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলি, এক ছোটখাটো জমিদার বংশের শেষ প্রতিভূ। জমিদারের ছেলেদের ফরসা ও সুপুরুষ হওয়ার কথা, নাকের তলায় যত্নে লালিত গোঁফ, গল্প-উপন্যাসে বা যাত্রা-সিনেমায় এরকমই থাকে, কিন্তু গোবিন্দ গাঙ্গুলি এক বলিষ্ঠকায় ঘোর শ্যামবর্ণ পুরুষ, গোঁফ নেই, শুধু তাঁর তেজটাই জমিদারসুলভ। কিছুটা গোঁয়ার ধরনের এবং দুঃসাহসী, এই গোবিন্দ গাঙ্গুলি একবার বর্শা দিয়ে একটা হিংস্র পাগলা কুকুর মেরেছিলেন, শিয়ালও মেরেছেন কয়েকবার, একবার নাকি সুন্দরবন থেকে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছিটকে এদিকে এসে পড়ায় গোবিন্দ গাঙ্গুলি অস্ত্র হাতে নিয়ে বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন অকুতোভয়ে, তবে শেষ পর্যন্ত বাঘে-মানুষে মুখোমুখি হয়নি।

কিশোরটি বাবার সঙ্গে মামাবাড়িতে এসেছে, এই বিয়ে উপলক্ষে। এ বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় কত ধুমধাম সে দেখেছে দুবছর আগেও, কত মানুষের সমারোহ। বাড়ির বড় ছেলের বিয়েতে আরও অনেক বড় উৎসব হওয়ার কথা, দূর থেকে আসবে আত্মীয়স্বজন। সেসব কিছুই নেই। সেই বয়েসের কিশোররা বড় বড় চোখ মেলে সব কিছু দেখে, অন্যান্য বছর মামাবাড়িতে আসার উদ্যোগের সময় থেকেই তার দারুণ উত্তেজনা হত, এবারেও সেরকম মন নিয়েই এসেছে, কিন্তু অনেক কিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য লাগছে। বিয়ে বাড়িতে এত কম লোক। সানাই বাজছে না।

সদ্য দেশ বিভাগের পর এখানকার মানুষদের মধ্যে যে নানারকম সংশয় ও আশঙ্কা চেপে বসে আছে, তা সে বুঝতে পারেনি। দিল্লিতে বসে কয়েকজন নেতা দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নিলেন আর তাতেই যে সুদূর বাংলার এইসব গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে গেল, এটা তার বোঝবার কথাও নয়। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ডাকে যে হিন্দু-মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, তার জের চলল পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে, স্বয়ং গাঁধীজি এসেও সে দাঙ্গা থামাতে পারেননি, তারপর আরও বীভৎস দাঙ্গা হল বিহারে। দাঙ্গা শব্দটির ভয়াল ধ্বনি এর পরের কয়েক দশক ধরে বিধ্বস্ত করে দিল বাঙালির জাতিসত্তা।

ফরিদপুরে তখনও কোনও দাঙ্গা হয়নি, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ হয়নি। কিন্তু যে-কোনও সময় বহিরাগতদের উসকানিতে বীভৎস কাণ্ড শুরু হয়ে যেতে পারে। এই দুশ্চিন্তা তো রয়েছেই। সেই জন্যই এই বিবাহপর্বটি যথাসম্ভব অনাড়ম্বরভাবে ও সংক্ষেপে সেরে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা থেকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন আর কেউ আসেনি। কিশোরটির বাবা এসেছেন, তার প্রধান কারণ, তিনিই ঘটকালি করেছেন এই বিয়ের, পাত্রীটি তাঁরই নিজের গ্রামের প্রতিবেশী-কন্যা।

বিয়ের দিন অল্প কয়েকজন বরযাত্রী, তারা যাবে নৌকোয়। এ অঞ্চলে শীতের সময় কয়েক মাস বাদ দিলে নৌকোই একমাত্র যানবাহন। ভরা বর্ষা, সমস্ত নদীগুলিই স্বাস্থ্যবতী, তার মধ্যে আড়িয়াল খাঁ নদী নয়, নদ, এক দৃপ্ত বলশালী পুরুষেরই মতন তার ভাবভঙ্গি।

গোবিন্দ গাঙ্গুলির এই কিশোর ভাগ্নেটিরও পদবি গাঙ্গুলি (পরবর্তীকালে যে গঙ্গোপাধ্যায় হয়েছে)। হিন্দু ব্রাহ্মণকুলে কোনও গাঙ্গুলির মামা গাঙ্গুলি হতে পারে না, আসলে এই গোবিন্দ গাঙ্গুলি তার মায়ের সহোদর নয়, মায়ের বড় মামার ছেলে, কিন্তু বৃহৎ যৌথ পরিবারে সবাই ছিল সমান। এই মামার সঙ্গে বিয়ে হবে তার এক পিসির। এই পিসিও রক্তের সম্পর্কের নয়, এক গ্রামের সব নারীদেরই মাসি, পিসি বা দিদি বলে ডাকাই প্রথা। তবে পাত্রীটি, যার নাম প্রভা, একেবারে পাশের বাড়ির, তাই আপনেরই মতন।

নৌকোতে ওঠার আগে খানিকটা কাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল, তারপর নৌকো যখন মাঝ নদী দিয়ে চলেছে তখন ছেলেটি ভাবল, গলুইয়ের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে জুতোর কাদা ধুয়ে নেবে। পাটাতনের ওপর শুয়ে সে এক পাটি জুতো ডুবিয়েছে জলে, নদীটি যে খরস্রোতা তা সে বুঝতে পারেনি, কিংবা খুব কাছেই একটি শুশুককে ভুস করে মাথা তুলতে দেখে সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, জুতোটা খসে গেল হাত থেকে। একজন মাঝি শুধু দেখেছিল, কিন্তু তখন আর সে জুতো উদ্ধার করার কোনও উপায়ই নেই।

মামার বিয়ের বরযাত্রী হয়ে সে গিয়েছিল খালি পায়ে, এটা সারা জীবনে ভোলবার মতন নয়। অন্য সকলের মুখ অন্য কারণে নিরানন্দ, শুধু কিশোরটির মনোবেদনা জুতোর জন্য। গ্রামের ছেলেদের পক্ষে খালি পায়ে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে তো সঠিক গ্রামের ছেলে নয়, সে থাকে কলকাতায়, এখানকার গ্রামের বন্ধুরা তাকে বলে ক্যালকেশিয়ান। তার সাজপোশাক অন্যরকম, সে মাঝখানে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ায় না। সে চুল অ্যালবার্ট করে।

নৌকো এসে পৌঁছল পুব মাইজপাড়ায়। মাদারিপুর শহর থেকে মাত্র ছ-সাত মাইল দূরে, একেবারে অজপাড়াগাঁ যাকে বলে। একটাও পাকারাস্তা নেই। গ্রামের প্রায় এক কোণে একটি ছোট্ট বামুন পাড়া, পাঁচটি পরিবারের বাস। আয়তক্ষেত্রের মতন একটি উঠোন, তার চার পাশে চারটি বাড়ি, কোনওটিই পাকা নয়, মাটির দেওয়াল টিনের ছাদ, তবে বেশ বড় বাড়ি, ঘরগুলি প্রশস্ত। সমস্ত পরিবেশটি ঝকঝকে তকতকে। চৌধুরী, দুই চ্যাটার্জি ব্যানার্জিদের বাড়ি, পঞ্চম বাড়িটি গাঙ্গুলিদের, একটু পেছনের দিকে, তুলনায় তারা দরিদ্র। কিশোরটির ঠাকুর্দা (তিনি তখন জীবিত নন) ছিলেন টোলের পণ্ডিত, কিছু জমি-জমা ছিল, তার থেকে সারা বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হত।

বরযাত্রীদের থাকার জায়গা কোনও অসুবিধে নেই। আয়তক্ষেত্রের এক পাশের একটি বাড়ি খালি, সে পরিবারের লোকজন এর মধ্যেই এ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কিশোরটি তো তার বাবার সঙ্গে উঠল নিজেদের বাড়িতে। সে বাড়ির সামনে একটি বাতাবি লেবুর গাছ, তাতে এত ফল হয় যে খেয়ে শেষ করা যায় না। বাড়ির পেছনের উঠোনে একটা ঝাঁকড়া জামরুল গাছ। জামরুল ফুলের রেণু বৃষ্টির মতন ঝরে পড়ে। আরও পেছন দিকে কয়েকটি বড় বড় গাছ, তার মধ্যে একটি আমগাছের আমের নাম কে রেখেছিল কে জানে, বেশ কবিত্বময়, টিয়াঠুঁটি।

পল্লীটি ছোট, তাতেও তিনটি পুকুর। চৌধুরীদের বাড়ি সংলগ্ন পুকুরটি তাঁদের নিজস্ব, অবশ্য অন্যরাও সে পুকুরে ছিপ ফেলতে পারে। ছিপ ফেললেই চটাপট ওঠে পুঁটি মাছ। মেয়েরাই বেশি ব্যবহার করে সেই পুকুর। অন্য দুটি পুকুর এজমালি। সকালে দাঁত মাজা থেকে শুরু করে দুপুরের স্নান ও রাত্রির আঁচানো পর্যন্ত সবই একই পুকুরে। পানীয় জলও ওই পুকুরেরই, কিন্তু তা ফুটিয়ে নেওয়া হয় কি না, কিশোরটি জানে না। একটি পুকুরের একেবারে ধার ঘেঁষে একটা খেজুর গাছ, সেটি বেশ বাঁকা, অর্থাৎ অনেকখানি চলে গেছে জলের ওপারে। শীতকালে সেখানে রসের জন্য কলসি বেঁধে দেওয়া হয় ডগার কাছে। শীতকালের প্রারম্ভেই একজন লোক এসে সব খেজুর গাছগুলো 'কামাই' করে দিয়ে যায়। সেই লোকটিকে বলে শিয়ালি, কেন শিয়ালি তা কে জানে! এক একটা গাছে বেশি রস হয়, যেমন এই বক্র গাছটি। মাঝ রাত্তিরে খেজুর গাছ বেয়ে ওঠে হাঁড়ির মধ্যে পাটকাঠি ডুবিয়ে চোঁচোঁ করে রস টেনে খাওয়া, বাচ্চাদের একটা মজার খেলা। এই কিশোরটি আরও

কম বয়েসে ওই বাঁকা গাছটিতে উঠে রস খেতে গিয়েছিল। কোনও কারণে ভয় পেয়ে তার হাত পিছলে যায়, ঝপাং করে পড়েছিল পুকুরের জলে, শীতের রাত্তিরে। অবশ্য তখনই সে সাঁতার জানত।

বড় চ্যাটার্জি আর গাঙ্গুলিদের বাড়ির মাঝখানের সরু পথ দিয়ে যে পুকুরটিতে যাওয়া যায়, সেটি আকারে গরিষ্ঠ। কিশোরটি এই পুকুরেই সাঁতার শিখেছে। সে শেখা নিয়মমাফিক নয়। যখন তার পাঁচ-ছ'বছর বয়েস তখন পাড়ার মাসি-পিসিরা কৌতুকছলে তাকে উঁচু করে তুলে ছুঁড়ে দিত গভীর জলে। ছেলেটি কান্না ও আঁকুপাঁকু করে যখন প্রায় ডুবে যাচ্ছে, তখন হেসে গড়াগড়ি যেতে যেতে সেই নারীরা তাকে উদ্ধার করত, আবার ছুঁড়ে দিত জলে। এইরকমভাবে চার-পাঁচদিন চলার পরই হঠাৎ সেই বাচ্চাটি আর ডোবে না, জল পোকার মতন সাঁতরে দূরে চলে যায়। এখন কিশোর বয়েসে এসে তার সাঁতার নিয়ে বেশ গর্ব, সে মাঝ পুকুরেও ডুব দিয়ে মাটি তুলে আনতে পারে। কলকাতাতেও হেদো পার্কের (এখন আজাদ হিন্দ বাগ) পুকুরে সাঁতার দিয়ে এপার ওপার হয়ে সমবয়েসিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

মাসি-পিসি শ্রেণির রমণীরা এই পুকুরে স্নান করত অনেকক্ষণ ধরে। সেটাই তাদের পরনিন্দা-পরচর্চা ও রঙ্গ-রস বিনিময়ের সময়। এখানে আব্রু রাখার মতন কোনও ঘেরা জায়গা নেই। স্নান সেরে ভিজে কাপড়েই তারা ফিরে যেত বাড়ি। সেইসব রমণীদের গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা, শাড়িতে হেমেন মজুমদারের ছবি হয়ে ওঠে, সেই দৃশ্য সারাজীবনের মতন অঙ্কিত হয়ে গেছে কিশোরটির স্মৃতিতে। পুরুষরাও তো ভিজে গায়েই ওই পথে ফিরত, কিন্তু তার কোনও ছবি হয় না! কোনও নারী শিল্পীও সে দৃশ্য আঁকেন না।

পুকুর ছাড়া একটি খালও ঘিরে আছে এই পল্লীটিতে। প্রত্যেক বাড়ির পেছন দিকে এই খালের ওপর মল-মূত্র ত্যাগের জন্য মাচা বাঁধা। অর্থাৎ প্রতিদিন পরিষ্কার করতে কোনও ঝামেলা নেই, সবকিছু জলে ভেসে যায়। একেবারে বাইরের দিকে এরকম একটি টয়লেট আছে, সেটি বারোয়ারি, মজবুত ও উঁচু। একটা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে একটি চ্যাঁচার বেড়া দেওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকতে হয়। সেখানে বসে-বসে যে দৃশ্য দেখা যায়, তেমন দৃশ্য দেখার মতন অভিজ্ঞতা পশ্চিমবাংলার কারওই বোধহয় হয় না! টুপ-টুপ করে খসে পড়া পুরীষ খাওয়ার লোভে ছুটে আসে দলে দলে মাছ, তারা কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। বিশেষ কোনও এক রকমের মাছ নয়, অনেক রকম।

একটি সোজা রাস্তা এসে এই পল্লীটিতে প্রবেশ করেছে। ঢোকার মুখেই আর একটি পুকুর, তারপর অনেক গন্ধলেবুর গাছ। বাল্য চোখে মনে হত লেবুবন। সেই লেবু গাছের পাতা ছিঁড়ে পান্তা ভাতে দিয়ে রাখলে বেশ একটা হালকা সুগন্ধ হত।

এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বেশ মিলমিশ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার চল বেশি, অনেক পরিবারের অবস্থাই সচ্ছল। সেই তুলনায় মুসলমানরা অধিকাংশই দরিদ্র, কয়েকঘর বেশ সম্পন্ন মুসলমানও আছে। কিশোরটি আরও কম বয়েসে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতা ছেড়ে গ্রামে বসবাস করতে এসে এক বছর পড়েছে গ্রামের বীরমোহন স্কুলে। তখন কয়েকজন মুসলমান সহপাঠীর সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এখন সে মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে কলকাতাবাসী। গ্রামের এই বাড়িতে সপরিবারে থাকেন তার জ্যাঠামশাই। দাঙ্গার আগুন এইসব গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি, তবু নানারকম গুজব শোনা যায়। জ্যাঠামশায়ের মুখে হাসি নেই, কপাল কুঁচকে থাকেন সবসময়। কিশোরটি তার বন্ধুদের খোঁজ নিতে যেতে চায়, কিন্তু প্রবীণরা তাকে নিষেধ করেন বাড়ির বাইরে বেশিদূর যেতে।

এখানেও বিয়ে বাড়িতে আড়ম্বর নেই। যেন দেশের বর্তমান অবস্থায় কোনও উৎসবের শোরগোল করাও একটা অপরাধ। জন্ম এবং মৃত্যু যেমন থেমে থাকে না, তেমন বিবাহও করতেই হয়, তবু যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে।

বড় চ্যাটার্জিদের বাড়িতে পাত্রী পক্ষের কাজের লোক বলতে গেলে একজনই, পাত্রীর দাদা

চুনী। গ্রামের সব ছেলেমেয়েদেরই তিনি চুনীকাকা, তিনি বিবাহের উপকরণ জোগাড় করা, পুরুত ডাকা, বরযাত্রীদের আপ্যায়ন ও খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন নিরলস পরিশ্রমে, অথচ হাসিমুখে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে, বেশ স্বাস্থ্যবান। এক একজন যুবকের ব্যক্তিত্বের গুণে ছোটরা খুব পছন্দ করে। এই কিশোরটির কাছেও চুনীকাকা খুব প্রিয় মানুষ। মালকোঁচা মারা ধুতি ও গেঞ্জি পরা, কোমরে গামছা বাঁধা সুদর্শন চুনীকাকা ছোটাছুটি করছেন সর্বত্র। শানাই-শঙ্খধ্বনি বাদ, শুধু নারীপক্ষের উলুতে সম্পন্ন হল বিবাহ অনুষ্ঠান, হ্যাজাকবাতি জ্বেলে। গ্রামের কিছু পরিবারের মাত্র একজন করে এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে, দুটি ঘরের মেঝেতে আসন, খাবার পরিবেশন করা হল কলাপাতায়। তত বেশিকিছু পদ নেই। তবে পুকুর থেকে জাল ফেলে ধরা পোনা মাছের অপূর্ব স্বাদের জন্য ধন্য ধন্য করতে লাগল সবাই।

পাত্রীটি খুবই লাজুক এবং সুশ্রী। রগচটা গোবিন্দ গাঙ্গুলি মাথায় টোপর পরে শান্ত-শিষ্টভাবে সব স্ত্রী-আচার মেনে নিলেন। হুল্লোড়-চ্যাঁচামেচি বাদ থাকলেও অনেকদিন বাদে এই পল্লিতে একটা অনুষ্ঠান হল। এবং তা নির্বিঘ্নে মিটে যাওয়ায় সকলেই খুশি।

পরিশ্রমে সব শরীর ঘর্মাক্ত, এক সময় চুনীকাকা কিশোরটিকে কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, কী রে, ভালো কইরা খাইছস তো? এর পরের বার যখন আসবি, তরে আমি তুইল্যার চরে নিয়ে যামু।

অন্য সবাই পান চিবুতে-চিবুতে কুশল সংবাদ বিনিময় করছেন, বরযাত্রীদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসও চলছে মাঝে-মাঝে। এইরকম সময়ে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করা সম্ভব নয় যে এখানে অনেকের সঙ্গে অনেকের এই শেষ দেখা। এরপর কে কোথায় ছিটকে পড়বেন তার ঠিক নেই।

কিশোরটির সঙ্গে তার প্রিয় চুনীকাকার আর দেখা হয়নি ইহজীবনে। তুইল্যার চর নামক স্থানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কী আছে, তাও জানা হয়নি তার।

॥ রাজ্জাক হাওলাদার ॥

কানাডার মন্ট্রিয়েল শহরে সপরিবারে থাকে রাজ্জাক হাওলাদার। তার স্ত্রীর নাম ফরিদা পারভিন। দূর বিদেশে এসে যারা মধ্যবয়সে থিতু হতে পেরেছে, তাদের প্রায় সকলেরই থাকে এক দুরন্ত সংগ্রামের ইতিহাস। শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, অনেককেই দেশ ছাড়তে হয় বাধ্য হয়ে। রাজ্জাকরা ছয় ভাই, উনিশশো একাত্তর সালে এই ছয় ভাই-ই যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। তখন রাজ্জাকের বয়েস খুবই কম। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। পাকিস্তানি আমলে এখানকার সাধারণ মানুষদের বিদেশে যাওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর বহুসংখ্যক যুবক পাড়ি দিতে লাগল ইউরোপ-আমেরিকা, অধিকাংশই নিজের দেশে জীবিকা অর্জনের সুযোগ না পেয়ে (স্বাধীন ভারতেও অজস্র বেকার, কিন্তু ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবাংলার গ্রামের বেকার ছেলেরা বি. এ. পাস করেও চাকরি পায়নি। ঢাকা শহরে ঘোরাঘুরি করতে-করতে এক সাহেবের বদান্যতায় জার্মানি যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।) সেখানে তাকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হত, সহ্য করতে হত নানাবিধ কষ্ট, কিন্তু হঠাৎ সে এক দয়াবতী মাতৃসমা, বিদুষী ও ধনী, চিরকুমারী (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে পুরুষের সংখ্যা খুবই কমে যাওয়ায় অনেক মেয়েই তাদের পছন্দের স্বামী পায়নি) এক মহিলা রাজ্জাককে শুধু যে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন তাই-ই নয়, তার মানসিক প্রসারতা গঠনেও সাহায্য করেন অনেক। মহিলা নিজের চেষ্টায় বাংলা লিখেছেন। রাজ্জাকের গ্রামের বাড়িতে এসেও থেকে গেছেন।

যাই হোক, কানাডার উপার্জনের সুযোগ বেশি বলে রাজ্জাক এক সময় জার্মানি ছেড়ে চলে আসে। এখন সে মন্ট্রিয়েলের পাকাপাকি বাসিন্দা, দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়েটির একটি স্থায়ী অসুখ আছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ওদেশেই ভালো বলে সে আর কানাডা ছাড়বে না।

মোটামুটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও সংসার, তবু মাঝে মাঝেই তাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। সে কিছুতেই নিজের জন্মগ্রামের কথা ভুলতে পারে না, যখন তখন দেশে চলে আসে, গ্রামের মাটির ঘ্রাণ নেয়, গ্রামের মানুষের নানারকম সাহায্য করে, চিকিৎসার বা ঋণমুক্তির। একবার সে পাকাপাকিভাবে চলে আসবে ভেবে, মাদারিপুর শহরে ওকালতি শুরু করেছিল। বিশেষ সুবিধা হয়নি। তবু বছরে একবার অন্তত সে গ্রামে আসবেই।

শুধু নিজের গ্রামে নেয়, সে কলকাতায়ও আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় সে ট্রেনিং নিয়েছিল। এই অঞ্চলটি তার মোটামুটি চেনা। এখানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম-প্রেম ভাবও হয়েছিল। কিন্তু তা বেশি দূর গড়ায়নি।

রাজ্জাকের একটি প্রিয় শখ হচ্ছে, কলকাতার সন্নিকট অঞ্চলে কোথায়-কোথায় তার গ্রামের মানুষরা আশ্রয় নিয়ে আছে, তাদের খুঁজে বার করা। পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা তো একসঙ্গে দল বেঁধে আসেনি, নানা ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে এসেছে। গরিব মানুষরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বাধ্য না হলে আসতে চায় না, পশ্চিমবাংলায় বা ভারতে কোথাও এই উদ্বাস্তুরা স্বাগত নয়, তবু এসেছে। রাজ্জাক তার ছেলেবেলায় গ্রামে অনেক হিন্দু দেখেছে। হিন্দু শিক্ষকদের কাছে পড়েছে, অনেক হিন্দু ছেলে ছিল তার বাল্যকালের খেলার সাথী। রাজ্জাক পশ্চিমবাংলায় এসে তার খেলার সাথীদের সঙ্গে পুনর্মিলন চায়। কয়েকজনকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। এরই মধ্যে একটি কাহিনি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য।

রাজ্জাকের গ্রামের এক বাল্যসঙ্গীর নাম কালীপদ। তাদের একটি বিস্কুট তৈরির ছোটখাটো কারখানা ছিল। কোনও এক সময়ে সেই বিস্কুটের কারখানা আগুনে পুড়ে যায় কিংবা আগুন লাগানো হয়। কিংবা কিছু একটা ঘটেছিল, কালীপদদের বাড়ির সবাই দেশান্তরী হয়। ওই গ্রামের আরও অনেকটা উদ্বাস্তু কলকাতার মফস্বলে গড়িয়ার কাছে কামালগাজি অঞ্চলে কলোনি করে আছে। এতদিনে অনেকেই দাঁড়িয়ে গেছে মোটামুটি। শুধু কালীপদ কিছুতেই সুবিধা করতে পারেনি। এখানেও সে একটা বিস্কুটের কারখানা করতে চেয়েছিল, প্রতিযোগিতায় করতে পারেনি। এখন সে একটা পাউরুটির কারখানায় দিনমজুর। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে তার থাকার জায়গাটিও নড়বড়ে। রাজ্জাক পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পাওয়ার পর তার বাসস্থানের দূরবস্থ দেখে নিজে টাকা দিয়ে একটা ছোট পাকা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। একে ঠিক নিয়তির পরিহাস বলা চলে না। নিয়তি মাঝে মাঝে মানবিকও হয়। পূর্ব বাংলার যে-গ্রাম থেকে কালীপদ বাড়িঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেই গ্রামেরই একজন মানুষ এসে পশ্চিমবাংলায় তার জন্য বাড়ি গড়ে দিয়েছে।

রাজ্জাক এ ব্যাপার নিয়ে বেশি কথা বলা পছন্দ করে না। বন্ধুকে আর এক বন্ধু সাহায্য করবে এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। ঠিক! আমরাও তো ভেবেছিলাম, বাংলাদেশের সৃষ্টির পর দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্কটি হবে। হল কোথায়। রাজ্জাকের মতন মানুষ অতি অসাধারণ ব্যতিক্রম হয়েই রইল।

এতক্ষণ আমি ইচ্ছে করেই রাজ্জাক কোন গ্রামের মানুষ, সে নামটি উল্লেখ করেনি। পুব মাইজপাড়া। যেখানে ছিল আমাদের পিতা-পিতামহের বাড়ি। রাজ্জাক আমার কোনও একটি লেখা পড়ে আবিষ্কার করে যে আমি তার গ্রাম-সহোদর। রাজ্জাকের বাবা বেঁচে ছিলেন একশো বছর। তেমন লেখাপড়া জানতেন না। তবুও বিদ্যাশিক্ষাকে সমীহ করতেন বলেই দৃঢ় ইচ্ছায় সব ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনি প্রায়ই আপশোশ করে বলতেন, কত লেখকদের কথা শুনি, আমাদের গ্রামে কোনও লেখক জন্মায়নি। আমার পরিচয় জানার পর রাজ্জাক তার বাবাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে, হ্যাঁ, একজন লেখক আছে এই গ্রামেরই। যদিও সে এখন পশ্চিমবাংলায় থাকে। তিনি বলছিলেন, তাকে একবার এনে দেখাতে পারবি?

তা পারা যায়নি, তিনি এর মধ্যে চক্ষু বুজেছেন। তারপর রাজ্জাক জেদ ধরেছে, আমাকে একবার সেই গ্রামে নিয়ে যাবেই।

রাজ্জাকের সঙ্গে আমার দেখা বছর তিনেক আগে মন্ট্রিয়েল শহরেই। স্থানীয় বাংলাদেশিদের একটি সভায় আমি কবিতা পাঠ করেছিলাম। সভা শেষে ভিড়ের মধ্যে একজন কেউ এসে বলেছিল, আমি আর আপনি এক গ্রামের লোক, তা শুনে আমি তার প্রতি আলাদা কোনও মনোযোগ দিইনি। বস্তুত, সে স্বল্প সাক্ষাৎকারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। রাজ্জাক পরে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। পরে ঢাকাতেও নাকি একবার দেখা হয়েছিল রাজ্জাকের সঙ্গে। তেমনই ভিড়ের মধ্যে, সেবারেও তর পরিচয় জেনে মনে দাগ কাটেনি। মানুষের নানারকম পরিচয় থাকে, নিছক এক গ্রামের মানুষ বলেই তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ হবে, গ্রাম-প্রীতি আমার নেই।

এর পরেও সে চিঠি লিখে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা দপ্তরে তার প্রেরিত চিঠি কোথায় লুকিয়ে রইল, পৌঁছয়নি আমার হাতে। প্রকাশকদের কাছ থেকে আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল, প্রকাশকরা এসব চিঠির উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব মানেন না। কিন্তু রাজ্জাক হাওলাদার তো এক অদম্য পুরুষ, আর আমার ঠিকানা এমন কিছু দুর্লভ বা গোপন ব্যাপারও নয়। এক সময় সে ঠিকানা সংগ্রহ করে ফেলল এবং ফোন নাম্বার। তারপর শুরু হল প্রতি সপ্তাহে একদিন সকালবেলা দূরভাষে ব্যাকুল আহ্বান, আমাকে একবার তার সঙ্গে পূব মাইজপাড়া গ্রামে যেতেই হবে। কেউ এমন আন্তরিকভাবে অমন্ত্রণ জানালে তা মন স্পর্শ করে ঠিকই। কিন্তু প্রতিবারই এড়িয়ে যাই।

বাংলাদেশে তো প্রায়ই যাওয়া হয় আমার। সেই উনিশশো একাত্তর সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের আগেই বেশ কয়েকবার, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন তাঁবুতে ওষুধপত্র, খাবারদাবার ও বেতারযন্ত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য গিয়েছি। এবং ১২ ডিসেম্বর, যখন এদিকের সীমান্ত থেকে পাকিস্তানি সেনারা পশ্চাদ অপসারণ করছে, তখন সদলবলে গিয়েছিলাম ইছামতী নদী পেরিয়ে খুবই বিপজ্জনক মাইন অধ্যুষিত পথ দিয়ে সাতক্ষিরায়। কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা তোলার জন্য। সাতক্ষিরায় আমরা সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। সেবারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বীভৎস অত্যাচার ও অসংখ্য নারী ধর্ষণের (যাওয়ার পথে বাংকারে, ফক্স হোলে অজস্র ছেঁড়া ব্রা-ব্লাউজ ও শাড়ি পড়েছিল চিহ্ন হিসেবে) কাহিনি শুনে মর্মাহত সুভাষদা অতি তীব্র ভাষায় লিখেছিলেন, 'ক্ষমা নেই।' সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছিলেন, 'ভোমরা থেকে সাতক্ষিরা।' এক মাস পরেই গিয়েছিলাম ঢাকায়, তখনও সেখানে বিজয়-উৎসব চলছে।

তারপর এতগুলি বছরে বহুবার গেছি ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, কক্সবাজার; কলকাতা থেকে যে যশোর রোডের শুরু সেই রাস্তা ধরে সোজা পৌঁছেছি যশোর শহরে। বাংলাদেশে আমার বহু বন্ধু ও আপনজন। সেখানকার প্রায় সব কবি ও গদ্য লেখকরাই আমার সুহৃদ ও স্নেহভাজন। গাজি সাহাবুদ্দিনের বাড়ি সব সময় আমার ও স্বাতীর জন্য অবারিত দ্বার, ঢাকায় শান্তিনগরের হোয়াইট হাউজ নামে এক হোটেলের মালিক মাসুম ইকবাল আমাকে বলেছিলেন, সারা জীবনে যতবার খুশি আমি সেই হোটেলে গিয়ে থাকতে পারি, খদ্দের হিসেব নয়, তাঁর অতিথি হিসেবে। এই ধরনের কথা শুনলেই কৃতজ্ঞতায় মন দ্রব হয়ে যায়। যেখানে যত কাজই থাক, বাংলাদেশ থেকে কোনও ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেলেই ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। এমনকি, এই তো গত বছরই, হুমায়ুন আহমেদ আমন্ত্রণ জানাল, সে যে ফিল্মের শুটিং করছে, তার শেষ দিনে সবাই মিলে একটা ঘরোয়া উৎসব করবে, সেখানে কি আমি যোগ দিতে পারি না? অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহারুল ইসলামও সেই দাবি জানাল। একটা জরুরি লেখা অসমাপ্ত রেখে, সেই ফিল্মের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকলেও, সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে উৎসবে গা ভাসিয়ে দিলাম। (আক্ষরিক অর্থেই বা ভাসানো, সেই উৎসবের অনেকটা অংশ, গাজিপুরে, হুমায়ুনের নিজস্ব চলচ্চিত্র গ্রামের সুইমিং পুলে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে স্নান-পান এবং আড্ডা ও গান।)

কিন্তু নিজের গ্রাম দেখতে কখনও যাইনি। একবার বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে পৃথিবীর

নানান দেশের পরিদর্শকদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ভারতের দশজন প্রতিনিধির মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছিলাম আমিও। আমি নিজেই বেছে নিয়েছিলাম বরিশাল জেলা (তপন রায় চৌধুরীর একটি অত্যুৎকৃষ্ট বই পড়ে আমার বরিশাল শহরটি দেখার খুব আগ্রহ হয়েছিল, তা ছাড়া জীবনানন্দ দাশের বাড়ি ও ধানসিঁড়ি নদী দেখার আকাঙ্খা)। আমাদের দেওয়া হয়েছিল একটি এসি গাড়ি, সেই গাড়ি নিয়ে আমরা যে-কোনও ভোটকেন্দ্র বা যত্রতত্র ঘুরতে পারি, সেবারে আমার সঙ্গী হয়েছিল ভ্রাতৃপ্রতিম ইমাদাদুল হক মিলন। ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে বিক্রমপুর হয়ে, মিলনের গ্রামের বাড়ির পাশ দিয়ে, মাওয়া ঘাট পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলাম মাদারিপুর শহরে। এর তো খুব কাছেই আমাদের পৈতৃক গ্রাম ও মামার বাড়ি, মিলন বারবার বলেছিল, চলুন না আপনাদের বাড়িটা খুঁজে দেখি, ঠিক পাওয়া যাবে। আমি রাজি হয়নি, আমার যেতে ইচ্ছে হয়নি।

এই অনিচ্ছার জন্য কিন্তু কোনও অভিমান বা ক্ষোভ নেই। দেশভাগ একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসে এমন বারবার বহু দেশেই ঘটেছে যে রাজা বা শাসক সম্প্রদায় বা নেতৃত্বের কোনও ভুল সিদ্ধান্তের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে, কতবার দেখা গেছে অসহায় উদ্বাস্তুদের স্রোত। আমাদের এই দেশভাগ অবধারিত ছিল কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা বোধ হয় কোনওদিনও মেলে না। তবে সেই দেশ ভাগের জের এখনও চলছে। মানুষের অশিক্ষা ও দারিদ্র্য ঘোচাবার বদলে চলেছে অস্ত্রের আস্ফালন, বেড়ে চলেছে ধর্মান্ধতা ও নির্বোধ মৌলবাদ, অপূর্ব সুন্দর শান্ত কাশ্মীর রাজ্যটি ছারখার হয়ে যাচ্ছে। রেষারেষি ও হানাহানির জন্য এই তিনটি দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি হয়নি, তার চেয়েও বেশি দুঃখ হয় মানবিক অধঃপতন দেখে। যুক্তি ও মানবিকতা হারিয়ে যাচ্ছে, ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে আমরা বৃহৎ ক্ষতি করে চলেছি। সামনের দিকেও কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশানা নেই। দেশভাগ হয়েছে ছাপ্পান্ন বছর আগে। যে-কোনও কারণেই হোক ছেড়ে আসা গ্রামের বাড়ি এতগুলি বছর পরেও অবিকৃত, অভগ্ন থাকতে পারে না। অনেক গাছই এতদিন বাঁচে না। সেই গ্রামের পরিমণ্ডলটাই এতদিনে বদলে যেতে বাধ্য। কিন্তু আমার মনের মধ্যে চোদ্দ বছর বয়েসে শেষবার দেখা সেই দুটি গ্রামের ছবি অতি উজ্জ্বলভাবে বাঁধান আছে। Pristine এই ইংরেজি শব্দটি ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয়। অতীতের সেই ছবিটাই আমি রেখে দিতে চাই, তাই আমার কাছে বর্তমান চিত্রের প্রয়োজন নেই।

এর মধ্যে যা-যা ঘটেছে, তার কিছু-কিছু অংশ কানে এসেছে। চুনীকাকা খুন হয়েছিলেন মাদারিপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে। সেই চ্যাটার্জির মেয়ে প্রভা ছাড়া আর কারুর কথা কখনও জানিনি। অন্য চ্যাটার্জিদের বাড়ির একজন, অতুলকাকা কাজ করতেন নেভিতে। সাদা রঙের প্যান্ট-শার্ট কোট ও মাথায় নীল রঙের টুপি পরে তিনি গ্রামে হাজির হতেন হঠাৎ। আমাদের চোখে তিনি ছিলেন এক রহস্যময় পুরুষ। সেই অতুলকাকাকে আমি পরবর্তীকালে স্বপ্নে দেখেছি বহুবার। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

আমার জ্যাঠামশাইও কিছুদিন পরেই বাড়ির সব কিছু ফেলে রেখে, শুধু ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। প্রথম কিছুদিন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। তখন আমার বাবার একমাত্র উপার্জনে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন, খুবই কায়ক্লেশে কেটেছে সেই সব দিন। আমার বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক, তখনকার দিনে শিক্ষকের বেতন ব্যাংকের ঝাড়ুদারের চেয়েও কম, বাবা তিন-চারটে টিউশনিও করতেন। ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একটানা পরিশ্রম। তখনই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙে। জ্যাঠামশাই কোনওক্রমে একটা চাকরি জুটিয়ে পৃথক বাড়িতে চলে যান। বাকি জীবন তাঁকে মনে হত, একজন মেরুদণ্ড ভাঙা মানুষ, গলার আওয়াজ হয়ে গিয়েছিল খোনাখোনা। আমার দুই কাকার মধ্যে একজন আমাদের বাড়িতেই থেকে গেছেন। অন্যজন কোনওভাবে জুটে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে।

পূর্ব মাইজপাড়া ব্রাহ্মণ পল্লিটি একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আমগ্রামে আমার মামা গোবিন্দ গাঙ্গুলি থেকে গিয়েছিলেন অনেকদিন জেদ করে। কেন যেন তাঁর ধারণা হয়েছিল, দেশ বিভাগ বেশিদিন টিকবে না, আবার জোড়া লেগে যাবে। যেসব হিন্দু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে চলে

আসছিল, তিনি তাদের জমিজমা কিনে নিচ্ছিলেন, ভবিষ্যতে তারা ফিরে এলে সেইসব জমিজমা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আমার মায়ের সেজো মামা অর্থাৎ গোবিন্দ গাঙ্গুলির কাকা সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে। এখানে তিনিও প্রতিষ্ঠিত, মতিঝিলে তাঁর সুদৃশ্য বাড়ি, তাঁর ছেলেরাও উচ্চশিক্ষিত, মেয়েরা সম্পন্ন ঘরে পাত্রস্থ, এঁরা সবাই প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় গ্রামে যেতেন, সেখানকার, পুজোর উৎসবে মেতে থাকতেন, দেশত্যাগের পর আর যাননি। গ্রামের সেই পুজো বন্ধ হয়ে গেলেও চালু হয়ে গেল কলকাতা সংলগ্ন মতিঝিলের বাড়িতে।

শুধু গোবিন্দ গাঙ্গুলি একা কুম্ভের মতো রয়ে গেলেন নকল বুঁদির গড় সামলাতে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজারা মান্য করত তাঁকে। পুরো পূর্ব পাকিস্তানের আমল কাটিয়ে দিলেও তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে আর টিকতে পারলেন না। সামরিক শাসনের সময় গ্রাম বাংলায় অরাজকতা চলছিল, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছিল। তাই কোনও একদিন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের নিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে এলেন কলকাতায়। শুনেছি, আসবার দিনে, উঠোনের তারে কাপড় শুকাতে দিয়ে, রান্নাঘরে উনুন জ্বেলে, সব দরজা-জানালা খুলে রেখে ভোরবেলায় চলে আসেন। এটা গল্পের মতন শোনায়, আমি সঠিক কারণ জানি না। হয়তো গৃহত্যাগের সংবাদ রটে গেলে পথে লুটপাটের সম্ভাবনা ছিল সেসময়ে। সেই তেজি পুরুষ গোবিন্দ গাঙ্গুলি পশ্চিমবাংলার মফস্বলে এসে কাঁচুমাচু ধরনের মানুষ হয়ে যান। নিজ গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অনেকেই তাঁকে নমস্কার ও সেলাম করত, এখানে তাঁকে কে চেনে। চৌরাস্তার ভিড় তাঁকে ধাক্কা দিয়ে লোকেরা চলে যায়, বাসে উঠলে কোনও হেঁজিপেঁজি লোক তাঁর পা মাড়িয়ে দেয়। অনেক গাছের চারাকে এক মাটি থেকে তুলে নিয়ে অন্য মাটিতে পুঁতলে কেমন যেন নেতিয়ে থাকে, এইসব মানুষদেরও সেই অবস্থা।

অনেক মুসলমানও পশ্চিমবাংলো তথা ভারত থেকে পাকিস্তানের দুই অংশে চলে গেছে, বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জীবনেও এরকম ট্র্যাজেডি ঘটেছে। হয়তো তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা কম, তবু একজন মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি নিয়েও রচনা করা যেতে পারে।

নিজের বাড়ি কিংবা মামাবাড়ির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক মুছে গেলেও, মাঝে-মাঝে মনে পড়ে সেই ছবি, এতকাল ধরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি পড়লেই আমার মনে পড়ত, আমাদের পাড়ার বড় চাটুজ্যেদের বাড়িটির কথা। ঠিক যেন ওইরকম বাড়িরই বর্ণনা। আমি নিজেও যখন কোনও গ্রামের পটভূমি নিয়ে গল্প লিখেছি, পশ্চিমবাংলার গ্রামের বদলে আমার অবচেতনে পূর্ব বাংলায় আমার চেনা গ্রামের ছবিই এসে যেত প্রথম দিকে। পরে, বাস্তবতার খাতিরে পশ্চিম বাংলার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি অনেকবার।

জ্যাঠামশাই আমাদের বাড়ি-জমি বিক্রি করে আসতে পারেননি বা সে সুযোগ পাননি। ওদিককার শহরের হিন্দুরা এদিককার শহরের মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করতে পেরেছেন অনেকে, গ্রামের মানুষদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানি আমলের শেষ দিকে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ি-জমিকে শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। তা শুনে আমি হেসেছিলাম। এটা পরিহাস ছাড়া আর কী! আমাদের মতন অনেকেই পূর্ব বাংলার নদী-মাটি-গাছপালার ছবিকে ভালোবেসে বুকে ধরে রেখেছে, সেখানকার মানুষদের আত্মীয়জ্ঞান করে, হঠাৎ আমরা তাদের শত্রু হয়ে গেলাম কী করে? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলু খাগড়া পুড়ে মরে', কত তীব্র সত্য এই প্রবাদ!

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির পর যাতায়াত এত সহজ হয়ে গেলেও আমি মাদারিপুর অঞ্চলে যেতে চাইনি। তার আরও একটা কারণ আছে। অল্প বয়েসে, যখন পাকিস্তানে যাওয়া দুরূহ ছিল, তখন জন্মভূমি পুনর্দর্শনের তীব্র সাধ হত। আমার বাবা মৃত্যুকালে 'বাড়ি যাব', 'বাড়ি যাব' বলেছিলেন, সে বাড়ি তাঁর পূর্ব মাইজপাড়ার কুটির। আমার মৃত্যুকালে এরকম খেদ হওয়ার কথা নয়। কারণ, জন্মস্থান সম্পর্কে আমার সেই টান নেই। আরব্য উপন্যাসের সেই সমুদ্রে ডোবা কলশির দৈত্যের মতন মানুষের জীবনেও মতামত বা মনোভাবের বদল হতে পারে কয়েকবার। এখন আমি অনেকটা

ঠাট্টা করে বলি, অনেকেই তো নার্সিংহোমে জন্মায়, তারা কি জন্মস্থান হিসেবে সেই নার্সিং হোম আবার দেখতে যায়? এমনকি দেশ সম্পর্কেও আমার মোহ ঘুচে গেছে। দেশ আবার কী? আমরা তো বিশ্বনাগরিক হতে চেয়েছিলাম। এক সময় ওয়েণ্ডেল উইলকির লেখা 'ওয়ান ওয়ার্লড' নামে একটি বই পড়ে ভেবেছিলাম, যতদিন না মানুষ সারা পৃথিবীকে সীমানামুক্ত এবং স্বাধীনভাবে যদৃচ্ছ বিচরণক্ষেত্র হিসেবে পাবে, ততদিন ঝগড়া, মারামারি বা যুদ্ধ হয়, তখন তাকে বাল্যখিল্যতা ছাড়া আর কী বলা যায়?

যাই হোক, অনেক দূরে সরে এসেছি।

রাজ্জাক হাওলাদার একেবারে নাছোড়বান্দা। আমাকে টানতে না পেরে সে অন্য পথ ধরল। টেলিফোন করেই তো বলে, দাদা একটু বউদির সঙ্গে কথা বলতে পারি? স্বাতীর সঙ্গে সে দিব্যি ভাব জমিয়ে নিল আর তাকে বোঝালে, বউদি, আমি আপনার গ্রাম সম্পর্কে দেওর, আপনি আমাদের গ্রাম দেখতে যাবেন না? স্বাতী সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। এমনিতেই সে খুব ভ্রমণপিপাসু, শরীরে কখনও ব্যথা বেদনা থাকলেও বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলেই তা সেরে যায়, বাংলাদেশে অনেকবার গেছে, সেখানকার অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সে রাজ্জাককে বলল, হ্যাঁ, আমি আবার শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাব।

স্ত্রীদের অনুরোধ বা আবদার তো আসলে হুকুমেরই সমান। তা অগ্রাহ্য করার সাহস আমার নেই। তবু আমি নানান কায়দায় এড়িয়ে যেতে লাগলাম, অচ্ছা ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে, এখন তো সময় নেই, এই সব বলে। সত্যি সত্যিই, আমার মন একটুও টানেনি।

এর মধ্যে রাজ্জাক তার লেখা একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি, 'বাকি রয়ে গেছে কিছু' পাঠিয়ে দিল আমার কাছে, ভূমিকা লিখে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। সরল, সাবলীল ভাষায় তার জীবনের অভিজ্ঞতা, তার মধ্যে অনেক সমসাময়িক চিত্র ফুটে উঠেছে। ধর্মের নামে স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি সম্পর্কেও অনেক তীব্র মন্তব্য আছে।

আবার হঠাৎ আমাকে একবার মন্ট্রিয়েল যেতে হল। সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার ব্যাপারে। এ খবর জানাজানি হতে দেরি লাগে না, রাজ্জাক অনুরোধ জানাল, আপনি যখন মন্ট্রিয়েলে আসছেনই, এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে ডাল ভাত খেতেই হবে। সে এতবার চিঠি লিখেছে ও টেলিফোন করেছে যে তার অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। টরেন্টো থেকে গাড়ি নিয়ে বেরুনো হল, অশোক চক্রবর্তী, তার স্ত্রী ভারতী এবং কান্তি হোড়ের সঙ্গে। মধ্যপথে অটোয়ায় থামতে হল আমার শ্যালিকা জয়তীকে দেখে আসার জন্য, তারপর মন্ট্রিয়েলে রাজ্জাকের বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল বেশ। এই প্রথম রাজ্জাক হাওলাদারের সঙ্গে প্রকৃত সাক্ষাৎ। নাতিদীর্ঘ, শ্যামলা রঙের মানুষটি, উৎসাহে একেবারে ভরপুর, জীবনীশক্তিতে সবসময় টগবগ করছে। (একটা কথা আমি রাজ্জাককে কখনও বলিনি, গায়ের রং ছাড়া তার সঙ্গে আমার বাবার চেহারার বেশ মিল আছে, শুধু তার ছোট গোঁফ এবং গলায় আওয়াজ আলাদা।)

রাজ্জাক একটা অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করে ফেলেছে। তার অ্যাপার্টমেন্টে অনেক আমন্ত্রিত বিশিষ্ট নারীপুরুষ। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপারটি ঘটাল তার ছেলে আরিফ, তার বয়েস হবে বছর বারো। ওসব দেশে প্রতিপালিত এই বয়েসি বাঙালি ছেলেমেয়েরা শিখতেই চায় না, কিন্তু আরিফ গোটা-গোটা বাংলা অক্ষরে আমার নামে স্বাগত জানিয়ে একটা পোস্টার সেঁটেছে দেওয়ালে, এবং সে 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি নির্ভুল আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিল।

সে রাতের আড্ডার পর রাজ্জাকের সঙ্গে আবার দেখা হল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। আমি কলকাতায় ফেরার পরের দিনই। সপরিবারে সে এসেছে বেড়াতে। আমাদের তখন আবার শান্তিনিকেতনে যাওয়ার কথা, ওরা কখনও শান্তিনিকেতন দেখেনি, তাই ওদেরও নিয়ে চললাম আমাদের সঙ্গে। তারপর এক সঙ্গে অনেকদিন কাটাবার ফলে ওদের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব হয়ে গেল। রাজ্জাককে ভালো না লেগে উপায় নেই, ওর সুন্দরী স্ত্রী ফরিদা কম কথা বলে, খুব বুদ্ধিমতী,

স্বামীর পাগলামিতে উৎসাহ দেয়। ছেলেমেয়ে দুটিও বেশ শিষ্ট। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অনেক রকম সংস্কারমুক্ত।

কলকাতায় এসেও রাজ্জাক কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করল আমার সঙ্গে। আমিও ওর সঙ্গে। ওর সাহায্যে নির্মিত কালীপদর বাড়ি দেখতে গেলাম গড়িয়ার দিকে। এসবের ফাঁকে-ফাঁকে রাজ্জাক আমাকে বারবার বলতে লাগল ওর গ্রামে নিয়ে যাওয়ার কথা। আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, গানের সঙ্গে বাঁশির সঙ্গীতের মতন, ওর কথায় তাল দিয়ে যাচ্ছে স্বাতী। তবু, শেষ চেষ্টা হিসেবে বললাম, ঠিক আছে, যাওয়া যাবে এখন শীতকালে। তখন এপ্রিল মাস, প্রচণ্ড গরম, বাংলাদেশের আবহাওয়া তো প্রায় এখানকার মতন, এই গরমে গ্রামে যেতে ভয় লাগবারই কথা। রাজ্জাক তাতেও রাজি নয়, কারণ, এই কয়েক মাসের ব্যবধানে যদি আমি আবার মত বদলাই কিংবা, আমার তো যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, এর মধ্যে হঠাৎ টুপ করে পৃথিবী থেকে কেটে পড়লে ওর সাধ কিংবা গোঁ অপূর্ণ থেকে যাবে। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। রাজ্জাক আর স্বাতী, দুজনেই মোগল!

॥ ঘর নেই, ঘরে ফেরা ॥

সেই চোদ্দো বছর বয়েসে শেষবার গিয়েছিলাম, তারপর কেটে গেছে পঞ্চান্ন বছর! ওঃ পঞ্চান্ন বছর, বিশ্বাসই হতে চায় না! কী করে কেটে গেল এত সুদীর্ঘ সময়, এত তাড়াতাড়ি! সমস্ত জীবনযাত্রাটাই যেন ম্যাজিক। আকস্মিক মৃত্যুও তো ম্যাজিকের খেলার মতন।

অবিভক্ত বাংলায় গ্রামে যেতাম ট্রেনে, স্টিমারে, তারপর নৌকোয়। ট্রেন বহুকাল অচল, স্টিমারও বাতিল, এখন অবশ্য কলকাতা-ঢাকা সরাসরি বাস চলে। সে বাসে কখনও উঠিনি, তবে কলকাতা থেকে একবার ঢাকা গিয়েছিলাম গাড়িতে, সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ যুদ্ধের পর, মনোজ বসু ও তাঁর ছেলে ময়ূখের সঙ্গে। তখন যুদ্ধের গোলা বর্ষণে অনেক নদীরই সেতু উড়ে গেছে, গাড়িসুদ্ধু ফেরি পার হতে হয়েছিল ছ-সাতবার। এবারে বেনাপোল সীমান্ত থেকে সোজা মাদারিপুর পৌঁছে গেলাম বাড়িতে, ফেরি পার হতে হল না একবারও।

সপরিবারে বাংলাদেশে গিয়েছিল রাজ্জাক, আবার ফিরে এসেছে, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। শুধু-শুধু অতিরিক্ত খরচ, কিন্তু তার আশঙ্কা, যদি শেষ মুহূর্তে মত বদল করে ফেলি। মন্ট্রিয়েলে গিয়ে দেখে এসেছি, রাজ্জাক কিন্তু ধনী নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত, তবু সে তার শখের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে পারে। ধনী হলে বোধহয় এইরকম শখ বা পাগলামি তার থাকতও না।

রাজ্জাক বলে রেখেছিল, আমাদের সঙ্গে যে কজনকে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারি। স্বাতী চায় আমার ভাইবোনরাও আমাদের সঙ্গী হোক, ওরা দেশের বাড়ি দেখেছে খুবই শিশু বয়েসে, এখন আর প্রায় কিছুই মনে থাকার কথা নয়। আমার মেজ ভাই অনিল আর ছোট বোন কণিকার বিশেষ উৎসাহ থাকলেও কিছু-কিছু অসুবিধে থাকায় শুধু ছোট ভাই অশোক সঙ্গে চলল। আমাদের অভিযানে সবচেয়ে খুশি হতেন মা, তিনি মাত্র কয়েক মাস আগে চির-বিদায় নিয়েছেন। মায়ের কাছে এসব গল্প আর শোনানো হল না।

বনগাঁ সীমান্তে এসে চক্ষু চড়কগাছ। শত শত ট্রাক আর গাড়ির ভিড়ে, রাস্তা প্রায় বন্ধ, কত ঘণ্টা লাগবে কে জানে, কিন্তু পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীদের তৎপরতায় খুব সহজেই পার হওয়া গেল। এতকাল লেখালেখি করার এইটুকু সুফল অন্তত পাওয়া যায়। তা ছাড়া, মাত্র এক বছর আগেই আমি ছিলাম কলকাতার শেরিফ, তাতেও বোধহয় কিছুটা নামের ওজন বাড়ে।

এদিককার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে, ওপারে রাজ্জাকের বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলেন, ওঠা হল তাঁদের গাড়িতে। প্রথম বিরতি ফরিদপুরে। এই শহরটি সম্পর্কে আমার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আমরা

যাতায়াত করতাম মাদারিপুর দিয়ে। সেখানে ফরিদপুর ছিল জেলার নাম, মাদারিপুর একটি মহকুমা শহর। এখন মাদারিপুর নিজেই একটি জেলা। বাংলাদেশের সমস্ত মহকুমাই জেলা হয়ে গেছে। ফরিদপুরে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা, কোনও হোটেলে নয়, রাজ্জাক আমাদের আগমনবার্তা আগেই রটিয়ে দিয়েছিল, ফরিদপুরের লেখক-কবি-সাংবাদিকদের একটি প্রতিষ্ঠান সব আয়োজন করে রেখেছিল একটি বাংলোতে। এরপরে কোথাও রাস্তার ওপর একটি স্কুলের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে থাকবে, তাই বেশি দেরি করা যাবে না, তাই খেতে বসেই সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় সারতে হল সংক্ষেপে। (আর একবার ফরিদপুরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হল, তবে এই ধরনের অনেক প্রতিশ্রুতিই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যায় না।)

সেখানেই কে যেন বললেন, ফরিদপুরের জেলাপ্রশাসকের সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে, তিনি অপেক্ষা করে বসে আছেন। প্রস্তাবটা আমার মনঃপূত হল না। খামোখা আমলাদের সঙ্গে দেখা করতে যাব কেন? কী কথা বলব তাঁদের সঙ্গে? আমি পুরোপুরি বেঁকে বসবার আগেই ওখানকার কয়েকজন বললেন, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য সৌজন্য সাক্ষাৎকার না করলে ভালো দেখায় না। যাওয়ার পথে একটু থামলেই হবে।

আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই যে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরাও আমার-আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতনই। স্কুল-কলেজ জীবনে তাঁরাও অন্য ছাত্রদেরই মতন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করেন। পরে কেউ কেউ হয়তো ওসবের আর তোয়াক্কা করেন না। ফরিদপুরের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার একজন সুদর্শন, যুবক, মৃদুভাষী, এখনও সাহিত্যপাঠে বিশেষ আগ্রহী। এঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা যায়।

কিন্তু বিপদ এল অন্য দিক দিয়ে। একটুক্ষণ কথা বলার পরই ডি. সি. বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে, আসুন আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আবার খাব। মাত্র দশ-পনেরো মিনিট আগেই ভরপেট খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আর কিছু মুখে তোলা অসম্ভব। তবু ডি. সি. সাহেবের উপ-কর্মচারী জোরাজুরি করতে লাগলেন। এখানেও কিছু রান্না হয়ে গেছে। লেখক সমিতি যে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করে রেখেছে, তা এই সরকারি মহল জানতেন না, আর এখানকার প্রস্তুতির কথাও জানেননি ওঁরা। তা বলে তো আমরা দুবার খেতে পারি না। কেউ একজন আমার কানে-কানে বললেন, ডি সি সাহেব নিজেও এতক্ষণ না খেয়ে অপেক্ষা করছেন, একবার অন্তত ওঁদের সঙ্গে খাবার টেবিলে না বসলে খুবই অভদ্রতা হবে।

পাশের প্রশস্ত কক্ষে লম্বা টেবিলে থরে-থরে খাদ্যবস্তু সাজানো! কত রকম যে পদ, তা গুনে শেষ করা যায় না। খাদ্য এমনই বস্তু ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে সুখাদ্য দেখলে লোভে চক্ষু চকচক করে, পেট ভরতি থাকলে সেই খাদ্যের দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করে না। প্লেটে দু-একটা পদ একটু নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই হল।

বাংলাদেশের আতিথ্য নিয়ে আমার অনেকরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। খাদ্য নিয়ে এঁরা বড্ড বাড়াবাড়ি করেন। কারওকে দাওয়াত দিলে প্রত্যেকে বাড়িতেই এতগুলিপদ প্রস্তুত করা হয়, যা একজন মানুষের শুধু চেখে শেষ করাও অসম্ভব। যদি কারও পক্ষে সম্ভবও হয়, তারও খাওয়া উচিত নয়। পাঁচ রকমের মাছ, তিন রকমের মাংস, আরও কত রকমের ভর্তা ও ভাজাভুজি, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কিছুই বাদ থাকে না। ঢাকায় এক বাড়িতে সকালবেলা নাস্তা খেতে গিয়ে দেখি, বিরিয়ানি ও তিন রকম মাংস ও ফিরনি ইত্যাদি। সকালবেলাতেই বিরিয়ানি ভোজন আমাদের কাছে অকল্পনীয়। একটা প্রবাদ আছে, 'হিন্দু লোকের বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি আর মেয়েমানুষের শাড়ি।' হিন্দুরা একটা বাড়ি বানাবার স্বপ্ন দেখে টাকা জমায়, আর মুসলমানরা খেয়ে ও খাইয়ে সব টাকা উড়িয়ে দেয়। তৃতীয়টি সম্পর্কে মন্তব্য অনাবশ্যক।

ডি সি সাহেব এর পরেও আবার এক কাণ্ড করলেন। খুব নিরীহভাবে অনুরোধ করলেন, কয়েক মিনিটের জন্য তাঁর বাড়ি যেতে হবে। তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করালেন

আর সেখানে এক কাপ চা। চায়ের সঙ্গে টায়ের পরিমাণ দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। আবার অনেক রকম নোনতা ও মিষ্ট দ্রব্য এবং বাছাই করা সব ফল। গৃহস্বামিনীর আন্তরিকতা ও দ্রব্যগুলি যতই সুস্বাদু হোক, এখন যে হাঁসফাস করার মতন অবস্থা। আমি বামুনের ছেলে হিসেবে সবকিছু ছাঁদা বেঁধে নেওয়ার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছিলাম। যদি এটা কলকাতায় ফেরার পথে হত, তা হলে নিশ্চিত এসব পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে আসতাম। বাংলাদেশে খাদ্য নিয়ে এই কাণ্ড দেখার অভিজ্ঞতা স্বাতীরও কিছুটা আছে, কিন্তু আমার ছোট ভাইয়ের কাছে সবই বিস্ময়কর।

মাদারিপুর পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে লিগাল এড সেন্টারের অতিথিশালায়। সেখানে অনেকগুলি ঘর, তার মধ্যে কয়েকটি বাতানুকূল। তা ছাড়াও এখানে রয়েছে একটি বড় আকারের ক্যান্টিন, আলোচনা কক্ষ, গ্রন্থাগার ইত্যাদি। বেশ বড় কমপ্লেক্স, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এতবড় আইন পরিসেবা কেন্দ্র পশ্চিমবাংলার কোনও মফস্বল শহরেই নেই।

এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ডাক্তার আবদুল বারি। এঁর কথা রাজ্জাকের কাছে আগেই শুনেছি। ইনি সকালবেলা চোখের ডাক্তার, বিকেলবেলা অন্য মানুষ। সকালে প্রথম দু'ঘণ্টা ডাক্তারি করেন জীবিকা হিসেবে, তার পরের দুঘণ্টা বিনা পয়সায়। মূলত সমাজ সেবক ডাক্তার বারির আরেকটি বিচিত্র সখ আছে, মোটর সাইকেল করে তিনি গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ান, হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলির ইতিহাস সংগ্রহ করেন। এভাবে তিনি ১,৬০০ বাড়ির ইতিহাস এর মধ্যেই সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ফেলেছেন। কোন গ্রাম যে অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান, তা ওঁর কাছেই পরে শুনেছি। অতুলপ্রসাদ সেনের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল এখনও চলে।

আমাদের বাড়ি নিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল।

পুব মাইজপাড়ায় ঠিক কোথায় ছিল আমাদের বাড়ি তা জানা যাবে কী করে? আমার স্মৃতি খুবই আংশিক। বীরমোহন স্কুলটির কথা মনে আছে, একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়, একটা সোজা রাস্তা চলে গেছে, ব্রাহ্মণ-পল্লিটি সেখানেই শেষ, সে পল্লির প্রতিটি বাড়ি আমার মনশ্চক্ষে উজ্জ্বল, কিন্তু পুরো গ্রামটি সম্পর্কে আমার ধারণা অস্পষ্ট। সুতরাং আমাদের বাড়ির অবস্থান ঠিক বোঝাতে পারিনি। রাজ্জাকদের পরিবার এখন পুব মাইজপাড়ায় এক গাঙ্গুলিদের বাড়িতে থাকে। অনেকখানি জমি সমেত বেশ বড় বাড়ি। রাজ্জাক আমাকে সেই গ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে শুনে কেউ একজন তাকে বলেছিল, তুই তো এত সুনীলদা, সুনীলদা করিস, সুনীলদা যদি এখানে এসে তার বাড়ি ফেরত চায় তা হলে কী করবি? রাজ্জাক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিল, সুনীলদা চাইলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে ও বাড়িতে আমার অংশ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াব। এ কাহিনি শুনে আমি হাসতে-হাসতে বলেছিলাম, এই গাঙ্গুলিবাড়িটা আমাদের নয়। মনে আছে, যতু গাঙ্গুলির বাড়ি হিসেবে পরিচিত ও-বাড়ি ছিল কোনও ছোটখাটো জমিদারের। ও বাড়ির ছেলেমেয়েরা ফরসা-ফরসা, ব্যাডমিন্টন খেলত, পুকুর ঘাটে রূপসি মেয়েদের বসে থাকতে দেখতাম। আমাদের ছিল কাঁচা বাড়ি, এতকাল পরে তার অস্তিত্ব থাকাও বোধ হয় সম্ভব নয়।

অস্তিত্ব থাক বা না-থাক তার অবস্থান তো জানা দরকার। তখন গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিলেন ডাক্তার বারি। ঘুরে-ঘুরে গ্রামের পুরোনো মানুষদের জিগ্যেস করে কয়েকটি গাঙ্গুলিবাড়ির সন্ধান পেলেন, তাতে সমস্যা মেটে না। তারপর মহাফেজখানায় খুঁজে পেলেন, আমার ঠাকুরদা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে বসতবাড়ির জমির খতিয়ান।

সে রাতেই ঢাকা থেকে এসে উপস্থিত হল বেলাল চৌধুরী আর কবি অসীম সাহা। এখন ঢাকা নিবাসী হলেও অসীমেরও বাড়ি ছিল এই মাদারিপুরে, তার বাবা অখিল বন্ধু সাহা ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষক, এখনও অনেকে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। বাবার মৃত্যুর পর তাদের গাছপালা ঘেরা বাড়িটি কীভাবে যেন বে-দখল হয়ে যায়, গত দশ বছরের মধ্যে আর অসীম এ শহরে আসেনি। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু ~ ছিলেন ওদের প্রতিবেশী, তাঁর বাড়িটিও অন্যের দখলে। পরে বেলালকে সঙ্গে নিয়ে অসীম নিজের বাড়িটা দেখতে যায় এক সকালে, একটি বোবা মেয়ে

তাকে চিনতে পেরে তার কাছে ছুটে আসে আকুতিভরা চোখে। পরে বেলাল এই ঘটনার মর্মস্পর্শী বিবরণ লিখেছে।

বেলাল তো শুধু কবি বা প্রাবন্ধিক বা সাংবাদিক নয়, সে আমাদের অনেক সময়ের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। যখন কয়েক বছর সে কলকাতায় ছিল, তার সঙ্গে কত অভিযানে গেছি, শুয়ে থেকেছি গাছতলায়। বাংলাদেশেও বহু স্থানে সফরে বেলালকে পেয়েছি। রাজদ্বারে এবং শ্মশানে (অথবা কবরস্থানে) যে সঙ্গে থাকে সে-ই প্রকৃত বন্ধু। বেলাল এর কোনওটাই বাদ দেয়নি। বেলালকে এখানে পেয়ে আমরা সবাই খুশি।

পরদিন সকালে নাস্তাটাস্তা সেরে সদলবলে বেরিয়ে পড়া গেল গ্রামের দিকে। মাদারিপুর শহরটি বেশ সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন। একটি বেশ বড় সরোবর আছে, রাস্তাঘাটে তেমন গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। পাকা সড়ক হয়েছে ঢাকা পর্যন্ত, এসব আগে দেখিনি। রাস্তার ধারে-ধারে গ্রামের নাম লেখা। আমাদের গ্রামের মধ্যে অবশ্য বেশি দূর পর্যন্ত গাড়ি চলার পথ নেই, গাড়ি থেকে নেমে উঠতে হল ভ্যান রিকশায়। প্রথম প্রথম সবই অচেনা, যতু গাঙ্গুলির বাড়ি নামে খ্যাত বাড়িটি চেনা গেল, এই বাড়ির পাশ দিয়েই স্কুলে যেতে হত, সে বাড়িটি অনেক বদলে গেছে, গেটের কাছে আগে যেখানে ছিল বাগান, সেখানে এখন একটি মাজার, তেমন সুদৃশ্য নয়। রাজ্জাকদের পরিবার এখন এ-বাড়িতে থাকলেও আগের মতন সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনি।

এ-বাড়ির পর থেকে সব মনে আছে। মোড়ের মাথায় একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছ, দিনের বেলাতেও তার কাছে দিয়ে যেতে গা ছমছম করত। কারণ, পাশেই শ্মশান। সে গাছের কোটরে-কোটরে অনেক পাখির বাসা, একটি কোটর থেকে ডেকে উঠত তক্ষক। এই গাছটিকে ঘিরে অনেক ভূতের গল্পও প্রচলিত ছিল, ভরত চক্রবর্তী নামে একজন ডাক্তার এই গাছতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ গাছের একটা ডাল নেমে এসে তাকে মারতে শুরু করে। ভরত ডাক্তারের নাম এখনও অনেকে মনে রেখেছে। একবার এক সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়েছিলেন, আমাদের চোখের সামনেই তিনি ধুনির আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত চ্যালা তুলে মুখে ভরে দিতেন।

বুকের মধ্যে প্রায় ধক করে একটা শব্দ হল। সেই অশ্বত্থ গাছটা নেই। এই গাছ তো বহুদিন বাঁচে। ঝড়েও পড়ে যায় না। তবে কি কেউ কেটে ফেলেছে? রাজ্জাক বলল, সম্ভবত তাই-ই।

শ্মশানটিও নেই, কারণ আর প্রয়োজন নেই।

এখান থেকে যে রাস্তাটি সোজা বামুন পাড়ার দিকে গেছে, সে রাস্তাটির অবস্থাও শোচনীয় বোঝা যায়, এ রাস্তা এখন কেউ ব্যবহার করে না, উঁচু-নীচু, গর্ত ও আগাছায় ছেয়ে গেছে, ভ্যান রিকশাও চলতে পারে না। নেমে পড়ে এবার হন্টন।

এ যেন রহস্য কাহিনির মতন। এরপর আরও কত কী যে দেখব।

এই রাস্তাটির এক পাশে ছিল পাট খেত, অন্য পাশে ধান খেত। ধান খেতের দিকটা নীচু, বর্ষার সময় ওখান দিয়ে নৌকো চলত, এখান থেকে নৌকোতেই গেছি ধুয়াসার নামে একটি গ্রামে। এখন বৈশাখ মাস, মাথার ওপর গনগনে সূর্য, এখন চাষের সময় নয়। দু'দিকে শুধু মাঠ, কিছু-কিছু বাড়িও চোখে পড়ে দূরে দূরে।

এক জায়গায় রাস্তাটার বদলে মাটির স্তূপ জমে আছে, সেটা পেরুতেই আমাদের পাড়া। প্রথম অবলোকনেই মনটা দমে গেল।

পঞ্চান্ন বছর আগেকার ছবিটা দেখতে পাব না জানতাম, কোনওটাই পাকা বাড়ি ছিল না, তাই এতকাল অবিকৃতভাবে টিকে থাকা সম্ভও নয়, অনুমান করেছিলাম, সেইসব বাড়িগুলো সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে কেউ বসবাস করবে। একেবারে খাঁ-খাঁ অবস্থায় পড়ে থাকার বদলে কারও দখল করা বা পুনর্বসতিই তো যুক্তিসঙ্গত। তা তো হয়নি। পুরো পাড়াটিই ধ্বংস হয়ে গেছে, একটি বাড়িরও সামান্যতম অস্তিত্বও নেই। এরকম কী করে, ইচ্ছে করে কেউ পুরো পল্লিটি নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে? তা অসম্ভব নয়, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্রাহ্মণদের ওপর রাগ থাকতেই পারে। ছুৎমার্গ ও পাপ-

পুণ্যের ভুজুংভাজুং দিয়ে ব্রাহ্মণরা তো এক সময় অন্যদের কম জ্বালায়নি। সেরকম ঘটেছিল কি না, সঙ্গীরা কেউ বলতে পারে না। ব্রাহ্মণ পল্লিটি একেবারে মুছে গেছে এই গ্রামের মানচিত্র থেকে। সমস্ত জায়গাটাই আগাছায় ভরা। যাকে বলে পড়ো জমি। ঘুরে-ঘুরে আমাকে শনাক্ত করতে হল, কোথায় ছিল চৌধুরীদের বাড়ি, কোথায় সেই চ্যাটার্জিদের বাড়ি, যেখানে আমি গোবিন্দ মামার বিয়েতে এসেছিলাম শেষবার। সবই শুধু শূন্যতা। রাজ্জাক কেন জোর করে আমাদের নিয়ে এল এখানে? স্বাতী কী দেখল শ্বশুরের ভিটে। ছোট ভাই অশোক (ডাক নাম বাচ্চু) কিছুই বুঝতে পারছে না।

ঘুরতে-ঘুরতে দেখলাম, একেবারে পেছনের দিকে আমাকের বাড়ির জমিতে কেউ একটা আস্তানা করে আছে। সামনের দিকের ভালো-ভালো জমি থাকতে সে পেছনের দিকে এই জমি কেন বেছে নিল কে জানে। তবু এটা আমাদের জমির সৌভাগ্য, এখনও মানুষের স্পর্শ আছে।

ছেলেবেলায় চোখে সব কিছুই বড়-বড় মনে হয়। যে পুকুরে আমি সাঁতার শিখেছিলাম, সেটাকে মনে হত বিশাল, একবারে পারাপার করা যায় না। সেই পুকুরে নাকি ঢেঁকির সমান দুটি গজাল মাছ ছিল, যাদের নাম কার্তিক আর গণেশ, কদাচিৎ তারা কুমিরের মতন মাথা তুলে ভাসত, এখন আর সে পুকুরটাকে তেমন বড় মনে হল না। অব্যবহারে মজে গেছে। এখানে সেখান পাড় ভাঙা। এক দিকের যে-বাগানে টিয়াঠুটি আমগাছটা ছিল, সেদিকে গাছপালা কিছু নেই, চেনা কোনও গাই নেই, লেবুবনটা অদৃশ্য।

এক জায়গায় শামিয়ানা টাঙিয়ে কিছু গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। অনেককাল পরে এই গ্রামের একটি ছেলে ফিরে এসেছে বলে তাঁদের চোখে কৌতূহল, আগ্রহ এবং অভ্যর্থনা সব মিশে আছে। সবাই আমাদের ডাবের জল বা সরবৎ খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। বয়স্ক ব্যক্তিরা স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন। লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা এক সচ্ছল চেহারার প্রৌঢ় বললেন, আপনার বাপ-জ্যাঠার কথা আমার একটু মনে আছে। আপনারা আছিলেন জমিদার, আমরা আপনেগো প্রজা। কথাটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। আমরা ছিলাম গরিব এবং কুঁড়েঘরবাসী। ঠাকুর্দার আমলে দশ-কুড়ি বিঘে জমি ছিল, তা ভাগ-চাষ হত, এবং শুনেছিলাম চাষিরা সবাই মুসলমান, কোনও চাষি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অবস্থাপন্ন। জমি থাকলেই কি জমিদার হয়? হাত থাকলেই কি হাতিয়ার থাকে? কারও কাছ থেকেই পুরোনো কালের সঠিক বৃত্তান্ত জানা গেল না, তবে আমাকে এই গ্রামের ছেলে হিসেবে ফিরে পেয়ে সবাই যেন খুশি। রিটার্ন অফ দা প্রডিগাল সান ঠিক বলা যায় না গেলেও আমাদের জন্য ভোজ দিতে অনেকেই আগ্রহী।

দুপুরে রাজ্জাকদের বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে আছে। প্রচুর মানুষ আমন্ত্রিত, যতু গাঙ্গুলির বাড়িটির স্ট্রাকচারটি খাড়া আছে। কিন্তু বদল হয়েছে অনেক। ফেরার পথে রাস্তার ধারে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির উঠোনে, হাতে একটা পাকা বেল। দেখে মনে হয় গরিবের বাড়ি। সেই মানুষটি তার গাছের বেল আমাকে উপহার দেবে বলে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। এরকম উপহার আমি খুব কমই পেয়েছি ইহজীবনে। হঠাৎ একটু আবেগ এসে যায়। মনে হয়, জন্মস্থান কিংবা জন্মভূমির মাটি-টাটি একেবারেই অবান্তর। মাটির চেয়ে মানুষই তো আসল। মাটি নয়, আমি এখানকার মানুষের টানেই এসেছি। রাজ্জাক হাওলাদার আমার গ্রাম-সহোদর।

একটি কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অকৃত্রিম কৌতূহলে প্রশ্ন করল, আপনারা এই গ্রামের বাড়িঘর ছেলে চলে গেলেন কেন? এর আমি কী উত্তর দেব? এই প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়েই পুরোনো ইতিহাস জানে না। না জানুক ক্ষতি নেই। ইতিহাস তো ধুয়ে খাবে না। বর্তমানের বাস্তবতাই বড় কথা। এবং অতীতের অশান্তির কথা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের শান্তির চিন্তাই স্বাস্থ্যকর। এবং যে বিশেষজ্ঞরা ইতিহাস নিয়ে চর্চা করবেন, তাঁরা যাতে কোনওক্রমেই ইতিহাসকে বিকৃত হতে না দেন, সেটাই কাম্য।

ছেলেটি বলল, আপনি আসুন, আমাদের বাড়িতে থাকবেন, যত দিন খুশি, আপনার কী লাগবে বলুন? আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললুম অবশ্যই আসব, আমার বিশেষ কিছু লাগে না,

শুধু ডাল-ভাত পেলেই যথেষ্ট, আর সঙ্গে যদি একখানা বেগুনভাজা পাই তো তাতেই দারুণ আহ্লাদ হয়।

এই ছেলেটির মতন প্রস্তাব আমাকে আরও কয়েকজন দিয়েছে।

বীরমোহন উচ্চবিদ্যালয়ে কিছু একটা সভার আয়োজন হয়েছিল, প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সেখানে আমারও আমন্ত্রণ। মাত্র এক বছর আমি পড়েছি এই স্কুলে, ১৯৪৩ সাল, বিশ্বযুদ্ধ চলছে, যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না থাকলেও ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে সারা বাংলা জুড়ে। বাবা তখন কলকাতায়, মা ও শিশু ভাইবোনদের সমেত আমরা গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। হাফ প্যান্ট ও চেন লাগানো গেঞ্জি পরে স্কুলে আসতাম হেঁটে, খুব বর্ষায় নৌকোয়। স্কুল বাড়িটি এখন বড় ও বিস্তৃত হয়েছে, তবু মূল অংশটি চিনতে পারি। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রায়বাহাদুর রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন এই অঞ্চলে আর ভালো স্কুল ছিল না। আমার বাবা এই স্কুল থেকে পাস করেই কলকাতার কলেজে পড়তে গেছেন।

মঞ্চে বিভিন্ন বক্তা নানা বিষয়ে বলছেন। কবি দুলাল সরকার একটি কবিতাও পড়ে ফেললেন, আমি অর্ধমনস্ক হয়ে শুনেছি আর বসে-বসে ভাবছি সেইসব দিনের কথা, যখন ভাতের বদলে সারাদিন আলুসেদ্ধ খেয়ে কাটাতে হত। স্কুলেও প্যান্টের পকেটে আলুসেদ্ধ নিয়ে আসতাম, সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়ের সময় হঠাৎ-হঠাৎ আলু ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়ে যেত। যুদ্ধের নকলে, হ্যান্ড গ্রেনেড বর্ষণের মতন।

এই স্কুলের পেছনে একটি সুপ্রসন্ন দিঘির কথাও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তবে, স্মৃতিতে তার আকার যত বড় ছিল, আসলে ততটা নয়। আমার শৈশবে দিঘিটি ছিল প্রায় নতুন। জল কাকচক্ষু টলটলে, সুন্দর বাঁধানো ঘাট, মাঝখানে ফুটে থাকত কয়েকটি পদ্মফুল। এখন দিঘিটি বুড়ি হয়েছে, সংস্কারের অভাবে ঘাটলাটা ভাঙা-ভাঙা। পানিও তত পরিষ্কার নয়। এখন বোধ হয় আর গ্রামের মানুষ সরাসরি পুকুরের পানি খায় না। আমাদের সময় খেতে হত, তাই পুকুরকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন নিতে হত।

সভার পর একটি লাইব্রেরির উদ্বোধন এবং বৃক্ষরোপণ। অন্যদের সঙ্গে আমিও গাছের চারা পুঁতে দিলাম। আশা করি যখন আমি আর ধরাধামে থাকব না, তখনও এই গাছটি থেকে যাবে। সব গাছের সঙ্গেই বাতাসের ফিসফিসানির একটা ভাষা আছে। সেই ভাষায় থেকে যায় সময়ের প্রকৃত ইতিহাস, মানুষ তো বোঝে না।

॥ অন্য গ্রাম, আমগ্রাম ॥

পরিকল্পনা রাজ্জাকের, ব্যবস্থাপনা সব বারি সাহেবের। দুজনেই সদা ব্যস্ত, তবে দুজনের স্বভাবের তফাত আছে। রাজ্জাক সবসময় অস্থির, আর বারি সাহেব ধীরস্থির। মাঝবয়েসি এই মানুষটি বেশ সুপুরুষ, কথা বলেন নীচু গলায়। আমি যদি চুপিচুপি গ্রাম দেখতে আসতাম, তা হলে অন্য ব্যাপার হত। কিন্তু যেহেতু আমাদের আনা হয়েছে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, তাই প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে। সেইসব ঝক্কি ঝামেলা সামলানো, সকলের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও দুজনের, রাজ্জাক তো আমাদের সঙ্গে এই অতিথিশালাতেই থাকছে, বারি সাহেব সকালেই নিজের বাড়ি থেকে চলে আসেন অন্য কাজকর্ম ফেলে, থাকেন অনেক রাত পর্যন্ত।

রাজ্জাকের শ্বশুরবাড়ি শরিয়তপুরে। বেশি দূরে নয়, ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা, ফরিদা সেখান থেকে রোজ আসে। স্বাতীর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না তার খোঁজ-খবর নেয়। একদিন তো সবাই মিলে তাদের বাড়িতে খেতে যেতেই হবে, তার আগে আমগ্রাম ঘুরে আসা দরকার।

ছোটবেলায় যেমন অনেক ছোট জিনিসকেও বড় দেখায়, তেমনই অনেক কাছের জিনিসকেও

সুদূর মনে হয়। বাল্য বয়সে মনে হত, আমাদের মাইজপাড়া থেকে আমার মায়ের মামাবাড়ি, যা বকলমে আমারও মামাবাড়ি, সেই আমগ্রাম যেন অনেক দূরে। এখন হুশ করে গাড়িতে সেখানে পৌঁছনো যায়। অবশ্য তখন তো গাড়ির রাস্তাও ছিল না, গাড়িও ছিল না, যেতে হত নৌকায়, তাতে অনেক সময় লাগে। তখন পূর্ব বাংলা ছিল নদীনালার দেশ। সেই সব নদী ও জলপথ গেল কোথায়? নদীগুলির বড়ই শীর্ণ দশা। একসময় আড়িয়াল খাঁ নদীকে মনে হত দুর্দান্ত তেজি, এখন অতি সাধারণ ও সরু। যদিও এখন প্রখর গ্রীষ্ম, অনেক জলধারাই শুকিয়ে যায়, তবে বর্ষার সময়ও এইসব পাকা রাস্তা ডুবে যায় না শুনলাম।

নদীগুলির এই দৈন্যদশার জন্য এখানে অনেকে ফারাক্কার বাঁধকে দায়ী করেন। তা সত্যি হতেও পারে। এখন তো অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, ফারাক্কায় অতবড় বাঁধ দেওয়া ভুল হয়েছে, পশ্চিমবাংলার পক্ষেও। পৃথিবীর সমস্ত নদীর বাঁধই ভুল এবং অন্যায়। পৃথিবীর সব নদীই বন্ধনদশার জন্য রুগ্‌ণ। পশ্চিমবাংলার গঙ্গার কী করুণ দশা, গ্রীষ্মকালে দক্ষিণেশ্বরের কাছে মাঝগঙ্গায় চর জেগে ওঠে, সেখানে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। এ বীভৎস দৃশ্য আমাদের অল্প বয়েসে অকল্পনীয় ছিল। গঙ্গার এই দশার জন্য কলকাতা বন্দরটাও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

আমগ্রাম যাওয়ার পথে একটি গ্রন্থাগার ও একটি মেয়েদের স্কুল ছুঁয়ে যেতে হল। গ্রন্থাগারটিতে বেলালের জন্য একটি বিস্ময়ের চমক অপেক্ষা করছিল। গ্রন্থাগারটির নাম মাদারিপুর এম এম হাফিজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, কামালউজ্জামান সাহেব আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন, হঠাৎ বেলাল জানতে পারল যে এই এম এম হাফিজ মানে মহিউদ্দিন মাহমুদ হাফিজ তার আপন মামাত ভাই বাবলু। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল বাবলু। ষাটের দশকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল, এস ডি ও হিসেবে প্রথম পোস্টিং হয় মাদারিপুরে। একবার এখানে প্রলয়ের মতন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা আঘাত হানে, তখন এই সুদর্শন, তরুণ এস ডি ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সবদিক সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয় সে। এরই মধ্যে হঠাৎ সামান্য একটি টিনের খোঁচা খেয়ে তার ধনুষ্টঙ্কার হয়। অকালে নষ্ট হয়ে যায় এই মূল্যবান জীবন। বাবলু তখন সদ্য বিবাহিত। মাদারিপুরের মানুষ তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত এই লাইব্রেরির নাম রেখেছে। বেলাল অভিভূত হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

মেয়েদের স্কুলটির রাজৈর গ্রামে। রাজৈর, চরমুগুরিয়া, টেকের হাট, এইসব নামগুলি স্মৃতির মধ্যে ঠংঠং শব্দ করে, কিন্তু কোনও চিত্র নেই। গ্রামের মধ্যে এমন সুদৃশ্য স্কুল দেখব, আশা করিনি। ছাত্রীরা সুশৃঙ্খলভাবে নানারকম ক্রীড়া দেখাল। স্কুলটি পরিচালনা করেন শ্রীমতি যোগমায়া দেবী। ভদ্রমহিলা জ্বর হয়েছে, তবু তিনি এসেছেন এবং ছোটাছুটি করলেন। স্কুলটির জন্য তাঁর ব্যাকুল ভালোবাসা অনুভব করা যায়।

এখানে ব্যবস্থাপনায় ছিলেন একজন ভারী আকর্ষণীয় ব্যক্তি, চেহারায়, নামে ও ব্যবহারে। এঁর নাম সুরুজ বাঙালি, সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় অনেক লম্বা, অনেক ভিড়ের মধ্যেও তাঁর উঁচু মাথা চোখে পড়বেই, গমগমে কণ্ঠস্বর। এঁর পরিচয় কিংবা অমন নাম দিয়েছেন কেন, তা জানা হয়নি। তবে আমাদের বাসস্থানে প্রতিদিনই লোডশেডিং হয়। এক সন্ধেবেলা বাইরের পুকুরের ধারে বসে গল্প করছি, হঠাৎ সুরুজ বাঙালি এসে কিছু একটা গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন অন্যদের থেকে আলাদা করে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, গোপন কথা বলছেন না। দোতলায় আমাদের নির্দিষ্ট ঘরের কাছে এসে বললেন, আলোর থেকে অন্ধকারই তো বেশি ভালো, তাই না? এরকম অন্ধকারে আপনার মতন মানুষদের একা থাকা উচিত।

ঠিক সেই মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল। সুরুজ বাঙালি খুব নিরাশ হলেন মনে হল।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে গাড়ি চলল আমগ্রামের পথে। নৌকোয় ছাড়া কখনও আসিনি। তাই কিছুই চিনতে পারি না। সেই রহস্য কাহিনির মতনই ভাবছি, মামা-বাড়ি গিয়ে কী দেখব, নিজেদের গ্রামের মতন পড়ো জমি, না অন্য কিছু? গোবিন্দ গাঙ্গুলিদের একটা পাকা বাড়ি ছিল তা একেবারে

ধ্বংস হওয়ার কথা নয়। গাড়ি এসে থামল এক জায়গায়। সঙ্গীরা বলল, এই তো এসে গেছি, তখন আমার মনে হল, নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় এসেছি। সামনে এ তো অন্য বাড়ি, নতুন বাড়ি।

ছবিটি ছিল এইরকম, একটা একতলা পাকা বাড়ির পেছনের উঠোনের দুপাশে ছিল আরও সারি-সারি টিনের চালের বাড়ি। আর সামনের দিকে স্থায়ী আটচালা, অর্থাৎ আটটি স্তম্ভের ওপর ত্রিপল ঢাকা, সেখানে যাত্রা-থিয়েটার ও সভাসমিতি হত, তার একদিকে পূজা মণ্ডপ, অন্যদিকে পাকা মন্দির গৃহদেবতার। সেসব কোথায়? নতুন বাড়িটির পাশ দিয়ে একটু এগোতেই সারা শরীর বটের চারা জড়ানো ভগ্নপ্রায় মন্দিরটি দেখেই চিনতে পারলাম। এরপর সব বোঝা গেল। আটচালা, পূজা মণ্ডপ অবশ্যই থাকার কথা নয়। গ্রামের সচ্ছল পরিবারের বাড়ি সংলগ্ন অনেকখানি জমি ও বাগান থাকেই, সেইসব জায়গায় নতুন বাড়ি উঠে গেছে, তাই চেনা যাচ্ছিল না।

পাকা বাড়িটির বিশেষ কিছু বদল হয়নি, শুধু কিছুটা কালের চিহ্ন লেগেছে। পেছনের বাড়িগুলো নেই, উঠোনটা ছোট হয়ে গেছে, এই উঠোনেই তৈরি আঁতুড়ঘর আমার প্রকৃত জন্মস্থান। বর্ষাকালে জন্ম, কলেরা, ম্যালেরিয়া কিংবা সাপের কামড় না খেয়েও কী করে বেঁচে রইলাম কে জানে।

ছাদের ওপর একটা ঘর আছে। আমার ধারণা ছিল, ওই ঘরে মা ও আমি কখনও থেকেছি। স্মৃতির মধ্যেও অনেক ভেজাল ঢুকে পড়ে। ওপরে উঠে দেখলাম, সে ঘরটি এতই ছোট যে বাসযোগ্য নয়। হয়তো কিছু জিনিসপত্র থাকত, হয়তো চোর-পুলিশ খেলার সময় কখনও এই ঘরে লুকিয়েছি। ছাদ থেকেই দেখা গেল পুকুরটা, ওখানে ছিপ ফেলে অনেক মাছ ধরেছি। না, অনেক মাছি ধরি-নি, অনেকদিনের মাছ ধরতে বসেছি।

এক তো প্রচণ্ড রোদ, তায় প্রচুর কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেছে, তাই সব জায়গা ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। এক জায়গায় চেয়ার পেতে বসলাম। স্বাতীকে বোঝাচ্ছি এটা সেটা। বাচ্চুর ধারণা, ওর অস্পষ্ট স্মৃতি আছে, ও একবার জলে পড়ে গিয়েছিল। ও শেষ এসেছিল তিন-চার বছর বয়েসে, তবু এই স্মৃতি সত্যি হতেও পারে। ওর একটু জলে পড়ার প্রবণতা আছে। একবার কাশীতে গঙ্গায় প্রায় ডুবতে বসেছিল।

এই বাড়ির সংলগ্ন দিঘির একদিকে ছিল নমঃশূদ্র পল্লি, আর একদিকে খ্রিস্টান পল্লি। তারা এখনও আছেন অনেকে। মাইজপাড়ার তুলনায় আমগাঁ অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম, অনেক বিশিষ্ট পরিবারের বাস ছিল, কিছু-কিছু পরিবার রয়ে গেছেন। এ গ্রামের বর্তমান চেহারাও ছন্নছাড়া নয়।

অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখতে এসেছেন আমাদের, বিশেষত স্বাতীকে। সে তো এ গ্রামের নাতবউ। মাইজ পাড়ার কেউই বাবা-জ্যাঠা বা আমাকে চিনতে পারেনি। এখানে তবু মাঝে-মাঝে পরিবারের ঝিলিক পাওয়া যাচ্ছে। এক একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দাবি করতে লাগলেন, কারও বয়েস বিরানব্বই, কারও বয়েস একশো দশ। এইসব গ্রামদেশে বয়েসের সঠিক হিসেব রাখা কঠিন। তবে তাঁরা যথেষ্ট প্রাচীন তে বটেই। কেউ-কেউ গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে চিনতেন। কেউ বা তাঁর বাবা-কাকাকেও দেখেছেন। বাড়ির অন্যান্য ছেলে ও মেয়েদের কথা বলতে-বলতে একজন বললেন, যতন নামে একটা ফুটফুটে মেয়ে ছিল, তখন আমার সত্যিকারের চমক লাগল। আমার মায়ের নাম মীরা, ডাকনাম যতন। এই নাম বোধহয় হিন্দু-মুসলমান দু'তরফেই হয় (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বিখ্যাত গল্প 'যতন বিবি') মায়ের মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনরা (তাদের সংখ্যা অনেক) তাঁকে ডাকত রাঙাদি, খুব ফরসা গায়ের রঙের জন্য। দিদিমা-দাদামশাইরা ডাকতেন যতন। আমি সেই যতনের ছেলে শুনে এক বৃদ্ধা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। সেই স্পর্শে অনেক পুরোনো স্নেহের স্নিগ্ধতা।

এই সম্পত্তির বর্তমান মালিক সাবেক ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট অনিল ব্যাপারীর পরিবার। তাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় জোর করেই আমাদের নিয়ে বসাল তাদের নতুন বাড়িতে। সেখানে পাখার হাওয়া আছে। ফুলের তোড়া, ডাবের জল ও সরবত এনে নানাবিধ আপ্যায়ন। এক বৃদ্ধ ধরে বসলেন, অতিথি হিসেবে আমাদের অন্ন গ্রহণ করতেই হবে দুপুরে। আমাদের তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বারি

সাহেব কানে-কানে জানালেন, আমাদের আহারের সব ব্যবস্থা হয়ে আছে স্থানীয় গ্রন্থাগারে। সেখানে অপেক্ষা করছেন অনেকে।

অন্দরমহলের মহিলাদের কাছ থেকে একটি শাড়ি উপহার এল স্বাতীর জন্য। সে এ গ্রামের নাতবউ, এবার প্রথম এসেছে, তাকে তো একটা কিছু দিয়ে আশীর্বাদ করতে হয়। মামারা কেউ নেই, কিন্তু আশীর্বাদ করার মতন মানুষ আছে।

॥ মুক্তিযুদ্ধে জাদুঘর ॥

রাজ্জাক লম্বা প্রোগ্রাম বানিয়ে রেখেছে। তার থেকে একটি দিনও সে বাদ দিতে রাজি নয়। এই সময় কলকাতায় আনন্দ পুরস্কার উৎসব হয়, পরপর দুবছর সে উৎসবে আমার থাকা হচ্ছে না।

এই অতিথিশালায় আমরা থিতু হয়ে গেছি। এ কথা ঠিক, কোনও এক স্থানে টানা কয়েকদিন থাকলে সেই স্থানটির প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যায়, শরীরেও অনুভব করা যায় পরিবেশ। মাদারিপুর শহরটি স্বাতীর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সে দু-একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই এখানে ওখানে যায়। আমি বেশি বেরোবার সুযোগ পাই না, অনেক মানুষ আসে দেখাসাক্ষাৎ করতে। তরুণ কবি কিংবা উচ্চপদস্থ আমলা, প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা বা সমাজসেবক। পরিচয় হয় কাজি আবদুস সবুর, ফরহাদ, খান মোহাম্মদ শহিদ, মনজুরুল হক, আলমগীর প্রমুখ অনেকের সঙ্গে।

আমি রাজ্জাককে গ্রাম-সহোদর বলে সম্বোধন করেছি বলে একজন কৌতুক করে বলল—এর পর ওর নাম হয়ে যাবে রাজ্জাক গঙ্গোপাধ্যায়। আমার নামও কি সুনীল হাওলাদার হতে পারে না? মন্দ শোনাচ্ছে না তো।

দুলাল সরকার রোজই আসে। তার মুখখানি ম্লান দেখি। শশীকর নামে একটি কলেজের সে অধ্যাপক। সেখানকার প্রভাষক পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুলাল ও আর কয়েকজনের কিছু-কিছু অভিযোগ আছে। সেগুলি আমি শুনতে চাই না, আমার কিছু করণীয় নেই। পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘুদের নানান সমস্যা থাকে, কোনও-কোনও দেশে তা বেশি প্রকট। যত দিন ধর্ম, গায়ের রং জাতি-পরিচয়ে মানুষের বিচার হবে, ততদিন এইসব সমস্যা থাকবেই। কিছুতেই মানুষ এই ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। আর যেখানে রাষ্ট্রশক্তি এই ক্ষুদ্রতার মদত দেয়, সেখানে হিংসা, ঘৃণা, অবিশ্বাস লাগামছাড়া হয়ে যায়। আক্রমণ ও প্রতিশোধের পালা চলতেই থাকে। যেমন চলছে ভারতে।

সব ধর্মের সঙ্গেই হিংসার ওতপ্রোত সম্পর্ক বলে কোনও ধর্মের প্রতিই আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তবে ধর্ম সম্পর্কে আমার উগ্র মতামত এখন আর আমি প্রকাশ করি না। চুপ করে থাকি। তবু শুধু নামটার জন্যই আমাকে কেউ কোনও ধর্মে দেগে দেয়, তখন বড় মনকষ্ট হয়। এবারেই একটা নদীর ওপর ফেরি পার হওয়ার সময়, সারা মুখ গোঁফদাড়িতে ভরা একজন মোল্লা ধরনের যুবক আমার কাছে এসে অটোগ্রাফ চাইল। পাশে দাঁড়ানো রাজ্জাক জিগ্যেস করল, আপনি এনাকে চেনেন? লোকটি বলল, চিনি। হিন্দু রাইটারদের মধ্যে আমি এনার লেখা খুব পছন্দ করি।

আমার গালে যেন কেউ ঠাস করে একটা চড় কষাল। হিন্দু রাইটার! সারাজীবন ধরে যে এত লেখালেখি করলাম, তা শুধু হিন্দু রাইটার হওয়ার জন্য, বাঙালি লেখক হতে পারলাম না। লোকটি সরলভাবেই কথাটি বলেছিল, কিন্তু সে যে আমার মনে কী দাগা দিয়ে গেল, তা জানল না। নাম নিয়েই যত গণ্ডগোল। এই জন্যই আমাদের বিশ্ব-যাযাবর বন্ধু মোস্তাফা কামাল ওয়াহিদ বলে, তার নতুন নাম হবে, আকাশ-বাতাস।

কাছাকাছি একজন লেখককে পেলে ইস্কুল-কলেজ থেকে তাঁকে ডাকাডাকি করবে, এটা স্বাভাবিক। যেতে হল এরকম কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আবার অনেক বাড়িতে দাওয়াতও গ্রহণ

করতে হয়, তাই সব সময় তাড়াহুড়ো থাকে। কোথাও এমনও হয়, সময়ের অভাবে কোনও স্কুলের সামনে গাড়ি থামে, অপেক্ষমাণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দু চারটি কথা বলেই বিদায় নিতে হয়, ভেতরে আর যাওয়া হয় না। এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়, তাড়াহুড়ো আমার শরীরে সয় না। কিন্তু এখানে আমার সময়-নির্ঘণ্ট অন্যের হাতে।

এমনকি শরিয়তপুরে যাওয়ার পথে একদিন কাশীপুর হিন্দুপাড়া প্রাইমারি স্কুলের সামনে মাত্র দু-মিনিট থামতে না থামতেই রাজ্জাক তাড়া দিতে লাগল, আর একটুও দেরি করা যাবে না। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ফরিদার বড় বোন শিরীন আখতার। নিজের শ্যালিকার অনুরোধও উপেক্ষা করতে পারে, রাজ্জাকের এত সাহস? জানি না সে পরে শ্যালিকার হাতের কানমলা খেয়েছিল কি না!

রাজ্জাকের শ্বশুরবাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাব বলে কমোডওয়ালা নতুন বাথরুম বানানো হয়েছে। থাকব তো মোটে কয়েক ঘণ্টা। শ্বশুরবাড়িতে রাজ্জাকের বেশ দাপট আছে বোঝা যায়। অতিভোজনের পর আমার ঘুম পাবে বলে একটি আলাদা ঘরে বিছানাও পাতা রয়েছে। অপূর্ব সব রান্না, কিন্তু পদের আধিক্যের জন্য সব ক'টির সুবিচার করা যায় না। শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক শ্যালিকা ও তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরিবারটি বেশ আনন্দমুখরিত। গাছপালা-ঘেরা বাড়ি। শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানতে-টানতে আমি মনে-মনে আওড়াতে লাগলাম জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতাঃ

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে
মাথা রেখে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের
খেতে
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, -চোখে
তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাদের আস্বাস পেয়ে অবসাদে পেকে
ওঠে ধান
দেহের স্বাদের কথা কয়...

পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনও মিল নেই, তবু এইভাবেই কবিতার লাইন মনে আসে। বিশেষ ভালোলাগা থেকে। 'চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ', এ উপমা আমার সাতপুরুষের কেউ লিখতে পারবে না।

শেষের আগের দিক একটা কোনও বড় কলেজে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে নানারকম আয়োজনের খবর আসছিল কানে। নির্দিষ্ট দিনটিতে দেখি রাজ্জাক আর বারি সাহেব আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে। আরও অনেকে আসছে, সকলেই সেই ফিসফিসানিতে যোগ দিচ্ছে। এক সময় রাজ্জাক কুণ্ঠিতভাবে জানাল যে ওই কলেজের দিকে আমার না-যাওয়াই ভালো। আমরা অন্য কোথাও যাব বেড়াতে।

কেন সে অনুষ্ঠান বাতিল হল, তা আমি জানতে চাইনি। হয়তো স্থানীয় কোনও দলাদলি, তাতে মাথা গলাবার আবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মানুষের জীবনটা এত ছোট, তার মধ্যে অপ্রিয় বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়। বরং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করতে কত সুসময় উপভোগ করা যায়।

সেরকমই বিমল আনন্দ পেলাম ঢাকা পৌঁছে প্রথম রাতেই। ঢাকায় যদিও আমার অনেক বন্ধুর বাড়িতেই ওঠার পাকা আমন্ত্রণ আছে। কিন্তু এবারে রাজ্জাক আর কোথাও যেতে দেবে না, তার দোসর রেজাউল করিম তালুকদার আগে থেকেই হোটেলে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ঢাকা পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল।

হোটেলে মালপত্র রেখেই ছুটতে হল ফারুক হায়দারের বাড়িতে। ফারুক অনেক দিনের বন্ধু,

বহু বছর ছিল লন্ডনে, প্রথমে সেখানেই দেখা। মনে আছে, লন্ডনে কোনও একটি বাড়িতে আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ফারুক আমার জন্য শ্যাফার ড্রিভন গাড়ি পাঠিয়েছিল। ওসব দেশে এটা দারুণ কেতার ব্যাপার। এক গোঁড়া মুসলমান পরিবারে রাত্রিবাস করছিলাম। সে বাড়িতে সুরা পানের সুবিধে নেই, আমি মনে-মনে সংযমের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ফারুক কোথা থেকে একটা বোতল এনে বলেছিল, ঘরের মধ্যে বসে খাবেন, তাতে কেউ আপত্তি করবে না।

অবশ্য এসবই যৌবনের কথা। এখন আমরা দুজনেই কিছুটা স্থিতধী হয়েছি। ফারুক এখন প্রধানত ঢাকাতেই থাকে। তার বাড়িতে এই রাতের আমন্ত্রণ পূর্বনির্ধারিত, কারণ পরের দিনই সে চলে যাবে বিদেশে। আরও অনেকেই এসেছেন, আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে গান। ফারুকের অসম্ভব সঙ্গীত-প্রীতি। গানের মাঝখানে যাতে যতি না পড়ে তাই আলাপ পরিচয়ের বদলে আমরা বসে গেলাম গানের আসরে। খুবই উৎকৃষ্ট গান, শুনতে শুনতেই অনুভব করা যায়, বড় শহরে পৌঁছে গেছি। গান দিয়ে বোঝা যায় নাগরিকতা।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা ঢাকার প্রথম সংবাদপত্রে দেখি, বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম লেখক হুমায়ূন আহমেদ, প্রথম পৃষ্ঠায় একটি রসস্নিগ্ধ রচনা লিখেছে আমারই গ্রাম-দর্শন বিষয়ে। এবং হুমায়ূন প্রস্তাব করেছে, আমাকে যেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। হুমায়ূন আমার সম্পর্কে এরকম চিন্তা করেছে বলেই আমি অভিভূত ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। কিন্তু ওইসব নাগরিকতার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমি যেতে চাই না। মনে-মনে তো আমি বিশ্বনাগরিক আছিই, ঠিক সময়ে, সহজে ভিসা পেলেই হল।

ঢাকায় প্রচুর বন্ধুবান্ধব, প্রচুর দাওয়াত। বেলাল মাদারিপুর থেকে আগে চলে এসেছিল, এখানে আবার দেখা। এবং রবিউল হুসাইনের সঙ্গে গাজি সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে পরপর আড্ডা, হুমায়ূন আহমেদ ও প্রণব ভট্টের বাড়িতে আহারের আগে গান ও পান, সৈয়দ আল ফারুকের উদ্যোগে সাহিত্যবাসর, এসবের আর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এবারে ঢাকায় আসার মূল উদ্দেশ্য, রাজ্জাকের 'বাকি রয়ে গেছে কিছু'র উদ্বোধন হবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। সে মাইজপাড়া গ্রামের ছেলে, আর একজন মাইজপাড়ার মানুষকে দিয়ে বইটি উদ্বোধন করাতে চায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমি প্রতিবারই আসি, এবারের অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেছেন রাইটার্স ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। এসেছেন অনেক বিদ্বজ্জন। শিল্পী, কবি গায়কা-গায়িকা, এবং এখন বয়েস হয়ে-যাওয়া কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা।

বসে-বসে সকলের ভাষণ শুনছি, আর মনে হচ্ছে, আমি তো মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিইনি, আমি অন্য দেশের নাগরিক, যুদ্ধবিদ্যাও শিখিনি। কিন্তু আমারই গ্রামের ছেলে রাজ্জাক তার ভাইদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেজন্য গর্ববোধ করতে পারি।

“ তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে ”

এই কথা বলেছেন এ যুগের
সেরা চলমান লেখক।
সেই শুরুর দিন থেকে ‘অর্ধেক জীবন’
ধরে তার ‘অনলস’ ভ্রমণ।
তাঁর মর্ত্যধামের সমগ্র ভ্রমণগাথা
নিয়ে এই অপরূপ বই।

9 788183 740753
www.bookspatrabharati.com